কার্ত্তিক ১৩৬০ : দাম আট আনা

: শ্রীসজনীকান্ত দাস

Oct.-Nov. : Price As. Eight

সূচী

ংবাদ-সাহিত্য ... ১
ড়ু মায়ের প্রতি—শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২৭
।না—"বনফুল" ... ২৭
আমার সাহিত্য-জীবন—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৩৩
ধূমাবতী—"বনফুল" ... ৪৩
পরিচয়—শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ... ৪৭
সন্ধ্যাবেলার গল্প—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত ... ৫৬
বিবাহ-বার্ষিকী—শ্রীপ্রমথনাথ ঘোষ ... ৫৭
লাউড স্পীকার—শ্রীকালিদাস রায় ... ৬৩
মিতার জন্য রোমাণ্টিক কবিতা—শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ ... ৬৪
ভক্তি ... ৬৫
মহাস্থবির জাতক—"মহাস্থবির" ... ৬৬
জবালা ও সত্যকাম—শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ... ৮১
হ্যামলেট, ডেনমার্কের কুমার—অনু. শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ... ৮৭
ফেরারী—শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ ... ৯৫

সাফল্য ও সমৃদ্ধির
বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসেবার যে গৌরব ও জনগণের যে অকুণ্ঠ আস্থার উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দুস্থান উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং যে সঙ্গতি, সততা ও প্রতিষ্ঠা হিন্দুস্থানের পূর্ব্বাপর বৈশিষ্ট্য, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ইহার ১৯৫২ সালের ৪৬তম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে।
নূতন বীমা
১৬,৩৮,৭১,২৭৮৲
মোট চলতি বীমা .... ৮৬,৭১,৮৫,০৪০৲
মোট সম্পত্তি .... ২২,৪৯,৮৩,০৫৬৲
বীমা ও বিবিধ তহবিল ...... ১৯,৭৭,৭৬,২৮৭৲
প্রিমিয়ামের আয় .... ৩,৯৪,[illegible],৩৭১৲
দাবী শোধ (১৯৫২) .... ৮৮,৮২,২৭১৲
হিন্দুস্থানের বীমাপত্র নিরাপদ

MARGO
SOAP
TOILET & MEDICINAL
BHRINGOL
MAHA BHRINGARAJ OIL
CHEMICAL
রূপরচনায় ক্যালকেমিকোর
কয়েকটী অনুপম প্রসাধনী
মার্গো সোপ
নিমের সুগন্ধি প্রসাধন সাবান ॥
ভৃঙ্গল সুগন্ধি মহাভৃঙ্গরাজ তৈল কেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়; মাথা ঠাণ্ডা রাখে।
রেণুকা পুষ্পসুরভিময় রূপচূর্ণ। মুখশ্রী ও দেহশ্রী লাবণ্যময় করে।
তুহিনা প্রাকৃতিক রুক্ষতা হইতে গাত্র-চর্ম্মকে রক্ষা করিয়া কোমল ও মসৃণ রাখে।
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

ইণ্ডিয়া
ল্যাম্প, বেল,
কর্ক-প্রভৃতির
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
প্রস্তুত কারক
ইণ্ডিয়া সাইকেল ম্যাঃ কোং লিঃ কলিকাতা-১

KAVIRAJ N.N. SENS
keshranjan
oil
এমনটি
আর নেই
কেশরঞ্জন
অসাধারণ কেশতৈল

১,০০০,০০০ এরও বেশী প্রমাণ

বিগত ২৭ বৎসরে ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ওয়ার্কস পুরাদমে কাজ করিয়া ১,০০০,০০০-এর অধিক পাখা তৈয়ারী করিয়াছেন।

এই সমস্ত পাখা এখন ভারতে ও ভারতের বাহিরে বাড়ীতে ও অফিসে, কারখানা, রেলওয়ে, হোটেল, হাসপাতাল, ক্লাব, রেস্তোরাঁ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হইতেছে। এই ২৭ বৎসরে প্রত্যেকটি আই-ই-ডব্লিউ পাখা উৎকর্ষতা ও অনন্যসাধারণ কার্য্যক্ষমতার গুণে পাখা ব্যবহারকারী প্রত্যেকেরই অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই এই প্রশংসা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং আজকাল প্রত্যেক পাখা ব্যবহারকারীই আই-ই-ডব্লিউ পাখা পছন্দ করিয়া থাকেন।

দি ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ওয়ার্কস লিঃ

কলিকাতা-৩৪

PURITY
INDIAN BARLEY
না আমি জানি 'পিউরিটি' বার্লি সব
য়েই ভালো, কারণ এই বার্লি স্বাস্থ্য-সম্মত
ায়ে টিনে ভরা হয় এবং সেরা শস্য থেকে
ডাকারের অভিজ্ঞ লোক দিয়ে তৈরি।
উরিটি' বার্লি তৈরির পেছনে রয়েছে
শো বছরের পেষাইর অভিজ্ঞতা।
পিউরিটি বার্লি

স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

মরণের পারে

(মরণের পারের আত্মাদের অসংখ্য রকমের চিত্র সংবলিত)

মৃত্যু ও পরলোকের রহস্য-কাহিনীর খবর দিয়েছে আজ পর্য্যন্ত যতগুলি বই স্বামী অভেদানন্দের এই বইখানি তাদের শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। কৌতূহলোদ্দীপক প্রত্যক্ষ কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে সুনিপুণভাবে তাদের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যার অপূর্ব সন্নিবেশ পুস্তকখানিকে অতুলনীয় করেছে।

প্রেতাত্মাদের সঙ্গে স্বামিজীর মেলামেশার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণও এতে পাওয়া যাবে।

অজ্ঞাত রহস্যময় প্রেতলোকের ও প্রেতাত্মাদের অনেক কিছু বিস্ময়কর মর্মন্তুদ খবর ও ঘটনা বিশেষ মর্মস্পর্শী।

মূল্য : পাঁচ টাকা

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

শনিবারের চিঠি

২৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৬০

সংবাদ-সাহিত্য

নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন

"প্রবাসী" বিশেষণে ভূষিত হইয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে এতকাল বৎসরে বৎসরে বঙ্গ-সাহিত্যের যে মাণ্ডূক্য সম্মেলন হইয়া আসিতেছিল, তাহাতে বঙ্গদেশের সুধী ও সাহিত্যিক সমাজ অবজ্ঞামিশ্রিত কৌতুকই অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন, কেন না, প্রবাসী-কূপে সাহিত্যের মুখোশ পরিয়া এতদিন "অফিসিয়াল" ব্যাঙেরাই নাচানাচি করিতেন, দুই-চারিটি কোলা ব্যাঙ অথবা ধনী ব্যক্তিকে তাঁহারা আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদেরই যশ বা অর্থের রুধিরে এই ব্যাঙের জলসার সমারোহ বৃদ্ধি করিতেন; অফিসে ও খেতাবে, ক্ষমতায় ও ট্যাঁকে মাথা-মাখি হইয়া মজা মন্দ জমিত না; মাত্র পাঁচ টাকার "ডেলিগেট-ফী"তে তিন দিনের "চেঞ্জার"বাবুরা সস্তায় আহার এবং দেশভ্রমণ দুইই সমাধা করিয়া ভাল মোটা কাগজে ছাপা একাধিক অভিভাষণ হাতে হাসিমুখে ঘরে ফিরিয়া পূরা এক বছর সাহিত্যের জাবর কাটিতেন; যাঁহারা ভাগ্যবান তাঁহাদের ছবি ও নাম দৈনিক সংবাদপত্রে মুদ্রিত ও বিঘোষিত হইত। বঙ্গ-সাহিত্যের নামে প্রবাসী বাঙালীদের এই বাৎসরিক আমোদ-প্রমোদে বাংলার সাহিত্যিকগণ এই ভাবিয়াই আপত্তি জানাইতেন না যে, প্রবাসে নিয়মো নাস্তি।

এবারেও জয়পুরে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে, কিন্তু "প্রবাসী"—"নিখিল-ভারত" হওয়াতে আমরা আপত্তি জানাইতে বাধ্য হইতেছি। জয়পুরে দিল্লীর অন্যতম "অফিসিয়াল" আই-সি-এস শ্রীদেবেশ দাশ সদ্যপ্রকাশিত 'রাজোয়ারা' গ্রন্থের লেখক হিসাবে ও শ্রীমনোজ বসু উক্ত পুস্তকের প্রকাশক হিসাবে যে কেলেঙ্কারি করিয়া আসিলেন, তাহা আর যাহাই হউক, নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন তো নয়ই—সম্মেলনই নয়। সরল এবং রসপিপাসু ভদ্র সম্প্রদায় সেখানে গিয়াছিলেন চতুর দেবেশ শ তাঁহাদেরই হাতে তীব্র যশের গঞ্জিকাধূম পান করিয়া আসিলেন। খানা তৃতীয় শ্রেণীর ভ্রমণ-কাহিনী সাহিত্যের হাটে যাঁহার একমাত্র

"অবদান" তিনি যে অনুষ্ঠাতাগণকে ধোঁকা দিয়া মূল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিতে পারিলেন, ইহাতেই তাঁহাকে কুশলী ও উদ্বাহু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তিনি নিঃসম্বল অবস্থায় কেমন শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছেন, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। গত বারে কটকে তিনি বৃহত্তর-বঙ্গ শাখায় আরোহণ করিয়াছিলেন, আর এইবার নিখিল-ভারতের মূলে চড়িলেন! স্বয়ং কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি কতখানি নির্লজ্জ হইলে করুণানিধান-কুমুদরঞ্জন-কালিদাস-যতীন্দ্রনাথ-উপেন্দ্রনাথ-প্রেমাঙ্কুর-তারাশঙ্কর-বনফুল-প্রেমেন্দ্র-প্রবোধ ইত্যাদি শতাধিক সাহিত্যিককে অতিক্রম করিয়া মূল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবার স্পর্ধা করিতে পারেন, তাহার পরিমাপ করিতে ওলনদড়ি চাই। তিনি যে এখানেই থামিবেন, তাহা আমাদের মনে হয় না। রাজোয়ারার দিকে আর একটু নজর দিলে মেবারের মহামান্য রাজন্য এই নিধিরাম সর্দারকে যে প্রতাপী ঢাল-তরোয়াল উপহার দিয়াছেন, তাহা তাঁহারই বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবে। নতুবা হিন্দুস্থানের রাজেন্দ্রপ্রসাদ-জওহরলাল অচিরাৎ বিপন্ন হইবেন। এই তেনজিং-প্রতিভা মাঝপথে থামিবার নহে।

পোড়া কপাল শ্রীমনোজ বসুর! তিনিই দেখিতেছি একমাত্র সাহিত্যিক যিনি শ্রীভূমির এই দ্বিতীয় নিমাইয়ের মচ্ছবে মাথা মুড়াইয়া আসিলেন। সম্মেলনের উদ্বোধনে যখন বঙ্কিম-রমেশচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাংলা দেশের মাত্র একজন জীবিত ধুরন্ধরকে ব্র্যাকেটায়িত করা হইল, তখন কি তাঁহার কানে তালা লাগিয়াছিল? ওই ত্রয়ীর সঙ্গে দেবেশ দাশের নাম উচ্চারিত হইতে দেখিয়া তিনি কি জহরব্রত করিয়া মরিতে পারিলেন না? বলিতে লজ্জায় মাথা কাটা যায়, ইহার পরেও তিনি দেবেশ দাশের ঢাল-তরোয়াল-বরদার হইয়া দিল্লী পর্যন্ত ধাওয়া করিলেন! হা হতোস্মি!

আবার নাকি কবি-সম্মেলন হইয়াছিল! সেখানেও সভাপতি শ্রীদেবেশ দাশ। বাংলা কবিতার অপঘাত-মৃত্যু শেষ পর্যন্ত ওই রাজোয়ারী তরোয়ালের আঘাতেই ঘটিল।

নিখিল-ভারত-বঙ্গসাহিত্য নাম লইয়া কতিপয় মতলববাজের এই ধৃষ্টতা আর কতদিন চলিবে? বাঙালীর সুনাম আর সর্বরকমেই খণ্ডিত

হইয়াছে, একমাত্র সাহিত্যে তাহার একটু নাম ছিল, রাজস্থানের মরু-বালুকায় তাহাও বুঝি বিলীন হইল ! যে সকল সাধু ব্যক্তির হাতে বিবিধ অর্থকরী দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল, তাঁহারাও শুনিলাম সাধুতার চূড়ান্ত করিয়া বাঙালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। সাহিত্য-সম্মেলনের এক প্রধান উদ্দেশ্য প্রবাসী বাঙালীদের সহিত খোদ বঙ্গবাসী রসিকদের মেলামেশা ও অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি। শুনিলাম, ইহার বিপরীতই ঘটিয়াছে। বাঙালীর সম্মান সত্য সত্যই ধুলায় লুটাইয়াছে। আগামী বৎসরে ইহার প্রতীকার যাহাতে হয় তাহাই কামনা করিয়া এই অবাঞ্ছিত প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম। বাংলা দেশের সাহিত্যিকেরা উদাসীন বলিয়াই এরূপ ঘটিতে পারিয়াছে। তাঁহারা তৎপর হউন এবং অপদার্থ বালখিল্যদের হাত হইতে এই প্রাতিষ্ঠানের পরিচালনা-ভার কাড়িয়া লইয়া যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে ন্যস্ত করুন। ঘরে বসিয়া বাঙালী যাহা খুশি তো করিতেছেই, বাংলা-সাহিত্যের নামে নিখিল-ভারতকে কি না-হাসাইলেই নয় !

সমসাময়িক বঙ্গ-সাহিত্য-সমাবেশ

দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, বাংলা সাহিত্যের বর্তমান বিভ্রান্তিকর 'পরিস্থিতি' হইতে গৌরবময় ঐতিহ্যকে রক্ষা করিয়া উন্নতমান সাহিত্যধারাকে পুনরুজ্জীবিত ও সুসমৃদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে 'সমসাময়িক বঙ্গসাহিত্য-সমাবেশ' নামে একটি দলনিরপেক্ষ সম্মেলন আহ্বান করার আয়োজন হইতেছে। গত ১৫ই কার্তিক রবিবার প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিকদের একটি প্রাথমিক আলোচনা-সভাও হইয়াছে—কালীঘাটে ৪২নং সদানন্দ রোডে। আমরাও মনে করি, অধুনা বিভিন্ন মতবাদের সঙ্কীর্ণতা ও গোষ্ঠীগত স্বার্থান্ধতার ফলে সাহিত্য-রসিকমাত্রেই সৎ সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতেছেন। এই অবস্থায় সত্য সত্যই তরুণ সাহিত্যিকদের দিগ্‌ভ্রান্ত ও আদর্শচ্যুত হইবার আশঙ্কা আছে, এবং তাহা হইলে জনসাধারণেরও সাহিত্যপিপাসা বিকৃতপথে পরিতৃপ্তি খুঁজিবে। সাহিত্যিকদের সুস্থবুদ্ধি এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঠকসাধারণের সু-রুচি জাগ্রত রাখিতে হইলে এইরূপ সমাবেশের

একান্ত প্রয়োজন। ইঁহারা নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন-সংস্কারের কাজও কর্মসূচীর গোড়াতেই গ্রহণ করিতে পারেন।

"ক্ষুদে ডাকাত"

উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রসমাজকে "ক্ষুদে ডাকাত" বলিয়া উপেক্ষা করিবার দিন আর নাই। কারণ অভিভাবক ও শিক্ষক সম্প্রদায়ের মত সকলেই আজকাল ইহাদিগকে তাচ্ছিল্য করিতেছেন না। একদল মতলববাজ লোক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে "মহান্" বিপ্লবের "মহান্" ধোঁকা দিয়া ভিতরে ভিতরে ইঁহাদিগকে তালিম দিতেছেন। ইহারই মহড়া সারা ভারতবর্ষ জুড়িয়া আরম্ভ হইয়াছে; বিপ্লব নয়, সত্যকার বিপর্যয় একদিন দেখা দিবে, যদি না নেহরু-সরকার হইতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষক-অভিভাবক সম্প্রদায় এই "ক্ষুদে ডাকাত"দের মস্ত কার্যকরী ক্ষমতা সম্বন্ধে অবহিত হন। ইঁহাদিগকে সাদরে সসম্মানে কাজে লাগাইতে হইবে। শিক্ষার কাজে, গঠনের কাজে ইঁহাদের উপর আমরা নির্ভরশীল হইলেই ইঁহাদের ভাঙনের প্রবৃত্তি দূর হইবে; "ক্ষুদে ডাকাত"দের মস্ত বীর করিয়া তুলিবার ইহা ছাড়া অন্য পথ নাই।

'শনিবারের চিঠি'র রজত-জয়ন্তী

১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১০ই শ্রাবণ শনিবার 'শনিবারের চিঠি'র জন্ম হয়—একটি চটি ৩২ পৃষ্ঠার সাপ্তাহিক-রূপে, মূল্য ছিল প্রতি সংখ্যা এক আনা। আজ ১৩৬০ বঙ্গাব্দের ২১ কার্তিক শনিবার ইহার বয়স হওয়ার কথা ২৯ বৎসর ৩ মাস ১১ দিন। কিন্তু সাতাশ সংখ্যা কাহিল জীবন যাপন করিয়া ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ৯ই ফাল্গুন সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি' পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। সাপ্তাহিকের সম্পাদক জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ছিলেন শ্রীযোগানন্দ দাস, বরাবরই ছাপা হইত ৯১ নং আপার সারকুলার রোডে প্রবাসী প্রেসে। অধিকাংশ লেখাই বেনামী থাকিত। নামে বা বেনামে যাঁহারা লিখিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, পুলিনবিহারী দাস, শ্রীশান্তা দেবী, শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা বহিরঙ্গ। অন্তরঙ্গদের মধ্যে মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীসুশীলকুমার দে, রবীন্দ্রনাথ

মৈত্র, শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযোগানন্দ দাস, শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও শ্রীসজনীকান্ত দাস নিয়মিত লিখিতেন। আরও অনেকে ছিলেন।

১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে মাসিক-রূপে 'শনিবারের চিঠি'র পুনরাবির্ভাব ঘটে। সাপ্তাহিক ও মাসিকের অন্তর্বর্তীকালে তিনটি অসাময়িক সংখ্যা বাহির হইয়াছিল—১। জুবিলী সংখ্যা—১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩, ২। বিরহ সংখ্যা—আষাঢ় ১৩৩৩, এবং ৩। ভোট সংখ্যা—কার্তিক ১৩৩৩। "জুবিলী সংখ্যা" নামের একটু ইতিহাস আছে। 'ভারতী'র তদানীন্তন সম্পাদিকা সরলা দেবী 'ভারতী'র পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ না হইতেই "স্বর্ণ-জুবিলী সংখ্যা" প্রকাশ করেন। ইহা দৃষ্টে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ই 'শনিবারের চিঠি'র "জুবিলী সংখ্যা" বাহির করিতে বলেন এবং স্বয়ং নিম্নলিখিত প্রসঙ্গটি লিখিয়া দেন—

" 'শনিবারের চিঠি'র জুবিলী সংখ্যা

" উনপঞ্চাশ বৎসর পরে 'শনিবারের চিঠি'র পঞ্চাশ বৎসর বয়ক্রম পূর্ণ হইবে। সেই জন্য আমরা উহার এই জুবিলী সংখ্যা প্রকাশ করিতেছি। গ্রাহক ও পাঠকগণ পঞ্চাশ বৎসরের চাঁদা অগ্রিম দিলে বাধিত হইব। বিজ্ঞাপনদাতাগণও পঞ্চাশ বৎসরের মূল্য অগ্রিম চুকাইয়া দিলে বড়ই আপ্যায়িত হইব।"

যাহা হউক, ১৩৩৪ সালের ভাদ্র মাস হইতে হিসাব করিলে 'চিঠি'র বর্তমান বয়স ২৬ বৎসর ২ মাস হয়, কিন্তু ১৩৩৬ আশ্বিন হইতে ১৩৩৮ ভাদ্র পর্যন্ত দুই বৎসর কাল 'শনিবারের চিঠি'র প্রকাশ বন্ধ থাকে। সাপ্তাহিকের ছয় মাস এবং মাসিকের সাড়ে চব্বিশ বৎসর ধরিয়া গত আশ্বিনে 'শনিবারের চিঠি'র পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। বর্তমান সংখ্যা তাই রজত-জয়ন্তী সংখ্যা। শ্রীযোগানন্দ দাসের সম্পাদনাতেই অসাময়িক তিন সংখ্যা এবং মাসিকের গোড়ার কয়েক সংখ্যা বাহির হয়। পরে শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীপরিমল গোস্বামী ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদকত্ব করেন। মাসিকের প্রথম বৎসরে 'পরশুরাম' (রাজশেখর বসু), শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়, বনফুল, শ্রীগোপাল হালদার প্রভৃতি লেখকের শুভাগমন হয়। পরে

বাংলা দেশের প্রায় সকল লেখকই যোগদান করেন। শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরিপদ রায় ও শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী (পি. সি. এল.)র ব্যঙ্গচিত্র 'শনিবারের চিঠি'কে দীর্ঘকাল সমৃদ্ধ করিয়াছিল। আমরা নিম্নে পুরাতন 'শনিবারের চিঠি' হইতে কয়েকটি রচনা সঙ্কলন করিয়া দিলাম। বলা বাহুল্য, অনেক লেখাই তখন বেনামে বাহির হইয়াছিল। আমরা সকল রচনার আসল লেখকের নাম প্রকাশ করিয়া দিলাম। "মুখবন্ধ" 'শনিবারের চিঠি'র সর্বপ্রধান রচনা এবং 'তালতলা-সাহিত্য' রবীন্দ্র মৈত্রের প্রথম রচনা। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রাশনাম ছিল ডমরুধর ভট্টাচার্য, তিনি "ড. ভ." এই ছদ্মনাম ব্যবহার করিতেন। "হিঞ্জলী-দর্শন" লেখাটির জন্য আশ্বিন ১৩৩৮ 'শনিবারের চিঠি' পুনর্মুদ্রণ প্রয়োজন হইয়াছিল।

১৩৩৪ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যার মাসিকে প্রকাশিত "পরশুরাম"-(শ্রীরাজশেখর বসু) রচিত "সাহিত্য-সংস্কার" প্রবন্ধটি স্থানাভাবে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না, অংশত উদ্ধৃত করিলাম।—

"···বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীকে মন্দ আঁকেন নাই, তবে প্রায়শ্চিত্তটা বেশি হইয়াছে,—আজকাল অত না হইলেও চলে। কিন্তু আধুনিক আর্টের ব্যাপ্তি না জানায় প্রতাপকে তিনি একেবারে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছেন। এই প্রতাপের চরিত্র আমূল সংশোধিত করিয়া কিঞ্চিৎ নমুনা দেখাইতেছি।—

প্রতাপ রায় মরে নাই। ঘা সারিবামাত্র সে চন্দ্রশেখরের বাড়ি আসিয়া হাঁকিল—ভট্‌চায, ও ভট্‌চায! চন্দ্রশেখর নামাবলী গায়ে খড়ম পায়ে আসিয়া বলিলেন—কে ও, প্রতাপ যে! বেশ সেরেচো বাবা?

প্রতাপ একটি তাড়ি-রঙের ধুতির উপর তাড়ির ভাঁড়ের রঙের মেরজাই পরিয়া আসিয়াছে। তার চোখ লাল, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। টলিতে টলিতে বলিল—শৈবলিনীকে ডেকে দিন। চন্দ্রশেখর মাথা নীচু করিয়া একটু ভাবিয়া বলিলেন—নাই বা দেখা করলে।

—দেখা করতে আমি আসি নি, একেবারে নিয়ে যেতে এসেচি। ডাকুন শীগগির।

—সে কি প্রতাপ? তিনি যে কুল-বধূ।

—হলেনই বা, এক কুল ছেড়ে অন্য কুলে যাবেন, আম তো আর লরেন্স ফস্টর নই। সব ঠিক করেছি, তকি খাঁ প্রস্তুত, আজই শৈবলিনীকে মোছলমান বানিয়ে দেবেন,—তারপর আপনাকে তাল্লাক, আমার সঙ্গে নিকে। আমার নাম এখন আফ্‌তাফ খাঁ। ভয় নেই ঠাকুর, জাত যাবে না, কালই আবার রামানন্দ স্বামীকে ধ'রে দুজনে শুদ্ধি নিয়ে নেব।

চন্দ্রশেখর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—তুমি কি জাল-প্রতাপ?

প্রতাপ বজ্র-নিনাদে বলিল—আমি জাল! মূর্খ ব্রাহ্মণ, কাহার সম্পত্তি তুমি ভোগ করিতে চাও? এক বৃন্তে দুটি ফুল কে ছিঁড়িয়াছিল? (মূল গ্রন্থ দেখ) ভণ্ড জ্যোতিষী, শৈবলিনীর অন্তরের কথা বিবাহের পূর্বে গণিয়া দেখ নাই?

চন্দ্রশেখর কাতরকণ্ঠে কহিলেন—খুবই অন্যায় হয়ে গেছে বাবা।…"

মুখবন্ধ

আজকাল "নেই-উদ্দেশ্য" এবং "ক্রমস্ফুট-উদ্দেশ্য"রই যুগ। তাই যুগ-ধর্ম পালনের ইচ্ছা না থাকলেও বলছি, আমাদের কোন উদ্দেশ্য নেই। এমন কি উদ্দেশ্যহীনতাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য যদি কখনও আপনা-আপনি ফুটে ওঠে, তা হ'লে আশা যে, তা আপনা-আপনি ঝ'রেও পড়বে। আমরা যতক্ষণ আছি ততক্ষণ আমাদের স্বভাবই আমাদের কখনও উদ্দেশ্যযুক্ত ও কখনও উদ্দেশ্যহীন ক'রে চালাবে। উদ্দেশ্যের বা উদ্দেশ্যহীনতার খাতিরে আমরা নিজেদের বিসর্জন দেব না। নিজেদের স্বভাব, জীবন ও আগ্রহের ক্রমবিকাশের পথ ধ'রে চলতে চলতে আমাদের যা ভাল মনে হবে আমরা তারই অনুসরণ করব—কোন নির্দিষ্ট "পলিসি"র অনুসরণ করতে গিয়ে জীবন, স্বভাব ও চির-পরিবর্তনশীল হৃদয়াকাঙ্ক্ষাগুলিকে আড়ষ্ট ও প্রাণহীন ক'রে ফেলব না। এই যে আমাদের উদ্দেশ্য,—জগতে স্বাধীনতার প্রয়াস, এর ছায়া আমাদের সব কাজের উপর পড়বে।

ধর্ম-জগতে আমরা কোন-কিছুকে সাধারণতঃ অভ্রান্ত, চিরসত্য অথবা শেষ ব'লে স্বীকার করব না। অবস্থাবিশেষে উত্তম, অধম, কার্যকরী বা অকেজো ব'লেই আমরা কোন মত বা ব্যক্তিকে বিশিষ্ট

করব। অবশ্য ক্ষণিকের উন্মাদনায় আমরা কখনও কখনও পূর্বপুরুষদের পথ অবলম্বন করতে পারি, কিন্তু সে-কথা আগে থেকে বলা যায় না। সামাজিক সকল ব্যাপারে আমরা আমাদের ছাড়া অপর কিছু বা কাউকে মানব না। ভৌগোলিক ক্ষেত্রে যেমন দূর দেশকে মানব না—সময়ের ক্ষেত্রে তেমনি অতীতকে মানব না। দূর বা অতীত আমাদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে আমাদের মধ্যে স্থান পেতে পারে, কিন্তু সে আমাদের মন জুগিয়ে—জোর ক'রে নয়।

রাষ্ট্রকে আমরা বাদ দেব না। রাষ্ট্রীয়তা আমাদের একটা শক্ত রোগের মত চেপে ধ'রে রয়েছে, সেই রোগটাকে তাড়িয়ে বা দাবিয়ে আমাদের নিজেদের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে হবে। একে অবাধে বেড়ে উঠতে আমরা দেব না; পারলে তাকে দিয়ে আমরা সুবিধামত অনেক কাজ করিয়ে নেব।—উপায়ের ক্ষেত্রে আমরা মুগুরকে হাত-ছড়ির উপরে জায়গা দেব। চাবুককে চাপড়ের চেয়ে বড় ব'লেই ধরব, এবং শিশুশিক্ষার উদ্দেশ্যে চিত্রে-বেদান্তপ্রচারের চেষ্টা করব না। অনেক রকম গোলমালই আমরা বাধাব, কিন্তু অলমতিবিস্তরেণ।

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

(সাপ্তাহিক ১ম সংখ্যা, ১০ শ্রাবণ ১৩৩১)

জীবন-দর্শন

শুধু "বেঁচে থাকার নাম কি জীবন ?"—না।

আমি যে বেঁচে থাকতে আরম্ভ করেছিলাম তার কৃতিত্বটা আমার ছিল না। সেখানে আমার বাবা-মার দায়িত্ব। তারপর তাঁদের লালনে আর তাড়নে পাঁচ-আর-দশে পনেরো বছর বেঁচেছি (শাস্ত্রমতে)। তারপর প্রাইভেট টিউটর, তারপর শ্বশুর-মশাই ও তাঁর সুপারিশে-পাওয়া চাকরীর বড়-কর্তারা আমাকে "বাঁচিয়ে" রেখেছেন। বুড়ো বয়সে আমার দেড়গণ্ডা ছেলের শ্বশুরদের টাকা আমাকে বাঁচিয়েছে। আমার স্ত্রীরাও আমায় কম বাঁচায় নি। সত্যিই আমি বেঁচে গেলাম। জন্ম থেকে আরম্ভ ক'রে মৃত্যু পর্যন্ত আমি বেঁচেই চলেছি।

কিন্তু এর মধ্যে জীবন কই? কোথাও নেই। কেননা, কোন-

দিনই তাকে জন্ম দিই নি। আমার বাবা ও মা আমারই জনক-জননী, আমার জীবনের নন। তার একমাত্র জন্মদাতা আমি নিজে।

জীবন মানুষের সৃষ্টি, তার কীর্তি। যতখানি সে এই জীবনকে রচনা করে, ততখানিতেই স্রষ্টার আনন্দ ও অধিকার তার আছে।

যেখান থেকে জীবনের জন্ম হয়, ঠিক সেইখানে এসেই বেঁচে থাকা শেষ হয়ে যায়। যেটুকু তার প'ড়ে থাকে, সে শুধু ভগ্নাবশেষ। তার স্থান প্রত্নে আর ঐতিহ্যে।

ধর্মে বা রাষ্ট্রে কিংবা প্রেমে, জীবনের অধিকারটাই আমাদের প্রথম অধিকার। আজো যে দেশ জুড়ে বেঁচে আছি (হোক না সে অত্যতি প্রাচীন কাল থেকে), সেটা শুধুই একটা প্রকাণ্ড জের—নতুন হিসাবের পত্তন নয়।

শ্রীযোগানন্দ দাস
(১০ শ্রাবণ, ১৩৩১)

চরখা না বেহালা

(তুলোনার তুলোধোনা)

চরখা—সুতোকাটে ঘ্যেনোর ঘ্যেনোর সুরসার কিছুই নেই
কাজেই লোকে চরখার শব্দ শুনে প্যালা দেয় না।

বেহালা—ছড়া কাটে "টাকা দিবি কি না দিবি বল্" একেবারে নিছক
কাজের কথা কিন্তু সুরে বলে বেহালা অতএব লোকে শুনে
খুসি হয় এবং প্যালাও দেয়।

চরখা যে কাটে সে সুতোর সঞ্চারে লক্ষ্মীকে পায়, কাপড় যে বোনে সে হাতে বহরে লক্ষ্মীলাভ করে, মহাজন সে তাঁতীকে দাদন দিয়ে লক্ষ্মীকে ক'যে বাঁধন পরায় এবং দুই পায়ে সোনার বেড়ি লাগিয়ে লক্ষ্মী ঠাকরুণকে নিজের ঘরে অচলা ক'রে রাখে, কিন্তু মহাজন টেরও পায় না যে 'লক্ষ্মী-বিলাস' যাত্রায় বেহালাদার কান ম'লে তার ঘরের কড়ি নিয়ে গেল। তুলোর সঙ্গে সম্পর্ক চরখার, তাঁতের সঙ্গে সম্পর্ক বেহালার, সুতরাং দেশকে কাপড় পরাতে হ'লে বেহালারও বিশেষ প্রয়োজন। তা ছাড়া চরখার কানমলাও নেই, ছড়ি চালানোও নেই, বেহালাতে এ দুটোই

আছে, অতএব দেশের বর্তমান অবস্থায় বেহালাযন্ত্র চরখাযন্ত্রের অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় পদার্থ ব'লেই বোধ হচ্ছে—তুলনায় এবং তুলোধোনায় বেহালাই জবরদস্ত এবং ভারী বোধ হচ্ছে ডবল চরখার চেয়ে।

চরখা একটা যন্ত্র, সমাজ বিদ্যালয় কন্‌গ্রেস এমন কি স্বরাজতন্ত্র এরাও যন্ত্র (জাঁতা) ছাড়া আর কিছুই নয়। ঘর্ঘর শব্দ ছাড়া স্বর বার হতে পারে না এসব থেকে—কিন্তু বেহালা যন্ত্র হ'লেও তা থেকে স্বর ওঠে, সুতরাং এটি হ'ল সমতুল্য বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি মানুষের শরীর যন্ত্রটির যেটা খুব কাজের অথচ যা স্বরে বলছে, এই কারণে শরীরের সঙ্গে কবিরা বীণা, বাঁশী, বেহালা, তানপুরা, একতারা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের উপমা দিয়ে থাকেন, জাঁতার সঙ্গে উপমা দেন সংসার-চক্র, ভাগ্য-চক্র ইত্যাদি, যা পীড়া দেয়—স্বর দেয় না।

সুতরাং স্বর সৃষ্টি একটা প্রকাণ্ড সাধনা যার কাছে খদ্দর সৃষ্টি, খেলাফৎ সৃষ্টি, অসহ দুঃসহ সব রকম সৃষ্টি ও অনাসৃষ্টি হার মেনেছে, এটা ক'দিন বেহালা বাজিয়েই আমি বুঝছি। এবং এও দেখছি যদি দেশ উদ্ধারে যাত্রাই করতে হয় আমাদের তবে একখানা বেহালা ও এক ওস্তাদ না হ'লে জাঁতাকলে প'ড়ে ছাতু হতে হবে, আমাদের রস জমবে না, যাত্রাও একপা চলবে না। ইতি—

মন্ত্রী নয় যন্ত্রী
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(১৭ শ্রাবণ ১৩৩১)

তালতলা সাহিত্য

(গ্রন্থসমালোচনা)

গোবরা-গৃহিণী। রমন্যান। কবিবর তোজাম্মল শেখ বাখরগঞ্জী কর্তৃক প্রণীত ও মোহম্মদ মোস্‌কিল আসান খাঁ কর্তৃক তালতলা ৪৯নং নবিবক্সের গলি হইতে প্রকাশিত এবং ৯৪নং আহম্মদীয়া লেন জেহাদ প্রেসে মুখতিয়ার মুন্সী কর্তৃক মুদ্রিত। কাপড়ে বাঁধাই, সোনার হরফে ফার্সীর মত করিয়া নাম লিখা, মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র।

বহিখানি বড় চমৎকার; কবিবর তোজাম্মল ছাহেবের লিখিবার

ক্ষমতা আছে। তাঁহার দ্বারা শীঘ্রই মোছলমানী বাংলা সাহিত্য হিন্দু-দিগের বাংলা সাহিত্যের সমান হইয়া উঠিবে আশা করিতেছি।

উপন্যাসের ঘটনাটি এইরূপ; হোসেননগর একটি পল্লীগ্রাম। তাহার নীচ দিয়া নদী। নদীর ধারে গোবর্ধন মাঝির বাড়ি। গোবর্ধনের চার পুত্র, পাঁচ কন্যা। গোবর্ধনের স্ত্রী কদলীসুন্দরী সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলা। প্রত্যহ সে নদীর ঘাটে জল লইতে আসিত। এমন সময় একদিন সে হাজী তবারক আলী ছাহেবের পুত্র মবারক আলীর নজরে পড়িয়া গেল। হাজী সাহেব গ্রামের জমিদার; মবারক মিঞা ঢাকায় নবাব সরকারে মুন্সীর কার্য করেন, ছুটি লইয়া বাড়ি আসিয়াছিলেন। মবারক মিঞাকে দেখিয়াই কদলীসুন্দরী তাঁহার দিকে বাঁকা নজরে চাহিল। এমন সময় রাখালেরা ঘাটে গরুগুলিকে পানি খাওয়াইতে আনিতেছে দেখিয়া মবারক মিঞা উঠিয়া গেলেন। পরদিন বেলা থাকিতে কদলীসুন্দরী ঘাটে আসিয়া বসিয়া রহিল ও বাঁশঝাড়ের পিছনের পথের দিকে বার বার চাহিতে লাগিল—কতক্ষণে মবারক মিঞার জরির তাজ দেখা যায়। কিন্তু মবারক মিঞা আসিলেন না। তখন কদলীসুন্দরীর কলিজা ফাটিয়া যাইতে লাগিল, সে মাছের চুপড়ী ধুইয়া ও কলসীতে জল ভরিয়া চলিয়া গেল। এদিকে মবারক মিঞার কদলীসুন্দরীর কথা ভাবিতে ভাবিতে জ্বর আসিয়াছিল, সেই কারণে তিনি দরিয়ায় যাইতে পারিয়াছিলেন না। ভোরে জ্বর ছাড়িলে তিনি কৈ মাছ খুঁজিতে গোবর্ধন মাঝির বাড়িতে গেলেন, তাঁহাকে নজর করিয়াই কদলীসুন্দরী বেহুঁস হইয়া পড়িয়া গেল। এইভাবে দুইজনে দেখাসাক্ষাৎ চলিতে লাগিল। শেষে একদিন মোবারক মিঞা গোবর্ধন মাঝির নৌকায় ঢাকা চলিয়া গেলেন, কিন্তু পথে গোবর্ধনকে কুম্ভীরে ভোজন করিল বলিয়া দুঃখের সহিত ফিরিয়া আসিলেন। হঠাৎ তিন দিনের পর মবারক মিঞাকে দেখিয়া কদলীসুন্দরী কাঁদিয়া আসিয়া তাঁহার চরণ জড়াইয়া ধরিল। যুবতী হিন্দুবিধবার দুঃখ দেখিয়া মবারক মিঞা স্থির থাকিতে পারিলেন না; সেই দিনই দ্বিপ্রহর বেলাতে মোল্লা ডাকিয়া হিন্দুমহিলা কদলীসুন্দরীকে তওবা করাইয়া পবিত্র এছ্‌লাম কবুল করাইলেন; সন্ধ্যার পূর্বে হিন্দুনারী কদলীসুন্দরী

কদ্‌বানু নাম গ্রহণ করিয়া মবারক মিঞা ছাহেবের সঙ্গে পবিত্র বিধানে শুভ 'নেকাহ্‌'সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। প্রেমের ও ধর্মের জয় হইল।

আমরা আশা করি প্রত্যেক হিন্দু নরনারী এই কেতাবখানি পাঠ করিবেন। মোছলমান ভ্রাতৃবৃন্দও এক-একখানি বহি কিনিয়া গ্রন্থকারকে উৎসাহ দিবেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিন হাজার কপি বিক্রয় হইয়াছে। হিন্দু-মোছলমান একতার দিনে এরূপ কেতাব যত বাহির হয় ততই মঙ্গল

মওলবী আলী আহাম্মাদ মজলিস্‌

নিবেদন—বইখানি আমি নিজে পড়ি নাই। বন্ধুবর মৌলবী সাহেব যে সমালোচনা লিখিয়া দিয়াছেন তাহাই সম্পাদক মহাশয়ের অবগতির জন্য পাঠাইলাম। শুনিলাম, গ্রন্থকার মহাশয়ের লেখা এই ধরণের একুশখানা উপন্যাস আছে। হিন্দু-মুসলমানের একতাসাধনই সকলগুলি গ্রন্থের লক্ষ্য জানিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম। ইতি

শ্রীদিবাকর শর্মা

পুঃ নিঃ—বিতরণের জন্য মৌলবী সাহেব একশতখানা বহি পাইয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় কিংবা পাঠকগণের কাহারও প্রয়োজন হইলে মৌলবী সাহেবকে জানাইলে তিনি পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীদিবাকর

(৺রবীন্দ্রনাথ মৈত্র)

(২১ অগ্রহায়ণ ১৩৩১)

পীর তাঁবেদার হালিম ছাহেবের কোকিল-ধ্বংস-ফতোয়া

আরব দেশে মেদিনা নামে একটি শহর আছে। নগরকে ফারসীতে শহর ও সংস্কৃতে পুর বলে। এই জন্য কাফেররা মেদিনা-শহরকে বাংলা দেশের মেদিনীপুর মনে করে, পীর তাঁবেদার হালিম ছাহেবের জন্ম হয় বাস্তবিক আরব দেশের মেদিনা শহরে, কিন্তু কাফেররা ভুল করিয়া বলে তিনি পয়দা হন মেদিনীপুরে। আরব দেশে জন্ম বলিয়া তিনি আক্‌ছার আরবী জবানেই গুফ্‌ত্‌গু করেন, কিন্তু কাফেররা বুঝিতে না পারিলে বাংলা লব্‌জ্‌ও ইস্ত্‌মাল করেন।

তাঁহার বাড়ির নিকট একটি মস্‌জিদ আছে। তাহার মোল্লা ছাহেব একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জনাব, মস্‌জিদের ছাম্‌নে কেহ গাওনা বাজনা গোলমাল আওয়াজ করিলে কি করিব?" পীর হালিম বলিলেন, "তাড়াইয়া দিও।" মোল্লা ছাহেব ফের জিজ্ঞাসা করিলেন, "ট্রাম গাড়ী, মোটর গাড়ী, মোটর ভেঁপুর আওয়াজ হইলে কি করিব?" পীর তাঁবেদার মনের কথা গোপন রাখিয়া বলিলেন, "ওগুলার জান্ নাই, উহারা জানোয়ার নহে। উহাদের আওয়াজ মস্‌জিদে শুনা গেলে গুনাহ হয় না, যাহাকে কাফেররা পাপ বলে।"

মোল্লা ছাহেব ফের পুছিলেন, "মানুষের ত জান আছে। মানুষে মস্‌জিদের ছামনে গোলমাল করিলে মারধর করিয়া তাড়াইব কি?" পীর ছাহেব আবার আসল কারণ ছিপাইয়া বলিলেন, "মানুষের জান আছে বটে, কিন্তু মানুষ জানোয়ার নহে। জানোয়ারে আওয়াজ করিলে যেমন করিয়া হউক, তাড়াইয়া দিও।"

তাহার পর দিন মোল্লা ছাহেব ফের হাজির হইয়া বলিলেন, "মসজিদের ছাম্‌নে কাকগুলা বড় আওয়াজ করে, ছাম্‌নের বাগানে কোকিলগুলাও কুহু কুহু করে। কি করিব?"

তাঁবেদার হালিম ছাহেব কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "কাক ও কোকিল কাফের কিনা তাহা আগে ঠিক কর। তাহারা কোন্ জবানে কথা বলে?" মোল্লা ছাহেব পণ্ডিত দীনদয়ালু শর্মা হইতে মৌলানা শৌকৎ আলী পর্যন্ত সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়াও কাক-কোকিলের ভাষার কোন সন্ধান পাইলেন না। তাহা হালিম ছাহেবকে জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন উপায় কি?" পীর ছাহেব বলিলেন, "কাক ও কোকিল আমাদের খানা খায় কি?" মোল্লা ছাহেব বলিলেন, "কাককে আমাদের গোস্তের হাড় ও টুকরা ঠোকরাইতে দেখিয়াছি বটে; কোকিলকে দেখি নাই।" তখন পীর ছাহেব আঁধারে আলোক পাইয়া খুসী হইয়া বলিলেন, "কাক কাফের নহে—কোকিল কাফের, কোকিল কুহু কুহু করিলেই মারিবে, কাককে কিছু বলিও না।" মোল্লা ছাহেব বলিলেন,

"কোকিলকে ত প্রায় দেখাই যায় না, আওয়াজই শোনা যায়। মারিব কেমন করিয়া?" পীর তাঁবেদার হালিমের তখন হঠাৎ মনে পড়িল কলেজে পড়িয়াছিলেন্ ইংরেজ কবি ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থ বলিয়াছেন ঃ—

"O Cuckoo! Shall I call thee Bird
Or but a wandering Voice"

তিনি বলিলেন, "কোকিল দেখিতে নাই বা পাইলে? ইংরেজ কবি বলিয়াছেন, কোকিল চিড়িয়া নহে, সেরেফ একটা মুসাফির আওয়াজ মাত্র। যেদিক হইতে কুহু কুহু ডাক শোনা যাইবে সেই দিকে আল্লার নাম করিয়া ঢিল ছুড়িবে এবং তাহার পর গিয়া দেখিবে কোন জানোয়ার মরিল কি না!"

তাহার পর হইতে মোল্লা ছাহেব পীর হালিমের ফতোয়া মোতাবেক কাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কাণ্ড দেখিয়া পাড়ার হিন্দু মোছলমান সব ছাওয়াল লুকাইয়া রোজ সব সময় কুহুকুহু করিতে লাগিল। মোল্লা ছাহেব আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিক্-বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া ঢিল ছুঁড়িতে লাগিলেন। ঢিল ছুঁড়িয়াই তিনি চিড়িয়া শিকার হইল কিনা খোঁজ করিবার জন্য আওয়াজের দিকে যাইতেন। একদিন পীর ছেখের ছেলে করিম সাঁঝের বেলায় তাহাদের সার ডোবার পাড়ের ঝোপে লুকাইয়া ষাই না কুহু কুহু করা আর অমনি মোল্লা ছাহেব ঢিল ছুঁড়িয়া ডোবার দিকে দৌড়িলেন। আঁধারে ডোবা লক্ষ্য না হওয়ায় একেবারে আদাড়ি পাদাড়ে নিমজ্জিত হইলেন। কষ্টে স্হষ্টে কোন প্রকারে উঠিয়া রাগে ক্ষোভে একেবারে পীর তাঁবেদারের কাছে হাজির। তিনি মোল্লা ছাহেবের অদ্ভুত চেহারা দেখিয়া ও খুশবু পাইয়া "তওবা তওবা" করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মোল্লা ছাহেব, এমন হাল কেমন করিয়া হইল?" জবাবে মোল্লা ছাহেব কি বলিলেন ও কি করিলেন এবং পীর ছাহেব মোকান হইতে মোল্লাজির দেহসৌরভ দূর করিবার জন্য কত সাবান ও আতর খরচ করিলেন সে সব কেচ্ছা আজ বলিবার সময় নাই।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

(জুবিলি বা হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা সংখ্যা, ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩)

'শনিবারের চিঠি'র উদ্দেশে

'শিব'-নাম জপ করি' কালরাত্রি পার হ'য়ে যাও—
হে পুরুষ! দিশাহীন তরণীর তুমি কর্ণধার!
নীর-প্রান্তে প্রেতচ্ছায়া, তীরভূমি বিকট আঁধার—
ধ্বংস দেশ—মহামারী!—এ শ্মশানে কারে ডাক দাও?
কাণ্ডারী বলিয়া কারে তর-ঘাটে মিনতি জানাও?
সব মরা!—শকুনি গৃধিনী হের ঘেরিয়া সবার
প্রাণহীন বীর-বপু, উর্দ্ধস্বরে করিছে চীৎকার!
কেহ নাই!—তরী'পরে তুমি একা উঠিয়া দাঁড়াও!

ছল-ভরা কলহাস্যে জলতলে ফুঁসিছে ফেনিল
ঈর্ষার অজস্র ফণা, অর্ধমগ্ন শবের দশনে
বিকাশে বিদ্রূপ-ভঙ্গি, কুৎসা-ঘোর কুহেলি ঘনায়—
তবু পার হতে হবে, বাঁচাইতে হবে আপনায়!
নগ্নবক্ষে, পাল তুলি' একমাত্র উত্তরী-বসনে,
ধর হাল—বদ্ধ করি' করাঙ্গুলি, আড়ষ্ট আনীল!

মোহিতলাল মজুমদার

(পৌষ, ১৩৩৪)

শনিবারের চিঠি

প্রজা খাজনা বন্ধ করাতে সামরিক গোমস্তা ব্যোমযান থেকে বোমা বর্ষণ ক'রে খাজনা আদায় করতে বেরিয়েছিল এমন একটা সংবাদ কিছু কাল পূর্বে শোনা গিয়েছে। আমার মনে হয় 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে সেই শাসন-প্রণালীর কিছু একটু সাদৃশ্য আছে।

'শনিবারের চিঠি'তে ব্যঙ্গ করবার ক্ষমতার একটা অসামান্যতা অনুভব করেছি। বোঝা যায় যে, এই ক্ষমতাটা আর্ট্-এর পদবীতে গিয়ে

পৌঁছেচে। আর্ট্ পদার্থের একটা গৌরব আছে—তার পরিপ্রেক্ষিত খাটো করলে তাকে খর্বতার দ্বারা পীড়ন করা হয়। ব্যঙ্গসাহিত্যের যথার্থ রণক্ষেত্র সর্বজনীন মনুষ্যলোকে, কোনো একটা ছাতাওয়ালা-গলিতে নয়। পৃথিবীতে উন্মার্গযাত্রার বড়ো বড়ো ছাঁদ, type, আছে, তার একটা না একটার মধ্যে প্রগতিরও গতি আছে। যে-ব্যঙ্গের বজ্র আকাশচারীর অস্ত্র, তার লক্ষ্য এই রকম ছাঁদের 'পরে। এই typeএর অভিব্যক্তি নানা আকারে নানা দেশে নানা কালে,—এই জন্যে, একে যে-ব্যঙ্গ আঘাত করে তা আর্টিস্টের হাতের জিনিস হওয়া চাই, কেন না তাকে চিরকালের পথে যাত্রা করতে হবে। আর্ট যাকে আঘাত করে তাকে আঘাতের দ্বারাও সম্মান করে। ক্ষুদে ক্ষুদে রাবণ অলিতে গলিতে বাস করে, সর্বদা হাটে বাটে তাদের বিচরণ, কিন্তু বাল্মীকির রামচন্দ্র ক্ষুদে রাবণদের প্রতি বাণ বর্ষণ করেন নি, যে মহারাবণের একদেহে দশ মুণ্ড বিশ হাত তার উপরেই হেনেছেন ব্রহ্মাস্ত্র।

তারুণ্য নিয়ে যে-একটা হাস্যকর বাহ্বাস্ফোটন আজ হঠাৎ দেখতে দেখতে মাসিক সাপ্তাহিকের আখড়ায় আখড়ায় ছড়িয়ে পড়ল এটা অমরাবতীবাসী ব্যঙ্গ-দেবতার অট্টহাস্যের যোগ্য। শিশু যে আধো-আধো কথা কয় সেটা ভালোই লাগে, কিন্তু যদি সে সভায় সভায় আপন আধো-আধো কথা নিয়েই গর্ব ক'রে বেড়ায়, সকলকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চায় "আমি কচি খোকা", তখন বুঝতে পারি কচি ডাব অকালে ঝুনো হয়ে উঠেচে। তরুণের স্বভাবে উচ্ছৃঙ্খলতার একটা স্থান আছে, স্বাভাবিক অনভিজ্ঞতা ও অপরিণতির সঙ্গে সেটা খাপ খেয়ে যায়, কিন্তু সেইটেকে নিয়ে যখন সে স্থানে-অস্থানে বাহাদুরী ক'রে বেড়ায়, "আমরা তরুণ, আমরা তরুণ!" ক'রে আকাশ মাত ক'রে তোলে, তখন বোঝা যায় সে বুড়িয়ে গেছে, বুড়ো-তারুণ্যের অজ্ঞানকৃত প্রহসনে হেসে উঠে জানিয়ে দিতে হবে যে, এটাকে আমরা মহাকালের মহাকাব্য ব'লে গণ্য করি নে। চিরকাল দেখে এসেচি তরুণ জ্বর নিজেকে তরুণ ব'লে কম্পান্বিত ক'রে দেখায়, তরুণ স্বাস্থ্য নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলেই থাকে।—আজকাল তারুণ্য হঠাৎ একটা কাঁচা রোগের মত হয়ে উঠল, সে

নিজেকে ভুলচে না, এবং পাড়াসুদ্ধ লোককে চব্বিশ ঘণ্টা মনে করিয়ে রাখচে যে, সে টনটনে তরুণ, বিষফোড়ার মত দগদগে তার রঙ। শুধু তাই নয় তরুণরা যে তরুণ, বুড়োদের অধ্যাপকপাড়া থেকে তার প্রমাণ-পত্র সংগ্রহ করা চলচে। এর মধ্যে কৌতুকের কথাটা হচ্চে এই যে, তারুণ্যটা হ'ল বয়সের ধর্ম, ওটা স্বভাবের নিয়ম,—ওটার জন্য রুষীয় সাহিত্যশাস্ত্র থেকে নোট মুখস্থ ক'রে কাউকে একজামিন পাস করতে হয় না,—বিধাতার বিধানে ঐ বয়সটাতে মানুষ আপনিই আসে। কিন্তু আজকালকার দিনে তারুণ্যের বিশেষ ডিগ্রী-ধারীরা নিজেদের দুঃসহ তরুণতা সম্বন্ধে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদের থীসিস্ লিখতে সুরু করেচে। তারা বলচে আমরা তরুণ-বয়স্ক ব'লেই সবাই আমাদের সমস্বরে বাহবা দাও,—আমরা যুদ্ধ করেচি ব'লে না, প্রাণ দিয়েচি ব'লে না, তরুণ বয়সে আমরা যা-ইচ্ছে-তাই লিখেচি ব'লে। সাহিত্যের তরফে বলবার কথা এই যে, যেটা লেখা হয়েচে সাহিত্যের আদর্শ থেকে তাকে হয় ভালো নয় মন্দ বলব, কিন্তু তরুণ বয়সে লেখার একটা স্বতন্ত্র আদর্শ খাড়া করতে হবে এ তো আজ পর্যন্ত শুনি নি। বাংলা দেশে সাহিত্যের বিচারে দুই-জাতের আইন, দুই-জাতের জুরি রাখতে হবে, একটা হচ্চে আঠারো থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের লেখকদের জন্যে, আর একটা বাকি সকলের জন্যে, এই বিধানটাই পাকা হবে নাকি? এখন থেকে লেখকদের কুষ্ঠি মিলিয়ে তবে লেখার ভালো-মন্দ ঠিক করতে হবে? কোনো তরুণ-বয়স্কের লেখার নির্লজ্জতাদোষ ধরলে নালিশ উঠবে যে, সেটাতে কেবলমাত্র লেখার নিন্দা করা হ'ল না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যত তরুণ আছে সবাইকেই গাল দেওয়া হ'ল! যা হোক্, আমার বক্তব্য এই যে, যথার্থ সাহিত্যের হাসি বিরাট্, দূরগামী! সে নিষ্ঠুর, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের উপরে নয়, হাস্যকর মানুষের 'পরে। ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ বিশেষ উক্তি সম্বন্ধে ভুল করার আশঙ্কা আছে, চিরদিন সে রকম হয়ে এসেচে, কিন্তু বহু মানুষ নিয়ে বিধাতা মাঝে মাঝে যে অদ্ভুত রসের অবতারণা করেন, তার মধ্যে একটা সর্বজনীনতা আছে। ডন্ কুইক্সোটে যদিচ য়ুরোপীয় মধ্যযুগের এবং পিক্‌বিকে ইংরেজী বিক্টোরীয় যুগের সাহিত্যিক হাসি

ধ্বনিত, তবু সে-হাসি সকল মানুষের অন্তরের হাসি, কোনো দেশে তার সীমা নেই, কোনো কালে তার অবসান নেই। বাঙালী তরুণের স্বভাবে যদি কোনো হাস্যকরতা ব্যাপকভাবে এসে থাকে, তবে সাহিত্যে তার হাসি তেমনি বড়ো ক'রে দেখা দিক্, এই হচ্চে আমার সাহিত্যিক দাবী, এটা আমার সামাজিক দাবী নয়। তুমি তর্ক করবে সবাই সর্বাণ্টেস্ বা ডিক্‌নস্ হ'তে পারে না—সে তর্ক আমি মানি নে। সাহিত্যে বড়ো-ছোটোর ভেদ আছে, মূল আদর্শে ভেদ নেই। যার কলমেই সাহিত্যিক শক্তি দেখতে পাব তার কলমের কাছেই সাহিত্যিক দাবী করব—এই দাবীর দ্বারাই সাহিত্যের আদর্শ জোর পায়।

সাহিত্যের দোহাই ছেড়ে দিয়ে সমাজহিতের দোহাই দিতে পার। আমার নিজের বিশ্বাস, 'শনিবারের চিঠি'র শাসনের দ্বারাই অপর পক্ষে সাহিত্যের বিকৃতি উত্তেজনা পাচ্চে। যে সব লেখা উৎকট ভঙ্গীর দ্বারা নিজের সৃষ্টিছাড়া বিশেষত্বে ধাক্কা মেরে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সমালোচনার খোঁচা তাদের সেই ধাক্কা মারাকেই সাহায্য করে। সম্ভবত ক্ষণজীবীর আয়ু এতে বেড়েই যায়। তাও যদি না হয়, তবু সম্ভবত এতে বিশেষ কিছু ফল হয় না। আইনে প্রাণদণ্ডেরও বিধান আছে, প্রাণহত্যাও থামচে না।

ব্যঙ্গরসকে চিরসাহিত্যের কোঠায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আর্টের দাবী আছে। 'শনিবারের চিঠি'র অনেক লেখকের কলম সাহিত্যের কলম, অসাধারণ তীক্ষ্ণ, সাহিত্যের অস্ত্রশালায় তার স্থান,—নব-নব হাস্যরূপের সৃষ্টিতে তার নৈপুণ্য প্রকাশ পাবে, ব্যক্তিবিশেষের মুখ বন্ধ করা তার কাজ নয়। সে কাজ করবারও লোক আছে, তাদের কাগজী লেখক বলা যেতে পারে, তারা প্যারাগ্রাফ-বিহারী। ইতি ২৩ পৌষ, ১৩৩৪।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আর একটা কথা যোগ ক'রে দিই। যে সব লেখক বে-আব্রু লেখা লিখেচে, তাদের কারো কারো রচনাশক্তি আছে। যেখানে তাদের গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানে সেটা স্বীকার করা ভালো। যেটা

প্রশংসার যোগ্য তাকে প্রশংসা করলে তাতে নিন্দা করবার অনিন্দনীয় অধিকার পাওয়া যায়। (মাঘ ১৩৩৪)

'শনিবারের চিঠি' শতবার্ষিকী

(উনশতনবতিশততম বর্ষ পূর্ণ হওয়াতে 'শনিবারের চিঠি'র উদ্দেশে লিখিত)

ভাবতে মনে লাগছে চমৎকার—
নব-নবতি বছর পরে শতেক হবে পার।
আজিকে সেই কল্পনাতে রঙ ধরে মোর মন-খানাতে,
বাতাস বহে নৃত্য-চপল ছন্দ ঝনৎকার।
মনের সে রঙ ছড়িয়ে পড়ে সব 'মাসিকে'র পাতার 'পরে,
আকাশ-পথে 'হকার' কহে, আজকে শনিবার।
শহর গ্রামে পথের বাঁকে —'শনির চিঠি' উচ্চে হাঁকে
কেউ বা খুশি, খোঁচা খেয়ে কারো বা মন ভার!
ভাবতে মনে লাগছে চমৎকার!

তোমার হাসি ছড়িয়ে দিকে দিকে,
সবার মনের মেঘে সেদিন করছ লঘু ফিকে।
ব্যঙ্গ তোমার রোদের মত ঝলক হেনে যাবে, যত
আঁধার ঘরে আঁধারী জীব চাইবে অনিমিখে!
যেথায় যত ঝুটো মেকী কেই-বা ন্যাকা কেই-বা নেকী,
কোন্ যুগে কি ঘটল ফাঁকি তাই রাখিলে লিখে;
হঠাৎ-গুরু গজায় কিসে সোহং স্বামী হয় শ্রীবিশে
মেকী-খাঁটি ধরলে সঠিক ভুললে না চিক্‌চিকে।
তোমার হাসি ছড়ায় দিকে দিকে।

খোঁচা খেয়ে খিঁচিয়ে ওঠে কারা!
চকিত আলোর ঝল্‌কানিতে চামচিকেদের সাড়া।
নকল সিংহাসনের 'পরে বসত যারা গর্বভরে
চৌমাথাতে এনে তাদের করলে তুমি তাড়া।

পাঁজির পাতার বিজ্ঞাপনে সাহিত্য কয় যে নূতনে,
বারবনিতা যাদের ঘরের বধূ সালঙ্কারা,
তরুণ নামের অন্তরালে লুকায় যারা কালে কালে
পড়ল ধরা, কঠোর বাণে হঠাৎ দিশেহারা।
খোঁচা খেয়ে খিঁচিয়ে ওঠে তারা।

বলত যারা, নোংরা কর ফিরি—
সেদিন তারা সবাই এসে বসবে তোমায় ঘিরি।
জানি তাদের রাত্রি হবে, যোগ দেবে এই মহোৎসবে
কায়াবিহীন তখন সবাই ছায়া অশরীরী,
তাদের নাতি-নাতিনীরা কেউ প্রগল্‌ভ, কেউ সুধীরা,
উপল-পথে কেউ-বা চপল ঝরনা ঝিরিঝিরি।
যেথায় যত তরুণ আছে রঙিন হবে তোমার আঁচে
কালিকলম প্রগতি আর কল্লোল সুচ্ছিরি!
তোমার কথাই করবে তারা ফিরি।

মণি-মুক্তা তখন হবে খাঁটি—
বীণাপাণি উল্লাসেতে সাজবে পরিপাটি।
সেদিন নরেশ রাধাকমল বাস্ত মাঝেই রইবে অমল
পাখোয়াজে বোল ফোটাবে ধূর্জটিরই চাঁটি।
জানি সেদিন হসন্তিকা পরবে সত্য হাসির টীকা,
সওদা ছেড়ে ধূপছায়া তার ভুলবে খুঁটিনাটি!
সেদিন তোমার আড্ডা-ঘরে মিলবে এরা পরস্পরে
আসবে তারা আজকে যারা দুয়ার আছে আঁটি।
মণি-মুক্তা তখন হবে খাঁটি।

কত কথাই জাগছে আজি মনে,
প্রকাশ করতে ভাষা না পাই থাকুক সংগোপনে।
ভাবী দিনের প্রেমেন কি সে দৈনিকেতে কলম পিষে
মনের দুখে কাল কাটাবে আঁধার কক্ষ-কোণে?

শৈলজা কি ছুটবে কাশী, মুরলী কি ছাড়বে বাঁশী,
গজল-কবি ভজবে নবী ক্রমিক বিবর্তনে!
অচিন্ত্যেরই চিন্তা-জ্বরে আগুন দেবে বুদ্ধ ঘরে—
ডুব দেবে কি শরৎচন্দ্র শ্রীরূপনারায়ণে?
কত কথাই জাগছে আজি মনে!

সেদিন যেন তোমার বক্ষে কোলে
অতীতকালের হাসি মোদের মুক্তা হয়ে দোলে !
আমরা তখন থাকব কোথায় হয়ত হেথায় হয়ত হোথায়
নূতন ন্যায়ের পাঠ নেব কোন্ নৈয়ায়িকের টোলে।
সেদিন মোদের মনের প্রীতি জাগাবে কোন্ কল-গীতি
তুমি যেদিন রাজার মত উঠবে চতুর্দোলে।
মোদের চিত্তস্রোতের ধারা তোমার চিত্তে হবে হারা—
রক্তে মোদের ফসল তব, কে দেবে তাই ব'লে?
থাকব তবু তোমার বক্ষে কোলে।

মরুর পথে আজকে অভিযান,
পূর্ণিমাতে অমানিশির মিলবে কি সন্ধান?
আজকে যারা আঁধার পথে ক্ষীণ আলোকে কোনোমতে
অনেক আশায় বুক বাঁধিয়া চলছে গেয়ে গান।
সেদিন শনিমণ্ডলীরা পাহাড়-ভাঙা পথের পীড়া
বুঝবে কি হায়, গলায় প'রে বিজয়-মাল্যখান?
তুমি শুধুই জানবে সখি কোন্ শোলা আর চকমকি
আজকে নিবিড় অন্ধকারে করল দীপ্তিদান!
মরুর পথে আজকে অভিযান।

কল্পনাতে আজকে দেখি খালি—
অরুণ রবির কিরণ এসে বিদায় দিল কালি।
দেখছি মনে দূরের ছবি মলিন হয়ে এল রবি,
একটি ঘরে বসল কারা ঘৃতের প্রদীপ জ্বালি'—

হাসি গল্প গানের সাথে কালির আঁচড় খাতার পাতে—
কেউ কহে, "বাঃ বেড়ে হ'ল" "নিছক গালাগালি"—
আবার চলে কাটাকুটি কাজের মাঝে মনের ছুটি,
ফুল কুড়িয়ে গাঁথছে মালা ভাবি দিনের মালী—
কল্পনাতে আজকে দেখি খালি।

তারা কি আর চাইবে পিছন ফিরে—
নবতি-নব বছর পারের টুকরা কালের তীরে!
যেথায় মোরা কজন মিলে ঝাঁপ দিয়েছি হিম-সলিলে
ঢেউ খেয়েছি ডুব দিয়েছি ঘট ভরেছি নীরে!
তারা কি আর করবে মনে জন্মদিনের শুভক্ষণে,
দেখবে চেয়ে এড়িয়ে-আসা আঁধার চিরে চিরে!
সেদিনে হায় কোন্ ষোড়শী বাতায়নে রইবে বসি',
মোদের ছন্দ বাজবে কি তার চরণ-মঞ্জীরে!
তারা কি আর চাইবে পিছন ফিরে!

কালের স্রোতে হারাই মোরা যদি—
ক্ষতি কি তায়, পৃথ্বী বিপুল কাল সে নিরবধি!
মোরা জানি নূতন এসে নেবে তোমায় ভালবেসে
সাগরপানে বিপুল বেগে বইবে তব নদী!
মোদের শ্মশান-ভস্ম 'পরে জানি সুদূর যুগান্তরে—
রইল পাতা ভাবী কবির অচল পাকা গদি।
আজ জেনেছি ছুটবে তুমি প্লাবন করি নূতন ভূমি
নারবে বাধাবন্ধ কোনো রাখতে তোমায় রোধি'।
কালের স্রোতে হারাই মোরা যদি!

ভাবতে মনে লাগছে চমৎকার—
নব-নবতি বছর পরে শতেক হবে পার।
রঙ্গে তোমার, তোমার লেখায়, তোমার ছন্দে, তোমার রেখায়,
দেখছি মনে কালের চাকা ঘুরছে অনিবার।

শুনছি কানে দূরের বাঁশী মৃত্যুপারের কলহাসি,
দম্ভভরা চরণ-শব্দ বিজয়-মত্ততার—
অসীম সে কাল পড়ল ধরা মোর আঙিনায় কলস্বরা
তটিনী সে, নয় মহাকাল বিপুল ক্ষুরধার!
ভাবতে মনে লাগছে চমৎকার!

—শ্রীসজনীকান্ত দাস (ভাদ্র ১৩৩৫)

হিজলী-দর্শন

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৩১) রাত্রিকালে মেদিনীপুর জেলার হিজলীক্ষেত্রে তত্রত্য বন্দীফৌজের সহিত আমাদের ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের যে ভীষণ যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহাতে আমাদের গবর্নমেণ্টই জয়লাভ করিয়াছেন। বিপক্ষ পক্ষে ২ জন হত ও ২০ জন আহত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের গবর্নমেণ্ট পক্ষে কোন ক্ষতি হয় নাই, কেবল যুদ্ধের পূর্বে ভারপ্রাপ্ত সহকারী সেনাপতি কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বিপক্ষ বন্দীফৌজের সকলেই armed, অর্থাৎ হস্তযুক্ত ছিল। তদুপরি তাহাদের মধ্যে অনেকে মশারী টাঙাইবার ভীষণ কাষ্ঠশলাকা, ইষ্টকখণ্ড, সোডার বোতল ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া আসিয়াছিল। তাহাদের আক্রমণ-কৌশলও অতি-চাতুর্যের সহিত আরব্ধ হইয়াছিল, কারণ তাহারা প্রথমে কোথায় আক্রমণ করিতে যাইতেছিল তাহা আজ পর্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। গবর্নমেণ্ট-সৈন্যবাহিনীর হস্তে বন্দুক ও সঙ্গীন ছাড়া কিছুই ছিল না! তথাপি বিপক্ষদল যে অল্প সময়ের মধ্যে পরাভূত হইয়াছিল ইহাতে আমাদের গবর্নমেণ্ট-বাহিনীর অদ্ভুত বীরত্ব ও রণ-চাতুর্যের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় হইতে বড়লাটের প্রধান মন্ত্রী পর্যন্ত সকলেই তাহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বিপক্ষ দল যে মশারী টাঙাইবার সাজ-সরঞ্জাম লইয়া আক্রমণ করিয়াছিল ইহাতে অনুমিত হয়, তাহারা প্রথমে ব্রিটিশ-সিংহের শক্তির পরিমাণ স্থির করিতে না পারিয়া মশকদূরকরণোপযোগী ব্যবস্থা সঙ্গে

আনিয়াছিল। এ পক্ষের গুলিবর্ষণে তাহাদের সে ভুল স্বল্পক্ষণের মধ্যেই ভাঙিয়া গিয়াছিল। গুলিবর্ষণের পূর্বে বিপক্ষ পক্ষ সুতীক্ষ্ণ গালিবর্ষণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে গবর্নমেণ্ট-ফৌজের কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই।

জয়লাভের পর আমাদের গবর্নমেণ্ট বন্দীদের প্রতি যথারীতি সদয় ব্যবহারই করিতেছেন। প্রভাত হইবার পরেই আহতদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছে; এমন কি, একজনকে ছাড়া আর কাহাকেও disarm বা নিরস্ত্র করা হয় নাই। তাহারা খাইতে চাহিলে খাদ্যদ্রব্য দিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তাহারা খাইতে চাহিতেছে না। তবে সেজন্য আশঙ্কার কোন কারণ নাই, কারণ উক্ত রাত্রিতে তাহারা যে পরিমাণ গুলি ভক্ষণ করিয়াছে তাহার নেশা কতদিনে কাটিবে কে জানে?

কতিপয় ছিদ্রান্বেষী স্বার্থপর রাজবিদ্বেষী ব্যক্তি রটনা করিতেছে যে, এ যুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে গবর্নমেণ্ট পরাজিত হইয়াছে! আমরা আমাদের বিশেষ সংবাদদাতার পত্রে জানিয়াছি যে, উহা সত্য নহে। আমাদের সংবাদদাতা স্বয়ং সত্যাশ্রয়ী সন্ন্যাসী। তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়াছেন যে, এ ব্যাপারে আমাদের ন্যায় রাজভক্ত প্রজার মহা আনন্দিত হইবারই কথা, আমরা যেন উক্ত ছিদ্রান্বেষীদের রটনা বিশ্বাস না করি।

সত্যাশ্রয়ী সন্ন্যাসী বলেন যে, হিঞ্জলীর যুদ্ধ একটা সাধারণ যুদ্ধই নহে। ইহা ভগবদ্গীতোক্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ন্যায় একটা দার্শনিক ব্যাপার। হিঞ্জলী-দর্শনের মূল সূত্রগুলি তিনি আমাদের পাঠাইয়াছেন, তাহার ভাষ্য তিনি পরে প্রচার করিবেন। সত্যাশ্রয়ী বলেন ঃ—

রাজা কহিলেন—হে অমাত্য! অমাত্য কহিলেন—হে সামন্ত! সামন্ত কহিলেন—হে নগরপাল! নগরপাল কহিলেন—হে কনিষ্ঠবল! অর্থাৎ রাজা কহিলেন, হে কনিষ্ঠবল! হিঞ্জলীক্ষেত্রে পরস্পর যুদ্ধার্থ সমবেত হইয়া মৎপক্ষীয় ও বিপক্ষপক্ষীয় চমূগণ কি ভাবে কার্য করিয়াছিলেন তাহা তুমি বর্ণনা কর।

কনিষ্ঠবল কহিলেন, হে নগরপাল! নগরপাল কহিলেন, হে সামন্ত!

সামন্ত কহিলেন, হে অমাত্য! অমাত্য কহিলেন, হে রাজন্! অর্থাৎ কনিষ্ঠবল কহিলেন, হে রাজন্! আমি যাহা দেখিয়াছি ও যাহা দেখি নাই, তাহা সমস্তই বর্ণনা করিব। আপনার অবগতির জন্য সত্য বলিব, প্রিয় বলিব—কদাচ অপ্রিয় সত্য বলিব না, কারণ তাহা শাস্ত্রের নিষেধ।

হে রাজন্, কনিষ্ঠবল হইতে মন্ত্রী পর্যন্ত, মুদী হইতে জমিদার পর্যন্ত, সর্ববিধ দেশীয় জনগণের আপনিই ভগবৎনির্দিষ্ট ভাগ্যবিধাতা! আপনার সুশাসনে বিশৃঙ্খল দেশীয় প্রজাগণ যখন ক্রমে ক্রমে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পড়িতে লাগিল, তখন হইতেই তাহাদের মধ্যে অসন্তোষ প্রধূমিত হইতে লাগিল। ইহা আপনি অবগত আছেন।

প্রজাপুঞ্জের অসন্তোষ প্রশমিত করিবার জন্য আপনি এক হস্তে আইন ও অপর হস্তে শৃঙ্খলা লইয়া যখন নির্বিচারে সব্যসাচীর ন্যায় শাসনকার্য আরম্ভ করিলেন তখন দেবরাজ ইন্দ্রও আপনার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন, ঋষিগণের ইহাই অভিমত।

রাজার কর্তব্য শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন, ইহা আপনি সম্যক অবগত ছিলেন, এবং এ বিষয়ে আপনার ত্রুটিও কোনদিন পরিলক্ষিত হয় নাই। কালপ্রভাবে অথবা আইন-শৃঙ্খলার গুণে দেশের জনসাধারণ যখন ক্রমে ক্রমে দুষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল তখন হইতে আপনি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, ইহাও ঋষিমুখে শ্রুত হইয়াছি। যে দুষ্টবুদ্ধি জনগণ শৃঙ্খলাকে শৃঙ্খল মনে করে, আইনকে বে-আইন বলে, তাহাদিগকে দুষ্ট বলা ছাড়া গত্যন্তর কি? যে রাজা তাহাদিগকে দমন না করেন তাঁহার রাজধর্মই বা কোথায় থাকে?

শাস্ত্রকর্তা আদিপিতামহ ব্রহ্মার নির্দেশমতই আপনি দুষ্টের দমন করিতে যতই বদ্ধপরিকর হইলেন ততই দুষ্টের দল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহার উপর বা আপনার কি হাত ছিল?

এমনই করিয়া কালপ্রভাবে যখন দেশীয় প্রজাসাধারণ অধিকাংশ দুষ্ট পর্যায়ে পড়িল, এমন কি খদিরখাদকবৃন্দকেও যখন সন্দেহ করিবার কারণ ঘটিতে লাগিল তখনই আপনার মনে শিষ্টপালনরূপ রাজধর্মের ব্যতিক্রম ঘটিবার আশঙ্কা সঞ্জাত হইল। সেই সময় হইতে আপনি দেখিতে

লাগিলেন ক্রমবর্ধমান দুষ্ট দলের দমনসঙ্গী কনিষ্ঠবল ভিন্ন প্রকৃত শিষ্ট আর কোথায়? বাধ্য হইয়া রাজধর্মের নির্দেশানুসারে আপনাকে কনিষ্ঠবল-পালন বা শিষ্টপালন করিতে হইতেছে।

হে মহাভাগ, হিঞ্জলী-ক্ষেত্রে যে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে তাহা ঐ শিষ্টের সহিত দুষ্টের যুদ্ধ। কার্যক্ষেত্রে যাহাই ঘটিয়া থাকুক, এ কথা আপনি কিরূপে বিস্মৃত হইবেন যে, আপনারই রাজধর্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মানদণ্ডে যাহারা দুষ্টের প্রতিনিধি বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল, হিঞ্জলীতে তাহাদেরই বসবাস! আর আপনারই রাজধর্মের প্রয়োজনে দুষ্টদমনকারী কনিষ্ঠবলরূপী অবশিষ্ট শিষ্টের দল তাহাদিগকে আর একদফা দমন করিয়াছে ইহাতেই বা:বিস্মিত হইবার কি আছে? হিঞ্জলীর বন্দীগণ যে চিরদুষ্ট ইহার স্বতঃসিদ্ধতা ত প্রমাণেরও অপেক্ষা রাখে না। উপস্থিত ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া আপনি যদি জানিতে পারেন যে কনিষ্ঠবলও দুষ্ট, তবে, হে রাজন্, আপনি চতুর্দিকে দুষ্টবেষ্টিত হইয়া আপনার শিষ্ট-পালনরূপ রাজধর্মের প্রয়োগ করিবেন কোথায়? রাজধর্মের অপালনে যে প্রত্যবায় ঘটিবে তাহা হইতেই বা আপনি কিসে মুক্তি লাভ করিবেন? কাঁটাতারবেষ্টিত এ বন্দীশালে আছে কেবল বন্দী ও প্রহরী। দুষ্ট বলিয়াই বন্দীরা বন্দী, আর শিষ্ট বলিয়াই প্রহরীরা প্রহরী। প্রহরীগণকেও আপনি যদি দুষ্ট প্রমাণিত করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন তবে এই বন্দীশালে যে আপনি নির্বান্ধব হইবেন। অতএব রাজ্যের উদার প্রয়োজনবশে ধরিয়া লউন, হিঞ্জলী-ক্ষেত্রে দুষ্টেরাই দুষ্টামি করিয়াছিল তাই শিষ্টেরা তাহাদের যথাবিহিত দমন করিয়াছে।

রাজা কহিলেন, হে অমাত্য! অমাত্য কহিলেন, হে সামন্ত! সামন্ত কহিলেন, হে নগরপাল! নগরপাল কহিলেন, হে কনিষ্ঠবল! অর্থাৎ রাজা কহিলেন, হে কনিষ্ঠবল, রাজধর্মের পরম পারদর্শী তুমিই আমার চরম বন্ধু, অতএব তুমি শিষ্ট। আমি তোমায় শেষ পর্যন্ত পালন করিব: দুষ্টের দমনে তুমি আমার চিরসহায় থাকিও, দেখিও, পরমপবিত্র রাজধর্ম পালন হইতে আমি যেন ভ্রষ্ট না হই!

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
(আশ্বিন ১৩৩৮)

বুড়ু মায়ের প্রতি

আমি বড় ভালোবাসি, বুড়ু মায়ের মৃদু হাসি,
"মায়ী" ব'লে ডাকলে তারে দেয় সে চুমা মোরে।
ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বুকের 'পরে, বুড়ো ছেলের দাড়ি ধরে,
হাত ঘুরায়ে, চুল উড়ায়ে কেমন আদর করে।
সে যেন যূঁইফুলের রাশি, আর-জনমে ছিল মাসী,
এই জনমে মা হয়ে গো ঘরটি আলো করে।
ঠোঁটের রাঙা লজঞ্জুসে মধু-টুকুন লই গো চুষে,
তারি লাগি হৃদয়-গলা আশিস্-ধারা ঝরে।

ভালে তাহার টিপ পরালে, দেখায় সে তার মা'র কপালে
আঙুল দিয়ে,—এ কী বুদ্ধি বয়স দু বছরে!
মানুষ হাসে পুণ্যফলে, হাসে সে "বিজয়া"র কোলে,
মুখে গো তার সোনার ঝিনুক ভরা দুধের সরে।
ইচ্ছা যাঁহার জাগলে পরে, কাঠের বিড়াল ইঁদুর ধরে,
ভালো হ'লেই বাসেন ভালো দেখেন বিচার ক'রে।
পেরেছি মা চিনতে তোমায়, এই পরিচয় তাঁর করুণায়,
আছেন তিনি সবার প্রাণে, আছেন চরাচরে।*

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

ডানা

(পূর্বানুবৃত্তি)

অনেক রাত্রে বাইকের ঘণ্টার ঝঞ্ঝনায় ঘুম ভেঙে গেল ডানার। বিছানায় উঠে বসল। কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে ব'সেই রইল। নিদ্রা আর জাগরণের মাঝামাঝি যে অবস্থাটা মানুষকে অসহায় ক'রে ফেলে, কয়েক মুহূর্ত সেই অবস্থায় অসহায় হয়ে ব'সে রইল ডানা। বাইকের ঘণ্টার শব্দটা থেমে গেল হঠাৎ। ঝিল্লীধ্বনিতে রূপান্তরিত হ'ল যেন। তার পর পদশব্দ পাওয়া গেল বারান্দায়।

---

* আমার প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান্ প্রসাদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (ডিস্ট্রিক্ট অ্যাণ্ড সেস্‌ন্‌স্ জজ, হুগলী) পৌত্রী ব্রততী দেবীর প্রতি আশীর্বাণী।

ডানা, ডানা—

রূপচাঁদবাবুর গলা !

কাপড়-চোপড় সামলে উঠে দাঁড়াল ডানা। পিছনের ঘরে চাকরটা থাকে, তাকে উঠিয়ে দিলে।

দেখ্ তো, বাইরে কে ডাকছে !

চাকরকে দেখে রূপচাঁদ হতাশ হলেন একটু, কিন্তু সপ্রতিভ ভাবে বললেন, মাইজি কোথা ? তাঁকে ডাক্, জরুরী দরকার আছে !

ডানা বেরিয়ে এল।

আনন্দবাবুর খবর পেলেন কিছু ?

পেয়েছি। তাকে অ্যারেস্ট করেছে, 'বেল' দেয় নি।

কোথায় তিনি এখন ?

জেলে।

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডানা। রূপচাঁদ নির্নিমেষে চেয়ে ছিলেন তার দিকে, সেই দৃষ্টিটা যেন ধাক্কা মেরে সম্বিত ফিরিয়ে দিলে তার।

কি উপায় করা যায় তা হ'লে এখন ?

সেইটে ঠিক করবার জন্যেই তো এলাম এত রাত্রে। কাল আমার আপিসের নানান ঝামেলা, সময় পাব না। চল, বসা যাক কোথাও। চা খাওয়াতে পারবে কি একটু ? ওরে, জগন্নাথের দোকান চিনিস ? তাকে উঠিয়ে আমার জন্যে এক প্যাকেট কাঁইচি নিয়ে আয় তো। আমার নাম করলেই দেবে।

পকেট থেকে পয়সা বার ক'রে চাকরটাকে দিলেন তিনি। চাকরটা চ'লে যাচ্ছিল। ডানা তাকে থামিয়ে বললে, শোন্। আমাদের নায়েব মশাইকেও ডেকে নিয়ে আয়। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি।

ঘরের কোণে যে কমানো লণ্ঠনটা ছিল সেটা উসকে দিয়ে টেবিলের উপর রাখলে সে, তার পর চিঠির প্যাডটা টেনে লিখলে—

হরসুন্দরবাবু,

এইমাত্র রূপচাঁদবাবু খবর এনেছেন যে আনন্দমোহনবাবুকে নাকি

পুলিসে ধরেছে। রূপচাঁদবাবু এখানে ব'সে আছেন। আপনি অবিলম্বে চ'লে আসুন। ইতি

ডানা

চাকর চিঠি নিয়ে চ'লে গেল।

রূপচাঁদ বললেন, অত ব্যস্ত হ'য়ো না। হরসুন্দরকে বৃথা ডেকে পাঠালে। হাত কচলানো ছাড়া আর কি করবে ও?

ডানা কোনও উত্তর না দিয়ে পাশের ঘরে চ'লে গেল। সেখানে চায়ের টেবিলে দাঁড়িয়ে সে স্টোভটা জ্বালতে লাগল। স্পিরিটের স্বচ্ছ নীল শিখাটার দিকে চেয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে, হঠাৎ চমকে দেখলে রূপচাঁদ তার কাঁধের উপর হাত রেখেছেন। কখন যে নিঃশব্দ-চরণে এসেছেন তিনি, তা ডানা বুঝতে পারে নি। তার সমস্ত মুখটা কঠিন হয়ে উঠল। খুব ধীরভাবেই কিন্তু হাতটা সে সরিয়ে দিলে, খুব সংযতকণ্ঠেই বললে, এ সব কি?—ব'লেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সোজা মাঠের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল।

রূপচাঁদও বেরিয়ে এসেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে। হঠাৎ তিনি অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ক'রে ফেললেন একটা। হাত জোড় ক'রে হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়লেন। অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন, আত্মসম্বরণ করতে পারি নি। মাপ কর আমাকে।

ছি, ছি, কি করছেন আপনি! উঠুন।

বল, আমাকে মাপ করেছ?

যার শাস্তি দেবার ক্ষমতা আছে সেই মাপ করতে পারে। আমার কাছে মাপ চেয়ে আমাকে ব্যঙ্গ করছেন কেন? আপনিই বরং মাপ করুন, আমি অসহায়—

রূপচাঁদ উঠে দাঁড়ালেন। কয়েক মুহূর্ত ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে রইলেন তার দিকে, তার পর বললেন, আমার কথাটা তোমাকে বোঝাতে পারছি না ঠিক। একটু যদি ভেবে দেখ, একটু যদি অনুকম্পাসহকারে ভেবে দেখ, তা হ'লেই বুঝতে পারবে, সবচেয়ে অসহায় আমি। বাঘ বা সিংহের কবলে প'ড়ে লোকে যেমন ছটফট করে আমিও তেমনই একটা হিংস্র

আবেগের কবলে প'ড়ে ছটফট করছি। তুমি ছাড়া আমাকে আর কেউ বাঁচাতে পারে না—

ডানার নারীত্ব হঠাৎ উদ্বুদ্ধ হ'ল এ কথা শুনে। নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হ'ল সে। সত্যিই তো, লোকটাকে সে মারতে কিংবা বাঁচাতে পারে, কনিষ্ঠ অঙ্গুলির নির্দেশে বাঁদরের মত নাচাতেও পারে। হঠাৎ একটা কথা মনে হ'ল তার। ঠিক এই ঘটনাটা যদি কোন আধুনিক বিদেশী ঔপন্যাসিকের কল্পনায় মূর্ত হ'ত কি করতেন তিনি! যা করতেন তা ডানার অবিদিত নেই, রূপচাঁদবাবুরও নেই সম্ভবত, তাই তিনি নাটকীয় ঢঙ ক'রে ব্যাপারটাকে সেই সম্ভাব্য পরিণতির দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছেন। অর্থাৎ উনি ধ'রে নিয়েছেন (এবং আধুনিক বাস্তববাদী কবিরা এবং বিজ্ঞানীরা ওঁর এই ধারণাটাকে সমর্থনও করেছেন) যে, নারীকে পুরুষের বাহুপাশে ধরা দিতে হবেই, ওইটেই তার সহজাত প্রবণতা এবং তার বিরুদ্ধাচরণ করলেই সমস্ত আর্ট, সমস্ত বিজ্ঞান, এক কথায় আধুনিক সমস্ত চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যাবে। সতীত্ব বা সংযমের, শ্লীলতার বা শালীনতার কোন মূল্য নেই, থাকা উচিতও নয় যেন! যে যত বেপরোয়াভাবে উলঙ্গ হতে পারবে সে তত আধুনিক, সে তত আর্টিস্টিক। নারী মানেই পুরুষের লালসা-বহ্নির ইন্ধন, অন্য রকম কিছু হ'লেই যেন সে বেমানান। তাকে নানা রঙে রঞ্জিত হতে হবে, নানা ঢঙে সজ্জিত হতে হবে—ওই একই উদ্দেশ্যে। বিদ্যুদ্বেগে কথাগুলো মনে হ'ল তার, নিমেষে সমস্ত মনটা বিষিয়ে উঠল। এক মুহূর্ত আগে যে উদ্বুদ্ধ নারীত্ব তাকে বরপ্রদা সম্রাজ্ঞীর সিংহাসনে বসিয়েছিল এই নূতন আলোকে সেই উদ্বুদ্ধ নারীত্ব কামাতুরা কুক্কুরীর রিরংসারই সমপর্যায়ভুক্ত ব'লে মনে হ'ল তার।

আপনি এ ছাড়া যদি অন্য প্রসঙ্গ আলোচনা করতে না পারেন, তা হ'লে আমাকে চ'লে যেতে হবে এখান থেকে।

অন্য প্রসঙ্গ আলোচনা করা কি সম্ভব এখন ?

চললুম তা হ'লে।

রূপচাঁদবাবুর বাইকটা পাশেই ঠেসানো ছিল। ডানা হঠাৎ সেইটেতে

চ'ড়েই বেরিয়ে গেল। বিস্মিত রূপচাঁদ তার প্রস্থানপথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। পর-মুহূর্তেই তাঁর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে গেল। তিনি ভাবতে লাগলেন—কোথায় গেল ও? কোথায় যাওয়া সম্ভব? মাথা হেঁট ক'রে ভাবলেন একটু। তার পর ধীরে ধীরে পদচারণ করতে লাগলেন। তার পর চেয়ারটায় গিয়ে বসলেন। সিগারেট ধরালেন একটা। ঘড়ি দেখলেন। ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। আবার উঠে পায়চারি করতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরে চেয়ারে এসে বসলেন আবার। পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে নাচাতে লাগলেন পায়ের পাতাটা। ঠিক করলেন, অপেক্ষাই করবেন। হঠাৎ মনে পড়ল, ডানা চা তৈরি করছিল। উঠে ঘরের ভিতর গেলেন। আবার স্টোভ জ্বেলে চা তৈরি করলেন। দু কাপ করলেন। এক কাপ নিজে খেলেন, আর এক কাপ ঢাকা দিয়ে রেখে দিলেন। ঘড়িটা দেখলেন আবার। আধ ঘণ্টা কেটে গেছে! এখনও ফিরল না? ভ্রূযুগল আবার কুঞ্চিত হ'ল। বাইরের চেয়ারে গিয়ে বসলেন আবার। আবার পায়ের পাতাটা নাচাতে লাগলেন। উঠে দাঁড়ালেন হঠাৎ। তার পর আবার পায়চারি শুরু করলেন। খানিকক্ষণ পরে ঘড়ি দেখলেন, আরও মিনিট কুড়ি কেটে গেছে। কোথায় গেল ডানা? মনে হ'ল, আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। হেঁটেই বেরিয়ে পড়লেন অন্ধকারে। বেশি দূর যেতে হ'ল না। দেখলেন, তাঁর বাইকটা একটা গাছে ঠেসানো রয়েছে। স্তম্ভিত হয়ে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইলেন সেটার দিকে খানিকক্ষণ। তার পর হরসুন্দরবাবুর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। দেখলেন, ডানাও তাঁর সঙ্গে কথা কইতে কইতে আসছে। রূপচাঁদের দিকে চেয়ে খুব সপ্রতিভভাবে হেসে ডানা বললে, খবরটা পেয়ে আমি নিজেই ছুটে গিয়েছিলাম হরসুন্দরবাবুর কাছে। ভাগ্যে গিয়েছিলাম! উনি বাড়ি ছিলেন না। চাকরটা এই খবর নিয়ে ফিরে আসছিল। আমি বাড়ির ভিতর গিয়ে ওঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম যে, উনি সিংহি মশায়ের বাড়ি দাবা খেলতে গেছেন, সেখান থেকে ধ'রে নিয়ে এলাম ওঁকে। আমি ওঁকে এখনই বাড়ি চ'লে যেতে বলছি—

হরসুন্দরবাবু বিপন্নমুখে রূপচাঁদের দিকে চাইলেন। বললেন, এখন গিয়ে লাভ কি! কাল সকালের ট্রেনেই যাব না হয়। এখন গিয়ে কারো সঙ্গে দেখা হবে কি ?

ডানা উত্তেজিত হয়েছিল। বললে, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে নিশ্চয় দেখা হবে। চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি—কটায় ট্রেন ?

হরসুন্দর আরও বিপন্ন বোধ করতে লাগলেন।

কটায় ট্রেন বলুন না ?

রূপচাঁদ এতক্ষণ স্মিতমুখে চুপ ক'রে চেয়ে ছিলেন।

বললেন,. আজকাল ম্যাজিষ্ট্রেট একজন বাঙালী ভদ্রলোক। তুমি যদি যাও সঙ্গে সঙ্গে 'বেল' দিয়ে দেবেন। তবে ট্রেনে গিয়ে সুবিধে হবে না, যদি বল রামেশ্বরবাবুর মোটরটা যোগাড় করি। অনুরোধ করলে এখনই পাঠিয়ে দেবেন। হরসুন্দরবাবুকে আর কষ্ট দেওয়া কেন, আমিই চল না হয় যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। তবে ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই, আজ তো আর তাকে ছাড়বে না।

ডানা বললে, বেশ কাল সকালেই যাব তা হ'লে। হরসুন্দরবাবুর সঙ্গেই যাব। আপনার তো আফিস আছে—

রূপচাঁদ বললেন, তা আছে। তবে দরকার হ'লে ছুটিও নেওয়া যায়। কাল দিনের ট্রেনে যদি যাও, আমার অবশ্য যাওয়ার দরকারই হবে না। আমি বরং এস. পি.কে. বলব একবার।

তা হ'লে তাই ঠিক রইল। চলুন হরসুন্দরবাবু, আপনার গিন্নী আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন ফুলুরি ভাজা খাওয়ার জন্যে। রাতের খাওয়াটা আপনার ওখানেই সারব আজ—

চলুন চলুন। বেশ তো, খুব আনন্দের কথা।

হরসুন্দরের মুখের বিপন্ন ভাবটা কেটে গিয়ে প্রফুল্ল ভাব ফুটে উঠল। ডানাকে সঙ্গে নিয়ে রূপচাঁদকে নমস্কার ক'রে তিনি চ'লে গেলেন। রূপচাঁদ তাদের প্রস্থানপথের দিকে চেয়ে নির্নিমেষে দাঁড়িয়ে রইলেন।

(ক্রমশ)

"বনফুল"

আমার সাহিত্য-জীবন

তিন

আরও একটা ইনজেকশনে স্ত্রী মোটামুটি সেরে গেলেন। সক্ষম হলেন না। তবে অক্ষম পঙ্গু রইলেন না। সে ভয়টাও গেল। আমিও আবার ঘাড় গুঁজে লেখা শুরু করলাম।

'কবি' শেষ করলাম।

'কবি' সম্পর্কে অনেক জনে অনেক কৌতূহল প্রকাশ ক'রে থাকেন। 'কবি'র চরিত্রগুলি সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন। 'কবি'র নায়ক নিতাইয়ের কথা খানিকটা বলেছি। সতীশ ডোম। সতীশের বংশ-পরিচয় যা দিয়েছি তাতে এতটুকু অতিরঞ্জন নেই। তাদের নিয়েও অনেক গল্প লিখেছি আমি। সতীশ কবিযশঃপ্রার্থী ছিল—এই আকাঙ্ক্ষাতেই সে ওই পরিবার ও গোষ্ঠীগত চৌর্যবৃত্তির প্রভাব থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য স্টেশনে এসে রাজা পয়েন্টস্‌ম্যানের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। পাঁচ-সাত মাইলের মধ্যে যেখানে কবিগান হোক, মাথায় চাদর জড়িয়ে জামা একটা গায়ে দিয়ে সতীশ যেতই এবং আসরে কবিয়ালের দোহারদের পাশে ব'সে স্বরে স্বর মিলিয়ে দোয়ারকি করত। মধ্যে মধ্যে ফোড়ন দিত। আমাদের দেশে কবিয়ালরা সাধারণত ঢুলী সঙ্গে নিয়েই আসে, দোয়ার জুটে যায় স্থানীয় সতীশদের মধ্য থেকে। না জুটলে ঝুমুর দলের মেয়েরা ওই কাজ ক'রে থাকে। কবিগান সাধারণত মেলাতেই হয় এবং মেলায় কবিগান ও ঝুমুর -এ দুটি আহার্যের ব্যবস্থায় ভাত এবং ডালের মত অপরিহার্য বা অবশ্যকরণীয় ব্যবস্থা। আমার গ্রামে বা গ্রামের কাছাকাছি যে সব মেলা হয়, সে সব মেলায় আমি সতীশকে এই ভাবে দোয়ারকি করতে এবং ফাঁক পেলে সেই ফাঁকে নাক গলিয়ে মুখ বাড়িয়ে কানে হাত দিয়ে ঈষৎ সামনে ঝুঁকে দু-চার কলি গাইতেও দেখেছি। প্রতিপক্ষ ঝুমুর দলের মেয়েদের ব্যঙ্গ করতেও শুনেছি। আবার প্রান্তরের মেলা থেকে ফেরার সময় ভোরবেলায় স্টেশনের পথে তাকে মাথায় চাদর বেঁধে উচ্চকণ্ঠে গান গেয়ে ফিরতে দেখেছি। সতীশ

জানত যে, আমিও একজন কবিযশঃপ্রার্থী তাই আমার সঙ্গে প্রীতি ছিল একটু গাঢ়, আমাকে দেখেই হেঁট হয়ে প্রণাম জানিয়ে বলত, প্রণাম প্রভু।

ইচ্ছে যে, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি—"কোথা হতে আগমন, কহ কিবা বিবরণ, রসভাণ্ড উপচায় কেন ?"

আমি নিজেই জিজ্ঞাসা করতাম। না করলে সতীশ নিজেই বলত, কই, কিছু শুধালেন না যে ?

কি শুধাব ?

কোথা থেকে আসছি ? কি ব্যাপার ? এত খুশি ক্যানে ?

সে তো বুঝতে পারছি। মেলায় গিয়েছিলে। খুব কবিগান করেছ।

এই! "রসিকের কথা রসিকে জানে বংশী বাজে বৃন্দাবনে।" খুব গাওনা—বুঝলেন প্রভু, নিদারুণ বেপার। দু দিকে দুই পেলয় কবিয়াল। সে একেবারে কর্ণ-অর্জুনে বাণ-কাটাকাটি। তার মধ্যে আমি, বুঝলেন কিনা, খাণ্ডব অরুণ্যের দাহনকালে-বাঁচা নাগের মত কর্ণের বাণের মুখে ব'সে অর্জুনের মুকুট কেটে দিয়েছি। ছিষ্টিধরের মুকুট ধুলোয় প'ড়ে গিয়েছে।

তার পরই সে আরম্ভ করত বিবরণ, "নিদারুণ যুদ্ধ কাণ্ড, সুতরাং সে প্রকাণ্ড—আদি আছে, অন্ত নাই যেন।"

শেষ কোনদিনই হ'ত না। আমরা এসে পৌছে যেতাম স্টেশনে—চায়ের স্টলে। চায়ের স্টলওয়ালার নাম একটা আছে, কিন্তু সে আজও পর্যন্ত আমাদের ওখানে বেনে-মামা বা বণিক-মাতুল নামেই পরিচিত। স্টলে ব'সে থাকত—আমার বাল্যবন্ধু বাতে প্রায় পঙ্গু দ্বিজপদ। 'কবি' বইয়ে সেই বিপ্রপদ। দ্বিজপদর বাল্যবয়সের বিবরণ আমার 'আমার কালের কথা'র মধ্যে আছে। তার শেষজীবনের নিখুঁত বিবরণই দিয়েছি 'কবি' বইয়ের মধ্যে। আমার জীবনে আমি প্রথম কবিতা "আগমনী" লিখে ছাপিয়েছিলাম শারদীয়া-পূজা উপলক্ষ্যে ; তখন আমার বয়স আট, দ্বিজপদ কয়েক মাসের ছোট আমার থেকে। সেই সময়েই

কারুর শিক্ষায় হোক বা নিজের উদ্ভাবনী শক্তিগুণেই হোক কবিকে 'কপি' ব'লে সম্বোধন ক'রে কয়েকটা কপিপাতা কাঁচাই কচকচ ক'রে চিবিয়ে খেয়ে বলেছিল, খেয়ে নিলাম। পরিণত বয়সের দ্বিজপদ এই রসিকতাটি ভুলতে পারে নি বা দ্বিতীয় রসিকতা আবিষ্কার করতে পারে নি—এই হেতু সতীশকেও সে বলত, কপিবর।

মধ্যে মধ্যে ঘুঁটে ছেঁদা ক'রে একফালি দড়ি পরিয়ে সতীশকে উপহার দিত—নে, মেডেল।

অথচ সে সতীশকে স্নেহ করত। কিন্তু এই রসিকতাটুকু এত মর্মান্তিক ছিল সতীশের পক্ষে যে, সে আদৌ সহ্য করতে পারত না। তাই চুপ ক'রে যেত।

এরই মধ্যে রাজা পয়েন্টস্‌ম্যান এসে দাঁড়াত। বলত, এই যে, ফিরেছ! কেমন গাওনা হ'ল?

রাজার নাম রাজা মিয়া, সে জাতিতে মুসলমান এবং হিন্দীও সে বলে না, যুদ্ধেও যায় নি, মেজাজেও মিলিটারি নয়—ওটুকু আমার চড়ানো পোষাক বা রঙ যাই হোক না কেন। ঠাকুরঝি রাজার শ্যালিকা নয়, সতীশের সঙ্গে তার প্রেম হয় নি। তবে ঠাকুরঝির অস্তিত্ব আছে। সে গ্রামান্তরের রুইদাস-বংশের মেয়ে,ছোটখাটো চিরকিশোরীর মত গঠন, চোখে ভীরু চঞ্চল হরিণীর দৃষ্টি, তাঁতে-বোনা খাটো কাপড়খানি আঁট-সাঁট ক'রে বেঁধে মাথায় দুধের ঘটি নিয়ে এ গ্রামে দুধের জোগান দিতে আসত। আসত ওই রেল-লাইন ধ'রে। সে বেনে-মামার দোকানে দুধের জোগান দিত। সতীশও তার কাছে এক পোয়া হিসেবে দুধ নিত। খুব দ্রুত চলত, খুব দ্রুত কথা বলত, সে সবের পিছনেই যেন একটি সরল-শঙ্কাত্রস্ততা ছিল। দুকথা চার কথার পরেই বলত, ঠাকুরঝি বকবে যি, অথবা ঠাকুরঝিকে না শুধিয়ে নারব। বা দাঁড়াও বাপু, ঠাকুরঝি আসুক। নয়তো ওই ঠাকুরঝি আসছে, লাও বাপু শিগগির দুধ লিয়ে লাও; ঠাকুরঝি বকবে।

ওই কারণেই মেয়েটির আসল নাম ঢাকা প'ড়ে গিয়ে নাম হয়ে

গিয়েছিল ঠাকুরঝি। বেণে-মামা বলত, ওই ঠাকুরঝি এসে গিয়েছে।

সতীশ বলত, ঠাকুরঝি!

কি বলছ?—মেয়েটি ওই নামে সাড়া দিতে কোন আপত্তি করত না।

আমাকে আজ এক পো দুধ বেশি দেবা?

তা লাও।

এমনি সে মেয়েটি। মধ্যে মধ্যে সতীশ তার সঙ্গে রহস্যালাপ করত, সে আমি শুনেছি অন্তরাল থেকে। আমি স্টেশনে গিয়েছি দুপুরবেলা, চা খাব বেনে-মামার দোকানে, কিন্তু দুধ নেই। ফুরিয়েছে। ঠাকুরঝি দুধ আনবে সেই অপেক্ষা। বেনে-মামা স্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে প্লাটফর্মের ওপর, সতীশ এগিয়ে গিয়ে শান্টিং পয়েণ্টে দাঁড়িয়ে আছে; দৃষ্টি রোদ-ঝকঝকে লাইনের ওপর, লাইনটা আধ মাইলটাক গিয়ে একেবারে পূব থেকে দক্ষিণ দিকে মোড় ফিরে বেঁকে গেছে; সেখানটায় যে দুটো লাইন মিলে গিয়েছে একটি বিন্দুতে, সেইখানে সকলের দৃষ্টি। হঠাৎ সেই বিন্দুর উপর থেকে রৌদ্রপ্রতিফলিত দুধের ঘটির ছটা সকলের চোখে পড়ত। ছটাবিন্দুটি চঞ্চল চলমান, তার নীচে দেখা যেত ক্ষারে-কাচা কাপড়ে আবৃত ক্ষীণ তনুমহিমা। মনে হ'ত, স্বর্ণশীর্ষবিন্দু কাশফুল একটি। ঠাকুরঝি ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠত। শান্টিং-পয়েণ্টের ধারেই একটি কৃষ্ণচূড়ার গাছও আছে, তার গোড়াটি বাঁধানো, চারিপাশে তার জয়ন্তী কস্তুরী ফুলের জঙ্গল, আমি সেইখানে ব'সে কি শুয়ে থাকতাম সেখান থেকেই শুনতে পেতাম, সতীশ তার সঙ্গে রসিকতা করছে।

বাবা রে বাবা, আসতে পারলে!

দ্রুত উচ্চারণে থরথর কথায় উত্তর দিত ঠাকুরঝি—ঠাকুরঝি ভিন গাঁ যেয়েছেন। এল্, তা-পরেতে এলাম কিনা!

আর আমাদের চোখ ক্ষ'য়ে গেল পথের পানে চেয়ে।

ঠাকুরঝি রসিকতার ধার দিয়েও যেত না, সরলভাবে সহজ বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বলত, চায়ের নেশা বেজায় নেশা, লয়? তারপরই বলত, বেনে-মামা বকবে, লয়?

এই ঠাকুরঝি।

এই চরিত্র কটিকে নিয়েই "কবি" গল্পের সৃষ্টি। 'প্রবাসী'তে যখন গল্প হিসেবে বের হয়, তখন ঝুমুর দলের নামগন্ধ ছিল না। শেষটায় ঠাকুরঝির অসুখের সংবাদ পেয়ে নিজের প্রতি তার আকর্ষণ অনুমান ক'রেই নিতাই চ'লে গেল—এই ছিল সমাপ্তি। পরে শেষ অংশ যোগ করার পরিকল্পনা মনের মধ্যে জেগেছিল। সে প্রায় মাস ছয়েক পরের কথা। পাটনা থেকে ৺মণি সমাদ্দার 'প্রভাতী' পত্রিকা বের করেন। মণিদের প্রভাতী সংঘের কথা সাহিত্য-জীবনের প্রথম পর্বে বলেছি। সেই সংঘের পরিণতিতে মণি সেই সময় 'প্রভাতী' পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। প্রথম বৎসরে 'প্রভাতী'তে "বনফুলে"র বিখ্যাত উপন্যাস 'রাত্রি' প্রকাশিত হয়। 'রাত্রি' শেষ হ'তে মণি আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন উপন্যাসের জন্যে। সে সময় 'ভারতবর্ষে' আমি 'গণদেবতা' উপন্যাস লিখছি। মণির অনুরোধে 'কবি' গল্পটির সঙ্গে শেষাংশ যোগ ক'রে উপন্যাসাকারে লেখা স্থির ক'রে লিখে যাই।

বাংলা দেশের, বিশেষ ক'রে রাঢ় অঞ্চলের মেলায় ঘুরে ঘুরে নিম্ন-স্তরের দেহপণ্যাদের নিদারুণ দুর্দশা আমি দেখেছি। এদের অধিকাংশই অবশ্য প্রেমের ছলনায় ভুলে গৃহত্যাগ ক'রে এই পাপপঙ্কিল চোরাবালিতে এসে প'ড়ে তিলে তিলে ডুবে ম'রে যায়। এরাও তখন উন্মত্ত। তাদের মন দেহ সব অসাড়। দুঃখবোধ লজ্জাবোধ এ সবই নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই পঙ্কিল জল আকণ্ঠ পান না করলে তখন আর এদের তৃষ্ণা নিবারণই হয় না। তবুও মানবাত্মার এই নিষ্ঠুর অপমান অসহ্য। হতভাগিনীদের উপায় নেই, পথ নেই। তারা স্বাধীন নয়, তারা বন্দীর চেয়েও পরাধীন, ক্রীতদাসীর মত অবস্থা। এদের দশজন পাঁচজন পনরজনের মাথায় আছে এক-একজন মাসী-শ্রেণীর মালিক। তারাই এদের নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, অভাবে অভিযোগে দেখে, পুলিসে ধরলে জামিন হয়, মারামারি হ'লে রক্ষা করবার চেষ্টা করে এবং উপার্জনের বোধ হয় বিশেষ একটা অংশ গ্রহণ করে। মাসীদের

কোন কথায় এদের 'না' বলবার উপায় নেই। মেলার পর মেলা ঘুরেছি, তথ্য সংগ্রহ করেছি। দেখেছি। ঝুমুর দলের মেয়েরা এ থেকে কিছু স্বতন্ত্র। ওই নিছক দেহপণ্যাদের অস্তিত্ব তো অনেক পরে জেনেছি। কিন্তু ঝুমুর দেখে আসছি বাল্যবয়স থেকে। আমাদের গ্রামে বা কাছাকাছি গ্রামে মেলায় এই সব দেহপণ্যাদের প্রবেশ করতে দেওয়া হ'ত না। কিন্তু ঝুমুর আসত। ঝুমুর না হ'লে মেলা হয় না। কবিও হয় না। সে ওই দোয়ারকির জন্যে। ঝুমুর দলের মেয়েরা কবিগানে দোয়ারকি করত এবং নাচত। আমাদের বাল্যবয়সে এই কারণে কবিগান শোনা নিষিদ্ধ ছিল, এবং সন্ধ্যের পর এক যাত্রা বা থিয়েটারের আসরে অভিভাবক ছাড়া থাকতে পেতাম না। এ ছাড়া শুনতে পেতাম নানান ধরনের গুজব, বিশেষ ক'রে যুবক সম্প্রদায় সম্পর্কে। প্রথম কথাটা আমার মনে আছে। আমার তখন বয়স ন-দশ বৎসর। আমাদের পাশের গ্রাম বাকুলগ্রামে শেষ নাগপঞ্চমীতে মনসার মেলা হয়। সেই মেলার সময় হঠাৎ গ্রামময়—স্বর্গীয় নির্মলশিববাবু এবং তাঁর কজন অন্তরঙ্গ সম্পর্কে চাপা নিন্দা র'টে গেল। নির্মলশিববাবু তখন নতুন ক্যামেরা কিনেছেন। সেই ক্যামেরা দিয়ে নাকি তিনি ঝুমুর দলের মেয়েদের ছবি তুলেছেন। লুকিয়ে দেখতে গেলাম ঝুমুর দল। মেলার প্রান্তে খ'ড়ে-ছাওয়া কুঁড়েতে তাদের বাসা। বাইরে গাছতলায় উনোন গ'ড়ে ভাত রান্না হচ্ছে। মেয়েরা সেজেগুজে ব'সে আছে। মুখে হাস্য, চোখে ইঙ্গিত, প্রতিটি অঙ্গসঞ্চালনে লাস্য বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

বড় হলাম। ঝুমুর নাচ দেখলাম। ভদ্র আসরে দেখলাম। তখন সে খেমটা নাচের অনুকরণ। ভদ্রজনেরা চ'লে গেলে—সে আসরে, এবং যেখানে ভদ্রজনেরা যান না—সে আসরেও দেখলাম, তখন সে কুৎসিত কদর্য তাণ্ডব। একজন একটা দো-আনি দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলে, একটা মেয়ে নাচতে নাচতে এসে দাঁত দিয়ে কামড়ে টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল।

হঠাৎ একদিন এদের দলের নেত্রীকে এবং একটি মেয়েকে আমি খুব

কাছ থেকে দেখলাম। এমন একটা অবস্থার মধ্যে তাদের জানলাম যে, তাদের আর বাইরের ছলনার আবরণটা ধ'রে রাখবার সামর্থ্য নেই।

আমাদের গ্রামে স্টেশনের ধারে কোন মেলা-ফেরত একদল ঝুমুর এসে নামল। বড় বটতলায় ঘর পাতলে। তাদেরই একটি মেয়ের হ'ল কলেরা। এই মেয়েটির নামই বসন। এককালে সুশ্রী ছিল, শীর্ণকায়া, দীর্ঘাঙ্গী, গৌরবর্ণ রঙ, বড় বড় উগ্রদৃষ্টি দুটি চোখ, মাথায় অপর্যাপ্ত চুল। দেহটা দেখে মনে হয়, কোন রক্তপায়ী সরীসৃপ নিঃশেষে ওর দেহের শুধু রক্তই নয়—সারাংশও টেনে নিয়েছে। আমি তখন কলেরায়-ম্যালেরিয়ায় সেবা ক'রে বেড়াই, আগুন লাগলে বালতি নিয়ে ছুটি, দুর্ভিক্ষে চাল-কাপড় সংগ্রহ ক'রে বিলিয়ে বেড়াই। কলেরার ওষুধ আমার কাছে আছে। ক্যালোমেল ⅛ গ্রেন আর সোডিবাইকার্ব পাউডার। কেওলিন আছে। রেক্টাল স্যালাইনের গ্লাস ও রবার টিউব রাখি। দিতেও পারি। কিছু প্রতিষেধকও রাখি। যাদের হয় নি, ইনজেকশন দি। কোথাও কারও কলেরা হ'লে খবর আগেই আসে আমার কাছে। কাজেই খবরটা এল। গেলাম। দলটির মুখ শুকিয়ে গেছে। সকলে স'রে দূরে ব'সে আছে, মেয়েটি ছটফট করছে—জল, জল আর জল শব্দ। কাছেই অদূরে ব'সে আছে মাসী। আর একটি পুরুষ, যে বসনের ভালবাসার জন। মদও রয়েছে দেখলাম।

যথাসাধ্য ক'রে এলাম।

এটা সকালবেলার কথা। ওই সময়েই বসনের অস্থিরতা দেখে মাসী বলেছিল, ভগবানকে ডাক্ বউ, ভগবানকে ডাক্।

সে বলেছিল, না।

এই সময়টুকুর মধ্যেই এ-কথা সে-কথার মধ্যে ওই কথাটিও শুনেছিলাম—বসন ম'লে তার ওয়ারিশ হবে ওই মাসী। বলেছিল, আমার নেকন দেখ না।

বিকেলবেলা ওদের দলের ওই বসনের ভালবাসার মানুষটি এসে খবর দিলে, একটুকুন ভাল আছে। একবার যদি আসেন।

এদিকে অর্থাৎ রোগী ভাল থাকার সংবাদ এলে উৎসাহ এবং আকর্ষণ দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। উৎসাহিত হয়েই গেলাম। তখন দেখলাম, ওরা একটু আশ্রয়স্থল পেয়েছে। স্টেশনের পাশেই সে সময় আমাদের শম্ভু-কাকার এক আশ্রম ছিল। শম্ভুকাকা কানে খাটো, সে আমলের তান্ত্রিক লোক, কারণ করেন, গাঁজা খান, পৃথিবীর কোন কিছুকে ভয় করেন না, যত ক্রোধ তত কোমলতা। তিনিই ওদের অবস্থা দেখে ডেকে ওই ঘরে ঠাঁই দিয়েছেন।—থাক্ এইখানে।

গিয়ে দেখলাম, মেয়েটি ঘুমুচ্ছে।

যেতেই মাসী তাকে ডাকলে, বসন!

আমি বারণ করবার আগেই সে ডেকেছিল, মেয়েটি ক্লান্ত চোখ মেলে চাইলে। প্রাণের আবেগে হাত বাড়িয়ে আমার পা খুঁজলে।

আমি বললাম, থাক্।

তার ঠোঁট দুটি কাঁপল, বললে, আপনি না থাকলে ম'রে যেতাম বাবু, এরা হয়তো জ্যান্তেই ফেলে পালাত, আমাকে শেয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে খেয়ে দিত।

কথাটা তার আদৌ মিথ্যা নয়। মুহূর্তে আমার মনে প'ড়ে গেল—পর পর কয়েকটা ছবি। একটি আছে 'ধাত্রী দেবতা'য়। কলেরায় সেবা করতে নেমেছি সেই প্রথম বার।

ফ্যালা ডোম কলেরায় মরেছে, তার স্ত্রীর কলেরা হয়েছে, বাড়ির বাকি লোকেরা পালিয়েছে। মেয়েটা 'জল' 'জল' ক'রে অস্থিরতার মধ্যে দাওয়ার উপর থেকে গড়িয়ে নীচে উঠানে প'ড়ে গেছে। বাড়ির পাঁচিলের ওপর শকুন ব'সে আছে তার দিকে চেয়ে।

আর একবার আমাদের পাড়ার মধ্যে এসে বাসা নিয়েছিল কোথাকার একটি রামায়ণের দল। তাদের একজনের কলেরা হ'ল। সন্ধ্যের পর গোপনে তাকে ফেলে পালাল দলকে দল। সকালে দেখা গেল, আক্রান্ত লোকটি ম'রে প'ড়ে আছে, তার বুকের খানিকটা শেয়ালে খেয়ে দিয়েছে। মৃত্যু তার কলেরায় হয় নি। হয়তো সে মরত।

কিন্তু তার পূর্বেই তাকে একা পেয়ে শেয়ালে জীয়ন্তেই ছিঁড়ে খেয়েছে। এমন ধারণা করবার কারণ আছে। সকালে গিয়ে যখন দেখলাম, তখন প্রথমেই চোখে পড়ল, লোকটার আতঙ্কিত মুখ এবং খোলা চোখ। আরও অনেক দেখেছি। সুতরাং এদের মধ্যে এমন ঘটবে তার আর আশ্চর্য কি?

মনে পড়ছে, ঠিক এমনি সময়েই ঘরের বাইরে মাসীর কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম, ওই—ওই, পালাইছ ক্যানে? ও নোকেরা, ও বাবারা! এস, এস। কলেরা লয়। সি ভাল আছে। ওগো! তারপরই শুনলাম, অ! বাবু রইছে!

অর্থাৎ আমাকে ব'সে থাকতে দেখে কারা পালিয়ে গেল। বুঝতে বিলম্ব হ'ল না, তারা কেন এসেছিল।

এদের এই জীবন। ক্রমে এদের জীবন সম্পর্কে আরও অনেক কথা জানলাম। জেনে বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। হে ভগবান, এমনও হয়!

পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্নের কাছে এদের মুল ইতিহাস জানলাম।

ঝুমুর দল অনেক স্থানেই আছে। কিন্তু বীরভূমের মল্লারপুরের ঝুমুর দল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এখানে এরা বংশানুক্রমিকভাবে বাস করছে। ঝুমুর দলের মেয়ে ঝুমুর দলে নাচে—তার মেয়ে, তার মেয়ে নেচে আসছে। গেয়ে আসছে। এরা পদাবলী জানে, খেউড় জানে, আবার আধুনিক খেমটা-টপ্পা জানে। মল্লারপুরে ঝুমুর দলের একটি গাড়াই আছে। আজকাল হয়তো লুপ্ত হয়ে গেল বা গেছে। পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন আবিষ্কার করেছেন, এককালে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরবর্তী কালে পূর্ববঙ্গে তখন বৈষ্ণবধর্ম ও কীর্তনের সমাদর বেশি, সেই কালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহু কীর্তনায়ার দল ছোটবড়-ভালমন্দনির্বিশেষে ওই অঞ্চলে যেত এবং যথেষ্ট উপার্জন ক'রে দেশে ফিরত। এই ছোটবড়দের মধ্যে ছোটরা শেষ প্রসার ও সমাদরের জন্য দলের মধ্যে গায়িকা গ্রহণ করে। ক্রমে গায়িকারাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। তার থেকে ক্রমে নাচ, তারপর আদিরসাশ্রিত গানের প্রচলন হয়। তারপর হিন্দু

মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনের জন্য ধর্ম বাদ দিয়ে নিছক নাচগানের দলের পরিণতিতে পৌঁছল। ফোঁটা তিলক মালা ফেলে কেশবিন্যাস হ'ল স্বৈরিণীর উপযোগী, গায়ে উঠল পিতলের গহনা— চুড়ি বালা বাওটা বাজুবন্ধ চিক হার, কানে কান, কপালে ঝাপটা। পায়ের নূপুর ঘুচে উঠল ঘুঙুর। তবুও আজও এরা গৌরচন্দ্রিকা অর্থাৎ মহাপ্রভুর বন্দনা না ক'রে গান শুরু করে না। এই সমস্ত কিছু জড়িয়ে আমার মনের মধ্যে এরা একটি অদ্ভুত আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। তাই নিতাইয়ের কবিয়ালির সঙ্গে বসনের কথা জুড়ে দিয়েছিলাম।

'কবি'র এই ইতিহাস। কবি'র গানগুলি কিন্তু সংগ্রহ নয়। ওগুলি সবই আমি রচনা করেছি। কি ভাবে করেছি বলতে পারি না। মোহিতলাল 'কবি' সম্পর্কে লিখতে গিয়ে গানগুলির কথাই আগে বলেছেন। বলেছেন, এই গানগুলিই কবির প্রাণশক্তি। আমি সে সময় নিতাইয়ের মতই ভাবতে পেরেছিলাম। "কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দো ক্যানে।"—এই লাইনের সঙ্গে অনেক লাইন বেঁধেছি।—"কালো চোখের তারায় তবে আলো এমন হাসে ক্যানে?" "কালাচাঁদের কোলের লাগি সোনার রাধা কাঁদে ক্যানে?" অনেক লাইন। কিন্তু কেটে দিয়েছি। ও নিতাইয়ের রচনা হয় নি।

সেবার 'ভারতবর্ষে' লিখেছিলাম—"চোর" গল্প।

"চোরে"র নায়ক শশী—সতীশের মামা। গল্পটিও 'কবি' গল্পের মতই বারো আনা সত্যের ভিত্তির উপর গ'ড়ে তোলা।

যাই হোক, এই ভাবেই সেবার পূজোর পালা শেষ হ'ল। বোধ করি শ দুয়েক টাকা সেবার পেলাম।

পশুপতিবাবুকে ধন্যবাদ। আমার স্ত্রী লাঠি ধ'রে হ'লেও হেঁটেই হাওড়া স্টেশনে ট্রেনে চড়লেন। বাড়ি থেকে পূজোর পর ফিরলাম। তখন আমার হাতে মাত্র পাঁচটি কি ছটি টাকা। এ কথা বলার কারণ আছে। সে কথা আসছে বারে বলব।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ধূমাবতী

১

প্রহরের পাহারায় নিযুক্ত সৈনিক-গ্রহ
জানি জানি পেয়েছিল মার্তণ্ড-সাক্ষাৎ
দৃষ্টি-স্তম্ভ সৃষ্টি-ছাড়া ছুটেছিল গগন ভেদিয়া
আলিঙ্গন-আকাঙ্ক্ষায়
তারপর উল্কা-পরিণতি।

২

ছোট ছোট সরিষার ক্ষেতে
আসে যায়
তৈল-পিপাসুরা।
কেবল মানুষ নয়
নানা-নামী কীটও।
জালাধীশ মাকড়শার দল,
মশা আর মৌমাছিরা।
রৌদ্রবার্তা পাঠান তপন,
রাত্রি আসে চুপি চুপি অন্ধকার-রূপে,
জ্যোৎস্নার ফাঁদ পাতে আকাশের চাঁদ,
কবির কল্পনা-জাল ঘিরেছে তাদের।
সকলেই তৈল চায়
ছোট ছোট সরিষার ক্ষেতে।

৩

কোন্ সে গঙ্গোত্রী হতে
জনতা-গঙ্গার স্রোত নিত্য প্রবাহিত ?
যে উত্তর দিতেছে বিজ্ঞান
অভব্য, অলেখ্য তাহা
নিতান্ত অশ্লীল।

গোঁজামিল অভিধানে
প্রমাণ-বিহীন তথ্য মিলিতেছে বহু,
ব্রহ্মা চতুর্মুখ
ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম
সব শ্লীল। কিন্তু ?······
জনতা-গঙ্গার স্রোত মিশিতেছে কলোল্লাসে
মহাজনতার মহাসিন্ধু-বুকে।
আকাশে বিজয়ী সূর্য
স্বর্ণ-তূর্যে নিঃশব্দে জয়-ধ্বনি করি
বৈদূর্য-কার্মুক তুলি
হানিতেছে সিন্ধুবুকে
অসংখ্য কলম্বকুল।
তার [illegible] শ-ঠিকানা
স্তূপ স্তর পালক মেঘের ইশারায়
হাসে ইন্দ্রধনু
বজ্রেরা গর্জন করে।
নূতন ইঙ্গিত মিলিতেছে নূতন স্রোতের।
মহাশূন্যে চলিয়াছে জনতার নির্জন মিছিল।

মনস্তত্ত্ব-কুয়াশার প্রহেলিকা ভেদি
অবশেষে দেখা দিল খেঁদি।
সেই খেঁদি
যারে আমি জ্ঞাতসারে
খেঁদিই ভাবিয়াছিনু :
স্বচক্ষে সজ্ঞানে
দেখেছিনু নাক তার বোঁচা।
তারপর মনস্তত্ত্ব·· নিবিড় কুয়াশা!

সে কুয়াশা কাটিতেছে ধীরে
নূতন আলোকে।
দেখিতেছি সবিস্ময়ে
কুয়াশার পারে
সেই খেঁদি এখনও মজুত।
নাক তার
নহে বোঁচা আর
তিল-পুষ্প মানিতেছে হার।
আবার কুয়াশা…… !

৫

পুরুষ-কোকিল-বর্ণ কবরীতে যার
বসন্তে পাই নি দেখা তার।
নয় ট্রেনে, নয় উপবনে।
দেখেছিনু তারে
আমার সত্তার ভগ্নস্তূপে।
সে স্তূপ-শিখরে
দেখেছিনু রাক্ষসীরে।
মোর কৃষ্ণ-কামনার খনি
লুণ্ঠন করিয়া
দেখেছিনু পরিয়াছে কৃষ্ণ-শিরস্ত্রাণ।
কবরী জুড়িয়া
ব'সে আছে শ্যামচঞ্চু পুরুষ-কোকিল
কৃষ্ণ-পক্ষ রক্তচক্ষু মেলি।

৬

যে কথা রক্ষিত আছে অন্তরের রেফ্রিজারেটারে
রিপ্রেশন-জর্জরিত-মানস-বরফে

কি ক'রে তাহারে বল ছাড়ি এই গরম বাজারে
ছাপার হরফে।
আতঙ্কিত দৃষ্টি মেলি দেখিতেছি আসিতেছে...
দলে দলে জিজ্ঞাসু পাণ্ডারা
সত্য-সন্ধী বাণীভুক্ নাছোড়বান্দারা!
বদ্ধদ্বারে মুহুর্মুহু হানিতেছে কর
পলায়িত নীরো সম চিত্ত মোর কাঁপিছে থর্থর,
ভাবিতেছি সভয়ে বসিয়া
সমস্ত কি অবশেষে পড়িবে ধসিয়া!
শেষে কি খুলিতে হবে মোর রুদ্ধ রেফ্রিজারেটার,
বাহির করিতে হবে সুকঠিন সেই সত্য-সার
মনো-হিম-লীনা
বলিতে হবে কি শেষে—আমি ভাই কিছুই জানি না:
মুখোশ খুলিয়া দেখ—আমি বোকা, হাঁদা
আমাকে রেহাই দাও দাদা!

৭

যশের মুকুট লাগি রসের সাগর
হইল উতলা,
একতলা একঘেয়ে, চাই যে দুতলা।
ক' সের কিসের ঘৃত তার লাগি চাই?
কার অঙ্গে কোন্ অঙ্গে হইবে মাখাতে
ঘৃত কিংবা তৈল?
এই ভাবি চিত্ত তাঁর বিকল যে হইল।
বিকলিত চিত্ত তাঁর হ'ল পুলকিত
প্রকৃত হিতৈষী এক শূন্য হতে হয়ে আবির্ভূত
করি মন্ত্রঃপূত
দুলাইয়া দিল কর্ণে মন্ত্রণা-মাদুলি।

সে মাদুলি কর্ণমূলে গুঞ্জরিল যেই বুলি-গীতা
অতি তুচ্ছ তার কাছে প্রজ্ঞা-পারমিতা।
কহিল সে ইঙ্গিত-সঙ্গীতে
প্রয়োজন নাই তেলে-ঘিতে
পরিস্থিতি সম্রাটের পদপ্রান্তে হইয়া উপুড়
খোঁড় মাথা-মুড়
কেবল মুকুট কেন, পাবে হার চুড়।
কি জানি কি হ'ল তারপর
রসের সাগর
সহসা হইয়া গেল রস-চচ্চড়ি
ক্ষিপ্তকণ্ঠে চীৎকারিছে- দাও কলসী দড়ি।

"বনফুল"

পরিচয়

মাঝরাতে বকুল বিছানা ছেড়ে উঠল, তার পর আলোটা জ্বেলে সোজাসুজি আয়নার সামনে গিয়ে সিঁথির সিঁদুররেখাটুকু ঘ'ষে ঘ'ষে তুলতে লাগল।

দুপুর রাতে এমন একটা খেয়াল যে কেন হ'ল ওর, তা ও নিজেই বুঝতে পারে না। আজ আড়াই বছর এই কারখানা-শহরে মেয়েদের স্কুলে চাকরি নিয়েছে বকুল— মিসেস বকুল চৌধুরীর পড়ানোর খ্যাতি বেশ ছড়িয়েছে, এক-আধটা যা টুইশান করে তার দরুনও মোটা টাকাই দক্ষিণা পায়। সামাজিক হিসেবে—কারখানা-অঞ্চলে যে ধরনের সামাজিকতা প্রচলিত, সেই সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে মিসেস চৌধুরীর নিমন্ত্রণ অবশ্যই হয়। ছোট বড় ও সব মহলই মিসেস চৌধুরীকে আত্মীয়জ্ঞানে আহ্বান করে। আজও তেমনই এক বিয়ের উৎসবে মিসেস চৌধুরীর নিমন্ত্রণ ছিল। সেখান থেকে ফিরে এসে বকুল লাল চওড়াপাড় শাড়িখানা বদলে শুয়ে পড়েছিল, কিন্তু ঘুমোতে পারে নি।

ওর চোখের সামনে আজকের বিয়ে-বাড়ির ছোট ছোট টুকরো ছবি ফুটে উঠছে, যেন রাত্রির কালো পর্দার ওপর সাদা-সাদা টগরফুল ফুটছে। যার বিয়ে হ'ল সেই অনীতা বকুলের ছাত্রী, দশম শ্রেণীতে পড়ছিল। গত

পরীক্ষাতেও মেয়েদের স্বাধীনতাকে সমর্থন ক'রে ভাল প্রবন্ধ লিখেছিল' মেয়েরা নাকি সবাই জানে, অনীতা 'লাভ'এ পড়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত ওর বাবা মা বাধ্য হয়েই বিয়ে দিলেন। এইটুকু মেয়ে প্রেমে পড়ে ?

প্রথমটা তো বকুল এই ভেবেই মনে মনে খুব হেসেছে। প্রেম কি বস্তু তা কি অনীতা বোঝে ! অথচ সেই না-জানা সংজ্ঞার ওপর কি মোহ ! কি বোকা মেয়ে ! এর পর ওর যে কি দুর্গতি হবে তা ভাবলেও বকুলের দুঃখ হয়। অল্প-বয়সী মেয়েদের জীবনে প্রেম আর প্রসন্ন থাকে না—এ তো সবাই জানে, শুধু ওই মেয়েটিই জানে না। আশ্চর্য ওর বাবা-মার বুদ্ধি, তাঁরা কেন এমন একটা অবাস্তবকে সত্য ব'লে ঘটা ক'রে বিজ্ঞাপন দিলেন !...বিয়ে-বাড়ির সব কিছুর মধ্যেই যেন ছেলেমানুষির ছাপ মারা থাকে। বড় বড়, বুড়ো বুড়ো মানুষগুলো কেমন একটা উচ্ছলতার মুখোশ লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায় ! কি সব সস্তা আর খেলো রসিকতা—আহা ! অথচ কেউ কি সচেতন নয় ! ওই যে দত্তবাবু বাঁধানো দাঁতের পাটি ওপর দিকে ঠেলে বিশ্রী হেসে বকুলের দিকে মিটমিটে হাসির তীর ছুঁড়লেন—"মিসেস চৌধুরীর বুঝি মনটা উড়ু-উড়ু করছে ? আমারও ভাই ওই হাল। তা দেখুন, চৌধুরী মশাই হয়তো এখন এয়ার হোস্টেসের সেবা পাচ্ছেন ; মিলিটারির ব্যাপার তো ! আপনি জানেনই না যে পাঞ্জাব থেকে আসাম চলেছেন। আমিও তাই বলি, সব পাখিই পাখি—পায়রা আর ঘুঘুতে ফারাক নেই, কি বলেন আপনি ?"

বকুল কিছুই বলে নি, মাত্র এক কণা ভদ্রতার হাসি খয়রাত ক'রে সেখান থেকে অন্য আসরে স'রে গিয়েছিল। মেয়েদের মহল আরও দুঃসহ। সেখানে শাড়ি গয়না আর রূপের কষ্টিপাথরে যাচাই চলেছে অবিরাম।

বকুলকে দেখে কোলাহল যেন দপ ক'রে নিবে যায়। সম্ভবত আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে বকুলকেই এরা ব্যবহার করছিল। যাই হোক, এসব বিষয়ে বিন্দুমাত্রও কৌতূহল জাগে না ওর।...বিছানায় শুয়ে শুয়ে এই সব আজেবাজে কথার ভিড়ে বকুল ঘুমোতে পারছিল না। হঠাৎ ওর কি মনে হ'ল, একেবারে সরাসরি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সিঁদুরের চিহ্নটা সিঁথি থেকে মুছে ফেলতে লাগল। অনেক দিন হয়ে গেছে এই সধবার সাজ। আজ ওর শখ হ'ল কুমারী বকুল রায়কে দেখবার। আয়নার ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে নিজের মুখখানায় খুঁজে দেখতে লাগল, সধবার কোন ছাপ সেখানে পড়েছে কি ?

-কই, না। একেবারে সেই বকুল রায়। যাকে দেখে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটের ছেলেরা প্রথমে চমকে উঠে কানাঘুষো শুরু করেছিল। আর যার সহজ সপ্রতিভ আচার-আচরণে ছেলেরা ভক্ত হয়ে পড়েছিল, অবশ্য দু-একজনের কথা স্বতন্ত্র। তারা বকুলের অকপট প্রগতিশীলতাকে মার্কিনী অভব্যতা ব'লে বিদ্রূপ করত, কিন্তু একাকীত্বের সুযোগ পেলে কবির মত ভিজে মিঠে কথার টোপ ফেলে কি যেন পরখ করত। সে সব কথায় মনটায় কেমন সুড়সুড়ি লাগত বটে, তবে তার বেশি কিছু হয় নি কখনও।···আজ দীর্ঘকাল পরে শিক্ষিতা সধবা বকুলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই বকুল রায়। মিসেস চৌধুরী, দিদিমণি- -কেউ নেই, সবাই কোথায় লুপ্ত হয়ে গেছে ?

বকুল আপন মনেই হাসে।

দুনিয়ার তাবৎ পুরুষদের ফাঁকি দিয়েছে বকুল—এই একটি সিঁদুরের রেখা টেনে। ওর প্রচারিত মিস্টার অনিন্দ্য চৌধুরী কোনকালেই বকুলের ঘরে পা দেবে না। এ কথা কেউ জানে না, তাই রক্ষে। নইলে এতদিনে কোথায় যে গিয়ে ওর ভাগ্যের রথখানা চাকা ভেঙে অচল হয়ে প'ড়ে থাকত, কে বলতে পারে !

বকুল বিয়ে করে নি। মেয়েদের স্বভাবধর্মের সূত্রকে সত্য প্রমাণ করবার জন্য ওর কোন রকম ব্যাকুলতা নেই। আশ্চর্য একটা নির্লিপ্ত দর্শকের ভূমিকা ও নিজেই বেছে নিয়েছে।

মায়ের মুখখানা মনে প'ড়ে গেল বকুলের। আয়নার সামনে নিজের মুখের পানে তাকিয়ে ছিল বকুল, কিন্তু মনশ্চক্ষে দেখছিল নিজের মাকে। মা তো মানুষ নন, একখানি ঘটনাবহুল ব্যর্থতাভরা উপন্যাস তিনি। মা কখনও সাধারণ চালচলন পছন্দ করেন নি—না নিজের জীবনে, না সন্তানের ক্ষেত্রে। চিরকাল তাঁর চলাফেরা ঘটেছে দুর্নিবার ব্যাকুলতার ছন্দে --যে ছন্দে স্বস্তি, শান্তি, তৃপ্তি, শ্রান্তি কিছুই ছিল না, সেই যৌবনদুর্মদ ছন্দে মাকে কে যেন চালিয়ে নিয়ে বেড়াত। বয়সের ভাটায়ও তিনি থামতে ভুলে গিয়েছিলেন, তাই শেষ বয়সে পুরুষজাতের কাছে অশেষ উপহাস আর বিরক্তির জঞ্জাল সংগ্রহ করতে হয়েছে তাঁকে।

বকুলের মনে প'ড়ে না বাবার কথা। তিনি যেন ওর জীবনের কোন যত্নই বহন করেন নি। কিন্তু মায়ের প্রভাবটা বকুলের মনে তির্যক ছায়াপাত

করেছে। তারই ফলে বকুল পরোক্ষভাবে মায়ের উল্টোপথে চলতে শুরু করে। নিজের সঙ্গে বোঝাপড়াটা খুব স্বচ্ছ ওর।

এমনই বক্র চলার একটা খেয়ালে একদিন নিজের হাতেই সিঁথিতে সিঁদুর চড়িয়ে বকুল শান্তি কিনেছে। খুশিমত একটা কাহিনী রচনা করেছে। অনিন্দ্য চৌধুরীর রূপ এবং বিত্ত সম্বন্ধে একটা বিশ্বাস্য বিবরণ প্রচার করেছে, এবং এই দীর্ঘ আড়াই বছরের অভ্যাসে অনিন্দ্য চৌধুরী সত্য হোক না-হোক, মিসেস বকুল চৌধুরী ওরফে অনিন্দ্য চৌধুরীর সহধর্মিণী, সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে।

এখন হঠাৎ মিস বকুল রায় যদি মাথা তুলে জানায় নিজের অস্তিত্ব, তা হ'লে কি যে হবে তা মিসেস চৌধুরী অনুমান করতে পারে না। তবু সেই সম্ভাব্য ছবিটা দেখবার লোভ ওর কৌতূহলী মনকে খুব আগ্রহতাড়িত করছে।

আয়নাতে মিস বকুল রায় হাসছে। এত ছেলেমানুষ, এমন মিষ্টি চেহারা ওর—দেখে ভারি আশ্চর্য লাগে বকুলের। আজ যে মেয়েটির বিয়ে হ'ল, সেই অনীতার চেয়ে এমন কিছু বেশি বয়স তো দেখে মনে হচ্ছে না বকুলের! অথচ বিয়ের সভাতে ধানদূর্বা দিয়ে বকুল বর-কনেকে আশীর্বাদ করার পর বর তো বকুলের পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছে!···ছেলেটির বয়স কত হবে? বকুলের আন্দাজ হয়, ত্রিরিশের কাছাকাছি। তা হবে বইকি। বকুলের চেয়ে কিছু বড়ই হবে। অথচ বিয়ে-বাড়িতে বকুলকে দেখে কেউ তো বুঝতেও পারে নি যে, ও কুমারী। তবে কি কৌমার্যে আর বিবাহিত জীবনের বাহ্য চেহারায় কোনই তফাত নেই? অন্তত চেহারাতে যে আচরণের ছাপ পড়ে না—এটুকু প্রমাণের জন্য বকুলকে অন্যের কাছে নজীর খুঁজতে হবে না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

আজ এই গভীর রাত্রে বকুলের আর ভাল লাগছে না সধবার সাজ। আড়াই বছরের পুরনো ওই সাজের মধ্যে কাছিমের মত নিজেকে ঢেকে রাখা যায়, বকুল তা জানে। সিঁথির সিঁদুরে নিরাপত্তা আছে, খুব সত্যি কথা। একদিন এই সব ভেবেই তো বকুল এই চিহ্নটা স্বচ্ছন্দে শিরোধার্য করেছিল। কিন্তু আজ যেন মনে হচ্ছে, এই মিথ্যাচারের মধ্যে শান্তি নেই—বরং কলঙ্কই আছে।

বকুল বিচলিত হয়েছে অনীতার কথা ভেবে। অনীতার কপালেও সিঁদুর পড়ল। আর ইস্কুলে আসবে না ও, তার দরকারও নেই। কবেকার শুরু-হওয়া সমাজ-জীবনের অন্ধপথে ছক-বাঁধা পথ ধ'রে চলবে অনীতা। এরই জন্য কি দীর্ঘ

পরমায়ু দরকার! ষোলোতে যে চাকা ঘুরতে শুরু করল, সেই চাকা যদি একটানা একঘেয়ে চ'লে ষাটের চৌকাঠে প'ড়ে ভেঙে যায়, তখনও কেন মানুষ কাঁদে? কি আছে সেই জীবনটিতে কাম্য? বকুল ভেবে পায় না। ওর মনে হয়, সধবার চিহ্ন মাথায় রাখার মধ্যে গৌরবের কিছু নেই—ওটা কলঙ্কসর্বস্ব। আরও জোরে ঘষতে লাগল, চিহ্নটুকুকে ঘুচিয়ে দেবার জন্য কী আকুলতা ওর! অনীতাদের মত পাশব পরিচয়ের বিজ্ঞাপন হয়ে ঘুরে বেড়ানো বকুলের কাজ নয়। অথচ এতদিন সেটাই বকুল মেনে নিয়েছিল তো! এখন যেন সেই কথা ভেবে ওর গা ঘিনঘিন করেছে। ছি-ছি! আত্মরক্ষার কবচ ব'লে শেষে বকুল অমন একটা বিশ্রী ছাপ নিজের মাথায় ব'য়ে মরেছে! নিজের কাছে যেন ছোট হয়ে গেল বকুল। আস্তে আস্তে বিছানার ওপর ক্লান্ত বিপর্যস্ত মনের ভারটুকু অসহায়ভাবে এলিয়ে দিল বকুল। ওর সীমন্তপ্রান্ত আবার রিক্ততার ধু-ধু প্রান্তরের মত পত্র-পল্লবচ্ছায়াশূন্য হয়ে গেল।

ঘন ঘন কড়া-নাড়ার শব্দে বকুলের ঘুম ভাঙল।

এইভাবে ঘুমের ব্যাঘাতে মনে মনে খুব অপ্রসন্ন হয়েই ও বিছানায় পাশ ফিরে শোয়। এদের উপদ্রবে একটু ঘুমিয়েও শান্তি নেই। খুলবে না বকুল দরজা, ওরা যত খুশি ধাক্কাধাক্কি করুক না।

নাঃ, কিছুতেই থামছে না। এক নাগাড়ে খট্ খট্ শব্দ ক'রেই চলেছে। অবশেষে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বকুল উঠে পড়ল। কণ্ঠস্বর যতখানি নীরস করা যায় ততটা তিক্ত বিরস ক'রে সাড়া দিলে, কে?

দরজা খুলেই দেখলে, সামনে মণিকা দাঁড়িয়ে।

ইস্ কী মেজাজ! তোমার বাপু মাস্টারনী না হয়ে রাজরাণী হওয়াই উচিত ছিল।—ব'লে মণিকা ঘরে ঢুকল।

সে কথার কোনও জবাব না দিয়ে বকুল শুধু হস্টেলের বারান্দার দিকে তাকাল। এ কি, রোদ যে ঝাঁ-ঝাঁ করছে! রান্নার মহলে জুনিয়ার-মায়ের তরকারি কোটা চুকে গিয়ে মশলা বাটা চলছে। বড্ড বেলা হয়ে গিয়েছে। বকুল মনে মনে কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল।

মণিকা বললে, রাগ করেছ ভাই, কাঁচা ঘুমটা নষ্ট করলাম তাই?

না, ব'স। মুখটা ধুয়ে আসি।

বসব না। মাথার যন্ত্রণায় ম'রে যাচ্ছি। তোমার ওডিকলোনের শিশিটা দাও, জলপটি লাগিয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করতে হবে, নাইট-ডিউটি চলছে।

টেবিলে রয়েছে।—ব'লে বকুল বাথরুমে চ'লে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ঘরে ফিরে এসে বকুল দেখলে, মণিকা ওর চেয়ারে ব'সে রয়েছে চুপ ক'রে। ওকে ফিরতে দেখে মণিকা বললে, এ সব কি ব্যাপার মিসেস চৌধুরী ?

কি সব ?—ব'লেই বকুলের নজর পড়ল ভাঙা শাঁখা আর নোয়াটা টেবিলের ওপর প'ড়ে রয়েছে। পরক্ষণে গত রাত্রের সব কথাই এক চমকে মনে প'ড়ে গেল বকুলের। ও সতর্ক হবার আগেই মণিকার অনুসন্ধানী চাউনি ওর সিঁথির শূন্যপথে প'ড়ে কি যেন আবিষ্কারের চেষ্টা করছে, বকুল তাও বুঝল।

মণিকা এবার উঠে দাঁড়িয়ে কাছে এসে সহানুভূতির আবেগে ভিজে গলায় বললে, তোমার স্বামীর কি হয়েছিল ভাই ?

বকুল আর হাসি চাপতে পারল না, বললে, আমারই খেয়াল হয়েছিল।

মণিকা বুঝতে পারে না, প্রশ্ন করে, তার মানে ?

মানে আবার কি, খেয়ালের কি কোন মাথামুণ্ডু আছে ?

তা ব'লে একেবারে এতবড় সর্বনেশে খেয়াল হতে গেল কেন ভাই ? হিন্দুর মেয়ে তো প্রাণ থাকতে শাঁখা-সিঁদুর ঘোচানোর কথা ভাবতে পারে না।

বকুল প্রায় চেঁচিয়ে বললে, বেশ করেছি। আমার ইচ্ছে হয়েছিল সধবা সেজেছিলাম, এখন আর ভাল লাগছে না, তাই ও ঢংটা পাল্টে ফেললাম।

মণিকা এবার হকচকিয়ে ভীত স্বরে বললে, রাগ ক'রো না ভাই। তোমাদের কি মনোমালিন্য হয়েছিল কিছু ? আর এত দূরে থেকে কিই বা হতে পারে, যার জন্যে সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে ফেলতে চাচ্ছ ? তা ছাড়া হিন্দুর মেয়ের বাঁধন যে মরলেও কাটে না। দেখ বকুলদি, মাথা ঠাণ্ডা কর আগে—

বকুল বললে, মণিকাদি, তুমিই জানলে আজ এই প্রথম —আর কেউ জানে না। যে সাজে এখন আমাকে দেখছ, এটাই আমার সত্যি পরিচয়। আমি সধবা নই, কোনকালে যে হব তাও মনে করি না। আমি বিয়েও করি নি, ইয়েও করি নি—

মণিকা কিছুক্ষণ কোন কথাই বলতে পারে না।

তারপর একটুখানি এটা-ওটা নাড়াচাড়া ক'রে টেবিলটা যেন গোছাবার

চেষ্টা করলে, একবার বকুলের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন লক্ষ্য করলে। অবশেষে মাটির ওপর দৃষ্টি নত ক'রে বললে, বকুলদি, তুমি কি ক'রে পার জানি না। এই একা-একা জীবনটা কি দিয়ে ভরাট ক'রে রাখ তাও বুঝি না। আমার নিজের কিন্তু ঠিক উলটো মনে হয়। কিছুতেই ভাবতে পারি না যে, আমি একেবারে একলা!

বকুল কোন কথাই কয় না।

মণিকা ব'লে চলল, আমাকে সে জন্যে কত যে কষ্ট পেতে হয়েছে তা তো আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।

বকুল বললে, আমি স্পিরিট ল্যাম্পটা ধরিয়ে একটু হর্‌লিক্‌সের ব্যবস্থা করি, তুমি ততক্ষণ বলতে থাক।

মণিকা ম্লান হাসি হেসে বললে, তোমার হয়তো এসব শুনতে ভাল লাগবে না। তা না লাগুক, আর কাউকেই কিছু বলতে পারি না। হাসপাতালে নাইট ডিউটি, তার পর একটু বিশ্রাম, আর কাকেই বা বলব! যে-ই শুনবে সে-ই নিজের খুশিমত তো নুন-ঝাল রসান দিয়ে কেচ্ছা ক'রে বেড়াবে। অথচ—

বকুল হাসিদীপ্ত দৃষ্টি মেলে বললে, আমাকেই বা এত সতী ঠাওরাচ্ছ কেন? আমিও তো পারি তেমন রসান দিয়ে একটু গল্প করতে?

আহা, আমি বুঝি অতই বোকা! মানুষ চিনি না?—বলতে বলতে মণিকা উঠে এসে বকুলের পাশে বসল উবু হয়ে।—আচ্ছা, তুমিই বল না, কি করা উচিত আমার?

কিসের কি করবে?—প্রেমের ব্যাপারে আমি অচল-অধম।

তাই বুঝি! এমন রূপ যার, আর কলকাতার কলেজে-পড়া মেয়ে হয়ে মি অতই আহাম্মক, কি যে বল!

ঠিকই বলি। আমার ওসব আসে না ভাই।

অবাক করলে। যাকগে, তবু শোনা—একটু ভেবে দেখ, যদি কিছু পরামর্শ দিতে পার। আমার তো এখানে কেউ নেই ভাই। তা হ'লে একেবারে গোড়া থেকেই বলি। আমি কিন্তু কুমারী নই।

তবে?

বিধবা।

সত্যি?

সে অনেক কাণ্ড, আমার ভাগ্যের ওপর দিয়ে বিরাট একটা ঝড় ব'য়ে গিয়েছে। খুব যে ছেলেবেলায় বিধবা হয়েছি তাও নয়।

যাক সে সব কথা। এখন সমস্যাটা কি হ'ল তোমার তাই বল।

দীর্ঘশ্বাসটুকু চাপতে গিয়ে মণিকা যেন দীর্ঘতর ক'রে ফেললে।—বলতে খুব লজ্জা করছে।

আমি তো দেখছি বলবার জন্যে আঁকুপাঁকু করছ, লজ্জার মুখটুকু যত তাড়াতাড়ি কাটতে পার ততই ভাল।

না, ভাবছি, তুমি যা গোঁড়া, শুনলে শেষে আমাকে ঘেন্না করতে শুরু করবে।

ঘেন্না-টেন্না আমার নেই। হয়তো এটা দুর্বলতা, নইলে সবাই যাতে সুখী হয়, যার জন্যে এত ধরাবাঁধার মধ্যে চলতে হয়, সেই বোধটুকু আমার নেই—একে দুর্বলতা মনে করাই ঠিক।

কিন্তু বকুলদি, তোমাকে আজ দেখে-শুনে আমি যেন ছোট হয়ে গেছি। জান, কাল রাত্রে নাইট ডিউটির সময় একটি পেশেণ্ট আমাকে বিয়ে করবার কথা আদায় ক'রে তবে ছেড়েছে। সেই ভেবেই তো মাথাটা ধ'রে উঠেছে।

বকুল বলল, ও।

সে আমাকে সত্যিই খুব ভালবাসে।

ও।

বলেছে যে, আমি যদি রাজী না হই তবে আর বাঁচবে না।

ও।

আর বলেছে যে, এখন অবিশ্যি বিয়েটা গোপন রাখতে হবে, কারণ সে থাকে তো ব্যাচিলরদের মেসে—দু বছর পরে কোয়ার্টার পাবে, তখন আমরা সেখানে গিয়ে থাকতে পারব, তখন আর ভাবনা কি!

ও।

কি করি বল না?

বকুল হর্লিক্সের একটা পেয়ালা মণিকার দিকে এগিয়ে দিয়ে গম্ভীর ভাবে বললে, হর্লিক্স্ খাও।

না, তা বলছি না। ওকে তো পাকাপাকি একটা বলতে হবে!

কি করে সে?

অ্যাপ্রেন্টিস।

বয়স ?

এই তেইশ-টেইশ হতে পারে।

তোমার বয়স ?

আমার ?—ব'লে মনিকা একটু থেমে গিয়ে আস্তে আস্তে বললে, দেখে কত মনে হয় ?

বকুল বললে, নেহাত কচি তো মনে হয় না। তবে ছেলেটিকে একটু বাড়তে দেওয়া ভাল, মানে, তেইশের অ্যাপ্রেন্টিস নেহাত ছেলেমানুষ। তার ওপর তোমার দ্বিতীয় পক্ষ তো ?

মনিকা আহতস্বরে উত্তর দেয়, আমার তো মোটেই ইচ্ছে নয়, কিন্তু একটা জীবন আমার জন্যে নষ্ট হয়ে যাবে, এই ভেবেই স্থির থাকতে পারছি না।

বকুল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মনিকার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললে, তা হ'লে যা স্থির করেছ তাই চুকিয়ে ফেল, দেখ—যদি জীবনটা বাঁচে।

তোমার কথাটা কি খুব সাদা হ'ল ? আমি খুব বড় একটা অন্যায় করেছি বলতে চাও ?

না, আমি বলছি, রোগীকে সারিয়ে তোলাই নার্সের কাজ—তা সে যেমন ভাবেই হোক না কেন, সারিয়ে তুলতে হবে।

ঠাট্টা করছ ?

মোটেই না।—ব'লে বকুল তাড়াতাড়ি সিঁথির ওপর সিঁদুরের রেখা টানতে শুরু করল। আয়নার সামনে মিসেস বকুল চৌধুরীর আবির্ভাব হতেই বকুলের মুখের গাম্ভীর্য ফিরে এল।

মনিকা পিছনে দাঁড়িয়ে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে বকুলের সিঁথিতে সিঁদুর পরা দেখছিল, যেন ওই দাগটুকুর দিকে এমনি পিপাসাকাতর চাউনি নিয়ে অনন্তকাল তাকিয়ে আছে মনিকা।

চটপট শাড়ি বদল ক'রে বকুল মনিকাকে প্রশ্ন করলে, এবারে তো আর কোন অসুবিধে নেই ?

মনিকা অবাক হয়ে বললে, এই সাত সকালে চললে কোথায় ?

একটু হাসল বকুল নোয়াটা হাতে তুলে নিয়ে। তার পর মনিকার কাছে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে, দাও তো এটা ঠিকমত সোজা ক'রে নুইয়ে, বড্ড বেঁকে গেছে।

মণিকা ইতস্তত করছে দেখে বকুল বললে, এটুকু জোরও নেই ?

আমার হাত দিয়ে—

কথাটা মণিকা শেষ করতে পারে না। কারণ বকুলের চোখ দুটো তখন ধক ক'রে জ্ব'লে উঠেছে। বকুল বললে, ন্যাকামি আমি সইতে পারি না। দাও তাড়াতাড়ি নোয়াটা পরিয়ে! ওদিকে অনীতাদের গাড়ির সময় হয়ে যাচ্ছে—আমিও যে একজন এয়ো, সেটা ভুলে গেলে চলবে না।

শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

সন্ধ্যাবেলার গল্প

আকাশে উঠলে অপরূপ চাঁদ
আমরা কূজন-লিপ্ত
দুজনকে নিয়ে দুজনে গল্পে
থাকতাম পরিতৃপ্ত।
হয়ত তখন খোলা জানালায়
হংস-মিথুন দল ভেসে যায়
বিচিত্র ছবি—রঙ চমৎকায়,
মন যে স্বতঃস্ফূর্ত
শুধুই চাইত কথায়-লাস্যে
অজস্র ক্ষণ—মূর্ত।

দক্ষিণ হাওয়া তখন আনত
চামেলি-হেনার গন্ধ,
কামনা করত হৃদয় কেবল
শিথিল কবরী-ছন্দ।
ছোঁয়াছুঁয়ি খেলা আঙুলে আঙুল
ভালবাসাবাসি—কবরীতে ফুল
গুঁজে করতাম এলোকেশ চুল
এমনি কত না সন্ধ্যা,
মালা যে গাঁথতে জড়ো করতাম
বকুল-রজনীগন্ধা।

তারা-শতভিষা—প্রস্ফুট চাঁদ
—স্মিত সায়াহ্ন-লগ্ন
প্রমত্ত নেশা ব্যাপ্ত স্নায়ুতে
বিলুপ্ত,—আশাভগ্ন—
আজ আর চোখে ভ্রূবিলাস নেই,
জুড়ি না প্রলাপ প্রতি কথাতেই,
নৃত্য ও গীত যে ব্যতিরেকেই
আলাপ আজকে অল্প
উৎসবহীন জীবনের সব
সন্ধ্যাবেলার গল্প।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

বিবাহ-বার্ষিকী

বাঙালীর জীবনে বারো মাসে যে তেরো পার্বণ লেগে আছে তার খরচা জোগাতেই লোকের প্রাণান্ত, তার ওপর আবার ইদানীং এক নতুন উপসর্গ জুটেছে, 'ম্যারেজ অ্যানিভারসারী ডে' বা বিবাহ-বার্ষিকী দিবস। এটা আমাদের দেশের উৎসবের লিস্টে কখনই ছিল না। পশ্চিম দেশের অনুকরণে একেবারে হাল আমদানি। বিবাহ-ব্যাপারটা যে দেশে অত্যন্ত ঠুনকো, কাচের বাসনের মত সামান্য আঘাতেই ভেঙে পড়ে সেখানে এর মূল্য থাকা স্বাভাবিক। তাই এক বৎসরের দীর্ঘ তিনশো পঁয়ষট্টি দিন কেটে যাবার পর তারা এটা নিয়ে উৎসব ক'রে লোককে দেখায়, প্রচার করে। কিন্তু যে দেশে বিবাহ মানে বিশেষভাবে বহন করা এবং পাছে সে বোঝা ঘাড় থেকে প'ড়ে যায় তার জন্যে আবার এক পাক নয়—একেবারে সাত পাকের ব্যবস্থা, সে দেশে তাই এর বাৎসরিক উৎসব করার রেওয়াজ নেই। যা কিছু উল্লাস আনন্দ সব ওই গোড়ার দিনের জন্যে।

কিন্তু মীনাক্ষী এ দেশের মেয়ে হয়েও এটা মানে না। সব জিনিসের বিলিতী সংস্করণ যখন দেশী জিনিসের চেয়ে ভাল, তখন বিবাহের এই নিয়মটাই বা খারাপ কিসে? বরং বছরে বছরে নব নব প্রেরণা বিবাহের স্মৃতিকে মধুর থেকে মধুরতর ক'রে তোলে। এই তার বিশ্বাস। তাই গাড়িটা গলির মোড়ে রেখে বান্ধবীদের বাড়ির ঠিকানা খুঁজে বার করতে গলদ্‌ঘর্ম হ'লেও সে ক্ষান্ত হয় না। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে সুগন্ধযুক্ত রুমাল বার ক'রে নাকে চেপে ধ'রে সঙ্কীর্ণতম গলির পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। বিশেষ ক'রে কলেজে যে কজন তার অন্তরঙ্গ বান্ধবী ছিল, তাদের নেমন্তন্ন করার জন্য যেন সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! মীনাক্ষীর বিশ্বাস, বিয়ের ব্যাপারে সে সবচেয়ে জিতেছে, তাদের সকলকে টেক্কা দিয়েছে, সেইজন্যে তার এই সৌভাগ্যটা যতক্ষণ না তাদের সকলকে দেখাতে পারছে ততক্ষণ যেন শান্তি নেই তার মনে। এটা তাদের বিবাহের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব, তবু জাঁকজমকটা এবার প্রথমবারের চেয়েও অনেক বেশি। কারণ মীনাক্ষীর বিয়েটা হয়েছিল দিল্লীতে মামার বাড়ি থেকে

এবং এতদিন তারা সেইখানেই ছিল। এ বছরে কলকাতায় বদলি হয়েছে মীনাক্ষীর স্বামী, তাই এখানকার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সকলের কাছে বরকে দেখাতে না পারা পর্যন্ত যেন ঘুম হচ্ছিল না মীনাক্ষীর কিছুতেই। অবশ্য সকলকে ডেকে দেখাবার মত বর যে মীনাক্ষী পেয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নাই। যেমন রূপ, তেমনই গুণ। তা ছাড়া শ্যামলের মত এতটুকু বয়সে কজন বাঙালীর ছেলে প্রায় হাজার টাকা মাইনের সরকারী চাকরি পায়?

ফুলের তোড়াটা মীনাক্ষীর হাতে দিতে গিয়ে অরুণা বললে, তুই একলা যে, মিঃ দত্ত কই? তাঁকে ডাক্।

ও আসছে ভাই এখুনি, নীচে গিয়েছে অফিসের বন্ধুদের তুলে দিতে। —ব'লে অরুণার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলে মীনাক্ষী, আমি তো ভাবলুম তুই আর এলি না। গীতা, বাসন্তী, রেবা, অশ্রু, রমলা—সবাই এসেছিল। একেবারে আমাদের কলেজের কম্প্লিট্ ব্যাচ, শুধু তুই ছাড়া।

অরুণা জবাব দেয়, ছোট ছেলেটার হঠাৎ গা গরম হয়ে উঠল বিকেলের দিকে, তাই তাকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আসতে একটু দেরি হয়ে গেল ভাই। তারা সকলে চ'লে গেছে নাকি?

হ্যাঁ। আর মিনিট পনেরো আগে এলে দেখা হ'ত।—ব'লে হঠাৎ একেবারে থেমে গেল মীনাক্ষী। যেন তাদের থাকাটার আর প্রয়োজন নেই তার কাছে, এখন সবচেয়ে বেশি দরকার অরুণাকে। বলা বাহুল্য মীনাক্ষীর মনের ইচ্ছাটাও তাই। অরুণাকে দেখে কলেজ-জীবনের প্রত্যেকটি ছোটখাটো ঘটনা যেন তার মনে প'ড়ে যায়। অরুণা ছিল তাদের ব্যাচের মধ্যে সবচেয়ে ভাল মেয়ে এবং দেখতেও সবচেয়ে সুন্দরী। কত ভাল ভাল ছেলে তাকে প্রেম নিবেদন ক'রে চিঠি দিত। টিফিনের সময় বাগানের একটা কোণে তারা সকলে ঘিরে ব'সে সেই চিঠিগুলো পড়ত। অরুণার সৌভাগ্যের কথা ভেবে কত মেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলত। আর সবচেয়ে বেশি ব্যথা পেত মীনাক্ষী নিজে।

কারণ লেখাপড়ায় সে যেমন ছিল সাধারণ পর্যায়ভুক্ত, রূপের ক্ষেত্রেও ছিল তেমনই। তাই অরুণা না আসা পর্যন্ত মীনাক্ষীর যেন মনে হচ্ছিল, আজকের আয়োজন সব ব্যর্থ। অন্তত অরুণা নিজের চোখে দেখুক যে, সে জিতেছে বিয়ের ব্যাপারে তার চেয়ে।

অরুণাকে নিয়ে মীনাক্ষী তখনি ড্রয়িং-রুমের ভেতর দিয়ে এঘর ওঘর দেখিয়ে ঘুরিয়ে শেষে নিজের শয়নকক্ষে বসিয়ে বললে, তুই এখানে একটু ব'স্, আমি এখুনি ওকে ডেকে আনছি ভাই।

মীনাক্ষীর ঐশ্বর্য দেখে অরুণার তখন মাথা ঝিমঝিম করছিল। প্রতিটি ঘর যেন ছবির মত সাজানো। মূল্যবান আসবাবপত্র যেখানে যেটি মানায়, পরিচ্ছন্নভাবে গুছিয়ে রেখেছে মীনাক্ষী। কি সুন্দর রুচিবোধ তার! একটা দীর্ঘনিশ্বাস বুকের মধ্যে চেপে নিলে অরুণা। কি পেয়েছে সে বিয়ে ক'রে! শুধু স্বামী প্রফেসর—এইমাত্র তার কোয়ালি-ফিকেশন। যা রোজগার তার অর্ধেক বই কিনেই শেষ করে, আলমারি কেনবার পয়সা জোটে না—জীবনের ভোগবিলাস বলতে যার বই ছাড়া আর কিছুই নেই।

অথচ এই মীনাক্ষীর চেয়ে রূপে গুণে বিদ্যায় সব দিক থেকে সে ছিল শ্রেষ্ঠ। আর ভাবতে পারে না অরুণা। কি অর্থের প্রাচুর্যের মধ্যে থাকে মীনাক্ষী, তার তুলনায় কি দারিদ্র্য তার! বাড়ি ভাড়া দিয়ে, দুটো ছেলের অসুখবিসুখ হ'লে ভাল ডাক্তার দেখাতে পারে না, তাদের ওষুধ-পথ্য কিনে দেবার সামর্থ্যে কুলোয় না। এবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস সজোরে ফেললে অরুণা। অথচ একদিন কি উচ্চাশাই না তার মনে ছিল, ঠিক মীনাক্ষীর মতই ঘর সাজিয়ে তার মধ্যে বাসা বাঁধবে! কিন্তু কি হ'ল? কি পেলে সে জীবনে?

এমনই ক'রে মীনাক্ষীর সৌভাগ্যের কথা যত ভাবে, তত যেন অরুণা ঈর্ষিত হয়ে ওঠে তার উপর।

মীনাক্ষী হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসে। বলে, তোকে একলা বসিয়ে রেখে গেছি, কিছু মনে করিস না ভাই। ওকে ডেকে এসেছি, আসছে

এখুনি। আর আমায় এখন যেতে হবে না।—ব'লে গল্প জুড়ে দেয় অরুণার সঙ্গে। তার স্বামীকেও নিমন্ত্রণ করেছিল মীনাক্ষী, কিন্তু তিনি আসেন নি—তাঁর কলেজে নাকি কিসের মীটিং আছে আজ।

হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে মীনাক্ষী, বলে, তুই যাই বল্ ভাই, প্রফেসররা সর্বদাই সিরিয়াস্, জীবনটাকে উপভোগ করবার জন্যে যেন ভগবান ওদের পৃথিবীতে পাঠান নি!

কথাটা সত্যি হ'লেও অরুণার মন কিন্তু তাতে সম্পূর্ণ সায় দিতে পারল না। মীনাক্ষী তাই লক্ষ্য ক'রে বললে, রাগ করছিস তোর বরকে বে-রসিক বলেছি ব'লে? আচ্ছা, যাক ওসব কথা। ব'লেই চট্ ক'রে আলমারির মাঝ থেকে একটা ফোটোর অ্যাল্‌বাম নিয়ে তার সামনে ফেলে দিয়ে মীনাক্ষী বললে, এই দেখ্, আমরা গেল বছরে কাশ্মীরে গিয়েছিলুম, কত তার ফোটো। অ্যাল্‌বামের পাতা যত ওলটায় তত যেন চোখ মুখ জ্বালা করতে থাকে অরুণার। মিঃ দত্তর সঙ্গে মীনাক্ষী কি সব নির্লজ্জ-ভঙ্গীতে ফোটো তুলেছে। ছিঃ! স্বামী হ'লেও কি এই ভাবে ফোটো তোলা উচিত! মনে মনে ভাবে।

ঠিক এই সময় মীনাক্ষীর স্বামী এসে ঢুকল ঘরে।

এই রুণু, এই নে, তুই যাঁকে দেখার জন্যে হাঁপাচ্ছিলি, ইনি সেই মিঃ দত্ত। আর এ আমার বন্ধু মিসেস অরুণা মল্লিক। এর স্বামী খুব নাম-করা একজন ইংরিজীর প্রফেসর।—ব'লে মীনাক্ষী অরুণার সঙ্গে তার স্বামীর পরিচয় করিয়ে দিলে।

ও!—ব'লে হাত জোড় ক'রে মিঃ দত্ত নমস্কার করলে অরুণাকে।

অরুণা মীনাক্ষীর স্বামীর মুখের দিকে বিস্ফারিতনেত্রে তাকিয়ে তখনও ভাবছিল, কি সুপুরুষ আর কি ছেলেমানুষ মিঃ দত্ত! বোধ হয় মীনাক্ষীর সমবয়সী হবে। ভগবান সব দিক দিয়ে ঢেলে দিয়েছেন একেবারে। কি লাকি ও!

কি রে! অমন হাঁ ক'রে চেয়ে আছিস যে!—ব'লে ছোট্ট একটা চিমটি কেটে মীনাক্ষী খিলখিল ক'রে হেসে উঠল।

সে হাসি যেন অরুণার কানে বিদ্রূপ বর্ষণ করে। মীনাক্ষী যে সকল দিক দিয়ে তাকে টেক্কা মেরেছে এ যেন তারই জয়োল্লাস। নিমেষে তাই অরুণার চোখ দুটো জ্ব'লে উঠল। মিঃ দত্তকে তাঁর নমস্কার ফিরিয়ে দিতে দিতে সে বললে, আপনি বোধ হয় আমায় চিনতে পারলেন না?

ওমা, তুই ওকে চিনিস নাকি? কই, একদিনও তো তোমার মুখে ওর কথা শুনি নি? হ্যাঁ গো, চুপ ক'রে আছ কেন? বল? মীনাক্ষী ঠেলা মারে স্বামীকে। ঘাবড়ে যায় মিঃ দত্ত। বলে, কিন্তু আমি তো কিছুতেই মনে করতে পারছি না যে, আপনাকে কোথাও দেখেছি!

মুখ টিপে হেসে অরুণা বললে, না পারাই ভাল। কি বল্ মিনু?

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মীনাক্ষী বললে, না না, সত্যি বল্ না ভাই, কোথায় ওর সঙ্গে তোর আলাপ হয়েছিল?

যদি ওঁর সে কথা মনেই না থাকে তো দরকার কি?—ব'লে একটু থেমে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে অরুণা একবার মিঃ দত্তর মুখের দিকে আর একবার মীনাক্ষীর দিকে তাকাল।

মীনাক্ষীর মুখটা নিমেষে যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল, কিন্তু আবার জোর ক'রে মুখে হাসি টেনে এনে বললে, আচ্ছা, থাক্। ওর যখন মনে পড়ছে না তখন হয়তো অন্য কথার সঙ্গে তুই গোলমাল করছিস। আচ্ছা, চল্, খাবি চল্, দেরি হয়ে যাচ্ছে তোর।

অরুণার মুখে বিচিত্র ধরনের হাসি ফুটল। বললে, সেই ভাল।

তারা চ'লে গেলে শ্যামল চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, কোথায় দেখেছে অরুণাকে! কিন্তু যত ভাবে, কিছুতেই মনে করতে পারে না ও মুখ! তবে কি রসিকতা করলে অরুণা তার সঙ্গে?

রাত্রে বিছানায় শুয়ে প্রথমেই স্বামীকে প্রশ্ন করলে মীনাক্ষী, হ্যাঁ গো, সত্যি সত্যি ওকে তুমি আগে চিনতে, তোমার সঙ্গে ওর পরিচয় ছিল?

আমি তো এখনও পর্যন্ত ভেবে কিছুতে সে কথা স্মরণ করতে পারছি না।—শ্যামল বললে।

মীনাক্ষী আর প্রশ্ন না ক'রে চুপ ক'রে যায়। কিন্তু তার চোখে ঘুম আসে না। সে ভাবে, এতটা ভুল করবে কি অরুণা? না, তার কাছে চেপে যাচ্ছে তার স্বামী সে কথাটা? কোন্‌টা সত্যি?

এই নিয়ে মনে মনে যত তোলাপাড়া করে, তত যেন মীনাক্ষীর মাথা গরম হয়ে ওঠে। আবার এক-একবার সে ভাবে, নিশ্চয়ই এর ভেতরে কিছু সত্যি আছে, তা না হ'লে এমন ক'রে চেপে যাবে কেন তার স্বামী? আর অরুণাই বা সেটা স্পষ্ট ক'রে ব্যক্ত করলে না কেন? খাবার সময় অনেক রকম ক'রে কথাটা সে অরুণাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কিন্তু সব সময়ই সে চেপে গেছে। সন্দেহটা তাই ঘুচতে চায় না আরও যেন তার মন থেকে। অবশেষে ভাবতে ভাবতে এই সিদ্ধান্তে সে উপনীত হয় যে, পুরুষজাতের পক্ষে সবই সম্ভব, ওদের বিশ্বাস নেই।

গোলাপের মালার ও তোড়ার স্তূপ জমেছে ঘরে। তারই সুগন্ধে ঘর ভরপূর, কিন্তু মীনাক্ষীর নাকে সে গন্ধ যায় না। শুধু গোলাপের কাঁটা যেন তার সর্বাঙ্গে ফুটতে থাকে। তারই জ্বালায় ছটফট করে সে শয্যায়।

ওদিকে অরুণার চোখেও ঘুম নেই। সেও জ্বলে ঈর্ষায়। মীনাক্ষীর যে সৌভাগ্য চোখে দেখে এসেছে, তা যেন কিছুতেই ভুলতে পারে না। তবু এই অন্তর্দাহের মধ্যেও এক-একবার আপন মনেই সে হেসে ওঠে, কেমন ওষুধ দিয়েছি মিথ্যে ব'লে, মর্ এখন ভেবে—কোথায় আমায় দেখেছে! তবু তো আজকের মধুর রাতটা বিষাক্ত ক'রে দিয়েছি মীনাক্ষীর।

এই মনে ক'রে যতবার অরুণা নিজের মনে সান্ত্বনালাভ করতে চেষ্টা করে, তত যেন আরও তার বুকের জ্বালা বাড়ে। কেন, তা সে বুঝতে পারে না। সারা রাত ছটফট ক'রে কেটে যায়।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

লাউড স্পীকার

ঢক্কাও মধুর হ'ল কানে ধাক্কা মারে না সে আর,
কারণ গর্জিছে কাছে খরকণ্ঠে লাউড স্পীকার।
কান হ'ল ঝালাপালা
প্রাণ বলে—পালা পালা
পূজার আনন্দটুকু কষ্টার্জিত করে সে সাবাড়।

কোথাও পূজার আগে চ'লে যাব কি বছর ভাবি,
মা বলেন, "সে কি কথা, পূজার সময় কোথা যাবি?"
কাজেই রহিতে হয়
লাঞ্ছনা সহিতে হয়
তা ছাড়া দেন না গিন্নী ছেড়ে ক্যাশবাক্সটার চাবি।

দেখেছি যায় না রোখা শব্দবাণ কানে তুলা দিয়া।
প্রয়োজন দুই কানে ঢালা তপ্ত সীসা গলাইয়া।
ডাক ছাড়ি বাপ বাপ
পেটে ফাঁপ ধরে হাঁপ
বাড়িছে রক্তের চাপ, নিদ্রা গেছে বিদায় লইয়া।

বিরুদ্ধে লেখে না কেন কাগুজেরা দু-চার লাইন?
নগরের শান্তিভঙ্গে কেন মোটা হয় না ফাইন?
এ চিন্তাও সর্বনেশে,
ধর্মে হস্তক্ষেপ শেষে
বিপ্লব উঠিবে ক্ষেপে, শাসনের করিলে আইন।

পুড়িবে ট্রামের গাড়ি, শাড়ি, দাড়ি, হবে ধর্মঘট,
ফাটিবে সংবাদপত্রে, পথে, রথে, বোমা ফটফট।
তখন আইন হবে
দ্বিগুণ চালাও তবে
প্রতিমা রহিয়া যাবে সারা মাস, সে বড় সংকট।

নিশ্চয়ই গর্জন যায় স্তব্ধ শান্ত কৈলাস পাহাড়ে,
আমরা তো রহি হট্টগোলে ভরা চোট্টার বাজারে।
মোদেরি অসহ্য এত,
মা এলে তো ক্ষেপে যেত
হয়তো মা ভেগেছেন শান্তিস্বর্গে গোবির ওপারে।

মা আসে নি, অসুরটা এসে ঠিক হয়েছে হাজির।
তাহারি তো পোয়া বারো, তারে ঘিরি জমে যত ভিড়।
তারি গলা দিনরাত
করে কানে বজ্রাঘাত;
গানের বার্ষিক শ্রাদ্ধে মা আমারে করুন বধির।

শ্রীকালিদাস রায়

মিতার জন্য রোমাণ্টিক কবিতা

'রঙলী' পাহাড় ভুলি নি তো আমি—'রাণীখোলা' নদীতীরে
পোলের ওপরে ছবি-দেখা সেই সন্ধ্যা-সকালবেলা,
এঁকে বেঁকে জল চ'লে গেছে কোথা পিপুল-শালের ভিড়ে,
কোণের আকাশে আভায় আভায় চলচ্চিত্র-খেলা।

সূর্যের আলো ঘুরিয়ে ধরেছে সামনে রূপোর মেঘে—
তুষার-শিখরে এখনো ঠিকরে জংলা জরির লেখা;
শালবন পারে পূর্ণিমা-চাঁদ কখন উঠেছে জেগে,
হরিয়াল পাখি উড়ে গেছে ফেলে দীর্ঘ ধূসর রেখা।

পাইনের বনে হায়েনার হাসি থেকে থেকে হা-হা করে,—
সারা রাত শুনি ভীরু হরিণের কি যে সেই আকুলতা!
পাথরের ফাঁকে ঘূর্ণি হাওয়ায় ঝরনার জল ঝরে—
ঘুমের আঁধারে মনে হয় যেন প্রেতেরা কইছে কথা!

মুক্তোর মত স্বচ্ছ সকাল ছড়ায় সোনার গুঁড়ো—
টুকরো রৌদ্র কেন আজ অহো মদিরার মত লাগে!
তুষারে তুষারে সাদা হয়ে গেছে পাহাড়ের নীল চূড়ো,
স্রোতের শব্দে নিস্রোত মনে বীটোফেন-সুর জাগে।
গান গেয়ে কারা সারি বেঁধে চলে 'মাত্‌লি' ঝোরার ধারে
আয়নার জলে মুখ দেখে তারা ভুলে যায় ঘট-ভরা—
মদালসা কোন্ কালো কটাক্ষে কাজ থামে বারে বারে—
ভিন্‌দেশী সেই গুন্ গুন্ সুর কিছুতে যায় না ধরা।
পাথরের বাধা ভেঙে পথ বাঁধে তারাই রক্তমুখে,
বল্লমে বিঁধে কঠিন শিকার ফিরে আসে উল্লাসে,
বোঝা টেনে তোলে খাড়াই পাহাড়ে সাহস-দৃপ্ত বুকে,
সন্ধ্যায় ঘরে মুখোমুখি বসে আগুনের চারিপাশে।
মন্দির হয়ে ঝাউগুলি ওঠে যেখানে নিথর ছায়া—
চিক্কণ জলে পা দুটি ডুবিয়ে বসেছে একলা মেয়ে,—
ধনুকের মত আয়ত চক্ষে অতলান্তিক মায়া,—
সৃষ্টির সেই প্রথম প্রতিমা দেখেছি অবাক চেয়ে।
দান্তের চোখে যে ছবি ফুটেছে সে ছবি আমার চোখে—
অনাদি কালের স্বপ্ন-জোয়ার বইছে আরেকবার.
পৃথিবী ছাড়ায়ে চ'লে যাই এ কি আর কোন রূপ-লোকে?
ধাপে ধাপে টানে শিখরচারিণী কোন্ নীহারিকা-পার।

শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ

ভক্তি

মানুষের শান্তি আজো অসন্দিগ্ধ ভক্তির প্রকাশে,
আত্মকল্যাণের লাগি কোনো প্রশ্ন মনেও তোলে না;
সুনিবিড় পরিচয়ে ভক্তি হতে ভালবাসা আসে,
অজ্ঞানের পথে শেষে ভক্তি নিয়ে চলে বেচা-কেনা।

মহাস্থবির জাতক

বারো

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা, জায়গাটার নাম একদম ভুলে গিয়েছি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা শহরের হুদ্দো ছাড়িয়ে গেলুম। ফাল্গুনের মাঝামাঝি সময়, তখনও সে দেশে গরম পড়ে নি, আমরা আরামেই চলতে লাগলুম। ক্রমে লোকালয় পেরিয়ে গেলুম, দু-পাশে শস্যক্ষেতের মাঝখান দিয়ে পাকা চওড়া রাস্তা চ'লে গিয়েছে সোজা—এরই মধ্যে কখনও বা রাস্তার ধারে সুন্দর এক-একটা বাড়ি ও বাগান দেখতে পাওয়া যায়। পথ চলতে চলতে কখনও দেখি রাস্তায় ও মাঠের মধ্যে দলে দলে ময়ূর ঘুরে বেড়াচ্ছে—মেয়ে-ময়ূরগুলো পুরুষ-ময়ূরদের চেয়ে কত বিশ্রী দেখতে! তারই আলোচনায় খানিকক্ষণ কেটে যায়। কখনও বা হরিণের পাল দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে যাই—আমাদের চোখে এসব দৃশ্য নতুন

পথ চওড়া হ'লেও মাঝে মাঝে ধুলো উড়ে একেবারে দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়। কোন কোন জায়গায় দু-পাশের শস্যক্ষেত থেকে ফসল কেটে নেওয়া হয়েছে—দমকা হাওয়া সেখানেও ধুলো উড়িয়ে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে কেউ বা ঘোড়ায় চ'ড়ে সামনের দিক থেকে এসে আমাদের পার হয়ে চ'লে যায়। ঘোড়া ও সওয়ারের সর্বাঙ্গ ধুলোয় সাদা হয়ে গিয়েছে—আমরা অবাক হয়ে তাকে দেখি, সেও অবাক হয়ে আমাদের দেখে। কখনও বা দেখতে পাই উটের পিঠে চ'ড়ে কয়েকজন লোক চলেছে—বাংলা দেশের লোক আমরা, উট দেখা অভ্যেস নেই। বিস্ময়-চকিত দৃষ্টিতে আমরা সেই দৃশ্য দেখতে থাকি—লম্বা লম্বা পা ফেলে বিচিত্র ভঙ্গীতে চলতে চলতে উট আমাদের দৃষ্টির সীমা পার হয়ে চ'লে যায়। কখনও বা সেই নির্জন রাস্তায় চীৎকারের দমকা ঝড় তুলে একদল পুরুষ ও স্ত্রীলোক কলরব করতে করতে চ'লে যায়—গ্রাম্যলোক তারা, আস্তে কথা বলতে জানে না—তাদের জিজ্ঞাসা করি, আমরা ঠিক পথে চলেছি কি না! কখনও বা ক্লান্ত ধূলি-ধূসরিত দেহ নিয়ে কোন পথিক আসে অপর দিক থেকে, তাকে জিজ্ঞাসা করি—সে ঝাড়শাহী ভাষায়

কি উত্তর দেয় আমরা বুঝতে পারি না। সেও আমাদের শহুরে হিন্দী বুঝতে পারে না, কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে থেকে আবার নিজের পথ ধরে।

চলতে চলতে এক জায়গায় পথের ধারে কয়েকটা ধূলিমাখা খোলার ঘর দেখে দাঁড়িয়ে গেলুম। অনেকক্ষণ ধ'রে জল তেষ্টা পেয়েছিল, কিন্তু তৃষ্ণা নিবারণের কিছুই পাই নি। মাঝে মাঝে পথের ধারে বড় বড় ইঁদারা দেখেছি বটে, কিন্তু ইঁদারা দেখলে তো তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। এইখানে জল পাওয়া যেতে পারে মনে ক'রে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে খোঁজাখুঁজি ক'রে একটা চানা-ভাজার দোকানে গিয়ে বললুম, আমরা বড় তৃষ্ণার্ত, একটু জল খাওয়াতে পার?

কথা শুনে লোকটা কথা না ব'লে ইতস্তত করতে লাগল। দোকানদারের মনস্তত্ত্ব সর্ব দেশেই প্রায় সমান। তার হালচাল দেখে বললুম, তোমার দোকান থেকে ভুঙ্গা খেয়ে আবার জল খেতে যাব কোথায়?

দোকানদার এবার সোজা জিজ্ঞাসা করলে, কত ভুঙ্গা চাই?

দু-পয়সার চালভাজা ও এক পয়সার ছোলাভাজা কিনে দোকানে ব'সেই আমরা চিবোতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। হিসাব ক'রে দেখা গেল যে, সেই রাশীকৃত চাল-ছোলা-ভাজা গলাধঃকরণ করতে দিবা অবসান হয়ে যাবে। অতএব বুদ্ধিমানের মতন সেগুলি কাপড়ের খুঁটে বেঁধে ভরপেট জল পান ক'রে সেখান থেকে রওনা হলুম। এবার কিন্তু কিছুক্ষণ চলতে না চলতে, পেটে জল পড়ার জন্যই হোক অথবা অন্য কোন কারণেই হোক শ্রান্তিতে শরীর ভারী হয়ে আসতে লাগল। শেষকালে বেগতিক দেখে পথের ধারে এক বিরাট গাছের তলায় গিয়ে আশ্রয় নিলুম। আমি ও জনার্দন আর বৃথা কালবিলম্ব না ক'রে সেইখানেই গা ঢেলে দিলুম— কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই ঘুম। সুকান্ত যখন আমাদের ঠেলে তুলে দিলে তখন বিকেল হয়ে গিয়েছে। তখনও হা-হা ক'রে হাওয়া বইছে বটে কিন্তু দুপুরের হাওয়ার চাইতে তা অনেক ঠাণ্ডা। ভাগ্যে আমরা বুদ্ধি ক'রে গায়ের কাপড় নিয়ে এসেছিলুম!

উঠে আবার যাত্রা শুরু করা গেল। একদল লোক সামনের দিক থেকে আসছিল, তাদের জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারা গেল যে, আমরা প্রায় মাইল দশেক এসেছি। আমাদের লক্ষ্যস্থল আর কত দূরে জিজ্ঞাসা করায় তারা বললে, আরও তিন-চার ঘণ্টার পথ। যদি পা চালিয়ে চলতে পারি তো সন্ধ্যে-রাত্রির মধ্যেই সেখানে পৌঁছতে পারব।

তারা আরও একটি সংবাদ দিলে, যা শুনে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। তারা বললে যে, আজকাল প্রথম রাত্রে এদিকটায় বাঘের উপদ্রব বেড়েছে। সন্ধ্যে হবার ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ঠিকানায় যদি না পৌঁছতে পার তা হ'লে কোনও জায়গায় আশ্রয় নিও।

আমরা জিজ্ঞাসা করলুম, দু-পাশে এই তো ধূ-ধূ করছে মরুভূমির মত মাঠ আর চষা জমি—এর মধ্যে বাঘ থাকে কোথায় ?

তারা দূরের পাহাড়গুলো দেখিয়ে বললে, ওইখান থেকে সব বাঘ, বন্যবরাহ, হুঁড়ার প্রভৃতি নামে। আর দিন পনেরো বাদে অর্থাৎ গরম প'ড়ে গেলে তারা আর জমিতে নামবে না। কিন্তু শীতের এই শেষটায় তাদের অত্যাচার বাড়ে।

তারা আশ্বাস দিয়ে বললে, নির্ভয়ে চ'লে যাও। আর একটু পরেই গ্রামের পর গ্রাম দেখতে পাবে—একজনের বাড়িতে রাতটা কাটিয়ে দিও—কোন ভয় নেই।

এই কথা শোনার পর আর ঢিমে তেতালায় চলা চলে না—একেবারে দৌড়ে-হাঁটা আরম্ভ ক'রে দিলুম। কিন্তু হাজার হ'লেও শরীর ছিল ক্লান্ত, কতক্ষণ আর সে রকম চলা যায়! কিছুক্ষণ দৌড়িয়েই গতি আমাদের মন্থর হয়ে গেল। দু-একটা খোলার বাড়ি পথের ধারে দেখতে পেলুম বটে, কিন্তু আমরা ঠিক করলুম যে রাত্রির প্রথম প্রহর অতীত না হ'লে বিশ্রাম নেব না।

চলতে চলতে বেলা প'ড়ে এল। সমস্ত দিন পথশ্রম। সকালে কিছু খেয়ে বেরিয়েছিলুম—কিছু খাদ্য সঙ্গে নেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পরেশদার সঙ্গে দেখা করার উৎসাহে সে কথা মনেই হয় নি। পথে যে চাল-ছোলা

কিনেছিলুম তা একেবারে অখাদ্য। দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে জঠরে ক্ষুধার অগ্নি জ্বলতে শুরু হ'ল দাউ দাউ ক'রে। এদিকে চরণও আর চলতে চায় না, এমন অবস্থা। রাত্রির প্রথম প্রহর অতীত না হ'লে বিশ্রামের চেষ্টা করব না ব'লে যে সংকল্প করা গিয়েছিল তা আর রাখা চলল না।

তখনও একেবারে অন্ধকার হয় নি, আমরা একটা গাঁয়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি, চওড়া রাস্তা, দু-পাশে নীচু খোলার বাড়ি। গ্রামখানা অস্বাভাবিক রকমের নিস্তব্ধ ব'লে মনে হতে লাগল। গ্রামে পৌছলেই সেখানকার কুকুরগুলো আমাদের অপরিচিত দেখে চেঁচাতে আরম্ভ ক'রে দেয়। সেখানটায় কোন কুকুর না দেখে আশ্চর্য বোধ হ'ল। ছোট ছোট ছেলেকেও রাস্তার ধারে খেলা করতে দেখা যায়—এখানে তাও দেখা গেল না। কোনও ঘরে আলোও দেখতে পেলুম না। জনার্দন বললে, এটা নিশ্চয় ভূতের গ্রাম।

যাহাতক ভূতের নাম শোনা, অমনি লাগালুম ছুট। যে চরণ এতক্ষণ চলতে চাইছিল না, ভূতের নামে তার গতি চতুর্গুণ বেড়ে গেল।

কিছুক্ষণ যেতে না যেতে আর একটা গ্রাম এসে গেল। তখন অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে এসেছে বটে, তবুও গ্রামখানাকে অপেক্ষাকৃত সজীব ব'লে বোধ হ'ল। কুকুরও আছে দু-চারটে, কয়েকটি ছোট ছেলেপিলে দেখা গেল। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলুম, এক বাড়ির দাওয়ায় একজন স্ত্রীলোক মুড়িসুড়ি দিয়ে রাস্তার দিকে মুখ ক'রে উবু হয়ে ব'সে রয়েছে। তারই একটু দূরে একটা মাটির বড় ডেলার ওপরে একটা প্রদীপ বসানো রয়েছে। রাতের মত সেখানে আশ্রয় পাওয়া যাবে কি না জিজ্ঞাসা করবার জন্যে আমরা তিনজনেই সেদিকে এগিয়ে গেলুম। দূর থেকে দেখে তাকে খুব বুড়ী ব'লে মনে হয়েছিল, কিন্তু কাছে গিয়ে সেই অল্প আলোতেও বুঝতে পারা গেল সে বুড়ী নয়—বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি হবে। যা হোক, জনার্দন তার ঢাকাই হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলে, মাসী, আজকে রাত্রির মতন আমাদের এই তিনজনকে একটু আশ্রয় দেবে?

এতক্ষণ স্ত্রীলোকটি পথের দিকেই চেয়ে ছিল। জনার্দনের আওয়াজ পেয়ে মুখ তুলে কট্‌মট্‌ ক'রে আমাদের আপাদমস্তক দেখতে লাগল। জনার্দন আমাদের চেয়ে একটু এগিয়ে ছিল। স্ত্রীলোকটির ওই রকম কট্‌মটে চাউনি দেখে ব্যাপার বিশেষ সুবিধের নয় বুঝে আমি তাকে ডেকে বললুম, জনা, চ'লে আয়, ব্যাপারটি যেন কি রকম ঠেকছে!

কিন্তু জনার্দন আমার কথা গ্রাহ্য না ক'রে আরও একটু এগিয়ে গিয়ে বলতে লাগল, হঁ্যা মাসী, তোমার বোন্‌পোরা শেষকালে কি বাঘের পেটে যাবে—একটুখানি এইখানে প'ড়ে থাকব, রাতটা কাবার হ'লেই চ'লে যাব।

এবারে স্ত্রীলোকটি ধীরে-সুস্থে সেখান থেকে উঠে বাড়ির ভেতরে চ'লে গেল। জনা চেঁচিয়ে আমাদের ডেকে বললে, মাসীর দয়া হয়েছে—আজ রাত্রিটুকুর জন্যে বোধ হয় আশ্রয় পাওয়া গেল।

জিজ্ঞাসা করলুম, কি বললে মাসী?

জনার্দন বললে, মুখে কিছু বলে নি, তবে মনে হচ্ছে বালিশ-টালিশ আনতে গেল।

আমরা এই রকম কথাবার্তা বলছি, এমন সময় সেই স্ত্রীলোকটি একটা লম্বা লাঠি হাতে ক'রে তীরবেগে দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এক মুহূর্তের মধ্যে জনার্দনকে ধড়াক ধড়াক ক'রে ঘা কয়েক জমিয়ে দিলে।

স্ত্রীলোকটি বাড়ির মধ্যে ঢুকে যাবার পর জনার্দন এক-পা দু-পা করতে করতে দাওয়ার ওপরে উঠে গিয়েছিল। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আঘাত পেয়ে সে "ওরে বাবা রে, গেছি রে" ব'লে এক লাফে নীচে পড়েই একেবারে রাস্তায়।

বলা বাহুল্য, আমরা আগেই রাস্তায় এসে পড়েছিলুম্‌। স্ত্রীলোকটি কিন্তু সেইখানেই থামল না। সে লাঠি হাতে সেই ভাবে তাড়া ক'রে অনেক দূর পর্যন্ত আমাদের পেছু পেছু দৌড়িয়ে এল—আমরা এক রকম দৌড়িয়েই গ্রামটুকু পেরিয়ে গেলুম। পেছনে কুকুরগুলো চেঁচাতে লাগল।

অন্ধকারের ভেতর দিয়ে চলেছি—সামনে, পেছনে, দক্ষিণে, বামে

নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। চন্দ্রহীন আকাশে তারা ফুটেছে, কিন্তু আমাদের অনভ্যস্ত চক্ষু তারার আলো দেখতে পায় না। পেছনে ফেলে আসা গ্রামপ্রান্তে গৃহস্থঘরের ক্ষীণ দীপরশ্মি কখন মিলিয়ে গিয়েছে—আশ্চর্য সে অন্ধকারের রূপ! সে যেমন নিবিড় তেমনই নিস্তব্ধ ও ভয়াবহ—গম্ভীর, অনন্ত অন্ধকারের মধ্য দিয়ে চলেছি। সেই সুগম্ভীর স্তব্ধতার মধ্যে আমাদের সমস্ত প্রগল্‌ভতা একেবারে চুপ্‌সে গিয়েছে—মাঝে মাঝে বুকের ধক্‌ধকানি পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছি। এই অন্ধকারে নিঃশব্দপদসঞ্চারে হয়তো বাঘ আসছে আমাদের অনুসরণ ক'রে—হয়তো বা অন্য কোন সাংঘাতিক জানোয়ার কিংবা কোন সরীসৃপ! প্রাকৃতিক নিয়মে সে আমাদের দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু আমরা অন্ধ। ভয়ে আমরা হাত ধরাধরি ক'রে চলেছি। আমি মাঝখানে, এক পাশে সুকান্ত অন্য পাশে জনার্দন। মাঝখানে থাকায় মনে করছি, অন্যদের চাইতে আমি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ! অন্ধকারে যতদূর সম্ভব সোজা চলতে চেষ্টা করছি কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে পথের ধারের গাছের ওপর গিয়ে পড়ি—চলেছি তো চলেইছি, পলকে প্রলয় মনে হচ্ছে। অনেকক্ষণ এইভাবে চলবার পর দূরে ক্ষীণ আলো দেখা গেল। বুঝলুম, কোন গ্রামপ্রান্তে এসে পড়েছি।

আরও কিছুক্ষণ চ'লে আমরা আর একটা গ্রামে এসে পড়লুম। দু-ধারে বাড়ি, কিন্তু অধিকাংশ বাড়ির দরজা বন্ধ। আশ্রয়ের জন্য কোথায় বলা যায় তাই ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেছি, এমন সময় দেখতে পেলুম এক বাড়ির দাওয়ার ওপরে চেটাই পেতে একজন লোক একখানা ছোট জলচৌকির ওপর একখানা বই রেখে সুর ক'রে কি পড়ছে। বইখানার আকৃতি দেখেই মনে হ'ল সেটি তুলসীদাসী রামায়ণ—এগিয়ে গিয়ে অতি বিনীতভাবে লোকটিকে নমস্কার ক'রে বলা গেল, বাবা, আমরা অমুক স্থানে যাচ্ছি সন্ন্যাসীদর্শনে, কিন্তু রাত্রি হয়ে গিয়েছে, তার ওপর সারাদিন পথ চ'লে অত্যন্ত শ্রান্ত হয়েছি। আজ রাত্রিটুকু যদি আপনার এই দাওয়ায় আশ্রয় দেন তবে প্রাণ বাঁচে।

লোকটি আমাদের কথা শুনে বললে, উঠে এসে ব'স।

আমরা উঠে দাওয়ায় বসার পর সে বললে, সন্ন্যাসীর কথা তোমরা কোথায় শুনলে?

—জয়পুরে। তা ছাড়া সন্ন্যাসীর এক চেলা আমাদের ভাই হয়।

লোকটি জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের বাড়ি কোথায়?

—বাংলা দেশে।

লোকটি আর কোনও কথা না ব'লে ফট্ ক'রে উঠে বাড়ির মধ্যে চ'লে গেল। কোন কথা না ব'লে ওই রকম হঠাৎ উঠে বাড়ির মধ্যে ঢুকে যাওয়ায় আমরা একটু ভড়কে গেলুম। জনার্দন বললে, কি বাবা, মেশো আবার কি আনতে গেল!

স'রে পড়ব কি না ভাবছি, এমন সময় লোকটি অন্য একজন বয়স্ক লোক সঙ্গে নিয়ে এল। এই লোকটি এসেই বেশ হাসিমুখে পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বললে, আপনারা বাংলা দেশ থেকে আসছেন বুঝি?

আমরা তো একেবারে অবাক! রাজপুতানার এই গ্রামের মধ্যে বাংলা কথা! বললুম, হ্যাঁ।

লোকটি অন্যজনকে আমাদের বসবার জায়গা ক'রে দিতে বললে। আমরা বসলে পর জিজ্ঞাসা করলে, আপনারা সাধুদর্শন করতে চলেছেন?

বললুম, হ্যাঁ, সাধুদর্শন করতে যাচ্ছি। পথে কয়েকজন লোক বললে, এই সময়ে এই দিকটায় বড় বাঘের উৎপাত হয়। সেজন্যে রাত্রির মত যদি আমাদের একটু আশ্রয় দেন, আমরা কাল ভোরে উঠেই চ'লে যাব।

লোকটি বললে, বেশ, বেশ, তার জন্যে আর কি! আপনাদের যতদিন ইচ্ছা থাকুন—এ আপনাদেরই বাড়ি।

লোকটির কথাবার্তা অতি ভদ্র ও মিষ্টি। তিনি আমাদের বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেলেন। বাড়ির অবস্থা দেখে মনে হ'ল, তাঁরা বেশ অবস্থাপন্ন লোক। একটা ছোট ঘরের মধ্যে গিয়ে আমরা বসলুম, দু-তিনটি ছোট ছেলেপিলেও দেখলুম। লোকটির সঙ্গে আলাপ হ'ল—কলকাতার কোন ব্যাঙ্কে দেউড়ী-রক্ষকের কাজ করেন। তিন ভাই

এক জায়গায় কাজ করেন। দুজন কর্মস্থানে থাকেন আর একজন ক'রে দেশে আসেন। দেশে একজন না থাকলে চলে না, কারণ এখানে ক্ষেত-খামার বিরাট, তা ছাড়া টাকা খাটাবার কারবারও খুব ফলাও আছে। জয়পুরে গদি আছে, এক ভাইপো সেখানে থাকে। কলকাতাতেও টাকা ধার দেওয়ার কারবার আছে। নিজেদের আপিসের বাঙালী বাবুরাই টাকা নেন, এতে টাকা মারা যাবার কোনও সম্ভাবনা নেই। এঁদের বাবা এই কাজে ঢুকে আস্তে আস্তে তিন ছেলেকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। ছেলেবেলা থেকে বাঙালীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে করতে তাঁরা বাংলা ভাষা বলতে, লিখতে ও পড়তে শিখে গেছেন। ইংরিজী একটু একটু জানেন, তবে ভাইপোরা ইংরিজী শিখেছে ইত্যাদি—

জিজ্ঞাসা করলুম, আপনারা কি ব্রাহ্মণ?

ভদ্রলোক বললেন, ঠিক ব্রাহ্মণ নই, তবে আমাদের পৈতে আছে। আমরা আসলে হচ্ছি রজপুত। আমাদের আদি বাড়ি ছিল যোধপুর-মাড়ওয়ারে—পূর্বপুরুষেরা এখানে এসে বাস করেছিলেন। ব্রাহ্মণের কাজও আমরা ক'রে থাকি, গ্রামের অনেক পরিবারই আমাদের যজমান।

আমরা জিজ্ঞাসা করলুম, অমুক জায়গায় যে একজন সাধু এসেছেন শোনেন নি?

তিনি বললেন, শুনেছি বইকি! আজ এক মাস হ'ল এই রাস্তা দিয়ে মেলার মত লোক চলেছে সাধুদর্শন করতে—এই চার-পাঁচ দিন লোক চলা কমেছে, তা না হ'লে দিনে রাতে সমানে লোক যাচ্ছিল সাধু দেখতে।

লোকটি আমাদের নাম জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর নাম বললেন, রণবীর সিং।

একটু পরে তিনি একজন লোক দিয়ে আমাদের কুয়োতলায় পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে গিয়ে বেশ ক'রে হাত মুখ ধুয়ে ঘরে এসে আমরা চৌকিতে লম্বা হয়ে পড়লুম। ঘরের মধ্যে অন্য কোনও আসবাব নেই, প্রায় ঘরজোড়া চৌকি ছাড়া। মাত্র একটা ময়লা তাকিয়া

এক দিকে প'ড়ে ছিল, সেইটেই কোনরকমে তিন জনে মাথায় ঠেকিয়ে শোয়া গেল। ঘুমোবার চেষ্টা আর করতে হ'ল না, শরীর তৈরিই ছিল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম জানি না, রণবীর সিং আমাদের ডেকে তুলে বললেন, চলুন বাবু, গরিবদের বাড়িতে কিছু আহার করবেন।

সত্যি কথা বলতে কি, আমরা এতটা আশা করি নি, আশ্রয় পেয়েই ব'র্তে গিয়েছিলুম। খাবার জায়গায় যাওয়া গেল। একটা দাওয়ার মতন জায়গায় আমাদের আসন করা হয়েছে, আসনের সামনে শাল-পাতার মত বড় বড় পাতা—আমরা বসতেই একটি বৃদ্ধা এসে পরিবেশন আরম্ভ করলেন। গরম রুটি তাতে ঘি মাখানো আর অড়রের ডাল, একটা কিসের তরকারি আর দু-তিন রকমের আচার। সিংজী বলতে লাগলেন, আপনারা যা খান তা আমরা কোথায় পাব, তবুও ভাবলুম অতিথি না খেয়ে থাকবেন—তাই এই কষ্ট দেওয়া।

আমরা বললুম, বিদেশে রাস্তায় কোথায় বাঘের মুখে যাচ্ছিলুম, আপনি আশ্রয় দেওয়ায় প্রাণে বেঁচে গেলুম। সারাদিন অনাহারের পর এই খাদ্য আমাদের অমৃতের মতন লাগছে, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করবেন।

ভদ্রলোক বললেন, এই যে খাবার আপনাদের দেওয়া হয়েছে এর সবই আমাদের ঘরের তৈরি—গম, ডাল, ঘি, সব।

আহারের পর কিছু দুধও খেতে দিলেন তাঁরা। খাবার পর রণবীর আমাদের ঘরে এসে কিছুক্ষণ গল্প ক'রে চ'লে যাবার সময় বললেন, কাল খুব ভোরে তুলে দেব আপনাদের, সকালবেলাতেই সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারবেন।

পরদিন রাত থাকতে রণবীর সিংজী এসে আমাদের তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, চা-টা খাওয়ার অভ্যেস আছে?

বললুম, পেলে তো বেঁচে যাই।

আমাদের জন্য চায়ের হুকুম দিয়ে সিংজী বললেন, কলকাতায় থেকে ওইটুকু বদ্ অভ্যেস হয়ে গেছে। তারপর একথা সেকথার পর বললেন, চলুন, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাই, সাধুদর্শন ক'রে আসি।

—বেশ তো, চলুন না।

সিংজী বললেন, আপনারা সেখানে পুরো একটা দিন-রাত থেকে বিশ্রাম ক'রে ফিরবেন, আমি দর্শন ক'রেই ফিরে আসব। ফেরবার সময় আবার আমাদের এখানে এক রাত্রি কাটিয়ে যাবেন।

দু গেলাস গরম গরম চা মেরে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। আগের দিন রাত্রে বেশ ভাল আহার ও সারারাত্রি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে শরীর ও মন বেশ ঝরঝরে হওয়ায় আমরা খুব দ্রুত হাঁটতে লাগলুম। রণবীর সিংজী তাঁদের দেশের গল্প করতে থাকায় পথশ্রম অনেক ক'মে গেল। সূর্যোদয়ের কিছু পরেই আমরা লক্ষ্যস্থলে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

আমরা সেখানে পৌঁছেই বুঝতে পারলুম যে, মেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। দূর-দূরান্তর থেকে লোক আসা ক'মে গিয়েছে, কাছাকাছির লোকেরা, যারা প্রায়ই আসে তারাই আসছে যাচ্ছে। সদাব্রতের ধুমধাম আর নেই, লোকজনের উৎসাহ যেন ক'মে এসেছে।

জমিদারের প্রকাণ্ড বাড়ি। কত যে ঘোড়া তার আর ঠিক নেই, উটও দেখলুম অনেক রয়েছে, একটা হাতীও বাঁধা রয়েছে। এক দিকের উঠোনে অসংখ্য গোলা পায়রা—তখন তাদের খেতে দেওয়া হচ্ছিল। এ সব ছাড়িয়ে প্রকাণ্ড বাগান, এই বাগানের এক দিকে একখানা ছোট মত সুদৃশ্য বাড়ির একতলায় সাধু মহারাজ থাকেন।

ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখলুম, ধবধপে সাদা চাদর পাতা একটা ছোট গদিতে সাধু মহারাজ ব'সে আছেন। সাধুর মাথায় প্রকাণ্ড জটা, একমুখ দাড়ি ও গোঁফ সাদা থেকে লাল হয়ে গিয়েছে। তাঁর পাশে গদির নীচেই একটি লোক ব'সে আছেন, তাঁকে দেখলে মনে হয় সত্তর পার হয়ে গিয়েছে, তাঁরও সাদা ধপধপে দাড়ি গোঁফ। এই লোকটিকে দূর থেকে দেখলেও বিশিষ্ট লোক ব'লে মনে হয়, চোখ বুজে স্থির হয়ে সাধুর পাশে ব'সে আছেন। শুনলুম যে ইনিই সরকার অর্থাৎ রাজা, যাঁর বাড়িতে সাধু মহারাজ বাস করছেন। ইনি বাল্যকালেই সাধুর শিষ্য হয়ে তাঁর সঙ্গে চ'লে গিয়েছিলেন হিমালয় পাহাড়ে।

সেখান থেকে দশ বছর পরে দেশে ফিরে আসেন। তারপর সারা জীবন ধ'রে নানা তীর্থে ঘুরে বেড়িয়েছেন, কখনও বা গুরুর কাছে কাটিয়েছেন। বিবাহাদি করেন নি, বিষয়-আশয় তাঁর ভাইপোর বংশধরেরা ভোগ করে, বর্তমান রাজা তাঁর ভাইয়ের নাতি হ'লেও জয়পুরের রাজসরকার এখনও এঁকেই রাজা ব'লে মানেন। বর্তমান রাজা এঁর প্রতিনিধি মাত্র।

সাধুর সামনে আরও কয়েকজন লোক ব'সে আছেন। সাধু মহারাজ মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে দু-একটা কথা বলছেন। আমরা প্রথমে একেবারে সাধুর কাছে না গিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলুম—অনেকক্ষণ সেইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ল। সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাধু মহারাজকে যতটুকু দেখতে পেলুম তাতে মনে হ'ল, যে সাধু এসে পরেশদাকে নিয়ে গিয়েছিল এ যেন সে সাধু নয়। অবিশ্যি পরেশদার গুরুকে আমরা দূর থেকে কয়েক সেকেণ্ড, বড় জোর এক কি দেড় মিনিট দেখেছিলুম, তাতে মনে হয়েছিল তাঁর যেন এক বিরাট চেহারা। এই সাধুর মূর্তি বড় হ'লেও ঠিক যেন তাঁর মতন নয়। আমি এদিক ওদিক দেখতে লাগলুম যদি জুগ্‌নুর দেখা পাওয়া যায়! কিন্তু তাকে দেখতে পেলুম না। ইতিমধ্যে সাধুর সামনে যারা ব'সে ছিল তারা একে একে উঠে যেতেই প্রথমে রণবীর সিং তারপরে আমরা গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম।

সাধু মহারাজ আমাদের প্রত্যেকের দিকে চাইতে লাগলেন—হাসি হাসি মুখ, চোখ দুটোও যেন হাসতে লাগল। মনে হতে লাগল যেন কত আপনার লোক তিনি—অনেক দিন বাদে আমাদের দেখা পাওয়ায় খুব খুশি হয়েছেন। আমরা দাঁড়িয়ে আছি দেখে ইঙ্গিতে ডেকে আমায় বললেন, আও, বয়ঠো।

আমরা তাঁর সামনেই ব'সে পড়লুম। সিংজী কিন্তু দাঁড়িয়েই রইল। সাধু মহারাজের আশেপাশে আরও কয়েকজন লোক ব'সেছিলেন—তাঁদের দেখে মনে হ'ল, হয় তাঁরা সেই বাড়িরই লোক, নয়তো সর্বদাই তাঁর

কাছাকাছি থাকেন। এঁদের উদ্দেশ ক'রে সন্ন্যাসী বললেন, এই ছেলেরা খুবই ভক্তিমান, অনেক দূর থেকে সাধুদর্শন করতে এসেছেন।

এই অবধি ব'লে পাশে উপবিষ্ট সরকার বাহাদুরকে ডাক দিলেন, ঝড়ে!

সরকার বাহাদুর চোখ চাইতে তিনি বললেন, দেখো ঝড়ে, এই ছেলেরা বাংলা দেশ থেকে এসেছে!

সরকার বাহাদুর হাসিমুখে আমাদের দিকে চাইতে আমরা তাঁকে নমস্কার করলুম। সাধু মহারাজ বলতে লাগলেন, এখানে আসতে পথে কোনও কষ্ট হয় নি?

বললুম, মহারাজ, আপনার আশীর্বাদে আমাদের কোনও কষ্টই হয় নি। ঠাণ্ডা দিন ছিল, শ্রান্তি বোধ করলেই গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করেছি—রাত্রে এই সিংজীর আশ্রয়ে আনন্দে কাটিয়েছি।

সাধু এতক্ষণে মুখ তুলে রণবীর সিংকে দেখে বললেন, ব'সো।

সাধু আমাদের বললেন, আমার একটি ছেলে আছে, যার বাড়ি তোমাদের দেশে। দেখা করবে তার সঙ্গে?

বললুম, নিশ্চয়। কোথায় তিনি?

সাধু বললেন, কে আছ, আনন্দকে ডেকে দাও তো।

দু-তিনজন লোক চেঁচামেচি করতে লাগল, এ আনন্দ মহারাজ—সদানন্দ বাবা—সদানন্দজী—

আশা হতে লাগল, এ আমাদের পরেশদা না হয়ে যায় না। বুকের মধ্যে টিপটিপ করতে লাগল, মনের মধ্যে কল্পনার ভিড় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, কিন্তু হায়, বিধির ইচ্ছা ছিল অন্য প্রকার!

অনেক ডাকাডাকি ও হাঁকাহাঁকির পর সদানন্দজী তো এসে হাজির হলেন, কিন্তু পরেশদার সঙ্গে তাঁর কোনও সাদৃশ্যই নেই।

সদানন্দ মহারাজকে দেখে মনে হ'ল, তাঁর বয়স চল্লিশের কিছু বেশি। দীর্ঘ দেহ, মাথায় কুণ্ডলী-পাকানো জটা, মুখ দাড়ি-গোঁফে ভরা, তাতে একটু পাক ধরেছে। দেহের বাঁধুনি ব্যায়ামবীরের মতন। তিনি

ছুটতে ছুটতে এসে সাধুর সামনে দাঁড়াতেই অতি মধুর স্বরে তিনি বললেন, বেটা, তোমার জন্মভূমি যেখানে, এঁরা সেই দেশের লোক।

আমরা সদানন্দজীকে নমস্কার করতেই তিনি হাত দুটো জোড় ক'রে নিজের বুকে ঠেকিয়ে সেইভাবেই দাঁড়িয়ে রইলেন। সাধু আবার বললেন, আনন্দ্, এই ছেলেরা বড় ভক্তিমান। এঁরা দূরান্তর থেকে পদব্রজে সাধুদর্শন করতে এসেছেন। এঁদের ক্লান্তি দূর করবার ব্যবস্থা কর, এঁদের বিশ্রাম ও আহারের যেন কোনো ত্রুটি না হয়।

গুরুর কথা শুনেই সদানন্দ মহারাজ আমাদের বললেন, চলুন।

কিন্তু তখুনি সেখান থেকে ওঠবার ইচ্ছা আমাদের মোটেই হচ্ছিল না। উঠতে তা-না-না-না করছি দেখে যেমন ক'রে ছেলে ভোলায় তেমনি মিষ্টি স্বরে সাধু মহারাজ আমাদের বললেন, যাও বেটা, তোমরা ক্লান্ত, এখন বিশ্রাম কর গিয়ে। সন্ধ্যার সময় এখানে ভজন কীর্তন হবে, তখন এসো।

এর পর আর সেখানে ব'সে থাকা চলে না, উঠতেই হ'ল। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রণবীর সিংজীও সাধুকে প্রণাম ক'রে বেরিয়ে এলেন। বললেন, ভাগ্যে আপনারা আমার বাড়িতে এসেছিলেন, তাই তো মহাপুরুষ দর্শন হয়ে গেল, এই জন্যেই লোকে সৎসঙ্গের কামনা করে, ইত্যাদি।

রণবীর সিং বললেন, আপনারা যদি দু-চার দিনের মধ্যে ফেরেন তবে আমার ওখানে হয়ে যাবেন। আমি শীগগিরই কলকাতায় ফিরব। তার আগে জয়পুরের গদিতে কিছু কাজ সারতে হবে, আপনাদের সঙ্গেই জয়পুরে ফেরা যাবে।

ফেরবার সময় তাঁর ওখানে একদিন থাকব প্রতিশ্রুতি দিলুম।

রণবীর সিং চ'লে গেলেন। আমরা সদানন্দজীর সঙ্গে বাগান পেরিয়ে একটা দোতলা বাড়িতে এসে উপস্থিত হলুম। তিনি সঙ্গে ক'রে ওপরে নিয়ে গেলেন। বললেন, এটা রাজাদের পান্থশালা। একটা ঘরে আমাদের নিয়ে গিয়ে বললেন, এই ঘরে আপনারা বিশ্রাম করুন।

ঘরখানা বাড়ির তুলনায় একটু ছোট মনে হ'লেও অমন চমৎকার ঘর

আজও দেখি নি। ঘরের মেঝে থেকে প্রায় এক মানুষ উঁচু অবধি ফিকে নীল পংকের কাজ—মনে হয় যেন দেওয়ালে নীল কাচ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে—তার ওপরের বাকি দেওয়াল ও সিলিংয়ে ফিকে সবুজ রঙের জমিতে গাঢ় সবুজ রঙের পদ্মপাতা ও সাদা পদ্মফুল—সমস্তটাই তেলের কাজ। ঘর জোড়া শতরঞ্চ, সে শতরঞ্চিকে কার্পেট বললেই হয়। এক দিকে একটু উঁচু গদির ওপরে সাদা চাদর টান ক'রে পাতা, তার ওপর চার-পাঁচটা গোল মোটা মোটা গিদ্দে।

সদানন্দজী আমাদের বসতে ব'লে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা এখুনি আস্নান করবেন, না আর একটু বিশ্রাম করবেন ?

একটু পরে আস্নান করব ব'লে তাঁকে বললুম, আনন্দ্জী, আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই, বিশেষ ব্যস্ত আছেন কি ?

সদানন্দজী বিছানায় টপ ক'রে ব'সে প'ড়ে বললেন, আমি আপনাদের সেবক।

প্রথমে আমরা তাঁর নিজের কথা জিজ্ঞাসা করলুম। বাংলা দেশে বাড়ি অথচ বাংলা বলতে পারেন না কেন—প্রশ্ন করায় তিনি বললেন, আমি বাংলা দেশে জন্মেছি মাত্র। খুব ছেলেবেলায় আমাকে নিয়ে আমার মা বাবা হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় গিয়েছিলেন। সেখানে অসুখ হয়ে মৃত্যু হওয়ায় তাঁরা আমার দেহটা নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। একদিন 'বড়ে' নদীতে স্নান করছিলেন, এমন সময় আমার মৃতদেহটা তাঁর গায়ে এসে ঠেকল। তিনি জলের ঝাপটা দিয়ে দিয়ে সেটাকে আবার স্রোতের মধ্যে ঠেলে দিলেন বটে, কিন্তু দেহটা আশ্চর্যভাবে ঘুরে আবার তাঁর কাছে ফিরে আসতেই তিনি সেটাকে জল থেকে তুলে একেবারে গুরুর কাছে নিয়ে এসে সব খুলে বললেন। গুরু দেখে সেটাতে প্রাণসঞ্চার ক'রে মানুষ ক'রে তুললেন, সেই ছেলে হচ্ছি আমি।

গুরুর কাছে শুনেছি, প্রথম প্রথম আমার মুখ দিয়ে বাংলা বুলি বেরিয়েছিল তার পরে ক্রমে ক্রমে হিন্দী কথা বলতে আরম্ভ ক'রে দিলুম।

আমরা জিজ্ঞাসা করলুম, ওই যে 'বড়ে' বললেন, সেই 'বড়ে'টি কে ?

সদানন্দজী বললেন, 'বড়ে' হচ্ছেন এখানকার রাজা অর্থাৎ সরকার। উনি দশ-বারো বছর বয়সে রাজ্য সংসার সব ছেড়ে দিয়ে গুরুর অনুগামী হয়েছিলেন। 'বড়ে' মহারাজের পিতামহ, তিনিও এখানকার রাজা ছিলেন—তিনিও আমাদের গুরুর শিষ্য ছিলেন, তবে তিনি ছিলেন গৃহী। 'বড়ে' মহারাজ সংসারত্যাগী, উনি নানা তীর্থে ঘুরে বেড়ান, মাঝে মাঝে এখানেও এসে থাকেন। তবে গৃহ-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর কোন কালে ছিলও না, এখনও নেই। বিষয় ও রাজত্বের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকলেও এখানকার বর্তমান রাজা—যিনি ওঁর ছোট ভাইয়ের নাতি, রাজপরিবারের সকলে ও প্রজারা তাঁকে রাজার মতনই সম্মান ক'রে থাকেন। এ ছাড়া আমাদের গুরুদেবের সঙ্গে এই পরিবারের সম্পর্ক প্রায় দুশো বছরের। এখানকার রাজপরিবারের প্রায় সমস্ত স্ত্রী-পুরুষই সাধু মহারাজের শিষ্য ও শিষ্যা।

জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি বললেন, এই পরিবারের সঙ্গে আপনার গুরুর সম্বন্ধ প্রায় দুশো বছরের, কিন্তু আপনার গুরুর বয়স হয়েছে কত?

সদানন্দ মহারাজ সহাস্যে বললেন, তা আড়াই শো বছরের কিছু বেশি হবে। ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী ও আমার গুরু প্রায় একই বয়সী।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'বড়ে' মহারাজের কত বয়স হবে

—ওঁর নব্বুই পার হয়ে গিয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলুম, আপনার কত বয়স হবে আনন্দজী? ষাট পেরিয়েছে?

আনন্দজী হো-হো ক'রে হেসে উঠে বললেন, বাবুজী, আমার উম্মর আশ্‌শী পেরিয়ে গিয়েছে। বড়ে মহারাজ যখন আমাকে কুড়িয়ে পান তখন আমার আন্দাজ পাঁচ বছর বয়স ছিল। এখন 'বড়ে'র বয়স বিরানব্বুই বছর—আমার চেয়ে তিনি এগারো বছরের বড়।

সদানন্দজীর কথা শুনে বিস্ময়ে আমাদের মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ আর বাক্য:নিঃসরণ হ'ল না। [ক্রমশ]

"মহাস্থবির"

জবালা ও সত্যকাম

বেদবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা পুরাকাল হইতে এতদ্দেশে গুরুপরম্পরাক্রমে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। আজকালকার মত পূর্বে ইহা কখনও সাধারণ্যে প্রচারিত হইত না। কেন না, এ বিদ্যার নাম [ব্রহ্ম]বিদ্যা, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা আর নাই। সুতরাং এ বিদ্যার [অ]ধিকারী যে-সে লোকে হইতে পারিত না। ব্রহ্মবিৎ পুরুষের উপদেশ [ব্য]তীত অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তিও এই বিদ্যার স্বরূপ হৃদ্গত [ক]রিতে পারেন না, ছান্দোগ্য উপনিষদের নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে ইহা [জা]না যায়। 'যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ, নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ, [না]বিরতো দুশ্চরিতাৎ' ইত্যাদি বহু বেদবাক্যে ইহার আরও অনেক প্রমাণ [আ]ছে। তবে ইহার বাহ্য বা দার্শনিক রূপটি প্রতিভালভ্য সন্দেহ নাই।

ঋষিযুগের পর বিভিন্ন ধর্মাচার্যগণ বেদব্যাখ্যা করিয়াছেন; সে সব [ব্যা]খ্যা অধিকাংশই সাম্প্রদায়িক। তার পরে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের [মধ্]য কেহ কেহ বেদের চর্চা করিয়াছেন এবং এ-দেশীয় পণ্ডিতগণও [ক]রিয়াছেন ও করিতেছেন। কোন কোন বৈদেশিক পণ্ডিতের [আ]লোচনায় বেদের ঐতিহাসিক দিক্‌টিও আলোচিত হইয়াছে এবং [ই]হাতে এমন অদ্ভুত সিদ্ধান্তে তাঁহারা পৌঁছিয়াছেন যে, তাহা [স]কলেরই হাস্যকর। ছান্দোগ্য উপনিষদের জাবাল সত্যকামের [আ]খ্যান সম্বন্ধে কোনও বৈদেশিক পণ্ডিতের এইরূপ এক হাস্যকর [সিদ্ধা]ন্ত আছে। সত্যকামের মাতা জবালা সত্যকাম কর্তৃক জিজ্ঞাসিত [হই]য়া যেহেতু তাহার গোত্রপরিচয় জানেন না বলিয়াছেন এবং নিজেকে ['ব]হ্বহং চরন্তী পরিচারিণী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং ঐ সময়ে [এ]দেশে বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল না, বৈদেশিক পণ্ডিত-পুঙ্গবের [এ]ই সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত! সুধীগণের বিবেচনার জন্য নিম্নে জবালা ও [সত্য]কামের তত্ত্বটি সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে।

[অ]নেকেই জানেন, উপদেশ দিবার সময় উপদেষ্টব্য তত্ত্বের বিভিন্ন [দি]ক এক এক ব্যক্তিরূপে উল্লেখ করিয়া ঋষিগণ উপদেশ দিতেন।

আমরা ইহাকে রূপক বর্ণনা বলিয়া অভিহিত করি বটে, কিন্তু ঋষিগণের দৃষ্টিতে ইহা রূপক নহে, অনুভবসিদ্ধ সত্য। যিনি ব্রহ্মবিৎ, তিনি ত ব্রহ্মের ধর্মই লাভ করেন—'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি'। সুতরাং ব্রহ্মের যে বহু হওয়ারূপ প্রধান ধর্ম, ঋষিগণ তাহা লাভ করিয়া থাকেন। এই জন্য অধ্যাত্ম বিষয়ে আমরা যাহাকে মন, প্রাণ বা বুদ্ধির বৃত্তি বলিয়া অনুভব করি, ঋষিগণ সে সবকে সদসদ্‌ভেদে এক এক জীবন্ত দেবতা বা অসুররূপে দর্শন করেন। আমরা যাহাকে জড় আকাশ, অগ্নি, জল বলি, ঋষিদের দৃষ্টিতে তাহা ঐ ঐ বিষয়ে অভিমানী দেবতা। দৃষ্টির এরূপ পার্থক্য কেন হয়? ঋষিগণ ব্রহ্মকে জানিয়াছেন; তাই তাঁহারা সর্বত্র ব্রহ্মমহিমা বা ব্রহ্মকে দর্শন করেন। আমরা :ব্রহ্মকে জানি না; তাই আমরা ব্রহ্মের স্থূলতম রূপ বা ভূতমূর্তি পর আকারে দর্শন করি। ঋষিগণ পদদ্রষ্টা; আমরা পদার্থদ্রষ্টা। অবশ্য আমাদের জ্ঞানও কিছু পরিমাণে সারূপ্য গ্রহণ করে। কিন্তু তাহাতে বিষয়েরই প্রাধান্য থাকায় সে সারূপ্য আমাদের বোধগম্য হয় না। এই বিষয়টি স্মরণে রাখিয়া আমরা জবালা ও সত্যকামতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করিব।

'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম'—ইহা বেদের একটি মহাবাক্য। ইহার অর্থ—ইদংপদবাচ্য যাহা কিছু, সমস্তই ব্রহ্ম। ইদংপদবাচ্য কি কি? শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, যাহা কর্ণ, ত্বক্‌, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা দ্বারা গৃহীত হয়। ব্রহ্ম কাকে বলে, তাঁহার স্বরূপ কি? 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম'—ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ। অথবা ব্রহ্ম চতুষ্পাদ—প্রথম পাদে তিনি সত্যস্বরূপ, দ্বিতীয় পাদে জ্ঞানস্বরূপ, তৃতীয় পাদে অনন্তস্বরূপ, চতুর্থ পাদে ব্রহ্মস্বরূপ। ইহা বেদবাক্য বটে, কিন্তু প্রশ্ন এই যে, আমাদের কাছে জগৎ ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হয় না কেন? বৃহদারণ্যক উপনিষৎ' বলেন,—

> কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি। স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি,
> যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম কুরুতে, যৎ কর্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে।

এই যে হৃদয়মধ্যস্থ চিন্ময় পুরুষ, যিনি প্রত্যগাত্মা বা জীবাত্মা নামে

অভিহিত, ইনি কামময়। সেই ইনি যখন যেরূপ কামনা করেন, তখন সেইরূপ ক্রতুময়—যজ্ঞ বা ভাবনাময় হন, অন্তরে যেরূপ ক্রতু বা ভাবনাময় হন, বাহিরে সেইরূপ কর্ম করেন, যেমন কর্ম করেন, নিজে তদ্রূপ হইয়া তাহা প্রাপ্ত হন। কঠ উপনিষৎ বলেন,—

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাঃ
তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।

আমরা শুধু বিষয়ের দ্রষ্টা। তাই বালকসদৃশ অল্পবুদ্ধি আমরা বৈষয়িক কামনার অনুসরণ করিয়া মরণ-বন্ধনে আবদ্ধ হই। মৃত্যু-পাশে আবদ্ধ হইয়া—

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্॥—কঠ।

যেমন যেমন কর্ম ও জ্ঞান সঞ্চিত করি, সেই সেই যোনিতে, অথবা কর্ম ও জ্ঞান সঞ্চিত না হইলে স্থাবরাদি যোনিতে জন্মগ্রহণে বাধ্য হই। গীতা বলেন,—

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥

জ্ঞানীর নিত্যবৈরী এই দুষ্পূরণীয় অনলসদৃশ কামনা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে।

দেখা গেল, জগৎকে ব্রহ্মরূপে দেখিতে না পাইবার কারণ হইল জীবাত্মার কামময়তা। জীবাত্মার এই কামনা কোথা হইতে আসিল? আত্মা হইতে। ঐতরেয় উপনিষৎ বলেন,—

আত্মা বা ইদং এক এবাগ্র আসীৎ।···স ঈক্ষত
লোকান্ নু সৃজা ইতি।

সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আত্মাই ছিলেন। তিনি ঈক্ষণ বা কামনা করিলেন—লোকসকল সৃষ্টি করিব। দেখা গেল, মূল কামনা আত্মার। জীবাত্মায় তাহার অনুবর্তন চলিতেছে। কেন না, আত্মাই ত জীবাত্মা হইয়াছেন—'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ'।

কামনার স্বরূপ কি? বহির্মুখী রজঃশক্তি। সে জীবের ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণে অধিষ্ঠানপূর্বক জীবকে কর্মপরায়ণ করে এবং কর্মোচিত লোক-লোকান্তর লাভ করায়। সাংখ্যমতে কামনা প্রকৃতির অন্তর্গত। তাই বহু শাস্ত্রগ্রন্থে কামনার নিগ্রহ বা কামনাকে ধ্বংস ও ত্যাগ করার উপদেশ দেখা যায়। কিন্তু ব্রহ্মবাদে প্রকৃতি ও পুরুষকে পৃথক্ করিয়া দেখা হয় না। প্রকৃতি ও পুরুষকে একসঙ্গে লইয়াই ব্রহ্ম বা আত্মা বলা হয়। সাংখ্যমতে কামনা ত্যাজ্য; কিন্তু ব্রহ্মবাদে কামনা ব্রহ্মরূপে উপাস্য। মহর্ষি নারদকে সনৎকুমার আশা বা কামনাকে ব্রহ্মরূপে উপাসনার ফল বলিতেছেন,—

য আশাং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে আশয়া অস্য সর্বে কামাঃ
সমৃধ্যন্তি অমোঘা হ অস্য আশিষো ভবন্তি···

ইহার ভাষ্যে পূজ্যপাদ আচার্য শঙ্কর বলেন,—

অপ্রাপ্তবস্ত্বাকাঙ্ক্ষা আশা তৃষ্ণা কাম ইতি···

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ব্রহ্মবাদে কোন শক্তিকেই ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ করিয়া দেখা হয় না। সমুদ্রের একটি তরঙ্গের ভিতরে ও বাহিরে যেমন সমুদ্রের জল ছাড়া অন্য কিছু দেখা যায় না, ব্রহ্মসমুদ্রে যে জগৎ ও জীব-তরঙ্গ উঠিয়াছে, তাহাতেও তেমনই ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি ভিন্ন আর কিছু কল্পনা করা বৃথা। সুতরাং ব্রহ্মবাদিগণের নিকট তিনি জগৎ ও জীব-জননী কামময়ী মহাদেবী; তিনি উপাস্যা। ব্রহ্ম কামনা করিয়া জগৎ ও জীবরূপে বহু হইয়াছেন, ব্রহ্মের প্রতিরূপ বা সম্মোহিত-ব্রহ্ম জীবও সেই কামনার অনুসরণে নিজেকে বহু করিতেছে। সুতরাং কামনা অতীব পবিত্র ও পূজনীয়া ব্রহ্মশক্তি। ইনি সমগ্র জীবকে বক্ষে ধারণ করিয়া বহুত্ব ভোগদ্বারা পুষ্ট করিয়া তুলিতেছেন। কেন? তাহাকে সত্যকাম পুত্ররূপে লাভ করিবেন বলিয়া। জীবের যাবতীয় কর্মশক্তির ইনি উৎস-স্বরূপ বা ইহার প্রেরণায় জীবের যাবতীয় কর্মশক্তি উদ্বুদ্ধ হয়, তাই ঋষি ইহার নাম দিয়াছেন 'জবালা'—জবাং শক্তিং লাতি দদাতীতি জবালা। জবালা যত দিন বিষয়াভিমুখী থাকেন, তত দিন বহুচারিণী এবং শাস্ত্রে

নিন্দিতা। আমাদের বিষয়কামনা ত বহুরূপেই বিচরণ করিতেছে এবং তাহার ফলে আমরা বহু যোনিতে জন্ম লাভ করিতেছি। পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যুর হেতুভূতা বলিয়া ইনি নিন্দিতা।

জবালা বহুচারিণী ও নিন্দিতা; কেন না, ইঁহাকে আমরা এখনও মা বলিয়া চিনিতে পারি নাই। রাখাল বালক যেমন গরুর পালকে যষ্টি-তাড়না করিয়া ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে পরিচালিত করে, ইনিও আমাদিগকে তেমনই একটা অনাত্ম শক্তিরূপে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছেন এবং তদ্দ্বারা আমাদের ন্যায় ইনিও পরিচারিণী হইয়া বহুত্বের সেবা করিতেছেন। একটু প্রণিধান করিলেই সুধী পাঠক ইহা বুঝিবেন। কখন্ আমরা জবালাকে মা বলিয়া চিনিব? কীট-পতঙ্গ হইতে মনুষ্য পর্যন্ত অনন্ত জীবে পরিব্যাপ্ত ইঁহার বিরাট্ মূর্তিতে যখন আমাদের জ্ঞানদৃষ্টি নিবদ্ধ হইবে। শুধু তখনই এই জবালাকে আমরা জননীরূপে দেখিয়া, জবালার সত্যকাম পুত্ররূপে প্রসূত হইব। তৎপূর্বে ইনি একটা অনাত্ম শক্তিরূপে আমাদিগকে তাড়না করিতে করিতে, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও বহুত্বের সেবা করিবেন।

পূর্বে দেখা গিয়াছে, চতুষ্পাদ ব্রহ্মের প্রথম পাদ সত্যস্বরূপ। অনন্ত জীবসমষ্টিতে পরিব্যাপ্ত জবালার বিরাট্ মূর্তিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ হইলে, তাঁহার বহির্মুখিতা নিরুদ্ধ হইয়া, ব্রহ্মের সত্যস্বরূপ প্রথম পাদে তিনি গতিশীল হন। জবালা যে বিষয়ে গতিশীল হইবেন, তাঁহার পুত্রও সেই বস্তুতে কামময় হইবে। সুতরাং জবালা ব্রহ্মের সত্যপাদে গতিশীল হইলে তাঁহার পুত্র আমরাও সত্যকাম হইব। কামনাকে মা বলিয়া না চিনিয়া এত দিন আমি বিষয়কামী ছিলাম; এখন মা বলিয়া চিনিয়া সত্যকাম হইলাম।

তৃতীয় অনুচ্ছেদে ঋষিগণের দৃষ্টি সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, এখানে একবার পাঠক তাহা স্মরণ করুন। তাহাতে বুঝা যাইবে, ঋষিগণের নিকট সত্যকাম যেমন ব্রহ্মবিদ্যালাভার্থ গুরুগৃহগমনাভিলাষী জীবন্ত পুরুষ, জবালাও তেমনি সত্য সত্যই তাহার জীবন্ত জননী। তাই জবালার নিকট সত্যকাম জিজ্ঞাসা করিতেছে,—

ব্রহ্মচর্য্যং ভবতি! বিবৎস্যামি, কিং গোত্রো নু অহমস্মি।

জবালাও বলিতেছেন,—

নাহং এতদ্‌বেদ তাত! যদ্‌গোত্রঃ ত্বম্‌ অসি। বহু অহং
চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বাম্‌ অলভে, সা অহং
এতৎ ন বেদ যদ্‌গোত্রঃ ত্বম্‌ অসি। জবালা তু
নাম অহম্‌ অস্মি, সত্যকামো নাম ত্বম্‌ অসি।

বাবা! তোমার গোত্র বা কুলপরিচয় ত আমি জানি না। আমি পরিচারিণী হইয়া বহুত্বে বিচরণপূর্বক যৌবনে তোমাকে লাভ করিয়াছি। এই মাত্র জানি, আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম।

গো শব্দের একটি অর্থ ইন্দ্রিয়। যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়জ অনাত্মজ্ঞান হইতে পরিত্রাণ করে, তার নাম গোত্রজ্ঞান। ইহার অর্থ কুলশক্তি বা কুলদেবতা। প্রতি জীবের মেরুদণ্ডমধ্যে বর্তমান থাকিয়া এই দেবী আত্মশক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। ইনি উদ্বুদ্ধ না হইলে মনুষ্য অনাত্মজ্ঞান হইতে মুক্ত হইতে পারে না। সত্যকাম জবালাকে মা বলিয়া চিনিয়াছে, ইহার অর্থ—তাহার হৃদয়স্থ কামশক্তি বা 'হার্দ্দ' সত্যবোধ উজ্জীবিত হইয়াছে; কিন্তু গোত্র, কুল বা আত্মশক্তি এখনও জাগ্রত হয় নাই। তাই কামময়ী জবালা বলিলেন—আমি তোমার গোত্র জানি না। আত্মশক্তি বা ব্রহ্মশক্তিকে জানিবার জন্যই গুরুগৃহে যাইতে হয়।

সেই সুদূর অতীতে—বৈদিক যুগে ব্রহ্মবিৎ ঋষির সত্যদৃষ্টিতে আমাদের দেশে যে সত্যকাম ও জবালা' আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতিরূপ যে এখনও আমাদের মধ্যে বর্তমান, এবং যে পর্যন্ত ব্রহ্মের জগৎলীলা চলিবে, সে পর্যন্ত বর্তমান থাকিবে, আশা করি, সুধী পাঠক তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

হ্যামলেট, ডেনমার্কের কুমার

[শেক্সপীয়র]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

ক্লডিয়স্	ডেনমার্কের রাজা।
হ্যামলেট	ভূতপূর্ব রাজার পুত্র, বর্তমান রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র
পলোনিয়স	বিশিষ্ট রাজসভাসদ।
হোরেসিয়ো	হ্যামলেটের বন্ধু।
লেয়ার্টিস	পলোনিয়সের পুত্র।
ভল্‌টিম্যাণ্ড কর্নিলিয়স রোজেন্‌ক্রান্‌জ্ গিলডেন্‌স্টার্ন অস্রিক্	সভাসদগণ।
জনৈক ভদ্রলোক	
একজন পাদরি	
মার্সেলস্ বার্নার্ডো ফ্রান্‌সিস্কো	পদস্থ সৈনিক।
রেনাল্ডো	পলোনিয়সের ভৃত্য।
অভিনেতাগণ	
দুইজন বিদূষক, খনক।	
ফর্টিন্‌ব্রাস	নরোয়ের রাজপুত্র।
সৈন্যাধ্যক্ষ, ইংরাজ রাজদূতগণ।	
গার্ট্রুড্	ডেনমার্কের রাণী ও হ্যামলেটের মাতা।
ওফেলিয়া	পলোনিয়সের কন্যা।

লর্ডগণ, সৈন্যগণ, নাবিকগণ, দূত ও অপরাপর পরিচারকগণ।

হ্যামলেটের পিতার প্রেতাত্মা।

স্থান :—ডেনমার্ক

প্রথম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

দুর্গের সম্মুখস্থ চত্বর

ফ্রান্‌সিস্কো পাহারা দিতেছে। বার্নার্ডোর প্রবেশ

বার্নার্ডো। কে ওখানে ?

ফ্রান্‌। তাই বটে ! আমাকে জবাব দাও।
খাড়া রও, জানাও, কে তুমি।

বার্না। দীর্ঘজীবী হোন্‌ মহারাজ।

ফ্রান্‌। বার্নার্ডো ?

বার্না। সেই।

ফ্রান্‌। একেবারে ঘড়ি ধ'রে এসেছ যে ঠিক।

বার্না। বারোটা বাজিল এই।
ফ্রান্‌সিস্কো, শুতে যাও তুমি।

ফ্রান্‌। বহু ধন্যবাদ। কী দারুণ ঠাণ্ডা,
ক্লান্তিভারে নুয়ে পড়ে বুক।

বার্না। পাহারায় ব্যাঘাত ঘটে নি কিছু ?

ফ্রান্‌। মূষিকটি নড়ে নি কোথাও।

বার্না। বেশ ; শুভরাত্রি। মোর প্রহরার সঙ্গী
হোরেসিয়ো, মার্সেলসে দেখ যদি পথে
ব'লে দিও আসে যেন দ্রুত।

ফ্রান্‌। মনে হয় তারাই এসেছে।
খাড়া রও ; কে ওখানে ?

[হোরেসিয়ো ও মার্সেলসের প্রবেশ।

হোরে। দেশের সুহৃদ্‌।

মার্সে। ডেনমার্কের রাজভক্ত প্রজা।

ফ্রান্‌। রাত্রি শুভ হোক উভয়ের।

মার্সে। তা হ'লে বিদায় বন্ধু ;
কে তোমার বদ্‌লি এখন ?
ফ্রান্। মোর স্থানে এসেছে বার্নার্ডো।
শুভরাত্রি হউক সবার। [প্রস্থান]
মার্সে। কোথা হে! বার্নার্ডো!
বার্না। এই যে এখানে ;
কি, হোরেসিয়ো উপস্থিত নাকি ?
হোরে। কতকটা বটে।
বার্না। এস এস হোরেসিয়ে
বন্ধু মার্সেলস্, তুমিও স্বাগত।
মার্সে। কি হে, আজ রাতে আবার কি দেখা গেল সেটি ?
বার্না। আমি তো দেখি নি কিছু।
মার্সে। হোরেসিয়ো বলে,
ওটা শুধু আমাদের মনের কল্পনা।
যে ভীষণ দৃশ্য মোরা দেখিনু দুবার
তাহাতে বিশ্বাস নাই তাঁর।
তাই বহু অনুরোধ করি'
আজ রাত্রে পাহারায় আনিনু তাহারে ;
যদি সেই মূর্তি হেথা আসে পুনর্বার,
তার সাথে কথা ক'য়ে
মোদের চক্ষুর সাক্ষী হবেন উনিও।
হোরে। থাক্ থাক্, আর সে দেবে না দেখা।
বার্না। ব'স কিছুক্ষণ ;
দুই রাত্রি যা দেখিনু তাহারি কাহিনী
পুনরায় ঢালি তব নিরুদ্ধ শ্রবণে ;
দেখি, ফল হয় কি না হয় !
হোরে। বেশ, না হয় বসিনু ;
বার্নার্ডো বলিয়া যাক, শুনিব আমরা।

বার্না। কাল রাত্রে,
ওই যে তারাটি দেখ ধ্রুবের পশ্চিমে,
ওই তারা উঠে এল যবে
আকাশের ঠিক ওইখানে,
যেখানে জ্বলিছে আজও,
আমি আর মার্সেলস্,
ঢং ক'রে একটা বাজিতে—
[প্রেতের প্রবেশ]
মার্সে। চুপ চুপ, দেখ দেখ এসেছে আবার !
বার্না। সেই মূর্তি ঠিক, যে রাজারে জানি মৃত
ঠিক তারই মত।
মার্সে। তুমি তো বিদ্বান হোরেসিয়ো,
কথা কও ওর সাথে।
বার্না। ঠিক কি রাজার মত নয় ?
ভালো ক'রে দেখ হোরেসিয়ো।
হোরে। একেবারে ঠিক। আতঙ্কে বিস্ময়ে
বিহ্বল বিদীর্ণ মোর হৃদি।
বার্না। ও চাহিছে—মোরা কথা কই।
মার্সে। প্রশ্ন কর হোরেসিয়ো।
হোরে। কে তুমি, এমন ভাবে নিত্য বিড়ম্বিত কর
রজনীর এই মহাক্ষণ ? কোন্ অধিকারে পুনঃ
ধরেছ ও বরবপু, ওই যোদ্ধবেশ,
যে বেশে ডেনমার্কপতি, মৃত সমাহিত,
করিতেন সমরাভিযান ?
মার্সে। বিরক্ত হয়েছে।
বার্না। দেখ, চ'লে যায় !
হোরে। দাঁড়াও, কথা কও, কথা কও,
নির্বন্ধ আমার—কথা কও ! [প্রেতের প্রস্থান]

মার্সে। চ'লে গেল, দেবে না উত্তর।
বার্না। কি হ'ল গো হোরেসিয়ো ?
কাঁপিতেছ পাংশুমুখে।
নহে কি ও কল্পনার অতিরিক্ত কিছু ?
কি তোমার অনুমান ?
হোরে। কহি ঈশ্বরের নামে,
স্বচক্ষুর সত্য সাক্ষ্য না পেলে এভাবে
বিশ্বাস হ'ত না কভু মোর।
মার্সে। ঠিক কি রাজার মতো নয় ?
হোরে। যেমন তোমার মতো তুমি।
নরোয়েপতির সনে দ্বৈরথ সমরে
ঠিক ওই বর্ম ছিল দেহে ;
অমনি ভ্রূকুটি দেখেছিনু
ক্রোধিত বিতর্ককালে
পোল সৈন্যে হানিলা যখন।
এ বড় অদ্ভুত !
মার্সে। এই ভাবে পূর্বে দুইবার
ঠিক এই নিস্তব্ধ নিশীথে
চ'লে গেল যোদ্ধবেশে বীর পদক্ষেপে
মোদের প্রহরা পার হয়ে।
হোরে। কোন্ চিন্তাসূত্র ধরি' মিলিবে প্রকৃত তথ্য
নাহি জানি আমি। মোটামুটি মনে হয়,—
এ রাষ্ট্রে আসিছে কোন অদ্ভুত সংকট ;
তাহারই সূচনা ইহা।
রোমের গৌরব-রবি তখনো উজ্জ্বল ;
পরাক্রান্ত জুলিয়স্ হারাইবে প্রাণ,
তারি সূচনায়—

সহসা সমাধি ছাড়ি যত শবদল
আর্তকণ্ঠে অস্ফুট চীৎকারে
পথে পথে লাগিল ফিরিতে!
বহ্নিপুচ্ছ তারাদল, রক্তঝরা হিমকণা,
কালোচিহ্নে কলঙ্কিত তপনমণ্ডল
রাহুগ্রস্ত মুমূর্ষু চন্দ্রমা,
এই সব দুর্লক্ষণ দুর্দিন-সূচক
ভবিষ্যের অগ্রদূত,
ভয়াবহ নাটকের ভীষণ ভূমিকা,
দেশে দেশে লোকে লোকে
দেখা দেয় আকাশ ও ধরণীর পটে।
দেখ, দেখ, আবার সে এসেছে ওখানে!

[প্রেতের পুনঃপ্রবেশ]

সম্মুখে দাঁড়ায়ে ওরে বাধা দিব আমি,
না হয় বিনষ্ট হব তাহার প্রভাবে।
দাঁড়াও অলীক মায়া! প্রকাশের কোন শব্দ,
অথবা কণ্ঠের ভাষা যদি থাকে তব,
কথা কও।
হেন কোন কার্য যদি চাহ করাইতে
যে কার্যে তোমার শান্তি আমার কল্যাণ,
কথা কও তবে।
দেশের দুর্ভাগ্য যদি জানা থাকে কিছু,
পূর্বাহ্নে জানিলে যাহা পারি এড়াইতে,
কথা ক'য়ে বল।
কিংবা যদি তাই হয়,—
জীবনে পরস্ব হরি' যা কিছু সঞ্চিলে
ধরাগর্ভে সে সম্পদ রাখিয়া গোপনে

কৃপণ যক্ষের মতো প্রেতরূপে আজ
ফিরে ফিরে আস মর্ত্যভূমে,
তবে তাই কহ প্রকাশিয়া।
দাঁড়াও! কথা কও!
মার্সেলস্, থামাও উহারে!

মার্সে। করিব কি কুঠার-আঘাত?
হোরে। না দাঁড়ালে তাই কর।
বার্না। এই যে এখানে।
হোরে। এইখানে বুঝি?
মার্সে। চ'লে গেছে।

[প্রেতের প্রস্থান]

অস্ত্রভয় দেখাইয়ে অমর্যাদা করিয়াছি
রাজবেশী ছায়ামূরতির।
বায়ুসম অচ্ছেদ্য ও তনু,
অস্ত্রাঘাত নিফল বিদ্রূপ।

বার্না। কথা কহিবারে যবে হয়েছে উদ্যত
ডাকিয়া উঠিল দূরে প্রভাতী কুক্কুট।

হোরে। তখনি উঠিল চমকিয়া অপরাধীসম
ভয় পেয়ে সেই তীব্র ডাকে।
শুনিয়াছি, কুক্কুটেরা উচ্চে কণ্ঠ তুলি'
তূর্যরবে জাগাইয়া দেয় দিনদেবে
বৈতালিক সম; শুনি সেই ধ্বনি,
জলে-স্থলে অনলে অনিলে
যেখানে ভ্রমিছে যত পাপবুদ্ধি অপদেবতারা
ত্বরিত লুকায় প্রেতলোকে।
সে কথা যে সত্য আজ প্রত্যক্ষ করিনু।

মার্সে। শুনিয়া কুক্কুটধ্বনি গেল সে মিলায়ে।

কেহ কেহ কহে,—
বিশ্বত্রাণ প্রভুর পবিত্র জন্মোৎসবে
সারারাত্রি ডাকে ওই বৈতালিক পাখী ;
তাই কোন ভূত প্রেত নাহি বাহিরায়,
ডাকিনী যোগিনী ভুলে মায়া,
গ্রহগণ বক্রদৃষ্টি না পারে হানিতে,
এমনই পবিত্র আর মহান সেদিন।

হোরে। আমিও শুনেছি তাই,
কিছুটা বিশ্বাসও করি।
কিন্তু, চেয়ে দেখ, রক্তবাসপরিহিতা উষা
ধীরে উঠে আসে ওই
হিমসিক্ত পূর্বাশার সমুচ্চ শিখরে।
সাঙ্গ হ'ল প্রহরা মোদের। মোর ইচ্ছা,—
আজি রাত্রে যা দেখিনু
হ্যামলেটে জানাই সকলি।
আমার সন্দেহ নাই,
যদিও ও ছায়ামূর্তি
র'য়ে গেল বাক্যহীন মোদের সম্মুখে
হ্যামলেটের সাথে কবে কথা।
কি বল তোমরা ?
তাঁর প্রতি প্রীতি আর কর্তব্যের বশে
সব কথা জানানোই ভাল।

মার্সে। চল সবে তাই করি ;
আমি জানি আজি এ প্রভাতে
কোথায় সাক্ষাৎ পাব তাঁর। [প্রস্থান]

[ক্রমশ]

অনুবাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ফেরারী

আকস্মিক হ'লেও অপ্রত্যাশিত নয়।

পাড়াগাঁয়ে ঘোপে-ঘাপে এমনি ঘটনাই মধ্যে মধ্যে ঘটে।

গোপী একবার মাত্র দেখেছিল উদ্যত ছুরিখানা। ছুরি নয়, বোধ হয় ছোট একখানা রামদা। এখন দুর্বল মস্তিষ্কে ঠিক ভাবতে পারছে না। সে বৈঠাটা বাগিয়ে ঝটকা বাড়ি ছেড়েছিল ডাকাতটাকে লক্ষ্য ক'রে। তরুণী যাত্রীটির চিৎকার সে সইতে পারে নি। এখন সে বলতে পারে না তার প্রতিরোধ সফল হয়েছে কি না!

সে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় এতক্ষণ নদীর কাদাচরে প'ড়ে ছিল। আকাশে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ যেন শয়তানের মত উঁকিঝুঁকি মারছে। উন্মত্ত গর্জনে ফুঁসছে বর্ষার কালিগঙ্গা—মেঘে নদীতে যেন একই তুলি বুলোনো, নির্জন পাড়ে পাড়ে যেন পাঠশালার দুষ্টু ছাত্রদের দোয়াত-ওলটানো কালি। জোয়ার আসার হয়তো বেশি দেরি নেই। এলে, নিশ্চয় তাকে [illegible]সিয়ে নিয়ে যাবে [illegible] গোপীর আর রক্ষা নেই।

সে উ[illegible]ত চেষ্টা করে।

গোপী জীবনে কখনও খুন-খারাপি করে নি, কোনও পেশাদার দলের সঙ্গেও সে সংশ্লিষ্ট নয়, তবু সে যদি ফের সন্দিগ্ধ হয়ে হাজতে যায়! প্রতিরোধ করতে গিয়েও আবার সাজে আসামী! সে পুলিসের কারসাজিতে এই তো ছ মাস খেটে এল হাজত। তার কলজে শুকিয়ে যায়। বিচারের নামে আবার প্রহসন! ঠিক প্রহসনও বলা চলে না। মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি—খামখেয়ালীপনা।

হাকিম বললেন, গোপী, ওরফে গোপিকাবিলাস দাস খালাস।

কিন্তু গোপীর যে সর্বনাশ হয়েছে এই কটা মাসে, তার খেসারৎ দেবে কে? ওর হাল গেছে, জোয়াল গেছে—তছনছ হয়ে ভেঙে গেছে নিম্নবিত্ত এক অতি সামান্য কৃষকের জীবন। আরও একটা বৃহৎ ক্ষতি হয়েছে, তা তো কারুর কাছে বলা চলে না। ওর সাত বছরের মা-মরা ছেলে জীবন কি বেঁচে আছে? না, অভাব-অভিযোগের বন্যায় ভেসে চ'লে গেছে একদিকে?

খালাস পেয়েও গোপীর ইচ্ছা করে না কাঠগড়া ছাড়তে।

হুজুর!

কিছু বলবে নাকি? তুমি নির্দোষ, খালাস পেয়েছ। কিছু বক্তব্য আছে নাকি তোমার?

না।

হুজুর সানন্দে রায় লিখে চলেন। আর নিরানন্দ গোপী সমস্ত এজলাসটাকে অবাক ক'রে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

একদা গোপী এক খেয়ালী বড়লোকের বাড়ি গিয়েছিল। ধনী ব্যক্তিটি শুধু খেয়ালীই নয়, শৌখিনও বটে। অজস্র পাখি পুষেছে খাঁচায় খাঁচায়। কিচিরমিচির হুটোপুটির অন্ত নেই। বলতে হ'লে একেই ঠিক চিড়িয়াখানা বলা উচিত। কিছুক্ষণ দাঁড়ালে কান ও চোখ টাটিয়ে ওঠে।

কিন্তু ব্যতিক্রম একটি মাত্র কাকাতুয়া। সে স্থির হয়ে চোখ দুটো বুজে ব'সে আছে একটা কৃত্রিম ডালে। তার স্তব্ধ বিষণ্ণ মূর্তির দিকে বেশিক্ষণ চাওয়া যায় না।

গোপী তখন উপস্থিত। হঠাৎ ধনী ব্যক্তি হুকুম পাঠাল, মা কাশী যাচ্ছে, পাখিগুলো সব মুক্ত ক'রে দাও।

একে একে সমস্ত পাখি উড়ে যায়। কেবল চোখ মেলে না বুড়ো কাকাতুয়াটা।

কোন্ পাহাড়ে, কত দূরান্তরে ওর একটি নিজস্ব নীড় ছিল, ছিল শাবক ও স্ত্রী-বিহঙ্গিনী তা কেউ জানে না।

ওকে খুঁচিয়ে বার করতে চেষ্টা করে সবাই। সে এক দৃশ্য!

গোপী এসে এজলাসের বাইরে দাঁড়ায় জমাদারের হেঁচকা টানে।

সে এখন পর্যন্ত যেন মানে বুঝে উঠতে পারে নি এ নিষ্কৃতির।

পরদিন দুপুরবেলা বাড়ি ফিরে গোপী দেখে যে, আগাছার বাগান হয়েছে উঠোনটা। পায়রার খোপটা খালি। খড়ের গাদাটা নির্মূল

করেছে দেশের যত গরু-বাছুরে মিলে। ঘরের ঝাঁপটা পর্যন্ত নিয়েছে চোরে।

গোপী কারুকে ডাকতে সাহস পায় না।

একটি ক্ষুধায়-কাতর ঘুমে-নেতিয়ে-পড়া বালকের স্মৃতি ওর মর্মকোষে কেবলই দোলা দেয়। বাগানে, ঘরে, প্রাঙ্গণে যেন জীবন্ত ছায়া ঘুরে বেড়ায় ঘুরঘুর ক'রে। কত আবদার, কত গলা জড়িয়ে বায়না—সে কি ভোলা যায় কখনও! এক্ষুনি হয়তো গলা শুনলে ছুটে আসবে।

তবুও ডাকতে সাহস পায় না।

ভাবে, গাঁয়ের কারুর সঙ্গে এখন দেখা না হওয়াই মঙ্গল।

সে এসে মনসাতলার পাশে একটা নির্জন স্থানে বসে।

কি রে গোপী, খালাস পেলি কবে বাবা? একেবারে দেখি খুনী-আসামীর মতই দেখাচ্ছে!

দাড়ি-গোঁফে সত্যই জঙ্গলাকীর্ণ হয়েছে মুখটা গোপীর। তা ব'লে তাকে খুনী-আসামীর মত দেখাবে কেন? যদিও বা দেখায় তার জন্য দায়ী কে?

বৃদ্ধ মহেশ্বর বলেন, দারোগাটা পরম পাজি। আমি তাকে ডেকে, নেমন্তন্ন ক'রে ঘি-ভাত খাইয়ে কত ক'রে বললাম। তবু শুনলে না, একেবারে নেমকহারাম, নেমকহারাম বেটা! যাকগে ও-কথা। আমি তোর কাছে শুধু ঘাসের জমি দশ কাঠা ন্যায্য বহায় দিয়ে কিনতে চাই, ঐক নাটমন্দিরের সুমুখটা।

গোপী কোনও উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না।

তার বদলে আমি তোকে কি কি দিতে চাই শোন্—বীজ ধান, নতুন গরু কেনার টাকা, যদি ফের সংসারধম্মো করতে চাস—। বৃদ্ধ এগিয়ে এসে গলার স্বর আর একটু মোলায়েম ক'রে বলেন, তুই চিন্তা ক'রে দেখ্, জমিটুকু নইলে নাটমন্দিরটা খোলতাই হয় না। একটা কেত্তন কি প্রহর হ'লে তোরাই তো নাচবি, কুঁদবি,—আমাদের বাড়ির ছেলেরা সব সাহেব ব'নে গেছে।

গোপী দু হাঁটুর ভিতর থেকে মাথা তোলে না।

বৃদ্ধের পায়ে কাঁঠাল-কাঠের খড়ম, পরনে দুগ্ধশুভ্র খদ্দর। একজন এসে হাত জোড় ক'রে দাঁড়ায়। তাকে ইঙ্গিতে থামিয়ে বৃদ্ধ আবার বলতে শুরু করেন, তোর ছেলেটাকে কত ক'রে বুঝিয়ে বললাম, কেবল গরু দুটো নিয়ে একটু মাঠে যাবি, আর পেট ভ'রে ভাত খাবি, বাপকে তোর খালাস ক'রে আনলাম ব'লে। দুদিন একটু মাঠে গেল কি গেল না, কারুকে কিচ্ছু না ব'লে-ক'য়েই পিটটান। আর তার পাত্তাই পেলাম না আমি।

যে হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল, সে মাথাটা নেড়ে অনুমোদন করে বৃদ্ধের বক্তব্য।

গোপী শুধু উঠে এক দিকে চ'লে যায়।

যে ভাল ক'রে ধুতিখানা পর্যন্ত পরতে শেখে নি, সে একা একা গেল কোথায়? এ গাঁয়ে তো নিশ্চয়ই সে নেই। তবে কি শহরে গেছে, গেছে তার পিতার খোঁজে? শহর পর্যন্ত সে কি পৌঁছুতে পেরেছে এত নদী খাল পেরিয়ে? একটু মেঘলা হ'লে যে ঘরের আশ্রয় ত্যাগ করে নি, রয়েছে গোপীর গা ঘেঁষে, সে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে নিরালম্ব আকাশের তলে?

এমন কোনও আত্মীয় বন্ধু বান্ধব নেই, যেখানে গেলে গোপী ওর সন্ধান পাবে। তবু ওকে খুঁজে বার করতেই হবে। জীবন নইলে এ বিশ্ব-সংসার আজ অন্ধকার। মণিহারা ফণীর মত গুমরে ওঠে গোপী।

সে একখানা নৌকা মাসিক ভাড়ায় সংগ্রহ করে। হাটে হাটে গঞ্জে গঞ্জে সে অনুসন্ধান ক'রে ফিরবে। কেরায়া বাইবে আর জিজ্ঞাসা করবে, তার জীবনধনকে কেউ কি কোথায়ও দেখেছে? এমনি নাক, এমনি চোখ—এমনি তার গড়ন। জগতে যত অপূর্ব ভঙ্গিমা আছে সব তার চলনে।

কেউ কি কিশোর-বয়সী কার্তিককে দেখেছ স্মিতমুখ তপঃক্লিষ্ট

পিতার কাছে—কল্পনা করতে পার কি গৌরীহীনা সংসারে ওই শিশুই একমাত্র অবলম্বন ?

কৃষক গোপী মাঝি হয়েছে—ওপারে যাবে এই আশা।

কিন্তু মেঘের ডম্বরু বেজে ওঠে। কালিগঙ্গার সে কি ফোঁসানি! নেচে নেচে মেঘকে ছোবল!

মাঝি, কেরায়া যাবে ?

এমন সময় যাত্রী! একা নয়, আবার সঙ্গে একটি তরুণী। বর্ষণক্লান্ত মুখশ্রী।

কোথায় যাবে ?

ওপারে, কার্তিকপুর।

সাহস তো কম নয় মশাইর। দেখছ না গাঙের চেহারা!

ডুবে মরলে আমি মরব—তুমি যেতে পারবে কি না তাই বল ? কত ভাড়া চাও ?

তুমি বাবু মরতে চাইলেই তো আমি আর টাকার লোভে উপলক্ষ্য হতে পারি নে। সঙ্গে আবার উনি রয়েছেন।

শ্রাবণের মেঘলা সন্ধ্যা। নির্জন নদীর পার।

স্ত্রীলোকটির গা-ভরা গয়না। পুরুষটির হাতেও দুটো আংটি। ঝড়ের চেয়েও অন্য একটা আশঙ্কায় গোপী মুহ্যমান হয়ে পড়ে।

এখনও পথ চেনা যায়, তোমরা বাড়ি ফিরে যাও। ঠিকানা ব'লে যাও, ভোর-রাত্তিরে আমিই ডেকে আনব।

তাই চল গো, তাই চল। বাবার কথা শুনলে না, মার অনুরোধ রাখলে না—এখন মাঝির উপদেশ অমান্য ক'রো না। বুড়ো মানুষ, যা বলছে তা ভালর জন্যেই বলছে। পদে পদে বাধা, আমার আর এক পাও এগুতে ভরসা হয় না।

তোমার ইচ্ছে হয় তুমি একা একা ফিরে যাও—আমি আর চণ্ডালের বাড়ি জলস্পর্শ করব না।

ছিঃ ছিঃ, কি যে তুমি বলছ!—স্ত্রীলোকটি লজ্জায় অধোবদন হয়ে থাকে।

কালো মেঘ আরও কালো হয়ে আসে। যে কোনও মুহূর্তে জল নামলেই নামতে পারে। ও-পারের আর চিহ্ন পর্যন্ত নেই। মাঝে মাঝে ঝিলমিল ক'রে ওঠে এক ফালি বিদ্যুতের ছুরি।

এখনও সময় আছে, আর দেরি ক'রো না গো। আমি পথ চিনি, তোমায় নিয়ে যেতে পারব কলমী-দীঘি বাঁয়ে ফেলে।

স্বামী হেসে ওঠে। বলে, তুমি আমাকে ঠিক চেনো নি এখনও।

দেখছি মশাইর ধনুক-ভাঙা পণ। কিন্তু—

কিন্তু নয় মাঝি, বড্ড অপমান হয়েছি। তুমি ফেরায় যাবে কি না বল? কত টাকা চাও?

এবার স্ত্রীলোকটি মুখ খোলে। বলে, আমি আর না ব'লে পারলাম না। এত যার টাকার গরম, সে আবার বরপণের বাকি কটা টাকার জন্যে এমনও যা-তা কাণ্ড করে! ছি-ছি, তুমি না অবস্থাপন্ন ভাল চাকুরে!

গোপী বলে, ভীষ্ম হ'লেও কথা ছিল—রাজা দুর্যোধনও নও বটে—তবে আর শ্বশুরবাড়ি ফিরে যেতে দোষ কি! উনি এত ক'রে বলছেন। আর আমি তো এখন কিছুতেই নাও খুলব না।—সে নৌকাটা একটা ছোট খালে এনে ভেড়ায়।

বর্ষা নামে।

একটা কিছু অশুভ দেখেই এমন হয়। আমার বিয়ে দিয়ে বাবা সর্বস্বান্ত হয়েছেন, তবু তোমার মন উঠল না। চল চল, আমিও আর বাড়ি ফিরব না। ঈশ্বর, এই যাত্রাই যেন আমার শেষ যাত্রা হয়।

তরুণী গিয়ে নায়ে ওঠে। গোপী আর কিছু বলতে পারে না।

দূরে নদীগর্ভে শত সহস্র নাগিনীর তর্জন শোনা যায়।

ওরা অনেকক্ষণ চুপচাপ ব'সে থাকে। গোপী নৌকার দু মাথার দুখানা ঝাঁপ ভাল ক'রে টেনে দিয়েছে। অনেকটা খোপের মত হয়েছে এখন। বর্ষা এবং ফোঁসানি চলছে সবিক্রমে।

ক্লান্ত উপোসী গোপীর ঘুম পায়। সে আর ব'সে থাকতে পারছে

না যেন। চোখ বুজে আসছে বার বার। কিন্তু পা মেলতে সঙ্কোচ হচ্ছে। একে এক-বৈঠার ডিঙি, তাতে অবাঞ্ছিত যাত্রী। প্রথম কেরায়াটা গোপীর জুটেছে ভাল!

উজ্জ্বল লম্পটাও গোপীর মত ঝিমিয়ে এল। অস্বস্তি, তিক্ততা, ক্ষোভে যেন ছৈয়ের ভিতর সময় স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। বাইরে কিন্তু তারই গতি যেন উল্কার মত। শব্দে তার বুক শুকিয়ে আসে।

মাঝরাত্রে হঠাৎ নৌকাটা টলমল ক'রে ওঠে। অনেকগুলো মানুষের চাপা আওয়াজ! গোপীকে বেঁধে ফেলে একটা গামছা দিয়ে। মাথায় সজোরে একটা আঘাত। তারপর জলে একটা শব্দ।···

উঃ, খুন করলে গো—খুন—

চুপ, চুপ।

থাম্, থাম্।

কে, কে—? কে বাবা তোমরা?

পুরুষ যাত্রীটির গলা আর শোনা যায় না।

গোপী এর ভিতরেই একবার রুখে উঠেছিল, কিন্তু তার সহজাত সেই তীব্র মানবতাবোধ সফল হয়েছে কি না, তা সে জানে না।

কাদাচরে গোপী উঠে বসে।

খুন হোক কি না-হোক ডাকাতি তো হয়েছে একটা। সে হাজত-খালাস সন্দিগ্ধ আসামী। তার নৌকোয়ই এই ঘটনা। এবার তার আর নিস্তার নেই। পুলিস আসল আসামীর সন্ধান পাবে না, হয়তো টাকা পেয়ে সেদিকে ধাওয়াই করবে না। সমস্ত দোষটাই চাপিয়ে দেবে গোপীর মাথায়। তার পর যদি সাক্ষী-প্রমাণে সুবিধা না হয় জজ সাহেব আবার বলবেন, গোপী, ওরফে গোপিকাবিলাস দাস খালাস···

হাসতে ইচ্ছা করে গোপীর। কিন্তু তার হাসার সময় নয় এখন। াকে আত্মরক্ষা করতে হ'লে অবশ্যই- আত্মগোপন করতে হবে। ধীরে ধীরে গামছার বাঁধন খুলে উঠে দাঁড়ায়। শক্তি নেই, তবু সমস্ত িক্তি সংহত করতে হয়।

সে একটা কাদা-মাখা পশুর মত থপথপ ক'রে চলে।

সন্তান এখন তার কাছে প্রধান নয়, প্রধান হয়েছে নিজের জীবন। কি ক'রে সে বাঁচবে? এড়িয়ে চলবে মানুষের দৃষ্টি?

এমন অন্ধকারে যেটুকু চাঁদের আলো, তাও যেন ভাল লাগে না। যে জল এই কিছুক্ষণ বন্ধ হয়েছে, তাও যেন পড়লেই সে থাকত আশ্বস্ত।

গোপীর মাথাটা টনটন করছে। সে ভিজে গামছা দিয়ে আহত স্থানটা শক্ত ক'রে জড়ায়। কত দূরে কি ভাবে গোপী ভেসে এসেছে, না, সাঁতার কেটে এসেছে সে স্থির করতে পারে না। হাত ছিল বাঁধা, সাঁতার কাটা তো অসম্ভব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওইটাই সম্ভব হয়েছে। ছেলেবেলা সে শিখেছিল ভাল সাঁতার।

নৌকাখানার জন্য চিন্তা হয় গোপীর। দামী নৌকা। তাকে বিনা জামিনে দিয়েছে স্রেফ বিশ্বাস ক'রে ভাড়া। একখানা শালকাঠের নৌকা— তাকে তো বেচলেও হবে না।

সে একবার অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখে।

চকিতে মনে পড়ে বউটির মুখ। পলকে বিগলিত হয়ে ওঠে অন্তর।

উন্মত্ত তুফান ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না গোপীর।

সে কূলের দিকে এগিয়ে চলে। কিছুদূর এগিয়ে ফিরে আসে। তার পায়ের দাগগুলো হয়তো সকালবেলা চেনা যাবে। হয়তো সনাক্ত হয়ে যাবে গোপী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ভাবে। এখন কি করা তার কর্তব্য?

পুলিসে যে কত রকমে আসামীকে অনুসন্ধান ক'রে বার করে, হাজতে ব'সে গোপী কিছু কিছু তা শুনেছে। সে অস্থির হয়ে পড়ে।

আবার জলে নামে গোপী। সাঁতার কেটে একটা হোগলাবনের কাছে যায় এবং তার ভিতর দিয়ে পথ ক'রে ওপরে ওঠে।

এবার অনেকটা নিশ্চিন্ত। তবু সে একটা জংলা ঝাড়ের আড়াল থেকে ছুটে আর একটায় আশ্রয় নেয়। এমনি ক'রে এখন এগুতে হবে।

কিন্তু কত দূরে? কোথায়?

ভোর তো হয়ে এল। পূর্বদিকের আলোর আভাস—অভিশাপ, অভিশাপ গোপীর কাছে। অথচ এখন এ জগতের কে না চাইছে আলো?

দোয়েল শিস দিচ্ছে। মোরগ ডাকছে গৃহস্থ-বাড়ি। আজান মসজিদে, ভজন-মন্দিরে। কৃষককে ডেকে তুলছে কৃষাণী।

এই যে!···

কে যে? গোপীর হৃৎপিণ্ডটা ছলাৎ ক'রে ওঠে। চট্ ক'রে সে লুকিয়ে পড়ে একটা বড় গাছের আড়ালে। সত্যযুগের মত সে যদি একেবারে ভিতরে ঢুকে যেতে পারত! তবু সে যতদূর সম্ভব সংকুচিত ক'রে থাকে নিজের অতবড় দেহটা। মাথাটা রাখে একটা ডালের পাতার ভিতর গোপন ক'রে, ভয়ার্ত শশকের কথা মনে পড়ে গোপীকে দেখলে।

এই যে, দেশলাইটা নাও।

তখন খালের জল ফুলে উঠেছে। ছলছলানি কলকলানি শোনা যাচ্ছে জোয়ারের। এক্ষুনি কূল-পার একাকার ক'রে দেবে।

দেশলাইটা ভিজে। পারলে তাওয়াটা দাও। গুলটা ধরিয়ে নেব।

দুখানা ছোট ডোঙা এসে পাশাপাশি ভেড়ে। একখানা যাবে হাটে—কলা-কচু বোঝাই। অপরখানায় ছোট্ট একখানা ছেউলী-পাতার সাময়িক ছৈ, ভিতরে একটি কৃষকের মেয়ে যাত্রী।

দু নৌকায় কথা হচ্ছে।

গোপী ঘামিয়ে ওঠার যোগাড়—কেন, কেন, এপার ঘিঁষে এগিয়ে আসছে কেন? নিশ্চয়ই ওরা লক্ষ্য করেছে গোপীকে।

তখনও খালের পারে ঝোপে জঙ্গলে অন্ধকার জড়িয়ে রয়েছে। গোপী হুড়মুড় ক'রে জলে নেমে একটা বাঁকা গাছের তলায় আশ্রয় নেয়। গাছটা কূল থেকে খালের দিকে প্রসারিত।

কোথায় যাচ্ছ কেশব? নায়ে কে? দেশলাই জ্বালতে চেষ্টা করলাম—অনেকক্ষণ তামাক খাই নি। কটা মাত্তর কাঠি, তাও ভিজে।

আগুন বুঝি জ্বলল না?

না হে, না, নারিকেলের ছোলাটা উড়িয়ে নিয়ে গেল দমকা বাতাসে।

দাদুকে যে উড়িয়ে নিয়ে যায় নি, এই ভাগ্যি!

কে রে, লক্ষ্মী নাকি? চলেছিস বুঝি বোলতলী খামারে? এবার কেমন হয়েছে আউশ?

পৌষের মত ফলন। কিন্তু ভাত পায় না চাষী। দাদু গো, ঘরে ঘরে কান্না, চোখের জল রাখা দায়।

কেন রে?

মুনিবে সরকারে পুলিসে লুঠছিল। খেটে-খুটে দিয়ে থুয়ে কিচ্ছু থাকে না ঘরে। দুদিন যেতে না যেতে যে-ই পাগল সে-ই ঠিক। উজাড় হ'ল গাঁয়ের চাষী।

কিছু সময়ের জন্য তামাক খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। নাও কিন্তু ঠিকই ভেসে চলে। বৈঠা বাইছে না কেউ, তবু গতি অব্যাহত।

এদিক ঘেঁষে আসছে কেন? সর্বনাশ! বুঝি দেখে ফেলেছে গোপীকে! গোপী নিশ্বাস বন্ধ ক'রে থাকে।

ডোঙা দুটো সেই গাছটার কাছে এসেই থামে।

বুড়ো দাদু বলে, প্রথম ঠাহর পাই নি—

গোপী ভাবে, তবে কি এইমাত্র পেল? সে তো নড়ে নি একটুও। শঙ্কায় তার সর্ব শরীর ঝিমিয়ে আসে। জোয়ারের জল বাড়ছে ক্রমে ক্রমে।

শেষে চিনলাম কাছে এসে।

কাকে চিনল? গোপীকে নয়তো? সে তীব্রতম উৎকণ্ঠায় সময় কাটায়। এবার জল ঢুকতে থাকে নাকে মুখে। এ রকম কতক্ষণ আর থাকা যাবে মাঠে? প্রতি মুহূর্ত যুগ ব'লে মনে হয়।

শেষ পর্যন্ত ওরা তামাক খায়। আর দু-একটা কথাবার্তা বলে। কিন্তু এত ধান হওয়া সত্ত্বেও কোনও প্রসঙ্গই যেন জমে না। গৃহস্থের মুখের হাসি শুকিয়ে গেছে। স্বাভাবিক রসিকতা নেই দাদুর নাতনীর মধুর সম্পর্কে।

ওটা কি?—লক্ষ্মী প্রশ্ন করে, ওইটা—

কোন্‌টা? আবার গোপী কেঁপে ওঠে। এদিকে তো শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

ওটা কুমীর নয়, একটা কলাগাছ। ভয় নেই। নাও খুললাম লক্ষ্মী। আবার দেখা হবে কেশব।

লক্ষ্মী দূর থেকে প্রণাম জানায়। বলে, দেখা হবে যদি প্রাণে বাঁচি।

গোপী হাঁফ ছেড়ে ওপরে ওঠে। মুমূর্ষুর মত নিজেকে প্রায় মাইল খানেক টেনে নিয়ে এসে একটা জঙ্গলের ভিতর অচৈতন্য হয়ে পড়ে।

আবার যখন জ্ঞান হয় গোপীর, তখন বেলা হয়েছে অনেকটা। কিন্তু সঠিক অনুমান করা যাচ্ছে না লতাগুল্ম-জড়ানো উঁচু গাছের ফাঁকে। একটা শান্ত স্নিগ্ধ শ্রী রয়েছে সর্বত্র।

গোপী নিজের পরিবেশটা উপলব্ধি করে ধীরে ধীরে। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে নিশ্চিন্ত মনে। তার স্নায়ুকেন্দ্রগুলি যেন খেটে খেটে শিথিল হয়ে পড়েছে। বিশ্রাম—একান্ত বিশ্রামের প্রয়োজন।

কি অদৃষ্ট! পাশবিক ক্ষুধায় তাকে নিষ্ঠুর রাখালের মত তাড়না করে, সে উঠে বসতে বাধ্য হয়। এখানে মানুষের খাদ্য কোথায়? শুধু গাছপালা আর জঙ্গল।

যে স্থানটায় সে এখন রয়েছে, তা কি সম্পূর্ণ নিরাপদ? নিকটে গ্রাম। ওই তো মানুষের উচ্চকণ্ঠ শোনা যায়, রাখাল বালকের চিৎকার। গোপী আরও নিবিড়, নির্জন স্থানের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। নিকটে একটা বেতের ঝাড়। ওপরটা অত্যন্ত ঝাঁকড়া, নীচেটা সেই তুলনায় খুবই পরিষ্কার। গোপী কচ্ছপের মত এগিয়ে গিয়ে ভিতরে ঢোকে।

এখন আর তার কোনও আশঙ্কা নেই। কিন্তু কেউ তাড়া দিলে পড়বে মহা জ্বালায়। বঁড়শির মত টেনে ধরবে বেতের ধারালো কাঁটাগুলো।

ক্ষুধার তীব্রতা তো কমে না। মানুষের জীবনের চরম অভিশাপ ক্ষুধা। কিন্তু সমস্ত সংসার আজ অসাড় হয়ে যেত যদি তাড়া না থাকত ও-টার। বিচিত্র, বিচিত্র এ লীলা!

গোপী হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে থাকে। মমতায় দ্রবীভূত হয়ে আসে অন্তর। ক্ষুধাক্লিষ্ট তনু পলকে পুলকিত হয়ে ওঠে। রাখালদের কলরবের ভিতর একটি ভিন্ন স্বর, ভিন্ন ঝঙ্কার সে যেন শুনতে পেয়েছে।

তার তো বার হওয়ার উপায় নেই। সে কান খাড়া ক'রে রাখে। এ যেন বহুশ্রুত, অতি পরিচিত কণ্ঠ। প্রতিটি উচ্চারণের লালিত্য তাকে মুগ্ধ করে।

অনেকক্ষণ বাদে গোপী বোঝে, এ তার ভুলে।

আবার আহার্যের জন্য গোপীর পাকস্থলী অধীর হয়ে পড়ে। এ কি বিড়ম্বনা! সবচেয়ে ভাল হ'ত, যদি গোপীর এ ভুল আর না ভাঙত!

বেলা যত বাড়ে ওর অনুভূতি তত শাণিত হয়ে ওঠে। এখন গোপী খানিকটা কাঁচা মাংস পেলেও বোধ হয় খেয়ে ফেলে দিতে পারে। পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মত সে ছটফট ক'রে সময় কাটায়।

নিকটে একটা হেলানো নারকেলগাছ। ডাব থাক্, ঝুনো থাক্— ওটার মাথায় সে উঠবে কিছু সে মানবে না। এ সঙ্কটে মানুষ কিছু গ্রাহ্য করতে পারে না। কিন্তু নারকেলগাছটা শীর্ষহীন। হয়তো বাজ পড়েছিল এক কালে।

গোপী শূকরের মত কতকগুলো কচি খেজুর-মাথি টেনে তোলে। চিবিয়ে খেয়ে তবে সুস্থ হয়।

বেলা ঢ'লে পড়ে পশ্চিমে।

গোপীর লোভ হয় রাখাল ছেলে কটিকে দেখার জন্য। তার মনের এ দুর্বলতা যে নিতান্তই ভিত্তিহীন, সে তা ভাল ক'রেই বোঝে। তবু স্নেহের আকর্ষণ অন্ধের মত তাকে টানে। সে উঁকি-ঝুঁকি মারতে থাকে।

কয়েকটা গাছ, কতকগুলো মাত্র লতার ব্যবধান। তার পরই হয়তো দাঁড়িয়ে রয়েছে তার সবচেয়ে কাম্য জন। খেলছে এখন, কলরব করছে সঙ্গীদের সঙ্গে। কিন্তু সন্ধ্যা এলেই ব্যাকুল হয়ে পড়বে একটু নিরাপদ উত্তপ্ত আশ্রয়ের জন্য।

গোপীর মনটা টাটিয়ে ওঠে। এ টনটনানিকেও হার মানায় আকস্মিক বন্দুকের শব্দ। ধর্, ধর্, শালাকে ধর্।

কোথায় দেখছি নে তো?

সিপাহী একজন বলে, তুই ব্যাটা নাকি নাম-করা চৌকিদার? তোর

উর্দি খুলে নেব কাল দারোগাবাবুকে ব'লে। একটা ঠ্যাং-ভাঙা বুনো মুরগী ধরতে পারে না, এসেছে ডাকাত পাকড়াও করতে!

ঝোপের ওপর লাঠি পড়ে সশব্দে।

এর মধ্যেই দারোগা এসেছে! গোপী পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করে। হয়তো এক্ষুনি একটা পাকা বাঁশের লাঠি তার মাথায় এসে পড়ল আর কি!

কি রে, খোঁজ পেলি?

চৌকিদারটা ভয়ে ভয়ে বলে, এই তো দেখলাম—শালা আবার গা-ঢাকা দিলে কোথা

ভাল ক'রে দেখ্, একটু ভিতরে ঢোক্—ভয়ে এক্কেবারে জবুথবু!

যে কাঁটা, পা পাতা যায় না। উঃ!

গোপী জড়িয়ে পড়ে সুতীক্ষ্ণ কণ্টকে। ঘেমে ওঠে তার সর্ব শরীর।

এমন হ'লে চাকরি রাখবি কি ক'রে! চাষার আবার কাঁটার ভয়! ব্যাটা যেন নবাব ব'নে গেছে। ওই—ওই—ধর্ দৌড়ে। আবার স্লুট ক'রে না পালায়।

এবার ছুটে গিয়ে একটা আহত বুনো মুরগীকে টেনে আনে চৌকিদার।—তোমাকে না পেলে বাবু যে আজ কি বুকনিটাই ছাড়তেন! দুদিন ধ'রে নাকি ভাল খাওয়া হচ্ছে না তাঁর, এখন না ঝিমিয়ে পেটে গিয়ে ঘুমিও। চল লক্ষ্মীটি, ছ-কোবী জজের নায়ে চল।

সন্ধ্যার পর গোপী বেরিয়ে আসে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে। নিকটের একটা তালগাছে উঠে তৃষ্ণা নিবারণ করে।

চোখে তার নিদ্রা আসে গাঢ়।

ঝিঁঝির ডাকের সঙ্গে সারা রাত ছন্দ মিলিয়ে চোখ মিটমিট করে অসংখ্য তারা। অনভ্যস্ত ক্লান্ত গোপীর মগজে ক্রিয়া হয় অসাধারণ। সে সমস্ত রাত পাশ ফেরে কিনা সন্দেহ।

ভোর হয়। বেলা বাড়ে। তার যেন নেশা ছুটতে চায় না। তবে তার মনে হয়, সারা শরীরটা যেন অনেক চাঙ্গা হয়েছে। ব্যথা-বেদনা কমেছে যথেষ্টই।

সে একবার উঠে বসে, আবার শুয়ে পড়ে। গায়ের আড়ো-মোড়া ভাঙে বার কয়েক। অনেকক্ষণ সে শান্তিতে থাকতে পারে না।

নির্লজ্জ ক্ষুধায় আবার তাকে প্রহার করে। গত কল্যের মত নিষ্ঠুরতা। সে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে যেতে চায়। এ চরম তাড়না তার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব।

সে গিয়ে নিকটস্থ পরগাছা-পরিবেষ্টিত একটা ঝাঁকড়া আমগাছে ওঠে। ওখান থেকে গ্রামের পথ ঘাট সম্পূর্ণ দেখা যায়। ও একটা রক্ত পিপাসু চিতা বাঘের মত ওৎ পেতে অপেক্ষা করে। যদি কেউ আহার্য নিয়ে গ্রামের পথ ধ'রে এই জঙ্গলের পাশ দিয়ে আসে—ফল মূল দই চিঁড়ে পানি পান্তা যা হোক—

জঙ্গলের পাশেই একটা জীর্ণ দেবালয়। তার ধার দিয়ে এ-পাড় থেকে ও-পাড়া যাওয়ার কাঁচা এক ফালি সরু পথ মোড় ঘুরে গেছে। গোপী শ্যেনদৃষ্টি মেলে থাকে।

একটি বিধবা স্ত্রীলোক সেই পথেই এগিয়ে আসছে। সঙ্গে একটিবালক

এখন পারবি তো ?

হাঁা, খুব পারব পিসীমা।

কঞ্চিটা ফেলে দে। এখন হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ না ক'রে, পরে এসে করিস। ধর্ এই দুধের ঘটিটা আর কলা পাঁচটা। ঠাকুর-বাড়ি দিয়েই চ'লে আসবি।

আচ্ছা।—বালকটির সুকুমার মুখের প্রধান সৌন্দর্যই তার দীর্ঘায়ত চোখ-জোড়া। অপূর্ব ভঙ্গিতে সে আস্ফালন ক'রে কঞ্চিরূপী কিরিচ চালাচ্ছে অনুপস্থিত প্রতিপক্ষের গায়ে।

তবে ধর্।

এই যে, দাও।

এখনও তো কঞ্চিটা ফেললি নি, কাপড়ও পরলি নি ক'ষে; বীরপুরুষ, খুলে পড়লে যে দেখা যাবে সব।

না, তুমি সব সময় অমন করলে আমি যাব না দুধ কলা নিয়ে। আমি পারব না, পারব না পিসীমা।—বালক ঘুরে দাঁড়ায় অভিমানে।

গোপী বিরক্ত হয়।—এত দেরি করছে কেন অবাধ্য বালক ?

না বাবা, না। তোমার কি কাপড় খুলে যেতে পারে। বড় হ'লে তুমি যোদ্ধা হবে ভীষ্মের মত। এবার যাও দেখি, ধর তো এগুলো।

ছেলেটি তবু গনগন করে এবং ঝাড়ে বংশে নির্মূল ক'রে ছাড়ে পথের পাশের কচুগাছগুলো।

ও কি হচ্ছে ? ডাকব নাকি তোমার কাকাবাবুকে ?

কই পিসীমা, কাকাবাবু কই ? দাও, শীগগির আমার হাতে দাও না ওগুলো।—কি কারণে যেন পলকে একেবারে শান্ত হয়ে যায় বীর যোদ্ধা।

দেখিস দুধ না প'ড়ে যায় ছলকে। বড্ড দেরি হয়ে গেল। একটু তাড়াতাড়ি যাস বাবা। পূজো না শেষ হয়ে যায় ঠাকুর মশাইয়ের। ওদিকে ছিষ্টি প'ড়ে রয়েছে, আমি চললাম। হ্যাঁ রে, কি বলবি বল্ তো ঠাকুর-বাড়ি গিয়ে ?

বলব, বলব। দাঁড়াও—

এর মধ্যেই সব ভুলে মেরে দিয়েছিস ? কি যে ছেলে তুই !

কি যেন ভেবে গোপী সরসর ক'রে নেমে পড়ে গাছ থেকে। ভাঙা মন্দিরটার পিছনে একটা ঝোপের ভিতর সে গিয়ে থাকে আড়ি পেতে।

বলবি যে, পিসীমা মা-শীতলাকে উৎচ্ছুগ্যু ক'রে দিতে বলেছে—বুঝলি ? তার হাতে অনেক কাজ, আসতে পারল না নিজে।

আচ্ছা। এবার আর ভুলব না, তুমি বাড়ি যাও।

আর একটা কথা, ঘটিটা কিন্তু এক্ষুনি ফিরিয়ে নিয়ে আসবি। তোর কাকাবাবুর বিয়ের দান-সামগ্রীর ঘটি ওটা।

বালক মাথা নাড়ে—হুঁ।

সে তার স্বভাবসুলভ নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করতে করতে মন্দিরের দিকে এগিয়ে আসে। এত যে পিসীমার হুঁশিয়ারি সব ভুলে যায়। অতটুকু পথ অতিক্রম করতে তার বেশ খানিকটা সময় লাগে। তার আয়ত চোখ কখনও বিস্ময়ে বিস্ফারিত, কখনও যেন ভয়ে ভাবনায় অর্ধ-নিমীলিত। জগতের যা কিছু কৌতূহল সময় সময় যেন পুঞ্জীভূত হয়ে ওর সমস্ত মুখমণ্ডল ভ'রে।

এমনি ছিল জীবন।

ক্ষুধার্ত গোপী যত এগিয়ে যায়, ততই নাটকীয় সংঘাত অনুভব করে অন্তরে। এখন সে কি করবে?

দেবালয়ের কাছে এসে বালক দুগ্ধপূর্ণ ঘটি ও কলা কটি কি যেন ভেবে নামিয়ে রাখে। সে চতুর্দিকে তাকায় ব্যগ্র দৃষ্টি মেলে। তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছে একটি বন্য পাখি। বালক কান পেতে শোনে তার ডাক—বউ কথা কও, বউ কথা কও।

এ পাখির ডাকের ইতিহাস ছেলেটি জানে। ওর যেন প্রাণ পুড়ে যায়।

গোপীর মনের ভিতর হিংস্রতা ও মানবতা দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হয়। ওর অন্তরলোক টলমল ক'রে ওঠে। ও কিছুতেই থামাতে পারে না কাউকে। হয়রান হয়ে গোপী নিশ্বাস ফেলে ঘন ঘন।

বালকটি একটু স'রে যায় দূরে। অমনি পট-পরিবর্তন ঘটে। গোপী নিতান্ত অনিচ্ছায়, কিন্তু দুর্লঙ্ঘ্য আদেশে যেন খাদ্যদ্রব্যগুলো টেনে আনে। ঢক ঢক ক'রে দুধটুকু খেয়ে ঘটিটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কলা কটা সাবাড় করে কয়েক কামড়ে।

গোপী এবার বনান্তরে ডুব দেয়।

ইতিপূর্বে গোপীর নিকট সূর্যের এত আলো, বনের সবুজ শ্রী, তার স্নিগ্ধছায়া মনে কোন রেখাপাত করে নি। বিশ্বজোড়া রূঢ়তা এবং রিক্ততাই ওকে কেবল পীড়া দিয়েছে। দৃষ্টির সুমুখে ওর নর্তন করেছে অলীক রঙিন গোলক। শান্তি নেই, স্বস্তি নেই—আছে শুধু জ্বালাময় অনুভূতি। প্রতি অণু-পরমাণুতে অনির্বাণ শূন্যতার দাহ।

গোপী একটা আধমরা ডালের ওপর ব'সে রয়েছে। কিছু ও ভাবছে না, শুধু অনুভব করছে সারা দেহে আনন্দ। যে কীটগুলো ওর শরীরটা কুরে কুরে খাচ্ছিল, সেগুলো যেন এই মাত্র মারা গেছে।

দেহের সঙ্গে মনের কি এক আশ্চর্য সম্বন্ধ! শুভ অনুভূতিগুলো যেন ধীরে ধীরে অঙ্কুর মেলছে—যেমন সামান্য জলের স্পর্শে বীজধানে দেখা দেয় প্রাণচাঞ্চল্য।

বেশিক্ষণ গোপী ব'সে থাকতে পারে না। ওকে উঠতে হয়। ফিরে আসতে হয় ভাঙা মন্দিরটার কাছে। খোঁজ নিতে হয়, বিপন্ন বালক কি করছে!

ছেলেটি তো রাস্তার ওপর নেই। বউ-কথা-কও পাখিটাও তো উড়ে গেছে। গোপী চারদিকে ব্যগ্র দৃষ্টিতে অন্বেষণ করে। তবে কি বালক বাড়ি ফিরে গেছে? তা যদি গিয়ে থাকে, তবে তার চরম লাঞ্ছনার হাত থেকে নিশ্চয়ই অব্যাহতি নেই। যে তার কাকাবাবু!

এ গোপী কি করেছে?

সে তো তখন-তখনই আর ম'রে যেত না। উচিত ছিল তার আরও সংযত হওয়া—উচিত ছিল তার আরও প্রলোভন দমন করা।

অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকে গোপী।

এমন সময় তার কানে যা যায়, তা বিশ্বাস করা অসম্ভব। কিন্তু নগ্ন সত্যকেই বা মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেবে কি ক'রে?

সে মন্দিরের ফাটলে কান পেতে থাকে।

ওগো, শিবঠাকুর!—সেই বালক নতজানু হয়ে মিনতি জানাচ্ছে, 'আমি আর বউ-কথা-কও পাখির পিছে ছুটব না, কক্ষনো আর শ্যাওড়া ফলের ওপরও লোভ করব না—বড় বড় টোপা টোপা ফল হ'লেও না। গুরুজনের কথা শুনব মন দিয়ে, এবারটি তুমি আমায় ক্ষমা কর শিবঠাকুর।

বালকের গলা আরও আর্দ্র হয়ে আসে। সে আরও গাঢ়কণ্ঠে বলে, তুমি না হয় দুধটুকু খেয়ে ঘটিটা ফিরিয়ে দাও। ওটা আর কারুর নয়, কাকাবাবুর ঘটি। ওটা পেলে কলার কথা আর আমি তুলবই না। ওগো শিবঠাকুর...। বালক বারম্বার যুক্তকরে প্রণাম করে।

গোপী লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে যায়। কিন্তু সে ফাটলের কাছ থেকে কান ও চোখ সরিয়ে নিতে পারে না।

ছেলেটি মন্দির থেকে বেরিয়ে যায়। একটু বাদেই ফিরে আসে। তার হাতে কতকগুলো কনকধুতুরা। সে বিগ্রহকে সাজায় সযত্নে।

গোপী এখনও তো একটা বিরাট ভুল করল। সে তো ঘটিটা খুঁজে

নিয়ে এসে চুপটি ক'রে রেখে যেতে পারত শিবমন্দিরে! ওর জীবন যদি এমনি বিপদে পড়ত!

ফুল আনতে একটা নেবু-কাঁটায় ছ'ড়ে গেছে আমার হাত, এই দেখ—রক্ত। পিসীমা রাগ করবে। বড্ড দেরি হয়ে গেছে। আমি চোখ বুজলাম, এখন ঘটিটা ফিরিয়ে দাও ঠাকুর। ওগো, আমার বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে।—বলতে বলতে বালকের কণ্ঠরোধ হয়ে আসে।

এমন অপূর্ব সুযোগও গোপী গ্রহণ করতে পারে না। সে বিবশ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পরম মুহূর্তগুলি বৃথা গত হয়ে যায়।

পিছন থেকে গায়ে হাত পড়তেই বালক চমকে ওঠে। বলে, তু-তু-তুমি—কাকাবাবু—

ওঃ, কি খোঁজটাই না খুঁজেছি, গ্রামশুদ্ধু তোলপাড়। আর তুমি হারামজাদা এই মন্দিরের ভিতর ফুল নিয়ে খেলছ! দুধ কোথায়, কলা?

জানি না কাকাবাবু, আ-আ-আমি—

বল্ শিগগির দুধ কোথায় ফেলেছিস? ঘটিটা?

কাকা একটা লিকলিকে শ্যাওড়া ডাল ভেঙে নেয়।

গোলমাল শুনে কয়েকজন কৃষক ও রাখাল বালক ছুটে আসে। ডাকপিওন বিটে যাচ্ছে, সেও এসে কাছে দাঁড়ায়। বলে, কি হয়েছে মুখুজ্জে মশাই?

আর বল কেন, এই বাপ-মা-খাওয়া তেঁতুলবিচি আমার হাড় মাংস জ্বালিয়ে খেল! বল্ শূয়ার, ঘটিটা কোথায়?

বলি বলি, তুমি আমায় মেরো না কাকাবাবু, মেরো না—

বালকের আর কোনও কিছু বলা সম্ভব হয় না।

উদ্যত ছড়িটা এক হাতে ঠেকিয়ে, অন্য হাতে ঘটিটা এগিয়ে যে দেয়, তাকে পাশের গাঁয়ের উপস্থিত সবাই অনায়াসে চেনে। ওকেই নাকি সন্দেহ ক'রে চতুর্দিক চ'ষে বেড়াচ্ছে স্থানীয় পুলিস।

শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ

শনিবারের চিঠি

ষান্মাসিক সূচী

বৈশাখ ১৩৬০—আশ্বিন ১৩৬০

সম্পাদক

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বি—৩

ছায়াছবি—শ্রীমতী অমলা দেবী ... ৬১১
জীবন-পরিপ্রেক্ষিতে—শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ১
ডানা—"বনফুল" ১৬, ১২৭, ২৩৪, ৪১৫, ৪৬৭, ৬৮৬
তেনজিং শার্পা—শ্রীসন্তোষকুমার দে ... ৩২২
'দনুজমর্দন'-সমস্যা—সঞ্জয় ভট্টাচার্য ... ৯৬
দাঁত—শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ... ২৫১
দুই নারী—"বনফুল" ... ৫৮৪
দুই বাড়ি—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র ... ৫৮৯
দেনা—শ্রীমানবেন্দ্র পাল ... ৫১৬
দ্বান্দ্বিক জড়োবাদ—গোপালদা ... ৪৬৬
নবীনা—"রঞ্জন" ... ৪৯
নিবেদন ... ৬৮১
পচা ফল—শ্রীতরুণ রায় ... ৫০০
পরাজয়—শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ... ৭৩৬
পরিব্রাজকের ডায়েরি—শ্রীনির্মলকুমার বসু ... ১৭৭
পাগ্‌লা-গারদের কবিতা—শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু ২৩, ১৩৫, ৩০১, ৩৭১, ৪৯১
পূজা এলো—শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী ... ৬৯৩
পূজা-চেঞ্জারদের প্রতি ... ৫৮৩
প্রসঙ্গ কথা—শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৮২, ৩১০
প্রেম—শ্রীমতী বাণী রায় ... ১৯৩
বই ... ৪৪৩
বর্ষণ-স্বপ্ন—শ্রীপ্রণব মিত্র ... ৬৬
বারাব্বাস—শ্রীঅবনীনাথ রায় ... ৩৮৩
বাসাংসি ... ৫৯৮
বেরিয়া—শ্রীপ্রভাত বসু ... ৭৫৪
বোকে—শ্রীগোপাল ভৌমিক ... ৬৮৫
ভাদ্র—শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ... ৭৫৮
[illegible] ... ৩৫৬
[illegible]ান্তর ... ২৯১

মর-মর মূর্তি—শ্রীকুমারেশ ঘোষ ... ৪২৫
মহাস্থবির জাতক—"মহাস্থবির" ৩৩, ১৪৫, ২৭০, ৩৯৯, ৪৭৫, ৫৯৯
মাঠ—শ্রীসঙ্কর্ষণ রায় ... ১৯৫
মোক্ষধন ও যক্ষধন—শ্রীকালিদাস রায় ... ১৭৫
রজ্জুতে সর্প—প্র. না. বি. ... ৬৮২
রবীন্দ্র-জয়ন্তী—শ্রীসঙ্কর্ষণ রায় ... ৫২৯
রূপ-নারায়ণ—শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় .. ৫১১
রূপান্তর— শ্রীপ্রভাত বসু ... ৫৭৪
লাভবান কে ? ... ১১৩
লেখার মূল্য ... ২৯৫
শিক্ষা হওয়ার কথা —শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ .. ৩৩৬
শ্যামাপ্রসাদ-বিয়োগে—শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩৫
শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুতে—"বনফুল" .. ৩৯৬
শ্রীযুক্ত বিনোভার ভূদানযজ্ঞ—শ্রীনির্মলকুমার বসু ... ২২৫
সংবাদ-সাহিত্য . . ১০০, ২১২ ৩২২, ৪৩১, ৫৪১
সমুদ্র-দর্শনে—শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী ... ১৭৪
সাহিত্যসাধক-রত্ন-মালিকা—শ্রীপ্রভাত বসু ... ৬৯২
সাহেবপাড়ার শেষে—"আযপুত্র সুপ্রিয়" ... ৭৫৬
সিনারা—মোহিতলাল মজুমদার ... ৪৩০
সূর্য-প্রয়াণ—শ্রীঅসিতকুমার চক্রবর্তী ... ৩৯৭
স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথ—শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায় ... ৩
স্বপনচারী—শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় ... ৭৫৩
স্মরণী—শ্রীশান্তি পাল ... ৬৯১
হারানো মাণিক—শ্রীভূপেন্দ্রমোহন সরকার ... ৭৭
হিমালয়—শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ ... ২৬৭
হিমালয় অভিযান—শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ ... ১৭৩
১৩৬০—"বনফুল" ... ৯৯
৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৬০—"বনফুল" ... ৫২৮

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্রবিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা ৩৭ হইতে

আদর্শ
লিভার টনিক
লিভারের রোগে কুমারেশ নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয়—কিন্তু সুস্থ অবস্থায়ও কুমারেশ কম প্রয়োজনীয় নয়। কুমারেশ অসুস্থ লিভারকে আরোগ্য করে এবং সুস্থ অবস্থায় লিভারকে সবল ও কার্য্যক্ষম রাখে।
ORCL'S
QUMARESH
কুমারেশ
.আর.সি.এল.লিমিটেড.সালকিয়া.হাওড়া।

অগ্রহায়ণ ১৩৬০ : দাম

দক : শ্রীসজনীকান্ত দাস ● Nov.-Dec. : Price A

জিম করবেটের লেখা

মানুষখেকো বাঘের মতো

ভয়ঙ্কর জীবশিকারের

রোমাঞ্চকর সত্যগল্প

প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল ভারতবর্ষের উত্তরপ্রদেশে পার্বত্য বনাঞ্চলে অসমসাহসী শিকারী বলে খ্যাতি ছিল জিম করবেটের। সেখানকার পাহাড়ী মানুষ ছাড়াও গাছ-বন-পাথর-কীট-পতঙ্গর সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা জন্মে গিয়েছিল। সমস্ত অঞ্চলটি ছিল তাঁর নখদর্পণে। প্রকৃতির বিচিত্র ইশারা তাঁর শিকারের সময় উপায় বাতলে দিত। এই প্রকৃতিপ্রীতি এবং পর্যবেক্ষণের সূক্ষ্মদৃষ্টি যোগে তাঁর কাহিনী ভিন্ন মর্যাদা পেয়েছে। মানুষখেকো বাঘের মতো ভয়ংকর জীবশিকারের রোমাঞ্চকর সত্যগল্প এই লেখায় সাহিত্যের গৌরবলাভ করেছে। শিকারের গল্প পুরোনো হয় না, কিন্তু মেজর জিম করবেটের এই শিকারকাহিনী কখনও পুরোনো হবে না এই কারণে। দাম ৩৲

সিগনেট বুকশপ

সূচী

অগ্রহায়ণ—১৩৬০

আমার সাহিত্য-জীবন—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১১৩
একটি পুরনো আলিঙ্গন—দীপক চৌধুরী	...	১২৫
নামের নমুনা—"সম্বুদ্ধ"	...	১২৯
মহাস্থবির জাতক—"মহাস্থবির"	...	১৫৫
প্রার্থনা	...	১৭৪
ধূমাবতী—"বনফুল"	...	১৭৫
স্বর্ণ-ক্যাডিলাক-কামী অভিমানিনীর প্রতি	...	১৭৬
অ্যানড্রোক্লিস ও সিংহ—শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু	...	১৭৭
হ্যামলেট—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	...	২০৪
সংবাদ-সাহিত্য	...	২১৭

স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

মরণের পারে

(মরণের পারের আত্মাদের অসংখ্য রকমের চিত্র সংবলিত)

মৃত্যু ও পরলোকের রহস্য-কাহিনীর খবর দিয়েছে আজ পর্যন্ত যতগুলি বই, স্বামী অভেদানন্দের এই বইখানি তাদের শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। কৌতূহলোদ্দীপক প্রত্যক্ষ কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে সুনিপুণভাবে তাদের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যার অপূর্ব সন্নিবেশ পুস্তকখানিকে অতুলনীয় করেছে।

প্রেতাত্মাদের সঙ্গে স্বামিজীর মেলামেশার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণও এতে পাওয়া যাবে।

অজ্ঞাত রহস্যময় প্রেতলোকের ও প্রেতাত্মাদের অনেক কিছু বিস্ময়কর মর্মন্তুদ খবর ও ঘটনা বিশেষ মর্মস্পর্শী।

মূল্য : পাঁচ টাকা

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ঋষি দাস অনূদিত
রোমাঁ রোলাঁ
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ৬৲
মহাত্মা গান্ধী ২॥০
ম্যাক্সিম গর্কী
জীবন প্রভাত ৫৲
লেনিনের সাথে ১॥০
টলষ্টয়ের স্মৃতি ২৲
সুনীল দত্ত অনূদিত
ভাঙন ৬৲
* শিক্ষানীতির বই *
প্রতিভা গুপ্ত
সমাজ ও শিশুশিক্ষা ৫৲
বিজয়কুমার ভট্টাচার্য
বুনিয়াদী শিক্ষা ২৲
বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতি ২৲
অনিলমোহন গুপ্ত
বুনিয়াদী শিক্ষার কথা ১ম ২৲ ২য় ২৲
বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতি ২৲
প্রবোধকুমার সান্যাল
দুরাশার ডাক ১॥০
সমরেশ বসু
মরশুমের একদিন ২॥০
অকাল বৃষ্টি ২॥০
প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়
অতীত স্বপন ৫৲
* জীবন-চরিত *
সুশীল রায়
মনীষী-জীবন কথা ১ম ২৲ ২য় ২৲
ধীরেন্দ্রলাল ধর
আমাদের গান্ধীজী ৬৲
স্বামী জগদীশ্বরানন্দ
নবযুগের মহাপুরুষ ৬৲
সাধিকামালা ২৲
খগেন্দ্রনাথ মিত্র
যাঁদের লেখা তোমরা পড় ২৲
বিবেকানন্দের জীবন
রোমাঁ রোলাঁ
অনুবাদ
ঋষি দাস
বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হইল
দাম: ছয় টাকা
ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলিকাতা-

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

স্বর্গের চাবি : খোশমেজাজের আমেজে পূর্ণ এই গল্পগুলিতে ধোঁয়ার কারবার নেই। স্বর্গের চাবি মর্ত্যবাসী প্রত্যেকেই সংগ্রহ করুন। তিন টাকা।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রসকলি : তারাশঙ্করের প্রথম গল্প "রসকলি"। 'রসকলি'র গল্পগুলি অবাস্তব নয়—লেখকের প্রকৃত অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা। রসিকেরা পড়বেন। আড়াই টাকা।

শ্রীঅমলা দেবী

স্বাধীনতা-দিবস : অমলা দেবীর গল্প সর্বপ্রকার জটিলতাহীন এবং আন্তরিকতায় ভরা। এটি তাঁর অধুনারচিত কয়েকটি গল্পের সমষ্টি। চার টাকা।

বনফুল

ভুয়োদর্শন : ভূয়োদর্শী বনফুলের অভিনব চিন্তাধারা এই খণ্ডরচনা ক'টিতে সরস ভাষায় সার্থক রূপ পরিগ্রহ করেছে। নতুন ছাপা হ'ল। তিন টাকা।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

মধু ও হুল : মধুর মিষ্টত্বের সঙ্গে হুলের খোঁচা রসিক পাঠকের চিত্ত জয় করবে। গল্পগুলি পড়লে কৌতুকে মুগ্ধ হতে হয়। আড়াই টাকা।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

রাণুর গ্রন্থমালা : রাণুর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগ এবং কথামালা নিয়ে রাণুর গ্রন্থমালা। এই গল্পগুলি আমাদের শাশ্বত সম্পদ। রাণুর ১ম ভাগ ২৷৷০, ২য় ভাগ ২৷৷০, ৩য় ভাগ ৩৲ ও কথামালা ৩৲।

সম্বুদ্ধ

ডায়লেকৃটিক : সম্বুদ্ধের গল্প সাহিত্যজগতে চমক এনে দিয়েছিল। 'ডায়লেকৃটিক' ব্যঙ্গ ও রসের সমন্বয়ে কয়েকটি বিখ্যাত গল্পের সঙ্কলন। আড়াই টাকা।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

আবর্ত : সাহিত্য-আস্বাদনে যাঁরা উন্মুখ 'আবর্ত' তাঁদের রসপিপাসু মনকে পরিতৃপ্তি দেবে। এ ধরনের গল্প বাংলায় নেই বললেই চলে। দু টাকা।

শ্রীআর্যকুমার সেন

অভিনেতা : 'অভিনেতা'র মিষ্টি সুরের গল্পগুলি পড়লে আনন্দ-অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে যায় মন। লেখক অল্প লিখেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। দু টাকা চার আনা।

শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডিটেকটিভ : লেখক পুলিসের উচ্চপদে থাকাকালে অর্জিত অভিজ্ঞতা গ্রন্থে কাজে লাগিয়েছেন। বাস্তব ঘটনা নিয়ে কয়েকটি ডিটেকটিভ গল্প। তিন টাকা।

MARGO SOAP
CONTAINS ACTIVE
TOILET & MEDICINAL
BHRINGOL
MAHA BHRINGARAJ OIL
রূপরচনায় ক্যালকেমিকোর
কয়েকটী অনুপম প্রসাধনী
মার্গো সোপ
নিমের সুগন্ধি প্রসাধন সাবান।
ভৃঙ্গল সুগন্ধি মহাভৃঙ্গরাজ তৈল কেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়; মাথা ঠাণ্ডা রাখে।
রেণুকা পুষ্পসুরভিময় রূপচূর্ণ। মুখশ্রী ও দেহশ্রী লাবণ্যময় করে।
তুহিনা প্রাকৃতিক রুক্ষতা হইতে গাত্র-চর্ম্মকে রক্ষা করিয়া কোমল ও মসৃণ রাখে।
CHEMICAL
Tuhina
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা-২৯

লেখকরা কাজল কালিতেই লেখেন

১৯০৫এ বাঙালী স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শিল্পে বাণিজ্যে ব্যবসায়ে ঝুঁকেছিল। উৎসাহ উত্তেজনায় স্বদেশী শিল্প জন্মলাভ করেছিল অনেকগুলি, কিন্তু ভাবপ্রবণ বাঙালী বন্যার জলের মত সেগুলিকে ভেসে যেতে দিয়েছিল। সেই ভাববন্যা কাটিয়ে বাঙালীর কীর্তি স্থায়ী হয়ে রয়েছে সামান্য দু-চারটিতে।.

১৯২১এ মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ-আন্দোলন সারা ভারতবর্ষ জুড়ে স্বদেশী শিল্পের নতুন উদ্বোধন করেছিল। তারও অধিকাংশ কালের প্রবাহে ভেসে গেছে। অসহযোগ-আন্দোলনেরই প্রত্যক্ষ ফল **"কাজল কালি"** বাংলা দেশে আজও সগৌরবে টিকে আছে। এর কারণ ভাবাবেগের সঙ্গে এর আবিষ্কারক-পরিচালকদের চিত্তে নিষ্ঠা ও সততা ছিল। **"কাজল কালি"** এক জায়গাতেই থেমে থাকে নি, সময়ের এবং বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে তাল রেখে নতুন নতুন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এই কালি কলমের মর্যাদা রেখে এগিয়ে চলেছে। দামে এবং গুণে হার মেনেছে যাবতীয় বিলিতী কালি।

বাংলা দেশের একজন সামান্য বাণীসেবক আমি, বিগত শতাব্দীপাদের অধিক কাল এই **"কাজল কালি"**র সাহায্যেই বাণীসাধনা ক'রে আসছি। কখনও অসুবিধেয় পড়ি নি, শ্লথ হয় নি কলমের গতি, বন্ধ হয় নি লেখনীর মুখ। এরই জন্য আমি কৃতজ্ঞ। সেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতাবশে **"কাজল কালি"**র অক্ষয় জীবন কামনা করছি।

২৬।১০।৫৩ শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিবারের চিঠি
২৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৬০

আমার সাহিত্য-জীবন

পূজোয় সে সময় বাড়ি গিয়ে এক মাস পর ফিরতাম। ছেলেরা কলেজে পড়ত তখন, ছেলেদের ছুটিটাই তখন মেয়াদ ছিল গৃহবাসের। বাঁচত এক মাসের বাসা-খরচা, আর লাভ হ'ত দেশের ম্যালেরিয়া। কলকাতায় এসেও তার জের চলত, অন্তত আরও এক মাস, এবং প্রায় প্রত্যেক জনকেই দুটো, অন্তত একটা কুইনিন ইন্‌জেক্‌শন নিতে হ'ত। কলকাতায় বাসা করার পর, সেই বারটাই প্রথম পূজো। দেশে থেকেই ছেলেমেয়েদের দু-একজনের মধ্যে ম্যালেরিয়া দেখা দিয়েছিল। আসবার দিন ট্রেনেই জ্বর এল বড় মেয়েটির। তার সেই প্রথম আক্রমণ।

কথাগুলি ব্যক্তি-জীবনের কথা, সাহিত্য-জীবনের নয়। তবু সেবারের এই কথাগুলি লিখতে ব'সে আপনি মনে প'ড়ে যাচ্ছে, কলমের ডগায় এসে যাচ্ছে। এমনই একটি ঘটনা সেবার ঘটেছিল, ঘটনাটি মনের মধ্যে এমনই ছাপ রেখে গেছে যে, তা আজও ভুলতে পারলাম না, হয়তো বা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভুলতে পারব না সেকালের বাংলা দেশের সাহিত্যিক জীবনের অসহায় অবস্থার এমনই এক শোচনীয় পরিচয় এই ঘটনায় সেদিন ফুটে উঠেছিল যে, ঘটনাটির কথা না লিখলে সাহিত্য-জীবনের পরিচয় ও প্রতিচ্ছবি অসম্পূর্ণ থাকবে। এর একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। অন্যথায় এ ঘটনাটির উল্লেখ না করলেই ভাল হ'ত। ক্ষোভের কথা ও কাহিনী তো সাহিত্যের কথা বা কাহিনী নয়, ক্ষোভ-দুঃখকে প্রসন্নতা ও প্রশান্তির মধ্যে জয় করার কথা বা কাহিনীই সাহিত্যের মর্মকথা। সাহিত্য সনাতন ও শাশ্বত ওইখানেই। শাস্ত্রকারেরাও ওই কথা ব'লে গেছেন, এবং জগতের যত মহাকবি ও মহৎ সাহিত্যকারের সাহিত্য ওই কথাতে চিরন্তন মহিমা লাভ করেছে। একালে মহাকবির মহাকাব্য সেই আনন্দরসেই ওতপ্রোত এবং সেই সাধনার প্রার্থনা-বাণীতে আদ্যন্ত ঝঙ্কৃত—

"বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিতে নাইবা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।"

ভয় বড় নয়, সুতরাং যে ভয় দেখায় সেও বড় নয়, দুঃখও বড় নয়, দুঃখদাতাও নয়। বড় হ'ল ভয় থেকে অভয়ে উপনীত হওয়া, দুঃখ থেকে অদুঃখে উপনীত হওয়া। যে ভয় দেখায় তাকে যুদ্ধে পরাজিত ক'রে ভয় থেকে যে উত্তীর্ণ হওয়া, সেটা নিরেনব্বইটায় হয়েও শেষ একটায় বা শেষটাতে হারতেই হয়, এবং সেইটাই তো আসল ভয়। ভয়ের পিছনে সে-ই থাকে ব'লেই তো ভয়। সুতরাং অভয়ে উপনীত না হ'লে তো ভয় করি না বা করছি না—এমন তো হয় না। দুঃখের বেলাতেও তাই। সমগ্র রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আনন্দ প্রেম পূজা রূপ প্রভৃতি সকল রস ও সকল ভাবানুভূতির মধ্যে ওই এক কথা। ক্ষোভ দুঃখ গ্লানি ইত্যাদিকে মুছে দিতেই হয় জীবনে। তা-ই সাহিত্যের কথা, তা-ই সাধনার কথা।

তবুও জীবনে এমন ঘটনা ঘটে, যার প্রতিক্রিয়ায় প্রশ্ন জাগে। রবীন্দ্রনাথের "প্রশ্ন" কবিতাটিই তার প্রমাণ। প্রচণ্ডতম আঘাতের বেদনায় কবি-মর্ম আর্তনাদ ক'রে উঠেছে। তিনি চোখে দেখেছেন, তরুণ কিশোর নিষ্ঠুর অত্যাচারে উন্মাদ হয়ে গেল; অসহনীয় যন্ত্রণায় পাথরে সে মাথা ঠুকছে। মর্মান্তিক বেদনায় মহাকবিও প্রশ্ন তুললেন—

"ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে—।
... ...
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে॥

দুর্দিন, তাতে সন্দেহ কি? যেদিন তাঁর মত মহাকবির সাধনামগ্ন চিত্ত-লোক সাধনা থেকে চঞ্চল হয়ে এমন প্রশ্ন তুললেন, চিরদিনের বিশ্বাস যে দিনের দুর্যোগে বারেকের জন্যও শিথিল হ'ল, সেদিন দুর্দিন বইকি। আমার জীবনে আমার শক্তি, আমার সাধনার বলের তুলনায় এমনই একটি দুর্দিন ছিল; তাই আজও তাকে ভুলতে পারি নি।

কলকাতায় সেবার সেদিন রাত্রে ফিরলাম। রাত্রি তখন এগারোটা।

হাওড়ায় ট্রেন পৌঁছবার কথা নটায়; গাড়ি লেট ছিল। হাওড়ায় নামলাম সওয়া দশটায়, বাগবাজারের বাসা পৌঁছুতে এগারোটার কিছু বেশিও হ'ল। তখনও ঘোড়ার গাড়ি একেবারে উঠে যায় নি। থার্ড ক্লাস গাড়িগুলি ও ট্যাক্সির ভাড়াতে অন্তত এক টাকার মত তফাত হ'ত। ঘোড়ার গাড়িই হোক আর ট্যাক্সিই হোক, চারটি ছেলেমেয়ে, আমরা স্বামী স্ত্রী, বিছানাপত্র, পূজোর পর পূজোবাড়ির কিছু মুড়কি-নাড়ু, কিছুটা তরিতরকারি, বাক্স-প্যাটরা নিয়ে দুখানার কমে স্থান সঙ্কুলান হয় না—দুখানা লাগেই, কাজেই দুটো টাকার তফাত হয়। রিক্‌শয় এলে আরও দেড় টাকা দু টাকা বাঁচত, কিন্তু মেয়েটির গায়ের উত্তাপ তখন ১০৪-এর মত, কাজেই তা করি নি। বাসায় পৌঁছে স্ত্রী বললেন, গঙ্গার জন্যে একবার ডাক্তা'র ডাকলে হ'ত না ?

কথাটা মনে হ'ল। বাগবাজার স্ট্রীটে পশুপতিবাবুর ডাক্তারখানা পর্যন্ত গেলাম, কিন্তু তখন ডাক্তারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। পশুপতিবাবুর বাড়ি তখন চিনতাম না, এবং তখনও তাঁর সঙ্গে তেমন অন্তরঙ্গতা হয় নি যাতে রাত্রি সাড়ে এগারোটা তাঁকে গিয়ে অসংকোচে ডাকতে পারি। কাজেই বাড়ি ফিরে এলাম। বললাম, যাক, কাল সকালেই ডাকব। আজই তো জ্বর হয়েছে এবং ম্যালেরিয়া জ্বর তাতেও কোন সন্দেহ নেই; সুতরাং ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই।

কথাটার গভীরে আরও একটি তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন ছিল। সেটি আমার সেদিনের অর্থনৈতিক অবস্থাতত্ত্ব। পূজোর সময় লিখে এবং প্রকাশকদের কাছে যা পেয়েছিলাম, তা বাড়িতে পূজোর সময় প্রায়ই শেষ হয়ে গিয়েছে, বাগবাজারে পৌঁছে গাড়িভাড়া দিয়ে আমার কাছে অবশিষ্ট আছে একখানা পাঁচ টাকার নোট এবং কিছু খুচরো। সুতরাং দরিদ্রের মনোরথ মনে উঠতে বা উঁকি মারতেই সাহস করলে না, উঠে মিলিয়ে যাওয়া তো পরের কথা। রথে পেট্রোলই ছিল না, স্টার্টই নিলে না; সুতরাং—

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া বাড়ির মুড়ি মুড়কি নাড়ু। শুয়ে পরদিনের প্রোগ্রাম ঠিক করলাম, সর্বাগ্রে টাকার ব্যবস্থা করতে হবে। ভেবে

দেখলাম, একটি লেখার দরুণ একটি কাগজের কাছে পঁচাত্তর টাকা পাব। পূজোর আগে থেকেই পাওনা হয়ে আছে। সর্বাগ্রে সেখানে যেতে হবে। টাকাটা গেলেই পাব না। ওখানকার নিয়ম হ'ল, গিয়ে প্রধান কর্মকর্তার সঙ্গে কথা ব'লে একটি দিন স্থির করতে হয়, পরে সেই দিনে গেলে টাকা পাওয়া যায়। অবশ্য পূজোর আগের পাওনা, কর্তা বলেছেন, পূজোর পরই পাবেন। তারপর এ-কাগজ ও-কাগজ ইত্যাদি। 'কালিন্দী' তখন বইয়ের আকারে বের হয়েছে কি হবে। তার দরুন দু শো টাকা প্রকাশক গিরীন সোমের কাছে পাওনা আছে। গিরীনবাবু খাড়াখাড়ি মানুষ, চুক্তির সময় এক শো দিয়েছেন, বাকি দু শো বই বের হবার এক মাস পরে দেবেন—এমনই কথা আছে। সুতরাং গিরীনবাবু এখন খুব সম্ভবত দেবেন না, তবু একবার যাব তাঁর কাছে। টাকার বিশেষ প্রয়োজন।

ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাত্রি প্রায় দুটোর সময় আমার বড় মেয়ে জ্বরের মধ্যে ছটফট শুরু করলে। আমার স্ত্রী আমাকে ডাকলেন। বোধ হয় মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই মেয়েটি চিৎকার ক'রে উঠে অজ্ঞান হয়ে গেল। হাত-পা তখন ঠাণ্ডা। আমি অন্ধকার দেখলাম চারিদিক। প্রথম মুহূর্তে যেন বিমূঢ় হয়ে গেলাম। কি করব? কিন্তু সংসারে মন্দের থেকে ভালই বেশি; মহাপ্রকৃতি নিজেই বোধ করি অসৎ থেকে সতের দিকে চলেছেন, সারা সৃষ্টি জুড়ে চলেছে সেই সাধনা, এই পৃথিবীতে মহাসৃষ্টির এক কণার তুল্য এই গ্রহে মানুষের মধ্যে সেই সাধনার রূপ স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ। তাই আর্তের কণ্ঠস্বর শুনলে গৃহদ্বার আপনি খুলে যায়, করুণায় বিগলিত মানুষ অযাচিত সেবা এবং সাহায্য নিয়ে ছুটে আসে। উপর থেকে নেমে এলেন আমার বাড়িওয়ালা বলাইবাবুর স্ত্রী—আমার দিদি এবং তাঁর মেয়ে পারুল। সামনের দিকে ও-বাড়ির বারান্দায় বেরিয়ে এলেন যামিনীদা, তাঁর স্ত্রী, তাঁদের বড় ছেলে ধর্মদাস।

দিদি অর্থাৎ বলাইবাবুর স্ত্রী সংসারে পাকা গিন্নী। অভিজ্ঞতা অনেক। তাঁর সাহস ধৈর্য দেখবার মত। আমার মেয়ের মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে নিজের মেয়ে পারুলকে বললেন, জল ঢাল্ মাথায়।

ও-বাড়ি থেকে যামিনীদার স্ত্রী এলেন। আমি বেরিয়ে যাচ্ছিলাম ডাক্তার ডাকতে; কিন্তু থমকে দাঁড়ালাম। মনে হ'ল সম্বলের কথা। সঙ্গে সঙ্গে যামিনীদার কণ্ঠস্বর শুনলাম—ধর্মদাস, যাও, ডাক্তার ডেকে আন। ধর্মদাস ছুটে বেরিয়ে গেল। বোধ করি দশ-বারো মিনিটের মধ্যেই ডাক্তার নিয়ে ফিরে এল।

ডাক্তার দুটো ইন্‌জেক্‌শন দিলেন। ধীরে ধীরে মেয়ের জ্ঞান ফিরল। হাত-পা গরম হ'ল। ডাক্তার সমস্ত শুনে বললেন, বোধ হয় খারাপ ধরনের ম্যালেরিয়া।

বোধ হয় নয়—ঠিকই তাই। আমার মেজো মেয়ে বুলু এই ম্যালেরিয়াতেই মারা গিয়াছে। আমাদের ও-অঞ্চলে এ ম্যালেরিয়া আছে। ছেলেদেরই বেশি হয় এবং মারাত্মকই হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে। ভয় পেলাম। কারণ রোগটির প্রথম ধাক্কা কাটলেও বিপদ কাটে নি। আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে। বুলুরও প্রথম ধাক্কা কেটেছিল, আমরা—শুধু আমরা কেন, ডাক্তার পর্যন্ত ভেবেছিলেন, বিপদ কেটে গিয়েছে। কিন্তু তিন দিন পর জ্বর না-থাকা অবস্থাতেই হয়েছিল দ্বিতীয় আক্রমণ। সেই আক্রমণই শেষ আক্রমণ হয়েছিল।

সে রাত্রি কাটল। সকালবেলা পশুপাতবাবুকে ডাকলাম। তিনি আবারও একটা কুইনিন ইন্‌জেক্‌শন দিলেন। ব'লে গেলেন, ভয় নেই।

আমি কিন্তু বিমূঢ় হয়ে ভাবছিলাম, টাকা কোথায় পাব?

পকেটে ছিল পাঁচ টাকা কয়েক আনা। রাত্রে ডাক্তারকে পাঁচ টাকা দিয়েছি। আরও কিছু বাকি আছে, বলেছি, সকালে দিয়ে আসব। সম্বল রয়েছে কয়েক আনা পয়সা। ভাবছিলাম, কোথায় যাব?

স্ত্রী একখানি দশ টাকার নোট বের ক'রে দিলেন। তিনি সংসার থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তাই নিয়ে ডাক্তারের পাওনা মিটিয়ে ওষুধ বার্লি সাবু কিনে, বাজার ক'রে দিয়ে, বাকিটা, বোধ করি টাকা ছয়েক, স্ত্রীর হাতে দিয়ে কয়েক আনা পয়সা পকেটে ফেলে বেরিয়ে পড়লাম।

বড় কাগজের আপিসে যেখানে পঁচাত্তর টাকা পাওনা আছে, যেটা পূজোর আগে থেকে পাওনা হয়ে রয়েছে, সেইটের জন্য ওইখানে যাব

স্থির করলাম। নিয়ম যাই হোক, আমি যেখানে এমনই বিপদে পড়েছি সেখানে কি টাকাটা তাঁরা দেবেন না? এ কি হতে পারে? তার উপর তাঁরা তো সাধারণ-ব্যবসায়ী নন, কাগজের পরিচালক। দেশজোড়া খ্যাতি।

প্রায় ছুটেই গেলাম। দশটার আগে পৌঁছুতে হবে। কারণ কাগজের সর্বময় কর্তা যিনি, তাঁর অনুমোদন ব্যতীত একটি পয়সাও বের হয় না, এবং কর্মকর্তার আপিসে আসা-যাওয়ার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। দশটা থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত যে কোনও সময় আসতে পারেন। আধ ঘণ্টা থেকে ভাউচার সই ক'রে এবং প্রাপক যাঁরা উপস্থিত থাকেন তাঁদের পাওনার জন্য দিন নির্দিষ্ট ক'রে দিয়ে চ'লে যান। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হ'লে দশটার সময় না গেলে হয়তো শুনব, এই কয়েক মিনিট হ'ল তিনি চ'লে গেছেন। গিয়ে বসলাম আপিসের সম্পাদকীয় বিভাগে। সকলেই বন্ধুস্থানীয়। একজন ছিলেন অগ্রজতুল্য শ্রদ্ধার পাত্র। বিজয়া-সম্ভাষণের পর তাঁদের কাছে বসলাম। আমার কেন সেথা আগমন শুনে সকলেই চুপ ক'রে গেলেন। বিবরণ শুনে দু-একজন সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। কিন্তু সে প্রকাশ যেন সহজ স্ফূর্তি পেল না। একজন বললেন, তাই তো, এই অবস্থায় কতক্ষণ যে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে!

হেসে বলেছিলাম, যতক্ষণই হোক, করতেই হবে। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। বিধাতার ভাউচার সই ভিন্ন অন্নজল মেলে না। গল্প জানেন তো!

বললাম গল্পটা। এক জামাই যাচ্ছিল শ্বশুরবাড়ি। পথে একটা শুকনো নদী। ভোরবেলা। চারিদিক জনহীন। শুধু একটা পাগলের মত লোক আপন মনেই বালি তুলছে, মাপছে আর ঢালছে। মুখে বিড়বিড় ক'রে বকছে। কান পেতে শুনলে, লোকটা প্রলাপের মত বলছে—শাক ভাত ডাল ঝোল ঝাল ইত্যাদি। কখনও বলছে, এক অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন। কখনও বলছে, এক মুঠো ভাত। কখনও বলছে, ফক্কা।

শ্বশুরবাড়ি-যাত্রী জিজ্ঞাসা করলে, তুমি পাগল নাকি?

লোকটি মুখ তুলে বললে, উঁহু। আমি বিধাতা পুরুষ।

—ওরে পাগল! তুই বিধাতা পুরুষ? তা বিধাতা পুরুষের এ সব কি হচ্ছে?

—দুনিয়ায় আজ কে কি খাবে তাই মাপছি। আমি না-মাপলে কারুর ভাগ্যে কিছু জোটে না।

লোকটি হো-হো ক'রে হেসে উঠল। তারপর বললে, আমার ভাগ্যে কি মাপছ বল দেখি?

বিধাতা নামক পাগলটি ফিক ক'রে হেসে এক মুঠো বালি ঢেলে বললে, মাপলাম শরবত, এবার তুমি যা বলবে তাই মাপব। ইচ্ছে হচ্ছে, অনেক ভাল জিনিস মাপি। তা বল—তুমিই বল।

লোকটি বললে, আমার নামে আজ কিছু মেপো না। বুঝলে?

—মাপলাম না। ফক্কা। উপরন্তু এমন কিছু মাপলাম, যা পরে টের পাবে। আবার ফিক ক'রে হাসলে বিধাতা। লোকটিও হো-হো শব্দে হেসে তাকে ব্যঙ্গ ক'রে চ'লে গেল। যাবেই তো। যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ি। আগে থেকে খবর দেওয়া আছে। তার খাবার আটকায় কে?

শ্বশুরবাড়ি পৌঁছল, তখন বেলা দুপুর। পথে দেরি হয়ে গিয়েছিল। শ্বশুরবাড়ির সকলে উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রতীক্ষা করছিল। যেতেই প্রচুর অভ্যর্থনা—হাত পা ধোয়ার জল, পাখার বাতাস, জলখাবার। শ্বশুর বললেন, জলখাবার থাক্। খাবার বেলা হয়েছে। শরবত দাও। তারপর স্নান ক'রে ভাত।

স্নান ক'রে আহারের স্থানে বসল জামাই। চারিদিকে সাত-সাতটি শ্যালক দাঁড়িয়ে আছে তদ্বিরের জন্য। শ্বশুর দাঁড়িয়ে আছেন। শাশুড়ী এলেন ভাতের থালা হাতে। শ্যালিকা এলেন একটা থালা নিয়ে, তার উপর পাঁচ-সাতটা বাটি সাজানো। কোনটায় ঝোলে মাছের মুড়ো, কোনটায় ঝালে মাছের পেটি, কোনটায় অম্বলে মাছের ল্যাজা, কোনটায় দই, কোনটায় পায়েস ইত্যাদি। শাশুড়ীর হাতের থালার দিকে তাকালে জামাই। তাকিয়েই মুচকে হেসে ফেললে। মনে পড়ল সেই পাগলটার কথা। হায় রে বিধাতা!

মুহূর্তে শাশুড়ী ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। জামাই তাঁকে দেখে হাসছে? সঙ্গে সঙ্গে জামাইয়ের পিঠে সাত-সাতটি কিল একসঙ্গে। দুম্-দাম, গুম-গুম, দুপ-দাপ ইত্যাদি। মারো—জামাইকে। পাষণ্ড

একটা পিঠে এক হাতের সাতটা কিল, আর সাত হাতের একসঙ্গে এক এক কিল—এ দুয়ে অনেক তফাত। এক হাতের সাতটা কিল সইতে সময় পাওয়া যায়। আর সাত হাতের একসঙ্গে এক এক কিল অর্থে এক মুহূর্তে সাতটা কিল। ও সওয়া যায় না। ভীম খেতে খেতে বক-রাক্ষসের কিলগুলো খেতে পেরেছিলেন, বক একা বক ব'লে। সাতটা বক একা হ'লে সহ্য করতে পারতেন—এ বেদব্যাসও কল্পনা করেন নি। সাত শ্যালকের সে প্রহার জনযুদ্ধের সামিল। জামাই 'বাপ রে' 'মা রে' ব'লে উঠে-প'ড়ে ছুটল। ছুটল তো শ্যালকবাহিনীও ছুটল। গ্রাম পার ক'রে দিয়ে তারা ঘরে ফিরল। জামাই ছুটে এসে হাজির হ'ল সেই শুকনো নদীর ধারে। দেখলে, বিধাতা পাগলা তখনও বালি নিয়ে খেলা করছে।

তাকে দেখেই বিধাতা হেসে বললে, কি, কেমন হ'ল?

জামাই তার পায়ে ধ'রে বললে, এমন আর হয় না। বিধাতা, তোমার জয় চিরদিন। নতুন জামাইও হার মানছে তোমার কাছে।

গল্প শেষ ক'রে বললাম, সুতরাং বিধাতা-স্থানীয়দের জন্য অপেক্ষা করতে হবে বইকি।

হাসলেন তাঁরা। তারপর তাঁরা আপন কাজে মন দিলেন। আমি সমালোচনার জন্য প্রদত্ত বইয়ের গাদা থেকে বই টেনে দেখতে লাগলাম। ওদিকে ক্লক ঘড়িটা চলছে টক-টক শব্দে। আধ ঘণ্টা বাজল। সাড়ে দশটা। এগারোটা, আবার আধ ঘণ্টা—বারোটা—একটা—দেড়টা।

এর মধ্যে বার-দুই চা এল আপিস থেকে। আমি বাইরে বেরিয়ে গিয়ে ফটকের ধারে ফুটপাথে ভাঁড়ে-বিক্রি-করা চা খেয়ে এলাম আরও বার-দুই কি তিন।

দেড়টার সময় অগ্রজতুল্য ব্যক্তিটি চঞ্চল হলেন, বললেন, তাই তো ভায়া! এখনও স্নান করেন নি, খান নি!

—কিন্তু আমার যে টাকা না-হ'লেই নয় দাদা।

—কিন্তু—। তিনি থেমে গেলেন। যে কথাটা তাঁর মনে হয়েছিল সেটা আমার কাছে লুকনো রইল না, কিন্তু ওই প্রতিষ্ঠানের কর্মী ব'লেই কথাটা তিনি উচ্চারণ করতে পারলেন না। কথাটা—কিন্তু টাকা কি পাবেন? দেবেন?

আমার কিন্তু ধারণা ছিল, নিশ্চয় পাব। আমার এত বড় দুঃসময়! এত বড় কাগজের প্রতিষ্ঠাবান কর্তা, তিনি কি এ শুনেও 'না' বলতে পারেন? অন্তত কিছু তো দেবেনই।

ঢং ঢং ক'রে দুটো বাজল। কয়েক মিনিট পরই গাড়ির হর্ন বাজল নীচে। জানালা থেকে উঁকি মেরে দেখলাম, সেই বিরাটকায় মাস্টার-বুইকখানিই বটে। উঠে দাঁড়ালাম। অগ্রজতুল্য ব্যক্তিটি হেসে বললেন, বসুন বসুন। আর দশ মিনিট ধৈর্য ধরুন। অর্থাৎ কর্তাকে আপিসের হিসেব নিকেশ দেখতে দিন। আজ কার পেমেণ্ট আছে দেখবেন, চেক সই করবেন। পাওয়া চেকের পিঠে সই করবেন। খাতায় সই করবেন। এগুলি হয়ে যাক।

আরও মিনিট দশেক পর তিনি নিজেই উঠে গেলেন। ফিরে এলেন গম্ভীরমুখে। বললেন, হবে না আজ। আমি নিজে গিয়েছিলাম আপনার জন্যেই। তবু যান আপনি, দেখুন, বলুন।

গেলাম। সবিনয়ে নিবেদন করলাম, নিজের বিপদের কথা। বললাম, এ বিপদে—

—আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আপনাদের মত লোকেরও বিপদ হয়! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, কিন্তু আজ তো আমি কিছুই করতে পারব না তারাশঙ্করবাবু। আপনি তো জানেন, আমাদের নিয়ম আমরা দিন নির্দিষ্ট ক'রে দি। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট পেমেণ্টগুলি হয়। তার একটার ব্যতিক্রম হ'লে সব গোলমাল হয়ে যাবে। আপনি দশ দিন পর আসবেন। আমি লিখে রাখলাম।

—কিছু টাকা—কুড়ি-পঁচিশ টাকাও অন্তত—। আমার কণ্ঠস্বর যেন রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। আমি শুনতে প্রস্তুত ছিলাম না এমন কথা। ভাবতে পারি নি।

—আজ কিছুই পারব না। আপনি দশ দিন পর আসবেন। নমস্কার।

চোখ ফেটে জল এল। বেরিয়ে এলাম। সম্পাদকীয় বিভাগ থেকে ডাকলেন, ভায়া! কিন্তু চোখের জলের লজ্জায় সে ঘরে ঢুকলাম না। প্রায় ছুটেই নেমে এলাম নীচে। ফটক পার হয়ে ফুটপাথে দাঁড়ালাম। খাঁ-খাঁ করছিল দুপুরের রাজপথ। শীতের আমেজ পড়েছে। পিচ গলছিল না, তবু নরম রয়েছে। ধুলো উড়ছে। জনবিরল ট্রাম ছুটছে। ক্ষিদেয় আমার পেট জ্বলছে। ক্ষোভে দুঃখে দুশ্চিন্তায় ব্রহ্মরন্ধ্র যেন ফেটে যাচ্ছে মনে হ'ল। কয়েক মিনিট একটা বাড়ির ছায়ায় দাঁড়িয়ে আত্মসম্বরণ করলাম। পকেটে তখন আনা তিনেক পয়সা অবশিষ্ট ছিল। এক আনার মুড়ি, দু পয়সার ছোলা কিনে পকেটে পুরে চিবুতে চিবুতে গলিপথ ধ'রে হেঁটে এসে পৌঁছলাম কাত্যায়নী বুক স্টলে গিরীন সোমের কাছে।

'কালিন্দী'র দরুন গিরীনবাবুর কাছে দু শো টাকা পাব। আগেই বলেছি, গিরীনবাবু কথার মানুষ। কথার খেলাপও করেন না, আবার কথার বাইরে প্রশ্রয়ও দেন না। অন্তত প্রথম প্রথম তাই বটে। সেই মতই দেখেছি তাঁকে। কথার বাইরে অনুরোধ করলে সোজা হাত জোড় ক'রে বলতেন, আমাকে মাফ করবেন।

পরে গিরীনবাবু আমার অনেক করেছেন, সে কথা পরে বলব; কিন্তু সেকালে তিনি এমনই মানুষ ছিলেন। সেদিন পর্যন্ত সেই ধারণাই ছিল। সেই দিনই প্রথম বদল হ'ল। সেদিন আমার বেশি টাকার দরকার ব'লেই গিরীনবাবুর কাছে আমি গিয়েছিলাম। নইলে যেতামই না। অন্তত কুড়ি-পঁচিশ টাকা চাই। সেকালে কুড়ি-পঁচিশ টাকা—বেশি টাকাই ছিল। অন্তত লেখার ক্ষেত্রে—বইয়ের কারবারে—লেখকদের কাছে ছিল।

গিরীনবাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন।

কৃষ্ণবর্ণ ক্ষীণকায় মানুষ আমি, তার ওপর স্নান নেই, আহার নেই, বেলা সওয়া তিনটে; বুকে দুশ্চিন্তা, মনের মধ্যে জ্বালা—সব মিলে

বোধ করি আমাকে এমনই হতভাগ্যের শ্রী বা চেহারা দিয়েছিল যা দেখে পূজোর পর বিজয়া-সম্ভাষণ করতে গিয়ে চমকে উঠলেন গিরীনবাবু।

প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে তারাশঙ্করবাবু? এমন চেহারা আপনার?

আমি কোন রকমে বিপদের কথাটুকু ব'লেই বললাম, 'কালিন্দী'র টাকা আমার এখনও পাবার সময় নয়, কিন্তু আমার এই বিপদ। আপনি কি—

গিরীনবাবু বললেন, বসুন। উঠে গেলেন তিনি। কোন দোকান থেকে দুটি সন্দেশ এক গ্লাস জল এনে আমার সামনে নামিয়ে দিয়ে বললেন, আগে খান। তার পর এক শো টাকা আমায় দিয়ে বললেন, বাড়ি যান। মেয়ে কেমন থাকে খবর দেবেন।

সেই এক আমার জীবনের অক্ষয় স্মৃতি।

প্রথমেই বলেছি, কথাটা না লিখলেই ভাল হ'ত। কিন্তু না লিখেই পারলাম না। কারও বিরুদ্ধে বিষোদ্গার আমার উদ্দেশ্য নয়। সে সময়ে বাংলা-সাহিত্যের সেবকদের মধ্যে আমার পর্যায়ের বন্ধুদের অবস্থার কথাই জানাচ্ছি আজকের অনুজদের, পাঠকদের। সেকাল থেকে এ-কালের অবস্থা অনেক পালটেছে—নিঃসন্দেহে পালটেছে। তবুও নবীন যাঁরা, তাঁদের দুঃখ এখনও ঘোচে নি। নবীনদের অবশ্য প্রতিষ্ঠার সময় কিছু যুদ্ধ করতেই হবে। যুদ্ধ মানেই বলছি, লিখে তাঁরা জয় করবেন—সেইটে তাঁদের আঘাত। আবার প্রকাশক পাঠক এবং কাগজের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনেক সময় প্রত্যাখ্যাত হবেন, নিন্দিত হবেন, বই হয়তো অবিক্রীত থাকবে, বই নিতে প্রকাশক দ্বিধা করবেন। কিন্তু এমন ক্ষেত্রে কেউ যেন প্রত্যাখ্যান না করেন। প্রকাশক সম্পাদক কাগজের কর্ণধার যাঁরা, তাঁরা যেন এই নবীন লেখকদের মুখের দিকে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখেন। শুকনো মুখ, দৃষ্টির বেদনা—এ দুটো চোখে পড়বেই। যদি এমন ক্ষেত্র হয় যে, লেখা পছন্দ নয়, তবুও ফিরিয়ে দেবেন না। সে লেখা না নিয়েও তাঁকে সাহায্য করবেন, বলবেন, নতুন লেখা এনে দেবেন। ঠকবেন না।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, প্রকাশকদের কাছে ও কাগজের কর্তৃপক্ষের

কাছেও লেখকদের অসততা সম্পর্কে অভিযোগ শুনেছি। কিন্তু সবিনয়ে মনে করিয়ে দেব, লেখকদের অসততায় অর্থাৎ দু-একজনের টাকা নিয়ে লেখা না দেওয়ায় বা ভুঁয়ো বইয়ের স্বত্বের জন্য টাকা নেওয়ায় কোন কাগজ বা কোন প্রকাশক ফেল পড়েন নি। কিন্তু আজও নবীন লেখকেরা সেদিনের আমার মত বিব্রত হচ্ছেন। ভাগ্যবশে আমি সেদিন টাকা পেয়েছিলাম। আমার মেয়ে বেঁচেছিল। পশুপতিবাবু ডাক্তারের মত সহৃদয় বন্ধু সাহায্য করেছিলেন। যামিনীদা অভয় দিয়েছিলেন। নবীন লেখকদের অনেকের এমন ভাগ্য হয় নি—আজও হয় না। হয়তো তাঁদের প্রাণের ধন চ'লে যায়। শুকনো মুখ, বেদনাকাতর দৃষ্টি দেখলে লেখকদের সম্মান ক'রে সহৃদয়তার সঙ্গে তাঁদের সাহায্য করবেন। লেখকেরা বড় অভিমানী। তাদের আত্মমর্যাদাবোধ একটু বেশি প্রখর।

শুধু প্রকাশক, সম্পাদক, কাগজের কর্তৃপক্ষই নয়; সরকার, সরকারী কর্মচারী এঁদের কাছেও নিবেদন জানাই এই সুযোগে। এদিক থেকে তাঁদের দৃষ্টির শৈথিল্য, নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ির অজুহাতে অবহেলা অনেক। সামান্য আবেদনের উত্তরে 'হাঁ' বা 'না' বলতে সরকার-দপ্তরের আট-ন মাস সময়েও কুলোয় না। আর অন্ধ সাহিত্যিক দিনের পর দিন চিঠির প্রত্যাশায় থাকেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন, সরকারী চিঠি আসে নি? স্ত্রী বলেন, না। চুপ ক'রে থাকেন তিনি। ভাবেন, তাঁর মৃত্যুতে শোকসভাটা নিশ্চয় হবে। খবর পেলে সরকারী দপ্তর থেকে হয়তো একটা ফুলের মালাও আসতে পারে। পরক্ষণেই সন্দেহ জাগে—মালা পাবার উপযুক্ত সাহিত্যিক কি না সে বিবেচনা করবার মীটিংটা হয়ে উঠবে তো? কমিটীতে কে কে আছে? কোনও সাহিত্যিক আছে কি?

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি পুরনো আলিঙ্গন

আমি এইমাত্র সুইট্‌জারল্যাণ্ড থেকে ফিরলুম।

বড় সুন্দর দেশ। ধুলো, বালি আর কালির সঙ্গে পরিচয় হয় না সমস্তটা জীবন পথে প'ড়ে থাকলেও।

আমার জীবনের চল্লিশটা দিন সুইট্‌জারল্যাণ্ডের রাস্তায় পড়েছিল, আরও চল্লিশটা বছর প'ড়ে থাকলেও আমার কোন আক্ষেপ থাকত না। আক্ষেপ মানে—স্বদেশের সঙ্গে সম্পর্ক না-রাখার আক্ষেপ। আজকাল উড়োজাহাজে ডাক-বিলির সুবন্দোবস্ত থাকায়, চিঠিপত্রের দ্রুত যোগাযোগে স্বদেশের ছবি কিছুতেই ভুলে যাওয়া যায় না।

আমি ভুলতে চেয়েছিলুম। পারি নি। ভারতবর্ষ থেকে একখানা চিঠি এসেছে, চারদিন হ'ল টেবিলের ওপর প'ড়ে আছে, খুলি নি। আমি ভুলে যেতে চেয়েছিলুম ভারতবর্ষকে। ধুলো, বালি আর কালির ভারতবর্ষ আমার সুস্থ জীবনকে অসুস্থ ক'রে তুলেছে। সুইট্‌জারল্যাণ্ডে আমি এসেছিলুম হাওয়া পরিবর্তনের জন্য, সাদা শিফন শাড়ির মত পরিষ্কার হাওয়া।

ভারতবর্ষের চিঠিখানা টেবিলেই প'ড়ে আছে। প্রথম দিন অতিকষ্টে টেবিলের দিকে পেছন দিয়ে ঘরের মধ্যে চলাফেরা করলুম। টেবিলটা ছিল পূব দিকে। অতএব পশ্চিমের দিকে মুখ ক'রে দেহটাকে কাত ক'রে দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করতে হ'ত। উত্তর গোলার্ধের দূরত্ব ধ'রে রাখবার জন্য কম্বলটাকে টেনে তুলে দিতুম মাথার চুল অবধি। সারারাত শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হ'ত, ভাল ক'রে ঘুমোতে পারতুম না। পারতুম না বটে, কিন্তু বিষুব-রেখার দক্ষিণে অবস্থিত ভারতবর্ষের কথা মনে পড়লে কম্বল-আচ্ছাদিত সংক্ষিপ্ত আয়তনটুকুর মধ্যে কম্পন উঠত, মনে হ'ত পুরো দক্ষিণ গোলার্ধটি এক মুঠো ধুলোর মত হয়ে আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করছে!

চারদিন পর কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে পূব দিকে মুখ ক'রে 'নিরাপদ-ক্ষুর' দিয়ে দাড়ি কামাতে কামাতে হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়ল টেবিলের ওপর। ভারতবর্ষের চিঠিখানা প'ড়ে রয়েছে। খামের ওপর টিকিট লাগানো আছে, টিকিটের ওপর আঁকা অশোক-স্তম্ভ। আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলুম, নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন সিংহ তিনটিকে আক্রমণ করবার জন্য এগিয়ে গেলুম টেবিলের দিক। মনে হ'ল, আমি পশুর চেয়েও বেশি হিংস্র। আমার ভয়ে পশুগুলো যেন মাটি কামড়ে প'ড়ে আছে গিরি-গহ্বরে। আমি গিরি-গহ্বর থেকে সিংহ তিনটি টেনে বার করবার জন্য খামটি হাতে তুলে নিলুম। মনে আমার আগুন

জ্বলতে লাগল। "আমরা বাঙালী বাস করি এই—" কবিতার কলিগুলো সুইট্‌জারল্যাণ্ডের ঠাণ্ডায় আগুনের হলকার মত আমার চামড়ায় তাপ দিতে লাগল। "—বাঘের সঙ্গে লড়াই করেছি—," আর খামের সঙ্গে পারব না? চেষ্টা করতে লাগলুম। খামখানা হাতে নিয়ে 'অগ্নি চুল্লি'র দিকে এগিয়ে গেলুম। আমার এক হাতে 'নিরাপদ ক্ষুর', অন্য হাতে তিনটি সিংহ—অশোক-স্তম্ভ। কেবল স্তম্ভ নয়, ভারতবর্ষের সরকারী পরিচয়। কেবল সাধারণ পরিচয় নয়, একটা গোটা জাতির ঐতিহ্য স্তম্ভ। এই স্তম্ভের মধ্য দিয়ে কেবল সম্রাট অশোকের কীর্তিই দেখা যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে তাঁরও পশ্চাতের ভারতবর্ষকে ইতিহাসের অবিচ্ছিন্নতায়। আমি দেখলুম, ভারত সরকারের অশোক-স্তম্ভটাও সেই অবিচ্ছিন্নতারই অংশ। অংশ ভারতবর্ষের শ্যামলী।

সহসা টুপ ক'রে খামের ওপর এক ফোঁটা রক্ত পড়ল। ক্ষুর টানতে গিয়ে কোন সময় গালের চামড়া কেটে গেছে—টের পাই নি। টের পাওয়ার কথাও নয়। ইতিহাস যখন কাটতে শুরু করে, কেউ তখন টের পায় না। সুইট্‌জারল্যাণ্ডে আমি এসেছিলুম হাওয়া পরিবর্তন করতে। ভারতবর্ষের শ্যামলীকে আমি ভুলে যেতে চেয়েছিলুম। কিন্তু পারলুম না। শ্যামলীর ইতিহাস অস্ত্র আমায় কাটছে। পাঁচ বছরের পরিচয় পাঁচ লক্ষ বছরের ব্যবধানেও বোধ হয় ভুলে যাওয়া যাবে না। খামখানা খুললুম।

শ্যামলী লিখেছে: শম্ভুদা, আজ আমার জন্মদিন। —

কাঁচের জানলার ওপর পর্দা ঝুলছিল। পর্দাটা এক দিকে সরিয়ে দিয়ে জানলাটা খুলে দিলুম। বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। দেখা যায় জুরা পাহাড়ের বুকে বরফ জমেছে। কিন্তু ইতিহাসের বুকে কোনদিনও বরফ জমে না। সময়-স্রোত চিরদিনই তরল। জানলার মধ্য দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি, অসংখ্য শ্যামলীর অসংখ্য জন্ম সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়েছে। কোন একটি বিশেষ জন্মদিনের চেয়ে শ্যামলীর সংখ্যাতীত জন্মের সমষ্টিগত বিস্ময়টা যেন আজ আমায় টানতে লাগল ভারতবর্ষের দিকে। কলকাতার তারা রোডের শ্যামলী *আমার জীবনে অ্যাক্সিডেন্ট—কিন্তু শ্যামলীর জন্ম অ্যাক্সিডেন্টাল নয়। একটা সিগারেট ধরিয়ে পুনরায় পড়তে লাগলুম শ্যামলীর চিঠি।*

"শম্ভুদা, জন্মদিনে আজ কেবল তোমার কথাই স্মরণ করছি। কেবল তোমার কথাই। তুমি যেদিন ভারতবর্ষের মাটি থেকে আলগা হয়ে গেলে, আমিও সেদিন আলগা হয়ে গেলুম আমার ভাগ্য-বিধাতার সম্পর্ক থেকে। তোমার

মত একজন আধুনিক নিষ্ঠুর ও নৃশংস পুরুষকে পাওয়ার জন্য আমার তপস্যা আর লোকোত্তরিত নির্ভরতায় অপচয়িত হবে না। একটা অন্ধকার বৃত্তের মধ্যে তোমাকে বড় সুন্দর দেখায়! আমার যক্ষ্মা-যন্ত্রণার চক্রাকার জগতে তুমিই একমাত্র পুরুষ যার ভালবাসার শলাকা ঊর্ধ্বদিকে বর্ধিত হয় না, বৃত্তের মধ্যে কেবল ঘুরে ঘুরে মরে।"

এই পর্যন্ত প'ড়ে চিঠিখানা বন্ধ ক'রে রাখলুম। এক নিশ্বাসে পড়বার মত চিঠি এ নয়। ভারত-সরকারের অশোক-স্তম্ভটা যেন সমগ্র সুইট্‌জারল্যাণ্ডকে গুঁতো মারতে লাগল। ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি? এমন সুন্দর সাজানো-গোছানো ষোল হাজার বর্গ মাইলের দেশটিতে এসেছিলুম হাওয়া বদলাতে, ভুলতে চেয়েছিলুম ভারতবর্ষকে।

পশ্চাতের শ্যামলী আমার সামনে এসে দাঁড়াল। বুকে যক্ষ্মা, ঠোঁটের কিনারে মেটে সিঁদুরের মত রক্তের ছিটে-ফোঁটা লেগে রয়েছে। উচিত ছিল ওরই হাওয়া বদলাতে আসা। কিন্তু শ্যামলীর ভাগ্যবিধাতা শ্যামলীর হাতে টাকাপয়সা দেন নি। আমিই দিয়েছি ওকে দু-দশটা উপহার। সে দেওয়ার মধ্যে খরচের উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল না, ছিল শ্যামলীর কাছ থেকে পাওয়া প্রেমের হিসেব-করা মূল্য। বিনিময়-অর্থনীতি আমার জীবনের একমাত্র সুস্থ নীতি। কিন্তু শ্যামলীর কাছে সেই উপহারগুলোর কতই বা মূল্য! বেচতে গেলে হয়তো খদ্দেরই পাবে না। অতএব শ্যামলী সুইট্‌জারল্যাণ্ডে আসতে পারল না। আমার অনেক টাকা, ওকে দিতে পারতুম কিছু। কিন্তু আমার খরচের মধ্যে অর্থনীতির বৈজ্ঞানিক বাঁধন অত্যন্ত টাইট। ইচ্ছে করলেই আমি দিতে পারি না। জড়বাদের ব্যালান্স-শীটে কড়াক্রান্তির ভাবপ্রবণতা নেই, নেই কানাকড়ির ভুলচুক। সুতরাং ভুল আমার নয়, ভুল অর্থবিদ্যার।

ওকে আমি হয়তো বিয়েও করতে পারতুম। যক্ষ্মার আক্রমণ আমায় রুখতে পারত না। গত পাঁচ বছর ধ'রে ওকে বোধ হয় আমি বিয়ে করব ব'লে আশাও দিয়েছিলুম। কিন্তু মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞান আমার বিয়ের রাস্তা বন্ধ ক'রে দিয়ে হাতে তুলে দিল একটি আশার আঙুর। সেই আঙুরটি আমি গত পাঁচ বছর ধ'রে শ্যামলীর মুখের সামনে ঝুলিয়ে রেখেছিলুম। নইলে শ্যামলীর যতটুকু আমি পেয়েছিলুম, ততটুকুও পেতুম না। আর পুরুষমানুষ যদি ততটুকুও না পায়, তবে তার পুরুষ হয়ে জন্মানোর দরকারই হ'ত না। অতএব শ্যামলীকে বিয়ে করার দোষ আমার নয়, মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের। মেয়েমানুষের মুখের সামনে

বিয়ের আঙুরটি ঝুলিয়ে না রাখলে ওরা ভালবাসতে পারে না। তবে কেন, শ্যামলী লিখেছে—আমি নিষ্ঠুর, আমি নৃশংস?

সিগারেটের গোড়ার দিকটা কখন যে চিবিয়ে ফেলেছি খেয়াল করি নি। একটা প্যারাগ্রাফ পড়তেই কণ্ঠনলীর প্রাচীর ভিজে উঠেছে পচা তিক্ততায়। মনের প্রাচীরও বোধ হয় স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠল।

সুইট্জারল্যাণ্ডের বিশুদ্ধ হাওয়ায় আমি বোধ হয় আর পরিশুদ্ধ হতে পারলুম না। অশোক-স্তম্ভ-আঁকা টিকিটের স্বাক্ষর নিয়ে উপস্থিত হয়েছে পশ্চাতের এক ক্ষীণাঙ্গী বাস্তব, যক্ষ্মা-বীজাণুর চেয়েও সে বাস্তব বড়। আমার জীবনের ইতিহাস থেকে তাকে আর কেটে বাদ দেওয়া যাবে না। যক্ষ্মা-বীজাণুর কোষস্থিত কষের মধ্যে খুঁজলে আমায় পাওয়া যাবে—পাওয়া যাবে শ্যামলী-জীবনের ভ্রষ্ট-লগ্ন। দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে শ্যামলী লিখেছে: তারা রোডের বাড়িতে দিন-দিনই অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। তিনতলার ছাদে সেই ছোট ঘরটায় আমি আছি, মানবসমাজ থেকে একেবারে পরিত্যক্ত হয়ে। জানলা দিয়ে কলকাতার আকাশ দেখা যায়। আমি দিনরাত চেয়ে থাকি আকাশের দিকেই। আমার দৃষ্টির প্রসারতা বাড়তে থাকে আকাশের গায়ে ভর দিয়ে। বিষুবরেখা পার হতে এক মিনিটও লাগে না। আমি খুঁজতে থাকি সেই মিলনরেখাটি, যেখানে কলকাতার আকাশ গিয়ে মিশেছে সুইট্জারল্যাণ্ডের আকাশের সঙ্গে। তারই নীচে হয়তো তোমার হোটেল। ঝক্ঝকে তক্তকে কামরায় তুমি পায়চারি করছ, হিসেব করছ কত ধানে কত চাল হয়! কিন্তু তুমি কি জান শম্ভুদা যে, সবচেয়ে বড় অঙ্কের চূড়ায় ধানচাল নেই, আছে অঙ্কের দর্শন? জীবনের বিস্তৃতি সেখানে বিরাট। সেখানে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাওয়ার পথ খুঁজছে মানুষ। বিজ্ঞানের আলোয় সে পথ সত্যিই সমুদ্ভাসিত। শম্ভুদা, তোমার কি মনে পড়ে কবির সেই লাইনগুলো?—

...At the still point, there the dance
is,
But neither arrest nor movement. And do not call it
fixity,
Where past and future are gathered...Except for the
point, the still point,
There would be no dance, and there is only the dance.

(১৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নামের নমুনা

প্রসিদ্ধ শিকারী ৺কান্তি চৌধুরীর একটি গল্প আপনাদের শুনাইতেছি।

কান্তি চৌধুরী বলিলেন:

ভাদ্র মাস, ভ্যাপসা গরম। বাইরে বিষম বৃষ্টি, আপিসে পাখার তলায় ব'সে ঘেমে নেয়ে যাচ্ছি। যতীনবাবু এসে বললেন, কান্তিবাবু মশায়, বেড়াতে যাবেন?

যতীনবাবুকে মনে আছে নিশ্চয়ই, সেই যাঁদের দেশে গিয়ে খানসায়েবকে দেখেছিলাম! তার পরে আরও কয়েকবার গেছি সেখানে, আরও শিকার খেলেছি। বললাম, এরই মধ্যে? এই তো সেদিন এলেন দেশ থেকে! যতীনবাবু বললেন, দেশে নয়। একেবারে উল্টো দেশে। বাঙাল দেশে—বরিশাল জেলায়। যাবেন? আমি বললাম, বরিশালে কেন হঠাৎ? যতীনবাবু বললেন, হঠাৎ নয়, অনেক দিন থেকেই তাগিদ আসছে। বাঘের উৎপাতে নাকি টেঁকা যাচ্ছে না গ্রামে, মেরে দিয়ে আসতে হবে। আমি বললাম, তবেই হয়েছে। এই বর্ষায় বরিশাল জেলা—সে বাঘ তো ছিপ-বঁড়শি ফেলে ধরতে হবে। যতীনবাবু বললেন, আরে না না, স্থলও চার ভাগের এক ভাগ আছে পৃথিবীতে। কবে যাবেন তাই বলুন? এনায়েৎও যাচ্ছে। আমি বললাম, এনায়েৎ? ব্যাপার তা হ'লে ঘোরালো বলুন? যতীনবাবু বললেন, তা তো একটু বটেই। ওই কথা রইল তা হ'লে, আমি তাকে খবর দিচ্ছি।

যথাকালে শেয়ালদায় এসে ট্রেনে চ'ড়ে বসা গেল। আমি, যতীনবাবু, এনায়েৎ—এনায়েৎ তার সেই বিরাট বোম্বাই বল্লম ঘাড়ে ক'রে এসেছে। বললাম, শুধু বল্লমে কি বাঘ মরবে এনায়েৎ? এনায়েৎ বললে, তা কি বলা যায়, কোন বাঘ অস্তরে মরে, কোন বাঘ মন্তরে মরে। তবু নিজের হাতিয়ার নিজের হাতে থাকা ভাল।

গাড়ি ছাড়ল। যতীনবাবুকে বললাম, বলুন দেখি এইবার, শুনি ব্যাপারটা।

শুনলাম। বরিশাল থেকে এক স্টেশন আগে নলছিটি, সেখান

থেকে মাইল চারেক দূরে গ্রামের নাম হয়বৎপুর। বাঘের উৎপাত চলছে প্রায় বছর খানেক ধ'রে। বড় বাঘ নয়, ষ্ট্রাইপস্ সে দেশে নেই, লেপার্ড। কিন্তু তারই বিক্রমে গ্রামের লোক অস্থির হয়ে উঠেছে। গরু ভেড়া ছাগল পাঁঠা হরদম চ'লে যাচ্ছে, এমন ধূর্ত বাঘ—গ্রামের লোকে, আশপাশের লোকে নানা রকমে চেষ্টা ক'রেও কিছুই করতে পারছে না। আমি বললাম, বীট ক'রে দেখা হয়েছে? যতীনবাবু বললেন, তা জানি নে। মাচান করা হয়েছে, বিষ-খাবার দিয়ে দেখা হয়েছে। খোঁয়াড় পাতা হয়েছে। সব ফেল।

খোঁয়াড় হচ্ছে, বাঘ-ধরা ফাঁদ। আস্ত আস্ত বাঁশের খোঁটা মাটিতে পুঁতে চৌকো ঘর করা হয়, তাতে দুটো কামরা। এক কামরায় ছাগল-কুকুর একটা পুরে দেয়, অন্য কামরা দিয়ে বাঘ ঢোকে, অমনি দোর বন্ধ হয়ে যায়। ইঁদুর-ধরা বাক্সর মত। আমি বললাম, তা হয়, লেপার্ডরা গ্রামে থাকে, মানুষের কাছেপিঠে বসবাস, মানুষকে তাই ভয়ও কম করে, মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে ধূর্তামিও রপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু কোথায় বরিশাল জেলায় বাঘ—আপনার কাছে খবর পৌঁছল কি ক'রে? যতীনবাবু বললেন, চট্ ক'রে। এক জন আছেন—সেখানে সুবাদে মামাশ্বশুর। বিষয়ী লোক, ধানপান কিছু আছে, গরুবাছুর ক্রমাগত খোয়া গেলে তাঁর সমূহ লোকসান। তিনিই অতএব স্মরণ করেছেন। বললাম, তা ভাল। মামাশ্চাসৌ শ্বশুরশ্চেতি, বাঘ মরুক না-মরুক, খ্যাটের যোগাড়টা মন্দ হবে না আশা করা যায়।

খুলনায় ট্রেন থেকে নেমে ষ্টীমারে চড়লাম। নলছিটিতে পৌঁছে ষ্টীমার যখন ভোঁ দিলে, ভোরের আলো মাত্র ফুটে উঠছে। তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম। বড় ফ্ল্যাট নয়। খোলা পন্টুন একটা, সেইটেই জেটি।

ষ্টীমার ছেড়ে চ'লে গেল। যতীনবাবু সিঁড়িতে নেমে গেলেন নৌকা ডাকতে। আমি চারদিকটা তাকিয়ে দেখে নিলাম। নদী সেখানে পূবে-পশ্চিমে লম্বা, পূবে এগিয়ে উত্তরে বেঁকে গেছে, বাঁকের মাথায় দূরের আকাশ লাল টকটকে হয়ে উঠেছে, সূর্য ওঠে ওঠে। নদী কানায় কানায় ভরা, বর্ষার ঘোলা জল—প্রায় দুধের মত রঙ, ওপারে নদীর

চড়াভর্তি ধানের ক্ষেত, এদিকে নলছিটির স্টীমারঘাট সদ্য ঘুম ভেঙে জেগে উঠছে। যতীনবাবু সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করছেন, ও মাঝি, ভাড়া যাবে? মাঝিরা একজন সাড়া দিলে, কোথায় যাবেন? যতীনবাবু বললেন, হয়বৎপুর। মাঝি বললে, তা যেতে পারি। যতীনবাবু বললেন, কত নেবে? মাঝি পাল্‌টে প্রশ্ন শুরু করলে, কজন যাবেন আপনারা? মালপত্তর কি? এই ঘাট থেকেই যাবেন তো? কখন উঠবেন নৌকায়? হয়বৎপুর যাবেন? কলকাতা থেকে এসেছেন? দেশ কোথায় আপনাদের?

ইতিমধ্যে উল্‌টো দিক থেকে আরেকটি স্টীমার এসে হাজির। ইনি বরিশাল থেকে এলেন, খুলনায় যাবেন। ভিড়ল, লোকজন নামালে, তুললে, ভোঁ দিয়ে ছেড়ে চ'লে গেল। আকাশ ফুঁড়ে সূর্যও খানিকটা উঠে পড়েছে ততক্ষণ, লাল রঙ কেটে গিয়ে তার রঙ সাদা হয়ে গেছে।

এদিকে আর দেখবার কিছু নেই, যতীনবাবুর দিকে এগিয়ে গেলাম। মাঝির জেরার জবাব দিতে দিতে ততক্ষণ তিনি ঘায়েল হয়ে পড়েছেন প্রায়। আমি বললাম, কি হ'ল, যাবে না নৌকো? মাঝি একগাল হেসে গদগদ হয়ে বললে, দেখেন তো কর্তা, আপনাদের নিয়ে যাব না তো বাঁচব কি ক'রে আমরা? আমি বললাম, তা নৌকাটা ছেড়ে দাও না দয়া ক'রে, আমরাও না হয় বাঁচি। মাঝি বললে, আজ্ঞে, আমিও তো যাবই বলছি।

দিশী ভাষা, অদ্ভুত শুনতে, সে ভাষা ব'লে শোনাতে পারব না তোমাদের, কথাগুলোই ব'লে দিচ্ছি। এনায়েৎ বললে, যাবেই যদি তো বাধছে কোথায়? মাঝি বললে, বাধবে কেন, আপনারা এসে উঠলেই আমি ছেড়ে চ'লে যাই। আমি বললাম, ভাড়া কিছু ঠিক ক'রে নিয়েছেন যতীনবাবু? মাঝি বললে, সেজন্যে আটকাবে না। আপনাদের সঙ্গে দরাদরি কবে ক'রে থাকি আমরা? ভাড়া যা সবাই দেয় তাইই দেবেন। আর দেরি করবেন না, গোণ ব'য়ে যাচ্ছে।

মাঝি নৌকা এগিয়ে সিঁড়ির গায়ে এনে বাঁধল। এনায়েৎ বাক্স বিছানা বন্দুকের বাক্স বল্লম একটা একটা ক'রে তার হাতে এগিয়ে দিচ্ছে,

মাঝি ধ'রে ধ'রে নিয়ে নৌকোর ভেতরে সাজিয়ে রাখছে। মাল তোলা হ'লে আমরা উঠব।

মাল তোলা প্রায় শেষ, আমরা উঠতে যাচ্ছি, পাশের নৌকোর মাঝি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, হুয়বংপুরে যাবেন আপনারা, কোন্ বাড়ি?

এটা এদের ব্যারাম, সব রকমের কথা অহেতুক জিজ্ঞেস করতে থাকা। যতীনবাবু বললেন, নীলু মুখুজ্জে। জান? নীলরতন মুখুজ্জে, বামুন-চাকলায়? সেই বাড়ি।

আমাদের মাঝি তখন শেষ একটা বাক্স হাত বাড়িয়ে ধ'রে নিচ্ছে। ঘাড় বাঁকিযে তাকিয়ে কথাটা শুনল, সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেল। একটু কি ভাবলে, তারপর বাক্সটা ঠেলে দিয়ে বললে, রাখ ভাইসায়েব, ওইদিকেই নামিয়ে নাও। বাক্সের এক মুড়ো তার হাতে, এক মুড়ো এনায়েতের হাতে, মাঝখানটা সিঁড়ির রেলিঙের ওপরে ভর দিয়ে রাখা। ব'লেই সে হাত ছেড়ে দিলে। এনায়েৎ আচম্‌কা ঝোঁক সামলে বললে, কি হ'ল? মাঝি বললে, আমার শরীর কি রকম লাগছে, আমি যেতে পারব না। আমি বললাম, শরীর কি রকম লাগছে মানে? মাঝি যতীনবাবুর দিকে চেয়ে বললে, মাথাটা ঘুরে উঠল, কাল জ্বর হয়েছিল কিনা। আপনারা অন্য নৌকোয় ক'রে যান। আমি বললাম, আর কে যাবে হে নিয়ে? পাশের মাঝিকে বললাম, তুমি যাবে? সে মাথা নেড়ে বললে, আমি আজ্ঞে নতুন মানুষ, সেদিকের খাল চিনি নে। যতীনবাবু বললেন, খাল তো একটাই, তার আর চেনাচিনি কি! যাবে তো চল, পথ আমি চিনিয়ে দেব। সে বললে, আজ্ঞে না, আমি একা ফিরে আসতে পারব না। যতীনবাবু অন্য মাঝিদের দিকে চেয়ে বললেন, তোমরা কেউ যাবে? দেখা গেল, কেউই জবাব দিচ্ছে না, মানে কেউই যেতে রাজী নয়। আমি বললাম, হঠাৎ হ'ল কি এদের, ও যতীনবাবু? যতীনবাবু বললেন, আমিই বুঝতে পারছি না। কি হে, কি হ'ল তোমাদের? এবার জবাব দিলে এক আধবুড়ো মাঝি, বললে, সে-পথে এখন যাওয়া যাবে না বাবু, খাল বন্ধ। আমি বললাম, এইমাত্র গোণ ব'য়ে যাচ্ছিল, এরই মধ্যে খাল বন্ধ? হ'ল কি খালের?

এনায়েৎ বললে, জলের তলায় বুড়ে গেছে হয়তো। আমি বললাম, মানে আসল কথাটা হচ্ছে, তোমরা কেউ যেতে রাজী নও। বুড়ো বললে, আজ্ঞে, তা কেন হবে? যতীনবাবু বললেন, তাই তো হচ্ছে। কিন্তু না-ই যদি যাবে, এতক্ষণ কেন বললে না? আমরা মেল-স্টীমার ধ'রে ঝালকাঠিতে ফিরে যেতাম, সেখান থেকে নৌকো নিতাম। আমি বললাম, তাই চলুন না হয়। যতীনবাবু বললেন, তাই হয়তো যেতে হবে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু তখন বললে মেলটা ফস্‌কাত না। এখন এই টাপুড়ে নৌকোয় জোয়ার উজিয়ে ঝালকাঠি পৌঁছতেই বেলা দুপুর হয়ে যাবে। আমি বললাম, তা তো বটেই। কিন্তু এরা এমনটা করছে কেন বলুন তো? এনায়েৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে বললে, মামাশ্বশুরের দেশ কিনা, তামাসা করল একটু জামাইবাবুর সঙ্গে। আমি বললাম, তা হ'লে কি করা ঠিক করলেন যতীনবাবু? যতীনবাবু বললেন, তাই তো ভাবছি, এখন ঝালকাঠি ঘুরতে যাওয়া মানে বাড়ি পৌঁছতে দিন কাবার। আমি বললাম, কিছু নয়, এদের বাঁদরামি—পয়সা কামাবার ফিকির, জানে এখন দায়ে প'ড়েই আমরা ঘুর-পথে যাব, দুগুণ ভাড়া দেব। সে দিচ্ছি নে, এইখান থেকেই যদি ফিরে যেতে হয় কলকাতায়, তাই যাব বরং। কিন্তু নৌকো ছাড়া অন্য কিছু নেই? যতীনবাবু বললেন, অন্য কি থাকবে আর! জল-কাদার দেশ, টমটম-পাল্কির চলন নেই এ দেশে। আমি বললাম, পাল্কি কেন, হাঁটাপথ নেই কি? যতীনবাবু বললেন, তা আছে। কিন্তু সে পথে এখন দারুণ কাদা, সে ঠেলে যাবেন কি ক'রে? আমি বললাম, সাঁতরে যাব, তবু এদের পায়ে ধরব না। চলুন আপনি, কোন্ দিকে পথ?

স্টেসন-মাস্টারের জিম্মায় মালপত্র রেখে দিয়ে, বন্দুকগুলো শুধু ঘাড়ে ক'রে রওয়ানা হয়ে পড়লাম। মালের জন্যে পরে লোক পাঠাব।

কাঁচা রাস্তা, তবু বেশ খটখটে, কাদা প্রায় নেই। দু ধারে জলভরা ধানক্ষেত, তার ওপরে সকালবেলার রদ্দুর, চমৎকার লাগছে হাঁটতে। মাইল তিন সাড়ে তিন সোজা রাস্তা—তার ডালপালা নেই, তার পর

গ্রামের শুরু। পথ জেনে নিতে হবে, দুজন লোক উল্টো দিক থেকে আসছে। যতীনবাবু ডেকে শুধালেন, বলতে পারেন, নীলু মুখুজ্জে মশায়ের বাড়িটা কোন্ দিকে হবে?

কথা শেষ হ'ল না, লোক দুটো থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দুজনে একবার চোখোচোখি করলে, একজন ফিসফিস ক'রে অন্যজনকে কি বললে, তারপর ফিরে উল্টোমুখে হাঁটা দিলে। আমরা ভ্যাবাচ্যাকা। যতীনবাবু তবুও অন্য লোকটিকে ডাক দিলেন, জানেন ভাই পথটা?

যে লোক আমাদের দিকে ফিরে চাইল, তার চোখ-মুখে যেন ভয় ফুটে বেরুচ্ছে। বললে, আজ্ঞে না, জানি নে। ব'লেই লম্বা লম্বা পা ফেলে আমাদের ছাড়িয়ে চ'লে গেল। আমি বললাম, হ'ল কি ব্যাপার? যতীনবাবু বললেন, আমিও তাই ভাবছি। আমি বললাম, বাড়ির নাম শুনেই ভয়ে আঁৎকে উঠছে এরা, সেই বাড়িতেই কি বাঘের বাসা নাকি? আমাদের ভবিষ্যৎ ভেবে ভয় পাচ্ছে এরা? যতীনবাবু বললেন, ভাব দেখে তো তা মনে হয় না, ভয়টা যেন এদের নিজেদেরই। এনায়েৎ বললে, ভয় ব'লে ভয়, ভয়ের ঠেলায় খালের ভরা-ভাদ্দর জল শুকিয়ে গেল, নৌকো চলল না ব'লে।

আমারও সেই কথাই মনে হচ্ছে, মাঝিরা ভয়ে আসতে চায় নি।

কিন্তু এত ভয় কিসের? বাঘ যদি থাকেও বা, ধরলাম না হয়—সেই বাড়িতেই বাঘের বাসা। তবু, মানুষজনও তো রয়েছে সেখানে। বললাম, যতীনবাবু, বাঘের খবর যা পেয়েছেন, ম্যান্-ইটার কি? যতীনবাবু বললেন, তা তো শুনি নি। গরু-ছাগল নিচ্ছে, এইটুকুই জানি। কেন? বললাম, ম্যান-ইটার হ'লে এদের ভয়ের হেতুটা কিছু বুঝতাম। যতীনবাবু বললেন, হতেও পারে। হয়তো ম্যান-ইটার শুনলে ঘাবড়ে যাব, আসতে চাইব না ভেবে ওটুকু আর খুলে বলেন নি তাঁরা।

এনায়েৎ খুব ভ্রূ কুঁচকে কি ভাবছে। খানিক পরে বললে, এই নীলু মুখুজ্জে লোকটা কে? এঁদের নৌকোঘাট, না, এঁদেরই বাড়ি? যতীনবাবু বললেন, এঁরই বাড়ি। আমি বললাম, কি রকম? আপনারা

বোস, নীলু মুখুজ্জে আপনার মামাশ্বশুর হলেন কি ক'রে? যতীনবাবু বললেন, আহা, সত্যি মামাশ্বশুর তো নয়, সুবাদে। মানে কি, দিদিশাশুড়ীর ধর্মছেলে, সেই খাতিরে শাশুড়ী ঠাকরুণের ভাই। আমি বললাম, শ্বশুরবাড়ি কোথায় আপনার, এই দেশে? যতীনবাবু বললেন, মোটেই না, মালদাতে। মানে, দিদিশাশুড়ী গিয়েছিলেন কাশীতে, ইনি সেখানে তখন টোলে পড়ছেন। সেইখানে আলাপ; তাই থেকে সম্পর্ক পাতানো। আমি বললাম, কি করেন ভদ্রলোক? দেশেই থাকেন? যতীনবাবু বললেন, খুব বেশি খবর আমিও জানি নে। কলকাতায় গেলে-টেলে দেখা হয়েছে দু-একবার—এইমাত্র। দেশেই থাকেন, শিষ্য যজমান জমি জিরেত আছে বেশ কিছু, স্বচ্ছল অবস্থা।

শুধু সচ্ছল অবস্থা বলাটা যতীনবাবুর বিনয়। বেশ বিরাট অবস্থা, সেটা বাড়িতে ঢুকেই টের পেলাম। অনেক বিঘে জমি নিয়ে বাড়ি। বাস্তুবাড়িটা পাকা, বাইরের দিকে অনেক ছোটবড় টিনের ঘর—কাছারি, ঠাকুরবাড়ি, চণ্ডীমণ্ডপ। ঢুকতেই চোখে পড়ল গরু বাছুর ধানের গোলা অনেক। আর চোখে পড়ল একটি প্রাণী, মনে ক'রে রাখবার মত। একটি খাসী। খাসী অত বড় হয় ধারণা ছিল না। ছোটখাট একটা গরুর চেয়েও বড়, কালো কুচকুচে গায়ের রঙ, পেল্লায় শিং, গা ব'য়ে যেন তেল গড়াচ্ছে। অথচ রামছাগল নয়, এই এমনি দিশী ছাগলের জাত। এনায়েৎকে বললাম, দেখেছ? এনায়েৎ বললে, দেখছি।

নীলু মুখুজ্জে ভেতর-বাড়িতে ছিলেন, খবর পেয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। আমরাও বারান্দায় উঠে গেলাম। যতীনবাবু নুয়ে প্রণাম করলেন, আমি হাত তুলে নমস্কার করলাম, এনায়েৎ বল্লমটা বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাতে সেলাম করলে।

যতীনবাবু চিনিয়ে দিলেন, ইনি কান্তি চৌধুরী, আমার আপিসের বন্ধু, খুব বড় শিকারী। আর এ হচ্ছে এনায়েৎ, আমাদের দেশের শিকারী, বাঘ-ভালুক খুঁজে বার করতে এর জুড়ি নেই। এনায়েৎ আবার হাত তুলে সেলাম করলে। কিন্তু ততক্ষণ নীলু মুখুজ্জে বেগ্নী

মুখুজ্জে হয়ে গেছেন। লম্বা কালো দোহারা চেহারা, সামনের দিকে অল্প টাক প'ড়ে কপালটা চওড়া দেখাচ্ছে বিদ্যেসাগরের মত, মুখটা লম্বা, সামনের দাঁতগুলো বড় আর চ্যাপটা-চওড়া। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললেন, তুই যে অ্যাদ্দূর এসে উঠেছিস ? নেমে যা, নীচে গিয়ে দাঁড়া।

এনায়েতের দিকে তাকিয়ে আমি প্রমাদ গনলাম, ফাটে বুঝি! এনায়েৎ কিন্তু খুব সামলে নিলে। মুখ তুলে মুখুজ্জের দিকে চাইলে একবার, তারপর যতীনবাবুর দিকে। যতীনবাবুর চোখ মাটির দিকে হয়ে গেছে। তার পর কথাটি না ব'লে ধীরে ধীরে সিঁড়ি ব'য়ে নীচে নেমে গেল। খানিক দূরে স'রে গিয়ে, এদিকটা পেছন ক'রে চারদিক চেয়ে দেখতে লাগল—যেন কিছুই হয় নি। আমি মনে মনে ভগবানকে ডেকে বললাম, বড় বাঁচিয়ে দিলে যা হোক।

বাইরের দিকে, কাছারি-মহলের একটা ঘরে আমাদের দুজনের জায়গা দেওয়া হ'ল। এনায়েৎ সেই ঘরেরই বারান্দায় শোবে, পাশের এক মুসলমান-বাড়ি থেকে খেয়ে আসবে। ঠিক হ'ল, সে দিনটা আমাদের বিশ্রাম, পরদিন থেকে বাঘের সন্ধানে লেগে যাব আমরা।

দুপুরবেলা। খেয়ে-দেয়ে উঠে দুজনে দুই খাটে শুয়ে পড়েছি, এনায়েৎও ও-পাট সেরে এসে জুটেছে। একথা-সেকথা গল্প হচ্ছে। মুখুজ্জের নাম কিন্তু কেউই তুলছি না সাহস ক'রে। তখন সামলে গেছে, কিন্তু ক্ষেপলে এনায়েৎ কি কাণ্ড বাধাবে তার ঠিক নেই। আমরাও সে কথা খুঁচিয়ে তুলছি না, যতীনবাবু ইতিমধ্যেই এক ফাঁকে আমাকে ব'লে দিয়েছেন, এমন জানলে আসতাম না আমি, অন্তত এনায়েৎকে নিয়ে আসতাম না। এখন ভালয় ভালয় ওকে নিয়ে ফিরে যেতে পারলে বাঁচি। আমি বলেছি, এসে যখন পড়াই গেছে, ভেবে তো আর লাভ নেই, যা হোক ক'রে সামলে-সুমলে চ'লে যাওয়া।

কিন্তু, চ'লে যে যাব, বাঘ মারতে এসেছি, বাঘের খোঁজ ক'রে তবে তো যাওয়া। মুখুজ্জের কথায় এসেছি বটে, কিন্তু বাঘ তো নীলু মুখুজ্জের একার সম্পত্তি নয়, সে হ'ল গোটা গ্রামের শত্তুর। নীলু মুখুজ্জে লোক যেমনই হোক, গ্রামের লোককে না বাঁচিয়ে ফিরি কি ক'রে ?

কার্তিক জল নিয়ে এল। এদের চাকরান প্রজা, এই গ্রামেরই ছেলে। বছর-বাইশের তাগড়া জোয়ান ছেলে, চেহারাটি স্বন্দর, মনটিও হাসিখুশি। একে ভার দেওয়া হয়েছে আমাদের তত্ত্বাবধানের, সেদিক দিয়ে মুখুজ্জের ব্যবস্থার ত্রুটি নেই। সব ব্যাপারেই উৎসাহ, বাঘ মারার ওস্তাদ শুনে এনায়েতের তো একেবারেই ন্যাওটা হয়ে পড়েছে ক ঘণ্টার মধ্যে। দুজনের মধ্যে শলা-পরামর্শও সারা হয়ে গেছে এরই মধ্যে—এনায়েৎ যখন বাঘ খুঁজতে বেরুবে, কার্তিক থাকবে একেবারে তার সঙ্গে সঙ্গে, এ সব কথা ইতিমধ্যেই পাকা হয়ে গেছে।

জলের কলসী গুছিয়ে রাখলে কার্তিক, দুটি গেলাসে জল ভ'রে খাটের পাশে পাশে রেখে দিলে। দিয়ে কিন্তু চ'লে গেল না, লাজুক লাজুক মুখ ক'রে শুধোলে, কখন বেরোবেন আপনারা বাঘ মারতে?

কার্তিকের বিপুল উৎসাহের খবর আমরা তার আগেই পেয়ে গেছি এনায়েতের মুখে। বললাম, ব'স। কার্তিক খুশি হয়ে মেঝেয় চেপে বসল। যতীনবাবু বললেন, যাব তো বটেই, তার আগে বাঘের হাল-হদ্দ আমাদের একটু বাতলে দাও, শুনি। কত বড় বাঘ? কার্তিক বললে, তা বেশ বড়ই হবে। মানে, চোখে তাকে দেখে নি কেউ, তবু ডাক শুনেই তো বোঝা যায় আকারটা। তা ছাড়া মস্ত বড় বড় বলদ-গরু বেমালুম নিয়ে চ'লে যাচ্ছে, মাটিতে ছেঁচড়ে নেবার দাগ পর্যন্ত নেই, এই থেকেই বুঝুন তার বিক্রম কতখানি! যতীনবাবু বললেন, তা বটে, তবু, থাবার দাগ-টাগ পাওয়া যায় না? কার্তিক বললে, কি জানি! কেই বা দেখে দাগ আর কেই বা চেনে! যতীনবাবু বললেন, বাঘ কটা? একটাই, না, বেশি? কার্তিক বললে, একটাই তো লোকে বলে। যারা ডাক শুনেছে তারা বলে, একটারই ডাক। বাঘ অনেকগুলো হ'লে ডাকও রকম রকম হ'ত। সব মানুষের কি গলার আওয়াজ সমান? এনায়েৎ বললে, খুব ডাকে বুঝি? কার্তিক বললে, তা ডাকে। রোজই ডাকে না তাই ব'লে। বেরোয় যেদিন সেই দিনই ডাকে—ডাক শুনলেই আমরা বুঝি আজ আবার কারু কপাল ভাঙল। যতীনবাবু বললেন, তা হ'লে তো ভালই হ'ল এনায়েৎ, তুমি ডেকেই তাকে নিয়ে

আসতে পারবে। এনায়েৎ বললে, সেই কথাই ভাবছি। কার্তিক বললে, ডেকে বাঘ আনবে কি? মন্তর জান বুঝি এনায়েৎদাদা? এনায়েৎ বললে, তা কিছু কিছু জানতে হয় বইকি ভাই, নইলে বাঘ-ভাল্লুকের দেশে প্রাণ বাঁচে কি ক'রে? সে যাক, তোমার বাঘের কথা বল শুনি। এর বাসা কোন্‌খানে? কার্তিক বললে, সেই তো মুশকিল, বাসা কোথায় কেউ চেনে না। এক-এক দিন এক-এক জায়গাতে হাঁক দেয়; জন্তু-জানোয়ার যেগুলো খাবে—সমস্ত এমন বেমালুম শেষ ক'রে দেয়, তার চিহ্ন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না আর। আমি বললাম, একে মারবার চেষ্টা করে নি কেউ? কার্তিক বললে, কেন করবে না, অনেকে করেছে। এদিকের বড় শিকারী এলেনদ্দি হাওলাদার, তারপর গিয়ে গিরিজা শিকদারের ভাই ছোটখোকা, সব হেরে গেছে। বরিশাল থেকে সায়েবরা এসেছিল, তারা পর্যন্ত পারে নি। এমন বাঘ, ঘর ভেঙে নেয়, মাঠ থেকে নেয়; কিন্তু খোঁয়াড় পাতলে তার পাশ দিয়েও হাঁটে না। আমি বললাম, আচ্ছা, বীট ক'রে দেখেছে কি কেউ? মানে এক ধার থেকে জঙ্গল ঠেঙিয়ে? কার্তিক বললে, না। সে দেখবেই বা কে? গ্রাম জুড়ে ঝোপজঙ্গল, মস্ত মস্ত মরা-দীঘিই আছে দশ-বারোটা, নল-খাগড়া আর তারাবনে ভর্তি। সে জঙ্গল ঠেঙানো কি সোজা কথা? যতীনবাবু বললেন, গাঁয়ের মধ্যে জঙ্গল ঠেঙানো যায়ও না। বাঘ যদি মারা না যায়, তাড়া খেয়ে সে ক্ষেপে ওঠে—সেটা বিষম বিপদের কথা। আচ্ছা কাত্তিক, তুমি যে বললে--হাঁক শুনলেই বুঝি কারু কপাল ভাঙল, তার মানে কি? কার্তিক বললে, মানে আর কি! যেদিন বাঘ নামে না, নামে না—তার সাড়াশব্দও কেউ পায় না। নামে যেদিন, তার ডাকে যেন পাড়া সুদ্ধু কেঁপে ওঠে। মানুষ-জন ভয়ে ঘরের দুয়োর এঁটে দেয়। বাঘ মজা ক'রে গোয়াল ভেঙে লুট করে। দারুণ দুরন্ত বাঘ। আমি বললাম, কিংবা বল বীরপুরুষ বাঘ, জানান না দিয়ে লুট ক'রে না। কাত্তিক বললে, তা যা বলেন। কিন্তু কাণ্ড যা ক'রে বেড়াচ্ছে, সে ব'লে বোঝানো যায় না। এই তো বছর খানেক ধ'রে চলছে ব্যাপার, এর মধ্যে অন্তত গুটি পঞ্চাশেক গরু গেছে গ্রামের,

ছাগল-পাঁঠা তো কত যে গেছে তার সীমা-সংখ্যা নেই। ভাবুন তো, যুদ্ধের বাজার একটা বাছুর বিকোচ্ছে পঞ্চাশ টাকায়, খাসীটা একটু বড় হ'লে তার দাম সত্তর-আশি। এ কি মানুষে সইতে পারে? আমি বললাম, ভাল কথা। কাত্তিক, কালো খাসী দেখলাম একটা, বিরাট বড়। ওটা কাদের?

কার্তিকের ঠোঁটে হাসি খেলে গেল। বললে, দেখেছেন? ও হচ্ছে ঠাকুরমশায়ের পোষ্যপুত্তুর, আমরা বলি—কালু মুখুজ্জে। আমি বললাম, বাহারে খাসী, রামছাগলও অত বড় হতে দেখি নি কখনও। এই দেশের কোন জাত বুঝি? কার্তিক বললে, জাত-টাত কিসের, এমনি দেশী পাঠারই জাত। আদরে যত্নে ওই রকম হয়েছে। বয়স কিন্তু বেশি নয়, জোর বছর দুই। ঠাকুরমশায়েরও অদ্ভুত মায়া ওর ওপরে, নিজের একটা হাত কেটে দেবেন তবু ওর এতটুকু অযত্ন হতে দেবেন না। এনায়েৎ বললে, ভারি মায়া তো! কার্তিক বললে, এটা ওঁদের চিরকালে ঝোঁক কিনা, ছেলেবেলা থেকেই দেখছি। দক্ষিণে কোথায় মহাল আছে, সেখান থেকে প্রতি বছর ধান চাল আসে, বড় বড় পাঠা আর খাসী আসে। ছাড়া খেয়ে খেয়ে মস্ত বড় হয় এক-একটা। সেই পাঁঠা ছাড়া এঁদের পূজো-আচ্চায় মন ওঠে না। গ্রামের লোকে নাম দিয়েছে বড় পাঠার বাড়ি। যতীনবাবু হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন, বললেন, বেড়ে নামটি তো হে। কার্তিক সঙ্গে সঙ্গে মুখ-চোখ শুকনো ক'রে বললে, মাপ করবেন বাবু, হঠাৎ ব'লে ফেলেছি। ঠাকুর মশায়ের কানে গেলে রক্ষে থাকবে না, জ্যান্ত পুঁতে ফেলবেন আমাকে। এনায়েৎ বাঁকা-চোখে কার্তিকের দিকে একবার তাকিয়ে আবার চোখ ফিরিয়ে নিলে। বললে, সে যাক। বাঘের ডাক কবে শোনাচ্ছ তাই বল। কার্তিক বললে, ডাকলেই শোনাব। পূর্ণিমা পেরিয়ে গেল তো, এইবার ডাকবে। আমি বললাম, তার মানে? ডাকের আবার শুভদিন আছে না কি এর? কার্তিক বললে, কি জানি, দেখছি তো আঁধার রাতেই বেশির ভাগ ডাকে। সবাই জানে।

পরদিন সকালবেলা গ্রাম দেখতে বেরুলাম। আমরা তিনজন আর কার্তিক। মস্ত বড় গ্রাম। এককালে জৌলুষ ছিল বোঝা যায়। গোটা গ্রামকে আলু-চেরা ক'রে এক-একদিকে রাস্তা বেরিয়ে গেছে—বস্তিপাড়া, বামুনপাড়া আর মুসলমানপাড়াই বড় তার মধ্যে। বেশির ভাগই খুব বড় বড় বাড়ি, মানে দালান-ইমারত অনেক তা নয়—বিরাট বিরাট জমি নিয়ে বাড়ি বাগান পুকুর। কিন্তু বেশির ভাগই শ্রীহীন, মানুষজন নেই, জঙ্গলে ভরা। বড় বড় দীঘিও অনেক, সবই ম'জে গেছে, হোগলা নলখাগড়া আর তারাবনে ঢাকা। কার্তিক বলেছে ঠিক, সে গ্রাম বীট করা শিবের অসাধ্যি। আর সেই অরণ্যের মাঝখানে কোন্‌খানে যে তিনি লুকিয়ে ব'সে আছেন, সে বার করতে হ'লে জ্যোতিষ জানতে হয়।

যতীনবাবু বললেন, এনায়েৎ, কেমন বুঝছ, পারবে কিছু করতে? এনায়েৎ বললে, আল্লা ভরসা। তাঁর যদি দয়া না হয়, বাঘের গা মাড়িয়ে চ'লে যাব, টের পাব না। আর তাঁর যদি দয়া থাকে, বাঘ নিজে হেঁটে বাড়ির উঠোনে এসে ধরা দেবে। কার্তিক বললে, ভাল কথা। কাল কি যেন বলছিলেন জামাইবাবু, ডেকে নিয়ে আসবে বাঘকে? এনায়েৎ বললে, সে সময় হ'লেই ডাকা যাবে। ব্যস্ত কেন, দু-চার দিন যাক। কার্তিক বললে, দু-চার দিনে কি হবে দাদা? দেখছ তো হয়বৎপুর পরগণা, যত না জমি তার বেশি জঙ্গল। আমি বললাম, আচ্ছা, এর নাম হয়বৎপুর হ'ল কি ক'রে? কার্তিক বললে, তা কি আর জানি আমরা, শুনে আসছি হয়বৎপুর। যতীনবাবু বললেন, ও তো বোঝাই যায়। মুসলমানী নাম। হয়বৎ বা হায়বৎ ব'লে কেউ ছিল কোন কালে, তার নামে নাম হয়েছে। আমি বললাম, তা নয়, দেখছেন না সব বিলকুল মাঠ আর জল? এ দেশের সব মানুষ ঘোড়া রাখত, ঘোড়ায় চ'ড়ে চলাফেরা করত, তাই নাম হয়বৎপুর, মানে ঘোড়াওয়ালাদের দেশ। এনায়েৎ দূরে একটা গাছের মাথায় তাকিয়ে কি দেখছিল, চোখ না ফিরিয়েই বললে, আজ্ঞে না, ওর মানে হচ্ছে ঘোড়া-মুখোর দেশ। যতীনবাবু টিপে বললেন, সেরেছে।

পরদিন ভোরবেলা এনায়েৎ একা-একাই বেরিয়ে গেল।

নীলু মুখুজ্জে আমাদের যত্ন-আত্তির ত্রুটি রাখেন নি। সেদিন এসে বসলেন, বললেন, একা মানুষ, সব দিকে নজর রাখতে পারি নে। অসুবিধে তো হচ্ছে না কিছু? বললাম, মোটেই নয়, আপনি ব্যস্ত হবেন না। মুখুজ্জে বললেন, কেমন দেখলেন গ্রাম? আমি বললাম, গ্রাম আর কই, সবই তো জঙ্গল। বাঘের পক্ষে চমৎকার স্থান বটে। মুখুজ্জে বললেন, কি রকম বুঝছেন, হবে কিছু? আমি বললাম, সেটা বরাত। হয়তো দু দিনেই হিল্লে হয়ে যাবে, হয়তো বছর ধ'রেও কিছু হবে না, শুধু হাতেই ফিরে যাব। তবে এক ভরসা এনায়েৎ। মুখুজ্জে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, তার মানে? আমি বললাম, মানে জঙ্গল পিটিয়ে এ বাঘকে ধরা অসম্ভব। ফাঁদ পেতেও তো নাকি কিছুই হয় নি শুনলাম। এখানে যদি কিছু পারে তো এনায়েৎই পারবে। মুখুজ্জে বললেন, কি পারবে? আমি বললাম, বাঘকে খুঁজে বার করতে। এ ব্যাপারে অসম্ভব ক্ষমতা ওর। মুখুজ্জের মুখ হাঁড়ি হয়ে উঠল, বললেন, কি ক'রে পারবে? মন্তর জানে? যতীনবাবু বললেন, তার চেয়ে বেশি। মন্তর কানে না শুনলে ফল নেই, ও বাঘকে খুঁজে বার ক'রে তার কানে মন্তর শোনায়। মানে, জন্তু-জানোয়ারের চলন-বলন সম্বন্ধে ওর মত বিদ্বান আমি অন্তত আর দেখি নি। মুখুজ্জে উদাসীন গলায় বললেন, বেশ বেশ, পারলেই ভাল। তা সে গেছে কোথায়? যতীনবাবু বললেন, কি জানি কোথায়! ব'লে তো গেল—ঘুরে আসছি। বলা যায় না কিছু। হয়তো জঙ্গলেই ঢুকেছে গিয়ে। মুখুজ্জে বললেন, তবেই হয়েছে, গেলে আর ফিরতে হবে না। আমি বললাম, ও অমন যায়, আবার ফিরেও আসে। মুখুজ্জে বললেন, এলেই ভাল। মুখুজ্জে উঠে গেলেন। যতীনবাবু বিছানার ওপরে চিৎ হয়ে পড়লেন। বললেন, নাও ঠ্যালা। বুঝছেন কিছু?

না বোঝার কি আছে! মুখুজ্জে এনায়েতের নাম অবধি সইতে পারছেন না; তিনি ঘোরতর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, ফোঁটা-টিকির এগজিবিশন-বিশেষ, কিছুতেই ভুলতে পারছেন না, এনায়েৎ ম্লেচ্ছ হয়ে তাঁর বারান্দায় পদার্পণ করেছে। এনায়েতেরও মুখুজ্জের নাম শুনলেই রোঁয়া ফুলে উঠছে,

কিছুতেই ভুলতে পারছে না মুখুজ্জে তাকে মুখ খিঁচিয়েছেন। মাঝখানে থেকে মরণ হয়েছে আমাদের। বাঘই খুঁজি, না, এদেরই সামলাই!

যতীনবাবু বললেন, ভাল বিপদ বেধেছে যা হোক। ধর্ম-ধর্ম ক'রে এখন সট্‌কাতে পারলে বাঁচি।

অনেক বেলায় এনায়েৎ ফিরে এল। যতীনবাবু বললেন, কোথায় গিয়েছিলে? এনায়েৎ বললে, দেখে এলাম একটু ঘুরে। যতীনবাবু বললেন, খালি-হাতে গিয়েছ, জঙ্গলের দিকে যাও নি? এনায়েৎ বললে, জঙ্গলে যাব কেন? গিয়েছিলাম পথ ধ'রে ধ'রে ঘুরে বেড়াতে। বাজারটাও দেখে এলাম একটু। আমি বললাম, তারপর, খোঁজ খবর পেলে কিছু? এনায়েৎ বললে, পেলাম বইকি। প্রভুর নাকি গুণের অন্ত নেই। গ্রামসুদ্ধু লোক মুঠোর মধ্যে। একবার যে খপ্পরে পড়েছে তার আর নিস্তার নেই, জাল জুচ্চুরি ঘর-জ্বালানো কিছুই বাদ যায় না।

আমি বললাম, তার মানে? এনায়েৎ বললে, মানে আবার কি! এদিকে নিষ্ঠের অন্ত নেই, অথচ হেন পাপ নেই যা করেন নি। গাঁয়ের লোক দু বেলা নামাজ করে—হে হরি, হে আল্লা, টেনে নাও। সকাল-বেলায় নাম নেয় না, নিলে নির্ঘাত উপোস। যতীনবাবু বললেন, আহা, কি আপদ! বাঘের খবর পেলে কিছু? এনায়েৎ বললে, বাঘের খবর বাজারে পাব কি, বাঘ কি বাজারে ওঠে? যতীনবাবু বললেন, তবে কি কম্মটা করলে সারাদিন ধ'রে? এনায়েৎ বললে, কম্ম আবার কি করব, মাটি চষব? বাজারে গেলাম, বেড়িয়ে দেখলাম লোকজন দোকানপাট, বাস্। যতীনবাবু বললেন, বাস্, হয়ে গেল? এলে বাঘ খুঁজতে, তার কি? এনায়েৎ বললে, রেখে দিন বাঘের কথা, কে যাবে বনজঙ্গল ঢুঁড়তে তার জন্যে? তার পর চিৎ হয়ে মেঝেয় শুয়ে পড়ল। চালটাকেই বোধ হয় উদ্দেশ ক'রে বললে, একটা জিনিস বড় ভাল দেখলাম এখানে, বাজারের দোকানে ভারি সুন্দর সুন্দর মাটির হাঁড়ি। গোটাকতক নিয়ে যাব ভাবছি। যতীনবাবু বললেন, ধুত্তোর। বাঘের দেখা নেই, মাটির হাঁড়ির হিসেব শুনে কি করব? এনায়েৎ সমান ঝেঁজে উত্তর দিলে,

আছে মাটির হাঁড়ি, হিসেব দেব কি তাজমহলের? যতীনবাবু আর ঘাঁটালেন না, পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন।

তিন দিন, চার দিন কেটে গেল। এনায়েৎ সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, কোথায় যে যায় তাও বুঝি নে। বুঝি নে নয়, তার মানে বুঝি নে। মানে, যায়ই না কোথাও। বনের দিকে তো নয়ই। বাজারে যায়, পথ ধ'রে ধ'রে হেঁটে বেড়ায়, হ'ল-বা রাস্তার পোলের ওপর চ'ড়ে তার রেলিঙে পা ঝুলিয়ে ব'সে থাকে। আবার যখন মন হ'ল না, বেরুল না—চিৎপাত হয়ে ঘরেই প'ড়ে রইল সারাদিন।

আমাদের ওদিকে ত্রিশঙ্কু অবস্থা। সারাদিন ব'সে ব'সে চালের বাতা গুনছি আর ভাবছি, মুখুজ্জে কবে বাড়ি থেকে ঠেলে বার ক'রে দেবেন—এমন শুধু শুধু বসিয়ে লোকে আপন জামাইকেও খাওয়ায় না। গ্রামের লোক প্রথম দু-একদিন ভিড় করেছিল শিকারী দেখতে, কবে বাঘ মারা হবে জানতে—তারাও আর আসে না, বুঝে গেছে ওসব ভুয়ো কথা। একমাত্র কার্তিকই হাল ছাড়ে নি, এনায়েৎ কখন একখানা জোর ভেল্‌কি দেখিয়ে দেবে সেই ভরসায় ব'সে আছে; সারাক্ষণ তার পেছন পেছন ঘুরছে।

পাঁচ দিনের দিন, যতীনবাবু আর পারলেন না, বললেন, ও এনায়েৎ, হ'ল কি? এনায়েৎ বললে, হবে আবার কি? যতীনবাবু বললেন, বাঘ-টাঘ কি বার করবে কিছু খুঁজে, না, শুধু শুধুই ব'সে লোকের অন্নধ্বংস করব আমরা? এনায়েৎ বললে, বেশ তো পাচ্ছেন পরের ভাত, খেয়ে নিচ্ছেন দু দিন, ক্ষেতি হ'ল কিছু? বাঘ তো আমার ট্যাঁকে গোঁজা নেই যে, বলা মাত্তর খুলে বার ক'রে দেব। যতীনবাবু চ'টে গেলেন। বললেন, আমরা পারি নে এমন ক'রে ব'সে খেতে, লজ্জা করে। তার চেয়ে বল না কেন, দেশেই ফিরে চ'লে যাই। এনায়েৎ বললে, বেশ তো যান না, কে ধ'রে রেখেছে? আপনারা চ'লে যান কালই। যতীনবাবু অবাক হয়ে বললেন, তুমি? এনায়েৎ বললে, আমি যাব কি ক'রে? বাঘকে ধরতে হবে না?

কাটল আরও ছদিন। বুধবারে এসেছি, মঙ্গলবার। রাত দুপুরে হঠাৎ একটা গোলমাল উঠল। দূরে কোথাও খুব কুকুর ডাকছে, মানুষের হৈ-চৈও আছে তার সঙ্গে। আমরা কান খাড়া ক'রে রইলাম, কি হ'ল? কার্তিক ছুটে এসে বললে, বাঘ বেরিয়েছে আবার। যতীনবাবু বললেন, কত দূর হবে জায়গাটা? কার্তিক বললে, ঠিক তো ঠাওর পাচ্ছি নে কাদের বাড়ি, তবে অনেক দূর। মুসলমানপাড়ার দিকে। এনায়েৎ উঠে ব'সে কান পেতে শুনছিল। শুয়ে পড়ে বললে, কাল দেখা যাবে।

পরদিন জানা গেল, বাঘই বটে, হালের গরু নিয়ে গেছে একটা। কার্তিককে নিয়ে এনায়েৎ দেখতে চ'লে গেল, কোথায় কাদের বাড়ি। ফিরে এসে কিন্তু একটিও কথা কইলে না।

সারাদিন কাটল, সন্ধ্যার পরে খেয়ে নিয়ে আমরা শুয়ে পড়েছি। রাত তখন প্রায় এগারোটা হবে—কার্তিক এসে চুপিচুপি ডাকলে, জেগে আছ, ও দাদা? এনায়েৎ জবাব দিলে, শুনেছি। দাঁড়াও যাচ্ছি।

আমরাও জেগে গেছি এদের কথায়। আমাকে বললে, চলুন। আমি বললাম, বন্দুক নেব তো? এনায়েৎ বললে, দরকার হবে না, তবু ভয় করে যদি, নিয়েই আসুন।

মানে তার ইচ্ছে নয়, বন্দুক নিই। আমি কিন্তু সে ইচ্ছে মানলাম না, বন্দুক নিয়েই বেরোলাম।

বাড়ি থেকে পথ বেরিয়ে সরকারী রাস্তায় গিয়ে পড়েছে, আমাদের ঘর থেকে সে রাস্তা কিছু না হোক তিন শো হাত হবে। সেই রাস্তার ওপরে চার জনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, কোন দিকে কোন সাড়াশব্দ নেই। তারপর হঠাৎ কার্তিক ফিসফিসিয়ে বললে, ওই শোন।

আমরাও শুনলাম। দূর থেকে একটানা ডাক ভেসে আসছে—ঘ্যাত্‌র্‌র্—ঘ্যাত্‌র্‌র্, যেন করাত দিয়ে কাঠ ফাড়ছে কেউ। শুনে বোঝা যায় অন্তত পাঁচশো হাত দূরে সে আছে, তবু হঠাৎ মনে হয় এই বুঝি একেবারে কানের কাছে এসে পড়ল।

মিনিট দুই চলল ডাক, ডেকে থামল। আবার চলল, এমনি ক'রে একবার থামে, একবার শোনা যায়। যতীনবাবু বললেন, ডেকে দেখবে?

এনায়েৎ একটু ভাবলে, একটু কান পেতে শুনলে, তার পর বললে, দেখলে হয় ডেকে। আমাকে বললে, তৈরি থাকুন।

ব্যাপারটা কি আমার আন্দাজি জানা ছিল। বনের পথে বেরিয়ে, বাঘ ডাকে বাঘিনীকে, বাঘিনী ডাকে বাঘকে। বাঘিনীর মত গলা ক'রে ডাক দিলে, সে বাঘ সোজা ছুটে এসে হাজির হয়। চোখে দেখি নি কখনও, বইয়েই পড়েছি। দেখা যাবে ভেবে মনটা খুশি হয়ে উঠল, বন্দুকে গুলি পুরে তৈরি হয়ে দাঁড়ালাম। যতীনবাবু বললেন, খুব হুঁশিয়ার কিন্তু। দূর যদিও, এ-দূর পার হয়ে আসতে বাঘের সময় লাগে না।

পথের ওপর খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, পরে ঝোপের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা, বাঘ এসে হঠাৎ দূর থেকেই দেখতে না পায়। এনায়েৎ মাটিতে উবু হয়ে বসল, মুখের দুই পাশে হাত রেখে চোঙার মত বানিয়ে আওয়াজ ছাড়ল।

আওয়াজ ব[illegible] অবিকল বাঘের ডাক—কিন্তু হামেশা যেমনটা শুনতে হয় ঠিক [illegible]রকম নয়। বাঘের গম্ভীর গলার সঙ্গে যেন একটু আহ্লাদে আবদেরে আওয়া[illegible] মিশেছে, গর্জনের মধ্যেও যেন রিনরিন ক'রে একটা ঘুঙুরের আও[illegible] মত মিষ্টি রেশ ভেসে বেড়াচ্ছে, যে ডাক শুনলে বুক কেঁপে ওঠে, আবার তারই মধ্যে অদ্ভুত একটা নেশাও লাগে।

একবার ডাকল এনায়েৎ—দুবার, তিনবার ডেকে থামল। যতীনবাবু আমাকে ঠেলা দিয়ে বোঝালেন, হুঁশিয়ার!

আমরা দাঁড়িয়েছি একরকম পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে—বাঘ যেদিক থেকেই আসুক যেন চোখ না এড়ায়, আচমকা ঘাড়ে এসে পড়তে না পারে।

বাঘ কিন্তু এল না। তিন মিনিট, চার মিনিট, পাঁচ মিনিট কেটে গেল। এনায়েৎ আবার মুখে হাত তুললে, আবার সেই মিষ্টি রিনরিনে আওয়াজ ছাড়ল। একবার, দুবার ডেকে থেমে গেল।

আবার আমরা তৈরি হয়ে দাঁড়ালাম। যতীনবাবু আমার কানে কানে বললেন, এইবার।

বাঘ তবুও এল না। আবার চার-পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। তারপর যতীনবাবু আবার বললেন, আবার ডাক। এনায়েৎ হাই তুলে বললে, কি হবে ডেকে, ও আজ আসবে না। যতীনবাবু বললেন, কি ক'রে জানলে? এনায়েৎ বললে, ও তো বোঝাই যায়, আসবার

হ'লে এতক্ষণ এসে যেত। বাঘে বাঘিনীতে ঝগড়া হয়েছে হয়তো, কথা বন্ধ। দেখলেন না! এর গলা শুনেই ও চট্ ক'রে থেমে গেল? আমি বললাম, দূর, তাই নাকি হয় কখনও?

এনায়েৎ ততক্ষণ বাড়িমুখো পা বাড়িয়েছে। বললে, হয় কি না হয়, শুধিয়ে আসুনগে বাঘকেই। মানুষের হয়, বাঘের হবে না কেন?

ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম, মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল।

পরদিন সকালবেলা মুখুজ্জে এলেন। বললেন, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি দিন ছয়েকের জন্যে। কাত্তিক রইল। যা যখন দরকার, ওকে বলবেন। ব'লে গেলাম, যা চাইবেন ও যোগাড় ক'রে দেবে। যতীনবাবু বললেন, যাচ্ছেন কোথায়? মুখুজ্জে বললেন, কাছেই, অভয়নীল। শিষ্য-বাড়ি আছে, ঘুরে আসতে হবে একবার। পরশু বিকেল নাগাদ ফিরব। তবু যদি হঠাৎ দরকার হয়, খবর দেবেন।

দরকারও আর হয়েছে, খবরও দিয়েছি। সে বাঘেরই পাত্তা নেই, খবর দেব কিসের?

এনায়েৎ কিন্তু হঠাৎ যেন ঝেড়ে উঠল। মুখুজ্জে সকালবেলা বেরিয়ে গেছেন, দুপুরবেলায় এনায়েৎ কাতিককে বললে, গাঁয়ের লোক সব ডাকতে পার আজ বিকেলে? কার্তিক বললে, বিকেলে কেন, এখুনি পারি। কি বলব? এনায়েৎ বললে, বলবে—মানে, আর তো ব'সে থাকা যায় না এমন ক'রে, হেস্তনেস্ত একটা ক'রে ফেলতে হয়। ডাক সবাইকে, দেখি কি হয়!

বিকেলবেলা, সদরের আটচালায় লোক জড় হ'ল, ছোটবড় ছেলে-বুড়ো কেউ প্রায় বাদ নেই। এনায়েৎ বললে, আপনাদের আমি ডেকেছি। কথাটা হচ্ছে, এই বাঘকে না মারলে নয়, আমরাও আর ব'সে থাকতে পারছি নে। আজ আমরা একটা বড় রকম চেষ্টা ক'রে দেখব। আপনাদেরও সাহায্য একটু চাই। পাঁচ-সাত জন একসঙ্গে হৈ-হৈ ক'রে উঠল, কি সাহায্য? এনায়েৎ বললে, বেশি কিছু নয়। যতদূর বুঝলাম, জঙ্গল পিটে বা খোঁয়াড় পেতে এ বাঘকে কায়দা করা যাবে না। এর জন্যে ফাঁদ পাততে হবে, নতুন রকম ফাঁদ। আমি বললাম, কি রকম? এনায়েৎ বললে, ঘরের ভেতরে ফাঁদ পাতব আমরা। মানে, বার-

দেউড়ির গায়ে ভাঙা ঘর আছে না একটা? ওই ঘরে জানোয়ার বেঁধে রাখব। মাচানে বসব না, বসলে গন্ধে বাঘ টের পেয়ে যাবে। সেই জানোয়ারের গলায় একটা থ'লে ঝুলিয়ে, তাতে বালি পুরে দেব, বাঘ যখন তাকে টেনে নিয়ে যাবে, থলের ফাঁক দিয়ে বালি ঝ'রে ঝ'রে পড়বে। সেই নিশানা ধ'রে আমরা বাঘের বাসা বার করব।

এ আইডিয়া মন্দ নয়। কার্তিক বললে, কিন্তু গাঁয়ের লোক কি করবে এতে? এনায়েৎ বললে, কিছু করবে না, মানে, যে-যার জন্তু-জানোয়ার সামাল ক'রে ঘরে পুরে রাখবে সবাই, যেন বাঘ আর কোথাও কিছু খুঁজে না পায়। এই কাজটিই করতে হবে আপনাদের, খবরদার একটাও গরু-বাছুর পাঁঠা-ছাগল হাঁস-মুরগী যেন কারু বাইরে না থাকে। অন্য যদি কোথাও কিছু না পায়, তখন বাধ্য হয়েই আমার এখানে আসতে হবে বাছাধনকে।

সবাই মাথা নেড়ে বললে, শক্ত কি, আমরা এখুনই গিয়ে ব্যবস্থা করছি। এনায়েৎ বললে, আর একটি:কথা। বাঘ আসবেই, আজ না আসুক কাল আসবে, কাল না আসে পরশু। এই কটা দিন কিন্তু আপনারা কেউ সন্ধ্যের পরে ঘরের বার হবেন না। মানে, মানুষের সাড়া পেলে বাঘ নাও বেরোতে পারে। তা ছাড়া, আদার নিয়েছে দেখলেই আমরা তার পিছু নেব। চোট পেয়ে যদি বাঘ স'রে যেতে পারে, যাকে সামনে পাবে তাকেই খাবে। খবরদার, কেউ এ কটা রাত ঘরের বার হবেন না।

সবাই বললে, বেশ কথা। আমি বললাম তবে আর কি, সভা ভঙ্গ। কাত্তিক, যাও, আদার যোগাড় কর। শূয়োরের ছানা পাবে একটা কোথাও? এনায়েৎ বললে, শূয়োর নয়, পাঁঠা বাঁধব আমি। আমি বললাম, তবেই হয়েছে। পাঁঠা বেঁধে, আবার সেবারের মত আহাম্মক হওয়া তো? এনায়েৎ বললে, হবেন না। সে ছিল ডোরাদার। এরা গেরস্থ বাঘ, সব খায়। আমি বললাম, তা হ'লে কাত্তিক পাঁঠাই খুঁজে এনো একটা। এনায়েৎ বললে, খুঁজতে আবার যাবে কার বাড়িতে! আর পাবেই বা কোথায় খুঁজে, গাঁয়ে কি বাকি আছে কিছু। ঐ খাসীটাকেই লাগিয়ে দেব। কার্তিক বললে, সব্বনাশ, ঠাকুরমশায়ের খাসী! খুন হয়ে যাব এনায়েৎদাদা ওর কিছু হ'লে, ঠাকুরমশায় জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে আমাকে।

এনায়েৎ বললে, যা যাঃ, পোঁতে সবাই। বাঘই যদি মারতে পারি, পাঁঠার মামলা পরে ঢের সামলানো যাবে। বুড়োমতন একজন বললে, কাত্তিক কিন্তু কথা মিছে বলে নি। ও খাসী ঠাকুরমশায়ের বড় ভালবাসার খাসী। এনায়েৎ বললে, আরে, তাই ব'লেই তো। অমন নধর খাসী, ওর লোভ বাঘ ছাড়তে পারবে না। বুড়ো বললে, তারপর, ঠাকুরমশায় যখন ফিরে আসবে? এনায়েৎ বললে, আহা, আজ কাল এই দুদিন তো আসছেন না। এই দুটো দিন ওকেই বাঁধি না আমরা। তারপর, পরশু যদি তিনি ফিরে আসেন, তখন না হয় একে ছেড়ে আরেকটা খুঁজে নেব।

সভা ভঙ্গ হ'ল। যতীনবাবু বললেন, এনায়েৎ কি সত্যিই তাই করবে নাকি? এনায়েৎ বললে, ফালতু মিছে কথা এনায়েৎ কয় না। যতীনবাবু বললেন, তারপর, মুখুজ্জে যখন ফিরে এসে শুনবে তার সাধের খাসী বাঘের পেটে গেছে, কি কাণ্ডটি বাধাবে তার হিসেব আছে? এনায়েৎ বললে, কচু। খাসী যদি যায়, তবে বাঘও যাবে। আর তার পরে আমাদেরই বা এখানে ব'সে থাকবার দরকার কি ঘরজামাই হয়ে? ট্রেনে স্টীমারে গিয়ে উঠব—মুখুজ্জে এসে দেখবে, পাখি উড়েছে।

যতীনবাবু বললেন, কর যা প্রাণ চায়। মার-টার একচোট না খেয়ে আর বাড়ি ফেরা গেল না দেখা যাচ্ছে। এনায়েৎ বললে, মার এমনি খেলেই হ'ল! বাক্স-বিছানা গুছিয়ে রেখে দিন না, কাজ হাসিল হবামাত্তর দেবেন চম্পট। আমি বললাম, আজই গোছাব? এনায়েৎ বললে, এক্ষুণি।

রাত নটা। খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে ব'সে আছি, এনায়েৎ তার বল্লমকে ঘ'ষে-মেজে আরও চকচকে করছে। আমার তো বন্দুক বিকেল থেকেই তৈরি।

কার্তিককে এনায়েৎ বললে, খাসীকে জল-টল খাইয়ে নিয়েছ ভাল ক'রে? বেশি ডাকাডাকি না করে। কার্তিক বললে, সে নিচ্ছি। কিন্তু সত্যি কথা এনায়েৎদাদা, ও-খাসী যদি যায় তবে আমিও গেছি।

এনায়েৎ বললে, ধোত্তোরি, এক কথা বার বার ভ্যান্‌ভ্যান্‌ করে! কি হবে খাসী গেলে, ঠাকুরমশায় কি জ্যান্ত খেয়ে ফেলবে তোকে? না হয় আমাদের সঙ্গেই পালিয়ে চ'লে যাবি। তিনকুলে আছে কে তোর? ধমক খেয়ে কার্তিক আর কথা কইলে না। খাসীকে জল খেতে দিই।—ব'লে সট্‌কে পড়ল।

এনায়েৎ গজগজ ক'রে বললে, ভক্তি দেখলে পিত্তি জ্ব'লে যায়। জায়গা-জমি যেটুকু যা ছিল সব ঠাকুরমশায়ের পেটে সেঁধিয়েছে; ভাই ছিল একটা, না খেয়ে মরেছে, নিজে তবু তারই দোরে পেটভাতায় খাটছে, মায়া দেখ! খাসী যায়, যার খাসী তাঁর যাবে—তো-হতভাগার বুক ফাটে কেন রে? আমি বললাম, বুক কি আর সাধে ফাটে, ফাটে প্রাণের দায়ে। শুনলে না বললে, ঠাকুরমশায় ওকেই খাবে এসে? এনায়েৎ বললে,হ্যাঁঃ, খায় অমনি। বেশি তেড়িমেড়ি করে তো দেখিয়ে দিয়ে যাব যার নাম ভেল্‌কি। যতীনবাবু বললেন, দোহাই বাবা এনায়েৎ, আর ভেল্‌কি দেখিয়ো না। এমনিতেই ভয়ে ভয়ে আছি—কখন তোমরা দুজনে হাতাহাতি একটা বাধাও, তার ওপরে আবার ভেল্‌কি ঝাড়লে আর বেঁচে বাড়ি ফেরা যাবে না। এনায়েৎ বললে, না যেতে পারেন থেকে যাবেন, ঘরজামাই হওয়া তো সুখের কথা। আমার কি, আমাকে কেউ জামাইও করবে না, আদর ক'রে ধ'রেও রাখবে না।

রাত দশটা। খাসী নিয়ে আলো নিয়ে চারজনে বেরুলাম। বাড়ির লোকজন চাকর-বাকর কেউ কোথাও নেই। সন্ধ্যে হতেই সব ঘরে ঢুকে খিল দিয়েছে।

বাড়ির পথ আর সরকারী রাস্তার মোড়, যেখানে দাঁড়িয়ে বাঘকে ডেকেছিল এনায়েৎ, তারই গায়ে একটা ছোট্ট পোড়ো ঘর। ভাঙা-চোরা, একদিকের বেড়া আধখানা নেই। সেই ঘরের মধ্যে গিয়ে মোটা দড়ি দিয়ে খুঁটির সঙ্গে খুব পোক্ত ক'রে খাসীকে বেঁধে দিলে এনায়েৎ। ফিরে পোঁটলামতন একটা তার গলায় ঝুলিয়ে দিলে। সব শেষ ক'রে বললে, এবার চলুন। যতীনবাবু বললেন, সে কি, সত্যি সত্যি ঘরে

ফিরে যাব নাকি আমরা? মাচানে বসব না? এনায়েৎ বললে, মোটেই না। বসলে বাঘ আসবে না। কার্তিক ভয়ে ভয়ে বললে, কিন্তু বসলে হয়তো খাসীটা বাঁচত। এনায়েৎ বললে, না-ই যদি বাঁচে, নির্বংশ তো আর হবেন না ঠাকুরমশায়। বাঘ পেতে গেলে তার দাম দিতে হয়।

ঘরে ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম চারজনে। কার্তিকও আর নিজের ঘরে যাচ্ছে না, সেইখানেই গুটিসুটি মেরেছে মেঝের ওপর।

ঘণ্টাখানেক গেল, তারপর এনায়েৎ হঠাৎ ডেকে বললে, উঠুন এবার কত্তারা। সবে একটু চোখ লেগে এসেছে, ডাক শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। কি হ'ল? এনায়েৎ বললে, আস্তে কথা বলুন, বাঘেরও কান আছে এ দেশে। যতীনবাবু বললেন, কান তো আছে, বাঘ কোথায়? এনায়েৎ বললে, ওই শুনুন। অনেক দূরে কোথা থেকে ঘ্যাত্‌র্‌র্‌ ক'রে আওয়াজ ভেসে এল। বাঘ বেরিয়েছে।

আলো নিবিয়ে, বন্দুক বল্লম আর টর্চ নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়লাম চারজনে। অন্ধকারে চুপচাপ চ'লে এসে ঘরের কাছে পৌঁছলাম। ঘর থেকে খানিক দূরে একটা ঝাঁকড়া বকুলগাছ।

এনায়েৎ ফিসফিস ক'রে বললে, উঠে পড়ুন। খুব আস্তে, ডালে-পাতায় শব্দ না হয়।

গাছে মেলাই ডাল, হাতের পাঁচ আঙুলের মত সবদিকে ছড়িয়ে ওপরে উঠে গেছে থাকে থাকে। ডালের ওপর এক এক ধাপে পা ছড়িয়ে বসলাম, চারজনের মুখ চারদিকে ক'রে। বাঘ আবার ডেকে উঠল। মনে হ'ল, খানিকটা কাছে চ'লে এসেছে।

অন্ধকার ঘুরঘুট্টি, নিজের হাতখানাকেও দেখা যায় না। টর্চ আছে অবশ্য, কিন্তু জ্বালবার হুকুম নেই। গায়ে-পিঠে মশা কামড়াচ্ছে, মারা নিষেধ।

পনের মিনিট কাটল। আধ ঘণ্টা। বাঘ আর ডাকছে না। অন্ধকারের মধ্যে প্রাণপণে চোখ মেলে ব'সে আছি, সেই আলকাতরার দেওয়াল ফুঁড়ে দেখবার চেষ্টা করছি। যদি কিছু চোখে পড়ে। একটু ছায়া, হ'ল বা একটু নড়াচড়ার আভাস। কোথাও কিছু নেই। চোখে

জোর দিয়ে দিয়ে চোখ জ্বালা করছে। এনায়েৎকে কানে কানে বললাম, ডেকে দেখবে নাকি একবার? এনায়েৎ বললে, চুপ।

আরও আধ ঘণ্টা। তারপর হঠাৎ খুট ক'রে একটু শব্দ কানে এল, চমকে উঠে কান পাতলাম। ঠিকই শুনেছি, শুকনো কাঠি পড়েছিল, পায়ের চাপে ভেঙে গেল কাঠি। এসেছে।

আরও পাঁচ মিনিট। মিনিট তো নয়, সেঞ্চুরি। তারপর হঠাৎ ডাক বেজে উঠল, ঘরটার ঠিক ও-পাশ থেকে। খাসীটা, মনে হ'ল এক-বার লাফ মেরে উঠে নিশ্চল হয়ে গেল। লেপার্ডের ডাক অনেক শুনেছি, কিন্তু সে ডাক যেন ডাকের রাজা। কি গুরু-গম্ভীর আওয়াজ—মনে হ'ল চারদিকের হাওয়া পর্যন্ত গুড়গুড় গুড়গুড় ক'রে কেঁপে উঠছে। দুবার তিনবার, চারবার ডেকে বাঘ থামল। আমি বন্দুক বাগিয়ে ধরেছি। যতীনবাবুর একটি হাত আলগোছে আমার পিঠে একটুখানি ঠেকেই আবার ফিরে চ'লে গেছে। আমার ঠিক পেছনে ব'সে কার্তিক, তার পা ঠকঠক ক'রে কাঁপছে টের পাচ্ছি, গাছের গায়ে ঠেসে ব'সে সে কাঁপুনিকে থামাবার চেষ্টা করছে, নিশ্বাসের শব্দকে জোর ক'রে চেপে রাখছে। এনায়েৎ একদৃষ্টি চেয়ে ব'সে আছে।

বাঘ আবার ডাকল। এবার ঘরের আর-এক পাশে—ভাঙা-বেড়ার দিকে। মানে, ঘরটাকে ঘুরে আসছে। নিঃশব্দে বন্দুক ঘুরিয়ে তৈরি হয়ে রইলাম। আর একটু ঘুরে এলেই ফায়ার করব।

বাঘ একবার হাঁক দিলে, দিয়ে আবার থামল। আবার হাঁক দিলে, দিয়ে থামল। থামতেই এনায়েৎ বলা নেই কওয়া নেই চেঁচিয়ে হেঁকে উঠল, ভাঙল নীলু মুখুজ্জের কপাল। সঙ্গে সঙ্গে দুদ্দুম্ ক'রে বিরাট এক আওয়াজ। মস্ত বড় একটা দেহ যেন ধড়াস ক'রে মাটিতে আছড়ে পড়ল। বিষম কাতর গলায় কে গেঙিয়ে উঠল, আল্লা!

এ কি কাণ্ড! বরিশাল জেলা মুসলমানের দেশ, তাই ব'লে তার বাঘেও কি আল্লা কয়? তখন ভাববার সময় নেই। আওয়াজ হতে না-হতে এনায়েৎ গাছ থেকে লাফিয়ে পড়েছে, ঘরের দিকে দৌড়চ্ছে আর বলছে, নেমে পড়ুন শিগগির। আমরাও ঝুপঝাপ নেমে পড়লাম।

গাছ থেকে ঘর হাত পনর-কুড়ি জোর। পার হয়ে পৌঁছতে পৌঁছতেই টর্চ জ্বেলে ফেলেছি। অবাক কাণ্ড! মস্ত বড় জোয়ান একটা লোক মাটিতে প'ড়ে লুটোচ্ছে। এনায়েৎ তার শিয়রে দাঁড়িয়ে। মাথার ঝাঁকড়া চুল দুই হাতে কড়াক্কড় ক'রে মাটির ওপরে ঠেসে রেখেছে। বললে, দড়ি আছে আমার কোমরে। ঠেসে ধরুন, বেঁধে ফেলুন খুব ক'ষে।

কাকে বাঁধছি, কেন বাঁধছি, কে তখন ভাবে! তিনজনে মিলে খুব মজবুত ক'রে বেঁধে ফেলা হ'ল তাকে। তারপর এনায়েৎ চুলের মুঠো ধ'রে এক রাম-হ্যাঁচকা দিয়ে তাকে খাড়া ক'রে বসিয়ে দিলে। টর্চের আলোয় দেখলাম, প্রকাণ্ড মুখ, মস্ত বড় জোয়ান।

এনায়েৎ বললে, চলুন নিয়ে। কাত্তিক, খাসীটাকে খুলে নিয়ে আয়।

ঘরে এনে তাকে এক পাশে বসিয়ে দিলাম। এনায়েৎ বললে, কই গো, মাথা তোল, দেখি মুখখানা! লজ্জা কেন?

সে মুখ তুলছে না। এনায়েৎ চুল ধ'রে ঝাঁকুনি দিয়ে মুখ উঁচু ক'রে দিলে। তখন দেখলাম, তার সমস্ত মুখটা প্রকাণ্ড হয়ে ফুলে উঠেছে। সারাটা মুখময় ছোট ছোট খোঁচার দাগ রক্তমুখো হয়ে উঠেছে, খুব দূর থেকে ছর্‌রা গুলি লাগলে যেমন হয়। এনায়েৎ বললে ও কাত্তিক, চিনিস একে? কার্তিক বললে, চিনি। করিম। নাচনমহলে বাড়ি। এনায়েৎ বললে, তা ভাল। আজ রাতটা শুয়ে ব'সে কাটিয়ে দাও কোনক্রমে, কাল তখন নাচতে নাচতে শ্বশুরবাড়ি চ'লে যাবে।

সকাল না-হতে আটচালায় লোকারণ্য। গ্রামসুদ্ধু ছেলেবুড়ো ভেঙে এসে পড়েছে। রাত না-পোয়াতে নলছিটিতে লোক ছুটেছে থানায় খবর দিতে। কার্তিক দৌড়েছে অভয়নীল।

রোদ চড়তে না-চড়তে সবাই এসে হাজির। মুখুজ্জেমশাই, থানার দারোগা সিপাই, আশপাশের গাঁয়ের লোক। করিমকে নিয়ে এসে এক পাশে বসিয়ে দেওয়া হ'ল। সে এক ভাবেই মাথা নীচু ক'রে ব'সে রইল। দারোগা বললেন, কি ব্যাপার, করিম মিঞা? করিম উত্তর দিলে না। এনায়েৎ বললে, ব্যাপার আর কি! আঁধার রাতে বাঘের ডাক

ডাকছে। লোকজন ভয়ে ঘরে ঢুকে দোর দিচ্ছে, ব্যস্, আরামসে গরু ছাগল নিয়ে চ'লে যাওয়া হচ্ছে।

করিম শুনলাম পুরোনো দাগী চোর। জেলও কয়েকবার খেটেছে। তবে এবারকার কায়দাটা নতুন। দারোগা বললেন, চল, পুরোনো বাড়িতেই আবার চ'লে যাওয়া যাক। কিন্তু এনায়েৎ মিঞা, তুমি কায়দাটা বুঝে ফেললে কি ক'রে, সেটা তো শুনে নিতে হচ্ছে। মামলা উঠলে আদালত শুনতে চাইবে। এনায়েৎ বললে, করি আর কি! রোজ রোজ বাঘে গরু নেয় ছাগল নেয়, অথচ না পাওয়া যায় তার পায়ের দাগ, না থাকে মাটিতে সে জানোয়ারের দাগ, সে বাঘ কি উড়ে আসে, উড়ে যায়? শিকারকেই না হয় তুলে নিয়ে যাচ্ছে, মাটিতে তার রক্তের ফোঁটা একটাও পড়ছে না কেন? এই দেখেই প্রথম সন্দেহ হ'ল। তারপর দেখলাম, এ বাঘ গরু ছাগল নিয়ে যায়, কুকুর কিন্তু নেয় না। অথচ গুলবাঘার সবচেয়ে পছন্দই হচ্ছে কুকুর। তারপর ধরুন, সত্যি সত্যি বাঘ বেরুলে কি কুকুর ডাকে কখনও? কুকুর তখন চুপচাপ গিয়ে খাটের তলায় সেঁধোবে। দারোগা বললেন, এই থেকেই বুঝে নিলে? এনায়েৎ বললে, এই থেকেই বলতে পারেন। তবু যেটুকু সন্দেহ ছিল, ডাক দিয়ে ভেঙে গেল। বাঘিনীর ডাক শুনে ছুটে চ'লে আসে না, হাঁকডাক থামিয়ে চুপসে স'রে পড়ে যে বাঘ, তাকে বাঘ বলে? দারোগা বললেন, বুঝেছ ঠিকই, বাহাদুর বলতে হবে তোমাকে। কিন্তু ধরার কায়দাটা কি করলে, বল তো শুনি? এনায়েৎ বললে, কায়দা আর কি জানি! ওই খাসী বাঁধলে চোরের সাধ্য নেই লোভ সামলায়। কাজেই খাসী বাঁধা হচ্ছে—সে খবরটা ঢোল পিটে জানিয়ে দিলাম। তারপর তো কথা, ঠাকুরমশায় দুদিন থাকবেন না, খাসীকে বাঁধবার দুটি দিন মাত্র মেয়াদ। বাঘকে এর মধ্যে আসতেই হবে। দারোগা বললেন, তারপর, ধরলে কি ক'রে ওকে? এনায়েৎ বললে, ও-কথা ছেড়ে দিন। সে দিয়ে আর কি হবে? দারোগা বললেন, আহা, বলই না! মুখে-চোখে ছিটেগুলির মত বিঁধেছে ওর, খাসীর গলায় বোমা ঝুলিয়ে রেখেছিলে বুঝি? এনায়েৎ বললে, হ্যাঃ, বোমা! বোমা পাব কোথায়? দারোগা বললেন, তবে?

বিষম ঝুলোঝুলি। এনায়েৎ বলবে না, আমরাও ছাড়ব না—সবাই মিলে সে মহা হৈ-চৈ। সবাই যখন হেরে ভূত, নীলু মুখুজ্জে একেবারে মারমুখো হয়ে উঠলেন। বললেন, ব্যাটা ছোটলোক, এতগুলো লোক সাধাসাধি করছে, আর তোমার ততই মান বাড়ছে, না? কোথায় পেলি বোমা, তাই বল্? এনায়েৎ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। মুখে কথা নেই, ভেতরে ফুলে ফুলে উঠছে। যতীনবাবুর মুখ কালি হয়ে গেছে, কি না-জানি ঘ'টে যায়! আমি পেছনে তাকিয়ে দেখছি, এনায়েৎ যদি লাফ মেরে ঠাকুরকে নিয়ে চেপে পড়ে, দৌড়টা দেব কোন্ দিক দিয়ে! দারোগারও মুখ গম্ভীর, মুখুজ্জের কথাটা পছন্দ হয় নি তাঁর। দারোগাই সামলে নিলেন শেষ পর্যন্ত। একটু চড়া গলায় বললেন, ওসব বলার দরকার কি? এনায়েৎ চোখ ফিরিয়ে তাঁর দিকে তাকালে, মুখের থমথমে ভাব একটু যেন কেটে এল। বাঁচালে। দারোগা বললেন, এতগুলো লোক জিজ্ঞেস করছে, ব'লেই দাও কথাটা। এমন তাজ্জব দেখিয়ে দিলে, লোকে শুনতে তো চাইবেই। ভয় নেই তোমার, বোমা যদি দিয়েও থাক, আমি সামলে নেব। এনায়েৎ ঘাড় ফিরিয়ে সবার দিকে তাকালে। শেষে বললে, বলতেই হবে? দেখবেন, শেষে আমার দোষ না হয়! দারোগা বললেন, কিচ্ছু দোষ হবে না, আমি গ্যারাণ্টি দিচ্ছি। এনায়েৎ যতীনবাবুকে চোখ টিপে ডাকলে, ফিসফিস ক'রে বললে, সব গোছানো আছে? যতীনবাবু বললেন, আছে। কেন? এনায়েৎ বললে, বলি তা হ'লে? নীলু মুখুজ্জে দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, সেই দয়া করতেই তো বলা হচ্ছে তখন থেকে। বল, আমরা শুনে কেতাত্থ হই—কোথায় পেলে বোমা? এনায়েৎ চোখ তুলে চালের দিকে চাইল। বললে, বোমা কোথায় পাব, যা করেন মেটে হাঁড়ি। দারোগা বললেন, তার মানে? এনায়েৎ বললে, হাঁড়ি মুখে দিয়ে ও বাঘ-ডাকত। সেই হাঁড়িটাই বোমা হয়ে ফেটে গেল, ওকে জখম ক'রে দিলে। মুখুজ্জে চোখ কুঁচকে বললেন, সে হাঁড়ি ফাটল কিসে? ফুসমন্তরে?

এনায়েৎ তাঁর দিকে ফিরে দাঁড়াল। খুব শান্ত স্থির গলায় বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। নীলু মুখুজ্জের নাম করতেই ফেটে গেল।

"সম্বুদ্ধ"

মহাস্থবির জাতক

তেরো

সত্যিই এই সদানন্দ মহারাজ অদ্ভুত মানুষ ছিলেন—ছিলেন বললে বোধ হয় ভুল হবে, কারণ আমার বিশ্বাস তিনি এখনও জীবলোকেই আছেন এবং আমরা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চ'লে যাবার অনেক পরেও থাকবেন।

মানুষের মধ্যে যত প্রকার শ্রেণী আছে—অর্থাৎ জ্ঞানী, অজ্ঞানী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বিবেচক, অবিবেচক, ধূর্ত, নির্বোধ, সুবোধ, দুর্বোধ—এদের কারুকেই স্রেফ দেখেই বোঝা যায় না যে, কে কোন্ শ্রেণীর মানুষ! কিন্তু একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা পরশমণির ছোঁয়া পেয়েছে—তাদের দেখলেই চিনতে পারা যায়। অন্তত এই শ্রেণীর যত লোকের সাহচর্যে আমি এসেছি, তাদের দেখেই চিনতে পেরেছি। গৃহত্যাগ করবার বছরখানেক আগে সর্বপ্রথমে এই শ্রেণীর একজনের সান্নিধ্যে আসবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। যদিও সে কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের বেশি হবে না, তবুও সে মূর্তির প্রতিচ্ছবি আমার মানসপটে এখনও জ্বলজ্বল করছে।

এই মহাপুরুষ রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বিভিন্ন হিন্দু-ধর্মগ্রন্থ থেকে ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের অনুকূল কয়েকটি শ্লোক সঙ্কলন ক'রে 'ব্রাহ্মধর্ম' নাম দিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। এই বইয়ের কুড়ি-পঁচিশটি সংস্কৃত শ্লোক আমাদের সুর ক'রে পড়তে শেখানো হয়েছিল। শেখাতেন মহর্ষির ভূতপূর্ব সভাপণ্ডিত এবং রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের প্রথম সংস্কৃত অধ্যাপক পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব মশায়। ছেলেরা যখন সমবেত কণ্ঠে সুর ক'রে সেই সব শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখে গেল তখন অভিভাবকেরা স্থির করলেন, তাঁদের এ হেন কেরামতিটা মহর্ষিকে একবার শুনিয়ে আসা চাই।

সে সময়ে দেবেন্দ্রনাথের বয়স আশী পেরিয়ে গিয়েছিল। অধিকাংশ সময় শুয়েই থাকেন, পরের সাহায্য ব্যতীত ওঠা-চলা করতে পারেন না। কানে একেবারেই শুনতে পান না। তাঁর কর্মচারী ও পার্শ্বচর প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মশায় তাঁর ক্যান্‌ক্যানে গলায় চীৎকার ক'রে বললে কিছু কিছু

শুনতে পান মাত্র। তবুও বালকেরা তাঁর কাছে আসতে চায় এবং 'ব্রাহ্মধর্মে'র শ্লোক শোনাতে চায় জেনে তিনি শুনতে রাজী হলেন।

মনে পড়ে একদিন—বোধ হয় রবিবার সকালে স্নান ক'রে পরিষ্কার ধুতি-জামা প'রে আমরা কয়েকটি ছেলে জোড়াসাঁকোতে মহর্ষিভবনে গিয়ে উপস্থিত হলুম। ব্যবস্থা আগে থাকতেই ঠিক করা ছিল। সেখানে উপস্থিত হওয়ার কিছু পরে একটা ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে আমাদের তেতলার ছাতের ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। ঘরের মধ্যে আমাদের সামনে একটা পর্দা ছিল, সেটাকে সরিয়ে দিতেই দেখলুম একখানা বড় আরাম-কেদারায় ব'সে আছেন বিরাট এক পুরুষ, নবোদিত সূর্যের মতন। সাদা পাজামা ও সাদা পাঞ্জাবি পরা—ধপধপে সাদা গায়ের রঙ, মাথার চুল দাড়ি তুষার-শুভ্র—অদ্ভুত সে দৃশ্য! মানুষ যে এ রকম দেখতে হতে পারে তার ধারণা এর আগে আমার ছিল না। শুধু যে আয়তনেই তিনি বিরাট পুরুষ ছিলেন তা নয়। আমরা ঘরে বাইরে মন্দিরে মহোৎসবে নিত্য যে সব লোকের সংস্পর্শে আসি—দেখলেই বুঝতে দেরি হয় না যে, এ মানুষ সে শ্রেণীর নয়, তার চেয়ে অনেক বড়।

দেখতে লাগলুম, মহর্ষির সমস্ত শরীরটা স্থির রয়েছে, কিন্তু মাথাটা ধীরে ধীরে কাঁপছে। দুই চক্ষু মুদিত—মৃদুমন্দ বাতাসে চুল-দাড়িগুলো একটু একটু নড়ছে আর সর্বাঙ্গে একটা দৈবী দ্যুতি ঝলমল করছে।

আমরা একে একে সকলে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে পায়ের কাছে অর্ধবৃত্তাকার হয়ে ব'সে শ্লোকগুলি সুর ক'রে আবৃত্তি করলুম। এই সমস্তক্ষণটাই আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ছিলুম। মহর্ষির দুই চক্ষু নিমীলিত থাকলেও দেখলুম, মাঝে মাঝে তাঁর মুখখানা লাল হয়ে উঠছে আবার সাদা হয়ে যাচ্ছে। আমরা গান শেষ করতেই তিনি পরিষ্কার কণ্ঠে কিছু বললেন, তারপরে আমরা প্রণাম ক'রে উঠে এলুম।

এর কয়েক মাস পরেই মহর্ষি দেহরক্ষা করেন।

এই সদানন্দ মহারাজের সঙ্গে মহর্ষির চেহারার অবশ্য তুলনা হয় না। মহর্ষির বর্ণ ছিল তুষার-শুভ্র এবং যৌবনে তিনি নিশ্চয় দেখতে অতি সুন্দর ছিলেন। চেহারার দিক দিয়ে সদানন্দজীকে খুব সুন্দর তো দূরের কথা,

সুন্দরই বলা চলে না। অঙ্গে তাঁর কোনও জন্মে বোধ হয় আবরণ পড়ে নি। রোদে, জলে, শীতে গায়ের যে রঙ হয়েছে তার কোনও সংজ্ঞা অভিধানে পাওয়া যায় না। মাথায় জটা, মুখ দাড়ি-গোঁফে ভরা, তাও অযত্ন-রক্ষিত। কিন্তু আশী বছর বয়সে কিশোরের মতন লাফালাফি ক'রে তাঁকে চলতে ফিরতে দেখেছি—মনে হয়েছে প্রতি ভঙ্গীতে যেন আনন্দ ছল্‌কে পড়ছে। সদানন্দ নাম তাঁতে সার্থক হয়েছিল। কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে মানুষের মনের আনন্দ বুঝতে পারা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বেশি কথা তাঁকে বলতে দেখি নি—সত্যি কথা বলতে কি, প্রথমে তাঁকে গম্ভীর মানুষ ব'লেই মনে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর চোখ মুখ—তাঁর প্রতিটি কথা, প্রতিটি কায ও সেবার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেতে লাগল তাঁর মনের আনন্দ। তাঁর জীবনের ইতিহাস শুনে প্রথমে আমাদের দুঃখ হয়েছিল। মনে হয়েছিল, ঈশ্বর যদি তাঁকে বাঁচিয়েই দিলেন তবে অমন ক'রে সারা জীবন আপনার জন থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন রাখলেন কেন? কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মনে হতে লাগল যে, গৃহে থাকলে এই অপূর্ব শক্তির অধিকারী তিনি কিছুতেই হতে পারতেন না। একমাত্র গুরুর কৃপাতেই তিনি আজ সর্ববিষয়ে সত্যিকারের সদানন্দ হয়েছেন।

একটু বিশ্রাম ক'রে চাঙ্গা হতেই সদানন্দ মহারাজ এসে আমাদের নিয়ে গিয়ে বাগানে এক কুয়ো থেকে স্নান করিয়ে নিয়ে এলেন। আমরা টানা-হেঁচড়া ও নানা রকম আপত্তি করা সত্ত্বেও সেই আশী বছরের বৃদ্ধ-যুবক, সেই সদানন্দ-সন্ন্যাসী ডুলি ক'রে জল তুলে তুলে আমাদের স্নান করালেন। বললেন, আপনারা আমাদের অতিথি। আমার গুরু নিজে ব'লে দিয়েছেন আপনাদের সেবা করতে—এই অতিথি-সেবা থেকে অনুগ্রহ ক'রে আমায় বঞ্চিত করবেন না। আজ থেকে অনেক—অনেক দিন পরে আপনাদের বয়স যখন আমার মতন হবে, তখন এই সাধুদর্শনের কথা মনে হ'লেই আমার কথাও মনে হবে আর সহৃদয়তার সঙ্গে আমাকেও স্মরণ করবেন। সন্ন্যাসীর কথা বৃথা যায় না—আজ এই জাতক লিখতে লিখতে সদানন্দ মহারাজের কথা মনে হচ্ছে

আর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় অন্তর লুটিয়ে পড়ছে তাঁর পায়ে, চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠছে।

স্নান সারা হয়ে গেলে আমরা গেলুম প্রাসাদের অন্য এক মহলে। সেখানে পাতা পেতে খাওয়া হল—পুরি তরকারি, জোঁদা টক ঝোলো দই আর শুক্‌নো বোঁদে। সদানন্দজী নিজের হাতে আমাদের পরিবেশন করলেন।

আহার সেরে আমরা নিজেদের ঘরে ফিরে এলুম। সদানন্দজী বললেন, আপনারা বিশ্রাম করুন, সন্ধ্যাবেলা যখন ভজন হবে তখন সাধুর কাছে নিয়ে যাব। ইতিমধ্যে যদি আপনাদের ভাল লাগে, তবে এদিক ওদিক বেড়িয়ে আসতে পারেন।

কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে আমরা রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে জায়গাটাকে ভাল ক'রে দেখে বেড়াতে লাগলুম। রাজপুতানার গ্রাম দেখবার সুযোগ ইতিপূর্বে আর হয় নি। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে কাছেই একটা বৃক্ষলতাশূন্য ছোট পাহাড় দেখতে পেয়ে সেখানে গিয়ে উঠলুম। এইখানে ব'সে ব'সে আমরা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মতলব আঁটতে লাগলুম।

বিস্কুটের টিন খালি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনের জোরও নিঃশেষ হয়ে আসছিল। জনার্দন বললে, তার বাড়িতে লিখলে কিছু টাকা তারা পাঠিয়ে দিতে পারে। সেখান থেকে যদি টাকা আসে তো তা দিয়ে ব্যবসা ফাঁদা যেতে পারে। ব্যবসায় যদি আমরা লাভ দেখাতে পারি, তা হ'লে বাড়ি থেকে আরও টাকা পাওয়া যেতে পারে।

আমি কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলুম যে, টাকার অভাবই আমাদের একমাত্র অভাব নয়। একটা অদৃশ্য শক্তি প্রতিপদেই আমাদের বাধা দিয়ে চলেছিল। আগ্রায় পরেশদার মা যদি আর কিছুদিন বাঁচতেন তা হ'লে আমাদের একটা গতি নিশ্চয় হয়ে যেত। আমাদের একজনেরও অন্তত কাজকর্ম একটা কিছু জোটবার পর মা যদি মারা যেতেন তা হ'লেও না হয় বুঝতুম। কিন্তু তিনি যেন আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন, আমরা আসার পরই চ'লে গেলেন। আগ্রাতেই সত্যদার কল্যাণে অমন মহাজন জুটল—লোকের কপালে একটা জোটে না, আমাদের জুটল তো

ছপ্পর ফুঁড়ে দু-দুটো জুটল ; কিন্তু কোথা থেকে শনি এসে প্রবেশ করলেন বাঁদরের রূপ ধ'রে—সব এমন ফেঁসে গেল যে পালাতে পথ পেলুম না। তার পরে ভরতপুরে ও গোয়ালিয়রে—বেশ বুঝতে পারছিলুম একটা শক্তি আমাদের রক্ষা করবার, পোষণ করবার চেষ্টা করছে, আর একটা শক্তি চেষ্টা ক'রে চলেছে আমাদের ধ্বংস করবার, আমাদের যা কিছু প্রয়াস তা নষ্ট করবার।

তাই, জনার্দন যখন তার বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে এসে ব্যবসা করবার কথা খুব উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগল, তখন আমি বিশেষ উৎসাহিত হতে পারলুম না। আগেই বলেছি যে, জয়পুরে এসে অবধি আমি নিজের মধ্যে একটা পরিবর্তন বুঝতে পারছিলুম। আমি বন্ধুদের কাছে প্রস্তাব করলুম, আচ্ছা, কিছু করবার চেষ্টা করা বন্ধ ক'রে দেখলে হয় না?

তারা বললে, সে কি ক'রে সম্ভব হয়! তাই যদি করা হয়, তা হ'লে বাড়ি থেকে বেরুবার প্রয়োজনই বা কি ছিল!

আমি বললুম, আচ্ছা, এই সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ভিড়ে গেলে কেমন হয়?

জনার্দন বললে, কি সর্বনাশ! সন্ন্যেসী হব কি রে! তার চেয়ে বাড়ি ফিরে গিয়ে দাদার ব্যবসায়ে লেগে যাব।

সুকান্ত বললে, তার এক দাদা আহমেদাবাদে থাকেন। বাংলা দেশের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আহমেদাবাদের কাপড়ের কলওয়ালারা জন কয়েক বাঙালী ছেলেকে কলের কাজকর্ম শেখাতে রাজী হওয়ায় কয়েকটি বাঙালী ছেলে সেখানে থাকে। মিলওয়ালারা তাদের কাজ শেখাবার জন্য পয়সাকড়ি কিছু নেয় না। দু-তিন বছর কাজ শেখবার পর তারা ওখানেই চাকরি পাবে। কিছুদিনের জন্য ওখানেই তাদের চাকরি করতে হবে, তার পর অন্যত্র যেতে পারে। বিনা পয়সায় কাজ শেখবার ব্যবস্থা থাকলেও ছেলেদের সেখানে নিজের খরচায় থাকতে হয়।

সুকান্ত বলতে লাগল যে, তার এক দাদা সেখানে থেকে মিলের কাজ শেখেন, সে সেখানে চ'লে যাবে।

আমি বললুম, সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আগে আমি কথা বলি। আমাকে যদি তারা নিতে রাজী হয় তা হ'লে তোমরা যার যেখানে ইচ্ছা চ'লে যেও, না হলে আবার দেখা যাবে।

শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৬০

সেদিন বিকেল হতে না হতে ঘরে ফিরে এলুম। মন এত ভারী যে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তাই বন্ধ হযে গেল। বিছানার এক-একটি কোণ এক-একজন দখল ক'রে গুম্ হয়ে ব'সে রইলুম। চারদিক ক্রমেই অন্ধকার হযে এল। কিছুক্ষণ পরে সদানন্দ মহারাজ একটা আলো হাতে নিযে এসে বললেন, চলুন, এবার ভজনের আযোজন হচ্ছে।

আলোটা ঘরে রেখে সদানন্দ মহারাজ আমাদের নিযে চললেন। সাধুর কাছে গিযে তাঁকে প্রণাম করতেই সকালবেলাকার মত সস্নেহ দৃষ্টিতে আমাদের সম্ভাষণ ক'রে ইঙ্গিতে কাছেই এক জাযগায় বসতে বললেন। ঘরের মধ্যে দুটো ঝাড়ে বোধ হয পঞ্চাশটা মোমবাতি জ্বলছে। খুব ভিড় নেই। বোঝা গেল, যাঁরা সেখানে উপস্থিত রযেছেন তাঁরা সকলেই বিশিষ্ট শ্রেণীর লোক। সকালবেলায যাদের ব'সে থাকতে দেখেছিলুম, তাদের পোশাকে এমন পারিপাট্য দেখি নি। তীব্র একটা আতরের গন্ধে ঘর একেবারে আমোদিত। বলা বাহুল্য, সেটা আগন্তুকদের কারুর অঙ্গ থেকে বেরুচ্ছিল। আর একটা দৃশ্য দেখলুম যা সেবার কিংবা তার পরেও রাজপুতানার অন্য কোথাও দেখি নি। ঘরের এক দিকে দেখলুম একদল মহিলা ব'সে আছেন। সে দিকটা অপেক্ষাকৃত অন্ধকার। মনে হল, মহিলারা বসবেন ব'লে ইচ্ছা ক'রেই সে দিকটা আলোকিত করা হয নি। রাজপুতানার সাধারণ মেযেদের মধ্যে পর্দা নেই বটে, কিন্তু এই সব সর্দারদের বা অন্য বড় ঘরের মেয়েদের মধ্যে খুবই কড়া পর্দার রীতি প্রচলিত আছে। ঘরের মধ্যে সব চুপচাপ শুধু মাঝে মাঝে নারীকণ্ঠের চাপা আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। সাধু মহারাজের একদিকে 'বড়ে' মহারাজ ব'সে আছেন। মুণ্ডিত মস্তক, পরিচ্ছদেরও কোনো বাহুল্য নেই। সকালে তাঁকে মুদিত-চক্ষু অবস্থায় দেখেছিলুম, এ বেলায় দেখলুম চোখ খুলেই ব'সে আছেন। চোখ তুলে যখন সামনে চাইছেন তখন মনে হচ্ছে, সামনের কোন জিনিসের প্রতি তাঁর নজর পড়ছে না—সে দৃষ্টি সুদূরপ্রসারিত, এ সব ছাড়িয়ে অন্য কোথাও কিসের অন্বেষণে সে দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাধু বাবার অন্য পাশে ব'সে আছেন আর একজন সন্ন্যাসী, তাঁকে বড়ে মহারাজের চেয়ে

বেশি বয়সী ব'লে বোধ হয়। এঁর সামনে একটা প্রকাণ্ড একতারা মাটিতে রাখা হয়েছে। এত বড় একতারা এর আগে কখনও দেখি নি— প্রথম দৃষ্টিতে সেটাকে তম্বুরা ব'লে বোধ হয়।

ইতিমধ্যে সাধু মহারাজ একবার হাসিমুখে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, বেটা, তোমাদের বিশ্রামের কোনও ব্যাঘাত হয় নি ?

বললুম, বাবা, আপনার দয়ায় আমাদের আহার ও বিশ্রাম হয়েছে। অনেকদিন এমন পরিতৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করি নি।

মহারাজ বললেন, পরমাত্মা তোমাদের মনে এমনিই ভক্তি জাগিয়ে রাখুন।

আবার পায়ের ধুলো নিয়ে বললুম, আপনি আশীর্বাদ করুন।

মহারাজ আবার আমার মাথায় হাত ঠেকিয়ে আশীর্বাদ করলেন। ইতিমধ্যে পূর্বের সেই সাধু একতারাটা তুলে নিয়ে ছেড়তে অর্থাৎ আওয়াজ করতে আরম্ভ করলেন। যন্ত্রটা নামেই একতারা, কারণ তা থেকে আওয়াজ হতে লাগল তানপুরার মতন। আর একজন সাধু একটা খঞ্জনি লাগানো কাঠের খটখটি নিয়ে পাশে ব'সে গেলেন। এই সময় দেখা গেল, সাধু মহারাজের সঙ্গে আট-দশজন চেলা এসেছেন, সকালবেলায় এঁদের সকলকে দেখতে পাই নি।

যাই হোক, কিছুক্ষণ সেই একতারার আওয়াজ হতে না-হতে অত বড় ঘর একেবারে স্থরে গম-গম করতে লাগল, মেয়েদের গুঞ্জন পর্যন্ত থেমে গেল। অনেকের চক্ষুই নিমীলিত হ'ল।

সন্ন্যাসী একে একে গুটি তিনেক মীরার ভজন গাইলেন। প্রথম গানটা মনে আছে, ফাগুনকো দিন যায়—যায় রে।

যিনি গাইলেন তাঁর কণ্ঠ মধুর। গান শুনেই বুঝতে পারা যায় যে, অশিক্ষিতপটুত্বের স্বাভাবিক শক্তির জোরে তিনি গাইছেন না, বহুদিনের শিক্ষা ও সাধনা তাঁর এই অভিব্যক্তির পেছনে রয়েছে। তা ছাড়া, শুধু স্থকণ্ঠ ও শিক্ষা থাকলেই এমন গান গাওয়া যায় না। এই স্থরের পেছনে রয়েছে এমন এক রহস্যময় দুর্জ্ঞেয় সত্তার আকস্মিক আত্মোদ্দীপন, যা মানুষের বুদ্ধির মূঢ় তটসীমাকে অতিক্রম ক'রে হৃদয়কে পৌঁছে দেয় কোন

এক চিরবেদনার অতল গভীরতায়, যেখানে যুগযুগান্ত ধ'রে বিরহী মানুষের অশ্রুর তরঙ্গ উদ্বেল হয়ে উঠছে।

গান আরম্ভ হবার কিছু পরেই অপেক্ষাকৃত অন্ধকার থেকে মেয়েরা এগিয়ে এসে একেবারে সামনেই বসলেন। আমি দেখতে লাগলুম, সাধুরা এবং আরও অন্যান্য যাঁরা সেখানে বসেছিলেন ক্রমে একে একে তাঁদের সকলের চোখ বন্ধ হয়ে আসতে লাগল, এমন কি মেয়েদের মধ্যেও অনেকেই চোখ বন্ধ ক'রে হাত জোড় ক'রে বসলেন। আমি জোর ক'রে চেষ্টা ক'রেও একাধারে চোখ খুলে রাখতে পারলুম না। একবার চোখ বন্ধ করি আবার জোর ক'রে খুলে সবাইকে দেখি—এমনই করতে করতে আমার সমস্ত দেহ যেন ভারী হয়ে আসতে লাগল। স্পষ্ট দেখলুম অনেকেরই দুই চক্ষু দিয়ে অশ্রু ঝরছে। কেন এ অশ্রু? এই অশ্রুর উৎস কোথায়? চিন্তা করতে করতে অনুভব করলুম, আমারও দুই চক্ষু দিয়ে অশ্রু ঝরছে। দেখলুম, আমার পাশে জনার্দন ও সুকান্ত চোখ বুজে হাত জোড় ক'রে ব'সে আছে। এই কয়মাস নিরন্তর তাদের সঙ্গে একত্র বাস করছি কিন্তু তাদের দেখে মনে হতে লাগল, এ কি অদ্ভুত মূর্তি, এ মূর্তি এতদিন তো চোখে পড়ে নি! মনে হতে লাগল যেন দুটি দেবশিশু ধ্যানে ব'সে আছে। শুধু আমার বন্ধুরা নয়—সেখানে যত লোক বসেছিল, পুরুষ কিংবা স্ত্রী, সকলেই সেই গানের প্রভাবে যেন দিব্যায়িত হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে আমি একেবারে ডুবে গেলুম, তার পরে কিছুক্ষণ আর কিছু মনে নেই। শৈশবে একদিন ব্রহ্মমন্দিরে নামগানবিহ্বল ভক্তদের ভাবাকুল অশ্রুপাতের যে অতল রহস্য বিস্মিত মনে, হাস্যমুকুলিত চক্ষে নিরীক্ষণ করেছিলুম, আজ সেই অকূল রহস্যের কিনারায় পৌঁছনো মাত্র এক অনাস্বাদিতপূর্ব নির্মম বেদনার নিপীড়নে আমার দু চোখের দৃষ্টি স্তব্ধরোদনের অশ্রুভারে নিমীলিত হয়ে গেল।

সম্বিত ফিরে পেয়ে চোখ খুললুম। গান তখন থেমে গিয়েছে, ঘর একেবারে নিস্তব্ধ। সাধুদের চোখ তখনও বন্ধ, আরও অনেকে যাঁরা সেখানে বসেছিলেন তাঁরা কেউ কেউ চোখ খুলছেন। মেয়েদের কেউ

কেউ অশ্রুসিক্ত চোখ মার্জনা করছেন। বোধ হয় মিনিট দুই-তিন এইভাবে কাটবার পর আবার গান শুরু হ'ল, আবার সকলের চোখ বন্ধ হ'ল।

জ্ঞানোন্মেষ হবার আগে থেকেই ঈশ্বরের নামগান কীর্তন প্রভৃতির আসরে বসতে আমি অভ্যস্ত। সমবেতভাবে নিয়মিত তাঁর ধ্যান ও নামকীর্তন হয় এমন সমাজে আমি জন্মেছি এবং সেই আবহাওয়ায় পালিত ও বর্ধিত হয়েছি; কিন্তু এ রকম অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এর আগে আর হয় নি। প্রাণস্পর্শী গান শুনে মনের মধ্যে ভক্তির উদয় হয়েছে—কখনো বেশি কখনো কম। জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে সে প্রবাহকে সংযত করতে বেশি বেগ পেতে হয় নি। কিন্তু জ্ঞান, বুদ্ধি ও অহঙ্কারকে অতিক্রম ক'রে আর একটা হিল্লোল নিজের মধ্যে জেগে উঠছে—বেশ বুঝতে পারছি, নিজের মধ্যে একটা কিছু হচ্ছে এবং সেই একটা কিছু যে ঘটিয়ে তুলছে সে আসছে ওই গানের রূপ ধ'রে।

পরে জেনেছি যে, ভাগবতী চেতনায় সচেতন যে আধার সে জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারেও দৈবী চেতনা সঞ্চারিত করতে পারে অন্য আধারে—অবিশ্যি পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ও যাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত হবে তাদের আধারও সে অবস্থার অনুকূল হওয়া চাই।

গান শেষ হয়ে যাবার পর প্রথমে সাধুর চেলারা উঠে গেলেন, তার পরে বাইরের কয়েকজন যাঁরা ছিলেন তাঁরা প্রণাম ক'রে চ'লে গেলেন। মেয়েরা আরও এগিয়ে এসে সাধুর কাছে বসলেন। আমরা উঠে প্রণাম করতেই সাধু মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা রাত্রে থাকবে তো?

বললুম, হ্যাঁ, আজ রাত্রে বিশ্রাম ক'রে কাল বেরুব।

নির্দিষ্ট কক্ষে ফিরে গিয়ে বিছানায় গা ঢেলে দেওয়া গেল। একটু পরেই সুকান্ত ও জনার্দন দুজনেই বলতে আরম্ভ করলে, সাধু মহারাজ যদি তোকে শিষ্য করেন তবে আমিও তাঁর শিষ্য হব—এমনি ক'রে ঘুরতে আর ভাল লাগে না, সত্যিই যদি তাঁর চরণে আশ্রয় পাই তো বেঁচে যাই।

সুকান্ত ও জনার্দন আমাকে এমনভাবে খোশামোদ করতে আরম্ভ করলে যেন আমি ইতিমধ্যে সাধু মহারাজের চেলা হয়ে একজন বড়দরের সন্ন্যাসীতে পরিণত হয়েছি। অথচ সেই দিনই বিকেলবেলা সেই পাহাড়ে ব'সে আমি যখন তাদের বলেছিলুম যে, আমি সাধু মহারাজের শিষ্য হয়ে তাঁদের সঙ্গে চ'লে যাব, তখন আমার সঙ্গে যোগ দেবার জন্য তাদেরও অনুরোধ করেছিলুম—তারা দুজনেই সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান তো করেইছিল, উপরন্তু মৃদু বিদ্রূপ করতেও ছাড়ে নি। রাত্রের সেই কীর্তনসভায় ব'সে তাদের মতামত শুধু যে পালটে গেল তা নয়, দেখলুম তারা ভগবদ্ভক্তিতে জরজর হয়ে পড়েছে। বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীরূপ গোস্বামী এক জায়গায় বলেছেন যে, অতি রুক্ষস্বভাববিশিষ্ট লোকেরও সদ্‌গোষ্ঠীর সহবাসে সত্ত্বগুণ জাগ্রত হয়—আমার বন্ধুদ্বয়ের নিশ্চয় সেই অবস্থা হয়েছিল।

জনার্দন তো কেঁদেই ফেললে আর তখুনি সাধু মহারাজের পায়ে ধ'রে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করবার সঙ্কল্পে তাঁর কাছে যাবার উদ্যোগ করতে লাগল। তখনকার মতন তাকে নিবৃত্ত ক'রে আমরা তিনজনে পরামর্শ ক'রে ঠিক করলুম যে, রাত্রে আহারাদির পর আমি সদানন্দজীকে আমাদের সঙ্কল্পের কথা জানাব। তিনি কি পরামর্শ দেন তাই শুনে পরে যা হয় করা যাবে।

সদানন্দজীর অপেক্ষা করতে লাগলুম, কিন্তু তাঁর দেখাই নেই। ঘণ্টা-দুই তাঁর জন্য অপেক্ষা ক'রে রাত্রে বোধ হয় আর খেতে-টেতে দেবে না মনে ক'রে শুয়ে পড়েছি, এমন সময় সদানন্দজী হাসিমুখে ঘরের মধ্যে এসে বললেন, চলুন, ভোজন করবেন।

আমরা জিজ্ঞাসা করলুম, কটা বেজেছে?

সদানন্দ বললেন, তা বোধ হয় বারোটা বেজে গিয়েছে।

খাবার জায়গায় গিয়ে দেখলুম, অনেক লোক খেতে বসেছে, দুপুরবেলা এত লোক দেখি নি। জিজ্ঞাসা ক'রে জানলুম যে, তারা সব সাধু দর্শন করতে এসেছে। আজ রাতে আর মহারাজের সঙ্গে দেখা হবে না, তিনি মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। মেয়েরা চ'লে গেলেই তাঁর

ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। এরা সব আজ রাত্রিটা এখানে থাকবে। এদের ব্যবস্থা করতে হ'ল ব'লেই আপনাদের ভোজনের দেরি হয়ে গেল।

খাওয়া-দাওয়া চুকে যাবার পর সদানন্দজী আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এসে পৌঁছে দিয়ে চ'লে যাচ্ছিলেন, এমন সময় আমি তাঁকে বললুম, মহারাজ, যদি অসুবিধা না হয় তো আমাদের সঙ্গে একটু ঘরে চলুন না—প্রয়োজন আছে।

সদানন্দ মহারাজ বেশ প্রসন্নমনেই বললেন, বেশ তো, চলুন।

ঘরের মধ্যে এসে তাকে বসিয়ে আমরা তিনজনে তাঁকে ঘিরে বসলুম। প্রথমটা বলতে ইতস্তত করছি দেখে তিনি নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন, কি বলতে চাইছেন বলুন?

তার আশ্বাসবাণী শুনে বুক ঠুকে ব'লেই ফেললুম, মহারাজ, এই বলছিলুম কি যে, এখানে আসবার কিছুকাল আগে থেকেই আমাদের মন বড় উচাটন হয়েছে, সংসারের কিছুতে আর মন বসছে না। আমরা সন্ন্যাস গ্রহণ করব—আপনি যদি দয়া ক'রে আপনার গুরুকে আমাদের মতন অধমদের শিষ্য করতে রাজী করান তা হ'লে তাঁর কাছে দীক্ষা পেয়ে আমরা ধন্য হই।

আমার কথা শুনে সদানন্দজী কিছুক্ষণ গুম হয়ে ব'সে থেকে বললেন, বাবুজী, আপনাদের তিনজনের মধ্যে কারুরই সন্ন্যাস গ্রহণ করবার সময় এখনও হয় নি। তারপরে আপনারা বোধ হয় জানেন না যে, আমাদের গুরুদেব কাল সকালে দেহত্যাগ ক'রে ইহলোক থেকে চ'লে যাবেন।

—অ্যাঁ!!! দেহত্যাগ করবেন মানে?

কথাটা কানের মধ্যে ঢুকে সেইখানেই ঘুরপাক খেতে লাগল—মগজ অবধি পৌঁছল না।

সদানন্দজী আবার বললেন, হাঁ বাবুজী, আমাদের গুরু কাল সকালে দেহত্যাগ করবেন। কাল ফাল্গুনী পূর্ণিমা—ওই দিনই দেহত্যাগ করবার উপযুক্ত সময় ব'লে বিবেচিত হয়েছে। গুরুদেব এই দেশেই জন্মেছিলেন এবং এইখানেই দেহ রাখবেন ব'লে এসেছেন। কিছুদিন

থেকে তাঁর দেহে জরা দেখা দিয়েছে—এবার দেহত্যাগ ক'রে চ'লে যাবেন। কাল বেলা বারোটার মধ্যেই তিনি চ'লে যাবেন।

অপরম্পা কিম্ ভবিয়তি! মাথার মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল। আর একটা কথাও জিজ্ঞাসা করা হ'ল না, কিছুক্ষণ ব'সে থেকে সদানন্দ মহারাজ উঠে চ'লে গেলেন।

আমাদের কারুর মুখে আর বাক্যি নেই। দেখলুম, জনার্দন ও সুকান্ত কিছুক্ষণ ব'সে থেকে থেকে শুয়ে পড়ল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা ঘুমিয়ে পড়ল ব'লে মনে হ'ল—আমি নিজের জায়গাটিতে ব'সে ব'সে ভাবতে লাগলুম।

ব'সে থাকতে থাকতে আলোটা গেল নিবে। ঘর অন্ধকার হয়ে পড়ায় আমিও শুয়ে পড়লুম, নানারকম চিন্তায় মাথা গরম হয়ে উঠতে লাগল। ওরই মধ্যে এপাশ-ওপাশ করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানি না, হঠাৎ কি রকম একটা ভয় পেয়ে ঘুম ছুটে গেল। মনে হ'ল, কে যেন আমার দেহটা স্পর্শ করছে। ঠিক রক্তমাংসের হাতের স্পর্শ নয়—স্পর্শটা ঠাণ্ডা কন্‌কনে। খুব ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগলে যে রকম অনুভব হয় অনেকটা সেই রকমের। অথচ হাওয়া যেমন ঝোঁকে ঝোঁকে লাগে এবং শরীরের অনেকখানি জায়গায় অনুভূত হয় এ যেন সে রকম নয়। শরীরের সব জায়গায় নয়—কখনো এক-দিকের গালে, কখনো বা একটা হাতের ওপর, কখনো বুকের খানিকটার ওপর শীতল বায়ুর স্পর্শ। ভয়ে আমার শরীরে কাঁটা দিতে লাগল। এর ওপরে কাদের ফিসফিস ক'রে কথা বলার আওয়াজ যেন কানে আসতে লাগল—খুব ক্যান্‌ক্যানে গলা যতদূর সম্ভব আস্তে বলা হ'লে যে রকম শুনতে হয়, অনেকটা সেই রকমের।

অনেকক্ষণ কান পেতে শুনতে শুনতে মনে হ'ল, বাইরে হাওয়ায় শুকনো পাতা ওড়ার শব্দ হওয়ায় হয়তো আমার ওই রকম মনে হয়েছিল। ঘরের জানলাগুলো বন্ধই ছিল, অনেক সাহস সঞ্চয় ক'রে ঘষ্‌টে ঘষ্‌টে গিয়ে একটা জানলা খুলে দেওয়া গেল। জানলা খুলতেই এক ঝলক চাঁদের আলো বিছানা ও মেঝের খানিকটা ভাসিয়ে দিয়ে

ছলকে গিয়ে পড়ল সামনের দেওয়ালে। বাইরে শেষ রাত্রের জ্যোৎস্নায় সমস্ত ঝকঝক করছিল, ওপর-নীচের প্রত্যেকটি জিনিস স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। মাঝে মাঝে হাওয়ার এক-একটা হলকায় এক রাশি শুকনো পাতা খড়খড় ক'রে উড়ে চলেছে—জানলার ধারে ব'সে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে একটু সাহস ফিরে এল। হঠাৎ একবার ঘরের মধ্যে মুখ ফেরাতেই অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখতে পেলুম। ঘরের মধ্যে যে জ্যোৎস্না এসে পড়েছিল এবার স্পষ্ট দেখলুম যে ছোট ছোট খুব হালকা ধোঁয়ার পিণ্ডের মত কতকগুলো ছায়ার মতন ভেসে ভেসে সেই জ্যোৎস্নাটুকু পার হয়ে উড়ে যাচ্ছে—একটা দুটো পরে পরে অনেকগুলো ছোট বড় নানা আকারের ছায়া—কোনটা খুব ফিকে একেবারে চাঁদের আলোর সঙ্গে মিশে আছে, কতকগুলো অপেক্ষাকৃত গাঢ় রঙের, যেন হাওয়ায় ভেসে ভেসে সেই জ্যোৎস্নাটুকু পার হয়ে দেওয়ালে গিয়ে ঠেকে মিলিয়ে যাচ্ছে। ভয়ে আমি সেখান থেকে উঠে জানলা থেকে দূরে গিয়ে ব'সে লক্ষ্য করতে লাগলুম—এবার যেন ঝাঁকে ঝাঁকে সেই ছায়ার দল ঢুকে ঘর ভ'রে যেতে আরম্ভ করল। আমি বেশ বুঝতে পারলুম, মাঝে মাঝে একটা দুটো ছায়ার টুকরো আমার মুখ হাত পায়ের ওপর দিয়ে বুলিয়ে যেতে লাগল আবার সেই শীতল স্পর্শ।

কিছুক্ষণ এই রকম চলবার পর একবার সব পরিষ্কার হয়ে গেল। জনার্দন ও সুকান্তকে ডাকব কি না ভাবছি, এমন সময় সুকান্ত ধড়মড় ক'রে উঠে চারিদিকে চাইতে লাগল। চাঁদের আলোতে স্পষ্ট দেখলুম ভয়ে তার মুখখানা আঁতকে উঠেছে। কয়েক মুহূর্ত এদিক ওদিক চেয়ে আমায় দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি এসে পাশে ব'সে হাঁপাতে লাগল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কি রে, কি হয়েছে ?

সুকান্ত জিজ্ঞাসা করলে, কি বল্ দিকিন্ এগুলো ?

—কোন্‌গুলো !

—এই যে সব দেখতে পাচ্ছিস না! এই যে—এই যে—এই এই গায়ের ওপর এসে পড়ছে !

সুকান্তর হালচাল দেখে মনে হ'ল, আমি এতক্ষণ যে দৃশ্য দেখছিলুম

সেও তাই দেখছে ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, সে সময় আমি কিছুই দেখতে পেলুম না। সুকান্ত বলতে লাগল, কিছুই দেখতে পাচ্ছিস না ?

আমি বললুম, তুই ঘুম থেকে ওঠবার আগে দেখতে পাচ্ছিলুম বটে, কিন্তু এখন আর দেখতে পাচ্ছি না।

সুকান্ত বলতে লাগল, এই দেখ্, এই একটা—এই উড়ে যাচ্ছে—

কিন্তু আমি কিছুই দেখতে পেলুম না। এই রকম কিছুক্ষণ 'এই—এই—এই যাচ্ছে' করার পর সে একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, কিছু শুনতে পাচ্ছিস ? খুব কান পেতে শোন্ !

[ক্রমশ]

"মহাস্থবির"

একটি পুরনো আলিঙ্গন

(১২৮ পৃষ্ঠার পর)

এবার তোমায় দু-একটা সাংসারিক খবর দিচ্ছি। টাকার অভাবে বড় ডাক্তার ডাকা সম্ভব হয় নি। ছোট একজন ডাক্তার আমায় দেখছেন। মনে হয়, তাঁর চিকিৎসার সবটুকুই বিজ্ঞান নয়। তিনি আভাস-ইঙ্গিতে আমায় বুঝিয়েছেন যে, তুমি আমার কাছে না এলে এ অসুখ সারবে না। তিনি অবশ্য তোমার নাম জানেন না। আমায় বিয়ে করবে শম্ভুদা ? তুমিও একা—তোমায় আমি সঙ্গ দেব। তুমি ফিরে এস।

এর পর চিঠিখানা হাতে রাখবার কিংবা বালিশের তলায় রাখবার প্রয়োজন বোধ করলুম না। অগ্নি-চুল্লিতে নিক্ষেপ করলুম শ্যামলীর চিঠি। যক্ষ্মা-বীজাণু পত্র-বাহিত হয়ে হয়তো আমাকেও আক্রমণ করতে চায়।

শ্যামলী লিখছে, আমি একা। একা কেন ? আমার সঙ্গে তো গোটা পৃথিবীটাই আছে ? আর আছে কত কাছে ! হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারি লণ্ডন, একটু ঝুঁকে বসলেই প্যারিস, দু কদম এগিয়ে যেতে পারলে নিউ ইয়র্ক। ঘরের দরজায় ওলন্দাজ এবং অন্যান্য সব কতগুলো কোম্পানির অফিস রয়েছে। উড়োজাহাজের টিকিট বেচবার জন্য ওরা দিবারাত্র হাতের মুঠোয় টিকিট নিয়ে ব'সে আছে। তা ছাড়া আধুনিক মানুষের একাকীত্ব শ্যামলী ঘোচাতে পারবে না ওর মধ্যযুগীয় ভালবাসার বীজাণু-অস্ত্র দিয়ে। জীবনের কোন অংশই নিঃসঙ্গ

নয়, বিজ্ঞান-বাহুর আলিঙ্গনে বাঁধা পড়েছে মানুষ। সেখানে বিরহ-বাতাস বইবার অবকাশ নেই। নেই জড়বাদের ভূখণ্ডে ফুটো ফুসফুসের বিবাহ-নাটক অভিনীত হওয়ার রঙ্গমঞ্চ।

দি ড্যান্স? নৃত্য? দেখেছি। গ্রীক দেশ থেকে দক্ষিণ-ভারত পর্যন্ত সব রকমের নৃত্য আমি দেখেছি। কিন্তু সেখানে তো ফুটো ফুসফুসের নৃত্য নেই। শ্যামলীর কবি শ্যামলীকে ভুল বুঝিয়েছেন। ভুল বুঝিয়েছেন কলকাতার এক ছোট ডাক্তার।

আজ আমি জেনেভা হ্রদে নৌকো ভাসিয়েছি। পাশে ব'সে আছে যুবতী মারীয়া। সেও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, আমার সঙ্গে সে সারা জীবন ভাসবে। এ দৃশ্য শ্যামলী দেখতে পেল না! ফোটো তুলে পাঠিয়ে দেব তারা রোডের তিনতলার ছাদে। ফুসফুসের যন্ত্রণা ওর বাড়বে। যন্ত্রণার মৃত্যুকালো গুহাভ্যন্তরে শ্যামলী দেখতে পাবে বাস্তব-সত্য। কবি ওকে স্টিল পয়েন্ট দেখিয়েছেন, সেই অনড়-মুহূর্তের তুরীয় সম্ভাবনার মধ্যে নৃত্য দেখিয়েছেন কবি এলিএট, কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু ফুসফুসের ফাটা আর্তনাদ তিনি শোনাতে পারেন নি।

মারীয়া আমার দেহসংলগ্ন হয়ে হেলে বসল। বিশ্ব-গ্লোব তার অক্ষের ওপর ঘুরতে লাগল। চব্বিশ ঘণ্টার আহ্নিক গতি শেষ হয়ে গেল।

জেনেভা-হ্রদে ভারতবর্ষের ছায়া পড়ল না।

ঠিক চল্লিশ দিন পর আমি ফিরে এলুম কলকাতায়।

বালিগঞ্জ পার্ক রোডের বাড়িতে এসে উঠলুম। চাকর-দরওয়ানরা কেউ আমায় এত তাড়াতাড়ি দেখবে ব'লে আশা করে নি। কোন কিছুর জন্য আশা না ক'রে ব'সে থাকবার শিক্ষা আমিই ওদের দিয়েছি। ওদের বুঝিয়েছি পৃথিবীটা ক্রমে ক্রমে একটা বড় হোটেলের মত হয়ে উঠছে। দশ নম্বর ঘরে কাল যিনি ছিলেন, আজ তিনি নেই। তিনি যখন দমদমের বিমানঘাটিতে গিয়ে পৌছলেন, তখন দশ নম্বর ঘরের নতুন প্যাসেঞ্জার নামছেন একটা উড়োজাহাজ থেকে। তিনি আসছেন ব'লে হোটেলের দরজায় কেউ হাত বাড়িয়ে ব'সে নেই, তিনি চ'লে যাবেন ব'লে কেউ এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলবে না। এমন একটা নীরব নিয়মানুবর্তিতা আমার চাকর-দরওয়ানদের জীবনকে পরিচালিত

করছে যে, বাড়িতে প্রবেশ করবার পর মনে হ'ল, আমি এইখানেই ছিলুম। সুইট্জারল্যাণ্ডে আজও যেন যাওয়া হয়ে ওঠে নি।

শয়ন-কামরা তদারক করবার প্রধান চাকর শঙ্কর এসে ঘরের দু-চারটে জানলা খুলে দিয়ে চ'লে গেল, যেমন প্রতিদিন সকালবেলায় করে। আমি ভাল আছি কি না, তাও সে জানতে চাইল না। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মানবতা-ধর্মী ভৃত্য-গোষ্ঠীর মত চাকর শঙ্কর নয়। শঙ্কর সুযোগ পেলে চুরি করে। হগের বাজারে একটা মাঝারি সাইজের মুরগীর দাম যখন তিন টাকা শঙ্করের হিসেবের ফর্দে সেই মুরগীরই তখন দাম হয় তিন টাকা আট আনা। আমি ইচ্ছে ক'রেই ওকে আট আনা এক টাকা চুরি করতে দিই। দিই এই জন্য যে, এক টাকার চুরি বন্ধ করবার মত সময় আমার নেই। যাকে বৈজ্ঞানিক নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে থেকে লাখ লাখ টাকা চুরি করতে হয়, তার সময়ের অভাব—ক্রনিক অভাব।

জানলা খুলে দেওয়ার পর দক্ষিণ দিক থেকে বাতাস আসতে লাগল। আসছে লেক-অঞ্চল থেকে, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ অতিক্রম ক'রে। রাসবিহারী অ্যাভিনিউ আর গড়িয়াহাটার মোড়ে যশোদা ম্যানসনের চারতলার একটা ফ্ল্যাটে আমার বাবা আর মা থাকেন। সঙ্গে থাকে আমার ছোট ভাই অমল। অমল কোথায় যেন একটা চাকরি করে ব'লে শুনেছি। আরও শুনেছি যে, ওর যা মাইনে তাতে যশোদা ম্যানসনের কেন, কোন ফ্ল্যাটেরই ভাড়া দেওয়া চলে না। দেয়ও না। ওরা সব রিফিউজী ব'লে বাড়িটা দখল ক'রে ব'সে আছে। গভর্মেণ্ট সাহস ক'রে তুলেও দেয় না। আসছে নির্বাচনে ওদের কাছেই গভর্মেণ্টের কর্তাদের আসতে হবে ভোট কুড়োতে।

জানলাটা বন্ধ ক'রে দিলুম। দক্ষিণের বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে একটা গন্ধ আসছিল। যশোদা ম্যানসনের চারতলার ফ্ল্যাটের গন্ধ। পচা চিংড়িমাছ ওঁরা কম মূল্যে কিনে নিয়ে আসেন। এটা তাঁদের নতুন অভ্যাস নয়। আমি তো জন্মাবধি বাবাকে বেলা এগারোটার আগে বাজারে যেতে দেখি নি। বহু বছরের অভ্যাস, তাই ওঁদের কোন গন্ধ-বোধ নেই।

দক্ষিণের সবগুলো জানলাই আমাকে বন্ধ ক'রে দিতে হ'ল। তারা রোডের দূরত্ব এখান থেকে দু মাইলের বেশি নয়। চল্লিশ দিন সুইট্জারল্যাণ্ডে থেকে যেটুকু উদ্বৃত্ত-স্বাস্থ্য আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছি, সুযোগ পেলে তারা রোডের বীজাণু সেটুকু আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে। কলকাতার বাতাস কোটি

বীজাণুর ক্রীড়াভূমি। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সহস্র আইনের ফাঁক দিয়ে বীজাণুগুলো আক্রমণের পথ খুঁজছে। মারীয়ার পয়সার অভাব ছিল, নইলে সে কলকাতার নোংরা মানুষের গায়ে হেলান দিয়ে বসত না। আমার মেরুদণ্ড নুইয়ে পড়লেও মারীয়া তার মুখটা তুলে ধরত না ওপর দিকে।

ঘড়িতে সময় দেখলুম, বিকেল পাঁচটা। শঙ্কর এসে খবর দিলে ডাক্তার দেবেশ দাস এসেছেন। দুপুরবেলায়ই নাকি সে টেলিফোন ক'রে জেনে নিয়েছে, আমি ফিরে এসেছি। আমার দেহের সব খবরই দেবেশ জানে। প্রতিদিন ভিজিট দিতে হয় না, মাসিক টাকার অঙ্ক বরাদ্দ করা আছে। শোবার ঘরেই ডেকে পাঠালুম দেবেশকে। সে যথারীতি আমার বুক, পেট এবং পিঠ পরীক্ষা করল। জিভটা বার ক'রে দিলুম। কোনরকম কোটিং পড়ে নি। চোখের নীচেটা টেনে টেনে সে দেখলে, কোথাও রক্তস্বল্পতা দেখা যায় কি না! সবরকম টানাটানি এবং টেপাটেপি শেষ ক'রে সে বললে, কোথাও কোন খুঁত নেই।

থাকলে আমি টের পেতুম।—এই ব'লে দেবেশের সামনে সিগারেটের টিনটা খুলে ধরলুম।

কেমন ছিলে সুইটজারল্যাণ্ডে ?—প্রশ্ন করল দেবেশ।

প্রতিদিন যেমন থাকি, তেমনই ছিলাম। আমার নিয়মানুবর্তিতার বিজ্ঞান আমায় কখনও খারাপ থাকতে দেয় না। মাঝে মাঝে একটু একঘেয়ে লাগে। মনে হয়, বগলের ভাঁজে রসুন চেপে রেখে গায়ে একটু জ্বর আনি। যাক সে সব কথা তোমার গবেষণাগার কেমন চলছে ?

চলছে ভালই। দুটো বেড খুলেছি পেসেন্টের জন্যে। নিজের খরচায় রাখব—

খরচা না করলে তোমার গবেষণার ফল পাবে কেন ? রক্তে বিষ ঢোকাতে পারলেই তো রক্তের বিষ ফেলতে পারবে। কিন্তু তোমার তো ফুসফুস নিয়ে কারবার ? দুটো বেডের জন্যে পেসেণ্ট পেয়েছ ?

একটা খালি আছে।

অন্যটায় ?

একটি যুবতী পেসেণ্ট পেয়েছি। শুকিয়ে দড়ির মত হয়ে গেছে।

কোথায় পেলে ?

রিফিউজী-বস্তিতে।

দেবেশের সিগারেট প্রায় শেষ হয়ে এল। দেবেশ পায়চারি করছিল। দক্ষিণ দিকের একটা জানলা খুলে দিয়ে সে বললে, বিচিত্র এই দেশ! অনেকটা আলেকজাণ্ডারের উক্তির মত শোনাল। জিজ্ঞাসা করলুম, কোন্ দেশ?

ভারতবর্ষ।—শব্দটা উচ্চারণ ক'রে দেবেশ চেয়ে রইল আকাশের দিকে। সম্ভবত আমার জানলার মধ্যে দিয়ে ও ভারতবর্ষকেই দেখছিল।

অনুরোধ করলুম, তোমার ভারতবর্ষের দু-একটা বৈচিত্র্যের নমুনা দাও।

নমুনা? চল তা হ'লে আমার গবেষণাগারে। মেয়েটিকে দেখবে। দেখবে, সবে-স্বাধীন ভারতবর্ষ বিছানার ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। সমাজ ও রাষ্ট্র যেন ওর দেহ থেকে একটু একটু ক'রে মাংস ছিঁড়ে নিয়েছে। তবু মেয়েটির মুখে হাসি, বাঁচবার জন্যে সে কী অসাধারণ সংগ্রাম করছে দিনরাত। হয়তো বাঁচবেও।

তোমার নতুন ওষুধের গুণে বোধ হয়?

কেবল ওষুধের গুণে নয়। ওর শুকনো হাড়ের মধ্যে বাঁচবার একটা অদ্ভুত আদিম প্রবৃত্তি আছে—ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার মত, সে ম'রেও মরতে চায় না, এবং হয়তো মরবেও না।—একটু থেমে দেবেশই আবার বললে, আজ রাত্রে আমার দ্বিতীয় পেসেণ্ট আসবে। আমি নিজেই যাব আনতে।

এটিও কি ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বৈচিত্র্য?

কেবল বৈচিত্র্য নয়, এ এক ভিন্ন রূপ। চল না আমার সঙ্গে, দেখবে তাকে?

গাড়িতে উঠে দেবেশ জিজ্ঞাসা করলে, বরযাত্রী যাবে?

তুমি কি আমার সঙ্গে ইয়ারকি করছ দেবেশ?

গাড়িটা তখন গড়িয়াহাট রাস্তা ধ'রে রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের দিকে যাচ্ছে।

দেবেশ আমার প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে বললে, মেয়েটিকে আমি আজই বিয়ে করব।

মনে হ'ল, দেবেশের সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। আমি আবার পালিয়ে যাব সুইট্জারল্যাণ্ডে। ভুলে যাব ভারতবর্ষকে। এমন একটা রুগ্ন ভারতবর্ষের নাগরিক হয়ে আমি যেন সত্যি সত্যি অসুস্থই বোধ করতে লাগলুম। অশোক-স্তম্ভের মধ্যে দিয়ে আমি আর পশ্চাতের ইতিহাস

দেখতে চাই না। এই তো ভবিষ্যতের ইতিহাস দেখতে পাচ্ছি, যে-ইতিহাস যক্ষ্মারোগাক্রান্ত রমণীর ভ্রূণের মধ্যে গিয়ে তার গতির কাহিনী অব্যাহত রাখবে।

রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে জিজ্ঞাসা করলুম, নতুন ওষুধের পরীক্ষা করবে ব'লে মেয়েটিকে বিয়ে করছ কেন? কি পাবে তার কাছ থেকে?

কিছু না পেলে কি একটুও কিছু দেওয়া যায় না শম্ভু?

গাড়িটা এসে দেশপ্রিয় পার্কের সামনে থামল। টি-পি পুলিস তার ডান হাতটা উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ভাবে ছড়িয়ে দিয়ে পূব-পশ্চিমের গতি সব রুখে দিয়েছে।

আবার আমি কপালের ঘাম মুছলাম।

এক রকম বাধ্য হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, ভারতবর্ষে কি গিনিপিগ কিংবা নেংটি ইঁদুরও পাওয়া যায় না দেবেশ? যদি না পাওয়া যায়, তবে চ'লে যাও পশ্চিমে। তুমি কেন এমন অসভ্যতা করতে যাচ্ছ?

অসভ্যতা নয় শম্ভু, মেয়েটিকে আমি বাঁচাতে যাচ্ছি।

পশ্চিমের রাস্তা খুলে দিয়েছে পুলিস। গাড়ি আবার চলতে লাগল।

দেবেশ, তোমার নিজের ফুসফুসের কি হবে? তোমার বিষাক্ত রক্তের ছিটে-ফোঁটায় ভারতবর্ষের ভগ্ন-স্বাস্থ্য ভবিষ্যতে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে না? বিয়ের মধ্যে আর যা-ই থাক্, যক্ষ্মারোগের ওষুধ নিশ্চয়ই নেই। তোমার ভয় করে না দেবেশ?

না। সব মানুষের যক্ষ্মা এক রকম নয়; অতএব একই ওষুধে সব রকম যক্ষ্মা সারে না। এই মেয়েটির ওপর আমি নতুন ওষুধ প্রয়োগ করব।

হাসি পেল। কলকাতার মেডিকেল কলেজের পাস-করা ডাক্তার দেবেশ রামায়ণ-মহাভারতের অসংখ্য নায়কের মধ্যে যে-কোন একটি নায়কের মত কথাবার্তা কইছে!

গলির মোড়ে এসে পৌঁছলাম আমরা।

জিজ্ঞাসা করলুম, ওষুধটা বোধ হয় তোমার বিজ্ঞানসম্মত নয়? এমন কি গন্ধমাদন থেকেও সম্ভবত নিষ্কাশিত হয় নি?

না। গন্ধমাদন যে-মূল থেকে নিষ্কাশিত হয়েছে, আমার ওষুধও বোধ হয় সেই একই মূল থেকে প্রক্ষিপ্ত।—এই যে এসে গেছি। এই বাড়িতেই কনে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

চেনা-বাড়ির সিঁড়িতে পা দিলুম।

দেবেশ দেখতে পায় নি, আমার পুরনো পদক্ষেপ এ বাড়ির সিমেণ্টে ফাটল ধরিয়েছে।

তিনতলার সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে দাঁড়িয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার নতুন ওষুধটি কি দেবেশ ?

নতুন নয়। আদিম ওষুধের নতুন প্রয়োগ বলতে পার। শম্ভু, এ শতাব্দীর ভগ্ন-স্বাস্থ্য এত বেশি ভেঙে গেছে যে, সুইট্জারল্যাণ্ডের সাদা হাওয়ায় তা আর জোড়া লাগবে না।

হঠাৎ যেন কানে এল, এক নারীকণ্ঠের আবেদন-স্বর—আমায় তুমি পরিত্যাগ করলে কেন ?

শ্যামলী পরিত্যক্তা নয়।

দাঁড়ালুম গিয়ে ওর বিছানার পাশে। আলিঙ্গনে এবার সৃষ্টি হবে নতুন ইতিহাস, যে ইতিহাসের পশ্চাৎ-বন্ধন আমি অস্বীকার করতে পারলুম না। পেছন দিকে চেয়ে দেখি, ডাক্তার দেবেশ অন্তর্হিত হয়েছে।

দীপক চৌধুরী

প্রার্থনা

ভগবান, তুমি নাই সেই কথা
বেপরোয়া আজ বলতে দাও,
তোমার টিকিতে বাঁধা থেকে মোর
সব কিছু প্রভু হ'ল উধাও।
অন্তরে তুমি থাক হে শ্রীহরি,
বাইরে উড়াব ফুৎকার করি,
তোমারে ধরিয়া অনেক মরেছি।
অঙ্গে লাগায়ে জড়তা-বাও
ভগবানহীন নূতন জগতে
ভক্তে তোমার বাঁচিতে দাও॥

অনিবার্য কারণে এবার "ডানা"র কিস্তি প্রকাশ করা গেল না।

ধূমাবতী

সহজকে অসহজ করি
নর্ম-সহচরী
উত্তীর্ণ হইল শেষে উত্তপ্ত মরুতে,
মিলাইতে হ'ল সুর মোটাতে সরুতে।
রুক্ষ দুঃখ-কাষ্ঠখণ্ডে এস্রাজ ভাবিয়া
হিয়া-ছড় তার 'পরে রেখেছি দাবিয়া,
ভুজঙ্গপ্রয়াত-ছন্দে অভিনব কাব্য-সুর বাজে
ধূপ-ছায়া মাঝে।
মনে হয় যেন তার নূপুর-ঝঞ্ঝনা
শোণিত-আবর্তে মম লভিতেছে নূতন ব্যঞ্জনা।
মনে হয় 'করোনারি'-পথে
হয়তো সে দেখা দেবে 'অ্যানজাইনা'-রথে ॥

* * *
* *

স্থিরকে অস্থির বলি জেনেছেন যিনি,
অথচ আবার
অস্থিরের মাঝে যিনি মহা-স্থিরে করেন দর্শন,
সে জ্ঞাতার লাগি
হিমালয়-শীর্ষে শম্ভু পাতে সিংহাসন
শুভ্র তুষারের।

শূন্য-সমুজ্জ্বল-কারী লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র-মশাল,
জলে স্থলে জড়ে জীবে অন্তহীন উৎসব-সঙ্গম,
পরোক্ষ ও অপরোক্ষ কল্পনা-বাস্তব,
অপূর্ব আলেয়া-রূপ ধরে অকস্মাৎ ;
জ্ঞাতা হয় পথ-হারা।
চন্দ্র-চূড় অপেক্ষিছে হিমাদ্রি-চূড়ায়,
জ্ঞাতা সে অজ্ঞাতসারে অনুসরি' আলেয়া-শিখারে
চলিয়াছে অন্ধকার পাতাল-পন্থায় !

কল্পনা-নয়নে তার ঝলসিছে খনি-লীন মণি।
যত নিম্নে নামে
কল্পনা-নয়নে তত চুনি পান্না হীরক মহিমা
রচে নব ইন্দ্রধনু মায়া ঃ নব হয় নবতর।

জানে না সে
শেষ-শিক্ষা দিবে বলি
শেষ-নাগ ফণা তুলে ব'সে আছে সেথা
শিরে বহি ধরিত্রীর ভার।

"বনফুল"

—

স্বর্ণ-ক্যাডিলাক-কামী অভিমানিনীর প্রতি

বৃথা অভিমান, ডাকোটা-বিমান
    কিনে দেব তোরে একটা লো।
সঙ্গে অঙ্গে দেব প্ল্যাটিনাম
    গহনার সাজে এক ভালও।
আজ ক্যাডিলাকে কাজ নেই সখি,
ভাবী গুডলাক্ যেতে পারে ট'কি—
ডায়ালেক্‌টিক্‌-বিধানে তো সোনা
    টিকবে না দেহে এক সালও।
বৃথা অভিমান, ডাকোটা-বিমান
    কিনে দেব তোরে একটা লো।

হ'লে সফ্‌টার (softer), হেলিকপটার
    না হয় একটা দিব তোরে ;
বিকেলে একটু হাওয়া খেয়ে এলে
    ব্যথা দূর হবে শ্রী-গতরে।
রোল্‌স্‌-রুইকের কাল নেই আর,
মাটি মাটি হবে শ্রীচরণ-ভার
না ধরি অঙ্গে। অসীম শূন্য
    হইবে ধন্য চিরতরে।
হ'লে সফ্‌টার, হেলিকপটার
    না হয় একটা দিব তোরে।

অ্যান্‌ড্রোক্লিস ও সিংহ

—ভূমিকা—

কোনো এক বিশেষ অবস্থায় অদূর প্রাচ্য ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য স্থানাদি পরিক্রমণকালে ৺অ্যান্‌ড্রোক্লিসের এক অতি অধস্তন পরপুরুষের সঙ্গে সহসা সাক্ষাৎ করি। ৺অ্যান্‌ড্রোক্লিস্ ইহারই অনৈক বাধ্যতামূলক পূর্বপুরুষ ছিলেন; ইহার কোন প্রমাণই ইতিহাসে, ভূগোলে বা চিড়িয়াখানায় পাওয়া যায় না। হারাপ্পা, মহেন-জো-দড়ো, অজন্তা, শিলালিপি, তাম্রলিপি, প্রস্তরলিপি, নালন্দা ইত্যাদি লইয়া এত যে হুড়াহুড়ি করা হইল, তাহার কিছুই দরকার ছিল না। মহাকবি বার্নার্ড শ ৺অ্যান্‌ড্রোক্লিসকে লইয়া, আজ্ঞাজে কেলেঙ্কারী করিতে গিয়াই অল্প বয়সে মারা গেলেন। গ্যেটে "ফাউস্ট্‌" পর্যন্ত আসিয়াই ক্ষান্ত হইলেন, অ্যান্‌ড্রোক্লিস পর্যন্ত ধাওয়া করিতে ভরসা পান নাই।

তারপর ৺অ্যান্‌ড্রোক্লিস যে সিংহের থাবার কাঁটা বাহির করিয়া দিয়াছিলেন, সেই সিংহটির এক অধস্তন বংশধরের সঙ্গেও অবিলম্বে সাক্ষাৎকার করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল তথ্যই অবগত হই। কেন না, কালের যাত্রার ধ্বনি কখনও ছাই চাপা থাকিতে পারে না, বিকশিত হইয়া সে উঠিবেই। জলের বুকে দাগ না থাকিলেও দাগের বুকে জল থাকিতে বাধা দিবে কে?

৺অ্যান্‌ড্রোক্লিসের কাহিনী ৺বিদ্যাসাগরের 'কথামালা' গ্রন্থে কথা হইয়াই রহিয়াছে, মালা হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহা বিমুগ্ধ জনসাধারণকে ধাপ্পা দিবার বিকৃত প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নহে। তাই এই ক্ষুদ্র কবিতায় ক্ষুদ্রতর পরিসরে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, অ্যান্‌ড্রোক্লিস্ যাহার প্রতীক, সিংহ তাহারই বিপরীত-সাধক মাত্র, এবং ইহাদের কেন্দ্র করিয়া যে সব চরিত্র ও পরিস্থিতি গড়িয়া তুলিয়াছি বলিয়া মনে হয় তাহারা আসলে নিজেরাই গড়িয়া উঠিয়াছে। আশা করি ৺অ্যান্‌ড্রোক্লিসের অতৃপ্ত আত্মা এতদিনে সত্যের সন্ধান পাইবে। ওঁ, শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!

—অ. কৃ. ব

[গভীর অরণ্যের ভিতর একটি পথ। চিন্তিতভাবে এদিকে ওদিকে তাকাইতে তাকাইতে অ্যান্‌ড্রোক্লিসের প্রবেশ। পরণে ক্রীতদাস-মার্কা অর্ধ পা-জামা ও চুড়িদার ন্যাঙো ফতুয়া।]

অ্যান্‌ড্রোক্লিস অরণ্যপথে চলিতে চলিতে চরণ হয়েছে ক্লান্ত
প্রাণ বাঁচাইতে শেষকালে হায় হয়তো হবে প্রাণান্ত।

ঝোঁকের মাথায় এসেছি পলায়ে রেগে মেগে ব'লে "দুত্তোর"
গুলিয়ে ফেলেছি পূব পশ্চিম, দক্ষিণ আর উত্তর।
পড়িয়াছি একা, নাহি কারো দেখা, কে কোথায় আছ ভাই রে!
জানি না কেমনে ঢুকেছি ভিতরে, কেমনে বা যাব বাইরে।
রাত্তির হ'লে হেথায় কোথাও শোবার জায়গা পাব কি?
আর ভাল কথা, ক্ষিদে যদি পায় তা হ'লে হেথায় খাব কি?
কোথা ফলগাছ—আম বা কাঁঠাল, নিদেন পক্ষে পেয়ারা?
কিছুই যে নাই, এ কেমন ঠাঁই? বনটা তো ভারী বেয়াড়া!
মাথা ভন্‌ভন্‌, মন উচাটন, জানিতে হয়েছি ব্যগ্র
আছে কি এ বনে হিংস্র সর্প, সিংহ অথবা ব্যাঘ্র?
ওদিকে হয়তো—ভাবিতেও হায় হয় মোর হৃৎকম্প—
মোর পলায়ন টের পেয়ে প্রভু দিতেছে লম্ফ ঝম্ফ।
টের পেয়ে যদি দলবল নিয়ে ঘিরে ফেলে এই জঙ্গল,
তবে বেমক্কা পাবই অক্কা, কিছুতেই নেই মঙ্গল।
একবার যদি ধরা পড়ি, তবে রাখিবে না মোরে আস্ত,
গুঁতো মেরে মেরে বলাইবে বাবা, করায়ে ছাড়িবে দাস্ত।
সমানে চলিবে লাথি ও চাবুক, মাথায় পড়িবে ডাণ্ডা,
গরম গরম প্রহারের চোটে একেবারে হব ঠাণ্ডা।
না জানি কতই দলাই-মলাই লেখা আছে মোর ভাগ্যে,
ধরা যদি পড়ি প্রভুর হস্তে। ভেবে কিবা হবে? যাক্‌গে।
সারা গায়ে যেন করিতেছে জ্বালা, গিয়েছে অনেক ছাল কি?
আমার বদলে কে দিতেছে কাঁধ টানিতে প্রভুর পাল্‌কি?
এই রে সেরেছে, এবারে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে সব দর্প,
আঁকিয়ে বাঁকিয়ে আমারি দিকে যে আসিতেছে ব্যাটা সর্প।

সর্প— (বঙ্কিম-গতিতে প্রবেশ ও গান।)

ডর পেয়ো না আদমী ওগো, তুম্‌হায় হামি কাট্‌বে না।
হামার পথে পা ফেলো না, তুমহার পথেও হাঁট্‌বে না।
হামার গালে জহর আছে,
তাই এসো না হামার কাছে,
হঠাৎ যদি ছোবল লাগে কোনো দাওয়াই খাটবে না।

তুম্‌হার জাতের বজ্জাতি সব হামার জাতে নেই রে ভাই
পরকে ভাল থাকতে দিয়ে নিজেও ভাল থাকতে চাই।
আপন পুঁজি করতে ভারি
পরের দফা সারতে নারি,
দেখলে হাসি তুম্‌হার মুখে মোর কলিজা ফাটবে না।
ডর পেয়ো না, ডর পেয়ো না, তুমহায় হামি কাটবে না।

অক্রবক্র গতিতে সর্পটি একটি ঝোপের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আত্ম-সংগোপন করিল। সর্পটি পুরাপুরি অদৃশ্য হইয়া গেলে অ্যান্‌ড্রোক্লিস নির্ভীক হাসি হাসিয়া নিঃশঙ্কচারী কায়দায় বুক চাপড়াইল।

অ্যান্‌ড্রোক্লিস্‌—হঠাৎ আমার মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল ব্যাটা চম্‌কে।
হুঁ হুঁ বাছাধন, দেখেছ কেমন বিদায় করিনু ধম্‌কে?
কিন্তু ভাবছি সন্ধ্যেবেলায় আঁধার যখন নামবে
তখন কি ব্যাটা সেই ফাঁকে মোরে ছোবল না মেরে থামবে?
সাপের বাড়া যে শয়তান নেই, এ জাতকে নেই বিশ্বাস।
ওরে বাবা, এ যে ভাবতে গিয়েই আটকে যেতেছে নিশ্বাস!

দূরে কি একটা চার-ঠ্যাং-ওয়ালা জানোয়ারের রহস্যাবৃত আওয়াজ শোনা গেল। অ্যান্‌ড্রোর খাড়া কান দুটি আরও খাড়া হইয়া উঠিল।

ও কিসের ডাক? সিংহ, ব্যাঘ্র, শেয়াল অথবা হায়না?
হাতী, গণ্ডার, ভালুক, গরিলা? কিচ্ছু যে বোঝা যায় না!
মনের দুঃখে ব্যাটা কি ব্যাটারা হাউ হাউ করে কাঁদছে?
অথবা জংলী গানের আসরে দল বেঁধে গলা সাধছে?
আওয়াজটা যেন আসছে এদিকে আমাকেই ক'রে লক্ষ্য!
দেখা যাক তবে বৃক্ষারোহণে আছি কি না-আছি দক্ষ।

আত্ম-নিরাপত্তার্থে একটি বৃক্ষ বাহিয়া আধ-থরথর আধ-অবলীলাক্রমে উঠিয়া গিয়া একটি উঁচু ডালে বসিয়া রহিল। ভাগ্যিস উঠিয়াছিল। তাহা না হইলে কি হইতে অনায়াসে বলা যায়। একটু পরে নর্তন-ভঙ্গীতে নৃত্য-চপল চার পায়ে একটি ব্যাঘ্র-তরুণী বৃক্ষের তলায় আগমন করিল। তাহার গীত গানটি আংশিকভাবে নীচে দেওয়া হইল।

ব্যাঘ্র-তরুণীর গান—ঠাকুর্দা ছিল মোর ইয়া কেঁদো বেঙ্গল টাইগার।
আমি তার আহ্লাদী নাতনী,

দেহ মোর তারি মত মজবুৎ জহ্লাদী গাঁথনি,
মানুষ, বয়েল, মোষ, যারে কাছে পাই তারি সাথ নি',
খুন চুষি, খাই ঠ্যাং, খাই ভুঁড়ি, বুক খাই, খাই ঘাড়—
ঠাকুর্দা ছিল মোর ইয়া কেঁদো বেঙ্গল টাইগার।
মিলত না জুড়ি তার উর্ধ্ব ও লম্বিত লম্ফে,
কিম্বা নিম্নমুখী ঝম্পে।
মিশকালো ডোরা ছিল গায়ে তার হল্‌দি,
ঠাকুমা তো তাই দেখে ভুলেছিল জল্‌দি।
একদিন বেশি খেয়ে দাদু হল চিৎ ভুঁড়ি-কম্পে।
ঠাকুমাকে বললে "ও বাঘিনি!
কখখনো কোথা হ'তে পিছে আমি ভাগি নি।
অ্যাদ্দিনে বুঝি মোর ভাগন্তি ঘটল,
কেঁদো বাঘ কেঁদে আজ পিছে বুঝি হটল।
জেদ ক'রে গোটা মোষ খেয়ে একা আস্ত
সাতবার হয়েছে যে হয়রানী দাস্ত;
তবু ভুঁড়ি এই দেখ ধীরে ধীরে ফুলছে,
তুলতুলে হয়ে হায় তুল-তুল তুলছে,
লাগে তাই মনে মনে খটকা
ভুঁড়ি ফুলে ফুলে ফুলে শেষকালে হবে ভুঁড়ি-ফটকা।"
ডাক পেয়ে হাঁক মেরে এল ধেয়ে হাল্লুম বদ্যি।
নামডাক যত থাক, দেখা গেল আসলে সে রদ্দি।
ফোলা ভুঁড়ি মাথা দিয়ে এলোমেলো মলল,
দর্শনী পাঁঠা নিয়ে যেতে যেতে বলল:
"আজকে যা ক'রে দিনু, দেখো তার ফল পাবে কল্য।"
পাওয়া গেল ফল ঠিক কল্যের একদিন অগ্রে,
দাদু কয়, "ওরে ভুঁড়ি, আজ তোর এ কি দুর্ভোগ রে?"
বার দশ-বারো ক'রে ছটফট
শেষে চোখ উলটিয়ে থেমে গেল চটপট,
থাবা টিপে দেখা গেল, নাড়ী আর নাই হায় নাই তার—
টেঁসে গেছে দাদু মোর ইয়া কেঁদো বেঙ্গল টাইগার।

ব্যাঘ্র-তরুণী আসিয়া বৃক্ষের গোড়া ঘেঁষিয়া উপবিষ্টা হইয়া বৃক্ষের গাত্র-চাটন করিতে লাগিল।

অ্যানড্রোক্লিস— (বৃক্ষের উপরে বসিয়া ভয়ে ভয়ে)
ও বাবা, এ কি রে ? আমার তলায় বিশাল চেহারা বাঘ যে !
গ্যাঁট হয়ে বেশ বসিল আসিয়া আমারি গাছের লাগ যে !
শুধু বসা নয়, কি ভেবে যেন সে মনে মনে ভারী হাসছে !
কি সর্বনাশ ! আরেকটা দেখি এদিক পানেই আসছে !

ব্যাঘ্র-তরুণের প্রবেশ। তাহার বুকে বোধ হয় গান ছিল, কিন্তু সে গান মুখে আনিবার মত অবস্থা তাহার ছিল না।

ব্যাঘ্র-তরুণ—কিছু দেরি হ'ল আসিতে, হে প্রিয়া, কিছু করিও না মনে।
তুমি তো জান না বিষম যে এক ব্যাপার ঘটেছে বনে।
কোথা হতে এক এসেছে সিংহ, এমনি বিষম থাবা,
এক চড়ে তার পাবেই অক্কা সজোরে ডাকিয়া 'বাবা।'
যাহারে-তাহারে যখন-তখন মারিতেছে জোর চাঁটি।
ওর সাথে সারা বনের আমরা পারি কি উঠিতে আঁটি ?
দেখেছি ও-ব্যাটা আসিছে এদিকে কি ভাবিয়া নাহি জানি ;
মানে মানে মোরা স'রে না পড়িলে কে জানে কি হবে হানি ?
তোমার গলায় আমার গলায় পরে হবে গলায়ন।
তার আগে ওগো এসো চট্ ক'রে করি মোরা পলায়ন।

(ব্যাঘ্র-তরুণ ও ব্যাঘ্র-তরুণী পলায়ন করিল। একটু পরেই অদৃশ্য সিংহের নেপথ্য কণ্ঠে ক্ষুধার্ত কণ্ঠ-সঙ্গীত শ্রুত হইতে লাগিল, এবং সেই সঙ্গীত শুনিয়া যাহা যাহা হইবার তাহা তাহা হইতে লাগিল।)

সিংহের নেপথ্য গান—হাঁউ মাঁউ খাঁউ খাঁউ খাঁউ রে !
আমি বীর পশুরাম অ্যাদ্দিন পরে আজ
মানুষের গন্ধ যে পাঁউ রে !
সেই কবে খেয়েছিনু গোটা দুই পাদ্রীর গোশ্‌ত,
সেরেছিনু এক ভোজে পুরো দুই দোস্ত,
মোর পেটে তারা একই বেহেস্তে হ'ল যে উধাউ রে—
হাঁউ মাঁউ খাঁউ খাঁউ খাঁউ রে।

তারপর ঢের দিন মানুষের মাংস তো খাই নি,
কেন না-তা পাই নি।
পাঁঠা, ভেড়া, গরু, মোষ, শেয়াল, হরিণ, ষাঁড়, ভালুক ও জেব্‌রা
খেয়ে খেয়ে জিভ হ'ল থ্যাবড়া।
ক্ষেপে উঠে মন হাঁকে "দুত্তোর
পশ্চিম, পূব আর দক্ষিণ, উত্তর
মানুষের সন্ধানে কোন্ দিকে যাউ রে ?"
হাঁউ মাঁউ খাঁউ খাঁউ খাঁউ রে !

(সিংহের গান থামিয়া গেল। থামিবার ভঙ্গী শুনিয়া বোঝা গেল এত তাড়াতাড়ি তাহার থামিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু হঠাৎ কি যেন দেখিতে পাইয়া তাহাকে থামিতে হইল।)

নেপথ্যে সিংহ—আরে আরে আরে, এ কি রে এ কি ?
এ কি অদ্ভুত কাণ্ড দেখি ?
জঙ্গলে এক জংলী তরু,
তারি সাথে বাঁধা মদ্দা গরু।
লাগে যদি মোর লাগিবে ভোজে,
তার আগে চলি মানুষ-খোঁজে।
মানুষ পাইলে, আহা রে দাদা,
গরু খাবে বলো কোন্ সে গাধা ?
কোন্ দিক হতে আসে মানুষের গন্ধ ?
নাকে মোর সর্দি যে, তাই লাগে ধন্দ।
উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম, পূর্ব
ধাঁধার গোলকে আহা কত আর ঘুরব ?
একবার যদি তারে কাছে মোর পাই রে
এক চড়ে কাবু ক'রে পেট ভ'রে খাই রে !

(সঙ্গে সঙ্গে এক ইয়া বড় জংলী কাঁটা তাহার সামনের ডান থাবার ভিতরে প্যাঁট করিয়া আমূল বিঁধিয়া গেল এবং মুহূর্তে পশুরাজকে কাবু করিয়া ফেলিল। তাহার ক্রুদ্ধ ও আহত গর্জনে জঙ্গল কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু কাঁটা কাঁপিল না। কাঁটারা গর্জনে কাঁপে না, ফুটিয়াই থাকে। হায়, চতুষ্পদ সিংহ সেই মুহূর্তে ত্রিপদ হইয়া গেল। চারি পদের এক পদ কানা হইলে

বাকি তিন পদও যে কতখানি ঝাপসা হইয়া যায়, অঙ্ক-হিসাবীরা তাহার কতটুকু হিসাব রাখে?

সিংহের কাঁটা ফুটিল পায়ে, সিংহ অন্ধকার দেখিল চোখে। তখনও সে জানে না, কাঁটা-উদ্ধারক অ্যান্‌ড্রোক্লিস্ তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। অহো, যে সব অভাগা সিংহের পায়ে জঙ্গলে কাঁটা ফোটে কিন্তু অ্যান্‌ড্রোক্লিস্ জোটে না, তাহাদের কি অবস্থা হয়?

সিংহ যখন বুঝিল যে, কাঁটা চতুষ্পদ বা দ্বিপদ নহে, তাহার ঘাড় মটকানো যায় না এবং হুঙ্কারে তাহাকে কম্পিত করাও বাতুলের বিলাপ মাত্র, তখন তাহার হৃদয়ের বীর ও রুদ্ররস গলিয়া করুণ রসে পরিণত হইল।

হৃদয়ের ভাব পরিবর্তনের ফলে তাহার কণ্ঠধ্বনি এবং ভাষা পর্যন্ত পরিবর্তিত হইয়া গেল। সে করুণ কণ্ঠে আর্ত ভাষায় মনোবেদনা গাহিতে গাহিতে নিয়তির রহস্যময়ী অমোঘ টানে টানিত হইয়া অ্যান্‌ড্রোক্লিসের গাছের দিকে তিন পায়ে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে অগ্রসর হইল।)

সিংহের গান—হায় মেরা দিল, হায় মেরা দিল টুট্ গয়া!
মেরে চরণকে অন্দরমে এক লম্বী কাঁটা ফুট্ গয়া!
জব্দ হুয়া ভারী হম্ জঙ্গলকে রাজা,
কৌন্ হ্যায় কাঁটা-উঠানেওয়ালা? আ জা রে আ জা।
ম্যায় হু বড়া বদ্ কিসমৎ, মেরা হিম্মৎ
কৌন্ লুটেরা লুট্ গয়া হ্যায় লুট্ গয়া?
আজ কাঁহা মেরী পত্নী, মেরী সহধর্মিনী কাঁহা হ্যায়?
হামে লে চলো মেহেরবান্, মেরী দিল-ভুলানী জাঁহা হ্যায়।
বড়ী দর্দ ভরী ইয়ে কাঁটা বড়া জখম কর্ দিয়া রে,
খুন্ ঝর্-ঝর্ ঝরতা হ্যায়, ও মেরী প্রাণ-পিয়া রে!
হম্ খতম্ হো জায়েঙ্গে বিলকুল জরুর,
মেরে আত্মা হো ব্রহ্মতালুমে উঠ্ গয়া উঠ্ গয়া।
হায় মেরা দিল টুট্ গয়া হ্যায়, টুট্ গয়া।
হা·········হায়! মে·········রা·········!
দি······················ল্ !!!!!

("দি·········ল্" বলিয়া একটা আর্তনাদসহ সিংহ ধপাস করিয়া অ্যান্‌ড্রোক্লিসের গাছের গোড়াতে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিয়া পড়িয়া

গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে গাছের উপর হইতে খানিকটা জল সিংহের মাথায় পড়িল, তারপর সিংহের মুখের কাছাকাছি ধপাস করিয়া পড়িল—অথবা পড়িয়া ধপাস করিল—অ্যানড্রোক্লিস্‌!! সিংহ এতক্ষণ নাকে সর্দি থাকা সত্ত্বেও ইহারই গন্ধ পাইতেছিল।

কাঁটার ব্যথায় ইতিমধ্যে সিংহের বেশ কিঞ্চিৎ ক্ষুধামান্দ্য ঘটিয়াছিল। তা ছাড়া বিধাতারই সূক্ষ্ম নির্দেশে তাহার মনে হইল, সম্মুখের লোকটি হয়তো তাহার পায়ের কাঁটাটি তুলিয়া দিতে পারে। তাই অ্যানড্রোকে সে খাইল না, উদাস নয়নে তাহার সামনে কাঁটা-বেঁধা থাবাটি আগাইয়া দিল।

ক্রীতদাস অ্যানড্রোক্লিস্‌ মানুষের গুঁতা নানাভাবে খাইয়া পোক্ত হইয়াছিল। প্রথম ভয়ের ধাক্কার পর সামলাইয়া লইয়া দেখিল, সিংহ হাজার হইলেও মানুষের মত হিংস্র প্রাণী নহে। তা ছাড়া, ভাবিল মানুষের হাতে মরার চাইতে বরং সিংহের হাতে মরা ভাল। তাই সিংহ দেখিল এ লোকটা ভয়ে আধমরা হয় নাই, একটু বুঝাইয়া বলিলেই কাজ হইবে। তখন……)

সিংহের কীর্তন বন্ধু হে, কাঁটা ফুটিয়াছে পায়।

দেখিতে সরু সে তবু ভরা বিষে,
ব্যথায় পরাণ যায়।
কেমনে হাঁটিব কেমনে ছুটিব,
কেমনে মারিব লাফ?
মারা যাব হায় যদি মোর পায়
কাঁটা নাহি হয় সাফ।
(মারা যাব ·····
শিকার বিনে না খেয়ে যে
অনাহারে মারা যাব—)
হে লাঙুল-ছাড়া দুই পায়ে খাড়া,
তোমার আঙুল দিয়া
কাঁটা ছিনে নাও মোরে কিনে নাও,
কাঁদিছে আমার হিয়া।

(সিংহ কাঁটা-ওয়ালা থাবাটা অ্যানড্রোক্লিসের মুখের কাছাকাছি বাড়াইয়া দিল, যেন গণৎকারকে হাত দেখাইতেছে।)

অ্যানড্রোক্লিস্— বাড়ায়ে দিয়েছে ডান পা-টা।
এই পাযে ফুটিযাছে কাঁটা।
কাজেব বেলায বটি কাজী,
তাব পবে যদি বলে পাজী ?
কাঁটা তুলে দিলে পবিপাটি
পরে যদি মেবে দেয চাঁটি ?
একদম না-ই তুলে দিলে ?
আস্তই খাবে তবে গিলে।
দেখি ভাই, দেখি তবে পা-টা
ধীবে ধীবে তুলে দিই কাঁটা।

(ধীরে ধীরে সিংহের থাবা হইতে কাঁটা বাহির করিয়া দূরে ফেলিয়া দিল। সিংহ কৃতজ্ঞতায় কাঁদিতে কাঁদিতে অ্যানড্রোর পায়ে লুটাইয়া পড়িল।)

সিংহ— কাটা হতে মোবে মুক্ত কবেছ, পবাণ কবিছে নৃত্য।
আজ হ'তে ববো আজীবন তব সহা অনুগত ভৃত্য।
হেন মোব মনে হইতেছে বোধ
হবে না এ ঋণ এ জীবনে শোধ—
করিও না মানা, খেযে আসি খানা, ক্ষুধায জ্বলিছে পিত্ত।
বাঁধা গরুটাকে খেযে আসি আগে তাকং কবিযা অঙ্গে
তাব পবে প্রভু, যেথায বলিবে যাইব তোমাব সঙ্গে।
সার্কাসে তুমি দেখাইযা খেলা
মোব সাথে, প্রভু, টাকা পাবে মেলা,
এই ভাবে যদি কিছু ঋণ শোধি হবে খোশ্ মম চিত্ত।

(সেই যে একটা বাঁধা মদ্দা গরু দেখিয়া আসিয়াছিল, সেটিকে ভক্ষণ করিতে সিংহ চলিয়া গেল। কিছুদূর গিয়া সিংহ দেখিল, গাছের সঙ্গে মদ্দা গরুটি সেইভাবেই বাঁধা আছে। দেখিয়া তাহার সুপ্ত ক্ষুধা আবার মাথা-চাড়া দিয়া জাগিয়া উঠিল। ব্যাটার মগজে ঢুকিল না যে, এহেন সিংহ-ব্যাঘ্র-চিতা-নেকড়ে-হায়না ইত্যাদি শ্বাপদ-সঙ্কুল ভীষণ গহন অরণ্যে কেহ গভীর শয়তানী মতলব না থাকিলে এভাবে কোনো শ্বাপদের সুখাদ্য জানোয়ার বাঁধিয়া রাখে না। অত শয়তানী বুদ্ধি মগজে থাকিলে হতভাগা মানুষ হইয়াই জন্মাইত।

আসলে ঐ সুখাদ্য জানোয়ারটির ঠিক পাশেই একটি কূপ খনন করিয়া তাহাতে একটি জটিল বাঘ-সিংহ-ধরা ফাঁদ পাতিয়া রাখা হইয়াছিল। উপরে ঘাস ও পাতা দিয়া এমন করিয়া ঢাকিয়া রাখা হইয়াছিল যে, কিছুই বাহির হইতে বোঝা যাইতেছিল না। সিংহ ক্ষুধার্ত লক্ষ্যে বাঁধা জানোয়ারটির উপর লাফাইয়া পড়িতে গিয়া ঝপাৎ করিয়া ফাঁদে পড়িয়া গিয়া অসহায়ভাবে আটকা পড়িল।......

এইবারে ফের যাওয়া যাক অ্যান্‌ড্রোক্লিসের কাছে।)

অ্যান্‌ড্রোক্লিস্—সিংহ হতে তো ছাড়া পাওয়া গেল কাঁটা তুলে দিয়ে পায়ের।

প্রভু মোরে পেলে ঘা করিবে মেরে, মলম দেবে না ঘায়ের।
চামড়ার কড়া চাবুকে আমার গায়ের চামড়া কেটে
মাখাইবে নুন, ঘ'ষে ঘ'ষে দেবে শুক্‌নো লঙ্কা বেটে।
একবার যদি পেরেছি পালাতে ফিরে তো যাব না কভু
এই বনে আমি এসেছি পলায়ে কেমনে জানিবে প্রভু?

(ঠিক সেইক্ষণে অ্যান্‌ড্রোক্লিসের চাবুক-হস্ত প্রভু তাঁহার অট্টালিকার একটি অট্ট-প্রকোষ্ঠে অট্টভাবে ধমকাইতেছেন, এবং তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া তাঁহার বিভিন্ন সাইজের একদল ক্রীতদাস সে ধমক শুনিতেছে এবং কাঁপিতেছে।)

প্রভু— এইবারে বুঝেছি যথার্থ
তোরা সব বেইমান, উজ্‌বুগ্‌, শয়তান
নেমক-হারাম অপদার্থ।
নাত-জামায়ের মতো পেয়েছিস তোরা ব্যবহার যে,
সেরা সেরা কত চীজ্‌ করেছিস নিত্য আহার যে,
পক্ক কলার খোসা, মৎস্যের ভাল ভাল হাড় যে,
পাঁঠার ছালের কত চচ্চড়ি করেছিস পার যে,
ভাতের পুষ্টু ফেনা গিলেছিস্ কত ভাঁড়ে ভাঁড় যে,
এ ছাড়াও আরো কত, মাথা ঘোরে ফর্দেতে তার যে,
এত ভোজ আজ থেকে জুটবে না আর তো!
নেমক-হারাম অপদার্থ!

(ক্রীতদাসগণের হতাশাপুর্ণ অর্ধস্ফুট "হায় হায়" ধ্বনি ।)

চব্বিশ ঘণ্টায় একুশটি ঘণ্টা তো মাত্র
কাজ দিই, তা ছাড়া তো গপ্পে কাটাস দিবা রাত্র।
ছুটি সিকি ঘণ্টার, জ্বর-জ্বর করে যদি গাত্র।
তবু কালো মুখ ভার, এম্নি হারামী তোরা পাত্র!
শয়তানী ইস্‌কুলে তোরা সব সেরা সেরা ছাত্র,
দল বেঁধে ফাঁকি দিস মনিবের স্বার্থ।
হাতে নাতে ধরেছি যথার্থ।
এই তো সেদিন মোটে মোটা দামে অ্যান্‌ড্রোকে কিনলাম।
দু'দিনের বান্দা সে, তাকে আর কতটুকু চিনলাম?
ভাবলাম, গায়ে পায়ে তাগড়া সে, খায় দায় অল্প,
চট্‌পট্‌ কাজে খুশি হরদম্‌, করে নাকো গল্প!
সেই কিনা শেষটায় বেমালুম দিয়ে গেল লম্বা?
আমি হেন জাঁদ্‌রেল, আমাকেও দেখাল সে রম্ভা?
তোরাই সহায় ছিলি, নইলে কি পারত?
খুন চেপে গেছে মোর, হয়ে গেছি ভয়ানক খাপ্পা।
ভেবেছিলি দল বেঁধে সহজেই দিবি মোরে ধাপ্পা?
টাক মাথা নিয়ে তোরা কাঁচকলা দেখাবি কি ডাবকে?
আয় দেখি পিঠ পাত্‌, ছাল তুলি পটাপট্‌ চাব্‌কে।
তারপর কেটে ফেলি সবগুলো ঘাড় তো
তবে হবি জব্দ যথার্থ।

ক্রীতদাসগণের সমবেত বন্দন। (সর্দারের পরিচালনায়)—

প্রভু, নম হে নম, ক্ষম হে ক্ষম!
(তুমি) তুষ্ট রহিলে পরম ইষ্ট,
রুষ্ট হইলে যম হে যম।
শ্রীমুখ-আকাশে হাসির বরষা
দেখিলে চিত্তে পাই যে ভরসা,
(তুমি) দন্ত ঘর্ষি' ভ্রূকুটি করিলে
মোদের গা করে ছম হে ছম।

(মোদের) রাখিলে রাখিতে, মারিলে মারিতে
পার পার পার হে নিরুপম !

(সকলে নতজানু হইয়া প্রভুকে প্রণাম করিয়া নতমস্তকে উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রভু অ্যান্ড্রোক্লিস-পলায়ন-ক্রুদ্ধতা সত্ত্বেও কিঞ্চিৎ প্রীত হইয়াছেন বোধ হইল।)

প্রভু— চাবুকের আর খাঁড়ার ভয়েতে
হয়েছিস বুঝি সভ্য !
(এবার) বল্ দেখি বক্তব্য ?
তার আগে তোরা সবে শুনে রাখ্
মানবো না কোন ফাঁকি আর ফাঁক,
অ্যান্ড্রোকে ফিরে না পেলে তোদেরই
সিংহের মুখে সঁপব।

(ক্রীতদাসগণের সর্দারের ইঙ্গিতে অন্যতম ক্রীতদাস এন্‌কোরাস্ [illegible] আসিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া দাঁড়াইল।)

এন্‌কোরাস্— শ্রীপদে প্রণাম করে এ দাসানুদাস
এনোবার্বাসের পুত্র, নাম এনকোরাস।
ক্রীতদাস-হট্ট হতে খরিদ করিয়া
আনিলেন প্রভু অ্যান্ড্রোক্লিসেরে ধরিয়া,
অ্যান্ড্রো যে করিল মহা নিরীহের ভাণ,
কে জানিত পেটে পেটে এত শয়তান !
আপনি বিশ্বাস করি আনিলেন তারে,
পলাইয়া গেল সে যে পগারের পারে,
অতএব হইল সে বিশ্বাসঘাতক,
বিশ্বাসঘাতন—সে যে বিষম পাতক।
এই পাতকের সাজা করিতে জাহির
আনিব তাহারে আমি করিয়া বাহির।

(সকলের বিস্ময়। সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভুর।)

প্রভু—(অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া)—এতক্ষণ করেছিলি ছল !
তা হ'লে জানিস তুই বল্

হতভাগা বিশ্বাসঘাতক
কোথায় হয়েছে পলাতক ?
তা হলে সে তোরি বুদ্ধি নিয়ে
চুপি চুপি গিয়েছে পালিয়ে ?

এন্‌কোরাস্—আগে কিছু জানি নাই প্রভু, পলায়েছে কিছু নাহি বলে।
প্রকৃতির ডাকে দিতে সাড়া, চুপি চুপি গেছে সেই ছলে।
সাড়া দিতে যতক্ষণ লাগে পার হয়ে গেলে সে সময়
তবুও সে ফিরিল না যবে তবে মাত্র জাগিল সংশয়।

সর্দার—সবে মিলে আসিয়া তখন
চরণে করেছি নিবেদন
যেইমাত্র পাইয়াছি টের,
কিছুমাত্র করি নাই দের।

দ্বিকোরাস্—ক্রীতদাস পলাইয়া ধরা যদি পড়ে
তবে, মুণ্ড রহিবে না ধড়ে,
এই রীতি অ্যান্‌ড্রোক্লিস ভালমত জানে,
ভেবেছিনু ভয় তাই আছে তার প্রাণে।
এ সন্দেহ কারো মনে মারে নাই উঁকি
পলাবে সে ঘাড়ে নিয়া এত বড় ঝুঁকি !

প্রভু—ঝুঁকির ভাবনা স্রেফ্ তার।
কেমনে করিবি গ্রেফতার
তাই তুই বল্ সংক্ষেপে
বাজে কথা একেবারে চেপে।

এন্‌কোরাস—আমারে বিশ্বাস ক'রে অ্যান্‌ড্রো কাল ভোরে
অনেক গোপন কথা বলেছিল মোরে।
বলেছিল দূরে এক জঙ্গলের কথা,
আমার বিশ্বাস অ্যান্‌ড্রো পলায়েছে তথা।
ধরা পড়িবার ভয় আছে তার চিতে
এই ভয়ে জানি শীঘ্র যাবে না বাড়িতে,
থাকিবে গা-ঢাকা দিয়া জঙ্গল-মাঝারে।
সেইখানে গিয়া আমি মিলিব তাহারে।

কোন্ পথে যেতে হবে সে জঙ্গলে পেতে
জানিয়া রেখেছি আমি অ্যান্‌ড্রোক্লিস্ হ'তে।
অ্যান্‌ড্রোক্লিস্ মোরে নাহি সন্দেহ করিবে
মোর সাথে আসি' ফাঁদে সহজে পড়িবে।
রক্ষীদল রবে সবে ঘিরিয়া জঙ্গলে
একা আমি প্রবেশিব পলায়ন ছলে।
ভুলায়ে যেমনি তারে আনিব বাহিরে
রক্ষীদল সেইক্ষণে ফেলিবেক ঘিরে।
এ না হ'লে অ্যান্‌ড্রো যদি আগে টের পায়,
তবে সে জীয়ন্ত ধরা নাহি দিবে হায়!

প্রভু— খাসা এঁটেছিস তুই ফন্দী।
করিতে পারিলে তারে বন্দী
ক্রীতদাস না রহিবি ওরে!
মুক্তদাস ক'রে দিব তোরে।
ধ'রে আনা চাই তারে তাজা,
নহিলে কেমনে দিব সাজা?

এন্‌কোরাস্—অ্যান্‌ড্রোরে আনিব জ্যান্ত, এ মোর বিশ্বাস।
কিন্তু প্রভু, মুক্তি নাহি চাহে এই দাস।
প্রভুর সেবায় কায়-মন-বাক্যে সাধা,
আজীবন রহি যেন চরণের কাদা।

(তাড়াতাড়ি তোড়জোড় করিয়া অ্যানড্রোক্লিস-গ্রেপ্তার-অভিযাত্রীরা জঙ্গল-অভিমুখে রওনা হইয়া গেল। ওদিকে তখন সেই সিংহটি—যে গাছের সঙ্গে বাঁধা মন্দা গরু খাইতে গিয়া ফাঁদে আটকা পড়িয়াছিল—একটি লোহার খাঁচার পালকীতে অসহায়ভাবে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রাজার সিংহশালা অভিমুখে নীত হইতেছে।)

সিংহ—(স্বগত) বিধাতা কি খেলা খেলিস আমায় নাচাতে?
কাঁটা থেকে রেহাই দিয়েই পুরলি খাঁচাতে!
এ যেন হায় সারিয়ে কাশি
হেসে ক্ষণিক মিষ্টি হাসি
করলি শুরু গুরু গুরু হাঁচন হাঁচাতে।

বাঁধা গরুর লোভ করে হায় আমিই বাঁধা যে
গোপন ফাঁদে আট্‌কে প'ড়ে লাগল ধাঁধা যে !
জায়গা দে রে হাত-পা নাড়াব,
জায়গা দে রে শরীর ঝাড়াব
নইলে পরে পারবি নে রে আমায় বাঁচাতে।
বিধাতা ভাই, এ কি খেলা আমায় নাচাতে ?

(সিংহের খাঁচা-বাহকদলের আগে আগে চলিয়াছে দলের প্রধান বাহক। সে দক্ষিণ হস্তে একটি চাবুক বহন করিতেছে এবং মাঝে মাঝে বাহকদের উপর তাহার সুব্যবহার করিতেছে।

তাহারও আগে একখানা ছাতখোলা পালকীতে বাহিত হইয়া যাইতেছে বিখ্যাত জ্যান্ত-পশু-ব্যবসায়ী শেঠ সিংহবিক্রম সিং।

পালকী যে দিকে চলিয়াছে সিংহবিক্রমের পৃষ্ঠদেশ সেই দিকে। সিংহবিক্রমের হাতেও চাবুক ; সেই চাবুক প্রধান বাহকের দিকে উদ্যত।)

সিংহবিক্রম--- (ওরে) চট্‌পট্ চল্ চল্
চল্ চল্ চল্ চল্ চল্ রে !
সব কিছু হাঙ্গামা পাছে হয়ে যায় নিস্ফল রে
ভয়ে তাই মন চঞ্চল রে !
আস্‌মানে বেলা বেশি নাই রে,
বেলাবেলি পৌঁছানো চাই রে,
তা না হ'লে চাবকিয়ে ক'রে দেব রক্ত যে জল রে—
চল্ চল্ চল্ চল্ চল্ রে !

(প্রধান বাহকের উপর চাবুক চালনা। সঙ্গে সঙ্গে প্রধান বাহকের চাবুক তাহার পিছনের বাহকদের উপর পরিচালিত হইল। শ্রান্ত বাহকগণ প্রাণপণে দ্রুততর গমনের চেষ্টা করিতে লাগিল।)

সিংহবাহকগণ— ডান্ বাঁ ডান্ বাঁ
তালে ফেলে চালা পা।
ধুপ্ ধাপ্ ধুপ্ ধাপ্
পড়ে পা চুপ্ চাপ্।
রাম দুই রাম দুই
পায় চাপে কাঁপে ভুঁই।

যায় যাবে জান্ ভাই
ক'ষে জোর টান ভাই।
হাঁইয়ো রে হাঁইয়ো
জোরে চল্ ভাইয়ো।

(ক্রীতদাস এন্‌কোরাসের প্রবেশ। সঙ্গে একদল সশস্ত্র বরকন্দাজ এবং বরকন্দাজ-সর্দার পেক্‌টোরাস্।)

পেক্‌টোরাস্— আরে আরে, এ কে? শেঠজী না?
মন বলিতেছে চিনি চিনি, আর
চক্ষে লাগিছে চিনা চিনা।

সিংহবিক্রম— দোহাই তোমার দাদা!
করিতে চলেছি রাজদরশন, দিও না এখন বাধা।
জানো তো রাজার সিংহশালার সিংহটা গেছে মারা?
প্রাণদণ্ডের কাছারী বন্ধ রয়েছে সিংহ ছাড়া।
সদ্য-ধরা এ সিংহেরে তাই নিয়া চলিয়াছি ভেট।
খেতাব এবারে কে মারে আমার? ধন্য রে আমি শেঠ।

পেক্‌টোরাস্—তোমারে হে দাদা দিতে মোটে বাধা নাহি সাধ,
নাহি সাধ্য।
তুমি ধরিয়াছ খাদক, আমরা ধরিতে চলেছি খাদ্য।

সিংহবিক্রম— সাধু অভিপ্রায় তব ভাই।
তুমি যাও তব পথে, মম পথে আমি চ'লে যাই।
চল্ চল্ চল্ চল্ চল্ রে।
বেলা প'ড়ে গেলে সব হবে নিষ্ফল রে।

(সিংহবিক্রমের দলবলসহ প্রস্থান। অ্যান্‌ড্রোক্লিস-সন্ধানীর দল সেই জঙ্গলের বাহিরে আসিয়া পৌঁছিল।)

এন্‌কোরাস্—তোমরা সবাই লুকিয়ে থাকো হেথায় বনের বাইরে,
একলা আমি পালিয়ে যেন বনের ভেতর যাই রে,
সেথায় খুঁজে অ্যান্‌ড্রোক্লিসের যদিই দেখা পাই রে,
ভুলিয়ে আমি হেথায় তাকে আসব নিয়ে ভাই রে।

পকুটোরাস্—আমরা তখন সবাই মিলে ধরব তাকে ক্যাঁক্ ক'রে,
হাতে পায়ে জড়িয়ে দড়ি ফেলব তাকে প্যাক্ ক'রে।
মরণ-সাজা বাঁধাই আছে, যতই কাঁদুক ভ্যাঁক্ ক'রে।
খাঁচার ভেতর ফেলব যখন, সিংহ খাবে খ্যাঁক্ ক'রে।

(এন্‌কোরাস্ বনের ভিতরে গিয়া অ্যান্‌ড্রোক্লিসের খোঁজ করিতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে তাহাকে ডাকিতেও লাগিল। সে তখন একটি পেয়ারা গাছের উঁচুতে বসিয়া পেয়ারা খাইতে খাইতে গাহিতেছে।)

অ্যান্‌ড্রোর গান— (মিশ্র দাদ্‌রা তাল)

আজি তারে বারে বারে মনে পড়ে, পড়ে মনে।
খেয়েছি পেয়ারা কত কাঁচা-পাকা তারি সনে,
যখন তখন আহা, কারণে ও অকারণে।
সে আজি রয়েছে দূরে আমি আছি কাছে;
সে কোথায় নাহি জানি, আমি ব'সে গাছে,
আমারে ভাবিয়া সেও কাঁদে জানি ক্ষণে ক্ষণে -
হবে কি মিলন পুন তার সাথে এ জীবনে?

(গান শেষে পেয়ারা খাইতে খাইতে অ্যান্‌ড্রোক্লিস্ মৃদু মৃদু অশ্রুবর্ষণ করিতেছে, এমন সময় গাছের তলায় আসিয়া দাঁড়াইল এন্‌কোরাস্।)

এন্‌কোরাস— কিমাশ্চর্যমতঃপরম্?
অবাক্ কাণ্ড এ যে চরম!
পালিয়েছি এক ফাঁকে রে ভাই!
আর কি রে সেথা ফিরিয়া যাই?

অ্যান্‌ড্রোক্লিস্—(নামিয়া) এন্‌কোরাস্? পলায়েছ? এস বন্ধু মম।
একসঙ্গে বনে বাস স্বর্গসুখ সম।
বাঁচিব কি এই বনে? ছিল এ সংশয়।
তোমারে পাইয়া বন্ধু, আর নাহি ভয়।
তবু এই চিন্তা করি' কাঁদিতেছে হিয়া
অ্যাগ্নিনী কাঁদিছে বুঝি আমারে ভাবিয়া।
(আবৃত্তি) ভগবান, যারে ক্রীতদাস কর প্রেম কেন দাও তারে?
ক্রীতদাস কেন কর প্রেম দাও যারে?

পায়ে হাতে যার লৌহ-নিগড় বাঁধা
তার প্রেম হায় নয় শুধু একা কাঁদা,
দাস যে প্রেমিক নিজে কাঁদে আর কাঁদায় সে প্রেমিকারে।
ভেবেছিনু এই পৃথিবীর হাওয়া, এই পৃথিবীর আলো
বুক ভ'রে নেব, চোখ ভ'রে নেব, প্রাণ ভ'রে বেসে ভালো।
তার পরে দেখি সবই মরীচিকা
শুধু আলেয়ার ফাঁকি-দেওয়া শিখা,
স্বপ্ন আমার চুরমার হয়ে ভেঙে গেল একেবারে।

এন্‌কোরাস্ (অ্যান্‌ড্রোক্লিস্‌কে ঝাঁকাইয়া)
বন্ধু আমার, হঠাৎ তোমার কি হ'ল ভাই বল?
হাল্‌কা হবে, আমার সাথে খোলা হাওয়ায় চল।
ভয় ক'রো না ভাই
প্রাণেব ভয় কি তোমাব একার, আমার কিছু নাই?

(এন্‌কোরাস্ সরল-বিশ্বাসী অ্যান্‌ড্রোক্লিস্‌কে লইয়া বনের বাহিরের দিকে চলিল। এই সময় বহুদূরে পার্বত্য উপত্যকা পথ হইতে শোনা যাইতে লাগিল জনৈক উদাসী বৈরাগী রুদ্র-খঞ্জনী বাজাইয়া গাহিতেছে।)

নেপথ্যে বৈরাগীর গান

(যদি) কেউটে সাপের ফণায় দোলে শিউলি ফুলের মালা
(তবে) সেই মালাতে না দিয়ে মন আপন পথে পালা রে তুই
আপন পথে পালা।
আনমনে পা দেয় যে ফাঁদে
বাঁধায় প'ড়ে সেও যে কাঁদে,
(আহা) সরল মনে গরল খেলেও সইতে যে হয় জ্বালা।
থাকতে সুখে ছুটিস কেন খেতে ভূতের চাঁটি?
(কেন) বাঁশের বাঁশীর আশায় ছুটে খাবি বাঁশের লাঠি?
তুচ্ছ ভেবে হাতের পাঁচে
ছুটিস নে তুই ছয়ের পাছে,
(ওরে) শালার যদি ভগ্নী মেলে নাই বা পেলি শালা।

অ্যান্‌ড্রোক্লিস্ (দ্বিধাগ্রস্ত)—ওকে গান গায়, ও কি গান?
ছ্যাঁৎ ক'রে কেঁপে ওঠে প্রাণ!

এন্‌কোরাস্‌— ও কিছু নয় অ্যান্‌ড্রো ভাই রে !
সব ঠিক হবে, এস বাইরে।

(বাহিরের দিকে গমনোদ্যত।)

নেপথ্যে রহস্যময় কণ্ঠের গান

ওকে জীবনের বুক থেকে মরণের মুখে ধায় ?
(হায় হায় হায় হায়)
ওকে চালাকের ধোঁকা খেয়ে রাম-বোকা ব'নে যায় ?
(হায় হায় হায় হায়)
ওকে মিট্‌মিটে শয়তানে দেবদূত ভাবে রে ?
মোক্ষের মোহে মহা দুঃখ যে পাবে রে !
ওকে ঠাঁই জল ছেড়ে চলে থই-হারা দরিয়ায় ?
(হায় হায় হায় হায়)

অ্যান্‌ড্রোক্লিস্‌— ও কি গান গায় ও কে দূরে ?
বুক যে কাঁপিছে তার সুরে।

এন্‌কোরাস্‌— কান দিয়ো না ক্ষ্যাপার গানে।
আবোল-তাবোল, নেইকো মানে।
হাত মিলিয়ে হাতে
এস আমার সাথে।

নেপথ্যে আবার গান

ও কে শখ ক'রে দুই চোখে ঠুলি প'রে ভাই রে
চড়াই ছাড়িয়া চলে যেথা উত্‌রাই রে,
ও যে মরিতে কোমর বাঁধে তারে বল্‌ কে বাঁচায় ?
(হায় হায় হায় হায়)

(কিঞ্চিৎ চিন্তিতমনে অ্যান্‌ড্রোক্লিস্‌ বনের বাহিরে হাওয়া খাইতে গেল। কিছুদূর যাইতেই এন্‌কোরাসের ইশারামাত্র লুক্কায়িত সশস্ত্র রক্ষীরা ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অ্যান্‌ড্রোকে কাবু এবং হস্ত পশ্চাৎবদ্ধ করিয়া গুঁতা মারিতে মারিতে লইয়া চলিল।)

পেক্‌টোরাস্‌— দেখিয়েছিলি বুকের পাটা !
(এবার) ভ্যা করতে চল্‌ রে পাঁঠা।
প্রভুর কাজে ছিলি সুখে।

(এখন) মর্‌তে হবে সিংহ-মুখে। (অ্যান্‌ড্রোক্লিসের চমৎকৃতি)
এন্‌কোরাসের চেষ্টাতে
পড়লি ধরা শেষটাতে।
ধন্য রে তুই এন্‌কোরাস্!
ইনাম পাবি যেমন চাস। (অ্যান্‌ড্রোর ভ্রূ-চমক)

অ্যান্‌ড্রোক্লিস্ (এন্‌কোরাসকে)—এতও ছিল তোমার ঘটে ?
সাবাস্ তুমি বন্ধু বটে!
আমি গেলে সিংহ-পেটে
বেঁচো প্রভুর চরণ চেটে। (পেক্‌টোরাসের হাতে প্রহার ভক্ষণ)
হায় বে-ইমান, লজ্জাহীন!
ছুঁতেও করে গা-ঘিন্‌ঘিন্। (প্রহার ভক্ষণ)

এন্‌কোরাস (ব্যঙ্গ-ছন্দে)—বন্ধু আমার প্রেমের রাজা!
আইন ভেঙেছ পাবেই সাজা।
খাই যে প্রভুর নিমক আমি,
ধরিয়ে দিলেম তাই আসামী।

(অ্যান্‌ড্রোক্লিসকে লইয়া সকলের প্রস্থান। আকাশে বাতাসে কি যেন এক নাম-না-জানা ছলছল সুর ক্ষণে ক্ষণে বেসুর হইয়া যাইতেছে। ওদিকে সেই সিংহটি গিয়া রাজার সিংহশালায় ভর্তি হইয়াছে। অপর দিকে অ্যান্‌ড্রোক্লিসের প্রিয়া অ্যাথিনী কোথায় কি ভাবিতেছে জানি না। ইহার পরের একটি তামাসা-দৃশ্য দেখা যাক।

মাঝখানে ফাঁকা ডিম্বাকৃতি মাঠ, তাহাতে ঘাস নাই, সব দিকে উঁচু দেওয়াল দিয়া ঘেরা। দেওয়াল ঘিরিয়া গ্যালারি, গ্যালারি ভরিয়া লোকারণ্য। রাজার নিজস্ব আসনে রাজা উপবিষ্ট। এক পাশে রাজকবি হণ্ডুরাস—অন্য পাশে রাজ-পুরোহিত সেনেকা। আশেপাশে দেহরক্ষীদল দেহরক্ষা করিতেছে। একজন শিঙা হাতে, ফুঁকিবার অপেক্ষায় দণ্ডায়মান। মন্ত্রীদের নির্দিষ্ট গ্যালারিতে মন্ত্রীরা বোধ করি মন্ত্রণায় মত্ত, কিন্তু চক্ষু মাঠের দিকে নিবদ্ধ। অপর দিকে অ্যান্‌ড্রোক্লিস্-প্রভু সপরিবারে অন্ন করিয়া হাসিতেছে। তাহার পায়ের তলায় এন্‌কোরাস্ ও অন্যান্য ক্রীতদাসগণ। রাজার

রুমালের ইশারায় উচ্চৈঃস্বরে শিঙা ফোঁকা হইল। তারপর রসুনচৌকীর মত উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া ঘোষক ঘোষণা করিল।)

ঘোষক (শব্দ-সম্প্রসারক যন্ত্রের সাহায্যে)

উপস্থিত সুধীজন শুন দিয়া মন
রাজ-আজ্ঞা-অনুযায়ী করিব বর্ণন।
বহুদিন বাদে হেথা হইবে তামাসা,
দৈবক্রমে যোগাযোগ হইয়াছে খাসা।
নয়া এক সিংহ কল্য হইয়াছে ধরা
ঐ যে খাঁচায় সে যে আছে বন্ধ করা।
ক্রীতদাস এক করেছিল পলায়ন
তাহারে হৈয়াছে আনা করিয়া বন্ধন।
পলায়ন-দোষে পাবে সাজা প্রাণদণ্ড,
ক্ষুধার্ত সিংহের মুখে হবে খণ্ড খণ্ড।
অ্যানড্রোক্লিস্ নাম তার, মরি কি বাহার!
করিতেছে অ্যানড্রোক্লিস্ অন্তিম আহার।
আহার হইলে সারা, শুরু হবে খেলা,
কিঞ্চিৎ অপেক্ষা সবে কর এই বেলা।

(চা-গরম, চানাচুর, কুলপি বরফ, পাঁঠার ঘুগনি, প্যাজ-ফুলুরি, লোনতা বিস্কুট, পাঁপরভাজা, ইত্যাদি খুব বিক্রি হইতে লাগিল। আজিকার এই সুযোগে ইহাদের ব্যবসা বেশ চালু। রোজ একটা প্রাণদণ্ডের তামাসা হয় না কেন? রোজ একটা করিয়া ক্রীতদাস পলাইয়া ধরা পড়ে না কেন?

(ওদিকে নগরকোটালী মন্ত্রী, আদালতী মন্ত্রী, পাঠশালা-মন্ত্রী, জল্পনাকল্পনা-মন্ত্রী প্রভৃতিরা একগাদা চানাচুর, ফুলুরি, পাঁঠার ঘুগনি, শরবত, চা-গরম ইত্যাদি সাবাড় করিয়াছে। ব্যাটারা দাম চাহিতেই আরক্ষীদল আসিয়া তাহাদিগকে গুঁতা মারিতে মারিতে লইয়া গেল। মন্ত্রীদের রসবোধ দেখিয়া রাজা ভারি খুশি।)

রাজকবি হুনডুরাস (মন্ত্রীদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া)

কেঁদে কেঁদে একদল পাঁঠা আর গাধা
ব্রহ্মারে কহিল ডাকি "হে ঠাকুরদাদা!

মাঠে মাঠে বহুদিন খাইয়াছি ঘাস,
গদিতে বসিতে বড় হইয়াছে আশ।"
"তথাস্তু" বলিল ব্রহ্মা, "কিন্তু ওরে বাছা,
লাঙুল লুকাতে পিছে দিতে হবে কাছা।"
তারপর বুঝ সাধু যে জান সন্ধান।
কবি হনডুরাস্ ভনে, শুনে পুণ্যবান।

(একটি খাঁচার নেপথ্যে গুরু গুরু ঘণ্টাধ্বনি। কয়েকজন আরক্ষী মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র ময়দান মধ্যে আনিয়া অ্যান্ড্রোক্লিস্‌কে দাঁড় করাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। খাঁচার দরজা বন্ধ হইয়া গেল। চারদিকের গ্যালারি হাততালিতে মুখরিত হইল।)

ঘোষক— এই সম্মুধরা পলাতক ক্রীতদাস;
সম্মুধরা সিংহ খাবে এরি হাড়মাস।
বিষম ক্ষুধার্ত সিংহ, কর যায় আশা
অতিশয় আকর্ষক হইবে তামাসা।
পলাতক হয়েছিল এই বেইমান!
এবারে সিংহের মুখে হারাইবে প্রাণ।

কবি হনডুরাস— একবার প্রাণ যদি যায় রে
তবে নাকি ফিরে পাওয়া দায় রে
কেন এ বিধান হায় হায় রে?
হনডুরাস্ কাঁদে আর গায় রে।

(রাজার নির্দেশ-ইশারায় খাঁচা খুলিয়া সগর্জন সিংহ বাহির হইয়া অ্যান্ড্রোক্লিসের সম্মুখে আসিয়াই স্তম্ভিত।)

সিংহ— এ কি হেরি, হে ভাগ্য-বিধাতা!
সম্মুখে বিরাজে মোর কণ্টক-হইতে-পরিত্রাতা।
এ নহে চোখের ভুল,
সেই নাক, সেই ভুরু, তরঙ্গিত চুল,
সেই উচ্চ ভাল, বড়ো কান, বড়ো মাথা।
হে বিধাতা!

হুবহু যে সেই মুখ,
সেই দীর্ঘ, সুগঠিত দেহ, উচ্চ বুক,

সেই সরু গোঁফ সদ্য-ওঠা
সেই পুরু ঠোঁট আর বাহু মোটা মোটা।
সেই যে গায়ের গন্ধ পাই
এ যে সে-ই, এ যে সে-ই ইহাতে সন্দেহ কিছু নাই।
অনাহারে যদি মারা যাই
যাব,
তথাপি জীবনদাতা এ মোর বন্ধুরে নাহি খাব।

(সিংহ মাটিতে লুটাইয়া অ্যান্‌ড্রোক্লিস্‌কে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া লেজ নাড়িতে লাগিল। অ্যান্‌ড্রোক্লিস্ প্রথমে হক্‌চকাইয়া গেল, পরে হঠাৎ তাহার খেয়াল হইল।)

অ্যান্‌ড্রোক্লিস—চিনেছি এবার। তোর পা থেকেই কাঁটা খুলেছিনু বনে,
সেই উপকার রেখেছিস তুই মনে।
আমারে না খেয়ে ছেড়ে দিবি তুই, কি লাভ আমার তাতে ?
তোর চেয়ে বেশি হিংস্র যাহারা, পড়িব তাদের হাতে।
পায়ে ধরি তোর, ওরে মোর ভাই, খেয়ে ফেল্ মোরে গিলে,
মানুষের হাতে ছাড়িস নে মোরে, মারিবে যে তিলে তিলে।

(সিংহ ক্ষুধার তাড়নায় দাঁড়াইয়া উঠিল, কিন্তু বিবেকের প্রেরণায় অ্যান্‌ড্রোকে খাইতে পারিল না। চারিদিকের গ্যালারিতে তাহার লোভনীয় ভক্ষ্য জীব দেখিয়া তাহার রসনা লালায়িত হইতে লাগিল।)

সিংহ (ঘুরিয়া ঘুরিয়া গান)
ম্যায় ভুখা হুঁ, মেহেরবান্, মুঝে খিলা দো।
ইত্‌না আদ্‌মী হ্যায় ইহাঁ, মুঝে দো-চার মিলা দো।
মেরে বুকমে এক লম্বী শ্বাস উঠ্‌তা হ্যায়,
মেরে ধমনীমে লাল খুন টগ্‌বগ্ কর্‌কে ফুট্‌তে হ্যায়,
ম্যায় পিয়াসী হুঁ, মুঝে বিস্-পচাস্ আদ্‌মিকো খুন পিলা দো।

(সিংহ কিছুতেই অ্যান্‌ড্রোক্লিস্‌কে খাইবে না দেখিয়া চারিদিকের গ্যালারির দর্শকগণ ভয়ঙ্কর চটিয়া উঠিয়া পাইকারী গোলমাল শুরু করিল। গোলমালের কিছু কিছু অংশ যথাসাধ্য উদ্ধৃত করিয়া নীচে দেওয়া হইল।)

গোলমাল—লাইনে দাঁড়িয়ে চড়া দাম দিয়ে কিনেছি প্রবেশপত্র
নয়া সিংহের নর-ভক্ষণ দেখিব বলিয়া অত্র,

এখন দেখছি আসল তামাসা ফাঁকি হয়ে গেল ভাই রে!
হুঙ্কার-রবে দাবি তোলে সবে "মূল্য ফেরত চাই রে!"

* * *

সামনে মানুষ পেয়ে ঘাড় ভেঙে খায় না,
এ কেমন সিংহ রে? কিছু বোঝা যায় না।
বোষ্টুমি, দুষ্টুমি, আফিং, না, চণ্ডু?
অথবা কি ভয় খেয়ে ঘুরে গেছে মুণ্ডু?
তামাসা বেবাক মাটি। হয়ে গেছি খাপ্পা।
পয়সা ফেরত চাই, চলবে না ধাপ্পা।

* * *

হয় পুরো তামাসা দেখাও রে!
না হয় ফেরত পুরো পয়সাটা দাও দাও দাও রে!
শাক-খেকো সিংহটা দেখিয়ে কি ফাঁকি দিতে চাও রে?
কচি খোকা নই মোরা, বোঝো না কি তাও রে?
বাওয়া কি এতই সোজা ধাপ্পার নাও রে?
পয়সা ফেরত দাও, দাও দাও দাও দাও, দাও রে!

(বহু প্রবেশপত্র বিক্রয় হইয়াছে, কিছু সাদা দামে, অধিকাংশ কালো-বাজারী দামে। এই লাভের কারবারে রাজার মন্ত্রীদের একটা মোটা অংশ রহিয়াছে। প্রবেশপত্রের মূল্য ফেরতের দাবি জোরালো হইয়া উঠিলে বিপদের কথা। অতএব মন্ত্রীমণ্ডলে ঝটিতি পরামর্শ হইয়া গেল। মন্ত্রী-প্রধান রাজার দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন। ইতিমধ্যে......)

রাজ-পুরোহিত (রাজাকে)—মনুষ্য পাইয়া সিংহ না করে ভক্ষণ
মহারাজ, এ যে অতি বড় দুর্লক্ষণ।
বক্ষ মোর কম্পমান লক্ষ কোটি ডরে
না জানি কি অমঙ্গল হবে রাজ্য 'পরে।
বুঝিতে পেরেছি আমি মুদিয়া নয়ন,
করিতে হইবে এক শান্তি-স্বস্ত্যয়ন।

সমবেত হল্লা—সইব না সইব না, এই ফাঁকি সইব না সইব না।
পয়সা ফেরত চাই, তা না হ'লে ছেড়ে কথা কইব না॥
ভালো যদি চাও রে,
পয়সা ফেরত দাও, দাও দাও দাও দাও, দাও রে!

(মন্ত্রী-প্রধান রাজার কানে কানে যেন কি বলিল। সঙ্গে সঙ্গে রাজা অ্যান্‌ড্রোক্লিস্‌-প্রভু বার্‌বারাসকে দ্রুত ডাকাইয়া আনিলেন।)

রাজা— বার্‌বারাস, এ কেমন খাপছাড়া ক্রীতদাস তব?
সিংহ নাহি খায় তারে, এ কি হে ব্যাপার অভিনব?
কি রহস্য এর? কহ আমার সম্মুখে,
তা না হ'লে তোমারেই দেব সিংহ-মুখে।

বার্‌বারাস—মহারাজ, সত্য কহি, নাহি জানি রহস্য ইহার।
অ্যান্‌ড্রোরে আনান হেথা, নিজেই সে করুক প্রচার—
সিংহ কেন নাহি খায় তারে।
মিথ্যা প্রশ্ন করি', প্রভু, কি হবে আমারে?

(মই নামাইয়া দিয়া তাহার সাহায্যে অ্যান্‌ড্রোক্লিসকে তুলিয়া আনা হইল। অ্যান্‌ড্রোক্লিস্‌ সিংহের কাছে যত কাঁপে নাই, এখানে আসিয়া ততোধিক কাঁপিতে লাগিল।)

বার্‌বারাস—অ্যান্‌ড্রোক্লিস্‌, বল্‌ বাছা, সিংহ তোরে কেন নাহি খায়,
তা না হ'লে আমি নিরুপায়।
শূল-বিদ্ধ হবি তুই, আমি যাব সিংহ-মুখে হায়!

অ্যান্‌ড্রোক্লিস— পরান যদি যাবেই যাবে, শুনুন কহি তবে
স্বপ্নে আমি দেখেছিলাম—মনে নেই তো কবে
বিরাট পুরুষ এসে আমায় বললে কানে কানে
"পঁচিশ বছর তোর জীবনে যেদিন পূর্ণ হবে
সেদিন থেকে বিষযুবা তুই হবি সর্বনেশে,
সে দেশ যাবে ছারেখারে তুই রবি যে দেশে।
বাঘে সিংহে খাবে নাকো; স্যাখেও যদি চেটে,
সঙ্গে সঙ্গে অক্কা পাবে পাক্কা দু মিনিটে।
যে কেউ তোকে ছোঁবে বা তোর গায়ের বাতাস খাবে,
হোক সে বড়, হোক সে ছোট, অক্কা সে-ই পাবে।
কিম্বা যদি কোনো দেশে পড়িস রে তুই মারা,
সে দেশ জুড়ে নামবে মড়ক, নেই কোনো তার চারা।"
আমার তরে এই দেশেতে হয় বা পাছে হানি,
পালাতে তাই চেয়েছিলাম, এই তো আমি জানি।

হায় রে কপাল, হাত পা বেঁধে আনলে আমায় ধ'রে—
সর্বনেশে পঁচিশ বছর পুরল আজি ভোরে।

রাজ-পুরোহিত—মহারাজ, এর স্বপ্ন আগাগোড়া খাঁটি
তাই না খাইল সিংহ, না মারিল চাঁটি।
সত্য কথা কহিয়াছে, করে নাই ভাণ,
সিংহেরি ব্যাভার হতে হয়েছে প্রমাণ।
বিষযুবা অ্যান্‌ড্রোক্লিস্ অতি সর্বনেশে,
রক্ষা নাই অ্যান্‌ড্রো যদি থাকে এই দেশে।
দেশ ছাড়ি' এ মুহূর্তে করুক গমন,
তারপর করা যাবে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন।

রাজা— তথাস্তু। যুবক, তুই এই পথে চ'লে যা বাহিরে
চ'লে যা এ দেশ হতে যেথা খুশি, সম্মুখে চাহি রে!
ভুলেও কখনো যেন এই দেশে আসিস নে ওরে!
ফের যদি দেখি কভু শূলে দেব বসাইয়া তোরে।

(অ্যান্‌ড্রোক্লিস্ প্রদর্শিত পথে প্রস্থান করিল। গ্যালারিতে আবার প্রবেশপত্রের মূল্য ফেরত দিবার জন্য সমবেত দাবি শোনা গেল। মন্ত্রীপ্রধান রাজার কানে আবার যেন কি কহিলেন। রাজা বারবারাসকে কি যেন কহিলেন। বারবারাস তাঁহার ক্রীতদাস এন্‌কোরাসকে ডাকাইয়া রাজার চরণে সঁপিয়া দিলেন। রাজার আদেশ ঘোষক কর্তৃক ঘোষিত হইল।)

ঘোষক—(প্রথমে শিঙা ফুঁকিয়া সকলের দৃষ্টি ও শ্রবণ আকর্ষণ করিয়া)
তামাসা-আমোদীগণ শুন দিয়া মন।
দেখিবে তামাসা হেন না যায় বর্ণন।
অ্যান্‌ড্রোক্লিস্-বদনে কিঞ্চিৎ ক্ষত ছিল,
খুঁতখুঁতে সিংহ তাই তারে না খাইল।
তাই তার পরিবর্তে অক্ষত বদনে
যাবে দাস এন্‌কোরাস্ সিংহের সদনে।
তাহারে খাইবে সিংহ খণ্ড খণ্ড করি,
তামাসা হইবে পূরা, দেখ ধৈর্য ধরি।

(চতুর্দিকে উল্লাসধ্বনি। এন্‌কোরাস্‌কে ঠেলিয়া নীচে সিংহের মুখে ফেলিয়া দেওয়া হইল। এন্‌কোরাস্ সিংহের পায়ের কাঁটা তুলিয়া দেয়

নাই, সিংহও বিষম ক্ষুধার্ত !!!! সেইক্ষণে মুক্তদাস অ্যানড্রোক্লিস্ মুক্তপথে মুক্তকণ্ঠে মুক্তস্বরে গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে—বহু পিছনে গ্যালারি হইতে উচ্চ হর্ষধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে, বোধ করি সিংহের এনকোরাস্-ভক্ষণ পালাটা বেশ জমিয়াছে।)

অ্যানড্রোক্লিসের গান—চ'লে যাই, যাই চ'লে যাই, যাই রে!

কোমরে মোর নাই রে দড়ি,
হাতে পায়ে নাই রে শিকল নাই রে!
(আমি) রাখব মনে সারা জীবন ভ'রে
মানুষের হাত থেকে তুই বাঁচিয়ে দিলি মোরে,
ওরে আমার মানুষ-খেকো ভাই রে!
(আমি) আর যাব না বনে রে ভাই,
ভয় ঢুকেছে বুকে।
(সেথায়) কে জানে কোন্ সিংহ আছে,
পড়ব কি তার মুখে?
(যদি) কাঁটা ফুটে না থাকে তার পায়,
তার কাছে যে প্রাণ বাঁচানো হবে বিষম দায় রে
হবে বিষম দায়!
তাই চলেছি চরণ ফেলে বন-পথের বাইরে।
চ'লে যাই, যাই চ'লে যাই, যাই রে!
প্রিয়া মোর হয়তো জানে, হয়তো জানে না,
তারি মুখ ভাবতে মানা মন যে মানে না!
যত দিই মনকে ফাঁকি
পথ যে অনেক বাকি,
(তবু) অনেকেরই অল্প ভেবে চলার তরী বাই রে!
চ'লে যাই, যাই চ'লে যাই, যাই রে!

(গাহিতে গাহিতে অ্যানড্রোক্লিস্ সুদূর পথের বাঁকে মিলাইয়া গেল। তাহার পর কি হইল ভগবান জানেন।)

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

হ্যামলেট, ডেনমার্কের কুমার

২য় দৃশ্য। রাজপ্রাসাদদুর্গের সভাগৃহ

[রাজা, রাণী, হ্যামলেট, পলোনিয়স, লেয়ার্টিস, ভল্‌টিম্যাণ্ড, কর্নিলিয়স
লর্ডগণ ও অনুচরগণের প্রবেশ]

রাজা। পূজনীয় অগ্রজের তিরোধান-স্মৃতি
চিত্তমাঝে আজিও নবীন ; সে শোকের
গুরুভারে নিপীড়িত হৃদয় মোদের,
প্রজাবৃন্দ মুহ্যমান তাঁহার বিয়োগে,
তথাপি, অন্তরের সে বেদনা রুধিয়াছি মোরা
জ্ঞানগর্ভ যুক্তি দিয়ে, দেশের দশের আর
নিজের কল্যাণে। সেই কল্যাণেরই লাগি
যুধ্যমান এ রাজ্যের যিনি পাটরাণী,
ভূতপূর্ব ভ্রাতৃজায়া মোর,
পত্নীরূপে বরিয়াছি তাঁরে
আনন্দে বিষাদ ঢালি'
এক চক্ষে আশা জ্বালি অশ্রু অন্য চোখে,
শোকের মাঝারে হর্ষ,
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বুকে পরিণয়োৎসব,
সুখ দুঃখ সমভাবে করিয়াছি তুল।
এ ব্যাপারে পাইয়াছি,—
ভবদীয় সকলের সুচিন্তিত স্বাধীন সম্মতি।
ধন্যবাদ জানাই সবারে।
উপস্থিত সংবাদ যা বলি ;—
সবাই আছেন জ্ঞাত, তরুণ ফর্টিন্‌ব্রাস
বার বার চাহিছে ফিরিয়া পিতার রাজ্যের অংশ,
যে অংশ করিলা জয় নরোয়ের রণে
বীরশ্রেষ্ঠ অগ্রজ আমার।
হয়তো সে ভাবিয়াছে, রাজার মৃত্যুতে
শক্তিহীন বিশৃঙ্খল হয়েছে ডেনমার্ক,

এ সুযোগে স্বপ্ন তার হইবে সফল।
সে কথা থাকুক।
মোদের কর্তব্য আর সভাব বিচার্য যাহা
কহি সেই কথা।
জরাজীর্ণ শয্যাশায়ী নরোযের রাজা,
ভ্রাতুষ্পুত্র ফর্টিন্‌ব্রাস যা কিছু করিছে
সে সবের পান না সংবাদ।
এই পত্র লিখিলাম তাঁরে, লিখিলাম,—
ফর্টিন্‌ব্রাসে করিতে সংযত,
সে যেন আবদ্ধ রাখে নিজ রাজ্যমাঝে
সৈন্যসংগ্রহাদি যত প্রচেষ্টা তাহার।
কর্নিলাস্, ভল্‌টিম্যাণ্ড, তোমরা দুজনে যাবে
এই পত্র ল'য়ে, সসম্মানে দিবে ইহা
বৃদ্ধরাজকরে। পত্রে যাহা আছে
তার বহির্ভূত কোন আলোচনা যেন
করিয়ো না রাজার সহিত। এস তবে,
ত্বরান্বিত হয়ে তব কর্তব্য সাধিলে
লভিবে মোদের প্রীতি।

কর্নিলিয়স, ভল্‌টিম্যাণ্ড। কর্তব্য সাধিতে মোরা রব অবহিত।

রাজা। সে বিষয়ে নিঃসংশয় মোরা।
বিদায়-মুহূর্তে লহ অন্তরের শুভেচ্ছা মোদের।

[ভল্‌টিম্যাণ্ড ও কর্নিলিয়সের প্রস্থান]

এবার লেয়ার্টিস, কি সংবাদ তব?
বলেছিলে কোন এক প্রার্থনার কথা,
কি প্রার্থনা লেয়ার্টিস? যুক্তিযুক্ত হ'লে
যা চাহিবে অপূর্ণ রবে না।
শ্রুতমাত্র মিলিবে না সম্মতি মোদের
এমন প্রার্থনা তব কি হইতে পারে?

যে রক্তসম্পর্ক আছে মস্তিষ্কের সাথে হৃদয়ের,
অথবা মুখের সাথে হাতের যে বাধ্যবাধকতা,
ডেনমার্কের রাজা আর তোমার পিতায়—
তা হতে ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ এখন।
কি চাহ লেয়ার্টিস ?

লেয়ার্টিস। প্রবলপ্রতাপ প্রভু মোর,
ফ্রান্সে ফিরে যেতে সম্মতি ও অনুমতি মাগি।
সেথা হতে এসেছিনু সানন্দে স্বেচ্ছায়
ভবদীয় অভিষেকোৎসবে।
সে কর্তব্য হইয়াছে শেষ,
সসংকোচে করি নিবেদন,—
মনপ্রাণ চাহিছে আবার সেই ফ্রান্সে ফিরে যেতে,
যদি পাই সদয় সম্মতি।

রাজা। সম্মতি কি পেয়েছ পিতার ?
পলোনিয়সেরই মুখে শুনি।

পলো। মহারাজ, ইচ্ছা মোর ছিল না প্রথমে।
অনিচ্ছুক সেই চিত্ত হতে
ক্লান্তিকর নিবেদন নির্বন্ধসহাযে
ছিনায়ে সে নিল যবে সম্মতি আমার,
বাধ্য হয়ে আবেদন করিনু মঞ্জুর।
আপনার কাছে মোর এই নিবেদন—
যেতে দিন তারে।

রাজা। লেয়ার্টিস, কখন করিবে যাত্রা তুমি কর স্থির।
যতদিন ইচ্ছা রহ সেথা; সেই দিনগুলি
যাপন করিও সদা স্বাধীন স্বপথে।
এইবার বৎস হ্যামলেট, আত্মীয় ও পুত্র মোর,—

হ্যাম। (স্বগত) সম্পর্ক নিকট খুবই, মনে বহু দূর।

রাজা। এখনও তোমারে কেন মেঘাচ্ছন্ন হেরি ?

হাম।	কে বলিল তাত ? রয়েছি তো খর রবিকরে।

রাণী।	বৎস হ্যামলেট,
মুছে ফেল অন্তরের বিষাদ-কালিমা,
প্রসন্ন নয়নে চাহ বন্ধুর মতন
বর্তমান নৃপতির পানে।
নতনেত্রে ধূলিমাঝে খুঁজিও না আর
গতপ্রাণ মহান জনকে।
জান তো এ সকলেরই হয়,
জীবমাত্র মৃত্যুর অধীন,
অনিত্য জীবন অন্তে অনন্তে মিলায়।

হাম।	তাই বটে দেবি, এ তো সকলেরই হয়।

রাণী।	তাই যদি,
তবে তা তোমার কাছে
অসামান্য কেন মনে হয় ?

হাম।	মনে হয় !
মনে হওয়া নয় দেবী অতি সত্য ইহা।
মা গো !   খুঁজিও না মসীবর্ণ এই পরিচ্ছদে,
কৃষ্ণবাসপরিহিত বিষাদগম্ভীর
যথাবিধি শোভাযাত্রা শোকযাত্রীদলে,
বায়ুগর্ভ চেষ্টাকৃত দীর্ঘশ্বাস মাঝে,
খুঁজিও না, খুঁজিও না নয়নের অশ্রুনদীধারে,
মুখের বিষণ্ণ ভঙ্গিমায়,
অথবা যা কিছু আছে শোকপ্রকাশের
আকার প্রকার ভঙ্গী বিধি ও লক্ষণ,
খুঁজিও না সে সবের মাঝে
আমার এ অন্তর-বেদনা।
এ সকলই 'মনে হয়' হতে পারে বটে,
মানুষ তো অভিনয়ও করে।   কিন্তু,

আমার অন্তর সে যে দেখাবার নয় ;
এ দুঃখের সাজসজ্জা অলঙ্কার নাই ।

রাজা । হ্যামলেট, আপন পিতার প্রতি
এইভাবে শোক নিবেদন
একান্ত প্রশংসনীয় সুমধুর স্বভাবে তোমার ।
কিন্তু জেনো, তোমার পিতাও একদিন
হারাইল আপন পিতায়,
তিনিও তো হারালেন তাঁহার পিতারে ।
সবাই পালিয়া গেল কিছুদিন ধরি
শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী
পুত্রের কর্তব্য তার জনকের প্রতি ।
কিন্তু এমন একান্ত করি
পিতৃশোক আঁকড়িয়া থাকা,
এ যে বৎস অবাধ্যতা বিধি-বিধানের ।
এ শোক—হৃদয়দুর্বলতা ;
যে প্রাণ ঈশ্বরমুখী নহে,
যে অন্তর স্বভাবদুর্বল,
যে চিত্ত সতত স্থৈর্যহারা,
যে বুদ্ধি স্থির ও অমার্জিত,
তারই পরিচয় এ যে করিছে বহন ।
ভেবে দেখ, যে ঘটনা ঘটিবেই,
জগতে যা নিয়ত ঘটিছে,
তা নিয়ে বিরক্তচিত্তে দুশ্চিন্তা পোষণ,
এ কেমন কথা ? ছিঃ, এতে অপরাধ ঘটে
ভগবৎপদে, স্বর্গত আত্মার প্রতি,
বিশ্বসংসারের কাছে ;
এ যে পূর্ণ বধিরতা বিবেক-বাণীতে ;
চিরদিন কী কথা সে কহে ? কহে না কি

অমর নহেক কোন পিতা ?
জগতের আদি যবে হতে
এখনই যে হারাইল প্রাণ
সমকণ্ঠে কহিছে সবাই—'এই হবে এই হবে'।
আমাদের অনুরোধ—বৃথা দুঃখ কর পরিহার,
পিতা বলি গণ্য কর মোরে।
জানাই সকল বিশ্বজনে,—
তুমিই এ সিংহাসনে একমাত্র ভাবী অধিকারী ;
যে পূত বাৎসল্যরসে পূর্ণ পিতৃহৃদি
সে বাৎসল্য দিতেছি তোমায়।
তুমি যে করেছ ইচ্ছা
ফিরে যাবে য়ুটেনবার্গ বিদ্যানিকেতনে
মোরা তার একান্ত বিরোধী।
করি অনুনয়, রহ তুমি এই স্থানে,
লভ নিত্য আনন্দ সান্ত্বনা
আমাদের স্নেহ-দৃষ্টি হতে ;
শ্রেষ্ঠ সভাসদ তুমি পুত্র আমাদের।

রাণী। ঠেলিও না হ্যামলেট মায়ের প্রার্থনা ;
করি অনুনয়, রহ আমাদের পাশে,
বিদ্যানিকেতনে আর যেয়ো নাকো ফিরে।

হ্যাম। দেবি, যথাশক্তি রাখিব তোমার কথা।

রাজা। প্রীতিপূর্ণ সুন্দর উত্তর পেলাম তোমার মুখে।
রহ হেথা আমাদেরই মত। এস দেবি,
হ্যামলেটের আন্তরিক প্রসন্ন সম্মতি
এ অন্তরে জাগায় প্রসাদ।
রক্ষিতে সম্মান তার
রাজকীয় পানমহোৎসবে
অভ্রভেদী গর্জিবে কামান আজি,

সে শব্দে মুখর হয়ে দিক্-দিগন্তর
ধরণীর বজ্রনাদ ধ্বনিবে আকাশে।
চ'লে এস।

[হ্যামলেট ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

হ্যাম। কঠিন এ মাংসপিণ্ড, একান্ত কঠিন.
কবে হায় গ'লে গিয়ে হয়ে দ্রবীভূত
পরিণত হবে কোন শিশিরকণায়!
শাস্ত্রে যদি আত্মঘাত নিষিদ্ধ না হ'ত!
ভগবান! ভগবান! কী নীরস, কী বিস্বাদ,
কী যে ক্লান্তিকর, আর কত মূল্যহীন
সংসারের সব কিছু লাগিতেছে মোর।
ধিক্! শতধিক এরে!
এ এক অযত্নে গড়া জঙ্গুলে বাগান
গাছেরা যথেচ্ছ ফল চলে ফলাইয়া।
যা কিছু ইতর স্থূল প্রকৃতির মাঝে
এখানে তাদেরই অধিকার।
এই হ'ল শেষে! মৃত্যু হ'ল মাত্র দুটি মাস।
না, তাও নয়, দু মাসও হয় নি।
অমন মহান রাজা;
শিবের আসনে যেন বসেছে বানর।
আমার মায়ের প্রতি কী স্নেহই ছিল;
বাতাসের রুক্ষস্পর্শে পাছে ম্লান হয়
জননীর মুখখানি, পিতা মোর হতেন আকুল।
হে আকাশ! হে ধরণী!—
ভুলিবার কোন পথ নাই? কি বলিব?
বক্ষলগ্ন হয়ে মাতা রহিত পিতার,
মনে হ'ত পানে যেন বাড়িছে পিপাসা।
বুত হায়, এক মাসও না হইতে গত,—

আর ভাবিব না,—
দুর্বলতা, তুই রে নারীরই নামান্তর !—
সামান্য একটি মাস না হইতে গত,
যে বসনে অঙ্গ ঢাকি জননী আমার
কাঁদিতে কাঁদিতে গেল শবের পশ্চাতে
রুদ্যমান নির্ঝর সমান,
সে বসন মলিন না হতে,—
সে জননী, সেই মাতা মোর ;—হা ঈশ্বর !
বিবেকবর্জিত পশুতেও
শোক করে আরও কিছুদিন,—
বিবাহ করিল কেনা পি[illegible] আমার,
পিতার ভ্রাতারে মো[illegible]
যে ভ্রাতার সহ সেই পিত[illegible] প্রভেদ
মোর সহ ভার্গবের পার্থক্য যেমন !
মাত্র মাসেকের মাঝে।
অপবিত্র সে অশ্রুর ক্ষারজলধারে
অনাময় না হতে নয়ন বিবাহ করিল মাতা।
নিষিদ্ধ শয়নে শুতে
কি নিপুণ ত্বরান্বিত দুর্নীতির গতি !
এ তো শুভ নয়,
ফলিবে না, ফলিতে পারে না কোন শুভ ইহা হতে।
তবু হায়,
বুক ফেটে যাবে, মোর মুখ ফুটিবে না।

[হোরেসিয়ো, মার্সেলস ও বার্নার্ডোর প্রবেশ]

হোরে। শুভ হোক কুমারের।

হ্যাম। ভাল আছ দেখে খুশি হনু।
হোরেসিয়ো তুমি ? ভুল তো করি নি কিছু ?

হোরে। কুমার, আমিই সেই অনুগত চিরভৃত্য তব।

হ্যাম । তুমি বন্ধু মোর ;
সেই নামে অভিহিত করিনু তোমায়।
বিদ্যানিকেতন ছেড়ে কেন হেথা এলে হোরেসিয়ো ?
মার্সেলস ?

মার্সে । কুমার !—

হ্যাম । খুশি হনু তোমাদের দেখে। নমস্কার।
কিন্তু বল, য়ুটেনবার্গ ছাড়ার কারণ।

হোরে। পলায়নী বুদ্ধি, আর কিছু নয়।

হ্যাম । তোমার শত্রুও যদি কহিত এ কথা
জানাতাম আপত্তি আমার।
এ কথা শোনাও দোষ,
নিজ মুখে করিতেছ নিন্দা আপনার,
তবুও তা করি না বিশ্বাস।
বেশ জানি, পলায়নী বুদ্ধি তব নাই।
তবে, এলসিনোরে কেন আগমন ?
ফিরিবার পূর্বে তোমা
দীক্ষিত করিয়া দিব
প্রচুর গভীর সুধাপানে।

হোরে। কুমার, আপনার পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হ'ল,
আসিবার উপলক্ষ্য তাই।

হ্যাম । তুমি বন্ধু, সতীর্থ আমার ;
ব্যঙ্গ করিয়ো না মোরে।
মনে হয় উপলক্ষ্য আমার মাতার পরিণয়।

হোরে। সত্যই কুমার,
উৎসবটি হ'ল খুবই অল্প ব্যবধানে।

হ্যাম । মিতব্যয়, হোরেসিয়ো, শুধু মিতব্যয় !
শ্রাদ্ধীয় পায়স পিঠা কিছু ঠাণ্ডা ক'রে
পাতে পাতে দিয়ে যাওয়া পাকস্পর্শ-দিনে।

পরম শত্রুরে যদি দেখিবারে পাই
স্বর্গসুখ করিছে সে ভোগ, তা হ'তেও
বেশি দুঃখ সেদিন পেয়েছি হোরেসিয়ো!
পিতা মোর! মনে হয় দেখি আসি তাঁরে।

হোরে। কোথায় কুমার?

হ্যাম। মনশ্চক্ষে, হোরেসিয়ো!

হোরে। একবার দেখেছিনু তাঁরে;
রাজা বটে কি রূপে কি গুণে।

হ্যাম। যে ভাবে দেখ না তাঁরে, মানুষ ছিলেন একজনা।
তুল্য তাঁর আর দেখিব না।

হোরে। কুমার, মনে হয় কাল রাত্রে দেখিয়াছি তাঁরে।

হ্যাম। দেখিয়াছ! কাকে?

হোরে। আপনার পিতাকে, রাজারে।

হ্যাম। আমার পিতাকে? রাজারে?

হোরে। বিস্মিত হবারই কথা বটে; তবু যদি
কিছুক্ষণ দেন মনোযোগ,
অলৌকিক সে ব্যাপার পারি শুনাইতে।
এই দুটি ভদ্রলোকও সাক্ষী আছে তার।

হ্যাম। বল, বল, নিশ্চয় শুনিব।

হোরে। মার্সেলস, বার্নার্ডো, এই দুইজন
পর পর দুই রাত্রি
একত্রে প্রহরারত ছিলেন যখন,
রজনীর মধ্যযামে নিস্তব্ধ নিঃসীমে
দেখিলেন সেই মূর্তি।
মূর্তি ঠিক আপনার পিতার মতন,
যোদ্ধবেশ, বর্মাবৃত আপাদমস্তক,
মন্থর গম্ভীর পদে আবির্ভূত হইল সম্মুখে।
দণ্ডপরিমিত দূরে,

বিস্ময়বিমূঢ় ত্রস্ত ইঁহাদের চোখের উপর
তিন বার করে যাতায়াত।
এরা তো আতঙ্কভবে ঘর্মাক্ত বিহ্বল,
মূকমুখে বাক্য নাহি সরে।
সেই বার্তা ভয়ে ভয়ে আমায় জানল সংগোপনে।
পর-রজনীতে আমিও গেলাম প্রহরায়।
সেখানে, এদের কথা বর্ণে বর্ণে করি সপ্রমাণ,
সেইভাবে, সেইক্ষণে, সেই মূর্তি হ'ল আবির্ভূত।
আপনার পিতারে তো দেখেছিনু আমি,
আমার উভয় করে যেটুকু প্রভেদ
সেটুকু প্রভেদও নাই সে দুইয়ের মাঝে।

হ্যাম। কোন্‌খানে হ'ল এ ঘটনা?

মার্সে। যে মঞ্চে প্রহরা দিই মোরা।

হ্যাম। তুমি কি কহ নি কথা?

হোরে। কয়েছিনু দেব, কিন্তু, উত্তর এল না কিছু।
তবু, একবার মনে হ'ল,
উত্থিত করিয়া শির, কাঁপাইয়া ওষ্ঠাধর,
কথা বলিবার যেন করিছে প্রয়াস।
তখনি উঠিল ডাকি প্রভাত-কুক্কুট,
সেই শব্দে ভীত ও চকিত
মুহূর্তে মিলায়ে গেল চোখের উপর।

হ্যাম। নিতান্ত অদ্ভুত।

হোরে। শ্রদ্ধেয় কুমার,
আমার অস্তিত্ব সম সত্য এ ঘটনা।
ভাবিলাম, এ কথা জানানো আপনারে
কর্তব্য মোদের।

হ্যাম। নিশ্চয়, নিশ্চয়, বন্ধু;
কিন্তু মোর বাড়িল যন্ত্রণা।
আজও রাত্রে যাবে পাহারায়?

মার্সে ও বার্না। যাব প্রভু।
হ্যাম। কি বলিলে! বর্মাবৃত?
মার্সে ও বার্না। বর্মাবৃত প্রভু।
হ্যাম। আপাদমস্তক?
মার্সে ও বার্না। আপাদমস্তক।
হ্যাম। তা হ'লে তো মুখ দেখ নাই?
হোরে। দেখেছি কুমার, মুখত্রাণ ছিল উন্মোচিত।
হ্যাম। মুখভাব ক্রুদ্ধ দেখিলে কি?
হোরে। ক্রুদ্ধ নয়, বরং একান্ত ক্ষুব্ধ মুখ।
হ্যাম। বিবর্ণ, না, রক্তবর্ণ?
হোরে। বিশেষ বিবর্ণ।
হ্যাম। দৃষ্টি তো নিবদ্ধ ছিল তোমাদেরি পানে?
হোরে। সর্বক্ষণ।
হ্যাম। আমি যদি থাকিতাম সেথা।
হোরে। আপনিও হইতেন বিস্ময়বিহ্বল।
হ্যাম। খুবই সম্ভব, খুবই সম্ভব। ছিল বহুক্ষণ?
হোরে। যেটুকু সময় লাগে কিছু দ্রুত এক শ' গনিতে।
মার্সে ও বার্না। তারও বেশি, তারও বেশি।
হোরে। না, যেদিন দেখেছি আমি সেদিন তো নয়।
হ্যাম। শ্মশ্রু কি পিঙ্গল ছিল? না?
হোরে। জীবিতে যেমন দেখেছিনু,—
কৃষ্ণবর্ণ, মাঝে মাঝে রজতের রেখা।
হ্যাম। আজ রাত্রে আমিও রহিব;
হয়তো সে আসিবে আবার।
হোরে। নিশ্চয় আসিবে।
হ্যাম। যদি সে গ্রহণ করে পূজনীয় পিতার মূরতি,
কহিব তাহার সাথে কথা;
প্রত্যক্ষ নরককুণ্ড ব্যাদিত বদনে

বাধা যদি দেয়, তথাপি কহিব কথা।
তোমাদের প্রতি অনুরোধ,—
যখন কাহারও কাছে কর নি প্রকাশ,
এ ঘটনা গোপন রাখিও।
আজ রাত্রে যাই না ঘটুক,
হৃদয়ে মুদ্রিত রেখো, দিও নাকো ভাষা।
তোমাদের এ প্রীতির দিব প্রতিদান।
এখন বিদায়। রাত বারোটার পূর্বে
দেখা হবে মোর সাথে সেই মঞ্চোপরে।

সকলে। মোদের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য লউন কুমার।

হ্যাম। আমার প্রীতির প্রতিদানে
মাগি আমি প্রীতি তোমাদের। বিদায় এখন।

[হ্যামলেট ভিন্ন সকলের প্রস্থান]

হ্যাম। অস্ত্রধারী প্রেতমূর্তি পিতার আমার!
শুভশংসী নহে। পাপহস্ত আছে মূলে।
কখন আসিবে রাত্রি?
রে হৃদয়, ততক্ষণ হ'য়ো না অধীর।
বিশ্বশুদ্ধ এক হয়ে যদি ঢেকে রাখে
পাপকর্ম প্রকাশ করিবে আপনাকে। [প্রস্থান]

অনুবাদ শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

সংবাদ-সাহিত্য

গত কার্তিক সংখ্যার "সংবাদ-সাহিত্যে" "নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন" সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য-পাঠে বন্ধুবর শ্রীমনোজ বসু একটা সাফাই "জবাব" দিয়াছেন, নীচে তাহা হুবহু মুদ্রিত করিলাম :—

"'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক শ্রীসজনীকান্ত দাসের সহিত আমার দুঃখ ও সুখের দিনের স্মৃতিজড়িত অতি-পুরাতন বন্ধুত্ব। কার্তিক সংখ্যার

'শনিবারের চিঠি'তে আমাকে লইয়া এই প্রথম তিনি কিছু লিখিলেন। গালিগালাজ হইলেও বন্ধুকৃত্যে উল্লাস বোধ করিতেছি।

"নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন সম্পর্কিত উক্তির জবাব সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে দিতে পারিবেন। আমি কর্তাদের কেহ নহি, সম্মেলনের সহিত এতাবৎ আমার কিছুমাত্র যোগাযোগ ছিল না, কখনও কোন অধিবেশনে যাই নাই। এবারে অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক শ্রীদিতীশকুমার দত্ত আমার উপর বিবিধ গুণাবলীর আরোপ করিয়া সাহিত্য-শাখার সভাপতি হইবার জন্য জয়পুর হইতে চিঠি দেন। গুণাবলী সম্পর্কে বিশ্বাস করি নাই, কিন্তু সম্পাদকের অনুরোধ মানিয়া লইলাম। এ বিষয়ে জোরালো নজীর আছে। গত বৎসর কটক সম্মেলনে "বনফুল" এবং তৎপূর্বে তারাশঙ্কর এই কর্ম করিয়া আসিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই সজনীকান্ত-সংকলিত সাহিত্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত। তাঁহারা 'মাথা মুড়াইয়াছেন'—সজনীকান্তের এরূপ ধারণা নহে। বরঞ্চ খবরের কাগজে বহুপ্রচারিত "বনফুলে"র অভিভাষণটি 'শনিবারের চিঠি'তে আগাগোড়া পুনর্মুদ্রিত করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। অধমের অভিভাষণের দোষগুণ সম্পর্কে সাহিত্যিক সজনীকান্ত একটি কথা উচ্চারণ করেন নাই; 'দিল্লীর অন্যতম 'অফিসিয়াল' আই-সি-এস শ্রীদেবেশ দাশ সদ্যপ্রকাশিত 'রাজোয়ারা' গ্রন্থের লেখক হিসাবে ও শ্রীমনোজ বসু উক্ত পুস্তকের প্রকাশক হিসাবে কেলেঙ্কারি করিয়া আসিলেন'—এইরূপে শ্রীদেবেশ দাশের সঙ্গে 'ব্রাকেটায়িত' করিয়া মনের ঝাল ঝাড়িয়াছেন। সজনীকান্তের মত আমরাও এক পাবলিশিং হাউস খুলিয়া তাঁহার প্রতিযোগী হইয়াছি, এবং 'রাজোয়ারা' (বাংলা) বইটার প্রকাশক আমরাই বটে! সজনীকান্তের মতে বইটা তৃতীয় শ্রেণীর হইলেও লেখাগুলা যখন 'দেশ' কাগজে বাহির হইতেছিল, তারাশঙ্কর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লেখককে প্রশংসা-বাণী পাঠান এবং প্রবোধকুমার সান্যাল দিল্লীতে লেখকের কাছে গিয়া স্বমুখে সম্বর্ধনা জানান। ইঁহারা উভয়েই সজনীকান্তের অনুমোদনপ্রাপ্ত সাহিত্যিক। সম্মেলনের ব্যাপারে যদি আমার কর্তৃত্ব থাকিত, তবে আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের রসগ্রাহী

সভাপতি মহাশয়ের ব্যূঢ়স্কন্ধে সাহিত্য-সম্মেলনেরও সভাপতিত্ব অর্পণের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করিতাম। তাহা হইলে কেলেঙ্কারির কোন কারণ ঘটিত না।

"হিন্দি 'রাজোয়ারা' (উহার প্রকাশক আমরা নহি) পড়িয়া মেবারের মহারাণা বঙ্কিম-রমেশচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে শ্রীদেবেশ দাশের নাম 'ব্রাকেটায়িত' করিয়া চিঠি দিয়াছিলেন সম্মেলনের অনেক পূর্বে। সেই চিঠি খবরের কাগজে বাহির হইয়াছিল। সজনীকান্ত প্রমুখ সাহিত্যিকবর্গ নিশ্চয় চোখে ঠুলি পরিয়া ছিলেন না। অতএব নিজেকে এবং আত্মজনদের বাঁচাইয়া একলা আমার উপর জহরব্রত করিয়া মরিবার বিধান কেন? জয়পুর যাওয়ার সময় আগ্রার পথে গিয়াছিলাম; দিল্লির পথে ফিরিয়াছি। বহুজনে এই পথ লইয়াছিলেন। 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে'র সম্পাদক শ্রীসুধাংশু-মোহন বসুর সহযাত্রী হইয়া দিল্লি যাই; শ্রীদেবেশ দাশ তখন উদয়পুরে ছিলেন। দিল্লিতে হিন্দুস্থান বিল্ডিং-এ সুধাংশুবাবুর অতিথি হইয়া দিন পাঁচেক ছিলাম। শ্রীদেবেশ দাশ দিল্লির কোথায় থাকেন জানি না, তাঁহার গৃহে বা কোনখানে তাঁহার নিকট হইতে এক পেয়ালা চা-গ্রহণেরও সুযোগ হয় নাই। পাঁচ দিনে আমাকে সাতটা সভায় যোগ দিতে হইয়াছিল; কয়েকটি আমার সম্বর্ধনার জন্য অনুষ্ঠিত হয়। ইহার মধ্যে মাত্র দুইটিতে (কালীবাড়ির বিজয়া-সম্মেলন এবং লোদি রোডের বেঙ্গলী ক্লাবের সভা) দেবেশ দাশ ছিলেন। ইহাতেই আমি দেবেশ দাশের ঢাল-তরোয়াল-বরদার! সজনীকান্ত তারাশঙ্কর-বনফুলের বইয়ের অন্যতম প্রকাশক, অধম তাঁহার পাবলিশিং হাউসের গ্রন্থলেখক হইবার সৌভাগ্য অর্জন করে নাই। ব্যবহার-বৈষম্য কি এই কারণে? 'পোড়াকপাল শ্রীমনোজ বসুর'—তাহাতে আর সন্দেহ কি?"

শ্রীদেবেশ দাশের সঙ্গে তাঁহার নাম "ব্রাকেটায়িত" করা হইয়াছে বলিয়াই শ্রীমনোজ বসুর আপত্তি। তিনি যে লজ্জা পাইয়াছেন—ইহা জানিয়াই আমরা সন্তুষ্ট; এবং সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকার করিতেছি তাঁহাকে শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল বিবেচনা করা আমাদের সমীচীন হয় নাই।

সাহিত্য-সম্মেলনের নামে কেলেঙ্কারি এবং বঙ্গ-সাহিত্য ও

সাহিত্যিকদের অপমান করা হইয়াছে—ইহাই আমাদের বক্তব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। দৈনিক সংবাদপত্র এবং দুই-একটি মাসিক পত্রে প্রত্যক্ষ-দর্শীরা যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা আমাদের বক্তব্যকেই সমর্থন করে। মনোজবাবু এই মুখ্য কথাটা সম্পূর্ণ এড়াইয়া গৌণ ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। ইহার জবাব দিতে হইলে বাংলা-সাহিত্যের গোড়ার কথা ধরিয়া আলোচনা করিতে হয়। মনোজ বসু কেন তারাশঙ্কর-বনফুল নন এবং দেবেশ দাশের প্রকাশক ও তারাশঙ্কর-বনফুলের প্রকাশকে কি পার্থক্য তাহা বলিয়া মনোজ বসুর আরও মনঃকষ্টের কারণ হইতে প্রস্তুত নই। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ অনুযায়ীই আমরা মনোজবাবুকে শ্রীদেবেশ দাশের ঢাল-তরোয়াল-বরদার বলিয়াছিলাম; সে বিবরণী যে ভুল, এইরূপ কোনও প্রতিবাদ-সংবাদ আমরা পরে প্রকাশিত হইতে দেখি নাই। মেবারের মহারাণার বঙ্কিম-রমেশচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-দেবেশ-প্রশস্তি সম্মেলনের সূচনাতেই প্রদত্ত হইয়াছিল, বহু পূর্বে নয়। চটপট-বহু-সংস্করণী মনোজ বসুর পুস্তক-প্রকাশে আগ্রহ ব্যবসায়-বুদ্ধি-সম্পন্ন প্রকাশকমাত্রেরই আছে; বলা বাহুল্য, আমাদেরও আছে।

—

আজ হইতে একত্রিশ বৎসর পূর্বে প্রখর যৌবনে বিজ্ঞানের উপাসনা করিতাম। ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে ফলিতবিজ্ঞান যে বিপুল পরিবর্তন ঘটাইতেছিল, তাহার সচিত্র বিবরণ পড়িয়া এবং ভ্রমণকারী দর্শকদের মুখে শুনিয়া ব্যাকুল আগ্রহে ভাবিতাম, আমাদের এই পোড়া দেশে বন্যা-অনাবৃষ্টি-মহামারী প্রভৃতি প্রকৃতির পরিহাসবিজল্পিত সর্বনাশা সম্ভাষণের কবে নিবৃত্তি হইবে, কবে আমরা কেশে ধরিয়া তাহার উচ্ছৃঙ্খলাতাকে বশে আনিতে পারিব! পিতৃমাতৃকুলের কল্যাণে বীরভূম-বর্ধমান-বাঁকুড়ার রুক্ষ কঙ্করকঠিন মরুপ্রকৃতির বিচিত্র রূপ দেখিয়া যখনই পুলক বোধ করিতাম, তখনই অন্নহীন মানুষের হাহাকার কানে আসিয়া নিরানন্দে মন ভরিয়া দিত। অজয়-দামোদর-দ্বারকেশ্বরের ভীষণদর্শন বন্যাস্ফীত মূর্তি পুরুষপরম্পরায় বর্ষে বর্ষে বর্ষায় বর্ষায় আমাদিগকে আশ্রয়-চ্যুত করিবার ভয় দেখাইত। কিছুকাল বিজ্ঞানের পাঠ লইয়া ভাবিতে

লাগিলাম, বিজ্ঞান একদা এই প্রস্তরকঠিন রুক্ষ প্রকৃতিকে সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা করিবে, বন্যার জলকে আয়ত্তে আনিয়া মানুষের প্রয়োজনে লাগাইবে। ভাবিতে লাগিলাম, জলকাদা-লাঞ্ছিত পল্লীপথগুলি সুগম হইবে, ঝিল্লিঝঙ্কারমুখরিত শ্বাপদগর্জনশিহরিত দস্যুতস্করসঙ্কুল পল্লীনিশীথিনীর অসহনীয় ভীতি একদিন বিদ্যুতের যাদুস্পর্শে দূর হইবে।

তারপর দীর্ঘকাল বীণাপাণি বাগ্দেবীর আহ্বানে সাড়া দিয়া আমরা যৌবনের সেই বিজ্ঞানঘটিত আশাকুহককল্পনা একেবারেই ত্যাগ করিয়াছিলাম। অন্নবস্ত্রআশ্রয়হীনতার নিদারুণ বাস্তব-লাঞ্ছনা আমাদিগকে বহু তত্ত্ব ও মতবাদের ঘূর্ণাবর্তে ফেলিয়া জীবনে একরূপ হতাশই করিয়া তুলিয়াছিল। আন্দোলন চলিতে লাগিল, পরের ঘরের যুদ্ধের প্রকোপে আমাদের ঘর ভাঙিল, মহামারী-মন্বন্তর দেখা দিল, আত্মকলহে রক্তারক্তি করিলাম, স্বাধীনতা পাইলাম। কিন্তু এ কি পরাধীন স্বাধীনতা! কি ভয়াবহ পরমুখাপেক্ষী জয়োল্লাস। কোথাও শান্তি নাই, স্বস্তি নাই, সর্বত্র অবসাদ, হাহাকার, অন্ধকার ভবিষ্যতের রুচিহীন দন্তবিকাশ!

মনের এই অবস্থায় আহ্বান আসিল, দামোদর-উপত্যকা-উন্নয়ন-সংঘের বিবিধ পরিকল্পনানুযায়ী প্রাগ্রসর কাজ দেখিতে যাইতে হইবে। সিঁদরির সার-কারখানা, চিত্তরঞ্জনের ইঞ্জিন-কারখানা এবং রূপনারায়ণপুরের টেলিফোন কেব্‌ল্‌-কারখানা পরিদর্শনও ভ্রমণসূচীর মধ্যে থাকিবে। উৎসাহহীন নিরাসক্তচিত্তে কিঞ্চিৎ কৌতূহলের সঞ্চার হইল। গেলাম। কোদারমা হইয়া তিলাইয়া জলাধার ও জলপ্রবাহ-সঞ্চালিত বিদ্যুৎ-কারখানা, কোনার জলাধার ও জলবিদ্যুৎ-কারখানা, বোকারো জলাধার ও কয়লাতাপ-পরিচালিত সুবিপুল বিদ্যুৎ-কারখানা। সিঁদরি-চিত্তরঞ্জন-রূপনারায়ণপুরের কারখানা, মাইথন-পাঁচেট জলাধার জলবিদ্যুৎ-কারখানার গোড়াপত্তন এবং দুর্গাপুরের পয়ঃনালীপথে কোনার-বোকারো বরাকর-দামোদর নদীর যাবতীয় সঞ্চিত ও প্রবাহিত জলধারা উষর ক্ষেত্রের উপর দিয়া নিষ্কাশনের আয়োজন দেখিয়া যখন ঘরে ফিরিলাম, তখন যৌবনের সেই বিজ্ঞানস্বপ্নও সঙ্গে লইয়া ফিরিলাম। আজ আর ঠিক স্বপ্ন নয়। স্বপ্ন বাস্তব হইয়া অন্ধকার রাত্রিশেষে অরুণ উষার মূর্তি ধরিয়া দেখা

দিয়াছে। আর ভয় নাই। যিনি আমার স্বদেশের এই বহু সম্ভাবনাময় মূর্তি দেখাইবার জন্য আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, সকৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাকে স্মরণ করিলাম।

বিস্ময় ও আনন্দের বিষয় এই যে, এতগুলি সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের বুদ্ধি এবং ভারতীয় কর্মীদের যত্ন-চেষ্টায় ও কার্যকুশলতায় গড়িয়া উঠিয়াছে,—কোনও কোনও ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিশেষজ্ঞের সাহায্যও লওয়া হইয়াছে, কিন্তু সমস্তটার পনের আনা যে ভারতীয়দের কীর্তি তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে। হাজার হাজার দক্ষ শ্রমিক এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে কাজ করিয়া নিজের ও পরিবারের অন্নসংস্থান করিতেছে; অবাধ আলোক-বাতাস-জল-বিদ্যুৎযুক্ত বাসস্থান এবং ক্রীড়া-আমোদ-প্রমোদ ও সুচিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিয়া কর্তৃপক্ষ হাজার হাজার স্বদেশবাসীকে নবজীবন দান করিয়াছেন। চিত্তরঞ্জনের এই সকল ব্যবস্থা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানকার জলবিদ্যুৎ-সরবরাহ-ব্যবস্থা এবং শহরের যাবতীয় নিষ্কাশিত সমল জলের শোধনান্তে পুনরুদ্ধার-ব্যবস্থা নিখুঁত। পাদপহীন রুক্ষ ভূমিকে পুনঃবনমহোৎসবপূর্ণ করিবার দ্রুত আয়োজন প্রশংসনীয়। সিঁদরি-কর্তৃপক্ষও এই সকল বিষয়ে তৎপর হইয়াছেন। অন্য সর্বত্র কাজ সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত মনুষ্যবাস সুখপ্রদ করিবার জন্য সাময়িক সুবন্দোবস্ত হইয়াছে।

মোটের উপর, আমাদের সকল কল্পনা ও আশাকে পরাভূত করিয়া হাজারিবাগ-মানভূম-বর্ধমান জিলার কিয়দংশে নবীন পূর্বভারতের ভিত্তিপত্তন করিয়াছেন বৈজ্ঞানিক ভারতীয়েরা—স্বাধীন ভারত সরকারের যত্নে ও অর্থে। অজয়-দামোদর-ময়ূরাক্ষী-বরাকরের বর্ষার উন্মত্ত বন্যাকে বশ করিলেই প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে, অধিকন্তু যদি ইহার ফলে প্রচুর বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ পাওয়া যায় তাহা হইলে অচিরাৎ সুখসমৃদ্ধি আসিবে। বিদ্যুৎ-সরবরাহ আরম্ভ হইয়াছে, ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষে কাজগুলি মোটামুটি সমাপ্ত হইলেই বিভিন্ন খালপথে চাষের জলও প্রবাহিত হইবে এবং বাংলা-বিহারের পল্লীগ্রামের সুনিবিড় ভয়াবহ অন্ধকার দূর হইয়া বিদ্যুতের হাসি ফুটিয়া উঠিবে। আমাদের ভাবী

বংশধরেরা পূরামাত্রায় ইহার সুফল ভোগ করিবে, বৃদ্ধ যাঁহারা তাঁহারা অন্তত একবার দেখিয়া চক্ষুকে সার্থক এবং চিত্তকে আশ্বস্ত করিয়া আসুন। জড়বিজ্ঞানেরও যে একটা মহনীয় সুন্দর রূপ আছে, সবটা একসঙ্গে দেখিয়া আসিলেই তাহা প্রতীত হইবে।

কালের প্রবাহ বড় বিচিত্র, বড় ভীষণ! ইহা কাহাকেও দয়া করে না, কাহারও প্রতি ইহার কোনও মমতা নাই, সবকিছুকে নিঃশেষে ধুইয়া মুছিয়া অবিরাম নির্মমগতিতে চলিতে থাকে। ইহাকে প্রতিহত করিতে পারে শুধু অগণিত জনগণের—পুরুষপরম্পরায় জাতিপরম্পরায় সমবেতভাবে গড়িয়া ওঠা সাধারণ মানুষের মন, আমাদের শাস্ত্রকারেরা যাহার নাম দিয়াছেন মহাজন। এই মহাজনেরাই মহাকালের সর্বনাশা প্রবাহকে প্রতিরোধ করিয়া তটরূপে বিরাজ করে; কাল যাহাকে বিলুপ্ত করিতে চায় তাহার ছাপ বা স্মৃতি সস্নেহে ও সপ্রেমে বক্ষে ধারণ করিয়া থাকে, অন্য সব কিছুর ধীরে ধীরে নিঃশেষ-বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মহাজন-মনের দর্পণে স্মরণীয়দের স্মৃতি বা ছাপ দিনে দিনে স্পষ্টতর হইতে থাকে. জটিল সরল হয়, বাস্তব মহাকাব্যের রূপ লইয়া যুগে যুগে মানুষের চিত্ত হরণ করে। পৌরাণিক শ্রীরামচন্দ্র-শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া দিতেছি; ঐতিহাসিক বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট এবং অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে শ্রীচৈতন্যদেব এই ক্রমকাব্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মহাজন-মনের ভালবাসা ইহাদিগকে কাব্যের আধারে স্থাপন করিয়া মহাকালের ধ্বংস-দাপট হইতে রক্ষা করিতেছে।

ইদানীংকালে বাংলা দেশের শ্রীরামকৃষ্ণকে লইয়া ইতিমধ্যেই এই কাণ্ড ঘটিয়াছে। এখনও পরিধি স্বল্পকালের, মহাকাল ইহাকে বলিতে পারি না, তথাপি দিনে দিনে বাস্তব রামকৃষ্ণ যেভাবে মহাজন-মনের কাব্যে রূপ লইতেছেন তাহাতে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, তিনি মহাকালের দরবারেও পাস-মার্কা পাইবেন। এই সৌভাগ্য এই কালের অর্থাৎ উনবিংশ শতকের আর কোনও মহাপুরুষের ভাগ্যে ঘটে নাই।

দুঃখের বিষয়, যাহা অবিসম্বাদিত তাহা মানিয়া লইতে এখনও এক

শ্রেণীর বা সমাজের লোকের কষ্ট হইতেছে। পরমহংসদেবের তিরোভাবের অব্যবহিত পরে এবং ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে 'দি নাইন্‌টিন্‌থ সেঞ্চুরি' পত্রে আচার্য ম্যাক্সমুলারের "A Real Mahatman' প্রবন্ধ প্রকাশের পর ও ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে মনস্বী রমাঁ রলাঁর 'The Life of Ramakrishna' গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যমের সময়—তিনবার ইঁহারা বিসম্বাদের ঝড় তুলিতে চাহিয়াছিলেন। পূর্বতন বিসম্বাদের ইতিহাস স্মরণ করিয়াই রলাঁ তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন :

At this distance from their differences I refuse to see the dust of battle; at this distance the hedges between the fields melt into an immense expanse. I can only see the same river, a majestic "*chemin qui marche*" (road which marches) in the words of our Pascal. And it is because Ramakrishna more fully than any other man not only conceived but [illegible] in himself the total Unity of this river of God, open to all rivers and all streams, that I have given him my love; and I have drawn [illegible] of his sacred water to slake the great thirst of the world.

তাঁর পঁচিশ বৎসর পর দেখিতেছি, ইঁহারা আবার অকারণে কোলাহল-[illegible] হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের মোদ্দা কথাটা এই যে—বাপু হে, আজ তো খুব রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ করিয়া লাফালাফি করিতেছ, কিন্তু তোমাদের রামকৃষ্ণকে অপরিচয়ের অন্ধকার হইতে আলোকে টানিয়া আনিল কে? আমরা তাঁহার প্রশস্তি-পুস্তিকা বা প্রবন্ধ লিখিয়া ভট্ট ম্যাক্সমুলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, ইউরোপ-আমেরিকার কাছে কে তাঁহার নাম জাহির করিল? তোমাদের বিবেকানন্দ নয়, আমাদের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। ইহা লইয়া ঝগড়া করিবার কিছু নাই; দাবি সমস্তই মানিয়া লইতেছি এবং সেই সঙ্গে সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি, অন্ধকার খনিগর্ভ হইতে হীরকখণ্ড যিনি আবিষ্কার করেন অথবা তাহার জৌলুস পাঁচজনের কাছে দেখাইয়া হীরক-মাহাত্ম্য প্রচার করেন তিনি স্বয়ং হীরক না হইতেও পারেন। হীরক-আবিষ্কার বা প্রচারের কৃতিত্বজনিত আত্মপ্রসাদ তিনি এবং তাঁহার সামাজিক বংশধরেরা নিশ্চয়ই লাভ করিতে পারেন, হীরক-মাহাত্ম্য তাহাতে এতটুকু খণ্ডিত হয় না। আমেরিকা-ইউরোপে ধর্মপ্রচার তো অনেকেই করিয়া আসিয়াছেন,

সে ধর্মের গৌরব চুলায় গেল, রামকৃষ্ণকে প্রচারের গৌরবের জন্য ইঁহারা লালায়িত ; কারণ ইঁহারা বাহিরে যাহাই বলুন, অন্তরে অন্তরে শ্রীরামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য অস্বীকার করিতে পারিতেছেন না। আচার্য ম্যাক্সমুলার খোলা চোখে দেখিয়া শুনিয়া রামকৃষ্ণকেই "যথার্থ মহাত্মা" জ্ঞান করিয়াছিলেন, রামকৃষ্ণের বাণীই রমাঁ-রলাঁকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, কোনও প্রচারের দ্বারা ইঁহারা বশীভূত হন নাই।

ধর্ম অঙ্ক নয়, কয়েকটা 'কপি-বুক ম্যাক্সিম' আওড়াইলেই ধর্ম প্রচার হয় না, ইহার জন্য চাই অখণ্ড বিশ্বাস, শুদ্ধা ভক্তি এবং প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ। নিছক তাত্ত্বিক বক্তা যতক্ষণ বক্তৃতা করেন ততক্ষণই স্মরণে থাকেন, কিন্তু বিশ্বাসবান হৃদয়বান ভক্ত নিজের মনের আবেগ অপরে সঞ্চারিত করিতে পারেন। বিবেকানন্দ তাহাই করিয়াছিলেন, তাই পশ্চিমের মানুষের কাছে সত্যকার ভারতবর্ষকে তিনিই ধরিয়া দিতে পারিয়াছিলেন। তৎকালীন অন্য প্রচারকদের দর্পণে ইউরোপ-আমেরিকা নিজেদেরই বিকৃত মুখ দেখিয়াছিলেন, কৌতুক বোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আকৃষ্ট হন নাই।

মহাকাল যাঁহাকে মারেন, তাঁহাকে কেহই রক্ষা করিতে পারে না। তাই গত ১লা আগস্টের 'ধর্মতত্ত্বে' যখন পড়িলাম—"কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার [প্রতাপচন্দ্রের] উপর বারংবার অযথা মিথ্যা অপবাদ দিয়া দেশবাসীর মন হইতে তাঁহার নাম মুছিয়া দিয়াছেন। এবং তাঁহার জীবন-কথা ও কার্যাবলী অন্যেতে প্রয়োগ করিয়া নিজেদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন" তখন কৌতুক বোধ করিলাম। আমরা জানি, প্রতাপচন্দ্রকে কেহ মারে নাই, মারিতে পারিবে না, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের মাহাত্ম্য সর্বপ্রথমে অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি চিরদিন আমাদের স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্রবিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা ৩৭ হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : বড়বাজার ৬৫২০

আদর্শ
লিভার টনিক
QUMARESH
লিভারের রোগে কুমারেশ
নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় —কিন্তু
সুস্থ অবস্থায়ও কুমারেশ কম
প্রয়োজনীয় নয়। কুমারেশ
অসুস্থ লিভারকে আরোগ্য
করে এবং সুস্থ অবস্থায়
লিভারকে সবল ও কার্য্যক্ষম
রাখে।
কুমারেশ
আর, সি, এল, লিমিটেড, সালকিয়া, হাওড়া।
Gomes

শনিবারের চিঠি
পৌষ ১৩৬০ : দাম আট আনা
Dec.-Jan. : Price As. Eight
স্পাদক : শ্রীসজনীকান্ত দাস
অ্যাস্‌কো
বার
ও
ট্যাবলেট
সাবান
ASCO
SPECIAL
HOUSEHOLD SOAP
TABLET
ASCO BAR
কোম্পানী · কলিকাতা

সূচী

পৌষ—১৩৬০

স্বপ্ন-দেওঘরে
—শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২২৫
আমার সাহিত্য-জীবন
—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২২৭
হারানো সুর ... ২৩৯
ডানা—"বনফুল" ... ২৪১
বেতালের বৈঠকী—বেতাল ভট্ট ২৪৮, ৩১৪
জগত্তারিণী পদক—শ্রীকালিদাস রায় ... ২৪৯
ধরিত্রী—শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ ... ২৪৯
ছিদ্রান্বেষী— ঐ ... ২৪৯
হ্যামলেট, ডেনমার্কের কুমার
—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ... ২৫০
মহাস্থবির জাতক—"মহাস্থবির" ... ২৫৭
পথিক—শ্রীপ্রণব মিত্র ... ২৭১
ধনপতি পাগ্‌লার ডায়েরি
—শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু ...
টাইগার হিলে সূর্যোদয়
—শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ ...
বসুদেব—শ্রীতারাপ্রসন্ন দেবশর্মা ...
চামড়া—শ্রীকুমারেশ ঘোষ ...
পলাশপুরের চিঠি—শ্রীপ্রভাকর মাঝি ...
ভর—শ্রীসুভাষ সমাজদার ...
শারদীয়া মহাপূজা ও সার্বজনীন দুর্গাপূজা
—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ...
রাক্ষস-খোক্কসের গল্প
—শ্রীভূপেন্দ্রমোহন সরকার ...
চলমান বিজ্ঞাপন
—শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ ...
সংবাদ-সাহিত্য ... ৩২৩

সুপ্রা কালি
দামী ফাউন্টেন পেনের জন্য
স্থপ্রা কালি আজ এত জনপ্রিয় কেন? সব বিদেশী দামী কালিকে "সে হার মানিয়েছে, সল-এক্স-যুক্ত ও তলানিমুক্ত ব'লে অব্যাহত তার প্রবাহ, বর্ণের স্থায়ী ঔজ্জ্বল্য মনে আনে তৃপ্তির নিশ্চিত আশ্বাস। কালির রাসায়নিক গুণে প্রিয় কলমটি থাকে চির নূতন।
Supra ink
SPECIAL
Supra ink

সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে

সপ্তম খণ্ড

পঞ্চদশ খণ্ড

ষোড়শ খণ্ড

রবীন্দ্র রচনাবলী

মোট এই খণ্ডগুলি বর্তমানে পাওয়া যায়—ক. কাগজের মলাট সংস্করণ। প্রতি খণ্ডের মূল্য আট টাকা—১ ৭ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬॥ খ. সাধারণ কাগজে ছাপা, রেক্সিনে বাঁধাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য এগারো টাকা—১ ৭ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬॥ গ. মোটা কাগজে ছাপা, রেক্সিনে বাঁধাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য বারো টাকা—১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ২১

রবীন্দ্র-রচনাবলী পাবার সহজ উপায়॥ আপনি কোন্ কোন্ খণ্ড সংগ্রহ করেছেন বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগে (৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭) চিঠি লিখে তা জানিয়ে, স্থায়ী গ্রাহক হয়ে থাকা। ক খ গ কোন্ রকমের বই আগে কিনেছেন তা জানালে সেই রকম বই দেবার চেষ্টা করা হবে। কোনো খণ্ড প্রকাশিত বা পুনর্মুদ্রিত হলেই গ্রাহকদের চিঠি লিখে জানানো হয়। গ্রাহক হবার জন্য অনুরোধপত্রই যথেষ্ট, কোনো দক্ষিণা বা অগ্রিম মূল্য জমা দিতে হয় না।

শনিবারের চিঠি

২৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৬০

স্বপ্ন-দেওঘরে

দুলিয়ে 'ইউক্যালিপ্‌টাসে'র পল্লব-মঞ্জরী,--
প্রগল্‌ভ পশ্চিমে হাওয়া উঠিল ঝর্‌ঝরি'।
আধফুটন্ত রক্তগোলাপ-কুঁড়িটি চুম্বিয়া
জাগিয়ে দিয়ে কহে—"মোরে চিনতে পার প্রিয়া ?
নির্জনে কে কুঁচ-বরণী রাজকুমারী দেখে'
ছুঁচ ফুটাল প্রিয়তমায় ঘুম পাড়িয়ে রেখে ?
সর্বাঙ্গে সুচির জ্বালা, কেউ না খোলে চোখ,
আড়াল থেকে পালিয়ে গেছে বিশ্বাস-ঘাতক। --
কারো পানে চায় সে যদি, কারেও বাসে ভালো,
তাই সুচিতে সীল করেছে চক্ষু দুটি কালো।—
খুলতে কাঁটা করলে দেরি, —তরুণ কেহ হর্ষে
কটাক্ষে তায় রোমাঞ্চিল পরশ-মণির স্পর্শে।
বারেক খোলো ছুঁচ-মুখীর সেলাই-করা আঁখি,
বারে বারে যারে তুমি পরাও রাঙা রাখী।"
আচম্‌কা পশ্চিমে হাওয়া ঝরায় ফুলের বৃষ্টি,
কইল তারে—"রূপজ-মোহে হারায় শুভদৃষ্টি।
তোমরা চল' আমার সাথে 'হনি-মুনে'র দেশ,
পুষ্পিতা সে আইভি-লতার নাই কুণ্ঠার লেশ।
থাবা গাঁদা ফুটতে শুরু, পাতা হারায় হেনা,
পরদেশিনী চন্দ্রমল্লী, মুখখানি যায় চেনা।
লিলি ও ডালিয়া রাণী বাসর সাজাইবে,
পিয়ানোতে পুরানো সেই গানটি বাজাইবে।···
দেখবে কোথাও নগর-নটী নিকুঞ্জে নির্জনে,
ইশারাতে কহেন কথা, হাসেন মনে-মনে।

বিলাসিনী কফিখানায় গ্লাস ভ'রে ত্যান 'সেরী' ;
দেখিও 'বল্' নাচেন যুগল,—সহে না আর দেরি।
এক পলকেই সকল কুঁড়ি হঠাৎ সেথা ফোটে,
ওই শোনো 'ওক'গাছের ডালে কোকিল ডেকে ওঠে।
স্পষ্ট কথার অর্থ গূঢ়, বুঝিবে চোখ বুজে',—
সারা জীবন কী হয়রানি তোমায় খুঁজে' খুঁজে' !
কে আছে আর তোমার মত ? অন্তরে নিরখি,
আর জনমে সত্যি তোমার বর হয়েছি সখি।
ধর গো মোর মৃগনাভি সোনার রেকাবিতে,
পদ্ম-মধু-মিছরি কিছু তোমারে ভেট দিতে।—
থামাও, কবি, এড়ো বাঁশী শাল-মহুয়ার ছায়,
প্রাণের বাঁশী যাব না থেমে শেষের মূর্ছনায়।
এই জীবনে জাগ্‌ত যদি দ্বিতীয় যৌবন,—
তন্দ্রাঘোরে ডাক্‌তে মোরে, ফল্‌ত গো স্বপন।
অর্ধ শত শরৎ গত, প্রথম সে যৌবনে
বেড়াইতাম তোমার সনে পিয়াল-বনে-বনে ;
অনেক রাতে মিলিয়াছি দোলের পূর্ণিমায়,
প্রাণে প্রাণে মিলিয়ে ছিল জ্যোৎস্নার রোস্‌নাই।
পথ হারায়ে ছুটব দু'জন আবার উল্টো পথে,
হাঁটু জলে পেরিয়ে যাব জল-প্রপাত-স্রোতে।...
তোমায় যেদিন প্রথম দেখি ছিলে আসব-মত্তা,
মহাকবি 'ভাসে'র তুমি "স্বপ্ন-বাসব-দত্তা"।
তোমার সাথে হয়েছিল গোপন স্বয়ংবর।
কত আপন হয়েছিলে নিতান্ত নিস্পর !
তোমায় দেখে মনে পড়ে অনেক ভোলা কথা,
স্মৃতির যাদুঘরের মাঝে গভীর ক্ষত-ব্যথা।"

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার সাহিত্য-জীবন

পাঁচ

পূজার পর এসে বড় মেয়ের অসুখে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম কয়েক-দিনের জন্য। বেশ মনে পড়ে, বাসা তুলে দেবার চিন্তা পেয়ে বসেছিল। নীচে নির্মল বসু থাকতেন, তিনি ছুটিতে অভ্যাসমত দেশান্তর ভ্রমণে গিয়েছিলেন; গঙ্গার অসুখের রাত্রে তিনি থাকলে কোন চিন্তাই করতাম না। তাঁর কাছে সে সময় প্রয়োজনে যখন হাত পেতেছি, তখনই টাকা পেয়েছি। এমন মহাজন হয় না; কোন কালেই তাগিদ নেই টাকা ফেরত পাবার জন্য। এবং আরও বড় কথা তাঁর নিজের কাছে টাকা না থাকলেও তিনি পরের কাছ থেকে ধার ক'রে এনে টাকা ধার দিয়ে থাকেন। এ ছাড়া আরও কথা আছে। নির্মল বসু ভাল মহাজনই নন, সেবাকার্যে সুনিপুণ ব্যক্তি। নির্মলবাবু ফিরে এলেন কয়েকদিন পর, তাঁকে বললাম সঙ্কল্পের কথা। তিনি টাকে হাত বুলিয়ে স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে বললেন, ভয় পেয়ে গেলেন? উত্তরে চুপ ক'রেই রইলাম, মৌনতার মধ্যেই স্বীকৃতি জানিয়ে দিলাম। নির্মল-বাবু আরও একটু হেসে বললেন, ক্ষেপেছেন নাকি? কিচ্ছু ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

বোধ করি, ঠিক পরের দিনই তিনি আমার একটি গল্পসংগ্রহ প্রকাশের এক প্রস্তাব হাজির করলেন। যাঁরা নেবেন তাঁদের মধ্যে নির্মল-বাবুর ভক্ত এবং সহকর্মী কয়েকজন ছিলেন। কথা হয়ে গেল। পরের দিন নির্মলবাবু এসে বললেন, ঝগড়া ক'রে এলাম। ওদের বই দিতে হবে না। তারপর বললেন, মশাই, দিগ্‌গজ পণ্ডিত লোক! সাহিত্যিকদের আসরে মজলিসে ঘোরাফেরা করেন, বললেন কিনা—তারাশঙ্করের বই ত টাকা দিয়ে নেব কেন? সে তো পঁচিশ টাকায় কপিরাইট বিক্রি করে! আমি প্রতিবাদ করলাম তো আমাকে বললেন—তুমি জান না। আমি জানি না। হাসতে লাগলেন নির্মলবাবু।

নির্মলবাবু এই সময়ের আমার সকল খবরই জানতেন। উপরতলায় চারখানি ঘরে ছিল আমার সংসার; বাইরের লোকজন এলে তাঁদের

নিয়ে নির্মলবাবুর ঘরেই বসাতাম, কথাবার্তা কইতাম; বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথাবার্তা, পাবলিশারদের সঙ্গে কথাবার্তা—সবই তাঁর ঘরে তাঁর সামনেই হ'ত; চুক্তিপত্র লিখতে কাগজ-কলম সেও নির্মলবাবুই জোগাতেন।

নিজের বন্ধুর কথায় নির্মলবাবু দুঃখ পেয়েছিলেন। আমি কিন্তু পাই নি। ভদ্রলোকের নাম শুনে আমি হাসলাম। বললাম, দাদা, পণ্ডিত লোকে এমন ব'লে থাকেন। কারণ পণ্ডিতেরা, বিশেষ ক'রে বিলেত-ফেরত পণ্ডিত অধ্যাপক এবং কিছু মনে করবেন না নির্মলদা, অতি শুদ্ধচিত্ত শুচিবাইগ্রস্ত পণ্ডিতেরা বাংলা গল্প উপন্যাস পড়েন না, কোন খবরও রাখেন না। কেউ তাঁকে বলেছে, ভুল খবর পেয়েছেন।

যাই হোক, পরের দিন কিন্তু পাবলিশারের লোক নিজের থেকেই এলেন এবং এক শো টাকা দিয়ে বাকি দেড় শো টাকা কয়েক কিস্তিতে দেবার কড়ারে বইটির প্রথম সংস্করণ চুক্তি ক'রে গেলেন। এবং আমার শ্রদ্ধাভাজন গুরুতুল্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন মশায় এর দু-একদিনের মধ্যেই একদিন বাসায় এসে 'ভারতবর্ষে'র জন্য উপন্যাস লিখতে বললেন। সামনের পৌষ থেকেই উপন্যাস দিতে হবে। বোধ করি, বছরে দু শো টাকা হিসেবে পারিশ্রমিকের কথা বললেন। এর আগে দেড় বছরে উপন্যাস শেষ ক'রে মোটমাট এক শো পঁচাত্তর টাকা পেয়েছি। কাজেই হতাশা কাটিয়ে ভরসা পেলাম এবং শক্ত হয়ে ব'সে ফাইবারের স্যুটকেসটা কোলের কাছে টেনে নিয়ে লিখতে ব'সে গেলাম। পত্তন করলাম 'গণদেবতা'র। 'গণদেবতা' এক কিস্তি বের হতেই কাত্যায়নী বুকস্টলের গিরীনবাবু এসে কিছু টাকা দিয়ে চুক্তি ক'রে গেলেন।

এর মধ্যে অন্দরমহলে একটি ঘটনা ঘটল।

বোধ করি, 'আনন্দবাজারে' বিজ্ঞাপনের স্তম্ভে আমার গৃহিণী আবিষ্কার করলেন, ঢাকুরিয়া অঞ্চলে কোথায় আড়াই হাজার টাকায় নূতন বাটী বিক্রয়ের জন্য আছে।

আগে বোধ হয় বলেছি যে, আমার গৃহিণী কিছু মাতৃধন পেয়ে-

ছিলেন। এই টাকাটা যাতে আমাদের সাধারণ সংসারে খরচ না হয়, তার দায়ে নিঃশেষিত না হয়, এর জন্য টাকাটার উপর গৃহিণীর পিতৃপক্ষের অভিভাবকদের সযত্ন দৃষ্টি ছিল দীর্ঘকাল। টাকাটা তাঁদের কারবারেই খাটাতেন তাঁরা; মাসিক সুদটা দিতেন মেয়ের হাতখরচের জন্য। এর জন্য অশান্তি ভোগ করেছি অনেক। নিজেও অশান্তির সৃষ্টি করেছি। নিজেদের বৈষয়িক দায়ে অনেক সময় ওই টাকা নিয়ে দুর্ভাবনা থেকে রেহাই পেতে চেয়েছি। কিন্তু পাই নি। সুতরাং গৃহিণীর সঙ্গে মনান্তরের সৃষ্টি হয়েছে; কটু-কাটব্য করেছি, উত্তরে ধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনেছি, এবং কিছুকাল পর ওই টাকার কথা চিন্তা করাও পাপ মনে করতে চেষ্টা করেছি। সেই টাকাটা দীর্ঘকাল পর গৃহিণী হাতে পেলেন। অভিভাবকেরা টাকাটাকে ক্যাশ-সার্টিফিকেটে পরিণত ক'রে হাতে দিলেন। ক্যাশ-সার্টিফিকেটগুলি গৃহিণীর বাক্সেই ইন্‌কিউবেটারের ডিমের মত উত্তপ্ত হচ্ছিল। গৃহিণী টাকাটা যক্ষের ধনের মত রক্ষা করছিলেন কন্যাদের বিবাহের জন্য। হঠাৎ 'আনন্দবাজারে'র বিজ্ঞাপনের পথে আড়াই হাজার টাকায় বাড়ি বিক্রয় হবে শুনে সঙ্কল্প বদল ক'রে ফেললেন এবং একদা অনেক বাক্য-প্রেরণা দিয়ে আমাকে ঢাকুরিয়া অভিমুখে প্রেরণ করলেন—দেখে এস বাড়ি। এর মূলে অবশ্য তাঁর গোপন মনের দমিত বাসনার খেলা ছিল ব'লেই আমার ধারণা। তাঁর পিতৃকুলের অনেকেরই কলকাতায় বাড়ি হয়েছে। তাঁর মামাতো বোনেদের কয়েক জনের কলকাতার উপকণ্ঠেই বড়লোকের বাড়ি বিবাহ হয়েছে। এই সব নিয়ে একটা গোপন বাসনা মনের নিভৃতে এক অন্ধকার কোণে বাসা বেঁধেছিল। সে সুযোগ পেয়ে সন্তর্পণে মুখ বাড়িয়ে বললে, সস্তায় যদি কিস্তিটা মারাই যায়, তবে দেখ না চেষ্টা ক'রে। ক্ষতি কি? সৃষ্টিতে পাখি তো বহুবিধ রয়েছে গো। ঈগল পাখি দূর আকাশে বেড়ায় ব'লে কি চটকেরা গাছের মাথায় বা আশেপাশে ওড়ে না! মোট কথা, পাখা হ'লেই পাখি হয়। তখন আর জাতে ঠেলা না। জাতে ওঠবার মস্ত সুযোগ ছেড়ো না।

যাই হোক, তাগিদের ঠেলায় বেরুতে হ'ল। খবরের কাগজের কাটিং পকেটে নিয়ে ঢাকুরিয়া গিয়ে উঠলাম। কিন্তু ঢাকুরিয়া একেবারে অজানা অচেনা, এবং কলকাতায় কয়েক বছর ধ'রে থেকেও কলকাতা সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা অত্যন্ত কম। আজও কম। মুচিপাড়া জোড়াবাগান বড়তলা—এসব বললে আজও ভড়কে যাই। শ্রীরঙ্গমের পাশে বড়তলা থানা চিনেছি এই সেদিন দাঙ্গার সময়। তালতলা চিনেছি হীরেন মুখুজ্জের সঙ্গে আলাপের পর। কাঁকুলিয়ার একটা রাস্তায় আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বুধাদার বাড়ি। যতবার যাই পথ ভুল হয়। ডিহি শ্রীরামপুরে শ্রদ্ধেয় যামিনীদা বাড়ি করেছেন। ওখানকার রাস্তাটা আজও চিনতে পারি না। আমার মধ্যে একজন চিরন্তন পাড়াগেঁয়ে মানুষ আছে, যে ভুলই শুধু করে না, আগেভাগে ভয় পেয়েও ব'সে থাকে। ঢাকুরিয়ার পথে চিন্তিত মনেই পথ হাঁটছিলাম। পথে দেখা হ'ল গজেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে। গজেন আজ আমার পরমাত্মীয়দের মধ্যে একজন। সুখে দুঃখে আনন্দে বেদনায় তার সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড়। কিন্তু তখন তার সঙ্গে পরিচয় ছিল মুখচেনা পরিচয়। তার বেশি এক তিল নয়। গজেন তখন গজেন-বাবু। গজেন আমাকে দেখে বিস্মিত হ'ল। রবিবার ছিল সেদিন। সকালবেলা। সাদরে সম্ভাষণ জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, সেখানে কোথায় চলেছি? সসঙ্কোচেই ব্যক্ত করলাম অভিপ্রায়ের কথা। গজেনও ঠিকানা দেখে প্রথমটা ঠাওর করতে পারলে না। গজেনের জন্ম কলকাতায়, কলকাতায় মানুষ; তা ছাড়া গজেন সেই শ্রেণীর মানুষ যাদের এই দিকের জ্ঞান, বাস্তব হিসেব, সাংসারিক বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, এবং খবরাখবর যাদের নখদর্পণে থাকে তাদের দলের একজন। সে বাজারদর থেকে উচ্চতম রাজনৈতিক মহলের সংবাদ রাখে। সে পাড়ায় একটু খবর ক'রেই সে বললে, ও আর দেখতে হবে না।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

হেসে গজেন বললে, সে এক তেপান্তর। চারিপাশে জলা। পথে গাড়ি চলা দূরের কথা, জুতো চলে না। পথের দু পাশে এমনই বাঁশবন,

এবং অন্ধকার যে, পথের মাঝে খুন ক'রে গুম করলেও কেউ টের পায় না। কাজী নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার' গানটি বোধ হয় ওই স্থানটিকে লক্ষ্য ক'রেই লেখা।

দ'মে গেলাম। হাঁ ক'রে মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

গজেন হেসে বললে, চলুন, একবার স্বচক্ষে দেখে সন্দেহভঞ্জন ক'রে নেবেন।

গজেনের সঙ্গে বেরিয়ে সে কি দুর্ভোগ! ঢাকুরিয়া থেকে বেরিয়ে মাঠে মাঠে বাঁশবনের মধ্যে দিয়ে জুতো হাতে ক'রে এক জলময় মাঠের ধারে দাঁড়ালাম। অদূরে চতুর্দিক জল, মধ্যখানে টুকরোখানেক টিলার মত উঁচু জায়গায় একখানি টিনের ছাওয়া দাঁত-বের-করা বাড়ি। গজেন আঙুল দেখিয়ে বললে, ওই দেখুন। যাবেন?

বললাম, না।

বাড়ি ফিরলাম। গৃহিণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। কিন্তু যে বাসনা উঁকি মেরে দিনের আলো দেখে নিয়েছিল একবার, সে কিন্তু উঁকি মারতে ক্ষান্ত হ'ল না। রবিবার দিন দুপুরবেলা গৃহিণী 'আনন্দবাজারে'র বাড়ির বিজ্ঞাপন নিয়ে বসতে শুরু করলেন।

ওদিক থেকে গজেন তাদের প্রতিবেশী করবার জন্য বাড়ির খবর আনলে। ভাল বাড়ি, মন্দ বাড়ি। গজেনের খবরমত একখানা বড় বাড়ি দেখে এলাম। কিন্তু সাধ্য হওয়া চাই তো!

গৃহিণী তখন আড়াই হাজারের মাত্রা ছেড়েছেন। উপরে উঠেছেন। কিন্তু পুঁজি তো হাজার ছয়েকের মত। তার মধ্যে কিছু মেয়ের বিয়ের জন্য রাখতে হবে। যাই হোক, সাধনা থাকলে সিদ্ধি না হয়ে যায় না। সিদ্ধি হ'ল। বরানগরের গায়ে, কলকাতা কর্পোরেশনের এলাকার মধ্যে কাশীনাথ দত্ত রোডে একখানি বাড়ি পাঁচ হাজার টাকায় শেষ পর্যন্ত কেনা হ'ল। হাজার তিনেক নগদ, বাকি দু হাজারের কিস্তিবন্দী দু বছরে। বাড়িখানা তৈরি হচ্ছিল। যাঁর কাছ থেকে কেনা হ'ল তিনি বাড়ির ব্যবসায় করতেন। কাদের যেন বাগান ছিল, সেই বাগান

কিনে, ভেঙে চুরে কলোনির মত ক'রে বাড়ি করছিলেন তিনি চারিপাশে এক শো গজের মধ্যে বাড়ি নেই, তার ওদিকে দু পাশে বস্তি জলা, বাকি দু পাশে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বাস। এই সূত্রে নিবিড় পরিচয় হয়ে গেল বাংলা দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে, বিশেষ ক'রে, স্ট্যাটিস্টিক্সের ক্ষেত্রে খ্যাতনামা "যমদত্ত" বা শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত মশায়ের সঙ্গে। চেহারায় যেমন খিটখিটে, মেজাজে তেমনি খটরোগা। মানুষ হিসেবে খাঁটি সোনা; নিজের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে খাঁটি ইস্পাতের হাতিয়ার—হয় কাটে, নয় ভাঙে। মাঝপথে বেঁকে বা নুয়ে কখনও পড়েন না যমদত্ত। যমদত্তই বিনা পারিশ্রমিকে উকিলের যাবতীয় কাজ ক'রে দিলেন এবং প্রথম যখন বরানগরে উঠে গেলাম তখন যতীনবাবু আমার সুবিধা-অসুবিধা দেখেছেন, প্রতিকার করেছেন সহোদরের মত। দত্ত মশায়ের বাসা একেবারে বাস্স্ট্যাণ্ডের ওপর। আসতে যেতে ওখানেই ছিল চায়ের আড্ডা। দত্ত মশায় দুর্লভশ্রেণীর তত্ত্ববিদ্ এবং মস্তিষ্কের অসাধারণ রকমের গহণশক্তি। কেবল মাত্র ইস্পাতের মত অনমনীয় স্বভাবের জন্য কোনক্ষেত্রে আপোস করতে পারলেন না ব'লেই প্রতিষ্ঠার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশাধিকার পেলেন না।

প্রাচীন কলকাতার হাটখোলার দত্ত-বাড়ির বংশধর। দত্ত মশায়ের প্রথম জীবনে পৈতৃক সম্পদও কিছু ছিল। কিন্তু ওই অনমনীয় স্বভাবের প্রেরণায় পাপীকে দণ্ড দেবার প্রতিজ্ঞায় তার অধিকাংশটাই ব্যয় ক'রে ফেললেন, অথচ কূটবুদ্ধিতে হেরে গেলেন, পাপীর দণ্ড হ'ল না। পৈতৃক সম্পদ তাঁর যাক, বংশগত সামাজিক সদাচারে, উদারতায় এবং নিজের প্রতিভাগত সম্পদে দত্ত মশায় ঐশ্বর্যবান। দত্ত মশায়ের একটা গল্প বলি। দত্ত মশায় প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্র বসু, জ্ঞান ঘোষ প্রমুখ ধুরন্ধরদের সহপাঠী। এম. এস-সি পরীক্ষায় দত্ত মশায় লিখিত বিষয়গুলিতে উল্লেখযোগ্য নম্বর পেলেন একটি বিষয়ের প্র্যাক্টিক্যালেও পেলেন। কিন্তু যে প্র্যাক্টিক্যালটিতে তাঁর প্রায় নব্বুয়ের কোঠায় নম্বর ওঠার কথা, সেই বিষয়ে তিনি ফেল

হলেন। তার কারণ, সেই প্র্যাক্‌টিক্যালে তিনি এমন সূক্ষ্মতম উত্তর নির্ধারণ করেছিলেন, পরীক্ষক তা তাঁর গবেষণার প্রত্যক্ষ ফল ব'লে বিশ্বাস করতে না পেরে বলেছিলেন, এটা তুমি চোখে-দেখছ, না, পুঁথিগত উত্তর দিচ্ছ? দত্ত বললেন, না, আমি চোখে দেখছি। তার কারণ, তাঁর চোখের হাই মাইনাস পাওয়ার। যাই হোক, এই নিয়ে পরীক্ষকের সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদের চরম মুহূর্তে তিনি একটা চরম কটু কথা বেশ ভদ্র-ভাবেই ব'লে দিয়ে বেরিয়ে এলেন, যার অর্থ এই যে, গর্দভ-রাগিণী ব'লে একটা রাগিণী আছে বটে, কিন্তু বীণা বা সেতারে যে রাগ-রাগিণী বাজে তা গর্দভকে সহস্র চেষ্টাতেও বোঝানো যায় না। শুধু এই ধরনের উত্তর দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, Thumbs up অর্থাৎ বুড়ো আঙুল দুটি খাড়া ক'রে দেখিয়ে দিয়ে চ'লে এলেন। আজও কাঠের কোঠায় পা দিয়েছেন যমদত্ত, তবু তাঁর খাড়া বুড়ো আঙুল দুটি নুইয়ে পড়ল না। ভদ্রলোক একটা প্র্যাক্‌টিক্যালে ফেল হয়েও অন্য বিষয়গুলিতে এত বেশি নম্বর পেয়েছিলেন যে, তাতেই পাস ক'রে গেলেন, কিন্তু ফল ভাল হ'ল না। ফল ভাল হ'লে দত্ত হয়তো অধ্যাপনা করতেন, তাতে বাংলা দেশের শিক্ষা-ক্ষেত্র যে উপকৃত হ'ত তাতে সন্দেহ নেই। তবে আজকাল সন্দেহ হয়। কারণ এই খটরোগা 'Thumbs up মানুষটি কি আজকালকার ছাত্রদের "আমাদের দাবি মানতে হবে" সইতে পারতেন?

যমদত্তর আর একটি দিক হিন্দুত্বের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ। এই কারণে তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের হিন্দু-বিদ্বেষের জন্য মুসলমান-বিরোধী। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস এবং যে সময়ের কথা বলছি সেই সময়ের মুসলিম-লীগের সাম্প্রদায়িকতা-দুষ্ট মনোভাব ও কার্যাবলীর কঠোর সমালোচক ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধগুলি অকাট্য তথ্য এবং যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কংগ্রেস এবং মহাত্মা গান্ধীর মুসলমান-তোষণ নীতির তিনি কঠোর সমালোচক। মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্ম এবং সমাজ সম্পর্কে তাঁর অনুসন্ধান, পড়াশোনা এবং গবেষণা গভীর এবং

ব্যাপক। শুনেছি তাঁর সহকর্মী বন্ধুজন অর্থাৎ আলিপুর বারের উকিলদের অনেকে তাঁকে "কোরাণরত্ন" ব'লে সম্বোধন ক'রে থাকেন। কোরাণ নাকি তাঁর মুখস্থ। হিন্দুধর্ম ও সমাজের কেশাগ্রের অনিষ্ট ক'রে বা একতিল অধিকার ছেড়ে দিয়ে যদি কেউ সাম্প্রদায়িক আপোস করতে চান তবে যমদত্ত তাঁকে ক্ষমা করেন না—সে তিনি যেই হোন্।

দত্ত মশায়ের আর একটি দিক আছে। সে হ'ল এই কলকাতার সমাজ সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও গবেষণা। কলকাতার সামাজিক ইতিহাস, বিভিন্ন সময়ের সমাজপতি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচয়, তাঁদের জীবনের কাহিনী-গল্প সম্পর্কে তিনি এন্‌সাইক্লোপিডিয়া-বিশেষ। বিশেষত্ব এই যে, এ সবের মধ্যে গল্প থাকলেও গাল বা গুল নেই। তাঁর মন ও দৃষ্টি একেবারে খাঁটি বৈজ্ঞানিকের মন ও দৃষ্টি। সন তারিখ প্রমাণ প্রয়োগ তাঁর অকাট্য। এ দিক দিয়ে তিনি যদি কিছু কাজ করতেন তবে বাংলা সাহিত্য উপকৃত হ'ত। কিন্তু দত্ত বলেন, লিখতে গেলেই আমার গল্পের রস উবে যায়। রসবস্তুর রস শুকিয়ে নিছক বস্তুটি থেকে যায়। বস্তু বস্তাবন্দী হয়ে গুদোমে থাকে। মিলিটারি ডিপার্টমেণ্টে দেখেছি, লোহার মাল হোয়াইট অ্যাণ্ট অর্থাৎ উইয়ে খেয়ে ফেলে। তোমাদের গল্পের বইগুলি হোয়াইট অ্যাণ্টে খায়। সেখানে কাগজের পৃষ্ঠায় বস্তু রেখে করব কি? মধ্যে 'যুগান্তরে' 'আনন্দবাজারে' তাঁর কিছু লেখা বেরিয়েছিল। বহু জনের ভাল লেগেছিল। কিন্তু বন্ধ কেন হ'ল ঠিক জানি না।

বরানগরে কাশীনাথ দত্ত রোডে যতীন দত্ত মশায় আমার বড় লাভ।

ওখানে উঠে গেলাম ১৯৪১ সনের এপ্রিলে—১৩৪৭ সালের ৪ঠা বৈশাখ। আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে ঠিক এক বৎসর থেকে উঠে গেলাম। বরানগরের বাড়িটা একেবারে ফাঁকার মধ্যে। বাগান-ভাঙা কলোনি। আশেপাশে আরও দুখানা বাড়ি হচ্ছে, শেষ হয় নি। ওই ব্যবসায়ীই বাড়ি তৈরি করছেন। বিক্রি করবেন। এরই মধ্যে ঘর বাঁধলাম। কলকাতায় বাস একরকম পাকা হয়ে গেল।

হাতে তখন দুখানি উপন্যাস রয়েছে। 'ভারতবর্ষে' চলছে 'গণদেবতা', পাটনার 'প্রভাতী'তে সবে শুরু করেছি 'কবি'। এই বাড়িতে এসে প্রথম শুরু করলাম নাটক। 'কালিন্দী' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিতে বসলাম। নাট্যরূপ শেষ হ'ল। ভাবনা হ'ল, কোথায় যাই?

তখন পুরনো অ্যালফ্রেড থিয়েটার বাড়িটিকে সুসংস্কৃত ক'রে নাট্যভারতী খোলা হয়েছে। ওখানে শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর নেতৃত্বে সমারোহের সঙ্গে নাট্যাভিনয় চলছে। ইচ্ছে হ'ল, ওখানেই নিয়ে যাব। কিন্তু কোন একজন সুপারিশের লোক চাই, যার সঙ্গে গেলে অন্তত ভিতরে পৌঁছুবার পালাটা সহজে হতে পারবে। ভেবে চিন্তে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের নাম মনে হ'ল। একদিন 'শনিবারের চিঠি'র আপিসে বীরেন্দ্রকৃষ্ণকে ধরলাম। তিনি বললেন, নিয়ে যেতে আমি পারি, কিন্তু অহীনবাবু শুনেছি শচীনদাকে যেন নতুন নাটকের জন্যে বলেছেন। আপনার বই পছন্দ হ'লেও দেরি হবে।

আমি বললাম, তা হোক।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বললেন, তা হ'লে যে কোনদিন বিকেলবেলা রেডিও-আপিসে যাবেন, সেখান থেকে দুজনে যাওয়া যাবে নাট্যভারতীতে।

দিন দুই পর বিকেলবেলা গেলাম বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কাছে। জি পি ও র ঠিক সামনে, লালদীঘির কোল ঘেঁষে ফুটপাথ ধ'রে রেডিও আপিসের দিকে চলেছি, হঠাৎ দেখা হ'ল নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি রেডিও আপিস থেকে ফিরছেন। আমাকে দেখেই তিনি বললেন, আরে মশাই, আপনাকে আমি খুঁজছিলাম।

কেন?

প্রবোধবাবু—প্রবোধকুমার গুহ, নাট্যনিকেতনের মালিক—দেখা করবেন আপনার সঙ্গে। আমাকে বলেছেন, তাঁকে নিয়ে আসুন একবার।

বুকটা ধড়াস ক'রে উঠল। প্রশ্ন করলাম, আমার সঙ্গে আলাপ করবেন?

আপনার 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী' প'ড়ে ভদ্রলোক ক্ষেপে গেছেন। নাটক ক'রে অভিনয় করতে চান নাট্যনিকেতনে।

আমার আর আত্মসম্বরণের ক্ষমতা রইল না। আমি ব'লে ফেললাম, আমি 'কালিন্দী' উপন্যাস থেকে নাটক তৈরি করেছি।

বগলদাবা খাতাখানা বের করলাম। বললাম, বীরেনবাবুর কাছে যাচ্ছি, উনি আমাকে অহীনবাবুর কাছে নিয়ে যাবেন।

নৃপেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ওঁরা করবেন কথা দিয়েছেন?

না, তা দেন নি। অহীনবাবুকে দেখাবার জন্যে নিয়ে যাচ্ছি।

প্রবোধবাবু কিন্তু আপনার বই করবেন ব'লে সঙ্কল্প স্থির করেছেন। আপনার জন্যে তিনি ব'সে আছেন মশায়। শচীনদার 'ভারতবর্ষ' নাটক খুলেছেন; বই জমে নি; লোকে নেয় নি। এক সপ্তাহের মধ্যেই আপনার বই রিহারশ্যালে ফেলবেন। এ একেবারে ফাইন্যাল। এ সুযোগ আপনি হারাবেন না।

আমি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। উত্তর দিতে পারলাম না।

নৃপেনবাবু বললেন, আজ আমার কাজ আছে, নইলে আজই নিয়ে যেতাম আপনাকে। আপনি কাল বিকেল পাঁচটার সময় নাট্য-নিকেতনে আসবেন, আমি দাঁড়িয়ে থাকব আপনার জন্যে।

নৃপেনবাবু চ'লে গেলেন। আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ি ফিরে এলাম। চুপচাপ ব'সে শুধু ভাবলাম। নাট্যভারতীতে সমারোহের সঙ্গে অভিনয় চলছে। ওখানকার নামডাক এখন খুব। তা ছাড়া 'কালিন্দী'র রামেশ্বরের চরিত্রে অহীন্দ্রবাবু অভিনয় করেন—এই আকাঙ্ক্ষাটি আমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু বই পছন্দ-অপছন্দ আছে। পছন্দ হ'লেও কত দিন পর অভিনয় করবেন তারও স্থিরতা নেই। অন্তত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ তাই বলেছেন। আর নৃপেনবাবু বললেন, প্রবোধবাবু আমার জন্যে ব'সে রয়েছেন। মাস খানেকের মধ্যেই বই খুলবেন। প্রথম যৌবনের স্বপ্ন মনে প'ড়ে গেল। নাট্যকার হওয়ার স্বপ্ন। দেওয়ালে দেওয়ালে বড় বড় হরফে নাটকের নামের সঙ্গে নাট্যকারের নাম থাকবে। সপ্তাহে

সপ্তাহে নূতন বিজ্ঞাপন পড়বে। খবরের কাগজে অন্তত চার-পাঁচদিন বিজ্ঞাপন থাকবে। বিলম্ব আমার আর সহ্য হ'ল না। স্থির করলাম, এ নিশ্চয়তা ছেড়ে অনিশ্চিত সম্ভাবনার পিছনে ছুটব না। নাট্য-নিকেতনেই যাব।

পরের দিন নাট্যনিকেতনে গেলাম।

সেদিনটা ছিল বোধ হয় শুক্রবার। অভিনয় ছিল না। নাট্যনিকেতনের (বর্তমান শ্রীরঙ্গম) সামনে খানিকটা বাগান আছে, সেখানে জন দুই-তিন থিয়েটারেরই লোক ব'সে আছেন। প্রবোধ গুহ মশায় ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে চিহ্নিত গম্ভীব এবং তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি। তিনি বাগানের রাস্তায় পায়চারি করছেন। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ নেই। বেরিয়ে এসে ফুটপাথে দাঁড়ালাম। সেখান থেকে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের মোড়ে এলাম। তাকিয়ে রইলাম ট্রাম এবং বাসের দিকে। ট্রাম যায়, বাস যায়, লোক নামে, কিন্তু নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের দেখা নেই। আবাব ঘুরে এলাম নাট্যনিকেতনে। মনে হ'ল, যদি হাঁটাপথে কোন দিক দিয়ে তিনি এর মধ্যে এসে থাকেন! কিন্তু না, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ আসেন নি। প্রবোধবাবু একা ঘুরছেন।

সে সময়ে রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে আমার একটা ভয় ছিল। আমার প্রথম নাটকের অদৃষ্ট সম্পর্কে বলেছি এর আগে। তা ছাড়াও সেকালে ৺নির্মলশিববাবুর কাছে এ সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছি। নির্মলশিববাবুকেই সেকালের এক অভিনেতা জেরা করেছিলেন, সিকোয়েন্স অব টেন্স সম্পর্কে। বলেছিলেন, আপনি সিকোয়েন্স অব টেন্স জানেন না, নাটক লিখেছেন? ৺অপরেশবাবু নির্মলশিববাবুকে বাঁচিয়েছিলেন। নির্মলশিববাবুর কাছেই আরও গল্প শুনেছি অন্য একজন নাট্যকার সম্পর্কে। সেকালে তাঁর নাটক শতাধিক রাত্রি চলেছিল ক্রমান্বয়ে। এই ভদ্রলোক নাটক নিয়ে রঙ্গমঞ্চে আসতেন প্রাণের তাগিদে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের একজন তাঁকে বলেছিলেন, এই ভাবে নিত্য এলে আপনার বই আমরা অভিনয় করব না। ভদ্রলোক

কিন্তু না এসেও পারতেন না, এসেও রঙ্গমঞ্চে ঢুকতে সাহস করতেন না। পাশের পার্কে ফুটপাথে ঘুরে বেড়াতেন। এই সবের প্রভাবে আমার মনেও আতঙ্ক ছিল। কাউকে কিছু বলতে সাহস হ'ল না।

অবশেষে প্রায় মরিয়া হয়ে সাহস সঞ্চয় ক'রে প্রবোধবাবুর কাছে গিয়ে নমস্কার ক'রে বললাম, এখানে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মশায়ের আসবার কথা ছিল, তিনি আমাকে আসতে বলেছিলেন—

কথা শেষ হবার আগেই প্রবোধবাবু বললেন, তিনি আসেন নি।

আমি একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম, তিনি আপনার কাছে একখানা নাটক নিয়ে আসতে ব'লেছিলেন।

গম্ভীরভাবে প্রবোধবাবু বললেন, তিনি আনতে বলেছিলেন, তাঁকেই দেবেন। আমার দরকার নেই। ব'লেই তিনি ঘুরলেন। আমার মাথাটা ঝিমঝিম ক'রে উঠল। ইচ্ছে হ'ল, ছুটে পালিয়ে আসি। কিন্তু তাতেও লজ্জা আছে। আত্মসম্বরণ ক'রেই ফিরলাম।

নাট্যনিকেতন থেকে বেরিয়ে থানার সামনে এসে পৌঁছেছি, এমন সময় কেউ পিছন থেকে আমার হাত চেপে ধরলেন।—ও মশায়!

ফিরে দেখি, প্রবোধবাবু স্বয়ং।

হেসে হাতজোড় ক'রে বললেন, আপনাকে আমি চিনতে পারি নি মশাই। দয়া ক'রে ফিরতে হবে, মাফ করতে হবে। আসুন।

ব'লেই বললেন, আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা তো জানেন না, নাটকের নামে যে কি আবর্জনা গাদা হয়ে থাকে, সেইটে অন্তত দেখে যদি চ'লে আসতে চান তো চ'লে আসবেন। আপনাকে দেখে ভাবতে পারি নি যে, আপনি তারাশঙ্করবাবু। ভেবেছিলাম, মোটা বই লেখেন, ভারী ভারী চরিত্র, এর লেখক নিশ্চয় দশাসই পুরুষ হবে, এই এক জোড়া গোঁফ থাকবে—

এবার হেসে ফেললাম এবং ফিরলাম।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

হারানো সুর

আমি ছিলাম, তুমি ছিলে,
আরো ছিল অনেকে তো
থেকেও তারা ছিল না যে,
মো'দের নাগাল কেউ না পেত।
দুয়ের লাগি আকাশে চাঁদ
বিছিয়ে দিত রূপালি ফাঁদ,
ভেঙে কাছের সব কটা বাঁধ
সুদূর মোদের ছুঁয়ে যেত।

ভালবাসার মায়াজালে
ধরা পড়েছিলাম ব'লে
ধূলিশয্যা—পালঙ্ক যে
হাঁটাই—চলা চতুর্দোলে।
সবাই ছিল, জান্‌ত কে তা
স্বর্গ নেমেছিল হেথা,
সত্য এবং দ্বাপর ত্রেতা
দিছ্‌ল ধরা কলির কোলে।

চোখে চোখেই কথা হ'ত
শুন্‌তে পেত আর কেহ কি,
একে একে পড়ত স'রে
অকারণেই বকি বকি।
জড়িয়ে ধ'রে পরস্পরে
বাঁচার সুখেই যেতাম ম'রে,
স্বর্গ ছিল মুঠোর 'পরে
সহজলভ্য আমলকি ॥

*   *   *

আমি আছি, তুমি
[illegible]রে আছ
যদি থাক্‌তে ক[illegible] কাছি
[illegible]মার স্মৃতিই হ'ত তেতো
হঠাৎ [illegible]ও নি ম'রে
বেশ [illegible]স গেছ স'রে,
পক্ষীর[illegible]ও—থাকলে চ'ড়ে
হ'ত নেহাৎ ঘোড়া বেতো।

তোমার প্রীতি স্মৃতি হ'ল
তাই তো এমন ভাল লাগে,
কাব্য লিখে চলেছি তাই
গভীর তোমার অনুরাগে।
তুমি আছ, দূরেই আছ,
তাই প্রেয়সী, বাঁচিয়াছ,
ভুলে তোমার কথার ধাঁচও
স্মরণ করি তোমায় আগে।

যেমন আছ তেমনি থাকো
তবেই থাকবে বুকে বুকে—
আমিও তাই তোমায় ভেবে
গাঁথব ছড়া মুখে মুখে।
হারিয়ে যাওয়া দুয়ানিটি—
লাগছে তোমায় বড়ই মিঠি,
থাকলে ট্যাঁকে—ইটিসিটি
কিনে কবেই দিতাম ফুঁকে॥

মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সে টরে। সে

তা নয়, রূপচাঁদের ভয়ে থেকে ডানা যখন বেরুল, তখন রাত্রি অনেক নয়, নিজের অজ্ঞাতে চাঁদ উঠেছে। নিস্তব্ধ চতুর্দিক। হরসুন্দরবাবু একটা চাকর আর একটা টর্চ সঙ্গে দিয়ে ন। কিছুদূর এসে ডানা চাকরটাকে বললে, তুমি শোও গে যাও টর্চটা সঙ্গে থাকলেই আমি চ'লে যেতে পারব। চাকর চ'লে গেল। ডানা টর্চের বোতামটা টিপতে টিপতে অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে লাগল, অর্থাৎ চিন্তা করতে লাগল, এখন কোথায় যাওয়া যায়! হঠাৎ ঠিক করলে, নিজের বাসাতেই ফিরে যাবে। রূপচাঁদবাবুর ভয়ে গৃহত্যাগী হতে হবে নাকি! দেখাই যাক না ভদ্রলোকের দৌড় কতদূর! ফিরে এসে দেখলে, চাকরটা বারান্দায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে, আর কেউ কোথাও নেই। নিজের অজ্ঞাতসারেই সে যেন হতাশ হ'ল একটু। মনের নিভৃত প্রদেশে কে যেন আশা ক'রে বসেছিল যে, রূপচাঁদবাবু তার অপেক্ষায় এখনও অধীরভাবে পায়চারি করছেন মাঠে। তার পায়ের সাড়া পেয়ে চাকরটা উঠে বসল।

রূপচাঁদবাবুর চাকর এই চিঠিটা দিয়ে গেছে। জবাবের জন্যে অনেকক্ষণ ব'সে ছিল, এই একটু আগেই চ'লে গেল।

খামটা নিয়ে ডানা ঘরে ঢুকে পড়ল। লণ্ঠনটা উসকে চিঠিটা হাতে ক'রে ব'সে রইল খানিকক্ষণ। কি লিখেছেন ভদ্রলোক! যা লেখা সম্ভব তা তার অজানা নেই···হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। অনেকদিন আগে কথাটা সন্ন্যাসী বলেছিলেন। হাসিমুখেই বলেছিলেন—ওই রূপচাঁদবাবুর লালসা তোমার মনকেও প্রভাবিত করেছে। শুধু প্রভাবিত করে নি, আতঙ্কিত করেছে। আতঙ্ক আকাঙ্ক্ষারই আর একটা রূপ। যে লালসা ওঁর মনে জেগেছে তা তোমার মনেও সাড়া তুলেছে। কিন্তু যেহেতু তোমার সংস্কারের সঙ্গে এই সাড়ার বিরোধ আছে, তাই তুমি ভয় পেয়েছ, মিল থাকলে খুশি হতে···।

খামটা ছিঁড়তেই কয়েকখানা নোট বেরিয়ে পড়ল আর এক টুকরো কাগজ। রূপচাঁদবাবু লিখেছেন—

ডানা,

একটু আগে ঠিক করেছি, তুমি না ডাকলে আর তোমার কাছে যাব না। এখনও সে সিদ্ধান্ত থেকে বিচলিত হই নি। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ল, কাল সকালে তুমি সদরে যাবে আনন্দমোহনের 'বেল' নেবার জন্যে। তোমার হয়তো অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু আমি জানি পুলিস-সংক্রান্ত ব্যাপারে টাকা জিনিসটা দরকারী, তালা খুলতে হ'লে চাবি যেমন দরকারী। তোমার হাতে টাকা আছে কি না আমার জানা নেই। তাই আমার কাছে যা ছিল পাঠিয়ে দিচ্ছি। পরে ফেরত দিও। আমি নিজে পুলিস-আপিসের বড়বাবু, আমার দ্বারা যতটা করা সম্ভব, বলা বাহুল্য, তা আমি করব নিশ্চয়ই ; কিন্তু একটা কথা ভেবে মনে হচ্ছে, আমি ব্যর্থকাম হব। পুলিস যেখানে টাকার গন্ধ পায় সেখানে শুষ্ক খাতিরে কাজ করে না। অমরেশবাবু বড় জমিদার, তার ম্যানেজারকে তারা ফাঁসিয়েছে, অতবড় রুইকে তারা শুধু হাতে ছেড়ে দেবে ব'লে মনে হয় না। তবে সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র, তুমি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে নিজে যদি যাও, বঁড়শিটা হয়তো খুলে যেতে পারে। ইতি

আরসি

ডানা গুনে দেখলে পঞ্চাশ টাকার নোট আছে। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইল নোটগুলোর দিকে। তারপর সেগুলো আর একটা খামে পুরে খামটা ভাল ক'রে জুড়ে দিলে। চাকরটাকে উঠিয়ে বললে, জবাবটা রূপচাঁদবাবুকে দিয়ে আয়। চিঠিটা তাঁর হাতেই দিবি—

চাকরটা ফিরে এল একটু পরে। দেখলে ঘরের কপাট বন্ধ, ভাবলে মাইজী বোধ হয় শুয়ে পড়েছেন। সে যদি ভাল ক'রে দেখত তা হ'লে বুঝতে পারত যে, কপাটে খিল বন্ধ নেই, বাইরে থেকে তালা ঝুলছে। ডানা বেরিয়ে গিয়েছিল চরের দিকে।

ডানা টর্চটা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু টর্চের দরকার ছিল না। জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল চতুর্দিক। একা একা আপন

মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সে চরে। সে যে ঠিক সন্ন্যাসীর সন্ধান করছিল তা নয়, রূপচাঁদের ভয়ে ভীত হয়ে সে যে পালিয়ে এসেছিল তাও ঠিক নয়, নিজের অজ্ঞাতসারে নিজেকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিল সে। নিজের অজ্ঞাতসারেই তর্ক করছিল নিজের সঙ্গে। অতীতে যে জীবনকে সে পিছনে ফেলে এসেছে সে জীবনেরই পুনরাবৃত্তি তার ভবিষ্যৎ-জীবনে কি ক'রে আবার হবে, আবার নূতন ক'রে ভদ্রভাবে কোথায় সংসার পাতবে—এই অতি স্বাভাবিক চিন্তাটাও তার মনে সজাগ হয়ে ছিল না, কখনও থাকতও না। খরস্রোতা জীবননদীর তীরে ছোট একটি গাছের মত বেড়ে উঠেছিল সে, হঠাৎ ধস্ ভেঙে প'ড়ে গেছে নদীর স্রোতে। যে শিকড় আগে স্থাণু মাটি থেকে প্রাণরস আহরণ করত তা এখন করছে বহমান স্রোতের জল থেকে। প্রথম প্রথম কষ্ট হয়েছিল, এখন আর হয় না। ভেসে চলাটাকেই এখন স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। ভেসে এসেছে নূতন জগতে। নূতন জগতের বিজ্ঞানী কবি রূপচাঁদ সন্ন্যাসীকে ঘিরে ঘিরে স্রোতাবর্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার মন, কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছে না, দাঁড়াতে পারছে না। অস্থির মনও স্বপ্ন রচনা করে। তার মনও করছিল। বিজ্ঞানীকে কবিকে এবং রূপচাঁদকে কেন্দ্র ক'রে তিন রকম স্বপ্নলোক সৃষ্টি করেছিল তার কল্পনা, যদিও জ্ঞাতসারে তার মনে হচ্ছিল অন্যরকম। মনে হচ্ছিল, সন্ন্যাসীই বুঝি তার স্বপ্নের খোরাক জোগাচ্ছে। কিন্তু সন্ন্যাসীকে ঘিরে কোন বিশিষ্ট স্বপ্নলোক মূর্ত হয়ে ওঠে নি তার মনে। সে স্বপ্নলোক সৃষ্টি করবার উপাদানই পায় নি। ঘুরে ঘুরে তার কাছে এসেছে কিন্তু কিছুই সংগ্রহ করতে পারে নি। অমরেশবাবুকে ঘিরে যে স্বপ্নলোক সে সৃষ্টি করেছিল শ্রদ্ধাই তার প্রধান উপকরণ, কবিকে ঘিরে যে জগৎ সে সৃষ্টি করেছিল তাতে শ্রদ্ধার সঙ্গে ছিল কিছু অনুকম্পা, রূপচাঁদের জগতে ছিল রিরংসা। কিন্তু সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে ছিল কেবল কৌতূহল। কৌতূহল নিয়ে স্বপ্নজগৎ সৃষ্টি করা যায় না, স্বপ্নজগৎ সৃষ্টি করবার জন্যও উপকরণ চাই, কৌতূহল সে উপকরণ সংগ্রহের প্রেরণা দিতে পারে। সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে ডানার মনে যে কৌতূহল জেগেছিল,

সে কৌতূহলও সব সময়ে একাগ্র থাকতে পারছিল না। চরে এসে সে সন্ন্যাসীকে খুঁজছিল না। আপনমনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অথচ সন্ন্যাসী যে এখানে কোথাও আছেন এই ধারণাটা মনের প্রচ্ছন্নলোকে অস্পষ্টরূপে আভাসিত হচ্ছিল, একটা আবছা প্রত্যাশাও ছিল—হয়তো তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। জ্যোৎস্নালোকিত চরটাই কিন্তু পেয়ে বসেছিল তাব মনকে। একটা অপরূপ আবির্ভাব যেন তার সমস্ত চৈতন্যকে মুগ্ধ ক'রে দিয়েছিল। জ্যোৎস্না সে আগে অনেকবার দেখেছে, চরও দেখেছে, কিন্তু গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতার সঙ্গে আকাশ-ভরা নির্মল জ্যোৎস্না আব দিগন্তবিস্তৃত শুভ্র চরের এমন অপূর্ব সমন্বয় আর কখনও সে দেখে নি। আকাশ যেখানে চক্রবালরেখাকে স্পর্শ করেছে সেই দিকেই স্বপ্নাচ্ছন্নবৎ সে ধীবে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ চমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল। সমস্ত জ্যোৎস্না যেন তারস্বরে প্রতিবাদ ক'রে উঠল। দেখলে কলরব করতে করতে চরের উপর দিয়ে পাখী উড়ছে, মনে হ'ল চরটাই বুঝি বহু পক্ষীর রূপ ধ'রে অবাঞ্ছিত আগন্তুকের আগমনে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। অবাক হয়ে দাড়িয়ে রইল সে, তারপর সন্ন্যাসীকে দেখতে পেল। একটা বালুস্তূপের আড়ালে ব'সে ছিলেন তিনি, উঠে দাঁড়াতেই দেখা গেল। পাখীদের এই হঠাৎ চাঞ্চল্য কেন জানবাব জন্যেই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। ডানাকে তিনি দেখতে পেলেন, কিন্তু এগিয়ে এলেন না, কোনও সম্ভাষণও করলেন না। নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েই রইলেন। ডানাই এগিয়ে এল।

ও, আপনি এখানে ব'সে আছেন বুঝি? আপনাকে দেখতেই পাই নি। পাখীগুলোকেও দেখতে পাই নি। ওগুলো টিট্টিভ মনে হচ্ছে—

সন্ন্যাসী হেসে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, টিট্টিভই। তোমাকে দেখে ভয় পেয়েছে। আমি ওদের সঙ্গে ভাব ক'রে ফেলেছি।

ভাব ক'রে ফেলেছেন?

তোমার সঙ্গেও ভাব হয়ে যাবে যদি ওরা বোঝে যে, তুমি ওদের হিতৈষী।

সেটা কি ক'রে বোঝাব ওদের ?

আপনিই বুঝবে। মন অন্তর্যামী।

তা হ'লে এখনই বোঝা উচিত ছিল। আমি তো ওদের কোনও অনিষ্ট চিন্তা করি নি।

কিন্তু তোমার মত চেহারাওলা অনেকে করেছে। এই সেদিনই ভোরবেলা নৌকো ক'রে শিকারীরা এসেছিল হাঁসের সন্ধানে। হাঁসেরা অনেক আগেই চ'লে গেছে, অনর্থক কতকগুলো টিট্টিভকে মারলে ওরা।

মানা করলেন না আপনি ?

মানা করলে শোনে না কেউ। উপদেশও শোনে না। সবাই আপন প্রবৃত্তি অনুসারে চলে। আমাকে তুমি যদি বল—আপনি এমন ছন্নছাড়া জীবনযাপন করছেন কেন, বিয়ে ক'রে সংসারী হোন—তোমার এ উপদেশ আমি শুনব না।

সত্যিই এই ছন্নছাড়া জীবন ভাল লাগে আপনার ?

সন্ন্যাসী হাসলেন একটু। তারপর বললেন, ব'স। একটু আগে তুমি একটা অদ্ভুত রহস্যের দিকে ইঙ্গিত করেছ। না জেনেই করেছ বোধ হয়। ব'স, সেই বিষয়েই আলোচনা করা যাক। আলোচনা করলে ব্যাপারটা তোমার কাছেও বোধ হয় আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। পরিবেশটাও মনোমত হয়েছে, ব'স।

এই ব'লে চুপ ক'রে গেলেন তিনি। তলিয়ে গেলেন যেন কোথায়। তারপর বসলেন আস্তে আস্তে। ডানাও বসল। অনেকক্ষণ কোনও কথা হ'ল না। নীরবতা ক্রমশ অস্বস্তিকর হয়ে উঠল ডানার।

বললে, পাখিগুলো এইবার থিতিয়ে বসছে। খুব কাছেই বসেছে অনেকগুলো। ও-রকম ক'রে বসেছে কেন ?

ডিম পেড়েছে ওরা। ডিমে তা দিচ্ছে। রাত্রেই ওরা ডিমে তা দেয়। দিনে বড় একটা বসতে দেখি না। দিনের বেলা নদীর ওপর উড়ে উড়ে মাছ ধরে খালি—

ওদের ডিম দেখেছেন আপনি ?

হাত দিয়ে তুলে দেখি নি, দূর থেকে ব'সে ব'সে দেখেছি। দিনের বেলা আমিই তো ওদের ডিম পাহারা দি।

নিজের বিদ্যে জাহির করবার জন্যে ডানা বললে, ওরা বালির খাঁজে খাঁজে ডিম পাড়ে, নয়?

হ্যাঁ। কি ক'রে জানলে তুমি? এসেছিলে না কি কোনদিন?

বইয়ে পড়েছি। ওরা দিনের বেলা ডিমে তা দেয় না কেন জানেন? রোদে বালি এত তেতে যায় যে তা দেবার দরকারই হয় না। ওদের ডিম পাহারা দেবারও দরকার নেই, বালির সঙ্গে এমন মিশে থাকে যে বাইরে থেকে বোঝা যায় না।

ওদের দরকারের জন্যে পাহারা দিই না, পাহারা দিই নিজের প্রয়োজনে। আমি যে ওদের বন্ধু সেটা ওদের বোঝাবার জন্যে। ওরা সেটা বোঝে। সেদিন একটা অদ্ভুত কাণ্ড হয়েছিল।

কি?

ওই যে উঁচু বালির ঢিপিটা দেখছ, তার ওপারে কয়েক জোড়া বেশ বড় ধরনের টিট্টিভ আছে। টিট্টিভই বোধ হয়, বেশ বড় ঠোঁট, পিঠ আর ডানার উপরটা কালচে বাদামী, জলের ঠিক ওপর দিয়ে দিয়ে উড়ে যায়—

বুঝেছি, বোধ হয় স্কিমার (Skimmer)-

তা হবে। ওদের বাচ্চা হয়েছে ওখানে। দুপুরে ব'সে আছি সেদিন, হঠাৎ দু-তিনটে পাখি উড়ে এল, এসে আমার মাথার ওপরে ঘুরে ঘুরে চিৎকার করতে লাগল। প্রথমটা আমি বুঝতে পারি নি। তারপর মনে হ'ল পাখিগুলো আমাকে বোধ হয় বলতে চাইছে কিছু। উঠে দাঁড়ালাম। উঠে দাঁড়াতেই পাখিগুলো আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে ওই ঢিপিটার দিকে উড়তে লাগল। মনে হ'ল, আমাকে যেন ইঙ্গিত করছে অনুসরণ করতে। অনুসরণ করলাম। গিয়ে দেখি, একটা সাপ ওদের একটা বাচ্চাকে ধরেছে। তাড়া দিলাম, নড়ল না। তখন বাধ্য হয়ে একটা গাছের ডাল ভেঙে এনে মারতে হ'ল সাপটাকে—

কি সাপ ?

কোনও চেনা সাপ নয়।

আহা, কেন মেরে ফেললেন বেচারীকে! ও তো কোনও দোষ করে নি, নিজের খাদ্য সংগ্রহ করতে এসেছিল—

আর্তকে রক্ষা করা কর্তব্য—শাস্ত্রের এই উপদেশ। ভৃগুপত্নী আর্ত দৈত্যদের রক্ষা করতে গিয়ে ইন্দ্রের হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন—

ভৃগুপত্নী মানে ?

শুক্রের মা।

তাই বুঝি শুক্র দেবতাদেব ওপর চটা ?

হ্যাঁ। কিন্তু আমরা আসল প্রসঙ্গ থেকে ক্রমশ দূরে স'রে যাচ্ছি।

বলুন।

আমার মনে হচ্ছে, ব'লে কি-ই বা হবে! ভাবের সমুদ্রে কত ঢেউ তো উঠছে, প্রত্যেকটাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায়ও না, প্রকাশ করব . দরকারও নেই—

না না, বলুন তবু।

সন্ন্যাসী চুপ ক'রে গেলেন। অনেকক্ষণ চুপ ক'রেই রইলেন।

নীরবতাটা আবাব পীড়া দিতে লাগল ডানাকে।

বলুন না, কি বলতে চাইছিলেন।

তুমি তখন বললে, মন অন্তর্যামী, কিন্তু সে এক নজরে বন্ধু বা শত্রুকে চিনতে পারে না কেন ? কেন ভয় পায়, কেন সন্দেহের চক্ষে দেখে, কেন যাচিয়ে নিতে চায় ? ওটা একটা অদ্ভুত রহস্য। ওর আসল উত্তর কি জান ? অন্তর্যামীর শত্রু কেউ নেই, মিত্রও কেউ নেই, কারণ, এই নিখিল বিশ্বই অন্তর্যামী। সে-ই সব, তার আবার শত্রু-মিত্র কি ? তোমার ডান হাতটা কি তোমার মিত্র, না, তোমার ডান পাটা তোমার শত্রু ? ডান হাতও তোমার, ডান পাও তোমার, তুমিই সবটা। তেমনই বাইরে যা কিছু দেখছ, সবই অন্তর্যামী, তিনিই প্রকাশিত হয়েছেন নানা রূপে, তাঁর কাছে ভেদাভেদ নেই কিছু।

তা হ'লে আমাদের মধ্যে যে অন্তর্যামী আছেন, তিনি একজনকে শত্রু, একজনকে মিত্র মনে করেন কেন ?

ওইটেই তাঁর খেলা। অনেকে বলেন—লীলা।

তার মানে ?

তিনিই যুধিষ্ঠির, তিনিই দুর্যোধন, তিনিই বেদব্যাস, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ—মহাভারতের প্রত্যেকটি চরিত্রই তিনি। এ না হ'লে মহাভারতের কাব্য জমত না। মহাকবি তিনি, অনন্ত তাঁর কাব্য, সে কাব্যের প্রতি ছত্রে ছত্রে নিজেকেই মূর্ত করছেন তিনি নানা ভাবে, নানা রূপে, নানা ছন্দে—

বুঝতে পারছি না ঠিক।

আমিও পারি নি। আভাসে যতটুকু বুঝেছি বললাম। হয়তো ভাল ক'রে গুছিয়ে বলতে পারলাম না। কারণ ঠিক বুঝি নি। বুঝতে পারলেই তো মুক্তি !

কি বুঝতে পারলে ?

যে তুমিই সেই।

আবার নীরব হয়ে গেলেন সন্ন্যাসী। ডানাও চুপ ক'রে রইল।

মনে হতে লাগল, একটা অসীম পাথার যেন থৈ-থৈ করছে চারিদিকে।

[ক্রমশ]

"বনফুল"

বেতালের বৈঠকী

কে বলে তোমার কোন ধর্ম নাই, কে বলে নাস্তিক ?
উপাস্য দেবতা তব শরীরিণী, নয় কাল্পনিক।
নহ তুমি শাক্ত, শৈব, সৌর, বৌদ্ধ, গাণপত্য, জৈন,
খ্রীষ্টান বৈষ্ণব নহ, নহ ব্রাহ্ম, ধর্মে তুমি স্ত্রৈণ।

বেতালভট্ট

জগত্তারিণী পদক*

স্কুল-কলেজে পদক যারা পায় নি কোনদিন,
তাদের তরে এই পদকটি থাকাই সমীচীন।
পদকমালা যে বুকে রয় এই পদকটি তায়
ভিড়ের মাঝে হারিয়ে যাবে, চেনাই হবে দায়।
পরীক্ষাতে ফার্স্ট হয়ে মিলল পদক যার
সারা জীবন ধ'রেই সে পায় তারই পুরস্কার।
তিরস্কৃত জীবনভরই দিচ্ছি পরীক্ষাই,
তারই পুরস্কার কি পদক ষাটের পরে পাই ?
বৈতরণীর পথে ওটা পাথেয় হোক সাথে।
খেয়ার কড়ি চাইলে দেব কর্ণধারের হাতে।

শ্রীকালিদাস রায়

ধরিত্রী

সারাটা জীবন যারে যাও পায়ে দ'লে,
মরিবার পর নেয় সেই স্নেহে কোলে।

ছিদ্রান্বেষী

খানায় প'ড়ে অন্ধটা দেয়
লাঠিগাছের দোষ,
চক্ষুষ্মানও পড়ল সেথায়
দেখায় কারে রোষ ?

শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

---

* কবির ভাগ্যে এই বৎসরে এই পদক ঝুলিয়াছে। তাঁহার দশপদী কবিতাটি পড়িয়া মনে হয়, পদকটির নাম "বৈতরণী-পদক" হওয়া সমীচীন।—স. শ. চি.।

হ্যামলেট, ডেনমার্কের কুমার

৩য় দৃশ্য। পলোনিয়সের গৃহে একটি কক্ষ

[লেয়ার্টিস্ ও ওফেলিয়ার প্রবেশ]

লেয়ার্টিস্। মালপত্র উঠেছে জাহাজে। যাই তবে।
অনুকূল বায়ু আর তরী যদি মিলে
ঘুমিয়ে থেকো না বোন,
মাঝে মাঝে খবরটা দিও।

ওফে। খবর দেব না নাকি ?

লেয়া। হ্যামলেটের ভালবাসা,—
সে শুধু খেয়াল, খুশি, খেলা।
নবীন বসন্তাগমে ফুটে উঠে ফুল,
শোভাময়, স্থায়িত্ববিহীন,
অতি সুমধুর কিন্তু নহে চিরন্তন,
গন্ধ তার ক্ষণে আসে ক্ষণে চ'লে যায় ;
এর বেশি নহে কিছু।

ওফে। এর বেশি কিছুই কি নয় ?

লেয়া। ও-কথা ভুলিয়া যাও বোন।
মানুষের বৃদ্ধিশীল মানস-প্রকৃতি
কখনো বাড়ে না একা আকারে শক্তিতে ;
যেমন যেমন বাড়ে দেহ, সাথে সাথে
বেড়ে যায় মনের ও বুদ্ধির প্রসার।
হয়ত এখন ভালবাসে সে তোমায় ;
কোন মন্দ অভিপ্রায় অভিসন্ধি কূট
এখনো করে নি তার চিত্ত কলুষিত,
তথাপি আশঙ্কা রেখো,
মর্যাদার গুরুভারে সে চিত্ত নহে ত আত্মবশ।

সে যে নিজে নিজবংশগৌরবের দাস।
সাধারণ মানুষের মত
আপনি কাটিয়া লবে আপনার পথ,
সে উপায় নাই তার।
কল্যাণ ও নিরাপত্তা সমগ্র রাষ্ট্রের
নির্ভর করিছে এই নির্বাচন 'পরে;
রাজার বনিতা নির্বাচন,—
নিয়মিত হতে বাধ্য প্রজাদের মতে।
যদি বুদ্ধিমতী হও, অবস্থা বিচারে
যতটুকু বাক্যরক্ষা সম্ভব তাহার
সেইটুকু আস্থা রেখো প্রেম-নিবেদনে।
ডেনমার্কের প্রজাকুল যতটুকু দেবে স্বাধীনতা
তার বেশি পারে না সে যেতে।
শুনিয়া তাহার কণ্ঠে প্রণয়-গুঞ্জন
সহজেই যদি মুগ্ধ হয়ে—
আপন হৃদয় কর দান,
অসংযত কামনার ধৃষ্ট অনুনয়ে
যদি খুলে ধর তব কুমারী-প্রাণের
অমূল্য রতনরাজি, ভেবে দেখ—
কোথা রবে নারীত্বের মর্যাদা তোমার!
মনে ভয় রেখো বোন, মনে ভয় রেখো;
প্রাণ যতখানি চায়, তা হতে কিছুটা
পিছে থেকো, থেকো দূরে, পরম সংকটময়
মদনের তীক্ষ্ণ ফুলশরের বাহিরে।
যে কুমারী আকাশের চন্দ্র সূর্য ছাড়া
নিজরূপ দেখায় না কারে, সেই বুদ্ধিমতী।
সতীধর্মে কুৎসা লাগে অতি অল্লায়াসে;

বসন্তের শিশুপুষ্প না মেলিতে আঁখি
দুষ্ট কীট দংশয়ে তাহারে
প্রত্যুষের হিমসিক্ত কোরকেরই বুকে
প্রভাতের খর বায়ু আগে মৃত্যু হানে।
সতর্ক থাকিও বোন,—
আশঙ্কাই শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ যৌবনে,
শত্রু তো বাহিরে নাই, আছে নিজমনে।

ওফে। তোমার এ উপদেশগুলি
সতর্ক জাগিয়া রবে হৃদয়ে আমার।
কিন্তু ভাই তেমনি না হয়,—
কোন কোন ধর্মগুরু পরের বেলায়
দেখাইয়া দেয় পথ স্বর্গে যাইবার
উত্তুঙ্গ কণ্টকাকীর্ণ একান্ত বন্ধুর,
নিজে কিন্তু মত্ত রহি বিলাসে ব্যসনে
চ'লে যায় সুন্দর কুসুমকীর্ণ পথে
ভুলে যায় আপনার উপদেশ-বাণী।

লেয়া। না না, সে ভয় ক'রো না।
বিলম্ব হইল বহু।
এই যে পিতাও এসেছেন।
[পলোনিয়সের প্রবেশ]
দুবার আশিস পেলে দ্বিগুণ কল্যাণ।

পলোনিয়স। এখনো এখানে লেয়ার্টিস!
হুঁশ-পর্ব কিছু নাই?
যাও যাও, পাল তুলে দিয়েছে জাহাজে,
সবাই রয়েছে সেথা তব অপেক্ষায়।
এস, কল্যাণ হউক।
গোটা কয় উপদেশ দিতেছি তোমায়,

স্মৃতিপটে রাখিও মুদ্রিত।
মনে যা ভাবিবে তাহা আনিবে না মুখে,
যে ভাবনা অপক্ক এখনো
কার্যে পরিণত তারে করিবে না কভু
ঘনিষ্ঠ হইবে কিন্তু হ'য়ো না সুলভ।
যে সব সুহৃৎ আছে তব,
বান্ধবতা যাহাঁদের বহুপরীক্ষিত,
তাঁদের বাঁধিবে বুকে লোহার বন্ধনে ;
তাই ব'লে বন্ধুভাবে যে আসিবে কাছে
তরুণ অস্থিরমতি,
বন্ধু ব'লে তাহারেই ধ'রো না জড়ায়ে।
ভয় রেখো পা বাড়াতে বিরোধের মাঝে,
কিন্তু যদি একবার করহ প্রবেশ,
চলিবে এমন ভাবে,
বিরোধীরা তোমারেই যেন ভয় করে।
কান দিও সবাইকে, কণ্ঠ দেবে অতি অল্প জনে।
শুনিবে সবার কথা, নিজ কথা শোনায়ো না কারে।
কলের মতামত করিবে শ্রবণ,
নিজের সিদ্ধান্ত কিন্তু দিয়ো না সহজে।
সামর্থ্য যেমন তব কিনিবে পোশাক-পরিচ্ছদ,
বিলাসের বশীভূত হ'য়ো না তা ব'লে ;
মূল্যবান হোক সজ্জা, আড়ম্বর যেন নাহি থাকে।
পরিচ্ছদই মানুষের পরিচয় দেয়,
বিশেষত ফরাসী-সমাজে
মান্য গণ্য সম্ভ্রান্ত যাঁহারা
সুন্দর সুরুচিপূর্ণ পরিচ্ছদ মাঝে
বহন করেন নিজ শ্রেষ্ঠ পরিচয়।
অধমর্ণ, উত্তমর্ণ, কোনটা হ'য়ো না,

অর্থ বান্ধবতা দুইই খোয়া যায় ঋণে।
এই ঋণই বহি আনে অমিতব্যয়িতা।
সর্বোপরি জেনো,
রাত্রি যথা আসে নিত্য দিবসের পিছে,
এ কথা তেমনই সত্য—
আপনি আপন কাছে যদি হও খাঁটি
জগতে তোমারে মেকি বলিবে না কেহ।
মোর আশীর্বাদে
কথাগুলি গাঁথা থাক্ হৃদয়ে তোমার।
এস তবে।

লেয়া। রহিল চরণে তব বিদায়-প্রণতি।

পলো। যাবার সময় হ'ল,
অপেক্ষা করিছে তব পরিচারকেরা।

লেয়া। যাই তবে ওফেলিয়া,
যে কথা বলিনু আমি মনে রেখো বোন।

ওফে। যতদিন চাহ তুমি
ততদিন হৃদি হতে মুছিবে না তাহা।

লেয়া। তা হ'লে বিদায়। (প্রস্থান)

পলো। ওফেলিয়া, কি কথা সে বলিল তোমায়?

ওফে। শুনুন তা হ'লে, হ্যামলেটের সম্পর্কীয় কথা।

পলো। ভাল কথা মনে ক'রে দিলে।
শুনিনু, সম্প্রতি নাকি প্রায়ই তব সাথে
উদযাপন করে সে গোপন অবসর;
তুমিও সাক্ষাৎ কর স্বচ্ছন্দ স্বাধীন।
যা শুনেছি তাই যদি হয়,
সতর্ক করেছে তারা মোরে;
আমিও তোমারে বলি, বোঝ নাই তুমি
কি ভাবে রাখিতে হয়

আমার কৈন্তার আর তোমার সম্মান।
কি হয়েছে তোমাদের মাঝে
খুলে বল মোরে।

ওফে। সত্য পিতা, কিছুদিন হতে
বার বার মোরে তিনি
করিলেন অন্তরের প্রীতি-নিবেদন।

পলো। প্রীতি। তাই বটে।
সাংসারিক সঙ্কটের অভিজ্ঞতাহীন
কাঁচা বালিকারই মত কহিলে কথাটা।
বলিলে যে 'নিবেদন,'—
সেই নিবেদন তুমি কর কি প্রত্যয় ?

ওফে। প্রত্যয়ের কথা, পিতা, বুঝি না তো আমি।

পলো। বেশ, তবে বুঝাই তোমাকে।
মনে কর, তুমি যেন নিতান্ত শিশুটি,
খাঁটি ব'লে মেকি মুদ্রা
নিবেদন করেছে তোমায়।
এইবার বুঝিলে তো ?
নিবেদনকালে কিছুটা দুর্লভতর করিও নিজেরে।
তা না হ'লে, সেই যে কথায় বলে,
—এইভাবে ছুটায়ে ছুটায়ে
আমারেই লোকচক্ষে বোকা বানাইবে।

ওফে। পিতা, প্রেম-নিবেদন তিনি করেছেন মোরে
পরম নির্বন্ধভরে সম্ভ্রম-বচনে।

পলো। যা বলেছ, বচনই তা বটে !
ডাহা পাগলামি !

ওফে। তা ছাড়া, ধর্মের নামে দেবতার নামে
শপথ করিয়া বলেছেন,—
বাক্যরক্ষা করিবেন নিজ।

পলো। বন-কপোতীরে ধরা ফাঁদ পেতেছেন।
জানি আমি, রক্তের উত্তাপে
হৃদয় হইতে যত স্থলভ শপথ
রসনায় ভেসে উঠে যেন খৈ ফুটে।
ক্ষণিকের ফুলঝুরি, আলো বেশি তাপ কম,
দেখিতে দেখিতে দুইই নিবে ছাই হয়,
অগ্নি ব'লে, কন্যা, তারে করিও না ভ্রম।
কুমারীস্থলভ লজ্জাবশে
দেখাশোনা কম ক'রে কর আজ হতে।
চলিবে এমনভাবে, অনুনয়গুলি
অনুমতি হয়ে যেন না উঠিতে পায়।
কুমার হ্যামলেট,- -মনে রেখো সে হ'ল যুবক,
চরিবার ক্ষেত্র তার
তোমা হতে অনেক প্রসর।
সোজা কথা, ওফেলিয়া,
বিশ্বাস ক'রো না কোন শপথই তাহার।
শপথ, না, ছদ্মবেশী দালাল ওসব ;
ঘটাইতে দু পক্ষের অবৈধ মিলন,
স্থখসাধ্য করি প্রতারণা,
ধর্মকথা কয় বৃদ্ধা কুট্টনীর মতো।
সার কথা বাল ;—
অবসর মিলিলেই হইয়া মিলিত
হ্যামলেটকে কথা দেওয়া কিংবা কথা কওয়
আজ হতে চলিবে না আর
এ কথা খেয়াল রেখো কহিনু তোমায়।
এস মোর সাথে।

ওফে। পিতৃ-আজ্ঞা করিব পালন। (প্রস্থান)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

রাজারাম, পতিতপাবন সীতারাম”—অপূর্ব মধুর লাগতে লাগল তুলসীদাসের সেই সঙ্গীত, যে সঙ্গীত অনেক ঘাটের জল খেয়ে এখন—“ঈশ্বর আল্লা তেরা নামে” পরিণত হয়েছে। কিন্তু যেতে দাও সে কথা—

তাড়াতাড়ি উঠে জনার্দন ও সুকান্তকে টেনে তুলে মুখ-টুখ ধুয়ে ছুটে গেলুম সাধু মহারাজের ওখানে। সেখানে গিয়ে দেখি লোকে একেবারে ঘর ভরতি।

মহারাজের কপালে মুখে হাতে সব চন্দন মাখানো হয়েছে। তাঁর গলায় ফুলের মালা, পাশে বড়ে মহারাজ ব'সে আছেন, তাঁরও গলায় দেখলুম মালা ঝুলছে। মহারাজের বিছানায় নতুন চাদর পাতা হয়েছে—তাঁর পেছনে পাহাড়ের মতন উঁচু ক'রে বালিশ সাজানো রয়েছে। নর-নারী আসছে সাধুকে প্রণাম করছে—কেউ বা এক পাশে দাঁড়াচ্ছে; কেউ বা মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়েই আবার চ'লে যাচ্ছে। সাধু বাবা হাসি-মুখে সকলকেই আশীর্বাদ করছেন। আমরাও গিয়ে প্রণাম করতেই তিনি হাত তুলে সকলকে যেমন আশীর্বাদ করছিলেন, আমাদেরও তেমনই আশীর্বাদ করলেন। আর একদিকে চার-পাঁচজন লোক ব'সে রামনাম গান করছেন। বাড়ির মেয়েরাও অনেকে এসেছেন, আরও দু-একজন ক'রে আসছেন। আমরা কোথায় বসব—এদিক-ওদিক করছি, এমন সময় সেই ভিড়ের মধ্যে থেকে সদানন্দজী বেরিয়ে এসে আমাদের নিয়ে গিয়ে একেবারে সাধুর সামনেই বসিয়ে দিলেন।

কাল সাধু বাবাকে সকাল-সন্ধ্যায় দুবার দেখেছি—দুবারই তাঁকে ধীর, স্থির, শান্ত দেখেছি; কিন্তু আজ দেখে মনে হ'ল, তিনি যেন ছটফট করছেন। মুখে হাসি লেগে আছে বটে, কিন্তু কখনও বালিশে হেলান দিচ্ছেন, কখনও বা সামনে এগিয়ে এসে হাত তুলে লোককে আশীর্বাদ করছেন। মুখে হাসি সত্ত্বেও মনে হচ্ছে, কি যেন বিড়বিড় ক'রে ব'কে চলেছেন।

ক্রমে লোক আসা-যাওয়া ক'মে আসতে লাগল। শেষকালে সাধু মহারাজের শিষ্যরা, বাড়ির মহিলারা ও আমাদের মত মাত্র জন কয়েক

াড়া একে একে সকলেই বেরিয়ে চ'লে গেল। যাঁরা এতক্ষণ রামনাম গান করছিলেন, তাঁরা এবার জলদে শুরু করলেন। ঘরের ভেতরে আর সকলেই চুপচাপ, আমার দৃষ্টি সাধু বাবার ওপরে স্থির নিবদ্ধ। দেখলুম আস্তে আস্তে তাঁর দীপ্ত চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেল। পা দুটো তখনও আসন-পিঁড়ি ক'রে বসা। একবার সেই পেছনে বালিশের দেওয়ালে হেলান দিয়ে যেন আরাম ক'রে বসলেন। ইতিমধ্যে সেই রামনাম শেষ হয়ে গেল—ঘরের মধ্যে সুরের রেশ গুমরে গুমরে ফিরতে লাগল।

সকলে নিস্তব্ধ, কারুর মুখে কোনও কথা নেই, এমন সময় সেই অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতার মধ্যে বড়ে মহারাজ সেই প্রকাণ্ড একতারাটা তুলে নিয়ে কয়েকবার ঝঙ্কার দিয়ে গান শুরু করলেন—

দেখলুম, বড়ে মহারাজও গাইয়ে লোক। তাঁর কণ্ঠও শিক্ষিত ও সুললিত; কিন্তু বয়সের জন্যই হোক অথবা আসন্ন গুরুবিচ্ছেদ-বেদনায় হোক, প্রথমটা মনে হয়েছিল যেন তিনি কিছু অভিভূত হয়ে পড়েছেন। মিনিট কয়েকের মধ্যেই কিন্তু তিনি সেই বাধাটুকু কাটিয়ে উঠলেন।

বড়ে মহারাজ শুরু করলেন ভজন—কবীরের সেই বিখ্যাত গুরু-বন্দনার অনুকরণে তাঁর নিজের রচিত ভজন—হে গুরু, আমার মোহ নাশ করবার জন্য তুমি জ্ঞান-কাটারি দিয়েছ, জ্ঞানরূপ গৃহের চাবি তুমি আমার হাতে দিয়েছ। হে পিতা, তুমি তোমার এই অধম সন্তানকে অমৃত পান করিয়েছ। অমৃতপানে অনভ্যস্ত এই অধম কতবার অমৃত ভেবে বিষপান ক'রে অসুস্থ হয়েছে, তুমি তাকে বাঁচিয়েছ—হে পিতা, এই অধম সন্তানকে তুমি চরণে স্থান দিও। সংশয়ের ঘোর অন্ধকারে কতবার পথভ্রষ্ট হয়েছি, তুমি আমার হাত ধ'রে চালিত করেছ সত্যপথে। আমার হাতে সত্য ও জ্ঞানের বর্তিকা দিয়েছ—হে গুরু, তুমি আমায় ভুলো না, অসময়ে দেখা দিও। আমার জীবনের উষায় প্রদীপ্ত ভাস্করের মত উদয় হয়ে সারা দিনমান তুমি কিরণ বিকীরণ করেছ—এখন রাত্রির ঘনতমসা আমাকে গ্রাস করতে উদ্যত—হে গুরু, ত্রস্ত এই সন্তানকে

তুমি রক্ষা কর—তুমি যেখানেই থাক, তোমার মঙ্গলহস্তের অভয়স্পর্শ যেন পাই।

বড়ে মহারাজের সেই করুণ মিনতি শুনতে শুনতে অনেকেরই চোখ ভিজে উঠতে লাগল। মেয়েরা অনেকেই চক্ষু মার্জনা করতে লাগলেন—গায়কের কণ্ঠস্বরও আর্দ্র হয়ে উঠল। সাধু মহারাজকে দেখলুম সেইভাবেই হেলান দিয়ে শুয়ে আছেন—চক্ষু মুদিত, ঠোঁট দুটো যেন একটু ফাঁক হয়ে গেছে—নিস্পন্দ, নির্বাক।

বড়ে মহারাজ গেয়ে চললেন, তুমি আমার অন্তরে বাতি জ্বালিয়েছ। ঝড়ে দুর্যোগে এই দীপশিখাটিকে তুমিই রক্ষা করেছ—তুমি দেখ, শেষ পর্যন্ত যেন পারে উত্তরিতে পারি—হে গুরু, তুমি আমাকে চরণে রেখো, তুমি স্মরণে রেখো।

বড়ে মহারাজের গান শেষ হতে না হতে আবার রামনাম শুরু হ'ল, জয় জয় রাম—জয় জয় রাম। সকলেই, এমন কি মেয়েরা পর্যন্ত গলা দিলেন—জয় জয় রাম—জয় জয় রাম—

এই রকম বেশ কিছুক্ষণ চলার পর সাধু মহারাজের এক শিষ্য চীৎকার ক'রে উঠলেন, চ'লে গেছেন—চ'লে গেছেন।

আবার সকলে সেই সুরে শুরু করলেন, জয় জয় গুরু—জয় জয় গুরু—

শিষ্যরা গুরুর দেহটা বিছানা থেকে তুলে অন্যত্র শুইয়ে রাখলে। ঘরের সমস্ত বিছানা তুলে ফেলা হ'ল। প্রকাণ্ড ঘটির আকারের তামার চাদরে তৈরি ঘড়া ঘড়া গঙ্গাজল প্রাসাদের কোথা থেকে বাহকেরা সব ব'য়ে নিয়ে আসতে আরম্ভ করলে। এই কয় সপ্তাহ ধ'রে নাকি প্রতিদিন হরিদ্বার থেকে গঙ্গাজল এসেছে।

মৃতদেহকে বসিয়ে দুজন শিষ্য পেছন থেকে ধ'রে রইলেন আর দুজনে মিলে এক-একটা ঘড়া তুলে নিয়ে মৃতদেহের মাথায় জল ঢালতে লাগলেন। স্নানপর্ব শেষ হয়ে গেলে মৃতদেহে নতুন কাপড় পরানো হ'ল—চন্দন-তিলকও বাদ পড়ল না। মেয়েরা এবং আরও অনেকে ফুলের মালা পরিয়ে দিতে লাগল মৃতদেহের গলায়। তার পরে শিষ্যরা

মৃতদেহ ব'য়ে নিয়ে গেল বাগানের একদিকে। সেখানে গর্ত খুঁড়ে পোড়াবার জায়গা আগে থাকতেই ঠিক ক'রে রাখা হয়েছিল। দেখলুম, দমাদ্দম গাছ কাটা চলেছে—চন্দনকাঠও এল এক রাশি।

চিতা সাজিয়ে গুরুর মৃতদেহ চড়িয়ে দেওয়া হ'ল। বড়ে মহারাজ চিতায় প্রথম অগ্নিসংযোগ করলেন—তার পরে একে একে সব শিষ্যই পরে পরে আগুন দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে কাঁচা কাঠ ধু-ধু ক'রে জ্ব'লে উঠল—বোধ হয় ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল। আবার ঘড়া ঘড়া গঙ্গাজল ঢেলে শিষ্যরা চিতা নিবিয়ে দিলে।

সাধু মহারাজের শিষ্যরা ও অন্যান্য সকলে প্রাসাদের দিকে চ'লে গেল। আমরা ইঁদারার ধারে গিয়ে স্নান সেরে সদানন্দ মহারাজের খোঁজ করতে লাগলুম। কিন্তু কি আশ্চর্য! এতক্ষণ যেখানে লোকারণ্য ছিল, এখন সেখানে একজনকেও দেখতে পেলুম না। আমাদের খাওয়াবার জন্যে যেখানে দুবার নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেদিকটায় একবার যাওয়া গেল—সকাল থেকে পেটে কিছুই পড়ে নি, যদি খাবার-দাবার কিছু ব্যবস্থা হযে থাকে তা হ'লে খাওয়া যাবে, নয়তো সেখানে কোন লোকের দেখা পেলে সাধুরা কোথায় আছেন তার সংবাদ পাওয়া যাবে; কিন্তু সেখানে দেখলুম, সব ভোঁ-ভাঁ—কেউ কোথাও নেই। ফিরে চলেছিলুম, এমন সময় ভাগ্যক্রমে সদানন্দজীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাঁকে বললুম, আমরা এবার জয়পুরে ফিরে যাচ্ছি; কিন্তু যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা না ক'রে যেতে পারছিলুম না—যাক, ভাগ্যক্রমে দেখা হয়ে গেল।

সদানন্দজী বললেন, এখুনি কেন যাচ্ছেন? রাত্রে পথে কষ্ট হতে পারে। আজ মধ্যরাত্রে আমরা এখান থেকে বেরুব জয়পুরের দিকে—আপনারা আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন। আমরা উটের গাড়ি ক'রে যাব—যদি আমাদের সঙ্গে যান তো অনেক পরিশ্রম বেঁচে যাবে।

সদানন্দজী আরও বললেন যে, আজ তাঁদের গুরুর তিরোভাব হওয়ায় তাঁরা সকলে উপবাসী থাকবেন—সেই জন্যই সদাব্রত বন্ধ

আছে। আপনারা ইচ্ছা করলে বাজারে গিয়ে খাবার খেয়ে আসতে পারেন।

শহরের দিকে গাড়ি যাবে শুনে তো আমরা বেঁচে গেলুম। সদানন্দ মহারাজকে বললুম, আমরা আপনাদের সঙ্গেই যাব। কিন্তু অত রাত্রে আমরা খবর পাব কি ক'রে?

—আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। সময় হ'লে আমি নিজে আপনাদের ডেকে আনব।

সন্ন্যাসীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমরা কাল বিকেলে যে ন্যাড়া পাহাড়টার ওপর গিয়ে বসেছিলুম, তারই চূড়ায় গিয়ে বসলুম। সেদিন সকাল থেকেই হু-হু ক'রে বাতাস বইছিল, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের বেগও যেন বাড়তে আরম্ভ করলে। পাহাড়ের ওপর সেই এলোমেলো বাতাস লাগতে লাগতে আমার ঘর-ভোলা মন আরও উদাস হয়ে পড়তে লাগল। মনের মধ্যে সাধু মহারাজের সেই হাসিমাখা মুখ ও চোখ দুটো বারে বারে ভেসে উঠতে লাগল। মনে হতে লাগল, আড়াই শো বছর আগে এই মানুষটি এই দেশেরই কোন এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কোন্ পরশমণির ছোঁয়া পেয়ে তাঁর মনে আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল সেই অজানাকে জানবার? তারপর একদিন এই অজানা সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন গৃহের স্নেহবন্ধন পেছনে ফেলে। এই আড়াই শো বছরে ইতিহাসের কত পৃষ্ঠা লেখা হয়ে গেল, কত রাজা কত রাজ্য এল গেল—তার সন্ধান রাখবার অবকাশ ছিল না—যে আশা নিয়ে ঘরছাড়া হয়েছিলেন তাই লাভ করবার জন্য পর্বতে কন্দরে কত বিষম কৃচ্ছ্র সাধন ও তপস্যায় তাঁর দিন কেটেছে তা কে জানে! অবশেষে সেই পরমপদ লাভ ক'রে আজ স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ ক'রে তিনি চ'লে গেলেন। সকালে যিনি সশরীরে সকলকে আশীর্বাদ করেছেন, এখন তাঁর দেহভস্ম নিয়ে বাতাস খেলা করছে। এ কিছু নতুন ব্যাপার নয়, আবহমানকাল থেকে এই ব্যাপার ভারতভূমিতে হয়ে আসছে। এই আমার জন্মভূমি—আমার মাতৃভূমি। মনে হতে লাগল, আমি কোথাকার লোক, আমার

শিক্ষা সংস্কৃতি সবই ভিন্ন; কিন্তু কি ঘটনাচক্রের মধ্যে দিয়ে এইখানে এসে পড়লুম! এ সবই কি অকস্মাতের খেলা! না, এ সব আগে থেকেই অবধারিত ছিল! বিস্ময়—বিস্ময়—বড় বিস্ময় লাগে!

আমরা ঠিক করলুম, সাধু মহারাজার শিষ্যদের মতন তাঁর তিরোধান উপলক্ষ্যে আমরাও সেদিন উপবাস করব। সন্ধ্যা অবধি পাহাড়ে কাটিয়ে ফিরে এলুম দুদিনের সেই বাসায়, যেখানকার অভিজ্ঞতা সারা জীবন ধ'রে স্মৃতিফলকে জ্বলজ্বল করছে।

সন্ন্যাসীরা জয়পুর শহর অবধি গেল না। তারা আমাদের শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে নামিয়ে দিয়ে অন্য এক রাস্তায় চ'লে গেল। তারা বললে, এখনও কয়েক জায়গায় ঘুরে বর্ষার পরে হিমালয়ে ফিরে যাবে।

রাস্তায় নেমে আমরা পথের ধারে প্রকাণ্ড একটা গাছের নীচে গিয়ে বসলুম। কি জানি কেন, নিজেকে অত্যন্ত অসহায় ব'লে মনে হতে লাগল। রোগমূর্ছিত দেহে প্রথম চেতনা সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে যে অসহায়তা রোগীর মনকে আচ্ছন্ন করে অনেকটা সেই রকম। মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচিত সেই সন্ন্যাসীরা আমাদের এত আপনার হয়ে পড়েছিলেন! মাত্র কয়েক ঘণ্টা! কে জানে কত জন্ম-জন্মান্তরের আত্মীয়তার বন্ধন এই—তাই বুঝি তাদের সঙ্গে এই বিচ্ছেদের সময় আত্মীয়বিচ্ছেদের ব্যথা অনুভব করলুম। দেখতে লাগলুম জনমানবহীন পথ প'ড়ে রয়েছে জন্মান্তরের বিস্মৃতির মত। একখানা কালো মেঘের আড়াল থেকে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য বেরিয়ে আসতেই হঠাৎ তীব্র পিঙ্গল রৌদ্রচ্ছটায় সমস্ত পথ ঝলসে উঠল। মনে হ'ল, এ কোন্ আত্মবিস্মৃতির মধ্য দিয়ে আমার এতটা কাল কেটে গেল! ওই রৌদ্রচ্ছটার মতন তীব্র উজ্জ্বল এ কোন্ চেতনায় আমার অস্তিত্বটা ভাস্বর হয়ে উঠল? মনে হতে লাগল, ওই যে অদ্ভুত জীব অদ্ভুত গাড়িতে অদ্ভুত মানুষগুলিকে ব'য়ে নিয়ে চলেছে দূর থেকে ক্রমশই দূরে, তাদের সঙ্গে সংসারের কোন্ সম্বন্ধে আমি আবদ্ধ! হৃৎকমল ছিন্ন ক'রে নিয়ে ওই যে মানসহংস উড়ে চলেছে এক আকাশ থেকে আর এক আকাশে তার সঙ্গে মৃণালসূত্রের

সম্পর্ক তো এখনও ছিন্ন হয় নি—দীর্ঘ থেকে সেও তো দীর্ঘতর হ‍ে চলেছে। ওই যে মানুষটি কাল আড়াই শো বছর পরে ছিন্নবস্ত্রখণ্ডে মত অবলীলায় দেহটাকে ফেলে চ'লে গেলেন, তিনি কি এতদিন আমার শ্রদ্ধানিবেদনের প্রতীক্ষায় ছিলেন ?

পায়ে পায়ে সন্ন্যাসীদের গাড়িখানা একেবারে দৃষ্টির সীমারেখায় গিয়ে পৌঁছল। ওই দেখা যায়—এখনও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—ওই আর দেখা যায় না।

সূর্য ডুবে গেল, সেই কালো মেঘখানা পশ্চিমের রক্ত আকাশের আলোকে আড়াল ক'রে দাঁড়াতেই দেখতে দেখতে সন্ধ্যার অন্ধকার রাত্রির তারাগুঞ্জনে মুখর হয়ে উঠল।

জয়পুর শহরে যখন প্রবেশ করলুম, তখন বেশ রাত্রি হয়ে গিয়েছে প্রায় দুদিন পেটে কিছু পড়ে নি—ক্ষুধায় প্রাণ যায় অবস্থায় এক দোকানে ঢুকে কিছু খেয়ে আমাদের ডেরায় গিয়ে উপস্থিত হওয়া গেল। সেখানে জিনিসপত্র যা কিছু ছিল তা বগলদাবা ক'রে স্টেশনে গেলুম। একখানা ট্রেন সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল, একখানা খালি কামরা দেখে তাতে উঠে পড়লুম। টিকিট কাটবার ঝঞ্ঝাট নেই, কোথায় যাবে, কখন যাবে তাও জানবার কোন প্রয়োজন নেই। টিকিট-চেকারের কাছে ধরা পড়বার ভয়ে আত্মগোপন করবার সতর্কতা নেই। উঠেই মাথায় পুঁটুলি গুঁজে লম্বা হয়ে পড়া গেল—যেখানে যায়, যখন যায় কিংবা থাকে, ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমের কোলে আত্মসমর্পণ করলুম।

এই ভাবে রাজস্থানের শহর, জঙ্গল ও মরুভূমিতে পাক খেতে খেতে বর্ষণমুখর এক রাত্রে আহমেদাবাদে গিয়ে পৌঁছনো গেল। স্টেশনে পৌঁছবার অনেক আগেই বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। দেখলুম, প্রকাণ্ড ইস্টিশন, কিন্তু লোকজন বিশেষ কিছু নেই। আমাদের সঙ্গে আরও অল্প কয়েকজন যাত্রী নামল। নামতেই সামনেই দেখি, একজন টিকিট-কলেক্টর দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে আমরা স'রে পড়বার তাল খুঁজছি, কিন্তু সে অবসর না দিয়ে লোকটা যেন ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল—টিকিট।

—আজ্ঞে, টিকিট তো নেই।

—তবে কি আছে, বার কর। তিনজনের তিন টাকা লাগবে।

লোকটার আগ্রহ দেখে বেশ বুঝতে পারা যেতে লাগল যে, সেদিন তার বরাতে বিনা-টিকিটের যাত্রী মোটেই জোটে নি।

তিন টাকা চাইতে স্পষ্টই বলা গেল, হুজুর, তিন টাকা তো দূরের কথা, আমাদের কাছে তিনটে পয়সা নেই।

বেশ, তা হ'লে চল তোমাদের পুলিসের হাতে সমর্পণ করি—ছ মাস খাটলেই আক্কেল হয়ে যাবে।

বাঁচা গেল! অন্তত মাস ছয়েকের জন্য আহার ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেল মনে ক'রে লোকটার সঙ্গে সঙ্গে চেকারদের ঘরে যাওয়া গেল। সেখানে কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা একটা ছোট জায়গায় আমাদের ঢুকিয়ে দিয়ে সে একটা টুলে গিয়ে বসল। সেই ঘেরা জায়গাটায় দেখলুম, আরও দু-তিনজন লোক ব'সে রয়েছে। তাদের দেখে উত্তর-প্রদেশের লোক ব'লে মনে হ'ল। জিজ্ঞাসা করলুম, কি বন্ধু, কতক্ষণ হ'ল এসেছ?

একজন বললে, বিকেলের ট্রেনে।

আর একজন বললে, সন্ধ্যার ট্রেনে।

অপরাধ একই। বিনা টিকিটের যাত্রী সব। ওদিকে একটা বড় গোল টেবিল ঘিরে ব'সে আরও কয়েকজন চেকার হাসিঠাট্টা গান করতে লাগল। হঠাৎ একজনের দৃষ্টি আমাদের দিকে পড়ায় সে সঙ্গীদের বললে, আজকে জালে তো অনেক মাছ পড়েছে দেখতে পাচ্ছি।

গুজরাটী ভাষা শুনে শুনে তখন কিছু কিছু বুঝতে শিখেছিলুম। সেই লোকটা আবার বললে, এগুলিকে যথাস্থানে জিম্মা ক'রে দিয়ে জায়গা খালি কর না—আবার তো মেল আসছে—

আর এক ব্যক্তি বললে, দূর দূর! পুলিসের হাতে দিলে তারা বেশ ক'রে মেরে হাতের সুখ ক'রে ছেড়ে দেয়। আর তাদেরই বা দোষ কি বল? তিন দিন খরচ ক'রে খাইয়ে-দাইয়ে আদালতে নিয়ে যাবার পর হাকিম দেয় ছেড়ে—পুলিসের হাতে দেওয়ার চাইতে নিজেরাই

হাতের সুখ ক'রে নিই।—ব'লেই একটা চেকার সেই কাঠের রেলিংয়ের দরজা খুলে আমার সামনেই যে হিন্দুস্থানী লোকটি ব'সে ছিল তার চুল ধ'রে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে তাকে কিল লাথি মারতে লাগল ধড়াধ্বড়।—বাপ রে, সে কি মার! সেই মার দেখে আমাদের দিব্যজ্ঞান হয়ে গেল। আমরা ইতিমধ্যে গুজগুজ ক'রে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলুম যে, আমাদের মধ্যে একজনকেও যদি ওরা মারে তো আমরা তিনজনে মিলে সে ব্যক্তিকে আক্রমণ করব। চেকারদের টেবিলের ওপরে রুল, তা ছাড়া পাথর ও লোহার অনেকগুলো কাগজ-চাপা এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিল—ঠিক করলুম ওরই গোটা কয়েক তুলে নিয়ে বাগিয়ে ছুঁড়তে পারলে অন্তত দুটোকে নিশ্চিন্তপুরের কাছাকাছি পাঠাতে পারা যাবে। রোদে বৃষ্টিতে অনাহারে নিরাশ্রয় অবস্থায় ঘুরে ঘুরে, অনিদ্রায় পথশ্রমে আমাদের চেহারাগুলোও প্রায় খুনের মত হয়ে উঠেছিল। কখনো কোনো আয়নায় নিজেদের প্রতিচ্ছায়া দেখলে শিউরে উঠতুম। মাথার চুলগুলো রুক্ষ, প্রায় জট ধ'রে এসেছে, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, শরীর মেরে গেছে পাকৃতেড়ে—দেখে কখনো কখনো নিজেরাই হাসাহাসি করতুম আর বলতুম, আঃ, উন্নতি যা হচ্ছে সে আর ক'য়ে কাজ নেই—

যা হোক, ঠিক সেই সময় কোনো একটা বিশেষ ডাকগাড়ি স্টেশনে এসে পড়ায় চেকাররা সদলবলে স্টেশনের দিকে বেরিয়ে গেল। এদের ঘরেরই আর এক দিকে একটা দরজা দিয়ে স্টেশনের বাইরে যাওয়া যায় দেখে আমরা আর কালবিলম্ব না ক'রে সেই দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লুম—আমাদের দেখাদেখি অন্য আর যারা ধরা পড়েছিল তারা সবাই বেরিয়ে এল। শুধু যে ব্যক্তি মার খাচ্ছিল সে ব'সে রইল, বোধ হয় আরও কিছু দক্ষিণার প্রতীক্ষায়। একেই বলে, এক যাত্রায় ভিন্ন ফল।

. বাইরে তখন মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে, অনেক লোক স্টেশনের গাড়ি-বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সেখানে দাঁড়াতে আমাদের সাহস

হ'ল না। পাছে আবার ধরা পড়ি, সেই ভয়ে বৃষ্টির মধ্যেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়া গেল।

ঝম্ ঝম্ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে, পথে লোকজন নেই, রাস্তার বাতিগুলো পর্যন্ত বৃষ্টির ঝাপটে ঘোলা হয়ে উঠেছে। এই আলো-আঁধারি অস্বচ্ছতার ভেতরে সেই অপরিচিতা নগরীর সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটল।

প্রায় এক পোয়া পথ এই ভাবে চ'লে পথের ধারে একটা সাজানো চক্‌চকে চায়ের দোকান দেখতে পেয়ে সেখানে গিয়ে ঢুকলুম। বেঞ্চিতে ব'সে তিন কাপ চায়ের অর্ডার করা গেল। সামনেই একখানা বড় আয়না টাঙানো ছিল, তাতে আমাদের চেহারা দেখে তো পরম পুলকিত হলুম। একে সেই মূর্তি, তার ওপর বৃষ্টিতে ভিজে যেন সে রূপ একেবারে অপরূপে দাঁড়িয়েছে। চা-ওয়ালারা কিছুক্ষণ আমাদের সেই বৃষ্টি-ভেজা নব কলেবর দেখে নিজেদের মধ্যে কি সব আলোচনা ক'রে বললে, চা নেই, রাত্রি হয়ে গিয়েছে, এখন আর চা পাওয়া যাবে না—উঠে যাও।

দোকানের লোকগুলো যে রকম ভাষা প্রয়োগ ক'রে এবং যে ভাবে দোকান থেকে আমাদের তাড়িয়ে দিলে তাতে অন্য কোনও দিন হ'লে হয়ত আমরা কিছু প্রতিবাদ করতুম; কিন্তু তখন বিনা টিকিটে রেলে চড়ার অপরাধ সম্বন্ধে মনটা খুবই সজাগ থাকায় আর বৃথা বাক্যব্যয় না ক'রে সেখান থেকে নেমে পড়া গেল। খানিক দূর গিয়ে একটা অপেক্ষাকৃত গরিব দোকানে জিজ্ঞাসা করলুম, চা পাওয়া যাবে?

দোকানদার বেশ ভদ্রভাবে আমাদেব ভেতরে আহ্বান করায় সেখানে ঢোকা গেল। তিন কাপ চায়ের অর্ডার করা মাত্র চা এসে হাজির হ'ল। বেশ ভাল চা, দাম দু-পয়সা ক'রে কাপ।

চা খাচ্ছি এমন সময় দোকানদার জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের উগ্‌রা শির কেন?

প্রথমটা তার প্রশ্ন বুঝতেই পারলুম না। আবার জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের মাথা খালি কেন?

হঠাৎ এ প্রশ্নের কি জবাব দেব তা ঠিক ক'রে উঠতে পারলুম না। এমন একটা প্রশ্ন ভবিষ্যতে কোনও দিন ওঠবার সম্ভাবনা আছে এমন চিন্তাও মনের মধ্যে কখনও জাগে নি। ভেবে-চিন্তে বলা গেল যে, আমাদের দেশের লোক মাথায় টুপি ব্যবহার করে না।

জবাব শুনে তারা আবার প্রশ্ন করলে, কোন্ দেশের লোক তোমরা?

এই প্রশ্নের মধ্যে একটা সুর প্রচ্ছন্ন ছিল। যেটাকে সরল করলে বলতে হয়—সে কোন্ অসভ্য দেশ, যেখানকার লোকে মাথা খালি রাখে!

বললুম, আমরা বাংলা দেশের লোক। বাংলা দেশের লোক শুনে দোকানের খদ্দেররা পর্যন্ত হুমড়ি খেয়ে এগিয়ে এসে আমাদের নিরীক্ষণ করতে লাগল। তারা নিজেদের মধ্যে আমাদের সম্বন্ধে আলোচনাও করলে কিছুকাল। বেশ বোঝা গেল যে, বাংলা দেশের জীবগুলি সম্বন্ধে তাদের বিশেষ কৌতূহল আছে। আমরা জিজ্ঞাসা করলুম, তোমরা কি ইতিপূর্বে বাংলার লোক দেখ নি?

দোকানদার বললে, না। তবে শুনেছি এখানে জনকয়েক বাংলা দেশের লোক কাপড়ের কলে কাজ করে, কিন্তু তাদের চোখে দেখি নি।

পঞ্চাশ বছর আগে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে জানাশোনা খুবই কম ছিল। বাংলা দেশের শহরের লোকেরা জানত বেহারী মাড়োয়ারী ও ওড়িয়াদের। বেহারীদের বলা হ'ত খোট্টা, মাড়োয়ারীদের মেড়ো ও উড়িষ্যাবাসীদের উড়ে বলা হ'ত। বিহার, উত্তর-প্রদেশ, পাঞ্জাব ও মাড়োয়ারীদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা খুব কম লোকেই বুঝতে পারত। তেমনই উড়িষ্যা, অন্ধ্র, মাদ্রাজ, মহীশূরবাসী সকলকেই ওড়িয়া ব'লে মনে করা হ'ত। খুব শিক্ষিত লোক ছাড়া এদের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারত না।

স্বদেশী আমলের পর থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোকদের মধ্যে পরস্পরের জানাশোনা বাড়তে থাকে। আজ ভারতের যে সব প্রদেশের লোক বাঙালীর নাম শুনলেই উদ্যতমুষল হয়ে ওঠেন তাঁদের

। ার্থে নিবেদন করছি যে, এই বাঙালীরাই সর্বপ্রথম ভারতের সমস্ত
দশকে একত্রে গাঁথবার চেষ্টা করে—তাদের উপন্যাসে, কাব্যে ও গানে।
যাই হোক, কিছুক্ষণ চায়ের দোকানদারের সঙ্গে আলাপের পর
ত পারা গেল যে, বাংলা দেশের লোকের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা আছে
, কিন্তু যারা মাছ খায় তারা ইত্যাদি ইত্যাদি—। ওইটুকু সময়ের
্যই বুঝে নিতে দেরি হ'ল না যে, সেখানে ছুৎমার্গ খুবই প্রবল।

এদিকে রাত্রির জন্য আশ্রয় একটু চাই। নতুন জায়গা, পথে প'ড়ে
কা চলে না। ওদিকে বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় দোকানদার দোকান বন্ধ
াবার ব্যবস্থা করছে দেখে আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, এখানে রাত্রে
কবার মতন কোন জায়গা টায়গা আছে?

ওঃ, ঢের।—ব'লেই সে দোকানের একটি ছোট ছেলেকে কি
লে। তার পরে আমাদের বললে, আপনারা এর সঙ্গে যান।

ছেলেটি দোকানের কাছেই আমাদের একটা বাড়িতে নিয়ে গেল।
টা ঠিক হোটেল কি বা ধর্মশালা না হ'লেও সেখানে ঘর ভাড়া পাওয়া
। সেইখানে একটা যাচ্ছেতাই ঘরে কোন রকমে রাতটা কাটিয়ে
ওয়া গেল।

সকালবেলা পরামর্শ ক'রে ঠিক করা গেল যে, সেই দিনই সুকান্তর
ই দাদার সঙ্গে দেখা ক'রে কাজকর্মের একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেলব।
দকে আমাদের ধুতি জামা সব ছিঁড়ে গিয়েছিল, ওদিকে বিস্কুটের টিনও
য় খালি। সুকান্তর দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আগে পরিচ্ছদের
কটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার মনে ক'রে বাড়িওয়ালাকে তার প্রাপ্য
িয়ে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লুম।

বেশ মনে পড়ে, কয়েকটা দোকান ঘুরে আমরা তিন জোড়া ধুতি ও
নটে পকেটহীন সেই দেশীয় জামা খরিদ করলুম। এই আহমেদাবাদ
হরে একটি নতুন রকমের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা গেল, যা ইতিপূর্বে
রতবর্ষের অন্য কোন শহরে হয় নি। আমরা দোকানে জিনিস কিনতে
ক দোকানদারকে বললুম, ধুতি দেখি।

দোকানদার ধুতি দেখাবে কি, সে অবাক হয়ে হাঁ ক'রে আমাদেরই দেখতে লাগল। যে ভাষার মাধ্যমে এতদিন আমাদের ভাব ও অভাবের আদান-প্রদান চলেছিল, দেখা গেল এখানকার লোক সে ভাষা একদম বুঝতে পারে না। সেখানকার জনসাধারণ হিন্দী ও উর্দু বোঝা তো দূরের কথা, শোনে নি বললেও চলে—বরঞ্চ ইংরিজী বললে তার চেয়ে বেশি বুঝতে পারে। তার ওপর আমাদের চেহারাই তাদের কাছে একটা দ্রষ্টব্য জিনিস হয়ে দাঁড়াল। আমরা দোকানদারকে বলি, কি রকম জামা আছে দেখাও দিকিন! দোকানদার হাঁ ক'রে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। অনেক বকাবকির পর হয়তো বললে, তোমাদের মাথায় টুপি নেই কেন?

ভ্যালা বিপদেই পড়া গেল! যা হোক, অনেক কষ্টে ধুতি জামা কিনে তো রাস্তায় বেরিয়ে পড়া গেল। কিন্তু পথ চলব কি! চলতে চলতে দেখি, রাস্তার লোক আমাদের দেখে দাঁড়িয়ে যায়—অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কেউ বা সাহস ক'রে গুজরাটী ভাষায় আমাদের মস্তকের টুপিহীনতার কথা জিজ্ঞাসা করে, কোথাও বা নিজেদের মধ্যে এই অত্যাশ্চর্য কাণ্ডের আলোচনা করে।

দু-চার জন রাস্তার লোককে আমাদের লক্ষ্যস্থানের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলুম, অবিশ্যি সঙ্গে সঙ্গে উগ্রা শিরের কারণও বলতে হ'ল। প্রায় ঘণ্টা দুই রাস্তায় ঘুরে ঘুরে গলির গলি তস্য গলির মধ্যে প্রকাণ্ড একটা বাড়িতে এসে পৌঁছলুম। এখন আহমেদাবাদে কি রকম হয়েছে জানি না, সে সময় দেখেছি অধিকাংশ বাড়ির কাঠামোটা ইট কিংবা পাথর দিয়ে তৈরি হ'লেও প্রচুর পরিমাণে কাঠ ব্যবহার করা হ'ত। অনেক বাড়িতে কাঠের থাম, বাহারের জন্য কাঠের কার্নিশ এবং নানা-রকম খোদাই কাঠের ব্যবহার দেখেছি। খুব সম্ভব, কাঠের এই প্রাচুর্যের জন্য সেখানে কাঠ-বেরালের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। এখনকার কথা ঠিক বলতে পারি না, তবে তখনকার দিনে বিহার, উত্তর-প্রদেশ প্রভৃতি দেশে মাছির উপদ্রব যত ছিল, আহমেদাবাদে কাঠ-বেরালের উপদ্রব তার চেয়ে কিছু কম ছিল না।

যা হোক, আমরা তো নানা রাস্তা ঘুরে ঘুরে বেলা প্রায় দশটা নাগাদ সেই বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। প্রকাণ্ড বাড়ি—একতলাটা খাঁ-খাঁ করছে। কেউ কোথাও নেই। বেরিয়ে এসে আবার পাড়ার লোকদের জিজ্ঞাসা করায় তারা বললে, সিঁড়ি দিয়ে সোজা তেতলায় উঠে যাও। সিঁড়িটা অত্যন্ত পুরনো, বোধ হয়, পঞ্চাশ বছর ধ'রে ধুলো জ'মে তার ওপরে পুরু আস্তরণ প'ড়ে গিয়েছে। পরে শুনেছিলুম, বাড়িটা ভুতের বাড়ি, অনেক দিন ধ'রে খালি প'ড়ে ছিল—ওখানকার কোন এক ধনী শেঠের বাড়ি। সে ব্যক্তি দয়া ক'রে বাঙালী ছাত্রদের থাকতে দিয়েছে—ভাড়া-টাড়া লাগে না।

(ক্রমশ)

"মহাস্থবির"

পথিক

পথিকেরা সব এসেছিল কাল রাতে,
ছায়ার মতন শরীর তাদের দু চোখে তাদের ছায়া
পথিকেরা সব এসেছিল কাল রাতে।
কত না যুগের হারানো গন্ধে মদির ওষ্ঠাধর
চুলের গভীরে থমকানো কত রাত
অশ্বক্ষুরের ধুলো-ওড়া কত বিস্মৃত সরণীর
স্মৃতি-চঞ্চল চপল চরণ মুহূর্তে পেল ভাষা
কত নি ঝুম অরণ্যচারী স্বপনবিহারী মন
কত অতৃপ্ত সুপ্ত চোখের নীরব সম্ভাষণ
এই সব নিয়ে পথিকেরা এসেছিল।

কত শতাব্দী ছায়াময় হ'ল নিশ্বাসে সুগভীর
দুর্গ-প্রাকারে অযুত দ্বারীর সতর্ক প্রহরায়
প্রাচীন সে কোন সম্রাট যেন হর্ম্যসৌধচূড়ে

স্বপ্নমদির সসাগরা পৃথিবীর,
মেঘের বরণ রাজকন্যার গজমতি-জ্বলা চুলে
ঝ'রে ঝ'রে পড়ে হলদে চাঁদের আলো ;
কোথায় সে কোন্ সপ্ত-ডিঙায় ভিনদেশী সদাগর
শঙ্খধবল দারুচিনি আর প্রবালের মালা নিয়ে
বেসাতির শেষে ফিরে যেতে যেতে বলে—
"এমন দেখি নি কমলের মাঝে কমলের মত মেয়ে
পদ্মরাগের মত যেন সেই মেয়ের দু চোখ জ্বলে।"
ছায়া-ছায়া ঘুম নেমে আসে চোখে
ছায়ার মতন এ দেহ বিলয় খোঁজে ;
কাদের দু চোখে ঝড়ের মেঘের জমানো অন্ধকার ;
দরজা খুলেছি, তারপর শুধু ডেকেছি কাতরে, "এস
এস ফিরে এস, ফিরে এস হৃদয়েতে।"
নদীর ওপারে ঝড় ওঠে ক্রমে
আকাশ পৃথিবী ইতিহাস হয়ে অনন্তকাল কাঁদে
তারপর সেই পথিকেরা কথা বলে ,
তারা বলে, "এস কঙ্কালীতলা ছেড়ে
কি আছে এখানে বল ?
হে পথিক, এস এস
আমরা তোমাকে শতাব্দী পারে খুঁজি।"
ঘন হয় রাত, নিশ্বাসে কার তুহিন তুষার ঝরে,
ছায়ার মতন শরীর তাদের দু চোখে তাদের ছায়া,
ছায়া-ছায়া ঘুম নেমে আসে চোখে
ছায়ার মতন এ দেহ বিলয় খোঁজে ;
মনে পড়ে যেন পথিকেরা এসেছিল
পথিকেরা সব এসেছিল কাল রাতে ॥

শ্রীপ্রণব মিত্র

ধনপতি পাগ্‌লার ডায়েরি

[অনবগত পাঠক-পাঠিকাগণের অবগতির জন্য সংক্ষেপে একটি ভূমিকা প্রকাশ করিবার প্রযোজন বোধ করিতেছি। পাঠক পাঠিকারা নিজগুণে ধৈর্যধারণ করত ক্ষমা করিবেন।........

ধনপতি পাগলা জন্মাবধি আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু। সুখে দুঃখে, শয়নে স্বপনে, আহারে বিহারে, আরামে ব্যারামে, দেশে বিদেশে, শীতে গ্রীষ্মে, ঘরে বাহিরে ধনপতির সহিত কত দিন কত রাত্রি একা অতিবাহিত করিয়াছি, তাহা শুনিলে আপনারা বিস্ময়ে অভিভূত হইবেন। ইহা একমাত্র আমার পক্ষেই সম্ভব, এবং এইরূপ একাত্মভাব আছে বলিয়াই যাদ ধনপতিকে আমি যতটা চিনি ততটা অন্য কেহ চেনে না।

আমি ধনপতির একমাত্র অন্তরঙ্গ সঙ্গী। অন্য সবাই বহিরঙ্গ। আর কাহারও সঙ্গে সে বড় একটা মেশে না। তাই কেহ কেহ ভাবেন—ধনপতি দাম্ভিক, অনেকে ভাবেন—ধনপতি পাগল।

পাগলামি ঠিক কাহাকে বলে বা বলা উচিত জানি না। কেহ কেহ বলেন, অপ্রকৃতিস্থ স্বভাব নামই পাগলামি। কিন্তু অপ্রকৃতি জানিতে হইলে আগে প্রকৃতি জানা দরকার। আর মজা এই যে, ধনপতি যখন নিজের বিশিষ্ট প্রকৃতিতে থাকে তখনই লোকে তাহাকে বেশি পাগল বলিয়া ও ভাবিয়া থাকে।

লোকের সঙ্গে মিশিবার ঝোঁক বা স্বাভাবিক ক্ষমতা ধনপতি পাগলার নাই। কিন্তু বহু লোক দেখিবার স্বভাব, সুযোগ এবং চোখ তাহার আছে। তাহার দুইটি চোখ ক্যামেরার দুই লেন্সের মত—এই লেন্সের মাধ্যমে তাহার মনের ফিল্মে অসংখ্য ফোটো উঠিয়া তাহা স্মৃতির গুদামে জমা হইতেছে। তাহার দুইটি কান অত্যনুভূতিপ্রবণ শব্দগ্রাহক যন্ত্র, ধনপতি যতক্ষণ জাগ্রত থাকে ততক্ষণ সদাজাগ্রত।

কিন্তু এত বাজে কথা বলিবার বোধ করি কোন প্রযোজনই ছিল না। শুধু এটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইত যে, ধনপতি পাগলা প্রায় নিয়মিতভাবে যে ডায়েরি লিখিয়া থাকে তাহা সাধারণ চলতি অর্থে ডায়েরি নহে। ডায়েরিতে সে যাহা খুশি তাহাই লিখে—ঘটনা, দুর্ঘটনা স্মৃতিকথা তত্ত্বকথা সত্যকথা বানানো কথা চরিত্র চিত্র, ধোপার হিসাব, উদ্ধৃতি, টীকা টীপ্পনী ইত্যাদি, কোন বাঁধাধরা ফরমুলা মানে না।

ধনপতির সম্পূর্ণ ডায়েরি প্রকাশ করা সম্ভব নহে, সম্ভব হইলেও আপনারা ক্ষেপিয়া উঠিতেন। তাই বাছিয়া বাছিয়া কিছু কিছু অংশমাত্র আপনাদের দরবারে পেশ করিব। ধনপতির ভাষা ও ভঙ্গীর কিছুমাত্র পরিবর্তন করিব না। কোথাও কোথাও হয়তো ভাব ভাষা নিতান্তই অবিশ্বাস্য ও খাপছাড়া মনে হইবে—কিন্তু একটু তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়া দেখিলেই দেখিবেন, কিছুই অবিশ্বাস্য বা খাপছাড়া নহে। এইরূপে মন তৈয়ারি করিয়া লইলে ধনপতির ডায়েরি পাঠ ক্রমেই অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া আসিবে।]

একটি গাধার কাহিনী

আজ বিষণ্ণ সন্ধ্যায় থেকে থেকে মনে পড়ছিল একটি গাধার বিষণ্ণ ছুটি চোখ। মন চ'লে যাচ্ছিল অতীতে।

অনেক রাত আগে। গাধাটি সার্কাসের খেলা দেখাচ্ছিল। বাঙালীর গৌরব প্রোফেসর ট্যালপেট্রোর গ্রেট রয়েল বেঙ্গল সার্কাস টালার ময়দানে। আমি গ্যালারিতে, আরও অনেকে গ্যালারিতে। সামনের চেয়ারগুলোও ভরতি—তাদের ভেতর সাদা কালো সায়েব, মেমসায়েব, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত নানা জাতের সার্কাস-আমোদী লোক। হাঁ ক'রে খেলা দেখে টিকিটের পয়সা উসুল করছে সবাই।

গ্রেট রয়েল বেঙ্গল সার্কাসের খেলার ফর্দ লম্বা বা পুরুষ্টু নয়, লম্বা আর পুরুষ্টু হচ্ছে দলের 'লায়ন-টেমার' (lion tamer) ধিঙ্গী ফিরিঙ্গী মেয়েটি। আঁটসাঁট ফরসা গড়ন, আঁটসাঁট হালকা সার্কাসী পোশাক পরা। হাতে লম্বা লকলকে সিংহ-পোষমানানো চাবুক। সিংহটি নেই, ছুটো খাঁচা শূন্য ক'রে চ'লে গেছে। চ'লে গেছে 'লায়ন', র'য়ে গেছে 'টেমার'। প্রোফেসর ট্যালপেট্রোই দলের আর সবার চাইতে বেশি মাইনে দিয়ে রেখেছেন তাকে। সিংহটিকে হয়তো বড় ভালবাসতেন, তার স্মৃতি ভুলে যেতে চান না। সেই সিংহস্মৃতি-বিজড়িতা মেয়েটির 'রেবেকা' নাম সার্কাস-দেখিয়েদের মুখস্থ। খ্রীষ্টান বা ইহুদী হবে আর কি। চাবুকের মত চটপটে, বেপরোয়া। ভ্রূ দিয়ে জানে ভ্রূকুটি করতে, ভ্রূক্ষেপ করে না কাউকে। 'লায়ন' গেলেও তার 'টেমার' জাঁকিয়ে রেখেছে গ্রেট রয়েল বেঙ্গল সার্কাস। খ্রীষ্টান বা ইহুদী রেবেকা।

চাবুক দিয়ে রেবেকা দীপ নেবানোর খেলা দেখাল—যে চাবুক হাতে নিয়ে এককালে সে সিংহের খেলা দেখাত। পাঁচটা খুঁটির মাথায় পাঁচটা মোমবাতি জ্বলছে, দীপালি রাতের দীপমালার মত। রেবেকার হাতের চাবুকের আওয়াজঃ শপ্ শপ্ শপ্ শপ্ শপ্। মোমবাতিগুলো ঠায় আস্ত দাঁড়িয়ে রইল; শুধু দীপের শিখাগুলো নিবে গেলঃ দপ্ দপ্ দপ্ দপ দপ্। চটাপট হাততালিতে সামিয়ানা কেঁপে কেঁপে উঠল।

চাবুকের ঘায়ে নিবে গেল দীপশিখাগুলো। তবু এক ফোঁটা ক্ষোভ নেই কোন চোখে। চাবুক চালালে যে, তার জন্যে ফুটে আছে বাহবার ফুল।

সার্কাসের মালিক ভজহরি তলাপাত্র ওরফে প্রোফেসর ট্যালপেট্রো চাদনির বুকখোলা কালো কোটের বুকে এক গাদা সাদা মেডেল ঝুলিয়ে এসে জানানী দিলে, এইবারে শুরু হবে গাধার অতুলনীয় খেলা—"দ গ্রেট ডাংকি অ্যাক্ট' তুনিয়ার সার্কাসের ইতিহাসে ও ভূগোলে সর্বপ্রথম এবং একমাত্র। পরিচালনা করবেন 'দি গ্রেট লায়ন-টেমার' মিস রেবেকা। প্রচণ্ড হাততালি। সার্কাসের ফোকাস-আলো এসে মুখে আলো দিলে ফিরিঙ্গী ধিঙ্গীর। সে মুখে আলতা-রাঙানো আল্‌তো হাসির অট্টভঙ্গী।

সার্কাসের প্রায়-গোল পৃথিবীর মত উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা আসরে গাধাটির প্রবেশ দেখা গেল। সে এল সামনের তুটি পা বাঁধা, লাফাতে লাফাতে। গলায় বাঁধা দড়ির এক মাথা, তার বাকি মাথাটা সার্কাসের ভাঁড়ের হাতে। ভাঁড় এল আগে আগে, ভাঁড়ামি করতে করতে। পরনে নানা রঙের নানা তালির পোশাক, গাধাটি দিগম্বর। হাততালি। হাততালি।...আরো হাততালি।

গাধার মুখে আলোর ফোকাস ফেলে নি কেউ। তবু দেখতে পেলাম, তার চোখ তুটি ছলছল, শুকনো কান্নায় ভরা।

আমার তু পাশের লোকের মুখে আগাম বর্ণনা শুনে বোঝা গেল, এবারকার খেলাটা খুব 'ইয়ে' হবে। এঁরা এই খেলাটা দেখবার জন্যেই বার বার আসেন।

রেবেকা চাবুক হাতে দাঁড়াল আসরের ঠিক মাঝখানে কাঠের একটা উঁচু টুলের ওপর, ফোকাসের আলোয় সচল পাথরে গড়া মূর্তির মত। পেছনে শুনতে পেলাম তু-তিনটি প্রৌঢ় কণ্ঠে "ধিঙ্গী ছুঁড়ির রোজ রোজ এই বে-আব্রু বেহায়াপনা দেখছি ছোঁড়াগুলোর মাথা একেবারে......" ছোঁড়াদের হাততালি ততক্ষণে একটু থেমেছিল। আবার শুরু হ'ল।

রেবেকার উঁচু টুল থেকে যতটা পারা যায় ততখানি দূরত্ব বজায় রেখে তার চারধারে ঘুরতে শুরু করল গাধাসুলভ ভঙ্গীতে সার্কাসের ভাঁড়, আর তার আগে আগে গাধাটি, সামনের পা তুটি ওপর দিকে

তুলে পেছনের দু পায়ে মানুষের ভঙ্গীতে হাঁটবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে। রেবেকার হাতের লম্বা চাবুক গাধার পিছে পিছে, সামনের পা দুটি এক-একবার মাটিতে পড়তেই গাধা পশ্চাদ্দেশে চাবুক খাচ্ছে আর ফের সামনের পা দুটিকে উঁচুতে তুলে হাত বানিয়ে মানুষের নকল ক'রে হাঁটছে।

ছোকরার দল এককণ্ঠে বাহবা দিচ্ছে চাবুকধারিণীকে। দু-চারজন বুড়ো 'ধিক ধিক' করছে—আমি তাদের বুকের ভেতরকার ধুকধুক শুনতে পাচ্ছিলাম।

দূর থেকে একবার আমার দিকে ইশারায় তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললে গাধা। হাত নেই তার, কিন্তু চোখ দিয়ে হাতছাঁনি দিতে জানে। আরও গভীর ক'রে দেখে নিলাম তার দুটি বিষণ্ণ চোখের ব্যাকুল নীরবতা আর নীরব ব্যাকুলতা। তাতে ভাষণ নেই, ভাষা আছে।

মন ব্যথিয়ে তুলল তার অসহায় অপমান। মনে হ'ল, ও গাধা বটে, কিন্তু শুধু একজন বিশেষ গাধা নয়। ও যেন ক্রমবিকাশশীল আত্মমর্যাদাজ্ঞান-সম্পন্ন গাধা-সমাজের একজন মুখপাত্র। অথচ তারই সামনে গাধাদের বিদ্রূপ করছে আমাদেরই একজন দ্বিপদ ভাঁড়, গাধাদের ব্যর্থ নকল ক'রে। আর চাবুকের ভয় দেখিয়ে আমাদেরই মত ক'রে হাঁটার অসম্মানও গাধাকে সওয়ানো হচ্ছে।

ওই একটি গাধার বিষণ্ণ চোখের বিষম বেদনার ব্যাকুল অভিব্যক্তি চিরন্তন বিশ্ব-গাধার আর্তনাদের মত আমার হৃদয়ে শেল হেনে গেল। আমারও মন গোপনে আর্তনাদ ক'রে উঠল "হায় দুনিয়ার সার্কাস্! কত চার-পাকে তুমি দু-পা বানাইয়া, আর কত দুই-পাকে চার-পা বানাইয়া মর্মান্তিক তামাসা দেখিতেছ এবং দেখাইতেছ! হায়……" ইত্যাদি।

এর পরের খেলাটা আরও মর্মান্তিক। রেবেকার চাবুকের ডগা থেকে ঝুলনো একগোছা তাজা সবুজ ঘাস গাধার মুখের সামনে দুলিয়ে দেওয়া হ'ল। গাধা বেচারা খেয়েছে সেই কখন ভোরবেলা, তারপর এখন পর্যন্ত পেটে একটি দানা পড়ে নি। গাধা খাবারের দিকে ক্ষুধার্ত

মুখ যেমনই বাড়িয়ে এগোচ্ছে, অমনই সঙ্গে সঙ্গে রেবেকাও টুলের ওপর ঘুরে যাচ্ছে, গাধার মুখ থেকে খাবারও স'রে আসছে প্রায় বৃত্তাকারে। গাধা ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে ডিম্বাকৃতি পথে এগিয়েই চলেছে, কিছুতেই মুখ দিয়ে খাবারের নাগাল পাচ্ছে না। পশ্চিমী পুরাণের অভিশপ্ত ট্যান্‌ট্যালাসের মত। পিপাসার্ত ট্যান্‌ট্যালাস জলে দাঁড়িয়ে। তাঁর তৃষ্ণার্ত ঠোঁটের পৌনে এক ইঞ্চি নীচুতে জল। বুকের আটচল্লিশ ইঞ্চি ছাতি পিপাসায় ফেটে চৌষট্টি ইঞ্চি হবার যোগাড়। জলে চুমুক দেবার জন্যে যতই ঠোঁট নামাচ্ছেন ট্যান্‌ট্যালাস, জলও ততই নীচে নেমে যাচ্ছে, ওই পৌনে এক ইঞ্চি দূরত্ব বরাবর বজায় রেখে। তাঁর ঠিক মাথার ওপরে গাছের বোঁটায় সুদৃশ্য, সুপক্ক, সুপুষ্ট ঝাঁকে ঝাঁকে ফল, ঝাঁকালেই টুপটাপ ক'রে ঝ'রে পড়বার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে যেন। ট্যান্‌ট্যালাস ওপরে হাত বাড়াচ্ছেন, অমনই ফলও ওপরে উঠে যাচ্ছে, তার হাত থেকে পৌনে এক ইঞ্চি দূরত্ব বরাবর বজায় রেখে। ট্যান্‌ট্যালাসের মিটছে না তৃষা, মিটছে না বুভুক্ষা। অথচ…!…!!…!!!…!!!

গ্রেট রয়েল বেঙ্গল সার্কাসের গ্রেট রয়েল ট্যান্‌ট্যালাস এই গাধা। তার আশা-নিরাশার দুরন্ত দৌড়ের পরম ব্যথাকে গরম তামাসা ভেবে হাততালি দিচ্ছে কেউবা মজা পেয়ে, কেউবা টিকিটের পয়সা উসুল করবার জন্যে। হাততালি শুনে প্রোফেসর ট্যালপেট্রো এসে মাথা নত ক'রে বুকের মেডেল দুলিয়ে গেলেন। ইনি খেলা দেখান না কখনও, দেখান শুধু মেডেলের মালা।

বাঙালীর গৌরব যে প্রোফেসর ট্যালপেট্রো, সে খবর বাঙালী রাখত না। তাই হ্যাণ্ডবিলে আর প্রাচীরপত্রে বড় বড় হরফে ছেপে জানাতে হয়েছে প্রোফেসরকে। বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। তাকে আত্মবিস্মরণ ভোলাবার জন্যে হ্যাণ্ডবিল আর পোস্টার দরকার। প্রোফেসরের বুকে দোলানো মেডেলগুলো ভজহরির জানা পুরাতন স্যাকরার তৈরি। ভজহরিকে সে সস্তায় মেডেল তৈরী ক'রে দেয়— খাতির অনেক দিনের। তারই তৈরি মেডেল বুকে দুলিয়ে ভজহরি হয় প্রোফেসর ট্যালপেট্রো।

রেবেকার একরঙা পোশাকের রঙ তার গায়ের রঙের সঙ্গে এমন ঢঙে মেলানো যেন পোশাককে পোশাক ব'লে সহসা চেনা যায় না, চোখের সামনেই চোখকে ফাঁকি দিয়ে চোখের আড়াল হয়ে থাকে। গাধাটা চারদিকের বহু চোখের লক্ষ্য হতে চেয়েও উপলক্ষ্য মাত্র হতে পেরেছে, 'গ্রেট ডাংকি অ্যাকৃটে'র নায়িকা হয়ে উঠেছে রেবেকা। খাঁ-সাহেবের খেয়ালী আসরে যেন বাইজী বাজি মারছে, লুটছে বাহবা; তাই খাঁ-সাহেবের দুটি চোখ ব্যর্থতার ব্যাকুল বেদনায় বিষণ্ণ।

কিন্তু গাধা উপলক্ষ্য হ'লেও লক্ষ্য থেকে অনেক চোখের দৃষ্টি মাঝে মাঝে উপলক্ষ্যের ওপরও ঠিকরে পড়ছে। ঘুরছে, ঘুরছে, গাধা ঘুরছে মুখের অগ্রবর্তী ঝুলন্ত ঘাসের গুচ্ছের লোভে। তাকে ঘোরাচ্ছে, ঘোরাচ্ছে, ঘোরাচ্ছে সার্কাস-সুন্দরী সিংহ-দময়ন্তী রেবেকা, ঝুলন্ত ঘাস-গুচ্ছের লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে। দুরারোগ্য আশাবাদে ভরা মগজ আর পেট-ভরা ক্ষিদে নিয়ে ঘুরন্ত গাধা ঝুলন্ত ঘাসগুচ্ছের পশ্চাদ্ধাবন করছে।

আমার গ্যালারির সীটের এক লাফ দূরে সবচেয়ে দামী টিকিটের দুটি চেয়ারে পাশাপাশি ব'সে আছে কুমার ভুজঙ্গ চৌধুরী আর কুমারী সানন্দা সান্যাল। নেতাজী সুভাষ রোড যেখানে লালদীঘি পেরিয়ে গিয়ে নেতিয়ে প'ড়ে নেতাজীকে বিদ্রূপ করছে, সেখানে এক মস্ত দালানে ভুজঙ্গ চৌধুরীর মস্ত কারবারী অফিস, ভুজঙ্গ তার ম্যানেজিং ডিরেক্টর আর প্রায়-মালিক। ভুজঙ্গের কাছে হাজার ছেলেমানুষ, লাখ ছাড়া কথা কইলে ভুজঙ্গের রসনা অপমানিত বোধ করে।

সানন্দা অফিসে ভুজঙ্গের প্রাইভেট সেক্রেটারি। ভাল মাইনেই দেয় ভুজঙ্গ সানন্দাকে—আরও অনেক দেবার বাসনা নানাভাবে জানাবার চেষ্টা ক'রে ক'রে ব্যর্থ হয়েছে আর অবাক হয়েছে ভুজঙ্গ। পরীক্ষা দিতে পারলে গ্র্যাজুয়েট হতে পারত সানন্দা, কিন্তু সাংসারিক বেকায়দায় প'ড়ে পরীক্ষায় না ব'সে তাকে বসতে হয়েছে চাকুরিতে। রূপ আছে, ভ্যানিটি ব্যাগ আছে, কিন্তু ভ্যানিটি নেই তার। অফিসে তার এত কাছে থেকেও যেন দূরত্বের ব্যবধান বজায় রেখে চলে সানন্দা।

ভুজঙ্গের প্রাণের ইঙ্গিত বোঝে না, অথবা বুঝেও না-বোঝার ভান করে। ভুজঙ্গের বিশ্বাস, সে ভানই করে।

ভুজঙ্গের আন্দাজ ঠিক। ভানই করে কুমারী সানন্দা। তার কৌমার্য ভুজঙ্গের পছন্দ নয় তা সে জানে ; এও জানে, বেশিদিন ভুজঙ্গকে এড়িয়ে চললে এই দুর্দিনের বাজারে ভাল মাইনের চাকরিটি যাবে। মাইনে তার বেশি, কাজ অল্প ; আর সেই অল্প কাজটুকুও তাকে বাদ দিয়েই অনায়াসে চলতে পারে। তা ছাড়া, সে গেলে তার শূন্য স্থান পূর্ণ করবার জন্যে চাকুরিপ্রার্থিনীর অভাব হবে না এক বেলাও। সানন্দাকে বিশেষভাবে পছন্দ করে ভুজঙ্গ : তার সম্বন্ধে আশা সে ছাড়ে নি, সবুরে মেওয়া ফলার অপেক্ষা করছে সে প্রাণপণে। চাকরি-যায় নি তাই কুমারী সানন্দা সান্যালের।

'দি গ্রেট ডাংকি অ্যাক্‌ট' দেখতে দেখতে হঠাৎ লজ্জায়, ধিক্কারে, ক্ষোভে ভ'রে উঠল ভুজঙ্গ চৌধুরীর মন। তাঁর মনে হ'ল, তিনি যেন গাধা ব'নে আছেন কুমারী সানন্দা সান্যালের হাতে। ভুজঙ্গ-গাধাকে যেন সানন্দা-রেবেকা ব্যর্থ আশার ঘাসগুচ্ছ সামনে ঝুলিয়ে রেখে অন্তহীন ঘোরা ঘোরাচ্ছে। ছিঃ! ধিক! দু হাতে টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে যে ভুজঙ্গ চৌধুরী, তাকে গাধা বানিয়ে ছিনিমিনি খেলছে একটা সদ্য-কলেজ-ছেড়ে-আসা মেয়ে? সার্কাসের গাধাটা নিশ্চয় টের পেয়েছে—হয়তো সমদুঃখী স্যাঙাৎ ব'লে এসে আদর ক'রে গলা জড়িয়েও ধরতে পারে! হয়তো গাধাটা তাকে দোস্ত ভেবে মুচকি মুচকি হাসছেও। হয়তো মিস সানন্দা সান্যালও...... !!!!!

ক্ষেপে উঠল ভুজঙ্গ—অফিসের চাকুরেরা যাকে আড়ালে ডাকে কালভুজঙ্গ ব'লে। বাঁকা ক্রুর চোখে ভুজঙ্গ একবার তাকাল সানন্দার দিকে—চোখ এড়াল না আমার। ধনপতির চোখ এড়ানো সহজ নয়। সানন্দা তখন সানন্দে দেখছে গাধার গাধামি, পাতলা ঠোঁটে ফুটে আছে পাতলাতর হাসি ; সে হাসিকে প্রচ্ছন্ন অনুকম্পামিশ্রিত বিদ্রূপ ব'লে মনে হ'ল ভুজঙ্গের। সে হাসি যেন নীরব অট্ট আওয়াজে ভুজঙ্গকে বলছে, "তুমিও একটি আস্ত গাধা হে ভুজঙ্গ।" ভুজঙ্গ আরও

ক্ষেপে উঠল। সার্কাসের তাঁবুর বাইরে তখন ভুজঙ্গর বিশালকায় শৌখিন দামী গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে শোফার রৌশনলাল। এই গাড়িতেই অফিস থেকে শৌখিন চীনে রেস্তোরাঁ হয়ে সোজা সার্কাসে চলে এসেছে ভুজঙ্গ আর সানন্দা একসঙ্গে। সার্কাসের দামীতম দুখানা টিকিট আগেই কিনিয়ে রেখেছিল ভুজঙ্গ—সানন্দা রাজী না-হবার বা কোনও অজুহাতে এড়িয়ে যাওয়ার পনেরো আনা এগারো পাই সম্ভাবনা আছে ভেবেও। সার্কাস যে ভুজঙ্গ খুব পছন্দ করে তা নয়। তা ওর চেহারা থেকেই বুঝতে পারি। ট্যালপেট্রোর সার্কাসের হ্যাণ্ডবিলে আর পোস্টারে সিংহ-হীনা সিংহ-দময়ন্তী মিস্ রেবেকার সচিত্র বর্ণনা মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল ভুজঙ্গকে। প্রোফেসর ট্যালপেট্রো রেবেকাকে মাইনে দেন বেশি, কিন্তু জানেন সেই বেশি মাইনের বাড়তি খরচার অনেকগুণ উসুল ক'রে নিতে। তা ছাড়া সার্কাসের টিকিট দুখানায় আর একটি মতলবও মাখানো ছিল। সেই মতলব-নাটিকার নায়িকা কুমারী সানন্দা সান্যাল।

অফিসের শেষের দিকে সানন্দাকে অনুরোধ করবার আগে মনে মনে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দোল খাচ্ছিলেন বহুলক্ষপতি ভুজঙ্গ চৌধুরী। অন্তরঙ্গ আর নিবিড় হবার সুযোগ যদি কখনও না চান বা না পান, তবে অনর্থক কেন রেখেছেন মিস্ সানন্দা সান্যালকে এত মাইনে দিয়ে প্রাইভেট সেক্রেটারি? কিন্তু একরোখা মিস্ সান্যাল যদি রুখে উঠে ঘৃণা বা হেলাভরে সার্কাসের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান ক'রে ভ্যানিটি ব্যাগ দুলিয়ে চ'লে যান, তখন? সে অপমানের পর তাঁকে বরখাস্ত না করলে লক্ষপতি ম্যানেজিং ডিরেক্টরের মান থাকবে কোথায়? অথচ বরখাস্ত তাঁকে করা মানে, তার আশা চিরদিনের জন্যে ছেড়ে দেওয়া, হয়তো যখন আর দু-চার দিন সবুর করলেই মেওয়া ফলত। সবার বাড়া ভয় তাঁর উলটো অফিসের সহ-কারবারী এন. ডি. হোড়কে। ওৎ পেতে আছে হোড়, ভুজঙ্গ চৌধুরীর হাত থেকে কোনও মতে একবার মিস্ সানন্দা সান্যাল ফস্কালেই সঙ্গে সঙ্গে লুফে নেবে এন. ডি. হোড়। সানন্দাকে প্রাইভেট সেক্রেটারি

পেলে ডবল মাইনের বেশি দিতেও দুবার ভাববে না সে। হোড়কে হাড়ে হাড়ে চেনে চৌধুরী।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে মিস্ সানন্দা বলেছিল, চলুন। তার পর রেস্তোরাঁ, আর সেখান থেকে সার্কাস। খুশি আর আশান্বিত হবার কথা ভুজঙ্গের, কিন্তু হ'ল সে রাগান্বিত আর নিরাশ। গাড়িতে অফিস-বহির্ভূত আবহাওয়ায় অন্তরঙ্গ হতে চেয়েছিল ভুজঙ্গ—ভেবেছিল "ধরা দেবো গো" বলে কুমারী সানন্দা ইঙ্গিত দিয়েছে এতদিনে। 'মিস্ চৌধুরী' আর 'আপনি' থেকে ভুজঙ্গ নেমে আসতে চেয়েছিল, 'সানন্দা' আর 'তুমি'তে। গাড়ির দামী নরম কুশনের সীটে কুমারী চৌধুরীর নরম সান্নিধ্য-ঘেঁষে বসতে চেয়েছিল ভুজঙ্গ। নম্র-কঠোর স্বরে বিনীত-দৃঢ় ভঙ্গীতে সানন্দা বলেছিল, "আপনি ওই ধারে স'রে বসুন দয়া ক'রে মিস্টার চৌধুরী; আমি মুখের পাউডারটা একটু ঠিক ক'রে নেব।" একেবারে ও-পাশে স'রে বসেছিল বাধ্য হয়ে ভুজঙ্গ। কিন্তু ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে পাউডার পাফ বার ক'রে নি সানন্দা। 'সানন্দা' ডাকেও সাড়া দেয় নি সানন্দা। শুনতে না পাওয়ার ভান করে নি। নির্ভুল ভঙ্গীতে, নীরবে ইঙ্গিত করেছিল শুনেছে সে ডাক, কিন্তু সে দেবে না সাড়া ওই ডাকে। এ যেন ভুজঙ্গের ডান গালে সানন্দার বাঁ হাতের প্রত্যক্ষ চাঁটি।

'দি গ্রেট ডাংকি অ্যাক্ট' দেখতে দেখতে এই সব ভাবছিল ভুজঙ্গ চৌধুরী। এ চাঁটি চলবে না হজম ক'রে যাওয়া। পোষ-না-মানা পাখিকে পোষ মানাতেই হবে। হবে—হবে—হবে। কিন্তু বরখাস্ত করবার ভয় দেখানো বা বরখাস্ত করা চলবে না মিস্ সান্যালকে, ওত-পাতা শয়তান এন্. ডি. হোড় সঙ্গে সঙ্গেই লুফে নেবে।

মাথা পেছন দিকে ঘুরিয়ে গ্যালারির দিকে তাকালে ভুজঙ্গ। তাকালে রাহুল রায়ের দিকে, আর মুখে খেলে গেল রহস্যময় হাসি। রাহুল ভুজঙ্গেরই অফিসে মাঝারি-মাইনের কেরানী। ছোকরা দেখতে শুনতে ভাল, কাজও করে ভাল, স্বভাবে বিনয়ের অভাব নেই, অথচ ইমানদার ছেলে—এক ফোঁটা বেইমানি জানে না। সানন্দার

আধা মাইনেও পায় না রাহুল রায়, তবু এই রাহুলের প্রেমেই হাবুডু' খাচ্ছে সানন্দা। কুমারী সান্যালের দিবারাত্রির স্বপ্ন হচ্ছে শ্রীমতী বা' হওয়া। এ কথা অফিসের আর কেউ জানে কি না সে খবর জা' দরকার—ভাবে না ভুজঙ্গ; সে নিজে জানে। এও জানে, ওই রাহুলের প' পূজ্য শ্রীচরণকমলযুগলে নিজেকে অঞ্জলি দেবে ব'লেই নিজেকে ভুজঙ্গে' ছোঁয়াচ থেকে বাঁচিয়ে চলার এই প্রাণপণ প্রয়াস সানন্দার। অসহ্য রাহুলের মত এক পুঁচকে পিপীলিকা কিনা ভুজঙ্গ-ঐরাবতের প্রতিদ্বন্দ্বী!

ব্যাস্! ওই রাহুল ছোকরাকে বরখাস্ত ক'রে দিতে হবে। তা হ'লে এ বাজারে চাকরি জোটানো শক্ত হবে ওর পক্ষে। আর তাতেই সানন্দা হবে পরম জব্দ। এই এক মোক্ষম উপায়। রাহুলের সামান্য আয়ের ওপর অনেকগুলো প্রাণী ভর ক'রে আছে, তারা তখন একেবারে পথে বসবে। সানন্দাকে তখন আসতেই হবে ভুজঙ্গের কাছে, তা প্রেমিকপ্রবরকে চাকরিতে ফের বহাল করবার অনুরোধ জানাতে। তখন ·। সানন্দা তখন কবজায় এসে যাবে--কোথায় থাকবে তার দম্ভ? কোথায় থাকবে তার এই ছোঁয়াচ-বাঁচানো শুচিবাই?

প্রেমের ভান ক'রে নিবিড় থেকে নিবিড়তর এবং নিবিড়তম সান্নিধ্য দেওয়াই যাদের ঐকান্তিক পেশা বা নেশা, এ জাতের অগুনতি না' সারি বেঁধে এসেছে গেছে ভুজঙ্গ চৌধুরীর জীবনে; পিপাসা মেটে নি ভুজঙ্গের। পিপাসা পাছে বা কখনও মিটে যায়, সেই ভয়ে পিপাসা জাগিয়ে রাখার প্রয়াসের শেষ নেই তার। নেশা মিটে গেলে জীবনে আর রইল কি! নেশা মিটে যাওয়া মানেই তো মৃত্যু। নেশা' পরিতৃপ্তি হবে দিগন্ত রেখার মত, তার দিকে যত এগোনো যাবে ততই সে দূরে স'রে যাবে। মানুষ রবি ঠাকুরের ভাষায় বলে "আমি চঞ্চ' হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।" কিন্তু সুদূর যদি সত্যি সত্যি কাছে এসে তার পিয়াসা মেটায়, চঞ্চল তখন চ'টে উঠে সুদূরকে লাগাবে চাঁটি।

কিন্তু পেশাওয়ালী আর নেশাওয়ালীদের প্রতি কিছুদিন হ'ল একটা প্রবল বিতৃষ্ণা ছেয়ে গেছে ভুজঙ্গের মনে, কেন-না এদের পেছনে ছুটতে হয় না, এরাই ছোটে পেছনে। পকেটে অগুনতি টাকার গন্ধ

পেলেই এরা ছেঁকে ধরতে আসে কাঁঠালের গন্ধে মাছি আর মাছের গন্ধে বেড়ালের মত। পুরুষ—অন্তত ভুজঙ্গ চৌধুরীর মত পুরুষ—হচ্ছে শিকারীর জাত; যে শিকার আপনি এসে ধরা দেয় তাতে তার আনন্দ নেই।

সানন্দার প্রতি ওর প্রচণ্ড লোভ এইজন্যে যে, সানন্দা সুলভ নয়। টাকার কুমীর ওর বিশ্বাস, টাকার জোরে দুনিয়ায় সব কিছু সম্ভব; এ বিশ্বাসভঙ্গের অপমান সানন্দার হাত থেকে সে পেতে রাজী নয়।

গাধার খেলা দেখতে দেখতে সানন্দার মনে হ'ল, সেও গাধাটার মত মিথ্যা আশার পেছনে ঘুরে মরছে। রাহুল রায় ঘোরাচ্ছে তাকে। রাহুলের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে সানন্দা, ভুজঙ্গের এ অনুমান আগাগোড়া সত্যি। এ হাবুডুবুর আভাস পাবার জন্যে ডুবুরী নামাতে হয় না সানন্দার মন-পুকুরে। অফিসের সবাই নীরবে জানে। জানে না বা না-জানার ভান করে রাহুল। সানন্দার বিশ্বাস, রাহুল জানে। সানন্দা সোজাসুজি প্রেম-নিবেদন করে না রাহুলের কাছে, কিন্তু আভাস ইঙ্গিত ইত্যাদি যত রকম আছে সব রকমই ব্যবহার ক'রে দেখবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। দেখেছে যে, তার মন-পাহাড়ের ভেতরে প্রেমের আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে। ওর ওপর ভয়ানক চটেছিল সানন্দা; রাহুলের মাথা কি এমন নিরেট? সে কি বুঝতে পারে না নারী-হৃদয়ের ব্যাকুলতা?

কিন্তু নিজের নারী-হৃদয়ের ব্যাকুলতা রাহুল রায়কে বোঝাবার জন্যে যতটা আকুল সানন্দা সান্যাল, তার এক ছটাক আকুলতাও তার নেই রাহুল রায়ের নর-হৃদয়ের ব্যাকুলতা বোঝবার জন্যে। রাহুলের হৃদয় মাস-কয়েক ধ'রে বেতনবৃদ্ধির জন্যে ব্যাকুল। জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে চড়চড় ক'রে; বেড়েছে রাহুলের কাজে দক্ষতা, অভিজ্ঞতা আর সেই সঙ্গে কাজের চাপ আর দায়িত্ব; বেড়েছে অফিসের অন্য অনেকের মাইনে, যাদের মাইনে বরং কমা উচিত ছিল; বাড়ে নি তবু রাহুলের মাইনে, যা বাড়া উচিত ছিল।

রাহুল জানত না—হয়তো ভুজঙ্গ নিজেও সোজাসুজি জানত না, রাহুলের মাইনে বাড়ছে না সানন্দার জন্যে, সানন্দা তাকে তার কুমারী-

হৃদয় দান করেছে ভুজঙ্গকে না দিয়ে, সেইজন্যে। ভুজঙ্গের প্রচণ্ড ঈর্ষা, দুরন্ত রাগ রাহুলের ওপর। তাই তার মাইনে বাড়ছে না, বাড়বেও না।

রাহুলের মনে হতে লাগল, প্রোফেসর ট্যালপেট্রোর গাধাটার চাইতেও সে বড় মূর্খ। গাধাটাব সামনে যে ঘাস ঝুলছে সেটা ফাঁকি নয়, খাঁটি। ওই খাঁটি ঘাসের পেছনে সে নকল আশায় ঘুরছে। ভুজঙ্গের মোটা কোম্পানিতে রোগা মাইনেতে যে ভবিষ্যতেব আশায় সে ঘুরছে সে যে মিথ্যে, সে যে ফাঁকি, সে যে ভূয়ো—এ সত্যেব খোঁচা মেরেই যেন সার্কাসের গাধাটা রাহুলের দু চোখে জ্বালা ধরিয়ে দিল। গাধাটাব কাছে হার মানা চলবে না।—প্রতিজ্ঞা ক'রে বসল রাহুল। এসপার কি ওসপার করবই। দেব চরমপত্র ঃ 'মাইনে বাড়াও, তা নইলে ইস্তফা-পত্র গ্রহণ কর।' মানব না মানা। শুনব না অনুরোধ। পুঁজিবাদের শোষণ সইব না আর। ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ!

পুঁজির ওপর রাগ নয়, রাহুলের রাগ পুঁজিবাদের ওপর। পুঁজি শোষণ করে না, শোষণ করে পুঁজিবাদ। এই পুঁজিবাদের সারা অঙ্গে পূঁজ জ'মে গেছে, আর কেন? ডাক্তারের বাবারও সাধ্যি নেই দাওযাই বাংলায়।—পুঁজিবাদের নাভিশ্বাস উঠতে আর দেরি নেই।

সার্কাসের পালোয়ান ছাতুরাম লাল আলখাল্লা আর সাদা পাগড়ি মাথায় প্রথম সারির চেয়ারের সামনে একটা টুলে ব'সে ব'সে গাধার খেলা দেখছে। গাধার খেলার পরেই আসবে তার পালোয়ানী খেলা দেখাবার পালা। বিজ্ঞাপনে তার বর্ণনা হচ্ছে "কলির ভীম"। মস্ত মস্ত মুগুর দু হাতে নিয়ে অবলীলাক্রমে সে ঘোরায়। হাত দিয়ে, পা দিয়ে, চুলের সঙ্গে বেঁধে বিরাট বিরাট লোহার ওজন সে অনায়াসে তুলে ফেলে। মুগুরগুলো আসলে ফাঁপা আর হালকা, অন্তঃসারশূন্য মানুষের মত। বিরাট ওজনগুলো আসলে হালকা কাঠের তৈরি, তার ওপর এমনভাবে কালো রঙ-করা যেন অল্প দূর থেকে দেখলেও লোহার তৈরি ব'লে মনে হয়। ছাতুরাম বেঁটে হ'লেও তার গড়নটা মোটা আর ভারী, তাই সে যখন কাঠের ওজন তুলে লোহার ওজন তোলবার ভান করে তখন অনেকে বাহবা আর হাততালি দেয়, আর প্রোফেসার ট্যালপেট্রো এসে মেডেল

ঝুলিয়ে যান। মাঝে মাঝে প্রোফেসরের আগে-থেকে-ঠিক-করা লোক গ্যালারি বা চেয়ার থেকে কলির ভীম ছাতুরামের অদ্ভুত শক্তিমত্তার পরিচয় পেয়ে রূপোর মেডেল ঘোষণা করে।

কলির ভীমকে আশা দিয়েছে সিংহ-দময়ন্তী রেবেকা, বলেছে, "শুধু আর কিছুদিন ধৈর্য ধ'রে থাক। তারপরই আমি তোমার, আর তুমি আমার। তোমার মত গুণী আর পাব কোথায়, পালোয়ান? কিন্তু খবরদার, এ কথা ফকিরচাঁদ যেন না জানে। ও-বেচারা একেবারে—"

ফকিরচাঁদ মানে দলের ভাঁড়, কেউ কেউ তাকে বলে ক্লাউন। রেবেকার প্রেমে নাক পর্যন্ত ডুবে আছে সে। তাই সবাই তার ভবিষ্যৎস্বপ্নভঙ্গের কথা ভেবে মনে মনে হায় হায় করে। কলির ভীমও।

ভাঁড় ফকিরচাঁদকে ইঙ্গিতে আশা দিয়ে রেবেকা বলেছে, "এ সার্কাসের তুমিই তো জান্ ফকিরচাঁদ। লোক-হাসিয়ে তুমিই তো আসর জমিয়ে রাখ। ছাতুরাম যে ওজন তোলে সে ওজন ঝুটা, যে মুগুর ঘুরিয়ে লোককে তাক্ লাগায় সে মুগুর ফাঁপা, হালকা। তোমার ভাঁড়ামিতে ভেজাল নেই ফকিরচাঁদ, তুমি যে হাসাও তা সাচ্চা। তুমি সাচ্চা ভাঁড়, আর ছাতুরাম হচ্ছে নকল পালোয়ান। কিন্তু ছাতুকে এখনই এ সব কিছু জানতে দিয়ো না ফকির। সে বড় আশা ক'রে আছে। এখনই তার দিয়ো না স্বপ্ন ভেঙে।"

তাই গাধার খেলা দেখতে দেখতে মেকী পালোয়ান বেচারী গাধার সঙ্গে খাঁটি ভাঁড়ের তুলনা ক'রে অনুকম্পার করুণ হাসি হেসে ভাবে, হায় রে বেচারা! আর গাধার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে খাঁটি ভাঁড় গাধার সঙ্গে মেকী পালোয়ানের সাদৃশ্য চিন্তা ক'রে ঠিক তাই ভাবে।

হঠাৎ গাধাটা হয়রান হয়েই যেন—অথবা বিরক্ত হয়ে?—দাঁড়িয়ে পড়ল। আর নড়ে না, চড়ে না, এগোয় না। চোখ দুটি তার আরও জ্বলছল। আমার দু পাশের ছোকরারা অবাক হয়ে বললে, এ কি? গাধা শালা আজ এমন করছে কেন রে বাবা?

রেবেকাও থেমে গেল। কি যেন একটু ভেবে নিয়ে টুল ছেড়ে ঝাঁক ক'রে এক লাফ, তারপর শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল

মাটিতে গাধাটার মুখোমুখি। দর্শকমণ্ডলীতে ফিস ফিস শুরু হ'ল, মাটিতে একটা আলপিন পড়লে তার আওয়াজ একটুও টের পাওয়া যাবে না। প্রোফেসর ট্যালপেট্রোও দেখলুম স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। গাধাটা আজ হঠাৎ এ কি করল? 'দি গ্রেট ডাংকি অ্যাক্‌ট' তো কয়েক রাত ধ'রে হচ্ছে, কোনও রাতে তো এমন করে নি। আর রেবেকাই বা হঠাৎ এ কি ক'রে বসল? এমন তো করবার কথা নয়! কে জানে এর পর কি করবে রেবেকা, আর কেমন ক'রে শেষ রক্ষা করবে? কিন্তু তবু নিজে এগিয়ে গিয়ে এ ব্যাপারে নাক গলাবার চেষ্টা করলেন না বাংলার গৌরব প্রোফেসর ট্যালপেট্রো। রেবেকার ওপর তাঁর আস্থা আছে।

প্রথম অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের ঝোঁকটা কেটে যেতেই চারদিকের হাতে তালি আর কানে তালা পড়ল। তারপর দেখা গেল ঘাসের গুচ্ছ নিজের হাতে ধ'রে পুচ্ছ-দোলায়মান গাধাকে খাওয়াচ্ছে রেবেকা।

ভুজঙ্গ চৌধুরী এতক্ষণ ভীষণ বিরূপ হয়ে ছিলেন সানন্দার ওপর; এই মুহূর্তে তার সমস্ত বিরূপতা গ'লে জল হয়ে গেল। সবুরে গাধার মেওয়া ফলেছে, তাঁরও ফলবে। চৌধুরীর বিশ্বাস হ'ল ভুজঙ্গ-গাধাকে সানন্দা-রেবেকা এমনি আদর ক'রে প্রেমের তাজা ঘাস খাওয়াবে। আজ গাড়িতে যেটুকু অভদ্রতা করেছে তা শুধু অভিনয় মাত্র—ধরা দেবার আগে একটু কেবল খেলিয়ে নিচ্ছে। মেয়েদের যা 'সাইকোলজি'।

ভুজঙ্গ চৌধুরী ভুলে গেলেন রাহুল রায়কে বরখাস্ত করার কথা। ভেবে দেখলেন, রাহুলের মাইনে অবিলম্বে বাড়িয়ে না দেওয়াটা নিতান্তই অন্যায় হবে। কালই অফিসে গিয়ে একটা ব্যবস্থা করবেন ঠিক করলেন।

কুমারী সানন্দা সান্যালের এইবার মনে হ'ল, রাহুল রায়ও একটি দ্বিপদ গাধাবিশেষ, তাকে মুখে গুঁজে খাইয়ে না দিলে সে নিজে থেকে খেতে পারবে না। সানন্দাকেই প্রথমে এগিয়ে যেতে হবে, প্রেমের ব্যাপারে যা নাকি পুরুষের কর্তব্য।

রেবেকার হাত থেকে গাধা ঘাস খাচ্ছে, আর সার্কাসের সমস্ত দর্শক নিশ্বাস রুদ্ধ ক'রে দেখছে। কে জানে, এর পর হঠাৎ রেবেকা কি একটা নতুন কসরৎ দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেবে?

আমার পাশে যে ভাবালু ছোকরা ব'সে ছিল, সে এইবারে বললে, গাধাটা কি আশ্চর্য কায়দায় ঘাস খাচ্ছেন দেখেছেন? ঠিক মানুষ ব'লে মনে হয় না কি? আমি বললাম, অনেক মানুষকেও তো গাধা ব'লে মনে হয়। এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? ছোকরা বললে, কিন্তু কি বিষন্ন দুটি চোখ, লক্ষ্য করেছেন? অবাক হয়ে উঠলাম, ধূমকেতুর ল্যাজের ঝাপটা-খাওয়া পৃথিবীর আবহাওয়ার মত। সার্কাসের এই ভিড়ে আমি ছাড়া অন্তত আর একটি প্রাণী লক্ষ্য করেছে গাধাটির বিষন্ন চোখ!

কেন বিষন্ন জানেন?—ছোকরার প্রশ্ন। উত্তর দিলুম না, উত্তর জানতুম না ব'লে। ছোকরা বললে, আমায় উনি চিনতে পেরেছেন। উনি আমার দাদু, বাবার বাবা। আমি ওঁর নাতি।

আমি বললাম, ধন্য আপনি। কিন্তু চিনতে পারলেন কি ক'রে?

ছোকরা বললে, কাশীর ওধারে ব্যাস-কাশীর নাম শুনেছেন তো, যেখানে মরলে পর মানুষ গাধা হয়ে জন্মায়? আমার দাদু সেই ব্যাস-কাশীতে মারা গিয়েছিলেন। তার মাস তিনেক পর তিনি এই গাধা হয়ে জন্মান। দাদুর তিরোভাব-তিথি আর এই গাধা ভদ্রলোকের জন্মতারিখ মিলিয়ে দেখেছি কি না! ইনি ছিলেন আমাদের পাড়ার ছিরু ধোপার হাতে। ছিরু মারা যেতে বিধবা ধোপানী গাধাটিকে এই সার্কাস-পার্টিতে বিক্রি ক'রে দিয়েছিলেন প্রোফেসর ট্যালপেট্রোর কাছে। খুব যত্ন ক'রে রাখেন তাঁকে প্রোফেসর, সেদিক দিয়ে আমাদের কোনো দুঃখ নেই। দুঃখু শুধু এই, দাদু বোঝেন সবই, কিন্তু কিছু কইতে পারেন না, বোঝাতে পারেন না। শুধু বিষন্ন চোখে চেয়ে থাকেন।

মনে মনে আমি বললুম, ছোকরাটি গাধাটির নাতি তাতে অবিশ্বাস নেই, কিন্তু গাধার চোখে ওই যে বিষন্ন ভাব, আসলে ওইটেই বোধ করি ওর সব চাইতে বড় ধাপ্পা। বিষন্নতার আলগা মুখোশ প'রে গাধাটি হয়তো ভেতরে ভেতরে ঠাট্টার অট্টহাসি হাসছে! মনে পড়ল সেই উপদেশটুকু—"যাহা দেখিবে বা শুনিবে তাহাই বিশ্বাস করিও না।"

হঠাৎ দেখি গাধাটা রেবেকার ছেড়ে-আসা টেবিলটার ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে, ওর চেহারা হয়ে গেছে সক্রেটিসের মত। টেবিলের ওপর

ঘুরে ঘুরে চারদিকে সে দেখছে অসংখ্য মূর্খ মানুষের অগুনতি মাথা আর তাদের দুঃখ ভেবে 'হায়' 'হায়' করছে। গাধার সক্রেটিসী চোখে দেখতে পেলাম সবগুলো মানুষের মুখে গাধাটে ভাব আর তাদের প্রত্যেকের মুখের সামনে ঝুলনো এক গুচ্ছ ঘাস, মুখ বাড়ালেই সেটা নাগালের বাইরেই এগিয়ে থাকছে। তাই দেখে গাধার সক্রেটিসী ছলছলে চোখ আরও ছলছল হয়ে উঠছে। সে যেন চেঁচাচ্ছে, "নিজেকে জান।" চারদিকে মানুষের হাততালি গাধার তামাসা দেখে। আর হতভাগা অজ্ঞান মূঢ় মানুষের কথা ভেবে গাধার চোখ বেদনায় বিষণ্ণ।

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

টাইগার হিলে সূর্যোদয়

(অদর্শনে)

টাইগার হিল! টাইগার হিল!
রামধনুকের দুলছে তোরণ বেগনে-সোনালী-ফিরোজা-সুনীল।
দূর মেঘে মেঘে জাগছে অবোবা,
বিদ্যুৎগতি ছোটে সাত ঘোড়া,—
দ্রুত চ'লে আসে সূর্যের রথ—ঘুমে ভরা ওই কাঁপছে নিখিল।
টাইগার হিল! টাইগার হিল!
চোখের পলকে খুলে গেছে আজ আঁধার-ঘরের সব কটা খিল।
হাজার নটীরা চরণ ফেলছে,
হাজার পরীরা পাখনা মেলছে,
হাজারো পাখীর সারঙে সেতারে ভরেছে আমার এ দরদী দিল।
টাইগার হিল! টাইগার হিল!
আমারো চোখের তারায় কাঁপিছে সূর্য-তারার কত-না মিছিল!
থেমে গেছে দূরে হায়নার হাসি,
মুগ্ধ সিংহ দাঁড়িয়েছে আসি,
নীল গম্বুজে মেরুন-সবুজে দ্যুলোকে ভূলোকে অবাধ এ মিল।

শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ

বসুদেব

যুগে যুগে ভগবান্ মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া, ধর্মকে গ্লানিমুক্ত ও অধর্মের অভ্যুত্থান প্রশমিত করিয়া থাকেন, গীতায় তিনি ইহা ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ধর্ম ত ভগবানেরই এমন এক মহতী শক্তি, যে শক্তিরূপে তিনি এই বিরাট্ জগৎ ও অনন্ত জীবমণ্ডলীকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন; সুতরাং ধর্ম ত তাঁহারই ন্যায় নিত্য, সত্য ও শাশ্বত বস্তু। তাহার মালিন্য-সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে। হাঁ, ধর্ম নিত্য, সত্য, শাশ্বতই বটে। কিন্তু দ্বন্দ্বময় এই জীবজগতে অধর্মকবলিত মনুষ্যরূপী আমাদের নিকট ধর্মের সেই সনাতন রূপটি সব সময় প্রতিভাত হয় না। যজ্ঞগৃহের বহির্দেশে অবস্থিত ব্যক্তির নেত্র যেমন যজ্ঞধূমে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, অধর্মের আবর্তনে আমাদের জ্ঞানদৃষ্টি তেমনি ক্ষীণ ও মলিন হইয়া যায়। তাই ধর্মের সনাতন রূপটি আমরা হারাইয়া ফেলি। তখন ধর্মভূমির বাহিরে দাঁড়াইয়া অসীম শূন্যে শূন্য অন্তরে আমরা পূর্ণের বা ধর্মের জন্য কাতর হইয়া পড়ি। তাই ভগবান্কে আসিতে হয়; শাশ্বত ধর্মকে প্রত্যক্ষ করিবার যোগ্য জ্ঞানদৃষ্টি অঞ্জন করিয়া ফুটাইয়া দিতে হয়। ইহারই নাম ধর্মকে গ্লানিমুক্ত ও অধর্মের অভ্যুত্থান প্রশমিত করা।

এই জন্য সমষ্টির প্রয়োজনে তিনি যেমন যুগে যুগে বিপুল শক্তি লইয়া জগতে অবতীর্ণ হন, তেমনি আবার ব্যষ্টির প্রয়োজনে ক্ষুদ্র জীবের অধ্যাত্মজগতে আবির্ভূত হইয়া তাহার জ্ঞানচক্ষু উন্মুক্ত করিয়া দেন। জগতে তিনি যখন যে রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, জীবের অধ্যাত্ম-জগতেও তাহার এক একটি প্রতিবিম্ব বর্তমান থাকিয়া, প্রত্যেক জীবকে ধর্মের পথে পরিচালিত করিতেছে। তাঁহার এই আবির্ভূতিটি যাহাতে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, সেই জন্য তাঁহার অবতরণের ভূমিস্বরূপ বসুদেবত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

বসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণরূপে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যে পুরুষ বসুদেব নহে, ভগবান্ তাঁহার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন না, ইহা বড়ই সত্য কথা। ভগবৎসাক্ষাৎকারে যিনি আগ্রহশীল, তাঁহাকে যেমন

কতকগুলি গুণ বা শক্তি অর্জন করিতে হয় এবং সেই গুণগুলি অর্জিত হইলেই যেমন তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা থাকে, তেমনি ভগবান্ যাঁহাকে পিতৃত্বে বরণ করিবেন, তাঁহারও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকা চাই। সেই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হইল বসুদেবত্ব।

'বসুদেব' শব্দের অর্থ কি? বসবো দেবা যস্য, বসুগণ যাঁহার দেবতা বসুগণকে যিনি দেবতারূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি বসুদেব। পাঠক হয় ত বলিবেন, যে ব্যক্তি যে নামের অধিকারী, সেই ব্যক্তিতে নামের অর্থানুরূপ গুণবত্তা আরোপ করা সঙ্গত নহে। কেন না, আজকাল ত দেখা যায় যে, ভীরু ও দুর্বল ব্যক্তি 'সমরেন্দ্র' এবং কাণা ছেলে 'পদ্মলোচন' নামের অধিকারী হইতেছে। কিন্তু যে সময়ের কথা আলোচিত হইতেছে, সেই পৌরাণিক যুগে অধিকাংশ ব্যক্তির আকৃতি ও গুণোচিত নাম দেখা যায়। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, পাণ্ডু, লোমশ, অষ্টাবক্র, অক্ষপাদ, কণাদ, বেদব্যাস, ইত্যাদি বহু নামে পাঠক ইহার দৃষ্টান্ত পাইবেন আর ভগবান্ যাঁহাকে পিতৃত্বে বরণ করিয়াছেন, নামের অর্থানুরূপ গুণ তাঁহাতে ছিল না, এ কথা বলা যায় কি?

বসুগণের 'বসু' এই নাম কেন? বসন্তি এষু প্রাণিনঃ সর্বে—প্রাণিবর্গ এই দেবগণেতে বসবাস করে, তাই ইঁহাদের নাম বসু। বেদ বলিতেছেন, প্রকৃতই আমরা দেবগণেতে বসবাস করি। এ বিষয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদের উক্তি—

> পুরুষো বাব যজ্ঞঃ, তস্য যানি চতুর্ব্বিংশতিবর্ষাণি,
> তৎ প্রাতঃসবনং···তদস্য বসবঃ অন্বায়ত্তাঃ।···এতেহি
> ইদং সর্বং বাসয়ন্তি।

এই যে হৃদয়স্থ চিন্ময় পুরুষ, ইনিই যজ্ঞ। যজ্ঞস্বরূপ পুরুষের যে চতুর্বিংশতি বর্ষ, তাহা তাঁহার প্রাতঃসবনঃ; এই প্রাতঃসবনের দেবতা বসুগণ। প্রাণিগণকে ইঁহারা নিজ নিজ অঙ্গে বসবাস করাইতেছেন। গীতা বলেন—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বং এষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥

পুরাকালে যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করিয়া প্রজাপতি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন—এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও এবং এই যজ্ঞ তোমাদের অভিলষিত বস্তুর দোহনকারী হউক।

উপনিষৎ বলিলেন—'পুরুষই যজ্ঞ'। গীতা বলিলেন—প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন, এই উভয় উক্তির একই অর্থ। সুতরাং মানুষ যজ্ঞময়, ইহাতে আর সন্দেহ রহিল না। এখন প্রশ্ন এই যে, যজ্ঞ কাহাকে বলে? যজ্ঞ অর্থে দেবগণকে দ্রব্য সমর্পণ। গীতা বলেন—

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥

তোমরা যজ্ঞদ্বারা দেবগণকে সম্বর্ধিত কর, দেবগণ তোমাদিগকে সম্বর্ধিত করুন। পরস্পর পরস্পরকে সম্বর্ধনা করিয়া তোমরা পরম শ্রেয়ঃ লাভ কর।

দেবগণকে যজ্ঞে সম্বর্ধনা করা কেন? তাহা না হইলে আমরা বড় হইতে পারি না, আমাদের বৃদ্ধি হয় না। বৃদ্ধি না-ই বা হইল, তাহাতে ক্ষতি কি? বৃদ্ধি না হইলেই তাহার বিপরীত সঙ্কীর্ণতা অবশ্যম্ভাবী। এ জগৎ শক্তিময়; শক্তি কখনও এক জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকে না। হয় উর্ধ্বে বা বৃদ্ধির দিকে, না হয় নিম্নে বা সঙ্কীর্ণতার দিকে সে ছুটিবেই। সুতরাং বৃদ্ধি না হইলেই আমাদের সঙ্কীর্ণতা আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং তাহার পরিণামে আমরা জড়ত্ব প্রাপ্ত হইব। সুতরাং আমরা দানদ্বারা দেবগণের সম্বর্ধনা করিব, প্রতিদানে দেবগণ তাঁহাদের বিপুল শক্তি দান করিয়া আমাদিগকে সম্বর্ধিত করিবেন। পরস্পর এইরূপ দান ও গ্রহণ দ্বারা আমরা পরমশ্রেয়ঃ লাভ করিব। যজ্ঞ কত রকম? নানারকম। দ্রব্য-যজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ ইত্যাদি বহুরকম যজ্ঞ। মনুষ্য নানাপ্রকৃতির; তাই যজ্ঞও নানাবিধ। দেবগণের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি? তরঙ্গরাজি বিস্তার করিয়া নদী সাগরাভিমুখে ছুটিয়াছে;

উহার প্রত্যেক তরঙ্গই যেমন নদীর একটু একটু জল লইয়া গঠিত, তেমনি এই যে জগৎরূপ দেবনদী ভোগবতী হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, ইহার তরঙ্গস্বরূপ আমরাও ঐ দেবনদীর একটু একটু জলেই গঠিত। দেবগণের একটু একটু অংশ লইয়া আমরা গঠিত হইয়াছি ; তাই দেবগণের সহিত আমাদের সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ ও মধুর। সেই জন্য আমরা যজ্ঞময়, দেবগণ যজ্ঞপতি হইয়া সৃষ্ট হইয়াছেন। বস্তুতঃ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সকল জীবই যজ্ঞ-পরায়ণ। তন্মধ্যে যিনি তাহা অনুভব করেন, তিনি যজ্ঞ-ফলভোক্তা, অন্য সকলে ফলভোগে বঞ্চিত।

পূর্বে দেখিয়াছি, যজ্ঞস্বরূপ পুরুষের চতুর্বিংশতি বর্ষ পর্যন্ত প্রাতঃসবন এবং ইহার দেবতা বসুগণ। আরও দেখিয়াছি, এই সব দেবতাতে আমরা বসবাস করি, সেই জন্য ইঁহাদের নাম বসু। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, দিক্, এই সবে আমরা বসবাস করি এবং ইঁহারাই বসুদেবতা। কই, ইঁহাদিগকে ত দেবতারূপে আমরা দেখিতে পাই না ? ইহার কারণ, আমরা অযজ্ঞশীল পুরুষ হইয়া ক্ষুদ্র হইয়াছি। তাই ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় ক্ষুদ্র ভিন্ন মহান্ কিছু দেখিতে পাই না। মনুষ্য-শরীরে একটা পিপীলিকা উঠিলে, সে যেমন গোটা মানুষকে দেখিতে না পাইয়া, তাহার বিচরণ-ভূমির ন্যায় জ্ঞান করে, আমরাও তেমনি দৈব চক্ষু হারাইয়া বসুগণকে চিনিতে পারিতেছি না এবং এই সবকে জড় পদার্থরূপে দেখিতেছি। দৈব চক্ষু কাহাকে বলে ? 'মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ', (ছান্দোগ্য)। যিনি যজ্ঞময় পুরুষ, মনই তাঁহার দৈব চক্ষু। এই চক্ষুতে বসুগণকে কি রকম দেখা যায় ?

প্রাণা বাব বসবঃ, এতে হি ইদং সর্ব্বং বাসয়ন্তি।—ছান্দোগ্য।

বসুগণ এক একজন প্রাণময় দেবতা। প্রাণিবর্গকে ইঁহারা নিজ নিজ অঙ্গে বসবাস করাইতেছেন।

'মন দৈব চক্ষু' ইহা দেখা গেল। তবে মন ত আমাদেরও রহিয়াছে এবং মনোদৃষ্টিতে আমরাও কিছু না কিছু দেখি ; কিন্তু তাহাতে ত এসবকে দেবতা বলিয়া দেখা যায় না। 'জগৎ মিথ্যা'—এই শিক্ষার

ফলে মনকে আমরা মিথ্যা করিয়া ফেলিয়াছি। তাই আমাদের মনশ্চক্ষু অন্ধ হইয়া অন্ধকার বা জড়পদার্থ ছাড়া আলো বা সত্যের জ্যোতি দেখিতে পায় না। জগৎকে মিথ্যা দেখিলে মন মিথ্যা হইবে কেন? আমি যে জগৎ উপলব্ধি করি, সে আমার মনেরই আকৃতি। সুতরাং জগৎকে মিথ্যা দেখিলে কার্যতঃ মনকে মিথ্যা বা শক্তিহীন জড় পদার্থবৎ দেখা হয়। প্রাচীন কালে ঋষিগণ জগৎকে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের সত্য প্রকাশ বলিয়া দেখিতেন এবং দেখিবার জন্য উপদেশ দিতেন। এইরূপ সত্যোজ্জ্বল মনশ্চক্ষুতে দেবগণ পরিদৃষ্ট হয়েন। সত্যোজ্জ্বল মনশ্চক্ষুতে দেবগণ কিরূপ দৃষ্ট হয়েন?

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।—কঠ।

জগৎ বলিয়া এই সব যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, [ব্রহ্ম হইতে] নিঃসৃত প্রাণই এইরূপে স্পন্দিত হইতেছেন। আবার দেখুন—

তস্য প্রাচী দিক্ প্রাঞ্চঃ প্রাণাঃ, দক্ষিণা দিক্ দক্ষিণে প্রাণাঃ,
প্রতীচী দিক্ প্রত্যঞ্চঃ প্রাণাঃ, উদীচী দিক্ উদঞ্চঃ প্রাণাঃ,
ঊর্দ্ধা দিক্ ঊর্দ্ধাঃ প্রাণাঃ, অবাচী দিক্ অবাঞ্চঃ প্রাণাঃ,
সর্ব্বা দিশঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ—বৃহদারণ্যক।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মহারাজ জনককে বলিতেছেন,—তাঁহার অর্থাৎ প্রাণবিৎ পুরুষের পূর্ব দিক্ পূর্বগত প্রাণ, দক্ষিণ দিক্ দক্ষিণ প্রাণ, পশ্চিম দিক্ প্রত্যক্ প্রাণ, উত্তর দিক উত্তর প্রাণ, উর্ধ্ব দিক্ উর্ধ্ব প্রাণ, অধো দিক্ অধঃ প্রাণ, সমস্ত দিক্ই প্রাণময়।

দৈব চক্ষু যাঁহার পরিস্ফুট হইয়াছে, জগতের সমস্তই তিনি প্রাণময় দর্শন করেন। আমরা ত জগতেই বসবাস করি। জগৎ প্রাণময় হইলে আমাদের বসবাস সুতরাং দেবগণেই হয়। ইঁহারা গণদেবতা অর্থাৎ বসুগণ সংখ্যায় আট।

প্রাণ আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয়। সেই প্রিয়তম প্রাণকে যদি জগৎরূপে বিস্তৃত দেখা যায়, তবে জগৎ কি রকম হইয়া যায়? মধুর, মধুর, মধুর, ইহাই আমাদের উক্তি হইবে না কি? এইরূপ মধুপুরী বা

মধুরা নগরীতে বসুদেবের হৃদয়ে ভগবানের অবতরণ যুগে যুগে ঘটিয়া থাকে। তাই মথুরার প্রাচীন এক নাম মধুরা।

বসুদেবের হৃদয়ে আবির্ভূত ভগবত্তেজ ধারণ করিবেন কে? তাঁহারই ধর্মপত্নী বা অধ্যাত্মশক্তিরূপিণী দেবকী। বসুগণ পুরুষবিশেষ হইলেও তাঁহারা অনন্তত্বের ভোক্তা অর্থাৎ এক একটি ভূত অনন্ত বলিয়া সেই সেই ভূতে অভিমানী বসুগণও নিজেকে অনন্ত বলিয়া দর্শন করেন। আর নদীর একটু একটু জল লইয়া গঠিত নদীতরঙ্গের ন্যায় ঐ ঐ দেবগণের একটু একটু অংশ লইয়া নির্মিত আমাদের অধ্যাত্ম দেবগণ তাদাত্ম্য লাভের পূর্বে অনন্ত নহেন, সান্ত বা ক্ষুদ্র। বসুগণকে প্রত্যক্ষ করিয়া যিনি বসুদেব হইয়াছেন, সেই সেই দেবগণের অংশে নির্মিত তাঁহার অধ্যাত্মক্ষেত্রও সুতরাং দেবময় হইয়াছে। তবে তাহা অনন্ত নহে—ক্ষুদ্র। তাই তাঁহার নাম দেবকী। দেব+ক্ষুদ্র অর্থে ক=দেবক, দেবক+ঈ=দেবকী। অধ্যাত্মশক্তিকে ধর্মপত্নী বলা হয় কেন? ধর্মাৎ পতন্তং ধর্মং নয়তি—স্বধর্ম হইতে পতিত আত্মাকে ইনি স্বধর্মে উন্নীত করেন, তাই ইঁহার নাম ধর্মপত্নী। আমাদের সামাজিক বিবাহবন্ধন এই তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অচ্ছেদ্য। কিন্তু আসুরিক ভোগোন্মত্ততার অনুকরণে আজ এই পবিত্র প্রাণবন্ধন ছিন্ন হইতে চলিয়াছে। যাক, সে অন্য কথা।

ভগবানের অবতরণক্ষেত্র বসুদেবত্ব কিঞ্চিৎ আলোচিত হইল। আজ আমরা বসুদেবত্ব বা অনন্ত জীবনের সম্ভোগে বঞ্চিত হইয়া 'বিষয়দেব' হইয়া পড়িয়াছি। এবং বিষয়বুদ্ধির প্রাথর্যে বেদালোচনায় অগ্রসর হইয়া আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছি যে, সভ্যতা বিকাশের সেই শৈশব যুগে ঝড় ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপদ্রবে ভীত ঋষিগণ সেই সবেতে দেবত্ব কল্পনা করিয়া যে স্তব স্তুতি করিতেন, তাহাই হইল বেদ। আরও অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের প্রতি জড়োপাসনার কর্দম নিক্ষেপেও আমরা পশ্চাৎপদ হই নাই। ইহাতে কাহাকেও দোষ দেওয়া চলে না। কেন না, এতদ্দেশে বেদবিদ্যা বহুকাল বিলুপ্ত এবং জড়বাদী বিদেশীয়গণের নিকট এইরূপ শিক্ষাই আমরা পাইয়াছি।

পঞ্চম অনুচ্ছেদে যজ্ঞের বিষয় বলা হইয়াছে। সেই যজ্ঞে প্রধানতঃ কোন্ দেবতা অর্চিত হইতেন, নিম্নবর্ণিত ছান্দোগ্যের উপাখ্যানে পাঠক তাহা দেখিবেন।—এক সময়ে কুরুদেশে শিলাবৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা শস্যহানি হওয়ায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। তথাকার ইভ্য নামক গ্রামে তখন উষস্তি নামে এক ঋষি সস্ত্রীক অন্নাভাবে বাস করিতেছিলেন। গ্রামের অদূরে রাজা যজ্ঞ করিতেছেন, এই সংবাদ পাইয়া তিনি যজ্ঞক্ষেত্রে গমনপূর্বক উদ্গাতৃগণের নিকটে বসিয়া প্রস্তোতাকে বলিলেন,—'এই স্তবের যিনি দেবতা, তাঁহাকে আপনি জানেন কি? দেবতাকে না জানিয়া স্তব করেন ত আপনার মস্তক নিপতিত হইবে।' ইহা শুনিয়া ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞ হইতে বিরত হইলেন। তখন রাজা আসিয়া উষস্তির পরিচয় গ্রহণান্তে তাঁহাকেই যজ্ঞসম্পাদনার্থ বরণ করিলে, প্রস্তোতা আসিয়া উষস্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কতমা সা দেবতেতি।' আপনি যে দেবতার কথা বলিয়াছেন, তিনি কোন্ দেবতা?

প্রাণ ইতি হোবাচ। সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি
প্রাণমেব অভিসংবিশন্তি, প্রাণম্ অভ্যুজ্জিহতে,
সৈষা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা···।

উষস্তি বলিলেন, সেই দেবতার নাম প্রাণ। কেন না, ভূতসকল প্রাণ হইতে উৎপন্ন হয়, এবং অন্তকালে প্রাণেই প্রবেশ করে। সুতরাং আপনি যে স্তব করিতেছেন, তাহার দেবতা প্রাণ।

প্রাণকে আমরা না জানিলেও এ কথা সত্য যে, প্রাণদেবতা আমাদিগকে এই জগতে আনিয়াছেন, তাঁহাতেই আমরা অবস্থান করিতেছি এবং আমাদের ইচ্ছা না থাকিলেও প্রাণই আমাদিগকে লোকান্তরে লইয়া যাইবেন। ঋষিগণ বেদে এই প্রাণেরই নানারূপ গাথা গাহিয়া গিয়াছেন।

শ্রীতারাপ্রসন্ন দেবশর্মা

চামড়া

জুতো জোড়ায় পা ঢুকাইতে গিয়া দেখি, হাঁ হইয়া আছে। যাত্রাপথে প্রথমেই বাধা পাইয়া মনটা খিঁচড়াইয়া গেল। এখন কোথায় পাই মুচি? জুতো জোড়া হাতে করিয়া দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলাম মুচির খোঁজে। যেহেতু মুচির খোঁজে দাঁড়াইয়া আছি, বোধ হয় সেইহেতু জাগতিক নিয়মানুসারে একজন নরসুন্দর বগলে কাঠের বাক্স চাপিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় আমার চুলের দিকে লক্ষ্য করিরা গেল; বুঝিল, সে কাজ আমার কয়েকদিন আগেই হইয়া গিয়াছে। আমার হাতের দিকে চাহিল; দেখিল, জুতা জোড়া ঝুলিতেছে। বুঝিল, আমি কাহার আশায় দরজায় দাঁড়াইয়া আছি। আর বুঝিল বলিয়াই বুঝি ফিক করিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল। আমি বিরক্তি চাপিয়া মুচির আশায় ব্যাকুল হৃদয়ে দাঁড়াইয়া রহিলাম। ব্যাকুল হইবার কারণ ছিল। আমার এক ব্যবসায়াভিজ্ঞ বন্ধুর কাছে যাইবার কথা নয়টার মধ্যে, অথচ এখন বাজিল প্রায় সোয়া সাতটা।

পড়িয়াছি, রাধা আকুল আগ্রহে কৃষ্ণের জন্য কুঞ্জে বসিয়া থাকিতেন। দেখিয়াছি, প্রেমে-পড়া ছেলে ব্যাকুল হৃদয়ে প্রেমিকার স্কুল-বাসের আশায় ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া থাকে। শুনিয়াছি, ব্যবসাদার হাপুস-নয়নে খদ্দেরের জন্য দরজার দিকে চাহিয়া থাকে। কিন্তু ছেঁড়া জুতা হাতে লইয়া মুচির শ্রীরূপ দর্শনের আশায় দাঁড়াইয়া থাকা কি যে ঝকমারি, সেদিন বুঝিলাম। বুঝিলাম হাড়ে হাড়ে। লোকের নাকি জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত শিখিয়া রাখা উচিত। চণ্ডীপাঠ করা না শিখিলেও ক্ষতি নাই হয়তো, কিন্তু জুতা সেলাই না শিখিলে এই কর্মব্যস্ততার যুগে সময়মত গিয়া কথা রাখার কোন উপায় নাই।

—ভুস!

কানে যেন মধু ঢালিয়া দিল কে! কিন্তু সে কই? শুধু তাহার বাঁশী-শুনেছি-গোছের ভাব লইয়া জুতা হাতে করিয়া খালি পায়েই ছুটিলাম সামনের গলির মুখে। ওই যে আসিতেছে! পিঠে চামড়ার পুঁটলি, কাঁধে লোহার তেপায়া। এস হে, এস হে, এস হে। মুচি

আসিল। আমার জুতা ইন্সপেকশন করিয়া যাহা বলিল, তাহার গূঢ় অর্থ হইল এই : শুধু সেলাই করিলে চলিবে না; অর্থাৎ পরিয়া চলিতে পারিবেন না, অথবা খানিকটা চলিবার পর পথের মাঝেই আবার 'ফটাস' হইয়া যাইতে পারে এবং তখন অচল হইয়া যাইতে হইবে। অতএব নূতন চামড়ার হাফসোল লাগাইয়া লউন বহুদিন যাইবে, বিনা আশঙ্কায় বহুদূরও যাইতে পারিবেন। তারপর ব্যবসায়সুলভ কায়দায় তাহার চামড়া, মানে তাহার কাঁধে-ঝুলানো পাকা গোচর্মখণ্ডটিকে আমাকে দিয়া ইন্সপেকশন করাইল এবং পাকা ব্যবসাদারের মত সমঝাইয়া দিল, অমন পাকা চামড়া নাকি কোন মুচির নিকট পাওয়া যাইবে না। সুতরাং তাহার বচনে রাজী হইয়া গেলাম, দরেও। কারণ সময় নষ্ট করিবার মত সময়ের তখন বড় অভাব।

সেলাই-করা জুতা পায়ে দিয়া নির্ভয়ে এবং নির্বিঘ্নেই বন্ধুর বাড়ি আসিয়া পৌঁছিলাম। পরের স্ত্রী ও পরিবারের একেলে স্বাধীনতায় বন্ধুবর, পরম উৎসাহী হইলেও নিজ স্ত্রী ও পরিবারের ব্যাপারে বড়ই সেকেলে-গোছের। এমন কি বাহিরের ঘরে পর্যন্ত চেয়ার-টেবিলের বদলে সেকেলে ফরাশ পাতা। বন্ধুটি খালি গায়ে ফরাশে বসিয়া ছিলেন। আমাকে দেখিয়া দুই বাহু তুলিয়া কোলে করিবার ভঙ্গীতে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, আরে, এস এস। এত দেরি যে!

আর ভাই, জুতো।

কেন, জুতো কি হ'ল?

হাসিয়া বলিলাম, না, জুতো প'রেই এসেছি। তবে জুতো সেলাই ক'রে তবে প'রে আসতে হ'ল। পায়ের অভ্যস্ত চাপে জুতা জোড়া খুলিয়া ফরাশে আসিয়া বসিলাম।

বন্ধুবর আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, যাক। এখন কি ব্যাপার বল তো? হঠাৎ আমার সঙ্গে তোমার কি এমন পরামর্শের দরকার হ'ল? ছেলের বিয়ে? না, মেয়ের?

আর ভাই! জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে ও-সব তো বিধাতা দিয়ে। তাঁর

ভাববার কথা। আমি ভাবছি, ছেলেটা এবার করবে কি! বি. এ. পাস তো করল।

ঠিক বটে।—বন্ধুবর হাসিয়া বলিলেন, মেয়েদের জন্যে বিয়ের আগে ভাবতে হয়, ছেলেদের জন্যে বি. এ.র পরে। তা তোমার মতলবটা কি বল?

বাড়ির মধ্যে হরদম শুনি—তোমার মতলবের কোন ঠিক নেই। হয়তো সত্যই। তাই বলিলাম, ভাই, আমার মতলব বলতে কিছু নেই। তুমি একজন ব্যবসাদার লোক, তাই তোমার কাছেই আসা মতলব নিতে।

তবে ব্যবসায় নামাও তোমার ছেলেকে।—বন্ধু উপদেশ দিলেন।

বলিলাম, মন্দ কি! যা চাকরির বাজার! কিন্তু কিসের ব্যবসা?

বলব?

অবাক আমি। বলিলাম, বলই না।

ঘাবড়িও না যেন।

বুকের ভিতরটা আশঙ্কায় দুলিয়া উঠিল। মুখে বলিলাম, না না। বলই না কিসের ব্যবসা?

চামড়ার।

বুকের ভিতর আশঙ্কার দোলনাটা আরও জোরে দুলিয়া উঠিল। আর তাহারই তালে তালে হৃৎপিণ্ডটা ঢ্যাবঢ্যাব করিয়া আওয়াজ করিতে লাগিল, যেন চামড়া-ফাঁসা ঢোলে চাঁটি কষিতেছে কেহ।

বন্ধুবর রিমাইণ্ডার দিলেন, কি হে! চুপ মেরে গেলে যে?

চুপ মারিয়ে দিলে চুপ মারব না?—ম্লান হাসিয়া বলিলাম, বলি, জাত মারবার তালে আছ না কি?

এবার বন্ধুর পালা। বলিলেন, ভাত মারার চাইতে জাত মারা ঢের ভাল। ভাতের হাঁড়ি খালি রেখে জাত নিয়ে সব ধুয়ে খাও। চামড়া শুনেই ঘেন্না? না? কিন্তু চামড়া কোথায় নেই বল? আমি তো দেখি সর্বত্র—ঘরে বাইরে।

ঘরে ?—আমি প্রায় চিৎকার করিয়া উঠিলাম।

হ্যাঁ হে মক্কেল, ঘরে।—বন্ধু ঠোঁট বাঁকাইয়া হাসিয়া বলিলেন, ঘরে গিয়ে আবার প্রচার ক'রো না যেন। বলি, টিউবওয়েলের জল যে খাও—আঃ, কি ঠাণ্ডা ব'লে—ওই পাম্পের ওয়াশারটি কিসের জান ? চামড়ার। অনেক জায়গায় ভিস্তি চামড়ার ব্যাগে জল এনে দেয়, তবে আমাদের জাতভাইদের হাত-মুখ ধোয়া হয়। আর ঘরের মধ্যে জুতো, চামড়ার স্যুটকেস, চামড়া-বাঁধাই বই, পকেটে চামড়ার ব্যাগ, কোমরে চামড়ার বেল্ট, হাতে রিস্টওয়াচের ব্যাণ্ড, সে বেলায় কি ? আরে বাবা, এ যুগটাই চামড়ার। ইংরেজ চ'লে যেতে না যেতেই সাদাচামড়া-কালোচামড়ার গুণাগুণ ভুলে গেলে নাকি ? এখনও তো চলছে চামড়ার খেল আফ্রিকায় মাউ-মাউদের নিয়ে, আমেরিকায় নিগ্রোদের সঙ্গে। সেখানে সাদারা কালোদের পিঠের চামড়া তোলবার তালে আছে ; ভুলেও ভাবে না, কালো-চামড়ার ভিতরের রঙটা কিন্তু লাল ওদেরই মত !—প্রভুত্বের জন্যে চামারের মত ব্যবহার।

বন্ধুবরের মুখের দিকে চাহিয়া ছিলাম। দেখিলাম, তাঁহার কপালের চামড়া কুঞ্চিত। আবেগে তাঁহার মুখের চামড়ার রেখাগুলি ক্ষণে ক্ষণে বদলাইতেছে। অনুভব করিলাম, আমার শরীরও রোমাঞ্চিত।

বন্ধু হাত-পা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, আর কি জান, রাজনীতির ব্যাপারই ওই। নেতা হতে চাও ? নিজের গায়ের চামড়াটি আগে গণ্ডারের চামড়ার মত পুরু করতে হবে ·· ·র চামড়া ব'লে কিছু থাকলে চলবে না। আর নিজের গুণকীর্তন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে নিজেকেই করতে হবে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে ; বাঁশী-খঞ্জনি সেখানে অচল।

হাসিয়া বলিলাম, সত্যি ভাই, চামড়ার বিষয়ে তোমার অসীম জ্ঞান। এত জানলে কি ক'রে ?

এবার হাসিলেন বন্ধু। নিজের চোখ দুইটা দুই আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, এই চর্মচক্ষু দিয়ে সংসারের হালচাল একটু লক্ষ্য করলেই সব দেখা যায়। দেখ নি, গান-বাজনার আসরে আর বিয়ের বাসরে চামড়ার

আদর ? চামড়া-ছাওয়া বাঁয়া-তবলায় চাঁটি মেরে বোল ফোটাতে ক· কসরৎ! ওটি না হ'লে আসর জমানো দায়। আবার মেয়ে যদি কটা চামড়ার না হয়, তবে ছেলের বাপের মুখের বোল থামাতে রূপোর ঠোঁটে· দরকার। জুতোর বাজারে সাদা বাদামী কালো চামড়ার জুতো· প্রায়ই একই দাম ; সাদা পাঁঠা কালো পাঁঠার মাংস একই ; সাদা গরু, কালো গরুর দুধের স্বাদে তফাত নেই, কিন্তু বিয়ের বাজারে কটা মেয়ে আর কালো মেয়ের তফাত কিন্তু আকাশ-পাতাল। খাঁদা হোক, বোঁচা হোক, ট্যারা হোক, নেড়া হোক, মেড়া হোক—তোমার মেয়ের চামড়া যদি কটা হয়, সহজেই ত'রে যাবে। আর যদি তা না হয়, তুড়ি লাফ পাড়তে হবে মেয়ে তরাতে। বুঝলে বন্ধু ?

বুঝলাম।

তবে বুঝলে ভায়া, এই মেয়েদের চামড়ার দৌলতে স্নো-ক্রীম-সাবান-পাউডারওলারা কিন্তু ফুলে গেল। ছাইভস্ম যা চালাচ্ছে, তাই ঘষছে চামড়ায়। আজকাল আবার নাকি নাটক-নভেলে সিনেমা-থিয়েটারে দেখি কোত্থেকে পট ক'রে একটা পাড়াতুতো দাদা জুটে যায়, আর সে মেয়েটার মাথায় হাত বুলিয়েই গায়ে হাত বোলাবার তালে থাকে ; আর জাঁহাতক মেয়েটার গুণ গায়, মেয়েটা তারস্বরে গান গাইতে শুরু করে ছেলেটার গা ঘেঁষে পাশাপাশি ব'সে। যাই বল বাপু, চামড়ার অস্পৃশ্যতা ব'লে আজকাল আর কিছু নেই।

তা ব'লে গরুর চামড়া অস্পৃশ্য কিন্তু।

তুমি তা হ'লে চামড়ার ব্যবসায় রাজী নও।

হিন্দুর ছেলে কি ক'রে রাজী হই বল ?

বন্ধু দাঁত খিঁচাইলেন—পাকা চামড়ার দোষ নেই, যত দোষ কাঁচা চামড়ার ? ছাগল-গরুর দুধ খেতে পার, তার চামড়ার ব্যবসা করলেই জাত গেল ? ডাবের জল খেয়ে যাদের শাঁস ফেলা অভ্যেস তাদের আর কি হবে ? চামড়ার ব্যবসা ক'রে যারা ফোলবার ফুলে গেল, আর আমরা শুকিয়ে অস্থিসার চামড়ায় ডুগডুগি বাজাবার যোগাড়।

খোঁচা দিয়াই বলিলাম, তা তোমার যখন চামড়ায় এত লোভ, চামড়ার ব্যবসা তুমি করলেই তো পারতে!

বন্ধু এবার হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, আমি বুঝি বন্দু না? হাসালে দেখছি।

হাসালে তো তুমি।

তবে এস দুজনেই হাসি।—বন্ধু আমাকে কাছে টানিয়া লইয়া পাড়া মাতাইয়া হাসিতে লাগিলেন। হাসির ছোঁয়া লাগায় আমিও হাসিলাম। পরে হাসি থামাইয়া বোকার মত জিজ্ঞাসা করিলাম, বলি, অত হাসির কারণটা কি?

কারণ?—বন্ধু হাসিতে হাসিতেই বলিলেন, নিজে যে কাজ করে না, অথচ পরকে করতে উপদেশ দেয়, তার চামড়াটা যে কত পুরু তা একবার ভেবেও দেখলে না ব্রাদার? এই আমার কথা বলছি।

বন্ধুবরের কথা শুনিয়া থ বনিয়া গেলাম।

* * * *

অন্যমনস্ক হইয়াই বাড়ি ফিরিতেছিলাম। হঠাৎ এক ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়া আমার ঘাড়ের উপর লাফাইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই নিজেকে কোন রকমে সামলাইয়া লইলাম। বুঝিলাম, কচুয়ানের চর্ম-চাবুকের চোটেই ঘোড়াটা ছটফট করিয়া উঠিয়াছে। আর বুঝিলাম, চর্ম-চাবুকই সংসারের রথ চালু করিয়া রাখে। আরও বুঝিলাম, চর্ম-পণ্ডিত বন্ধুবরের সংসার-ধর্মে অগাধ জ্ঞান।

বাড়ি ফিরিয়া কড়া নাড়িতেই দরজা খুলিয়া দিল আমার বড় মেয়ে। হঠাৎ চিনিতে পারি নাই। সারা মুখে হাতে কি যেন ঘষিয়াছে! জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, বেসন আর কাঁচাহলুদ-বাটা।

উপরে উঠিয়া দেখি, গৃহিণীর মুখ তেলে চকচকে করিতেছে।

ও কি গো, অত তেল মেখেছ!—বলিতেই তিনি ফিক করিয়া হাসিয়া বলিলেন, তেল নয়, সর-ময়দা।

ঘরে আসিয়া গলার চাদরখানা আলনায় গুছাইয়া রাখিতে গিয়া

নিজেরই অজ্ঞাতে নিজের মুখখানি আরসিতে দেখিতে পাইলাম দেখিলাম, মুখের চামড়া কুঁচকাইতে শুরু হইয়াছে, অর্থাৎ প্রৌঢ়ে আসিয়াছি। নিজের হাত দুইখানি আপনা হইতে আসিয়া মুখখানিকে এক ফাঁকে মাসাজ করিয়া দিল। হঠাৎ কানে আসিল গানের এক কলি—কালা তোর তরে কদমতলায় চেয়ে থাকি—ই—ই। বুঝিলাম, কালাচাঁদ যথারীতি সাবান ঘষিয়া ঘষিয়া সরবে স্নান করিতেছে।

পুত্রপ্রবর জানিতে পারে নাই, আমি বাড়ি ফিরিয়াছি।

শ্রীকুমারেশ ঘোষ

পলাশপুরের চিঠি

কলকাতা থেকে পালিয়ে এসেছি চারটে দিনের তরে
লাল কাঁকরের আঁকাবাঁকা পথ আমাকে আনল ডেকে।
পলাশপুরের বনে মাঠে, আহা, কত হাওয়া হু-হু করে,
সারা চোখে মুখে নিলাম নিলাম মুঠো মুঠো রোদ মেখে।
এখানে আকাশ ফাঁকি দেয় নাকো সবটুকু নীলে ঢাকা
হাতঘড়ি দেখে চলতে এখনও হয় নি জীবনটারে।
নির্ভয়ে দেখি, জলাজঙ্গলে হরিয়াল মেলে পাখা—
সকাল এখানে চমকে উঠে না হুকারের চিৎকারে।
সাড়ে ছয় ক্রোশ দূরে প'ড়ে আছে রেলের ইস্টিশান
এখানে আসতে পারে ওখানের পিলে-চমকানো সিটি?
হপ্তায় মেলে একবার ডাক-পিওনের দর্শন।
আসবে কি ক'রে ইনিয়ে-বিনিয়ে মঞ্জুলিকার চিঠি?
প্রতিদিনকার উঠি-উঠি রোদে গঞ্জের পথে যায়
টুকরো কথার গুঞ্জন তুলে দেহাতী মেয়ের দল।
রাস্তায় যেতে একটি তাদের হঠাৎ এদিকে চায়,
আহা, সে মেয়ের সারা দেহে করে যৌবন টলটল।
এখানে কখন ভুলে গেছি আমি ট্রাম বাস্ কলকাতা,
উতল হাওয়ায় মেলে ধরলাম নয়া কবিতার খাতা।

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

ভর

ডুডুম্-ডুডুম্-ডুম্। কাষ্ঠগড়ের বুড়ো বটগাছের নীচে রক্ষাকালীর বাৎসরিক পূজা আজ। মস্ত বড় মেলা বসেছে সেই উপলক্ষ্যে। সেই ভোর থেকে জয়ঢাকের শব্দ বাতাসে তরঙ্গ তুলে ছড়িয়ে যাচ্ছে ধু-ধু ফাঁকা মাঠের উপর দিয়ে কাশীপুকুর, সোদপুর, খরলপাড়া ছাড়িয়ে আরও দূরে। দূর দূর গ্রাম থেকে অবস্থাপন্ন গৃহস্থেরা গরুর গাড়িতে ক'রে আসছে। গরুর গলায় ঘণ্টা-ঘুঙুরের ঝমঝমানি শব্দে সচকিত হয়ে উঠছে চারিদিক। কাঁচা মাটির রাস্তার লাল ধুলোয় ছেয়ে যাচ্ছে দু পাশের ধান-কাটা ফাঁকা মাঠ। কাষ্ঠগড়ের বটগাছের নীচে রক্ষাকালীর থান। বহুদিনের পুরানো বটগাছ—মোটা মোটা ডাল থেকে শিকড় নেমে স্তম্ভের মত রচনা করেছে চারিদিকে। নীচেটা নিবিড় নীলাভ ছায়ায় স্যাঁতসেঁতে। সূর্যের আলোর এক চিলতিও সেখানে আসে না। কালীর মণ্ডপের চারিদিকে মেলা জ'মে উঠেছে।

গিজগিজ করছে অসংখ্য মানুষ। মিষ্টির দোকান থেকে ছেলে-বুড়ো ভিড় ক'রে জিলিপি কিনছে, খুরমা কিনছে। তিন পয়সা দামের হিমানী, মাছধরা বঁড়শি, কোমরের ডোর কিনছে মনিহারী দোকান থেকে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সবাই আনন্দে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ছে; নতুন কেনা বাঁশীতে ফুঁ দিচ্ছে; তেলে ভাজা জিলিপি খাচ্ছে। আর এক-একবার ছুটে যাচ্ছে মণ্ডপের সামনে, খোঁজ নিয়ে আসছে রক্ষাকালীর ভক্ত গোবরার ভর হয়েছে কি না! ঢাকের শব্দে আর শত শত মানুষের কলরোলে কাষ্ঠগড়ের পাশ দিয়ে ব'য়ে-যাওয়া আত্রাই নদীর নিস্তরঙ্গ জলও কেঁপে কেঁপে উঠছে। আশপাশের গ্রামের মোড়লদের কিন্তু মেলার দিকে নজর নেই। তারা সবাই মণ্ডপের চার পাশে গোল হয়ে ব'সে উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গোবরার দিকে। রক্ষাকালীর পায়ের নীচে থানের কাছে ব'সে আছে গোবরা। রোদে-পোড়া তামাটে গায়ের রঙ। শক্ত পাকানো চেহারা। কপালে জ্বল-জ্বল করছে একটা সিঁদুরের ফোঁটা।

মুগ্ধ তন্ময় চোখে মা-কালীর মুখের দিকে তাকিয়ে সে নিশ্চল হয়ে

ব'সে আছে। এত অসংখ্য লোক যে তার দিকেই তাকিয়ে আছে, সেদিকে গোবরার ভ্রূক্ষেপ নেই। এ অঞ্চলের গ্রামের লোকের বিশ্বাস, গোবরার যখন ভর হয় তখন স্বয়ং রক্ষাকালীই তার মুখ দিয়ে কথা বলেন। তাই দূর দূর গ্রাম থেকে এমন অনেক লোক এসেছে যাদের কারও ছেলের অসুখ, কারও স্ত্রী বন্ধ্যা, আবার কারও বা গ্রহের দোষে সময় খুব খারাপ যাচ্ছে। রক্ষাকালী গোবরার মারফত ওই সব অসুখের ওষুধ এবং দুগ্রহ দূর করবার ব্যবস্থা বাতলে দেন। যে ওষুধ বলেন তা নাকি একেবারে ধন্বন্তরি, অসুখ নির্ঘাত ভাল হয়। গ্রামের প্রবীণ মাতব্বরেরা কিন্তু নিজেদের সুবিধা-অসুবিধার কথা গোবরাকে জিজ্ঞাসা করে না। তারা বলে সারা গ্রামের কথা, ফসলের কথা, ক্ষেতখামারের কথা। হাত জোড় ক'রে সমবেত জনতা শোনে গোবরার উক্তি। বিশ্বাসের আলোয় তাদের চোখগুলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ফসল হবে না, অজন্মা হবে, কি গবর্নমেণ্ট ধান নিয়ে নেবে—এসব অশুভ কথা শুনলে আশঙ্কার কালো ছায়া ঘনিয়ে আসে তাদের মুখে। অনাগত দুর্দিনের আতঙ্ক তাদের বুকে চেপে বসে। হঠাৎ চারিদিক সচকিত ক'রে উল্লসিত হয়ে চিৎকার ক'রে উঠল দেবেন ঠাকুর—গোবরার ভর হইছে রে,—ভর হইছে। এই বাজনদার, সামাল—

ঠিকরে-পড়া চোখে সবাই তাকিয়ে দেখলে, গোবরার ডান হাতটা হাওয়ায় কাঁপা বাঁশপাতার মত থরথর ক'রে কাঁপছে। রক্তের ডেলার মত দুটো চোখে ভয়ানক উগ্র দৃষ্টি, পেশীগুলো শক্ত পাথরের মত হয়ে ফুটে উঠল তার সারা শরীরে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর গোবরার ভর হয়েছে। মণ্ডপের চারিদিকের সমস্ত লোক আনন্দে জয়ধ্বনি ক'রে উঠল—কালী-মাইকী জয়! দ্বিগুণ হয়ে উঠল ঢাকের শব্দ। সমস্ত মেলার লোক ছুটে এসে গোল হয়ে দাঁড়াল মণ্ডপের পাশে। উঠে দাঁড়িয়েছে গোবরা। অস্ফুটগলায় বিড় বিড় ক'রে কি যেন বকছে! কাঁপুনির ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে তার বিশাল দেহটায়। দেখতে দেখতে তার পাকা বাঁশের মত শক্ত শরীরটা ধনুকের মত পিছন দিকে বেঁকে গেল। আর

মুখের দু পাশ দিয়ে সাদা গ্যাঁজলা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। দেবেন ঠাকুর চড়াগলায় মন্ত্র পড়ছে আর মাঝে মাঝে চরণামৃতের জল ছিটিয়ে দিচ্ছে গোবরার গায়ে। কেউ কেউ আবার চিৎকার ক'রে সাবধান ক'রে দিচ্ছে ঢাকীকে—সামাল ভাই, জোরসে চালাও, তাল যেন না কাটে। ঢাকী নেচে নেচে প্রাণপণ শক্তিতে কাঠির বাড়ি মারছে ঢাকে। সেই তালে চলছে কাঁসির আওয়াজ। একটু পরেই গোবরার দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। রক্ষাকালীর পায়ের নীচে থানের উপর মাথা দিয়ে কাত হয়ে প'ড়ে রইল। কিছুক্ষণ পর গোবরা উঠে ব'সে উদ্‌ভ্রান্ত চোখ দুটো মেলে দেখতে লাগল তার চারিপাশের অজস্র মানুষের ভিড়। দেবেন ঠাকুর চোখ দিয়ে ইঙ্গিত করতেই বদিহার গাঁয়ের মাতব্বর ভুবন দাস এগিয়ে এল। তারই উপরে এবার প্রশ্ন করার ভার পড়েছে। ভুবন হাঁটু গেড়ে হাত জোড় ক'রে গোবরার সামনে ব'সে কম্পিতগলায় জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা মা, এ সনে ধান কি রকম হবি?

ভালই হবি।—আকাশের দিকে তাকিয়ে জড়িত গলায় গোবরা বললে, কিন্তু ধান পাকার পর পঙ্গপাল পড়বি।

আবার প্রশ্ন হ'ল—গরু-মোষের মড়ক হবি কি না?

খুব সামান্য হবি, বেশি ক্ষতি করবা পারবে না।

তারপর এগিয়ে এল দুরারোগ্য রোগীর অভিভাবকরা। অমৃত মণ্ডল হাত জোড় ক'রে বললে, হামার বড় ব্যাটার আজ না হ'ল দু সন থেকে কালাজ্বর—অনেক ওষুধবিষুদ করিছি। ভাল হচ্ছে না ক্যান?

উত্তর পাথারের ধারে আটিশ্বরী গাছের মত এক রকম গাছ আঁছে, তার শিকড় বেটে খাওয়া।

দুর্লভপুরের পাঁচ-শো বিঘার জোতদার তিনকড়ির মা কান্না-মাখা গলায় বললে, ব্যাটার বিয়া হইছে পাঁচ বছর আগে, ছাওয়াল হচ্ছে না ক্যান?

ধুম ক'রে কার্তিকপূজা করেক, ছাওয়াল হবি।

আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তিনকড়ির মার চোখ দুটো। ধীরে ধীরে

গোবরার দু চোখের দৃষ্টি শান্ত স্বাভাবিক হয়ে এল। দেবেন ঠাকুর তা মাথায় ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে উঁচু গলায় ঘোষণা করলে, গোবরা ভর কেটে গেছে—তোমরা সব ওকে আর ঘিরে থাকো না, বাতাস ছাড়ে দাও—

সবাই মেলার দিকে যেতে শুরু করল। প্রত্যেকেই পঞ্চমুখ হয়ে উঠল গোবরার প্রশংসায়।

পশ্চিমের আকাশে মুঠো মুঠো আবির ছড়িয়ে দিয়ে সূর্য অস্ত গেল গেরুয়া-রাঙা হয়ে উঠল আত্রাইয়ের জল। আসন্ন রাত্রির রঙে মলিন হয়ে উঠল কাশীপুকুর গ্রামের শিবমন্দিরের চূড়াটা। শত শত মানুষের কলরোলে মুখরিত মেলার মাঠটা ধীরে ধীরে জনমানবশূন্য হয়ে গভীর নিস্তব্ধতায় তলিয়ে গেল। গোবরা উপুড় হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে রক্ষাকালীকে প্রণাম ক'রে বাড়ির দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল। ক্লান্তিতে তার সারা শরীর যেন ভেঙে আসছে। তবুও গোবরার মনের মধ্যে আনন্দ যেন সুরভি হয়ে গ'লে গ'লে পড়ছে। আজ তার কত নাম কত খ্যাতি, রক্ষাকালীর শ্রেষ্ঠ ভক্ত সে। হঠাৎ গোবরার চোখে পড়ল, দূরে চারিদিকের দিক্‌চিহ্নহীন অন্ধকারের সমুদ্রে বুদ্বুদের মত জ্বলছে দু-তিনটি আলো—কাশীপুকুরের রাজবংশীপাড়া। বাড়ির কাছে আসতেই কিন্তু অজস্র লোকের প্রশংসা পাবার আনন্দটা ফিকে হয়ে এল। বিদ্যুৎচমকের মত গোবরার মনের মধ্যে জেগে উঠল সুরবালার শীর্ণ মুখখানা। সোনার মত ছিল তার গায়ের রঙ। অটুট স্বাস্থ্যের লাবণ্যভরা খুশি-উচ্ছল ঝলমলো মেয়ে সেই সুরবালা তার ঘরে এসে একদিনের জন্যও সুখের মুখ দেখতে পেল না। এই আশ্বিন কার্তিক মাস থেকেই শুরু হয় অভাবের সময়। এক-একটা দিন যায় না তো যম যায়। অনাহারে আর অর্ধাহারে সুরবালার সেই পরিপুষ্ট শরীরটা শুকিয়ে কাঁটার মত হয়ে গেছে। ঠেলে উঠেছে গলার হাড়টা। সবুজ হিলহিলে সাপের মত শির বের হয়েছে তার নিটোল হাত দুটোয়।

বুক উজাড় ক'রে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঘন অন্ধকারে ছেয়ে থাক

বাড়ির উঠানটায় এসে দাঁড়াল গোবরা। খুব সন্তর্পণে ভেজানো দরজাটা খুলতেই দেখলে, ঘরের মেটে প্রদীপটা বুক জ্ব'লে নিবে যাচ্ছে, আর একমাথা রুক্ষ চুল ছড়িয়ে দিয়ে মেঝেয় ছেঁড়া মাদুরের উপর ঘুমিয়ে পড়েছে সুরবালা। গোবরার পায়ের শব্দে জেগে উঠল সে। ঘুম-জড়ানো চোখ দুটো রগড়ে নিয়ে ধারালো গলায় বললে, কি, কালীর থানে তোমার নাচন-কোঁদন শ্যাষ হ'ল? লোকের মুখে মুখে তোমার তো খুব নাম! হুঁ, কথায় আছে না—নামে গগন ফাটে, হাঁড়িপাতিল কুকুরে চাটে, তোমার হইছে তাই। আজ না হ'ল এক মাস থেকে অক্ষাকালীর নামে তোমার চান খাওয়া মাথায় উঠি গেছি। আর এদিকে যে ভিটেমাটি বাড়িঘর সব রসাতলে যাছে, সেদিকে কি খেয়াল আছে তোমার? তুমি হামাক অনেক কষ্ট-দুখু দিছেন, শ্যাষ পর্যন্ত তুমি গাছতলাত দাঁড় করালেন—। কান্নায় ভেঙে পড়ল সুরবালা। উত্তেজিত গলায় চিৎকার ক'রে উঠল গোবরা, কি হইছে কি, আগে তো বল্? তুই কাঁদছ ক্যান? সুরবালা বিছানার নীচে থেকে ট্রেজারির ছাপ-মারা একটা লম্বা লাল কাগজ বের ক'রে নিয়ে এল। গোবরার হাতে দিয়ে বললে, তারণ চৌকিদার এটা হামাক দিয়ে বুলে গেল—মোড়লকে বলিস, আদালতের নুটিশ দিয়ে গেনু। এই মাসের শ্যাযে বাড়ির সব জিনিস ক্রোক করবি; সব জমিও নাকি নীলাম হয়ে যাবি। মুহূর্তে বিশখানা গ্রামের লোক যাকে এক ডাকে চেনে, রক্ষাকালীব ভক্ত ব'লে যাকে শ্রদ্ধা করে সবাই, সেই দীর্ঘ বলিষ্ঠ মানুষটাকে আশ্চর্যভাবে অসহায় মনে হ'ল। আচমকা থমকে দাঁড়াল গোবরার হৃৎস্পন্দন। শূন্যচোখে প্রদীপটার দিকে তাকিয়ে ব'সে রইল। তার মনে পড়ল, জোতদার হরেন চৌধুরী মশাই আদালতে নালিশ করবে ব'লে শাসিয়েছিল। দশ বছরের খাজনা বাকি। চৌধুরী বোধ হয় খাজনা-বাকির নালিশ ক'রে ডিক্রী পেয়ে গেছে। সুরবালার চোখের জলে ভেজা মুখখানার দিকে তাকিয়ে গোবরার বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। ম্লান চোখে সুরবালার দিকে তাকিয়ে অবসন্ন গলায় গোবরা বললে, তুই কাঁদিস না সুরো। কাল বিহানেই চৌধুরী-

বাবুর কাছে যামু। তার পা ধ'রে কান্নাকাটি করমু, দেখি যদি কিছু করবা পারি—

স্থরবালা কোন কথা বললে না। দুই হাঁটুর মধ্যে মাথাটা ঝুলিয়ে দিয়ে ব'সে রইল গোবরা। গোক্ষুর সাপের মত পাকে পাকে জড়িয়ে আছে মহাজনের ঋণ। অথচ সবই তার আছে। সাত বিঘার উপরে ধানি জমি আছে, ধানও হয় তাতে। পৌষ-মাঘ মাসে নীল আকাশের সীমায় সীমায় একাকার হয়ে যায় সোনার বরণ ধানের ক্ষেত। সেই পাকা ফসলের মিষ্টি গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে তার কত স্বপ্নই দেখে! কিন্তু— হিংস্র নেকড়ের থাবার মত ক্ষেতের ফসলে হাত পড়ে জমিদারের মহাজনের। বছরে ছ মাস তাদের না খেয়ে থাকতে হয়, ঋণের দায়ে উজাড় হয়ে যায় ভিটেমাটি—

পরদিন সকালে গোবরা চৌধুরী-বাড়ির দেউড়িতে এসে দাঁড়াতেই দেখলে, দু হাজার বিঘার জোতদার হরেন চৌধুরী মোড়ায় ব'সে তামাক টানছেন। বাতাসে ভাসছে বালাখানা তামাকের মিষ্টি গন্ধ। চৌধুরী মশায় হরিভক্ত মানুষ। গলায় তিন থাক তুলসীকাঠের মালা, নাকে রসকলি। ত্রিসন্ধ্যা জপ না ক'রে উনি অন্নজল স্পর্শ করেন না। কিন্তু সবাই - সবাই জানে ঐ হরিভক্ত মানুষটির ধবধবে ফরসা রঙের মেদস্ফীত চেহারাটার আড়ালে লুকিয়ে আছে অনেক রক্তশোষণের ইতিহাস। টাকার লগ্নী কারবার, ধান-চালের কালো কারবার ক'রে গ'ড়ে উঠেছে তার ঐশ্বর্যের বনিয়াদ—এই চক-মেলানো বাড়ি, বাগান, পুকুর আর ভরি ভরি গয়না। তার সরীসৃপ-গ্রাস থেকে রক্ষা পায় নি বহু অনাথা বিধবার, দুঃস্থ চাষীর জমি। গোবরাকে দেখেই মধু-ঝরা গলায় চৌধুরী মশায় বললেন, এত সকাল সকাল কি মনে ক'রে গোবরা? বাড়ির সব ভাল তো? বিষণ্ণ গলায় গোবরা বললে, বাবু, তুমি রক্ষা না করলে আর তো উপায় নাই। বাড়ি ক্রোক হওয়ার নুটিশ পাইছি, তুমি নালিশ করিছেন হামার নামে। বাপ-ঠাকুদ্দার আমল থেকে তোমার পায়ের তলায় আছি, মাগ-ছাওয়ালের হাত ধ'রে গাছতলাত দাঁড়ামু? কোন

কমে আর দুটা মাস সবুর করা যায় না বাবু? নতুন ধান উঠলে ধান বেচে তোমার দেনা শোধ ক'রে দিমু—মা-কালীর নামে কিরা কাটছি বাবু। তুমি একটা বুদ্ধিশুদ্ধি ক'রে বাঁচাও বাবু। অবরুদ্ধ ব্যথায় গোবরার গলাটা আটকে যায়। বুক ঠেলে ঠেলে ওঠে কান্নার ঢেউ। হুঁকো থেকে মুখ সরিয়ে মিষ্টি হেসে চৌধুরী মশায় বললেন, তোকে আমি দু মাস আগেও একবার সাবধান করিছিনু, তুই তখন কান দিলু না। এখন আর কানদে তো লাভ নাই। আদালতের ডিগ্রী হইছে, সরকারের লোকেই তোর সম্পত্তি ক্রোক করবি। হামার তো আর হাত নাই, হামার হাত থাকলে মাস তিনেক অপেক্ষা করতুঁ—হরি হরি হরি, সবই হরির ইচ্ছা।—ব'লেই একটা বড় নিশ্বাস ছেড়ে হুঁকোয় টান দিলেন। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল গোবরা। আবার কাতর করুণ গলায় বললে, তা হ'লে কিছু উপায় হবি না বাবু? মুহূর্তে বদলে গেল চৌধুরী মশায়ের চেহারাটা। ধূর্ত শেয়ালের মত চোখ দুটোর দৃষ্টি ধারালো হয়ে উঠল। ভয়ানক বিরক্ত হয়ে তিনি উগ্র গলায় বললেন, খাজনা বাকি ফেলতে খুব মজা লাগে, না? বিপদে পড়লে তখন পা-ধরাধরি। রাজবংশীপাড়ার সবাইকে হামার জানা আছে, যা যা, হামার সামনে থেকে স'রে যা।

বুকভাঙা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে ধীরপায়ে চৌধুরী-বাড়ির দেউড়ি পেরিয়ে গোবরা রাস্তায় নামল।

দুপুরের খর রোদে জ্ব'লে যাচ্ছে বরিন্দের ধু-ধু মাঠ। হু হু ক'রে বইছে গরম হাওয়া। বুড়ো পুকুরের সারি সারি তালগাছের পাতায় পাতায় শব্দ উঠছে খড়খড় ক'রে। হঠাৎ বহুদূর থেকে কে যেন ডাক দিল গোবরাকে—হোই মোড়ল, থামো থামো, একটু থামো—। থমকে দাঁড়াল গোবরা। পিছনে মুখ ফিরিয়ে দেখলে, জেলেদের পাড়াব মাতব্বর লক্ষ্মণ সিং। লম্বা সিড়িঙে লোকটা। দড়ির মত শক্ত পাকানো চেহারা। ন্যাড়া মাথা। কালি-পড়া চোখের কোটরে কোটরে উগ্র দৃষ্টি। ডান দিকের ভ্রূর উপরে জ্বলজ্বল করছে একটা সাদা ক্ষতচিহ্ন। কোন ভূমিকা না ক'রেই লক্ষ্মণ বললে, কি, চৌধুরী তোমাকে কিছু সময়

দিল? শুনল তোমার কথা? রুদ্ধস্বরে গোববা বললে, না মোড়ল, হামার কথায় কানই দিল না, বাড়ি ক্রোক হবি ঐ তারিখেই—

দেখ মোড়ল।—কঠোর গলায লক্ষ্মণ বললে, ওই চৌধুরীর জ্বালায় দেশ ছাড়তে হবে দেখতিছি। আমবা বাস্তুভিটে ছেড়ে ও-দেশ থেকে এ-দেশে এলাম। এমনিই নুন আনতে তেল ফুরায়, দিন চলে না। তাব উপবে আবাব চৌধুরী আমাদেব পাড়ার প্রত্যেক জেলেব কাছে দু বছবের অগ্রিম জলকব জুলুম ক'রে আদায করছে—না দিলে কাষ্ঠগড়ের দহে মাছ ধরিতে দেবে না। আর তো পাবা যায না মোড়ল, এব কি কোন বিহিত নেই?—বাঘেব মত কপিশ আলোয জলজ্বল ক'রে উঠল লক্ষ্মণেব চোখ দুটো। ধু ধু মাঠের মধ্যে উজ্জ্বল রোদে ঝলকানো হবেন চৌধুবীর বিশাল টিনেব বাড়িটাব দিকে তাকিয়ে ছাড়া ছাড়া ভাবে গোবরা বললে, উপায আব তেমন কি আছে লক্ষ্মণ?

আছে, উপায আছে মোড়ল।—আহত পশুর মত গ'র্জে উঠে লক্ষ্মণ বললে, চুপ ক'বে ব'সে থাকলে কেউ তোমাব মুখে খাওযা তুলে দিবে না। চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে নীচু গলায় বললে, তুমি আজ সাঁঝের সময় আমাব বাড়িতে এসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে। রাস্তায় এত কথা বলা ভাল নয।—ব'লেই হনহন ক'বে পা ফেলে মাঠ ভেঙে কাষ্ঠ-গড়ের দিকে চ'লে গেল লক্ষ্মণ।

বাত্রে একটা দুঃসাহসিক প্রস্তাব কবল লক্ষ্মণ। ভারী গলায় সে গোববাকে বললে, মোড়ল, জোদ্দার বড়লোকেরা আমাদেব রক্ত শুষে খাচ্ছে। এমনিই তো মবতে বসেছি আমরা, তার চেয়ে কিছু ক'রে মরাই ভাল। হবেন চৌধুরীর বাড়িতে ডাকাতি করতে তোমার কোন আপত্তি আছে মোড়ল? সঙ্কল্পে ভযাল শোনাল লক্ষ্মণের গলা। উগ্র হিংসা তার দুটো চোখে দু খণ্ড আগুনের মত চকচক ক'রে উঠল। সভয়ে উঠে দাঁড়িযে গোবরা বললে, না না, হামরা বাপ-ঠাকুদ্দাব আমল থেকে দেবদেবীব ভক্ত। এমন ছোট কাজ হামরা পারমু না, কালীব ভক্ত হয়ে শ্যাষ পর্যন্ত হামাকে ডাকাতি করতে হবে?

তোমার কালী তোমাকে দু বেলা পেট পুরে খেতে দিচ্ছে ?

প্রবল ভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে গোবরা বললে, না না, তুমি জানেন না, রেন চৌধুরীর উপর মা-কালীর কিপা আছে। ওকে কেউ কোনদিন মামলায় হারাতে পারে না, কোন ক্ষতি কেউ করতে পারে না। ওর গায়ে হাত দিলে হামাদের সব নিবংশ ক'রে দেবি মা-কালী—

হা-হা ক'রে হেসে উঠল লক্ষ্মণ। সেই ভয়ঙ্কর হিংস্র হাসির শব্দ লহরে লহরে ব'য়ে চলল অন্ধকারের বুক ছিঁড়ে। গোবরার হাতটা ধ'রে লক্ষ্মণ বললে, তুমি কথা দাও মোড়ল, তুমি না এলে রাজবংশীপাড়ার কেউ আসবে না। অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল গোবরা। তার হাত-পাগুলো যেন ঠাণ্ডা হযে আসছে। অন্তরঙ্গ গলায় আবার লক্ষ্মণ বললে, তা হ'লে ওই কথাই রইল, তুমি আসবে।

বিশ-মণী ওজনের পাথরের বোঝা বুকে নিযে বাড়ি এল গোবরা। তাদের বংশে কেউ কখনও কোন অন্যায়, কোন পাপ কাজ করে নাই। আর সে কিনা পেটের দায়ে ডাকাতি করবে! না না, সে পারবে না। সে লক্ষ্মণকে বলবে, সে যাবে না। আবার মনের ভেতরে জলজল ক'রে উঠল লোভ—যদি নির্বিঘ্নে মা-কালীর কৃপায় কাজ হয়ে যায়, তা হ'লে হাতে আসবে চৌধুরীর সিন্দুকের মোটা টাকা, ইটের থামের মত সোনার দলা, আরও কত কি! ক্ষতি কি লক্ষ্মণের সঙ্গে যোগ দিলে? আবার রক্ষাকালীর দৃপ্ত চোখ দুটো তার চোখের সামনে ভেসে উঠতেই দুর্বল হয়ে গেল গোবরার মনটা।

গভীর রাত্রির নিচ্ছেদ স্তব্ধতাকে কাপিয়ে দিয়ে দূরে একপাল শিয়াল ডেকে উঠল। ঘুম নেই গোবরার চোখে। আগুন জ্বলছে তার মাথার ভেতরে। হঠাৎ সুরবালাকে গোবরা বললে, সুরো, এখন যদি কিছু টাকা পাওয়া যায়, তা হ'লে কেমন হয় বল্ তো? খেঁকিয়ে উঠে সুরবালা বললে, স্বপন ত্যাখোছেন না কি? মাথায় জল দিয়ে আসে চুপ ক'রে ঘুমাও। সুরবালাকে ডাকাতির কথা বললেই এক্ষুনি কেঁদে কেটে অনর্থ বাধাবে। তাই কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে গভীর ব্যথা-ভরা গলায়

অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে এই প্রথম মিথ্যা কথা বললে গোবরা। বললে বুড়া শিব হামাকে স্বপন দেখাইছে সুরো, সোদপুরের পশ্চিমে শিবমন্দিরের উঁচা ঢিবিটা খুঁড়লেই তিন কলসী টাকা পাওয়া যাবি। গেল-রাতে লক্ষ্মণ আর হামি খুঁড়বা যামু।

ঠিক বলোছেন তো?—খপ ক'রে তার হাতটা ধ'রে সুরবালা বললে, ইস্, ঐ টাকা পাওয়া গেলেই চ'লে যামু ভিনগাঁয়ে, সেথি যায়ে জমি পত্তন নিমু, ঘর বাঁধমু, দু হাতে খেটে ফসল ফলামু—তুমি দেখো, এমকা দিন থাকবে না। বহুদিন পর বীণার ঝঙ্কারের মত শোনাল সুরবালার গলা। প্রদীপের মৃদু আলোয় গোবরা দেখলে, সুরবালার চোখের তারা দুটো হাসছে। কি আশ্চর্য গভীর কালো দুটি চোখ! বয়সকালে সে ওই চোখের মধ্যেই ডুবে কতদিন কাটিয়েছে! পুরানো দিনের প্রেম-ভালবাসার স্মৃতি ফুলের পাপড়ির মত ঝ'রে ঝ'রে পড়তে লাগল সুরবালার মনে। গোবরাকে জড়িয়ে ধ'রে নিবিড় তৃপ্তির সুরে সে বললে, কাল সারা রাত হামি চুল খুলে শুয়ে থাকমু তুমি না আসা পর্যন্ত। সোয়ামী শুভকাজে গেলেই স্ত্রী এই রকম করে, বিধি আছে—

কিন্তু সুরবালা জানল না, গোবরার মনে কি নিদারুণ একটা অস্বস্তি কাঁটার মত বিঁধছে।

পরের দিন সকালের আলোয় গোবরার দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল সুরবালা। এক রাত্রির মধ্যে তার বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। ভয়ার্ত গলায় সুরবালা বললে, কি গো, শরীল খারাপ হয় নাই তো?

কোন উত্তর করল না গোবরা। নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

থমথম করছে রাত্রি। কোথায় একটা হুতোম প্যাঁচা ডেকে উঠল—ধু-ধু-ধুম। কাষ্ঠগড়ের দক্ষিণে ভাঙা শিব-মন্দিরের পাশে ঝাঁকড়া পাকুড়গাছের নীচে ঘন হয়ে জ'মে আছে কালো পাথরের মত জমাট নীরেট অন্ধকার। প্রায় কুড়িটা মশালের আলো জ্বালিয়ে লক্ষ্মণ সিংয়ের দলটা সেই পাকুড়গাছের নীচে এসে জমায়েত হ'ল। আকাশে একটার পর একটা উল্কা ঝ'রে পড়ছে। শিউরে উঠছে তমসাস্তীর্ণ আত্রাইয়ের কালো

.ল। সেই গা-ছমছম-করা পরিবেশে দাঁড়িয়ে মানুষগুলোর রক্তে যেন .াদিমতার সাড়া জেগেছে। বাতাসে ছায়া-কাঁপা মশালের আলোয় া'কমক করছে তাদের হাতের টাঙ্গি, সড়কি আর রামদা। লক্ষ্মণের ঘনে জ্বলজ্বল ক'রে উঠেছে তার যৌবনের উত্তেজনা-ভরা দিনগুলোর স্মৃতি। দুর্ধর্ষ দাঙ্গাবাজ সে। বহুবার জেল খেটেছে। সে নাম-করা াগী। দুলে উঠছে তার বুকের রক্ত। কলিজার ভেতরে ব'য়ে যাচ্ছে উত্তেজনার উত্তপ্ত জোয়ার। তাড়ির নেশায় লাল দুটো চোখে ু খণ্ড আগুনের মত চকমক করছে বন্য হিংসা। শেষ বারের মত একবার .চষ্টা ক'রে গোবরা বললে, হামি না গেলে হয় না লক্ষ্মণ?

না।—একসঙ্গে ব'লে উঠল রাজবংশীপাড়ার ঝাংরু, গাদলু আরও ানেকে। সাপের মত ফুঁসে উঠে লক্ষ্মণ বললে, তুমি মরদ নন মোড়ল, ালীর থানে শুধু নাচতে শিখেছেন! ঘৃণায় সংকুচিত হয়ে উঠল তার প্রকাণ্ড মুখখানা।

লাল মাটির কাঁচা রাস্তাটা ধ'রে নিঃশব্দে দলটা বাদিহারের দিকে চলল। ঠিক হয়েছে হরেন চৌধুরীর বাড়ি চারিদিকে ঘেরাও করার পর লক্ষ্মণ ভিতরে গিয়ে চাবি চেয়ে নেবে। যদি চাবি না দেয়, তা হ'লে চৌধুরীর মাখনের মত নরম শরীরটা ল্যাজা সড়কি দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় ক'রে দেবে। এমন সময় দেখা গেল, ঝিম-ধরা তালগাছগুলোর মাথায় ঝুলছে বিশাল গিন্নী-শকুনের ঠোঁটের মত এক টুকরো মেঘ। বাতাসও ঠাণ্ডা হয়ে উঠেছে। দেখতে দেখতে কালো মেঘে ছেয়ে গেল সারা আকাশ। তালগাছের মাথায় ঝলকে উঠল াল বিদ্যুৎ। সবাই শঙ্কিত হয়ে উঠল। লক্ষ্মণ সিং অভয় দিয়ে বললে, ল চল, যত ঝড় জল হয় তত আমাদের কাজের সুবিধা। গোবরার নে তখন সহস্র তর্জনী তুলে শাসন করছে রক্ষাকালী। তার বুকের ভতরটা টনটন করছে। হঠাৎ সে লক্ষ্মণকে বললে, এতবড় একটা ভকাজে যাচ্ছেন, কিন্তু তোমরা তো কেউ কালীর থানের দিকে গেলেন ।। তোমরা একঘড়ি দাঁড়াও, হামি রক্ষাকালীকে দণ্ডবৎ ক'রে আসি।

ঠিক কথা, ঠিক কথা।—ব'লে সবাই সায় দিয়ে উঠল। গোবরা জোর পায়ে কালীর থানের দিকে চ'লে গেল।

কড়—কড়—কড়াৎ।—দূরে কোথাও বাজ পড়ল। সাদা আলোয় ঝলকে উঠল মাঠ। ও-দিকে ঘন অন্ধকারে লেপটে-থাকা বটগাছটাব নীচে রক্ষাকালীর সামনে দাঁড়াতেই গোবরার মাথার ভেতরটা ঘুবে উঠল। সারা শরীরে ভীষণ জোরে একটা টান পড়ল যেন—এ কি হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে যাবে না কি? না, ভর হবে? গোবরার চোখের সামনে রক্ষাকালীর মুখ, সুরবালার মুখ, চৌধুরীর মুখ—সব একসঙ্গে মিশে গিয়ে যেন এক অতিকায় দানবেব মুখের মত সৃষ্টি হ'ল। থরথর ক'রে কেঁপে উঠল তার দেহটা। কাটা গাছের মত আছড়ে পডল বটগাছেব শক্ত শিকড়ের উপরে। সাদা গ্যাঁজলা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল মুখের দু পাশ দিয়ে। গোববার দেরি হচ্ছে ব'লে দলের একজন এখানে এসে এই অবস্থা দেখে লক্ষ্মণকে বলতেই রাজবংশীপাড়ার সবাই বেঁকে বসল। হতাশ হযে দাডিয়ে রইল লক্ষ্মণ।

বেশ বেলা হযেছে। মিষ্টি নরম রোদ সিল্কের পাতলা ওড়নার মত ছড়িযে পড়েছে বরিন্দের মাঠে। সোনা মেখে ঝলমল করছে আত্রাইয়ের জল। গোবরা চোখ মেলে নিজের দিকে তাকাতেই লজ্জায় অনুশোচনায় একেবারে এতটুকু হয়ে গেল। ছিঃ, এ কি করেছে সে! যার একটা মুখের কথা শোনার জন্যে বিশখানা গ্রামের লোক জডো হয়, রক্ষাকালীর অতবড় একজন ভক্ত হয়ে সে কিনা বেরিয়েছিল ডাকাতি করতে? কেমন ক'রে সে লক্ষ্মণের কথায় রাজী হয়েছিল?

শ্রীসুভাষ সমাজদার

বেতালের বৈঠকী

নাতির সঙ্গে ঠাকুরদাদার কুস্তি যদি হয়,
কে না জানে দাদুই হারে নাতিই লভে জয়!
শিশু নাতি লাফায় মাতি মল্লের উল্লাসে,
ধূলায় প'ড়ে ঠাকুরদাদা ফোকলা মুখে হাসে।

বেতালভট্ট

শারদীয়া মহাপূজা ও সার্বজনীন দুর্গাপূজা

১। শারদীয়া মহাপূজা

শারদীয়া মহাপূজা ও শারদীয় মহোৎসব যেমন বাংলা ও বাঙালীর বৈশিষ্ট্য, শারদীয়-শব্দটিও সেইরূপ বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে হয়। শরৎকালে সঞ্জাত বা শরৎকাল-সম্বন্ধীয় প্রভৃতি অর্থে সংস্কৃতে শারদ হয়। পাণিনি বলিয়াছেন, সন্ধিবেলা প্রভৃতি শব্দ, ঋতুবাচক শব্দ ও নক্ষত্রবাচক শব্দের উত্তর সেই সময়ে উৎপন্ন (তত্র ভবঃ) এই অর্থে অণ্ প্রত্যয় হয়। (সন্ধিবেলাদ্যৃতুনক্ষত্রেভ্যোঽণ্—পাঃ ৪।৩।১৬)। স্কন্দপুরাণে ও ভবিষ্যপুরাণে আমরা শারদী চণ্ডিকাপূজার সমুল্লেখ প্রাপ্ত হই—

শারদী চণ্ডিকাপূজা ত্রিবিধা পরিগীয়তে।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥

বাংলায় আমরা শারদ শশধরের বিমল কৌমুদীরাশিতে পুলকিত হই, ভারতচন্দ্রের কাব্যে শারদশশীকে সন্দর্শন করি ("কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা ?"), মধ্যে মধ্যে শারদোৎসবেরও অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, শারদীয়া প্রতিমার অর্চনা করি ("দূরপ্রান্তে দেখিলাম স্থবর্ণমণ্ডিতা এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা"—কমলাকান্ত), কিন্তু শারদীয়া মহাপূজা ও শারদীয় মহোৎসবই (অধিকাংশ লেখকের মতে "শারদীয়া মহোৎসব") আমাদের অতিশয় প্রিয়। রঘুনন্দনে পাই—

শারদীয়া মহাপূজা চতুঃস্বর্ণময়ী শুভা।
তাং তিথিত্রয়মাসাদ্য কুর্যাদ্ভক্ত্যা বিধানতঃ॥

বসন্তকালে যে দেবীপূজা হয় তাহাকে কেহ বাসন্তীয় পূজা বলে না, সকলেই বাসন্তী পূজা বলিয়া থাকে, অথচ শরৎকালের পূজাকে শারদীয় পূজা বলা হয়। আমাদের মনে হয়, 'শারদীয়'র জন্য দায়ী কতকটা নারদীয় মহাপুরাণ, নারদীয় মহালক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি আর কতকটা "শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী" দুর্গাসপ্তশতীর এই পঙ্‌ক্তিটি। নারদীয়-শব্দটি ব্যাকরণসঙ্গত, কেননা নারদ-শব্দটির প্রথম স্বর দীর্ঘ হইয়া উহার উত্তর তাহার সম্বন্ধীয় ("তস্যেদম্") এই অর্থে ঈয়-প্রত্যয়

হইতে পারে (বৃদ্ধাচ্ছঃ। পাঃ ৪।২।১১৪)। আর শ্রীশ্রীচণ্ডী প্রভৃতি প্রামাণি· গ্রন্থে এই পূজাকে মহাপূজা বলা হইয়াছে, মহাপূজাতে যখন চাবি অক্ষর আছে, তখন উহার বিশেষণেও চারিটি অক্ষব থাকিলে ভাল হয় সুতবাং শরদ্-শব্দনিষ্পন্ন চারিটি অক্ষবের একটি শব্দ আবশ্যক, এই শব্দের অন্বেষণ করিতে গেলে নাবদীয মহাপুরাণ, নারদীয় মহালক্ষ্মীবিলাসে· কথা মনে উদিত হয, ফলে নাবদীয মহালক্ষ্মীবিলাস, নারদীয মহাপুবা· প্রভৃতিব অনুসরণে শারদীয়া মহাপূজার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

ভগবান্ পাণিনি সংজ্ঞা-অর্থে শারদক-শব্দের বিধান করিয়াছেন (সংজ্ঞায়াং শবদো বুঞ্ ৪।৩।২৭), সুতবাং সংজ্ঞা অর্থে, শবৎকালেব মহাপূজা এই বিশেষ অর্থে, আমবা শাবদিক শব্দের প্রয়োগ কবিতে পাবি। বাংলায় এই অর্থে শারদীয়া শব্দেব প্রযোগ দৃষ্ট হয, যেমন শারদীয়াব শ্রেষ্ঠ উপহার ইত্যাদি।

শবৎকালে ভবঃ এই অর্থে পরবর্তী কালে মধ্যে মধ্যে শাবদীন-শব্দেব প্রয়োগ দেখা যায়। শারদীন শব্দটিও ব্যাকরণসঙ্গত নহে, প্রাককালীন প্রভৃতি শব্দেব সাদৃশ্যে ঐ শব্দটিব উদ্ভব হইযাছিল। বলা বাহুল্য প্রাককালীন প্রভৃতি শব্দও পাণিনিসম্মত নহে।

দেখা যাইতেছে, শাবদীয শব্দ স্থলে প্রথম শরদ শব্দের উত্তর "তত্র ভব" এই অর্থে অণ প্রত্যয় কবিযা পুনরায সেই অর্থে ই ঈয় (ছ) প্রত্যয় করা হইযাছে। এইভাবে একই অথে দুইটি প্রত্যয় নানা ভাষায় দৃষ্ট হয। বেদে আমবা পুরুষত্বতা-শব্দে ভাব অর্থে ত্ব ও তা—দুইটি প্রত্যয় দেখিতে পাই। বাংলায অনেক লেখক সখ্য বাহুল্য প্রভৃতিতে সন্তোষ লাভ করিতে না পারিয়া সখ্যতা বাহুল্যতা প্রভৃতি "শুদ্ধ" পদের প্রযোগ করিয়া থাকেন। শ্রেষ্ঠতম শব্দ সকলেরই সুবিদিত, শ্রেয়স্তবও আমাদের একেবারে অপরিচিত নহে। ইংরাজীতে deteriorate-শব্দে আমবা de-শব্দের উত্তর প্রথমে আতিশাযনিক (comparative) *-ter* বা তর প্রত্যয ও তাহাব পব *-ior* বা ঈয়স প্রত্যয় দেখিতে পাই। সংস্কৃত, গ্রীক্, ল্যাটিন প্রভৃতি তুলনা কবিয়া আমবা দেখিতে পাই, প্রথমে

অকারান্ত অঙ্গের বেলায় উত্তম পুরুষে একবচনে 'আ' হইত, অকারান্ত ভিন্ন অঙ্গের বেলায় হইত 'মি'। সংস্কৃতে 'ভরামি' পাই, কিন্তু গ্রীকে পাওয়া যায় *phero* ও লাটিনে *fero*, অথচ সংস্কৃতের এমি, গ্রীকে ***eimi***, সংস্কৃতের দধামি গ্রীকে ***tithemi***। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভৃ-ধাতুর বর্তমানকালে উত্তম পুরুষের একবচনে ভরা হওয়া উচিত, কিন্তু ভরতি প্রভৃতি আটটি পদে তিনটি করিয়া অক্ষর আছে, কেবল ভরা-পদে দুইটি রহিয়াছে, ফলে সাম্যের অনুরোধে parity-র খাতিরে ভরা-শব্দের উত্তর পুনরায় মি যোগ করিয়া ভরামি করা হইল।

শারদা-শব্দ সরস্বতী ও দুর্গা অর্থে প্রযুক্ত হয়। এই শারদা-শব্দের প্রথম স্বরটি আ, সুতরাং ইহার উত্তর ঈয় প্রত্যয় হইতে পারে। অতএব দুর্গাদেবী সম্বন্ধীয় এই অর্থে শারদীয়-শব্দ ব্যাকরণসঙ্গত ও শারদীয়-শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ শারদীয়া হইতে পারে।

বেদে পঞ্চশারদীয়া ইষ্টির কথা পাওয়া যায়। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে আছে—পঞ্চশারদীয়ো মরুতাং স্তোমঃ (২১।১৫।১)। ব্যাখ্যাকার বলেন, যঃ পঞ্চসু শরৎসু অঙ্গভূতৈঃ পশুবন্ধৈরিষ্ট্বা পশ্চাদারভ্যতে স পঞ্চশারদীয়ো নাম। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে নৈদাঘীয়ও দেখিতে পাওয়া যায়। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন—নিদাঘসম্বন্ধিনি কালে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যরচনায় আছে—নিদাঘীয় প্রখর প্রভাকর (পৃ. ১০)। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে অবশ্য ব্যাকরণসঙ্গত নৈদাঘ শব্দই দৃষ্ট হয়—অল্পকাল মধ্যে মহারবে নৈদাঘ ঝটিকা প্রবাহিত হইল।

২। সার্বজনীন দুর্গাপূজা

কলিকাতায় এখন পল্লীতে পল্লীতে সার্বজনীন দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান হইতেছে। এই সার্বজনীন শব্দের অর্থ—যে অনুষ্ঠানে সকলের যোগদান করিবার অধিকার আছে, সর্বজনসম্বন্ধীয়, ইংরেজীতে যাহাতে public বলে। এই সার্বজনীন শব্দটি ব্যাকরণসঙ্গত অথবা ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ তাহা এই প্রবন্ধে বিচার করা যাইতেছে। কলিকাতার একটি প্রধান দৈনিকপত্রে সার্বজনীন-শব্দ ব্যবহৃত হয়, আর একটি প্রধান

দৈনিক পত্রিকায় সর্বজনীন-শব্দই দৃষ্টিগোচর হয়। ইংরাজী পত্রগুলিতে Sarbajanin বা Sarbajonin হইতে কিছু বুঝিবার উপায় নাই।

পাণিনির মতে হিতকর ("তস্মৈ হিতম্") অর্থে বিশ্বজন-শব্দে উত্তর খ অর্থাৎ ঈন প্রত্যয় হয়। সূত্র—আত্মন্-বিশ্বজন-ভোগোত্তরপদাৎ খঃ (৫।১।৯) অর্থাৎ হিতকর অর্থে আত্মন্ শব্দ, বিশ্বজন শব্দ ও যে সব শব্দের শেষে ভোগ শব্দ আছে সেই সকল শব্দের উত্তর খ অর্থাৎ ঈন প্রত্যয় হয়, সুতরাং যাহা সকল লোকের পক্ষে হিতকর তাহা বিশ্বজনীন। কাত্যায়নের সময় এই অর্থে সর্বজনীন ও সার্বজনিক শব্দেরও প্রচলন হইয়াছিল। ফলে কাত্যায়ন বার্ত্তিক করিলেন—সর্বজনাট্ ঠঞ্ চ ৫।১।৯।৫ অর্থাৎ হিতকর অর্থে সর্বজন-শব্দের উত্তর খ (=ঈন) ও ঠঞ (=ইক) প্রত্যয় হয়। ভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্যা করিলেন, সর্বজনাট্ ঠঞ্ চ বক্তব্যঃ খশ্চ। সর্বজনায় হিতঃ সার্বজনিকঃ সর্বজনীনঃ। পাণিনির আর একটি সূত্র আছে—প্রতিজনাদিভ্যঃ খঞ্ (৪।৪।৯৯)। এই সূত্রটির অর্থ—প্রতিজন প্রভৃতি শব্দের উত্তর সেই বিষয়ে প্রবীণ বা নিপুণ বা যোগ্য ('তত্র সাধুঃ") এই অর্থে খঞ্ প্রত্যয় হয় অর্থাৎ ঈন প্রত্যয় হয়, আর শব্দটির আদি স্বরের দীর্ঘ হয়। এই প্রতিজনাদি শব্দের তালিকায় সর্বজন, বিশ্বজন, পঞ্চজন ও মহাজন শব্দ পঠিত হইয়াছে। গণরত্নমহোদধিকার বর্ধমান বলেন, অত্র সাধুর্যোগ্যঃ প্রবীণো বা গৃহ্যতে উপকারকবাচী তু হিতমিত্যনেন সংগৃহীতঃ। অত্র হি সূত্রকদম্বকে সপ্তম্যন্তাৎ প্রত্যয়ঃ। অগ্রে তু হিতার্থে চতুর্থ্যন্তাৎ প্রত্যয়ঃ। অতেন বাধ্যবাধকভাবঃ। চন্দ্রবৃত্তিকারও সাধু-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—কুশলো যোগ্যো হিতো বা (৩।৪।১৯)। হেমচন্দ্রও তাঁহার বৃহদ্বৃত্তিতে বলিয়াছেন—প্রবীণো যোগ্য উপকারকো বা। সংক্ষিপ্তসারের টীকাকার (তদ্ধিত ৮৩২) গোয়ীচন্দ্রও বলেন, সাধুঃ প্রবীণো নিপুণ ইত্যর্থঃ। অথবা সাধুর্যোগ্যঃ সমর্থ ইত্যর্থঃ। সুতরাং সর্বজনের যোগ্য এই অর্থে 'সার্বজনীন' বেশ হইতে পারে। এইজন্যই অভিধানে সার্বজনীন শব্দের অর্থ দেখা যায়—public, universal, general।

তৈত্তিরীয়ারণ্যকের সাযণভাষ্যে আছে—চক্ষুষো রূপৈকবিষয়ত্বং সার্বজনীনম্ (৭।১।১)। আবিপালগোপালং হি সার্বজনীনেনানুভবেন ব্যবহ্রিয়মাণত্বাৎ ইত্যাদি। এই সকল স্থলে universal অর্থে সার্বজনীন শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

'বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী'তে কয়েক স্থলে সার্বজনীন-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়—

ভগবদুক্ত ধর্ম সার্বজনীন—মনুষ্যমাত্রেরই রক্ষা ও পরিত্রাণের উপায় ('শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' ৩।৩৫)। ভগবদ্বাক্যের যাথার্থ্য এবং সার্বজনীনতার প্রমাণস্বরূপ পরবর্তী দেশী বিদেশী ইতিহাস হইতে তিনটি উদাহরণ প্রয়োগ করিব (ঐ ৩।৩৭)।

এই অর্থেই আবার বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বলৌকিক প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন—গীতোক্ত ধর্ম বিশ্বলৌকিক ইহা পূর্বে বলা গিয়াছে (ঐ ২।৩৯)। অতএব গীতোক্ত এই ধর্ম বিশ্বজনীন (ঐ ৩।৯)। এই শ্লোকোক্ত ধর্মই জগতে একমাত্র অসাম্প্রদায়িক ধর্ম, একমাত্র সর্বজনাবলম্বনীয় ধর্ম (ঐ ৪।১১।)

'কৃষ্ণচরিত্রে' কিন্তু সর্বজনীন শব্দ দৃষ্ট হয়—**সর্বজনীন** ধর্ম হইতে অবতরণ করিয়া রাজধর্মে বা রাজনীতি সম্বন্ধেও দেখিতে পাই যে, কৃষ্ণের জ্ঞানার্জনী বৃত্তিসকল চরম স্ফূর্তি প্রাপ্ত (পৃঃ ৩১৫)। এ স্থলে সর্বজনীনের আকাবলোপ মুদ্রাকরপ্রমাদকৃতও হইতে পারে।

'ইন্দ্রনাথ-গ্রন্থাবলী'তে আছে—

সেদিন আলখোট্টা সাহেব বোলে গ্যালেন যে, "সার্বজনীন ভ্রাতৃভাব"—(অশ্বাণ্ড যদি কিছু বুঝে থাকি)—"খুব উচিত, আর সেই ভাব যাতে বাড়ে তাই করা উচিত" (পৃঃ ৪৩১)।

উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে, পাণিনির সময় সার্বজনীন-শব্দেরই প্রচলন ছিল, পরে সর্বজনীন-শব্দ চলিত হয়, আর সার্বজনীন দুর্গাপূজা একেবারেই অশুদ্ধ নহে।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রাক্ষস-খোক্কসের গল্প

এক ছিল গ্রাম। তার দুটি ছিল পাড়া। দুই পাড়ার দুই দলের মধ্যে বিবাদ হ'ল।

যুগটা ছিল রাক্ষসের যুগ। অতিকায়, বিকট-দর্শন, ভীষণ-প্রকৃতির রাক্ষসের ভয়ে সকল পাড়ার সকল মানুষই তটস্থ থাকত। নানা রকম ভেট দিয়ে পূজো করত রাক্ষসকে।

উত্তরপাড়ার কাছে একবার এক অতিকায় রাক্ষস এসে হাজির হ'ল। ভীত ত্রস্ত মানুষগুলিকে অভয় দিয়ে রাক্ষসটি মৃদু হেসে বললে, ভয় নেই—তোমাদের রক্ত খাব না। খাব ওই দক্ষিণপাড়ার। যাও, ধর ওদের। আমি পেছনে আছি। খুশি হয়ে রাক্ষসকে পূজো দিয়ে বরণ ক'রে নিলে তারা।

দুই পাড়ায় বিবাদ শুরু হ'ল। দক্ষিণপাড়ার মানুষ আত্মরক্ষার জন্যে ডেকে নিয়ে এল বিরাটকায় এক খোক্কসকে। খোক্কস হেসে বললে, কোন ভয় নেই। তোমাদের রক্ষা করব।

যুদ্ধ চলল। এক দিকে রাক্ষস আর এক দিকে খোক্কস। ভীষণভাবে গ্রামবাসীদের রক্ষা করবার জন্যে দুই পাড়া দুজনে চ'ষে বেড়াতে লাগল। রক্ষার তাড়নায় গ্রামবাসীরা হাঁপিয়ে উঠল।

উত্তরপাড়ার লোকেরা গোপনে এক সভা ক'রে দলপতিকে বললে, আর যে পারছি না।

কেন, কি হ'ল?

পাড়া যে শ্মশান হতে চলল!

সে তো ও-পাড়াতেও হচ্ছে।

তা হচ্ছে।

তবে?—দলপতি ধমক দিলেন।—রাক্ষস তো আমাদের কোন অনিষ্ট করছেন না, বরং আমাদের জন্যেই প্রাণপণ খাটছেন। কত সভ্য হয়েছেন রাক্ষস, দেখ তো। আগের কালে ওঁরা কাঁচা মাংস খেতেন, এখন তো খান না।

তা অবশ্য খান না।

তবে?

আমাদের শরীরের রক্ত ক'মে যাচ্ছে কেন, সেইটেই তো বুঝতে পারছি না।

দলপতি সান্ত্বনা দিলেন, এত বড় ধর্মকাজ, রক্ত কিছু যাবেই। রাক্কস রক্ত খান বটে, কিন্তু আমাদের রক্ত তো খাবেন না। খাবেন ওই দক্ষিণপাড়ার রক্ত।

দক্ষিণপাড়ায়ও এই আলোচনাই হ'ল। আমাদের রক্ত যেন কে শুষে খাচ্ছে!

কে?

বুঝতে পারি না।

খোক্কসের কোন দোষ দিও না। তাঁকে নানা ভেট দিয়ে পূজো দিতে হচ্ছে বটে, কিন্তু রক্ত তিনি ও-পাড়ারই শুষছেন।

তবে আমাদের রক্ত যাচ্ছে কোথায়?

ধর্মযুদ্ধে রক্ত কিছু যায়ই।

তাই তো, আমরা যে ধর্মযুদ্ধ করছি!

তবে?

চল, সব ধর্মযুদ্ধে চল।

জয়—খোক্কসের জয়।

উত্তরপাড়ার লোকেরা রাক্কসকে গিয়ে ধরল।—ওরা আজ আমাদের অনেক ঘর বাড়ি ক্ষেত খামার পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। গরু ভেড়া মানুষ অনেক ধ'রে নিয়ে গেছে।

রাক্কস একটা রণহুঙ্কার দিল। সকলে গর্জন ক'রে উঠল, জয় রাক্কসের জয়।

রাক্কসের কৃপায় ওদের প্রায় অর্ধেক ঘর-বাড়ি পুড়ে গেছে। ও-পাড়ার অর্ধেক লোক এখন আমাদের হাতে।

জয়—রাক্কসের জয়!

দক্ষিণপাড়ার লোক একদিন খোক্কসকে ধরল। ওদের ঘর বাড়ি লোক জন এক রকম কাবার হয়েছে বটে; কিন্তু সম্পূর্ণ দখল তো এখনও হ'ল না?

খোক্কস মৃদু হেসে বললে, কি দরকার? যেমন চলছে চলুক না।

সকলে চমৎকৃত হয়ে ব'লে উঠল, তাই তো। একেবারে শেষ ক'রে দরকার কি! যেমন চলছে চলুক।

এদিকে রাক্ষসের সঙ্গে খোক্কস একদিন দেখা করল। দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গে দুজনে হেসে লুটোপুটি।

রাক্ষস বললে, তোমার ওখানে ওরা কি কিছু বুঝতে পারছে?

কিছু না, কিছু না। তোমার ওখানে?

আরে, রাম বল। একদম কিছু না।

আর একবার দুজনে হেসে গড়াগড়ি।

শ্রীভূপেন্দ্রমোহন সরকার

চলমান বিজ্ঞাপন

সামান্য বসন অঙ্গে সোনাদানা নাই,
গরীবের স্ত্রী তাহারা নাইক বড়াই,
অভাবের চিহ্নগুলি চোখে মুখে সব
সর্বদাই পরিস্ফুট, বড়ই নীরব।

* * *

ধনীর ঘরণীগণ গয়না ও শাড়ি
নিয়ে করে পরস্পর সদা আড়াআড়ি,
কর্তাদের অবস্থার এই নারীগণ
প্রত্যেকেই চলমান যেন বিজ্ঞাপন।

শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

সংবাদ-সাহিত্য

অবতারকল্প মহাপুরুষদের সহধর্মিণীরা সচরাচর স্বামীর কীর্তির মধ্যেই জীবিত থাকিয়া পরবর্তী কালে সাধারণের স্মরণের বিষয় হইয়া উঠেন। স্বামীদের আকস্মিক বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস তাঁহাদের সাংসারিক ভোগের জীবনে যে অপরিসীম বিরহ-দুঃখ আনয়ন করে, সমসাময়িক এবং ভবিষ্যৎ সকল মানুষের সহানুভূতিশীল কবিপ্রাণে তাহার আঘাত সমবেদনার তরঙ্গ তুলিয়া লিখিত বা অলিখিত কাব্যে উচ্ছ্রিত হইয়া উঠে। বাস্তব জীবনের অগ্নি-পরীক্ষার কঠোরতা ইঁহারা যে পরিমাণে সহিয়াছিলেন, দুঃখী মানুষের প্রাণের রসে তাঁহারা ততখানিই পুনঃসঞ্জীবিত হইয়া মহনীয় হইয়াছেন। প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্যগুলির নায়িকা—সীতা, দ্রৌপদী, সতী, দময়ন্তীরা যেমন কাব্যলোক হইতে আমাদের অতিপরিচিত বাস্তবলোকে অবতীর্ণ হন, সংসার-বিবাগী মহাপুরুষদের সহধর্মিণীরাও সেইরূপ বাস্তবলোক হইতে ভাবলোকে উত্তীর্ণ হন। শাক্যরাজ-বংশের হতভাগিনী বধূ যশোধরা অথবা নবদ্বীপের শচীমাতার পুত্রবধূ বিষ্ণুপ্রিয়া এই পথেই মানুষের হৃদয়-কন্দরে প্রবেশলাভ করিয়া পূজিত হইয়াছেন। পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের পত্নী সারদামণি দেবী এই দলের সর্বশেষ সৌভাগ্যবতী। গত রবিবার ১২ই পৌষ (২৭ ডিসেম্বর) বাংলা দেশের সর্বত্র এবং বাংলার বাহিরেও বহুস্থলে সারদামণি দেবীর জন্ম-শতবার্ষিক অনুষ্ঠান হইয়াছে, এবং অনেক ক্ষেত্রে এই অনুষ্ঠান সেদিন আরম্ভ হইয়া বর্ষকাল চলিবে। রামকৃষ্ণ-ভক্তদের এই মা নিজের স্বভাবগুণে জগৎবাসী সকল মানুষের মা হইতে পারিয়াছিলেন; মহাপুরুষের জীবন-সঙ্গিনী হওয়ার সৌভাগ্য ছাড়াও এই আপামরসাধারণের মা হওয়ার গুণটি তাঁহার নিজস্ব আকর্ষণ। মায়ের এই স্মরণোৎসবে আমরা আমাদের ভক্তিশ্রদ্ধার্ঘ্য অন্যত্র-প্রকাশিত আমাদের একটি কবিতায় নিবেদন করিতেছি—

"আমরা তো সাধারণ, তুমিও মা ছিলে সাধারণই ;
স্পর্শমণি ছুঁয়ে যথা হয় লোহা কষিত হিরণ—

পরমহংসের স্পর্শে দরিদ্রের ঘরের ঘরণী
জগৎ-জননী হয়ে স্নেহ-রশ্মি কৈলে বিকিরণ।

গুরু-তিরোভাবে যবে শিষ্যদল বেদনাবিহ্বল,
সঙ্গী ও সঙ্গতিহীন অন্ধকারে ক্লান্ত দিশাহারা—
তাঁরি শক্তি সঞ্চারিয়া প্রাণে এনে দিলে নববল,
ঘুচাইলে অন্নপূর্ণা হয়ে অন্নচিন্তাচমৎকারা!

বিচ্ছিন্নে আনিলে টানি আপনার স্নেহময় ক্রোড়ে,
তবে মন্ত্রপূত জন লভিল পরম উদ্বোধন;
তুমি মাতা ঘটাইলে মহাগুরু-আশীর্বাদ-জোরে
বিবেক-সারদা-ব্রহ্ম-প্রেম-শিব-অভেদ মিলন।

বিশ্বেরে করিল কোলে ক্ষুদ্র জয়রামবাটি গ্রাম,
সেই শুভলগ্ন স্মরি' তোমারে মা জানাই প্রণাম॥"

রামকৃষ্ণ-নিরপেক্ষ সারদামণির মহত্ত্ব সম্পর্কে আধুনিক জগতের দুই মনস্বীর উক্তিও আজ এই সুযোগে স্মরণ করিতেছি। ভগিনী নিবেদিতা মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস পূর্বে ১৯১০, ১১ ডিসেম্বর তারিখে আমেরিকা হইতে লিখিত একটি পত্রে বলিতেছেন—

"তুমি যে ভগবানের অপূর্বতম সৃষ্টি তাতে সন্দেহ নেই—তুমিই শ্রীরামকৃষ্ণের নিজস্ব আধার। তোমার মধ্য দিয়েই মরজগতের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রবাহিত হচ্ছে···ভগবানের অপূর্ব সৃষ্টি সবই নিঃসন্দেহে শান্ত, নীরব। আমাদের জীবনে আমাদের অজ্ঞাতেই তারা প্রবেশ করে—এই বাতাস, এই সূর্যালোক, বাগানের মিষ্ট সুরভি এবং গঙ্গার স্নিগ্ধতা যেমন। এই সব শান্ত জিনিসের সঙ্গেই শুধু তোমার তুলনা হতে পারে।"

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেছেন—

"আমাদের সমসাময়িক ইতিহাসে রামকৃষ্ণের সুস্পষ্ট মূর্তির অন্তরালে সারদামণি দেবীর মূর্তি এখনও ছায়ার ন্যায় প্রতীত হইলেও তিনি

সাত্ত্বিক প্রকৃতির নারী না হইলে রামকৃষ্ণও রামকৃষ্ণ হইতে পারিতেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ আছে।"—'প্রবাসী' বৈশাখ, ১৩৩১।

অবিস্মরণীয় মুহূর্তের ভাবাবেগজনিত মহৎ কীর্তির জীবন তাঁহার নয়, প্রতি দিবসের অতি তুচ্ছ খুঁটিনাটির মধ্যেই তাঁহার মহত্ত্বের সহস্র পরিচয় আছে, তাই তিনি ভক্তিশ্রদ্ধার ব্যবধানে পড়েন নাই, অতি সহজেই সকলের একান্ত আপন মা হইতে পারিয়াছেন।

—

আমাদের শাস্ত্র বলে, সাধু-সন্তেরা যতদিন প্রকট থাকেন, লোকে অনুভব করুক আর নাই করুক, তাঁহাদের মহৎ প্রভাব পৃথিবীর সর্বসাধারণের কল্যাণ আনিয়া থাকে। তিনি যেখানেই আবির্ভূত হউন, তাঁহার ধর্মমানস অদৃশ্য আকাশের মত সারা জগতে ব্যাপ্ত হয় এবং সংসারের পাপ-তাপ-ব্যাধি-শোক-দুঃখ তাঁহার অদৃশ্য হস্তাবলেপে নিরাময় হইয়া মানুষকে উন্নতির পথে আগাইয়া দেয়। শ্রীঅরবিন্দ আমাদের শাস্ত্রীয় এই সত্যে বিশ্বাসী ছিলেন। শ্রীরামদাস বাবাজী তাঁহার পরার্থে উৎসর্জিত ভাগবতজীবন লইয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে সেইরূপ অদৃশ্য কল্যাণের আকাশ রচনা করিয়া আমাদেরই অতি সন্নিকটে বরাহনগরের পাটবাড়িতে বিরাজ করিতেছিলেন। মহতের তিরোভাব ঘটিলেও যে তাঁহার প্রভাব তিরোহিত হয় না—এই কথাটায় সর্বদা বিশ্বাস রাখিতে পারি না বলিয়াই তাঁহাদের আকস্মিক তিরোধানে আমরা বিমর্ষ শোকাচ্ছন্ন হই। শান্তমনোহর আশ্বাসবরাভয়ময় মূর্তি ধরিয়া বৈষ্ণবদাস রামদাস আর পাটবাড়িতে নাই; গত ১৮ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার রাত্রি তিনটার সময় তিনি তাঁহার নশ্বর দেহ রক্ষা করিয়াছেন। বাংলা দেশের বৈষ্ণবসমাজ শোককাতর হইয়াছে।

রামদাস বাবাজী নিতাই-গৌরের উপাসক ছিলেন, অবশ্য উপাসক বলিলেই তাঁহার ঠিক স্বরূপটি বুঝানো যাইবে না। তিনি শ্রীচৈতন্যদেব-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের মূর্ত-প্রতীক ছিলেন। এ যুগে আর কোনও

মানুষের আধারে বৈষ্ণব ধর্ম এতখানি স্ফূর্তি লাভ করে নাই। শ্রীচৈতন্য-দেব তাঁহার জীবনে যে যে আদর্শানুরুক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন, যথা—সাম্য, সেবা, অহিংসা, সহিষ্ণুতা, স্বাবলম্বিতা, প্রীতি ও মৈত্রী এবং বিচার ও আলোচনা, তাহার সকলগুলিই অবলম্বন করিয়া তিনি নিষ্ঠার সহিত জীবনাতিবাহিত করিয়াছেন, কখনও আদর্শভ্রষ্ট হন নাই। বাংলার বৈষ্ণব-সমাজকে তিনি বাসুকীর মত ধারণ করিয়া ছিলেন। তাঁহার শক্তি ও প্রভাব ইহার পরও কার্যকরী না হইলে সে সমাজে ভাঙন ধরিবার আশঙ্কা আছে। আমাদের বিশ্বাস, এই সাধুপুরুষের জীবনব্যাপী সাধনার ফল স্বল্পস্থায়ী হইবে না।

তাঁহার জীবনের যে দিকটা সর্বাপেক্ষা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহা হইতেছে তাঁহার নিরহঙ্কার নিরভিমান সহজ সরল ভাব। তাঁহার কর্মপ্রবাহ অবিচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ প্রবাহিত ছিল—পরহিত, পরসেবা ও নামগানে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এক মুহূর্তের জন্যও কর্মবিচ্যুত অবসর গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার আর এক বিশেষত্ব—প্রচারবিমুখতা। সুদীর্ঘ জীবন তিনি নীরবে কাজ করিয়া গিয়াছেন, আধুনিক প্রচারের সর্বনাশা জালবিস্তারে তাঁহার ঘোরতর আপত্তি ছিল। শেষ-জীবনে অর্থাৎ মাত্র দুই বৎসর পূর্বে তাঁহার "সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনী"র ভক্তেরা তাঁহার আপত্তি সত্ত্বেও 'শ্রীরামদাস-প্রশস্তি' গ্রন্থ বাহির করিয়া তাঁহার কীর্তির যৎসামান্য পরিচয় মুদ্রিত করিয়াছেন। তাহা হইতেই কবি শ্রীকুমুদরঞ্জনের একটি প্রশস্তি অংশত উদ্ধৃত করিতেছি—

"হরিনামে নব মাধুরী আনিলে তুমি।
অনুরাগ-ফাগে রাঙালে বঙ্গভূমি।
মুখে হরিনাম, চোখে ঝরে জল—
অতি পাষণ্ডে করে যে বিভল.
নূতন জনম লভে পাপী, পদ চুমি।
গোরাচাঁদ ল'য়ে তুমি করিতেছ ঘর,
হরিনাম-রসে গড়া তব অন্তর

রাধাশ্যামকে তুমি দাও দোল,
আচণ্ডালকে তুমি দাও কোল,
সব জানো তাঁর, তুমি যে জাতিস্মর ॥"

—

রামদাস বাবাজীর প্রচারবিমুখতা প্রসঙ্গে একটি ধর্মপ্রতিষ্ঠানের লজ্জাকর প্রচার-বিজ্ঞাপনের কথা মনে পড়িতেছে। আমরা বিশ্বাস করি, সদ্ধর্মও প্রচারের অপেক্ষা রাখে; কিন্তু সে সংপ্রচারের। কোনও ধার্মিক ব্যক্তিকে লইয়া যদি ধূর্ত ও কৌশলী ব্যক্তিরা মিথ্যা প্রচারের জাল বিস্তার করিতে থাকে, তখন আশঙ্কা হয়, ধার্মিকের ধর্মের গ্লানি ঘটিতেছে। লক্ষ লক্ষ লোক ছুটাছুটি করিলেও সে ধর্মগ্লানির অপহ্নব ঘটে না। এত কঠিন মন্তব্য যখন করিতেছি, তখন ঘটনাটা পুরাপুরি খুলিয়া বলা আবশ্যক। গত ২৯শে অক্টোবরের 'যুগান্তর' পত্রিকায় এই সংবাদটি পড়িলাম; 'যুগান্তরে'র নিজস্ব সংবাদদাতা সংবাদ দিয়াছেন—

দেওঘর, ২৬শে অক্টোবর—"কোনও দেশ বা বৃহত্তর ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বে কোন ব্যাপক সঙ্কট আসন্ন হইলে অতিমানব বা ঋষির আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী হয়। ইতিহাসে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বৃটিশ যুগেও ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে। বর্তমান পৃথিবী পুনরায় আন্তর্জাতিক ও শ্রেণীবিরোধের ক্ষেত্রে এক দ্বিতীয় সঙ্কটমুখে আসিয়া ঠেকিয়াছে। **বর্তমান সঙ্কট হইতে বিশ্বকে ত্রাণের জন্য স্বর্গ হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র প্রেরিত হইয়াছেন।** তিনি তাঁহার দেশের এবং বিশ্ববাসীর ত্রাণের বাণী লইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন।"

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ৬৬তম জন্মবার্ষিকী উৎসবের তৃতীয় দিবসের সভায় সভাপতির ভাষণদান প্রসঙ্গে **কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়** উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

পড়িয়া চমকাইয়া উঠিলাম, বিশেষ করিয়া বড় হরফে ছাপা অংশগুলি পড়িয়া। রমাপ্রসাদবাবুকে চিনি, কোনও আধুনিক ঠাকুরকে দেখিয়া

এতখানি মাতিবেন, ততখানি উন্মত্ত তিনি এখনও হন নাই। টেলিফোনের সাহায্যে তাঁহাকে খুঁজিতে গিয়া সংবাদ পাইলাম, তিনি কলিকাতার বাহিরে আছেন।

দশ দিন যাইতে না যাইতে ওই 'যুগান্তরে'র ৯ই নবেম্বরের সংখ্যায় একেবারে খাস সংবাদের মূল্যবান পৃষ্ঠায় বড বড় অক্ষরে এই সংবাদটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল--

"পুত্র-শোকাতুরা
শ্যামাপ্রসাদ-জননী
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ।

"দেওঘর, ৫ই নভেম্বব—শ্যামাপ্রসাদজননী শ্রীযুক্তা যোগমায়া দেবী পুত্র হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখার্জ্জি এবং তাঁহার পত্নী ও কন্যা সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীঠাকুব অনুকূলচন্দ্রেব দর্শনলাভের উদ্দেশ্যে গত কাল মধুপুর হইতে এখানে আসিযা পৌছেন। আশ্রমবাসীবা সাগ্রহে তাঁহাদের শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে লইয়া যান।

"পরলোকগত নেতা শ্যামাপ্রসাদকে শ্রীশ্রীঠাকুর যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। পুত্রশোকাতুরা ৮২ বৎসব বয়স্কা জননী যোগমায়া শ্রীশ্রীঠাকুবের নিকটে উপস্থিত হইয়া কাঁদিয়া ফেলেন। তাঁহাব শীর্ণ গণ্ড বাহিয়া অশ্রু গড়াইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখও অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠে।"

আমবা আজন্ম পাষণ্ড, জীবনে অনেক সাধু মহাত্মাকে সঠিক চিনিতে না পারিয়া তাঁহাদের নিন্দা-কটূক্তির দ্বারা অনেক পাপসঞ্চয় করিয়াছি। উপরের দুই দিনের দুইটি সংবাদ পড়িয়া আশ্বস্তও হইলাম, যদি দর্শনে পাপ কাটিয়া যায়! তবু সঠিক যাচাই করিবার জন্য আবার টেলিফোন করিলাম, সহোদর উমাপ্রসাদ টেলিফোন ধরিলেন, শ্রীরমাপ্রসাদ গৃহে ছিলেন না। উমাপ্রসাদ বলিলেন, বড়দার দেওঘরে গিয়া বক্তৃতা দেওয়াটা সর্বৈব মিথ্যা, অন্য সংবাদটি আরও মারাত্মক; কারণ তাহা অর্ধ-সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্য কি জানিতে চাহিলাম। তিনি আমাকে

একটি পত্র লিখিতে বলিলেন, পত্রযোগেই জবাব দিবেন বলিলেন। পত্র দিলাম। তাহার জবাবে শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে তিনি যাহা জানাইয়াছেন, তাহা নিম্নে হুবহু মুদ্রিত হইল।—

"প্রিয় সজনীবাবু,

"আপনার চিঠি পড়ে আশ্চর্য হই নি। পূজার ছুটিতে বাইরে গিয়েছিলাম। ৮ই নভেম্বর এখানে ফিরেছি। এসে পর্যন্ত দেখছি, দেওঘরের ঘটনা সম্বন্ধে অনেকেরই কৌতূহলের অন্ত নেই। বহুলোকের কাছে রোজই কৈফিয়ৎ দিতে হচ্ছে। এর কারণও আছে। ঘটনা-স্রোতের আবর্তে প্রকৃত ব্যাপারটা তলিয়ে গিয়ে একটা tragedy of errors-এর সৃষ্টি করেছে। ফলে, আমাদের অবস্থা নিদারুণ করুণ হয়ে উঠেছে। আপনার জ্ঞাতব্য হিসেবে যেটুকু প্রয়োজন তা লিখে জানাচ্ছি।

"ছুটির বেশির ভাগ এবার আমার পশ্চিম-হিমাচলের এক নিভৃত অঞ্চলে কেটেছে। খবরের কাগজের সেখানে গতিবিধি নেই। তাই বেশ কিছুদিন পরে রিপ্-ভ্যান্-উইঙ্কিলের অবস্থা নিয়ে ফিরলাম। ফেরবার পথে মধুপুরে নামি ও সপ্তাহখানেক থাকি। মধুপুরে তখন মা, বড়দা, বউদি, ছেলেরা সকলে ছিলেন। সেখান থেকে একদিন নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে দেওঘর যাই। বৈদ্যনাথ-মন্দিরে যাওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। বাড়ির সকলেই গিয়েছিলাম। সকালে গিয়ে সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরব এই প্রোগ্রাম। মন্দিরে পূজা-দর্শনাদি শেষ হ'ল। তারপরও প্রচুর সময়, কোথায় কাটানো যায় সমস্যা দাঁড়াল। কয়েক জায়গায় ঘোরার পরও দেখা গেল তখনও ঘণ্টা দুই দেরী ট্রেন ছাড়তে। সেই সময়ে আমাদের মধ্যে কথা উঠল, 'শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুরের আশ্রম' দেখতে গেলে কেমন হয়? স্টেশনের পথেই তো প্রায় পড়বে? এ কথা মনে হবার একটা কারণ ছিল। মধুপুর থেকে দেওঘর যাবার পথে ও দেওঘর শহরে চতুর্দিকে দেখছিলাম, তাঁর নামে প্ল্যাকার্ডের ছড়াছড়ি। শুনলাম, কিছুকাল আগে তাঁর জন্মোৎসব গেছে। দেশদেশান্তর থেকে

লোক এসেছিল, স্পেশ্যাল ট্রেন চলেছিল, বিরাট সভা হয়েছিল ইত্যাদি। কাগজে তার বিস্তারিত বিবরণীও বার হয়েছিল। আমি তখন প্রবাসে বনবাসে, আমার সে-সব কিছুই জানা ছিল না। এখন উৎসবের শেষ হয়েছে। ভাবলাম, সময় রয়েছে, মন্দ কি, আশ্রমটা দেখাই যাক না?

"বড়দার দেখি কোনই উৎসাহ নেই, বলেন, স্টেশনেই সোজা চল না? কিন্তু শেষ পর্যন্ত আশ্রমের দিকেই আমাদের যাওয়া হ'ল। অনুকূল ঠাকুরের নাম মার জানা ছিল না। তা ছাড়া, তাঁর শরীর ও মন দুইই ভেঙেছে। সেখানে যাওয়ার কোন আগ্রহই তাঁর ছিল না। তাই আশ্রমে পৌঁছে তিনি গাড়িতেই বসে রইলেন, বললেন, যাও, তোমরা ঘুরে এস, আমি এখানেই থাকি।

"এদিকে গাড়ি থেকে নামার পর আশ্রমের একজন কর্মকর্তা বড়দাকে দেখতে পেয়েই তার কাছে এগিয়ে এলেন, সাদর অভ্যর্থনা জানালেন ও 'ঠাকুরে'র সঙ্গে দেখা করারও প্রস্তাব করলেন। আমি ভাবলাম, মাকেও নিয়ে আসি। মাকে গিয়ে বললামও। তিনি দ্বিধা-ভরে নামলেন। সামনেই একটি প্রকাণ্ড ঘরে শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর ছিলেন। আমরা সকলেই সেখানে গেলাম। সেখানে কি কি দেখলাম এবং মনে আমাদের কি ধারণা নিয়ে এলাম—সে-সব কথার এখানে প্রয়োজন নেই, সেটা ব্যক্তিগত অভিমতই হবে। তবে এই কথাটাই এখানে জানানো দরকার যে আমরা খুব অল্প সময়ই সেখানে ছিলাম। বোধ করি, মিনিট পাঁচেকই হবে। বড়দার সঙ্গে 'ঠাকুরে'র দুই একটা কথা হয়েছিল—সাধারণ গতানুগতিক কথা। মা যেমন ঘোমটা দিয়ে থাকেন তেমনি চুপ করে বসে ছিলেন।

"তারপর আশ্রমের ভদ্রলোকটি, যিনি আমাদের ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়েছিলেন, গাড়ি পর্যন্ত এসে আমাদের তুলে দিয়ে গেলেন। গাড়ি ছাড়ল। মা শুধু বললেন, এখানে আমাকে নামিয়ে ছিলে কেন, বাবা?

"উত্তর দিতে পারলাম না।

"এই এক ঘটনা।

"এর পর স্টেশনের পথে পরিচিত দুই জনের সঙ্গে দেখা। ছুটিতে দেওঘর এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলার মাঝে জানলাম এর আগে 'ঠাকুরে'র জন্মতিথি উৎসবে বড়দা আশ্রমে এসেছিলেন, বক্তৃতা দিয়েছিলেন—কাগজে তাঁরা নাকি পড়েছেন! অথচ প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে বড়দা সে-সময় দেওঘরেই যান নি—বক্তৃতা দেওয়া তো দূরের কথা। হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত বেণুপদ মুখোপাধ্যায় সেখানে গিয়েছিলেন এবং বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁরও সংক্ষিপ্ত নাম জষ্টিস্ আর. পি. মুখার্জি। তাই লোকমুখে প্রচারের গুণে ও কাগজের রিপোর্ট থেকে সাধারণের ভুল ধারণা হয়, বড়দাই সেখানে গিয়েছিলেন ও বক্তৃতা দেন। কাগজের সে রিপোর্ট আমি পড়ি নি, কি ছাপা হয়েছিল আমি জানি না। কিন্তু কলকাতায় এসে দেখছি অনেকেরই সেই সম্পূর্ণ ভুল ধারণা!

"এর পরও আছে।

"একদিন এখানে খবরের কাগজে ছাপার হরফে দেখি, আমাদের সেদিনকার আশ্রমে যাওয়ার বৃত্তান্ত। সাজিয়ে গুছিয়ে একটা অভিনব রূপ দিয়ে ঘটনাটিকে সাধারণের কাছে পরিবেশন করা হয়েছে। সমস্তটা পড়ে, বিশেষতঃ মা-র সম্বন্ধে যে-ভাবে লেখা হয়েছে দেখে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হলাম। প্রোপাগ্যাণ্ডারও একটা সীমা আছে।

তাই ভাবি, কাগজ না-পড়ে কিছুকাল ছিলাম ভালো! ইতি

শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়"

ইহার উপর আমরা কোন মন্তব্য করিব না, কারণ মন্তব্য কঠিন এবং রূঢ় হইবে। বয়স হইয়াছে, রূঢ়তা পরিহার করিয়াই চলিতে চাই। কিন্তু আমাদের ভয় ভাঙিতেছে না। মিথ্যা-প্রচারের দৌরাত্ম্যে সাধারণ নিরীহ বিশ্বাসী মানুষ যে আজও বৈজ্ঞানিক বিংশ শতাব্দীর এই দ্বিতীয়ার্ধে কিরূপ নাকাল ও হয়রান হইতেছে বি. এন. আর-এর বীর-শিবপুরের সর্বরোগহর ডোবা, পুরীর রাখাল বালক, ধনলক্ষ্মী প্রভৃতির ব্যাপারে আমরা তাহা দেখিয়াছি। তারাশঙ্করের বিচিত্র চাঁপাফুলপ্রাপ্তির

সরস কাহিনী "এ যুগেও সম্ভব" বর্তমান পৌষ সংখ্যা 'কথাসাহিত্যে' বাহির হইয়াছে। সত্য মিথ্যা নির্ধারণের উপায় নাই, তাই আশা হইতেছে, দেখিব—পাইকপাড়ার রাজাদের গৃহদেবতা রাধাবল্লভ আবার ঝাঁকিয়া উঠিবেন। দেখিয়া শুনিয়া অনেক দুঃখেই ১৬ অগ্রহায়ণ তারিখের 'তত্ত্ব-কৌমুদী' মন্তব্য করিয়াছেন—

"সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ অবতাররূপে প্রচারিত এরূপ একটি নব পুরুষোত্তমের জন্মতিথিতে লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হইয়া গেল। একই সময়ে এতগুলি পূর্ণ ব্রহ্মের আবির্ভাব দেখিয়াও যদি আমাদের অন্ধভক্তি আমাদের বিবেচনা-শক্তিকে আচ্ছন্ন করে, তবে এদেশের শ্রেষ্ঠতম ধর্মীয় বিকাশ অদ্বৈতবাদকেই যে নস্যাৎ করা হয়, সে জ্ঞান আমাদের জাতীয় জীবনে পরিস্ফুট হইবে কবে ?

"মানুষের বুদ্ধিতে যার কারণ পাওয়া যায় না, এমন ঘটনা যে এ পৃথিবীতে ঘটে না, তাহা নয়, মাঝে মাঝে এ রকম ঘটনার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এই রকম অতিপ্রাকৃত ঘটনার প্রতি মানুষের চেতন ও অবচেতন মনে আগ্রহ অনেক সময়ই দেখা যায় এবং এই আগ্রহের সুযোগ লইয়া একদল অসৎ প্রকৃতির লোক মানুষকে নানা ভাবে প্রতারিত করিয়া অলৌকিক বিভূতিসম্পন্ন লোকের বিভূতির কথা যখন লোকপরম্পরায় ছড়াইয়া পড়িতে থাকে, সেই সময়ে নিজের অবচেতন মনের বিশ্বাসপ্রবণতার জন্য সেই সমস্ত রচা গল্পে সহজেই বিশ্বাস হওয়ার ফলে মানুষ প্রলুব্ধ হইয়া নানা ভাবে বিপন্ন হয় ; তবুও এই রকম বিশ্বাসের আর অন্ত নাই।

"কয়েক বৎসর আগে ওড়িষ্যায় সর্বরোগনিরাময়ের ক্ষমতাপন্ন বালক নেপাল বাবার অলৌকিক ক্ষমতার মিথ্যা গল্পে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতারিত হয়, লক্ষ লক্ষ টাকার অপব্যয় ও অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া দুর্গম প্রদেশে আসিয়া কত লোক যে কত ভাবে বিপন্ন হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। লোকের ভীড়ে সংক্রামক ব্যাধির আবির্ভাবে ও সহজ প্রসারের ফলে

অনেক লোকের প্রাণান্ত হয়। কিন্তু তাহার পরও নেপাল বাবার মত এই শ্রেণীর বুজরুকের কাছে মানুষ ঠকিয়াছে ও ঠকিতেছে।

"কিছুদিন আগে খবর রটে যে, মহীশূরে এক গ্রামে ধনলক্ষ্মী নামে এক বালিকা বহুদিন অনাহারে থাকিয়াও জল স্পর্শ না করিয়া মাসের পর মাস ধরিয়া সুস্থ ও সবল শরীরে অতি কঠিন পরিশ্রম করিবার শক্তির অধিকারী রহিয়াছে ; ইহা শুনিয়া লোকের বিস্ময়ের আর সীমা পরিসীমা ছিল না। শরীর-বিজ্ঞানের সকল নিয়ম-কানুনের বিপরীত এই কাহিনীর সম্পর্কে এমনই একটা ধারণা লোকমনে জন্মিতে লাগিল যে, সরকার হইতে উহার সত্যাসত্য পরীক্ষা করার প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং বাঙ্গালোরের সরকারী হাসপাতালে ধনলক্ষ্মীকে কঠোর পাহারাধীনে রাখিতেই অনাহারে থাকার কাহিনী আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ভাঙিয়া পড়ে। আটচল্লিশ ঘণ্টা যাইতে না যাইতে ধনলক্ষ্মী পিপাসায় কাতর হইয়া পড়ে ও পানার্থে জল চায়। তাহাকে পান করিতে জল দিবার পর, তাহাকে খাইবার জন্য কিছু আহার্য দিলে আগ্রহের সহিত সে তাহা আহার করে এবং বহুদিন অনাহারে থাকার পর আহারে তাহার কিছুমাত্র অস্বস্তি দেখা দেয় না। ইহা হইতেই চিকিৎসকগণ বুঝিতে পারেন যে, বহুদিন অনাহারে থাকার কাহিনী সকল মিথ্যা ; তাহাকে গোপনে আহার্য যোগান দিয়া তাহার অলৌকিক শক্তির মিথ্যা কাহিনীর সৃষ্টি, মতলববাজ লোকে প্রতারণার উদ্দেশ্যেই করিয়াছিল।

"নেপালবাবা, ধনলক্ষ্মী প্রভৃতিকে লইয়া শঠতার খেলা চলিতে দেখিয়াও অলৌকিক শক্তির প্রকাশ দেখিতে আগ্রহশীল লোকের অভাব দেশে হইবে না। ইহা জানা আছে বলিয়াই এই শ্রেণীর কীর্তির শেষ হইবে না। তবে বুদ্ধিমান লোক নিশ্চয়ই সাবধান হইবেন এবং অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে কোনও অসাধারণ শক্তির আধার বলিয়া কাহারও উপর আস্থা রাখিবেন না।"

—

আচার্য অবনীন্দ্রনাথের সুযোগ্য শিষ্য আচার্য নন্দলাল বসু গত ৩রা ডিসেম্বর বাহাত্তর বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন ; এই পুণ্যদিবস উপলক্ষে শান্তিনিকেতন শ্রদ্ধার্ঘ্য দান করিয়া সমগ্র দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সাহিত্যে ও শিল্পে বিশ্বের দরবারে যাঁহারা বাঙালী জাতিকে সম্মানের আসনে বসাইয়াছেন, আচার্য নন্দলাল তাঁহাদের অন্যতম। অবনীন্দ্রনাথ বর্তমান থাকিতেই নন্দলালের হাতে ভারতীয় চারুশিল্প ও কারুশিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল। বৎসরে বৎসরে কংগ্রেস-মণ্ডপ সজ্জায় তিনি সারা ভারতে এক নিজস্ব নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। ইদানীং প্রায় খেলাচ্ছলে তিনি বিচিত্র রেখা ও লেখার মাধ্যমে শিল্পকলার ছাত্রদের যে ভাবে শিল্পমনা করিয়া তুলিতেছেন, তাহাও সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য। আমরা তাঁহার দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছি এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া তাঁহাকে বলিতেছি—

বিশ্ব সদা তোমার কাছে ইসারা করে কত,
তুমিও তারে ইসারা দাও আপন মনোমত।
বিধির সাথে কেমন ছলে
নীরবে তব আলাপ চলে,
সৃষ্টি বুঝি এমনিতরো ইসারা অবিরত॥

ছবির 'পরে পেয়েছো তুমি রবির বরাভয়,
ধূপছায়ার চপলমায়া করেছো তুমি জয়।
তব আঁকন-পটের 'পরে
জানি গো চিরদিনের তরে
নটরাজের জটার রেখা জড়িত হয়ে র'য়॥

চির-বালক ভুবনছবি আঁকিয়া খেলা করে।
তাহারি তুমি সমবয়সী মাটির খেলাঘরে।

তোমার সেই তরুণতাকে
বয়স দিয়ে কভু কি ঢাকে,
অসীম পানে ভাসাও প্রাণ খেলার বেলা 'পরে ॥

কবি কালিদাস রায়ের ভাগ্যে এবার জগত্তারিণীর শিকা ছিঁড়িয়াছে। আমরা আনন্দিত হইয়াছি। বাংলার কবি-সমাজে ষষ্টিপর বৃদ্ধদের মধ্যে চারিজন আছেন, ব্রাহ্মণ করুণানিধান গতবারে প্রথমেই বিদায় পাইয়াছেন, এবার তিন কবিরাজের পালা শুরু হইল; কালিদাস পাইলেন, পরে পরে কুমুদরঞ্জন এবং যতীন্দ্রনাথ পাইলেই আমাদের অর্থাৎ কবিদের বাজিমাৎ। কালিদাসদা রাজধানীর সন্নিকটে বাস করেন বলিয়া বয়সের দিক দিয়া একটু ওলট-পালট ঘটিয়াছে; তা সটিক। কুমুদরঞ্জন যতীন্দ্রনাথ কেহই ব্যস্তবাগীশ নহেন।

কয়েক বৎসর হইতে উপন্যাস-জগতের দিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের কিঞ্চিৎ কৃপণ-দৃষ্টি প্রকট হইয়াছে। কবি-সিরিজের পর ঔপন্যাসিক-সিরিজের বৃদ্ধতম উপেন্দ্রনাথকে দিয়া এবার শুরু করুন।

জগত্তারিণী-প্রাপ্তি সম্বন্ধে স্বয়ং কালিদাসের কিঞ্চিৎ বক্রোক্তি-কাব্য (এবারের 'শনিবারের চিঠি'র অন্যত্র প্রকাশিত) পাঠকেরা নিশ্চয়ই উপভোগ করিবেন।

—

যক্ষ্মারোগের কথা আমরা এতাবৎকাল অনেক বিশেষজ্ঞ এবং বিশেষ অজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে অনেক শুনিয়াছি, এবারে বিখ্যাত যক্ষ্মারোগ-পারদর্শী ডাক্তার রামচন্দ্র অধিকারীর মুখে ('ক্ষয়রোগের কথা'—নিউ গাইড প্রকাশিত) অপূর্ব ভঙ্গিতে শুনিলাম। এই পুস্তকপাঠে রোগীরা এবং রোগীদের আত্মীয়-স্বজনেরা সবিশেষ উপকৃত ও আশ্বস্ত হইবেন। যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা যে অসম্পূর্ণ এবং বহু ক্ষেত্রেই ভ্রমাত্মক, এক দিক দিয়া অনেকে যেমন ইহার ভয়াবহ সংক্রামকতা সম্বন্ধে উদাসীন,

আবার অন্য দিক দিয়া অকারণ ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত ও সঙ্কুচিত, রোগ নিরাময় হইলেও সংসারে ও সমাজে রোগীকে গ্রহণ করিতে অনভ্যস্ত—এই সকল কথা স্পষ্ট ভাষায় এইভাবে প্রচার করার আবশ্যকতা ছিল। খাদ্যের সহিত এই রোগের সম্বন্ধের কথা বিস্তারিতভাবে বলারও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় যে কথাটা ডাক্তার অধিকারী বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা হইতেছে এই, রাজ-রোগ প্রশমন-ব্যাপারে রাজকীয় কর্তাদের দায়িত্ব।' যে পরিমাণ সহানুভূতিপূর্ণ সতর্ক দৃষ্টি এবং ব্যয়ে অকুণ্ঠতা এই রোগকে ব্যাপকভাবে দূর করিবার জন্য একান্ত আবশ্যক, দুঃখের বিষয় ভারতীয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সে পরিমাণ দৃষ্টি এদিকে নাই। সরকারী এই মনোভাবের পরিবর্তন না ঘটিলে যক্ষ্মামৃত্যু রোধ করা সম্ভব নয়। ডাক্তার অধিকারী সেই কথাটাই স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। সরকারের নজর এদিকে পড়িলে ডাক্তার অধিকারীর জ্ঞান ও পরিশ্রমসঞ্জাত এই রচনা সার্থক হইবে।

—

যথারীতি ডিসেম্বরের শেষে নূতন ইংরেজী বছরের ডায়েরি ও দেওয়ালপঞ্জীর দ্বারা অভিষিক্ত করিয়াছেন এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, দেবসাহিত্য কুটির, বেঙ্গল কেমিক্যাল ও কিরীট অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি। ওজনে ও আয়তনে এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং-এর বদান্যতায় বিচলিত হইয়াছি। এম. সি. সরকারও মন্দ নয়। ভাল কাগজ এবং সুদৃশ্য বাঁধাই এই ডায়েরিগুলি আমাদের কাজে তো লাগিয়াছেই, সূর্যরশ্মিসমৃদ্ধ চন্দ্রের মত আমরাও ধার-করা কিরণ বিতরণ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি। দেশের লোকে ডায়েরি ব্যবহারে অভ্যস্ত হউক এবং ধনেপুত্রে ডায়েরিগুলি লক্ষ্মীলাভ করুক—ইহাই কামনা।

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্রবিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা ৩৭ হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: বড়বাজার ৬৫২০

আদর্শ
লিভার টনিক
লিভারের রোগে কুমারেশ নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয়—কিন্তু সুস্থ অবস্থায়ও কুমারেশ কম প্রয়োজনীয় নয়। কুমারেশ অসুস্থ লিভারকে আরোগ্য করে এবং সুস্থ অবস্থায় লিভারকে সবল ও কার্যক্ষম রাখে।
QUMARESH

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **অনুবর্ত্তন**

মাত্র কয়েকজন শিক্ষকের দিনানুদৈনিক কর্ম ও ধর্মকে কেন্দ্র ক'রে রচিত কাহিনীটি যেন সমগ্র শিক্ষাব্রতী সমাজের প্রত্যেকটি সমস্যা পাঠকের মর্মকে তীব্রভাবে আলোড়িত করে। ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ বিচিত্র একটি অখণ্ড বেদনাময় সঙ্গীতের অবতারণা করেছেন লেখক আর্থিক দৈন্যতাড়িত যদুবাবু, মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত নারায়ণবাবু সকলেই সত্যের মত জী !

। চতুর্থ মুদ্রণ, সাড়ে চার টাকা ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের **পঞ্চগ্রাম**

বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র শহর নয়—গ্রাম। তেমনি বাংলা-সাহিত্যের জীবনাশ্রয় ও পল্লী-জীবন তারাশঙ্করের পঞ্চগ্রামের পটভূমি হৎ উপন্যাসেরই যোগ্য সন্দেহ নেই। সুখ-দুঃখের কথা ছাড়া বৃহত্তর আদর্শের বিকাশ ঘটেছে পঞ্চগ্রামের মধ্যে। ॥ পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ, ছয় টাকা ।

প্রমথনাথ বিশীর **পদ্মা**

প্রেম এবং পদ্মা সর্বনাশা: সব কিছু ভেঙেচুরে প্রেম আপন পথকে নিরঙ্কুশ করে চলেছে, কা থেকে, তা ইতিহাসও জানে না। নায়কের দুর্বার প্রেমের বেগ দু'টি নারীর জীবনকে কী ভা তচ্‌নচ্‌ করেছে তারই বেদনাকরুণ চিত্র পদ্মার ঔপন্যাসিককে এই গ্রন্থরচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসখানিকে আশীর্বাদভূষিত করে লেখককে অভিনন্দিত করেছিলেন।

। তৃতীয় মুদ্রণ, চার টাক ।

কালীপদ ঘটকের **অরণ্য কুহেলী**

আরণ্য সাঁওতালদের সামাজিক বন্ধন এবং বন্য আদিম তৃষ্ণাকে কেন্দ্র ক'রে এই উপন্যা ভূমিকা। আদিবাসীদের খাঁটি নিখাদ মনের পরিচয় তাদের সঙ্কল্পে, প্রেমে, আক্রোশে, ক্ষ আর তা আবিষ্কার করেছেন লেখক এই উপন্যাসে। বাংলার বিদগ্ধ সমাজ কর্তৃক সমাদৃত হ গ্রন্থটি। । চার টাকা ।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের **অ্যালবার্ট হল**

কলেজ স্কোয়ারের 'অ্যালবার্ট হল' একদিন সারা বাংলার সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি ছিল, সারা ভার রাজনৈতিক আশা-উদ্দীপনার মন্ত্রমঞ্চ—বর্তমানে তা 'কফি হাউসে' রূপান্তরিত। নব্য বাং স্নায়ুকেন্দ্র এখন কফি হাউস। কেবলমাত্র একটি দিনের পরিসরে সমসাময়িক বাঙালীর ম লোকের ছবিটি আশ্চর্য নিপুণ হয়ে ফুটে উঠেছে এই বইতে। বেকার পরগাছার মত কয়ে স্বল্পবুদ্ধি রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্রছাত্রী, হবু সাহিত্যিক, কবি, ব্যবসায়ী, গাইয়ে, নানা ধরণের চরিত্রের মাধ্যমে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের শূন্যকুম্ভ রূপটি ফুটে উঠেছে। ব সাহিত্যে এ ধরণের বই এই প্রথম। । সাড়ে তিন টাকা ।

শনিবারের চি
মাঘ ১৩৬০ : দাম আট
শ্রীসজনীকান্ত দা
Jan.-Feb. : Price As. Eig
অ্যাস্কো
বার
ও
ট্যাবলেট
সাবান
ASCO
SPECIAL
HOUSEHOLD SOAP
TABLET
ASCO BAR
কোম্পানী · কলিকাতা

সূচী

মাঘ—১৩৬০

আমার সাহিত্য-জীবন
—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৩৩৭
চিরায়ু বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর—কানাই সামন্ত ৩৪৫
তিনকড়ি-দর্শন—"বনফুল" ... ৩৫৩
ক্ষতি কোথায় ?—শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায় ... ৩৫৪
ডানা—"বনফুল" ... ৩৬০
মহাস্থবির জাতক—"মহাস্থবির" ... ৩৬৯
উলুখড়—শ্রীসঙ্কর্ষণ রায় ... ৩৮৫
ধনপতি পাগ্‌লার ডায়েরি
—শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু ... ৪০১
বনলতা সেনের প্রতি
—শ্রীঅসিতকুমার চক্রবর্তী ... ৪১২
নাটক—শ্রীতারকদাস চট্টোপাধ্যায় ... ৪১৩
ধূমাবতী—"বনফুল" ... ৪১৭
হ্যামলেট, ডেনমার্কের কুমার
—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ... ৪১৮
অতি-প্রাকৃত
—শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ ... ৪৩২
বেতালের বৈঠকী—বেতাল ভট্ট ... ৪৩৬
সংবাদ-সাহিত্য ... ৪৩৭

রামপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

কাল-কল্লোল ৪॥০

ভোলা সেন প্রণীত

উপন্যাসের উপকরণ ২৷০

অমরেন্দ্র ঘোষ প্রণীত

দক্ষিণের বিল ১ম—৪৲ ২য়—৪৲

প্রভাত দেবসরকার প্রণীত

অনেক দিন ৩॥০

অশোককুমার মিত্র প্রণীত

দু' ঘণ্টা ২৲

জ্যোতির্ময়ী দেবী প্রণীত

মনের অগোচরে ২৲

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত

কাক-জ্যোৎস্না ৩৲

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র প্রণীত

উদাসীর মাঠ ২৲

প্রিয়কুমার গোস্বামী প্রণীত

কবে তুমি আসবে ২॥০

ননীমাধব চৌধুরী প্রণীত

দেবানন্দ ৪৲

শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত

করুণাদেবীর আশ্রম ২৲

সীতা দেবী প্রণীত

বন্যা ৪৲

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

কলঙ্কিনীর খাল ২॥০

পঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত

দুই পক্ষ ২॥০

প্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত

য়েক ঘণ্টা মাত্র ২৲ **কলরব** ২৲ **দুই আর দু'য়ে চার** ২॥০

অনুরূপা দেবী প্রণীত

হারানো খাতা ৩৲ **গরীবের মেয়ে** ৪॥০ **পোষ্যপুত্র** ৪॥০

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

আমরা কি ও কে ? ৩৲

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য প্রণীত

মিলন-মন্দির ৩৲

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

পঞ্চভূত ২॥০

কানামাছি ২॥০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

নীলকণ্ঠ ২৲

তিনশূন্য ৩৲

সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে

সপ্তম খণ্ড

পঞ্চদশ খণ্ড

ষোড়শ খণ্ড

রবীন্দ্র রচনাবলী

মোট এই খণ্ডগুলি বর্তমানে পাওয়া যায়—ক. কাগজের মলাট সংস্করণ। প্রতি খণ্ডের মূল্য আট টাকা—১ ৭ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬॥ খ. সাধারণ কাগজে ছাপা, রেক্সিনে বাঁধাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য এগারো টাকা—১ ৭ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬॥ গ. মোটা কাগজে ছাপা, রেক্সিনে বাঁধাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য বারো টাকা—১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ২১

রবীন্দ্র-রচনাবলী পাবার সহজ উপায়॥ আপনি কোন্ কোন্ খণ্ড সংগ্রহ করেছেন বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগে (৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭) চিঠি লিখে তা জানিয়ে, স্থায়ী গ্রাহক হয়ে থাকা। ক খ গ কোন্ রকমের বই আগে কিনেছেন তা জানালে সেই রকম বই দেবার চেষ্টা করা হবে। কোনো খণ্ড প্রকাশিত বা পুনর্মুদ্রিত হলেই গ্রাহকদের চিঠি লিখে জানানো হয়। গ্রাহক হবার জন্য অনুরোধপত্রই যথেষ্ট, কোনো দক্ষিণা বা অগ্রিম মূল্য জমা দিতে হয় না।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা

PURITY
INDIAN BARLEY
PURITY
INDIAN
BARLEY
আমি জানি 'পিউরিটি' বার্লি সব
ভালো, কারণ এই বার্লি স্বাস্থ্য-সম্মত
টিনে ভরা হয় এবং সেরা শস্য থেকে
রের অভিজ্ঞ লোক দিয়ে তৈরি।
' বার্লি তৈরির পেছনে রয়েছে
ছরের-পেষাইর অভিজ্ঞতা।
উরিটি বার্লি
্যাটলাণ্টিস (ইস্ট) লিমিটেড, পোস্ট বক্স নং ৩৩৪, কলিকাতা

সুপ্রা কালি
দামী ফাউন্টেন পেনের জন্য
সুপ্রা কালি আজ এত জনপ্রিয় কেন? সব বিদেশী দামী কালিকে সে হার মানিয়েছে, সল-এক্স-যুক্ত ও তলানিমুক্ত ব'লে অব্যাহত তার প্রবাহ, বর্ণের স্থায়ী ঔজ্জ্বল্য মনে আনে তৃপ্তির নিশ্চিত আশ্বাস। কালির রাসায়নিক গুণে প্রিয় কলমটি থাকে চির নূতন।
Supra ink
SPECIAL
Supra ink
Contains Sol-X SPECIAL
সুপার টয়লেট এণ্ড কেমিক্যাল কোং, লিঃ কলিকাতা-৫

এশিয়া

আর্থার কোয়েসলারের বিখ্যাত বই "Darkness at noon"এর বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ করেছেন নীলিমা চক্রবর্তী। দাম ২॥•

সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত

কথাগুচ্ছ	৭৲

পরশুরামের

কজ্জলী	২॥•
গড্ডলিকা	২॥•
হনুমানের স্বপ্ন	২॥•
গল্পকল্প	২॥•
ধুস্তরীমায়া ইত্যাদি গল্প	৩৲

চিত্রিতা দেবীর

ঔপনিষৎ	২॥•

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

এই মর্তভূমি	৩॥•

অন্নদাশঙ্কর রায়

নতুন করে বাঁচা	১৸•
পথে প্রবাসে	৩॥•

সুবোধ ঘোষ

জতুগৃহ	৩॥•
মণিকর্ণিকা	১॥•
ফসিল	২॥•

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাগৈতিহাসিক	২॥•
বৌ	২৸•
আদায়ের ইতিহাস	১॥•

এম, সি, সরকার [illegible] সন্স লিঃ—১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট : কলিকাতা-১২

[illegible]তিক গল্প [illegible] (আঞ্চলিক) পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক **দেবাচার্যের**

[illegible]রের [illegible] ১৲

"...পড়ে আমি শুধু আনন্দিতই হই নি, বিস্মিতও হয়েছি।..."—শ্রীসজনীকান্ত দাস

"...উচ্চাঙ্গের সাহিত্যস্রষ্টিকার বলতেও কুণ্ঠা নেই।..." —বসুমতী

উপন্যাস :—

কস্তুরীমৃগ (যন্ত্রস্থ)

বিমুগ্ধা পৃথিবী ২৲

"...অসাধারণ কৃতিত্ব..." —শ্রীসজনীকান্ত দাস

"...real moments of greatness..." —Amrita Bazar Patrika

"...Exquisite scenes ..." —Hindusthan Standard

"...অনবদ্য পরিবেশ..." —প্রবাসী

"...ছত্রে ছত্রে...সৌন্দর্য ও রস..." —যুগান্তর

সীমা (কাহিনী) ২৲

"...কাব্য গূঢ়ার্থ ব্যঞ্জনায় চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে..." —অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য

"...সুপাঠ্য ও সুসাহিত্য"... —শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

"...সুনিপুণ ভাবে ও ছন্দের তটবন্ধনের মধ্যে একটি রসরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ইতিহাসের কঙ্কালে কবি জীবন দর্শন করিয়াছেন।..." —যুগান্তর

"...ইহার সূচনা হইতে পরিসমাপ্তি পর্যন্ত একটা নিরবচ্ছিন্ন আকর্ষণ পাঠকের মনকে গ্রথিত করিয়া রাখে।..." —হিমাদ্রি

সোল ডিষ্ট্রিবিউটার্স

রিডার্স এসোসিয়েট

শনিবারের চিঠি
২৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩৬০

আমার সাহিত্য-জীবন

ছয়

আমার জীবনে সেদিন একটা জয়ের দিন।

আর্ট থিয়েটারে আমার প্রথম নাটক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। যিনি নাকি অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি নাটক না প'ড়েই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন! ক্ষোভে দুঃখে নাটকখানিকে আগুনের মুখে সমর্পণ করেছিলাম। স্থির করেছিলাম, সাহিত্য-সাধনাই ছেড়ে দেব। কিছুদিনের জন্য দিয়েওছিলাম। তারপর রাজনৈতিক জীবনের পালা শেষ ক'রে আবার যখন সাহিত্য-সাধনা শুরু করলাম তখন স্থির করেছিলাম, নাটকের ধার দিয়েও অন্তত যাব না। নাটকও ঠিক লিখি নি। 'কালিন্দী' প্রথমে ছিল একটি গল্প। "ফল্গু" ছিল গল্পটির নাম। গল্পটি 'পরিচয়ে' প্রকাশিত হয়েছিল—শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র দত্তের 'পরিচয়ে'। 'কালিন্দী' উপন্যাস প্রকাশিত হবার পর দু-চারজন উপন্যাসটিকে নাট্যরূপ দেবার জন্য বলেছিলেন। নাটকেই যে আমার হাতেখড়ি তা তাঁরা জানতেন না, সেইহেতু বলেছিলেন, কোন নাট্যকারের শরণ নিতে। —কে, কি —কে বলুন না, নাটক তৈরি করুন। একজন নাট্যকারও বলেছিলেন, বলুন না, নাটক ক'রে দিই। এই থেকেই বাসনা হ'ল আবার নাটকে হাত দিতে। 'কালিন্দী' নাটক নিয়ে এলাম এবং সে নাটক একদিনেই গৃহীত হ'ল। গ্রহণ করলেন শ্রীযুক্ত প্রবোধ গুহ, যিনি এককালে আর্ট থিয়েটারের এক রকম হর্তাকর্তা ছিলেন।

এই তারিখটি লিখে রাখি নি। তবে বৈশাখের শেষ কি জ্যৈষ্ঠের প্রথম।

প্রবোধবাবু আশ্চর্য মানুষ। না-বোঝেন, না-জানেন হেন বিষয় বোধ করি দুনিয়ায় নেই। এবং হেন ব্যবসায়কর্ম নেই যা তিনি করেন নি।

আমি বরানগরে বাড়ি করেছি শুনে বললেন, কোন্ জায়গাটায় বলুন তো?

রাস্তার নাম শোনবামাত্র সঠিক ব'লে দিলেন আশপাশের বিবরণ।

হেসে বললেন, কলোনি ক'রে জায়গা-জমির ব্যবসাও করেছিলাম কয়েক দিনের জন্যে।

ফ্রেঞ্চ-ছাঁট দাড়ি-গোঁফ গৌরবর্ণ মানুষটি বিচিত্র। অদ্ভুত কর্মশক্তি। জীবনে যত দুর্নাম তত সুনাম অর্জন করেছেন। গালিগালাজ প্রশংসা কিছুতে ক্ষোভও নেই, লোভও নেই। যখন যাতে হাত দেন তাতেই বিপুল উৎসাহের সঙ্গে লেগে যান। কাজটিকে সার্থক ক'রে তুলতে যা করবার ক'রে যাবেন। ভালমন্দ কিছু বাছবেন না। তা যদি বাছতেন, তা হ'লে বাংলা দেশ একজন মহান কর্মীকে পেত। প্রবোধবাবুর আর একটি বড় পরিচয়, তাঁর সামাজিকতার পরিচয়। কথায় বার্তায়, আদরে আপ্যায়নে, হাস্যে পরিহাসে প্রবোধবাবুর জুড়ি নেই।

পরিচয়ের পূর্বে গম্ভীর মানুষ প্রবোধবাবু। পরিচয়ের পর আর এক মানুষ। পরিচয়ের পর তাঁকে ডাকুন, প্রবোধবাবু!

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পাবেন—ইয়েস সার্। অথবা—হুকুম করুন।

আপনার হাতের কাছে একটা জিনিস রয়েছে, সে জিনিসটা এগিয়ে দিতে বলছেন প্রবোধবাবু, তার ভাষাটা এই রকম—সার্ অথবা প্রভু, পায়ে ক'রে ওই জিনিসটা একটু এগিয়ে দিন তো দেখি! আপনার দেশলাইটা পায়ে ক'রে একটু ছুঁড়ে মারুন না সার্।

পরিচয়ের পর—আপনার বাড়িতে কাজ। প্রবোধবাবু তাতে উদয়াস্ত পরিশ্রম করবেন, খালি গায়ে খালি পায়ে। দরকার হ'লে উচ্ছিষ্ট পাত কুড়িয়ে বাইরে ফেলবেন।

মজলিস বসেছে, প্রবোধবাবু ওদিকে মাংস আনিয়ে নিজেই হাঁড়ি চড়িয়ে পাককার্যে লেগে গেছেন।

প্রবোধবাবু! ও মশাই, গেলেন কোথায়?

এই যে সার্, আমি ঠিক আছি।—প্রবোধবাবু মশলামাখা হাতেই উঠে এলেন। দাড়িতে কখন হলুদমাখা হাত দিয়েছেন—দাড়িতে হলুদের রঙ লেগেছে।

নতুন নাটক হবে। একা প্রবোধবাবু বিশ জন হয়ে বিশ জনের কাজ উঠিয়েছেন।

কলকাতার তখনকার দিনের এমন বড় মানুষ নেই যাঁর সঙ্গে প্রবোধ-বাবুর পরিচয় ছিল না। সে রামকৃষ্ণ-মঠের মহারাজদের শিরোমণি থেকে শুরু ক'রে শেঠকুলের শ্রেষ্ঠ পর্যন্ত; আবার দেশবন্ধু, নেতাজী, শরৎ বসু থেকে লীগ-মন্ত্রীমণ্ডলের জনাব ফজলুল হক সাহেব পর্যন্ত; পুলিস কমিশনার টেগার্ট সাহেব থেকে মীনা পেশোয়ারী, খ্যাঁদা গুণ্ডার মত গুণ্ডা পর্যন্ত না-চিনতেন কাকে প্রবোধবাবু!

সে আমল মানে, অ্যাণ্ডারসনের লাটশাহী, টেগার্টের কোতায়ালশাহী আমল। সেই আমলে প্রবোধবাবুই 'সিরাজউদ্দৌল্লা' 'মীরকাশেম' নিয়ে নাটক পাস করিয়ে এনেছেন পুলিসের কাছ থেকে। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'ও তাঁর নাট্যালয়েই মঞ্চস্থ হয়েছিল। শ্রদ্ধেয় নাট্যকার শচীনদার সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল অপরিসীম; এ সব নাটক লিখেছেন শচীনদা, প্রবোধবাবু পুলিসের হাত থেকে পাস করিয়ে অভিনয় করিয়েছেন, এবং প্রচুর অর্থব্যয় করেছেন নাটকগুলির সার্থক রূপ দেবার জন্য। 'সিরাজউদ্দৌল্লা' অভিনয়ে কাশিমবাজার কুঠির দৃশ্যের সাজসজ্জা স্মরণীয়। শুধু তাই নয়, ষড়যন্ত্রের মধ্যে নবাবের আকস্মিক আবির্ভাব-ঘোষণার পরেই ওয়াটস্ সাহেব ইংরেজদের নাচবার জন্য আহ্বানমাত্রই দু পাশের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসত একদল অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে-পুরুষ, তারা বল-নাচ নাচত।

নাট্যালয় এবং নাটকাভিনয়ের প্রতি প্রবোধবাবুর অনুরাগ অকৃত্রিম। তাতে খাদ ছিল না। পয়সা করাটাই মূল উদ্দেশ্য ছিল না তাঁর। প্রবোধবাবুর সঙ্গে এ ক্ষেত্রে আর একজনের নাম না করলে, অসত্য না হোক, সত্য গোপনের দায়ে দায়ী হতে হবে। তিনি প্রতিভা-শালিনী অভিনেত্রী শ্রীমতী নীহারবালা। তিনি প্রবোধবাবুর সকল প্রচেষ্টায় সহকারিণী ছিলেন। প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন, নিজের অর্থ-সঞ্চয়ও ব্যয় করেছেন। মেয়েদের নাচ শেখাতে, গান শেখাতে, অভিনয় শেখাতে বিপুল পরিশ্রম করতেন তিনি। তাঁর প্রসঙ্গে এক-দিনের কথা মনে পড়ছে।

নাট্যনিকেতন উঠে যাবার পর ১৯৪২ সনের ডিসেম্বরে বোমা পড়ল

কলকাতায়—২০শে ডিসেম্বর। ২৪শে ডিসেম্বর আমি মেয়েছেলেদের নিয়ে লাভপুর যাচ্ছি। সে সময়ের ভিড়, হাঙ্গামার বর্ণনা থাক্। সে বর্ণনা বাংলা-সাহিত্যে অনেক স্থলেই আছে। তারই মধ্যে হাওড়া প্ল্যাটফর্মে দেখা হয়েছিল শ্রীমতী নীহারবালার সঙ্গে। এর আগে শুনেছিলাম, তিনি কঠিন অসুখে মরণাপন্ন হয়েছিলেন। সেদিন দেখলাম এক কালের লাস্যময়ী নৃত্যগীতপটিয়সী নীহারবালা, শীর্ণ ক্লান্ত মুখ, আধপাকা চুল, ব'সে আছেন, যাবেন নবদ্বীপ, সঙ্গে সামান্য জিনিসপত্র। আমাকে দেখে এসে প্রণাম করলেন। আমরা একই গাড়িতে গেলাম। তিনি নামলেন নবদ্বীপে, আমাদের কাটোয়ায় নেমে ছোট লাইনে যাওয়ার কথা। আমার সঙ্গে আমার বড় মেয়ে গঙ্গা, ট্রেনে ভিড়ের চাপে রৌদ্রে দু-তিনবার মূর্ছা গেল। সারাটা পথ নীহারবালা যে কি যত্ন তাকে করেছিলেন, সে কথা মনে হ'লে তাঁকে নমস্কার জানাই। কথায় কথায় হেসে বলেছিলেন, জীবনে অনেক আলো জ্বলেছিল, সে এক রোশনাইয়ের নূরমহল। হঠাৎ সব নিবে গেল। দেখলাম, খোলামাঠে অন্ধকার রাত্রে একলা প'ড়ে আছি। এই প্রথম চোখে পড়ল আকাশের তারা। কোনদিন আকাশপানে তাকিয়ে দেখি নি। তাকিয়ে দেখে মনে হচ্ছে, ছোট নূরমহল থেকে বড় নূরমহলের পথে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন ভগবান। তাই নালিশ কারুর বিরুদ্ধে নেই, কিছুর বিরুদ্ধে নেই।

তাঁর কথা শুনে মনটা ভ'রে উঠেছিল। আজ নীহারবালা শুনেছি পণ্ডিচেরী আশ্রমে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। কিছুদিন পূর্বে শ্রদ্ধেয় নট অহীন্দ্র চৌধুরী মশায়ের মুখে শুনেছিলাম—তিনি কথাটা বলেছিলেন, এককালের বহু খ্যাতির অধিকারিণী অভিনেত্রী শ্রীমতী কুসুমকুমারীকে বলেছিলেন—নীহারবালার কথাটা ভাবুন না, সে তো দিব্যি সব ছেড়ে চ'লে গেল পণ্ডিচেরীতে। শুনলাম ব'লে গেছে—সেখানে বাসন মাজব, উঠোন ঝাঁট দেব, দু বেলা দু মুঠো খাব আর ভগবানের নাম করব।

কথাটা শুনে চট্ ক'রে আমার মনে প'ড়ে গিয়েছিল, নবদ্বীপের ট্রেনের ওই কথাগুলি। নীহারবালা হয়তো একটা বড় পাওনা পেয়েছেন বা পাবেন ব'লেই মনে হয় আমার।

আর প্রবোধবাবু! তিনিও বিচিত্র মানুষ।

আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার মাস ছয়েক পরেই তাঁর ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটল। একই বিপর্যয়ে তিনি এবং নীহারবালা দুজনেরই নাট্যালয়ের সঙ্গে জীবনের সংস্রব ছিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু প্রবোধবাবু দমলেন না। তাঁর মেজ ছেলেকে নিয়ে অন্য ব্যবসা শুরু করলেন। ছেঁড়া কাগজের ব্যবসা। গ্রে স্ট্রীটে তাঁর মেজ ছেলের সঙ্গে কয়েকবারই আমার দেখা হয়েছে। প্রবোধবাবুর সঙ্গেও হয়েছে। প্রবোধবাবুর মুখের হাসি ফুরোয় নি। সে ঠিক আছে। দেখা হ'লেই বলেছেন, থিয়েটার আমি আবার করব। ভাল নাটক আমাকে দেবেন কিন্তু।

বাংলা ভাগ হবার পর প্রবোধবাবু পাকিস্তানে চ'লে গেছেন। ঢাকাতে কোন ব্যবসা করেন। এর মধ্যেও বার তিনেক আমার সঙ্গে পথে হঠাৎ দেখা হয়েছে। সেই হাসি, সেই কথা, সেই প্রবোধব এর মধ্যে একবার হঠাৎ বিষন্ন হয়ে গেলেন। হঠাৎ বললেন, আর বোধ হয় হ'ল না তারাশঙ্করবাবু।

প্রশ্ন করলাম, কি?

হেসে বললেন, থিয়েটার। ওটা আমার পাগলামি বলুন, নেশা বলুন, যা বলুন—ওটা নইলে জমে না আমার দিনরাত্রি। জীবনটাই মনে হয় ফাঁকা মাঠ।

আর একদিনের কথা মনে আছে।

রবীন্দ্র-তিরোভাব দিবসের কথা। শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে রঙমহলের সামনে এসে তৃষ্ণা পেয়েছিল, গেলাম নাট্যনিকেতনে প্রবোধবাবুর কাছে। দেখলাম, প্রবোধবাবু ব'সে আছেন মালা ও ফুল নিয়ে। চোখের কোণ থেকে জলের দুটি ধারা। অবাক হয়েছিলাম। প্রবোধবাবুকে কাঁদাতে পারে, এমন আঘাত আমি কল্পনাও করতে পারি না।

*　　*　　*

আরও বহু জনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তাঁদের কথা যথাসময়ে যথাস্থানে বলব।

প্রথম আলাপ হ'ল নরেশ মিত্র মশায়ের সঙ্গে। মিত্র মশায় তখন অভিনয়-বিভাগের অধ্যক্ষ। দিন দুই-তিন পর বোধ হয়। নাটকখানি প'ড়ে উৎসাহিত হয়েছেন, আমাকেও উৎসাহিত করলেন। আমার বাড়ি লাভপুর শুনে বললেন, আরে মশাই, আমাদের নির্মলশিববাবুর বাড়ি। সেখানে তো আমি গিয়েছি।

আমি চুপ ক'রেই রইলাম। বললাম না—খুব মনে আছে, আমাদের সঙ্গে আপনি অভিনয় ক'রে এসেছেন; সে অভিনয়ে আমিও অংশ নিয়েছিলাম।

সেবার 'কর্ণার্জুন' হচ্ছিল; নরেশবাবু এবং স্বর্গীয় তিনকড়ি চক্রবর্তী হঠাৎ গিয়ে পড়লেন। সে অভিনয় আমাদের জুনিয়র ব্যাচের অভিনয়। আমাদের দলের মধ্যে আমিই অভিনয়ের অভিজ্ঞতায় সব চেয়ে প্রবীণ। বয়সে বছর কয়েকের বড় একজন ছিলেন, কিন্তু অভিনয়ের ব্যাপারে আমার থেকে তাঁকে অসঙ্কোচেই নবীন বলছি। মিত্র মশায় এবং চক্রবর্তী মশায় গিয়ে হঠাৎ নেমে পড়লেন দুটি ছোট ভূমিকায়। আমি তখন নিতান্তই অখ্যাত পল্লীযুবক। ৺নির্মলশিববাবুর সঙ্গে আত্মীয়তাই তখন ওঁদের শ্রেণীর লোকের সঙ্গে পরিচয়ের একমাত্র সূত্র। আমি সে সূত্র ব্যবহার করি নি। লাভপুরে আমাদের পাকা স্টেজ; অনেক সমারোহ ছিল সে স্টেজে, সে আমলে ইলেকট্রিক আলোও ছিল। আমি 'কর্ণার্জুনে' শকুনির ভূমিকায় অভিনয় করছিলাম, সেজে দাঁড়িয়ে আছি, আমার শ্যালক নির্মলশিববাবুর ভাগ্নে এবং তার সঙ্গে নির্মলশিববাবুর ছেলে আমায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল মিত্র ও চক্রবর্তী মশায় দুজনের সামনে। মিত্র মশায় বলেছিলেন, হুঁ, চেহারা মেকআপে তো আমার মত অনেকটা ঢঙ এনেছেন। অভিনয় কেমন করেন দেখি!

সেদিন নাট্যনিকেতনে সে কথা নরেশবাবুকে বলি নি। এমনি আলাপ হ'ল। রবি রায়, ৺ভূমেন রায়, ৺শৈলেন চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। বই সম্পর্কে সকলেই উৎসাহ প্রকাশ করলেন, কিন্তু অভিনয় সম্পর্কে উৎসাহিত কেউ হলেন না। কারণ নাট্যনিকেতনের আভ্যন্তরীণ আর্থিক অবস্থা তখন খুব অস্বচ্ছল। খারাপ বলাই বোধ করি ঠিক

হবে। সে কথা কয়েক দিন যেতেই কানে এল। দু-একজন বললেন, এমন ভাল বইখানি নষ্ট হবে।

ক্রমে জানতে পারলাম, শ্রীছবি বিশ্বাস, শ্রীসতু সেন—এঁরা চ'লে গেছেন নাট্যনিকেতন থেকে। ছবিবাবু অবশ্য তখনও এই খ্যাতি অর্জন করেন নি, কিন্তু সতু সেনের নাম-খ্যাতি তখন অনেক। শ্রীযুক্ত সেন যে বইয়ের অভিনয়ের মূলে থাকেন, সে বই দৃশ্যপটে আলোকসম্পাতে আশ্চর্য সাফল্য-মহিমা অর্জন করে।

খুব দ'মে গেলাম। একদিন বিখ্যাত লেখক শ্রীরমেশ সেন মশায়কে সঙ্গে নিয়ে শ্রীযুক্ত সতু সেনের সঙ্গে দেখা করলাম। সতু সেন বরানগরে আমার প্রতিবেশী ছিলেন। কিন্তু আমেরিকা-ফেরত সতু সেন একে খ্যাতিমান, তার উপর রঙ্গালয়ের লোক, তাই একা তাঁর ওখানে যেতে ভরসা পেলাম না। শ্রীরমেশ সেন শ্রীসতু সেনের মাতুল। সেই সুবাদ ধ'রে গেলাম। পাকা শালকাঠের সারের মত শক্ত অথচ শীর্ণ-দেহ সতু সেনকে দেখে মনে হ'ত, অত্যন্ত খিট্‌খিটে মেজাজের লোক। আমি নিজেও তাই। কি জানি, কি কথায় কি হয়—সেই আশঙ্কায় রমেশবাবুকে নিয়ে গেলাম। উদ্দেশ্য, কি উপায়ে বইখানি বের ক'রে আনা যায় তার একটা সদ্‌যুক্তি যদি সতু সেন দিতে পারেন! তাঁর বাড়ির দরজায় রাস্তার উপর তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল। আমরা বাড়ি ঢুকব, সতু সেন একখানা মোটরে এসে নামলেন। ওই ফটকের সামনে দাঁড়িয়েই কথা হয়ে গেল। তিন মিনিটের ব্যাপার। রমেশবাবু আড়াই মিনিট ধ'রে ব্যাপারটার আধখানা বলতেই সতু সেন মাঝখান থেকে কথা কেটে বললেন, আমি জানি। কিন্তু ওর তো উপায় নেই। প্রবোধ গুহের কাছ থেকে বই কেউ বের করতে পারবে না, এবং প্রবোধ গুহের এ অবস্থায় বই যতই ভাল হোক মার খাবেই। ও ডুম্‌ড্।—ব'লেই হন হন ক'রে বাড়ি ঢুকে গেলেন এবং মিনিটখানেক পর বেরিয়ে এসে সেই গাড়িতেই চ'লে গেলেন।

আমি সিঁথির মোড়ে রমেশবাবুকে বাসে চড়িয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। ওদিকে নাট্যভারতীতে অহীন্দ্রবাবুর পরিচালনায় মনোজ বসুর

নাটক হবে স্থির হয়ে গেল। পোস্টার পড়ল। আমি প্রবোধবাবুর ভাঙা হাটে যাই আসি। প্রবোধবাবু সান্ত্বনা দেন, ব'সে ব'সে শুনি। প্রবোধবাবুর মঞ্চে অভিনয় পর্যন্ত তখন বন্ধ। অভিনেতারা দু-চার জন বেড়াতে আসেন। তাঁরাও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চ'লে যান। এর পরই রঙমহলে ৺দুর্গাদাসের পরিচালনায় বিধায়ক ভট্টাচার্যের একখানি নাটকের পোস্টার প'ড়ে গেল। প্রবোধবাবু কলকাতা চ'ষে বেড়ান—বোধ করি বই খুলবার প্রাথমিক খরচ সংগ্রহের জন্য।

একদিন হঠাৎ সকালে কাগজে দেখলাম, নাট্যনিকেতনে 'কালিন্দী' মঞ্চস্থ হবে ব'লে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। উৎসাহিত হয়ে সকাল-বেলায়ই নাট্যনিকেতনে এলাম। প্রবোধবাবু হেসে বললেন, পোস্টার প'ড়ে যাবে কাল-পরশুর মধ্যে।

অনেক কষ্টে দৈন্যের মধ্যেই 'কালিন্দী' মঞ্চস্থ হয়েছিল। দৃশ্যপটের মালিন্য, চরিত্রোপযোগী অভিনেতার অভাব অত্যন্ত কটু হয়ে চোখে পড়ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ অহীন্দ্রের চরিত্রে ৺ভূমেন রায়ের অবতরণ। ভূমেন রায় প্রতিভাশালী অভিনেতা ছিলেন, কিন্তু সে সময় তাঁর বয়স চল্লিশের উপরে। তার ওপর তাঁর মুখে এমন রেখা পড়েছে, শরীর এমন হয়েছে যে, দেখে মনে হ'ত বয়স বোধ হয় ষাটের কোঠায়। অহীন্দ্র ১৮।১৯ বছরের ছেলে, দীপ্তিমান, বর্ণনায় আছে—যেন খাপ-খোলা তলোয়ার। এমন অশোভন ভূমিকা-নির্বাচন আরও হয়েছিল। এতে অভিনেতাদের দায়ী করব না। ভূমেন রায় অহীন্দ্রের ভূমিকা কিছুতেই নিতে চান নি, সে আমার মনে আছে। ঠিক এমনটি না হ'লেও এই ধরনের ব্যাপার ঘটেছিল নায়ক রামেশ্বরের ভূমিকা নিয়ে। ৺শৈলেন চৌধুরী নিজের শক্তি বিবেচনা ক'রে এ ভূমিকা নিতে চান নি। বিশেষ ক'রে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধার কারণ হয়েছিল। তবুও 'কালিন্দী' দর্শকসমাজে গৃহীত হ'ল—সমাদৃত হ'লই বলব। আজও 'কালিন্দী' অভিনয় হয়।

'কালিন্দী'র অভিনয়ে সুন্দর অভিনয় করেছিলেন নরেশবাবু অচিন্ত্য-বাবুর ভূমিকায়। আর নীহারবালা করেছিলেন সুনীতির ভূমিকায়

চমৎকার অভিনয়। সারীর ভূমিকায় রাধারাণীর গানগুলি হয়েছিল শোনবার মত। অভিনয়ও ভাল করেছিলেন।

প্রবোধবাবু উৎসাহিত হয়ে আমাকে বললেন, তাড়াতাড়ি আবার একখানা নাটক চাই মশায়। 'ধাত্রী দেবতা' নাটক ক'রে ফেলুন।

আমি তখন আরম্ভ করেছি—'ধাত্রী দেবতা' নয়, 'দুই পুরুষ'।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

চিরায়ু বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

'তোমাদের মনের কথার যেমন অন্ত নাই আমার কল্লোলকাহিনীরও সেইরূপ কোথাও ছেদ নাই। সেইজন্য কলসী কক্ষে ঘাটের ভাঙা ধাপগুলি দিয়া পদে পদে তোমাদিগকে যখন নামিয়া আসিতে দেখি উৎসাহে ও আনন্দে আমার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে—মনে হয় এই কয়টি ধাপ নামা হইয়া গেলে একেবারে সর্বাঙ্গে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া এক নিশ্বাসে ছলছল-কলকলে সমস্ত কথাগুলি যদি বলিয়া ফেলিতে পারি! কিন্তু মনের কথা আর বলা হয় না। কাঁখ হইতে কলসীটি নামাইয়া তোমরা যেই আমার জলে পদার্পণ কর, তোমাদের কোমল পদপল্লবতলে আমার সমস্ত মনের কথা যেন আবর্তিত হইয়া উঠে। তখন ছলছল কলকল করিয়া একটি কথাও আর খুঁজিয়া পাই না—উৎসাহভরে গণ্ড বাহিয়া কর্ণমূল পর্যন্ত ছলাৎ ছলন্ করিয়া উঠি, কিন্তু কী বলিতে আসিয়াছিলাম ভুলিয়া গিয়া লজ্জায় তোমাদের চঞ্চল বাহুমূলে, সিক্ত বস্ত্রাঞ্চলে, তপ্ত বক্ষতলে কোথায় যে মিশিয়া যাইব ভাবিয়া পাই না।··· আমার এই চির-আবহমান কলস্রোতে সকলই যেন ভাসিয়া যায়। একবার যদি তোমাদের মত, হে বন্ধুরগাত্রী সুন্দরীগণ, দুই দণ্ড স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারি! একবার যদি অমনি করিয়া একখানি···বসন-বেষ্টনের মধ্যে এই চঞ্চল কলপ্রবাহকে মুহূর্তের জন্য সম্বৃত করিয়া তুলিতে পারি!'*

---

* "কলবেদনা", পৃ. ৫৫৪-৫৫। বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস কর্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। মূল্য সাড়ে বারো টাকা।

কল্লোলিত, উচ্ছলিত, প্রবাহিত ভাব-ভাষা-ভঙ্গীর নমুনা হিসাবেই যে বলেন্দ্রনাথের উৎকলিত লেখাটুকু পড়িয়া দেখিতে বলি তা নয়। প্রতিভার প্রথম আবেগ ও উচ্ছলতা হইতে, প্রায় লক্ষহীন ও বিষয়হীন অন্ধ আবর্তন হইতে, ক্রমশঃ রূপ ও রসের ঠিকানা খুঁজিয়া পাওয়া, নির্দিষ্ট বিষয় ও বক্তব্য ধরিয়া বাড়িয়া উঠা, অনিবার্য দ্রুতগতিতে একটি লক্ষ্যে পৌঁছানো, একটি নিবিড় তন্ময়তার শক্তিতে যেন এক দৃষ্টিগ্রাহ্য, স্পর্শগ্রাহ্য মূর্তি বা বিগ্রহ হইয়া উঠা—সেই পরমপ্রয়োজনীয় তত্ত্বের ইঙ্গিত যে-কোনো প্রতিভাবানের জীবনেতিহাসের গোড়ার কয়েকটি অধ্যায়ে যেমন, তেমনি এই লেখাটিতেও আছে। এই 'কলবেদনা' বস্তুত কোনো জড় জলস্রোতের নয়; কবি বা ভাবুকের জীবনস্রোতে, বলেন্দ্রনাথ বা সতীশচন্দ্রের সুদূর-সিন্ধু-অভিসারী যাত্রামুখে তরল অব্যক্তগদ্‌গদ ভাষায় মর্মরিত মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা-সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি বলিতে হইবে, অন্ধ আবেগ ও আকুলতা যে মহেন্দ্রক্ষণে লক্ষ্য খুঁজিয়া পাইয়াছে, বিষয় ও বক্তব্যের জন্য হাৎড়াইবার প্রয়োজন ঘুচিয়া গিয়াছে, প্রাক্‌সৃষ্টির নিরাকার হইতে ক্রমশঃই একটির পর একটি আকার রসলোকে সৌন্দর্যলোকে জাগিয়া উঠিতেছে, সেই আনন্দে আগ্রহে জাগরূক, প্রত্যাশায় উৎসুক, শুভ মুহূর্তেই আমরা বলেন্দ্রনাথকে হারাইয়াছি, সতীশচন্দ্র রায়কেও হারাইয়াছি। আমাদের ক্ষতির খাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা এই দুইটি নামের অক্ষরপংক্তির উপরে মানসসরোজবাসিনী জ্যোতির্হাসিনী সরস্বতীর দুইটি ফোঁটা দিব্যাশ্রু সিঞ্চিত হইয়াছে। ইঁহাদের প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া গেল না সত্য, তবু অল্প কতকগুলি রচনার প্রসাদে, নিশ্চিত বৈশিষ্ট্যে, অবশ্যম্ভাবী (ভবিতব্যতা যদি বিমুখিনী না হইতেন) সম্ভাবনার মহত্ত্বে অল্পায়ু হইয়াও বঙ্গসাহিত্যে ইঁহারা একরূপ চিরায়ু হইয়াই রহিলেন। সতীশচন্দ্র মারা যান বাইশ বৎসর বয়সে, বলেন্দ্রনাথের আয়ু উনত্রিংশ-বৎসর-পরিমিত। দেশে অক্ষরজ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতি যদি ক্রমশঃই ব্যাপ্ত হইতে থাকে—হাজার বা লক্ষের ভিতরে নয়, কোটি কোটি নরনারীর মধ্যে—ঐতিহ্যের আদর লুপ্ত না হয়, রসবোধ ও রূপদৃষ্টি প্রবল ও প্রখর হইবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে সারস্বত-তীর্থের তরুণ ঐ যাত্রী দুইটিকে

দেশ কোনো কালেই ভুলিবে না; তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির বিশেষ সমাদর থাকিবে এবং সাহিত্য-পরিষদের বর্তমান উদ্যম, তেমনি বিশ্ব-ভারতী-গ্রন্থনবিভাগ সতীশচন্দ্রের রচনা পুনঃপ্রকাশের ইচ্ছা যদি করিয়া থাকেন সেই সাধুসংকল্প অবশ্যই প্রশংসিত হইবে।

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায়ের প্রসঙ্গ যখন টানিয়াই আনিয়াছি, সেটি একরূপ চুকাইয়া দিয়া অতঃপর বলেন্দ্র-প্রতিভার অনুগামী হইলেই আলোচনার ধারা অবাধ হইবে। বলেন্দ্রনাথের গদ্য-রচনাতেও সর্বদাই কবিজনসুলভ ভাব ভাষা ভঙ্গীর সুন্দর সংমিশ্রণ আছে; গম্ভীর মধুর ছন্দে আর রূপরসালস নবযৌবনের রাগে ও রেখায় মনোজ্ঞ কবিতাও তিনি অনেকগুলি লিখিয়াছেন; তবু স্বভাবতঃই তিনি কবি নহেন। অপর পক্ষে সতীশচন্দ্রের বাইশ বৎসরের জীবনে চিন্তাশীলতার, বিশ্লেষণ-ক্ষমতার, বহুবিষয় ও বহির্বিষয়-গ্রাহিতার, তথা বিচিত্র অধ্যয়নের ও অনুশীলনের কিছুমাত্র অপ্রাচুর্য না থাকিলেও আসলেই তিনি কবি, বিশেষ শক্তিশালী কবি এবং অত্যন্ত 'বিশিষ্ট প্রতিভার অধিকারী'। তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে শেষ কথা কয়টা লিখিতে বাধ্য হইলাম যে, ইহা যার-পর-নাই বিস্ময়ের বিষয় বলিতে হইবে। রবীন্দ্রদীপ্তি তখন প্রায় মধ্যাহ্নগগনে, বাঙালীর নিখিল মানস-ভুবন তাহাতে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। এই অলৌকিক রবিকরে দাহ নাই, শুষ্কতা নাই গ্লানি; বরং তাহার বিপরীতই; তবু ইহারই অতি নিকট আশ্রয়ে, ইহাতেই একরূপ ঘর বাঁধিয়া, অন্য বিশিষ্ট প্রতিভার নেত্র-উন্মীলন ও দ্রুত বিকাশ, সতীশচন্দ্রের মুষ্টিমেয়—স্বর্ণমুষ্টিবৎ—প্রবন্ধ ও কবিতা কয়টি ছাপার অক্ষরে না পাওয়া গেলে স্বপ্নেও কল্পনা করা যাইত না।

সতীশচন্দ্রের জীবন, তাঁহার পরমাশ্চর্য ও বলিষ্ঠ বিশিষ্টতা, তাঁহার রচনা ও চরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় অনুরাগ ও প্রচুর আশিস—উপস্থিত প্রসঙ্গে এগুলির উল্লেখ না করিয়া পারা গেল না। বিশেষ আলোচনা, নিপুণ বিশ্লেষণ ও সামগ্রিক আলেখ্য-লিখন কোনো উপলক্ষ্যে কেহ করিয়া থাকিবেন বা ভবিষ্যতে করিবেন আশা করা যায়।

সাহিত্যিক বলেন্দ্রনাথ স্বভাবতঃ কবি না হইলেও, কবিভাবাপন্ন বা কাব্যভাবুক ইহাতে আর সন্দেহ নাই। সে যে কেবল তৎকালীন

ঠাকুর-বাড়ির রসরুচিসমৃদ্ধ, প্রাণোচ্ছল, গানোচ্ছল বিশেষ আবহাওয়ার জন্য বা কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের নিত্যসাহচর্যহেতু তাহা নয়। আপন প্রতিভা-বিকাশের কোনো একটি পর্যায়ের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—'তখন আমার বয়স আঠারো। বাল্যও নয়, যৌবনও নয়। বয়সটা এমন একটা সন্ধিস্থলে যেখান থেকে সত্যের আলোক স্পষ্ট পাবার সুবিধা নেই। একটু একটু আভাস পাওয়া যায় এবং খানিকটা খানিকটা ছায়া।...মজা এই, তখন আমারই বয়স আঠারো ছিল তা নয়—আমার আশেপাশের সকলের বয়স যেন আঠারো ছিল। আমরা সকলে মিলেই একটা বস্তুহীন ভিত্তিহীন কল্পনালোকে বাস করতেম। সেই কল্পনালোকের খুব তীব্র সুখদুঃখও স্বপ্নের সুখদুঃখের মতো।' অথবা ঐ একই প্রসঙ্গে কবি যেমন বলিয়াছেন, 'অপরিণত মনের প্রদোষালোকে আবেগগুলা...পরিমাণবহির্ভূত অদ্ভুত মূর্তি ধারণ করিয়া একটা নামহীন পথহীন অন্তহীন অরণ্যের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহারা আপনাকেও জানে না, বাহিরে আপনার লক্ষ্যকেও জানে না।... পদে পদে আর-একটা কিছুকে নকল করিতে থাকে।...সত্যের অভাবকে অসংযমের দ্বারা পূরণ করিতে চেষ্টা করে।...তখন আতিশয্যের দ্বারাই সে আপনাকে ঘোষণা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।' মধুসূদন ও বঙ্কিমের ন্যায় কৃতকাম স্রষ্টার সৃষ্টিকার্য বাংলা-সাহিত্যে দানা বাঁধিয়া উঠিবার পরেও, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'মানসী' 'সোনার তরী' 'চিত্রা' পার হইয়া আবেগস্তম্ভিত রসগাঢ় দৃঢ়পিনদ্ধ প্রৌঢ় 'কল্পনা'র কূলে আসিয়া পৌঁছিলেও, দেশব্যাপী এই নিরাকার নিরাধার ভাবাবেগের কালটা বাষ্পগদ্‌গদভাষী 'আঠারো' বছর বয়সটি, তখনও অনিঃশেষ ছিল। বলেন্দ্রনাথের প্রথম দিকের রচনায় তাহার প্রচুর সাক্ষ্য দেখা যায়। তখন একে রচয়িতার বয়স অল্প, তাহাতে দেশের অধিকাংশ লোকই অল্পবয়সী, কাজেই লক্ষ স্থির হয় নাই, ভাষা নিজস্ব ভঙ্গী পায় নাই, ভাব নির্দিষ্ট আকার পায় নাই, বিষয় ও বক্তব্য লেখকের অন্তর্দৃষ্টিতে অভ্রান্ত স্পষ্টতায় ফুটিয়া উঠে নাই। প্রতিভার এই অপরিণতির কাল লইয়া আলোচনা না করিলেও চলিত। দৃষ্টান্ত দিয়া বিশদ ব্যাখ্যার কোনো

প্রয়োজনই নাই। প্রতিভা-বিকাশের একটি প্রায় সার্বজনীন আদিস্তর হিসাবেই ইহার যা উল্লেখযোগ্যতা। নহিলে প্রতিভারও বহু প্রকারভেদ আছে এবং বলেন্দ্র-প্রতিভার যে বিশেষ প্রকৃতি তাহাতে নিরাকার নিরাধার ভাবুকতার এরূপ দীর্ঘস্থায়িত্ব অবশ্যম্ভাবী ছিল না। কৃতিত্বের ইতরবিশেষ যতই থাকুক, অর্থাৎ statureএ অনেক তফাৎ যদিবা থাকে, বলেন্দ্রনাথ কতকটা কীট্‌সেরই সজাতি। পারিপার্শ্বিক প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে না উঠিতেই দেখা গেল, রূপরস শব্দগন্ধ স্পর্শের সন্ধানে ও আস্বাদনে তাঁহার তৎপর ইন্দ্রিয়চারী মন বুদ্ধি হৃদয় কত সজাগ, সচতুর। কী মধুরগম্ভীর পদবিন্যাসের সঙ্গীতে, কী আলেখ্যপ্রতিদ্বন্দ্বী বর্ণ ও রেখার লিখনে, রূপরসের কী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে আহরণে ও ভুঞ্জনে, ভোগবিহ্বল শিথিলস্নায়ু মোহাবেশে নয়, মূর্ছায় নয়, বলেন্দ্রনাথের প্রতিভার বিশিষ্টতা ফুটিয়া উঠিল। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার সমালোচনায় সত্যই বলিয়াছেন, এ প্রতিভা ইন্দ্রিয়সুখবিহ্বল না হইলেও ইন্দ্রিয়-সুখচারী, সৌন্দর্যসন্ন্যাসী, কীট্‌সের মত, কতকটা রবীন্দ্রনাথেরও মতই যাহার অমৃতময়ী বাণীতে এ যুগে আর এ দেশে প্রথম শুনিলাম—

> মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
> মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

অথবা—

> বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
> অসংখ্যবন্ধনমাঝে মহানন্দময়
> লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
> মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
> তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
> নানা বর্ণগন্ধময়।

কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আপন অল্পায়ু জীবনে বলেন্দ্রনাথও বলিতে পারিয়াছিলেন কিনা জানি না—

> যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
> তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

এইটুকু জানি, তাঁহার প্রতিভার পরিণতি সেই দিকে লক্ষ্য করিয়াই চলিয়াছিল।

কীট্সের প্রতিভায় বস্তুনিষ্ঠা আর রসরূপের সহজ স্বতঃসিদ্ধ বোধ কাহারও অগোচর নয়। তাঁহাকেও কিন্তু এণ্ডিমিয়নের হৃদয়-অরণ্যে ঘুরিতে হইয়াছিল। সেই অরণ্যের মায়াজাল ছেদন করিয়া একবার বাহির হইয়া আসিবার পর তিনি নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন: **Beauty is truth, truth beauty,** এবং তাঁহার অচিরজীবনের সাধনা একলক্ষে ঋজুগতিতেই চলিয়াছিল সাতমহলা কোন্ সৌন্দর্য-পুরীতে দেউড়ির পর দেউড়ি অবলীলায় পার হইয়া। আসলে ওই সৌন্দর্য বিমূর্ত তত্ত্ব হইলেও আমাদের মর্ত্যপ্রতীতিতে সর্বদাই কোনো না কোনো মূর্তির সহিত মিলিত হইয়াই দেখা দেয়। হইত যদি শেলির **Intellectual Beauty,** এ কথা খাটিত না ঠিকই। ফলতঃ বিমূর্ত আইডিয়ার ভুবনে সৌন্দর্যের তরঙ্গে সুরের হিল্লোলে অকূল হইতে কূলে ভাসিয়া আসা আর মুগ্ধ রসিকচিত্ত লুঠ করিয়া লইয়া ফিরিয়া যাওয়া শেলির পক্ষে যেমন স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব ছিল, সংস্কার ছিল, তেমন আর কাহারও ক্ষেত্রেই দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া লই আমাদের অন্তর্লোকের ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় ক্ষণে ক্ষণে কীট্সের বা শেলির পরস্পর-অসদৃশ প্রতিভার চকিত আভাস দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। এক দিকে পাথর কুঁদিয়া মূর্তি নির্মাণ (অমূর্তেরই —

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।

আর-এক দিকে মানসসুন্দরীর আহ্বান, জীবনদেবতার অভিমুখে জন্ম-জন্মান্তরীণ অভিসার—

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরি!

তেমন তীব্র, তেমন অনন্তযন্ত্রণাবিদ্ধ আনন্দে হৃদয়রক্তস্রাবী না

হইলেও, তবু তো শেলির এপিপসাইকিডিয়ন আর ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল বিউটির উপাসনা মনে আনিয়া দেয়! ওড্‌ টু ওয়েস্ট্‌ উইণ্ড-এর সহিত 'ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চ'লে আসে' মিলাইয়া পড়িলেও উভয় প্রতিভার মিল আর অমিল স্পষ্টই বুঝা যাইবে। দীর্ঘ জীবনের অতন্দ্র সৃষ্টিসাধনায়, ঐশ্বর্যের পর ঐশ্বর্য দুই হাতে কুড়াইয়া এবং ছড়াইয়া, এইভাবে চলিতে চলিতে অবশেষে একই রবীন্দ্রপ্রতিভায় শাশ্বত কবি-প্রতিভার দুই কোটির দ্বিবিধ সিদ্ধি একত্র মেলেও নাই কি-–'বলাকা'য় অথবা 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা'য়? উপস্থিত এই প্রশ্নের ছলেই আমাদের বক্তব্যের ইঙ্গিত রাখিয়া দেওয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে বলিতে গেলে অন্য সব কথাই চাপা পড়িয়া যাইবে। অতএব প্রস্তুত বিষয়েই প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

বলেন্দ্রনাথের পরিণতিশীল প্রতিভার বাল্য ও কৈশোর -লীলা, শিক্ষা-নবিশির নমুনা, ছাড়িয়া দিলে অন্য লেখাগুলি কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। এক বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ -পটু সমালোচনা—উত্তরচরিত, মেঘদূত, মৃচ্ছকটিক, রত্নাবলী, জয়দেব, কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা ইত্যাদি। দেখা যায়, সংগত কারণেই সংস্কৃত কাব্যকৃতির চিরন্তন রূপলোক রসলোক এই আত্মআবিষ্কার-প্রবৃত্ত তরুণবয়সী ভাবুককে বারংবার হাতছানি দিয়া ডাকিয়াছে। প্রাচীন রূপরসরুচির সহিত বলেন্দ্রনাথের রুচির বড়ই যে মিল আছে। সেই কীট্‌সের কাব্যলোকই এই ভিন্ন দেশের ভিন্ন বেশবাসে। সেই পুষ্পগন্ধঘন অরণ্যপথ, সেই অলৌকিকসুরাস্রাবী ইন্দ্রিয়মোহকর পাপিয়ার গীতোচ্ছ্বাস, সেই দিনের রৌদ্রছায়ায় আর রাতের কৌমুদীমায়ায় স্বর্গকারিগরের আপন হাতের শল্মাচুম্‌কির বিচিত্র কারুকাজ, আর উৎফুল্ল-মাধবী-আশ্লিষ্ট ফুল্লসহকারের আড়ালে এই যে বীণারব হইতেও সুমধুর আকস্মিক স্বরলহরী: ইদো-ইদো সহীও! তপোবনোত্তীর্ণ তরুণ দুষ্মন্তের মতই তরুণ বলেন্দ্রনাথ ইহারই মনোহারী রূপে রসে ও সুরে সর্বদেহমনে পুলকিত না হন যদি, আর কে হইবে? অবশ্য, অলোকসামান্য কল্পনাবলে কালিদাস ভবভূতি বাণভট্টের কালকে, কল্পনাকে, হরপার্বতী দুষ্মন্ত শকুন্তলা ঊর্মিলা বা পত্রলেখার সুপরিস্ফুট

মূর্তিকে যে প্রত্যক্ষতা রবীন্দ্রনাথ দিতে পারিয়াছেন, আর যে ভাবে পুরাতন কাব্যসৃষ্টিকে উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথের এই রচনাচয় নূতন ও অবিস্মরণীয় সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে, তাহা নানা কারণেই বলেন্দ্রনাথের কাছে আশা করা যায় না। তবু প্রশংসনীয় তাঁহার উল্লিখিত আলোচনা বা সমালোচনাগুলি; প্রগাঢ় রূপরসবোধের পরিচয়বাহী আর রসিক-চিত্তাকর্ষী যে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নাই। কিন্তু, কেবল সংস্কৃত কাব্যেই যে এই লেখকের অভিনিবেশ একান্তভাবে নিবদ্ধ ছিল তাহাও নয়। কাশীদাস, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ইঁহাদের সার্থক রচনার অন্তর্লোকেও আমরা বলেন্দ্রনাথের অনুসরণেই প্রবেশ করিবার সুযোগ পাই। বৈষ্ণব কবিদিগের আলোচনাতেও সুপ্রচুর দরদ ও রসবোধের পরিচয় আছে। অধ্যাত্মসংস্কারে আর ধর্মাচরণ-রীতিতে প্রচলিত হিন্দু সংস্কার আর হিন্দু সমাজরীতির প্রতিবাসী হইয়াও, স্ববাসে কতকটা পরবাসী হইয়াও, বৈষ্ণব কবিদের হৃদয়বিহারী কৃষ্ণ রাধা নন্দ যশোদার ভাব ও চরিত্র বুঝিবার, বর্ণনা করিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন বলেন্দ্রনাথ, ঐ দরদের গুণেই তাহা একেবারেই বিফল হয় নাই, বন্ধ্যা হয় নাই। অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে অন্যরূপ কথা বলিবার আছে সন্দেহ নাই; 'ভারতী'তে প্রকাশ-কালে সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী বা অন্য লেখক তাহা বলিয়াছেনও—কৌতূহলী পাঠক দেখিয়া লইবেন।

প্রাচীন সাহিত্যের রসাস্বাদন ও সমালোচনা, ব্যাখ্যা ও বিবরণ—ইহা ছাড়া বলেন্দ্রনাথের রচনার একটি বৃহৎ ভাগ হইল দৃশ্যমান ও স্পন্দমান, প্রত্যক্ষ আর কল্পনাগোচর, বাস্তব জগতের সুনিপুণ বর্ণনা। সে যেন তুলির লেখার মতই সুন্দর ও মনোহারী; দর্শনযোগ্য কোনো খুঁটিনাটি বিষয়ই বাদ যায় নাই, বিভিন্ন রঙ আর প্রত্যেক রঙের বিভিন্ন পর্দা—সমস্তই যেন দেখা যায়, ছোঁওয়া যায়। আর, মধুর গম্ভীর ভাষায় নিবদ্ধ হওয়ায় ইহার সংগীতটিও পরমাকর্ষী। বলিব কি 'ঘরের দরজা খুলিয়া, পরম বন্ধুর মত হাতে ধরিয়া যে জগতে আমাদের

(৪৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

তিনকড়ি-দর্শন

তিন আর তিন পাশাপাশি যতক্ষণ
তেত্রিশ হয় তারা ঃ
গুণ কর হবে নয়,
ভাগ করলেই এক হয়ে যাবে
যোগ করলেই ছয়,
তিন থেকে তিন বিয়োগ করলে থাকবে না কিচ্ছুই—
তিনের প্রতাপ শূন্যেতে হবে হারা।

তিনের উক্ত মহিমা শুনিয়া কন তিনকড়ি দাম
আমার ব্যাপার তিনের আলোকে এতখনে বুঝিলাম।
শূন্য ঘরেতে বহিতেছিলাম বিয়োগ-ব্যথাই
তিনকুলে মোর আপনার লোক ছিল নাকো ভাই,
বন্ধ্যা গৃহিণী মানিয়া সিন্নি বাঁধিয়া ঢিল
গোপনে খুলিতে চাহিতেছিলেন নিয়তি-খিল।
এমন সময় অকস্মাৎ
হাজির হলেন ত্রিদিবনাথ।
কহিলেন মোরে, খাও তিন্তিড়ি-ঝোল।
বলিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন, র'য়ে গেল কিছু গোল
তিন্তিড়ি মানে বাংলা তেঁতুল ছিল না জানা!
জানিবামাত্র বাজারে ছুটিয়া দিলাম হানা,
কিনিয়া ফেলিনু তেঁতুল কয়েক বোরা ;
তারপর থেকে প্রত্যহ খোরা খোরা
খাই তিন্তিড়ি ঝোল,
এবং, বন্ধু, তারপর থেকে ভরা গিন্নীর কোল।
তিনকুলে কেউ ছিল না আমার
এখন শক্ত জোটানো খাবার।

নয়-ছয় সব হইয়া গিয়াছে
বাজারে প্রচুর দেনা জমিয়াছে,
এখন কেবল চিন্তা করিছে বিমর্ষ প্রাণ-পাখি
তিন আর তিন পাশাপাশি হয়ে তেত্রিশ হবে নাকি !

"বনফুল"

ক্ষতি কোথায় ?

[গত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবন্ধের জবাবে বন্ধুবর শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায় পাটনা হইতে ৯ই শ্রাবণ এই প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, আমাদের অব্যবস্থায় সম্পাদকীয় দপ্তরে লেখাটি হারাইয়া গিয়াছিল। পাঁচ মাস বিলম্বিত হইলেও ইহা প্রকাশ করিলাম।—স. শ. চি.]

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে "লাভবান কে ?" শীর্ষক গবেষণা পাঠ করিয়া ৫২ বৎসর আগের একটা মন্তব্য মনে পড়িল। মন্তব্যটি ১৩০৮ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'নব্যভারতে' প্রকাশিত হয়। লেখকের নাম অপ্রকাশিত। রচনাটি চট্টগ্রামের এক কর্মী সম্বন্ধে, প্রবন্ধের নাম "৺নলিনীকান্ত সেন"। এই অজ্ঞাতনামা লেখক লিখিতেছেন—

"তাহার হাতে একখানা নবপ্রকাশিত মাসিক পত্র ছিল, আমি বলিলাম, 'মাসিক পত্রের জ্বালায় দেশ ছাড়তে হবে দেখছি।' নলিনী হাসিয়া বলিল, 'বড় মিথ্যা নয়। একই লেখক সমস্ত বাঙ্গালা মাসিকে লেখেন ; ইহাতে লেখক, পাঠক, ভাষা কিছুরই উন্নতি হয় না। কারণ লেখকেরা অনুরোধের যন্ত্রণায় চিন্তা করিয়া কোন সারবান প্রবন্ধ সৃষ্টি করিতে পারেন না।'"

দেখা যাইতেছে যে, আজ 'শনিবারের চিঠি'র কর্ণধারগণের যাহা সমস্যা বলিয়া মনে হইতেছে, এই শতাব্দীর (বাং) প্রথম দশকে (ইং শতাব্দীরও সদর ফটক তখন খুলিয়াছে) সেই একই সমস্যা ছিল। অর্থাৎ, মাসিক পত্রিকার সংখ্যাবাহুল্য এবং সারবান প্রবন্ধের অঙ্গুলি-পরিমিত লেখকসংখ্যা।

১৩০৮ সালে কতগুলি বাংলা মাসিক পত্র ছিল বলিতে পারি না। কিন্তু ইহার দশ বৎসর পর যখন কলেজে প্রবেশ করিলাম, তখন বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত ও নিছক সাহিত্যমূলক মাসিক পত্রের সংখ্যা যতদূর মনে পড়ে ৬০।৭০খানি ছিল। ১৩২০ সালে খুব ডাকহাঁক করিয়া 'ভারতবর্ষ' বাহির হয়। ইহার অগ্রজ 'নব্যভারত'; নাটোরের মহারাজা ৺জগদীন্দ্রনারায়ণের 'মানসী'; ৺সুরেশ সমাজপতির 'সাহিত্য'; ৺কুমুদিনী বসুর 'সুপ্রভাত'; 'জাহ্নবী', 'যমুনা' এবং অনুজ 'সবুজপত্র' আজ টিকিয়া নাই। এগুলি তখন উচ্চাঙ্গের পত্রিকা বলিয়াই বিবেচিত হইত। ৺চিত্তরঞ্জন দাশের 'নারায়ণ' কিছুদিন বিশেষ মর্যাদা পায়। তাহাও গতায়ু। এগুলি আজ নাই বলিয়া এগুলি যে স্রোতের শেওলা ছিল, তাহাও বলিতে পারি না। এই সব পত্রিকার তদানীন্তন অনেক অপরিচিত লেখক পরবর্তী কালে সাহিত্যিক বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছেন ও হইতেছেন।

১৩১৯-২০র পর দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। তখন বাংলায় যত অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন অধিবাসী ছিল, আজ ন্যূনপক্ষে দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাংলার পাঠকসংখ্যা অনুপাতে বাড়িয়াছে। তখন একখানা দৈনিক বাংলা পত্রিকা ছয় হাজার কাটতি হইলে সম্পাদকের ও মালিকের ছাতি হাতীর মত ফুলিয়া উঠিত। আজ দুইখানি বাংলা দৈনিক অন্তত দিনে পঞ্চাশ হাজার বিক্রয় হইতেছে। আটগুণের বেশি। বইয়ের ও মাসিক পত্রের চাহিদা বাড়িয়াছে। সুতরাং ৬০।৭০ যদি এখন ১৫০ হইয়া থাকে—এমন বেশি কি হইয়াছে? মানব-সমাজের ক্রমবিকাশে চাহিদা (দর্শনশাস্ত্রের সঙ্কল্প) উপস্থিত হইলে যোগানের স্রোতও প্রবাহিত হয়। আকাঙ্ক্ষিত পদার্থ বস্তুনিষ্ঠই (মেটিরিয়াল) হউক বা ভাব-নিষ্ঠই (মেণ্টাল) হউক।

এই চল্লিশ বৎসরে বাংলার ভাব-রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। অবতার-বাদ, বৈষ্ণবী গোঁসাইদের শিষ্যগৃহে রাসলীলার সম্মোহন, কৌলীন্য ও বর্ণভেদের নোঙর—এই সব খুঁটায় বাঙালীর মন বদ্ধ

অবস্থায় ফর-ফর করিত। এখন বাঁধন অনেক আলগা হইয়াছে, বহু সংখ্যায় শিকল কাটিয়া স্রোতোমুখে ছুটিয়াছে। সমাজে মেয়েরা কেরানী, মাস্টারী, স্টেনোগ্রাফী, ওকালতী প্রভৃতি পেশায় প্রবৃত্ত হইয়া অর্থ নৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে ও তাহার ফলে ইচ্ছামত পুরুষকে কৃপা করিবার অধিকার লাভ করিয়াছে। সিনেমা দেখা ও করা, কফি হাউসে আড্ডা, ফুটবল-ক্রিকেট-রেডিও-নিষ্ঠা, শার্কস্কিনের বুশকোট প্রভৃতি সভ্য স্ট্যাণ্ডার্ড অফ লিভিং যুবক-যুবতীদের ঠাসিয়া ধরিয়াছে। যুবক তাই বিবাহ করিতে চায় না, যুবতী তাই যুবক ধরিবার নয়া তালিম অভ্যাস করিতেছে। স্ফূর্তির বিপত্তি মাঝে মাঝে হইতেছে। অনেক শহরেই ভ্রূণ-নিষ্কাশনের স্পেশালিস্ট ডাক্তার গজাইয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া, গান্ধীবাদ (যাহা লোকে বোঝেও না, মানেও না—কিন্তু কপচায়), লোহিয়া-জয়প্রকাশের আত্মবাদ, হীরেন-জ্যোতির আপকা-ওয়াস্তের সাম্যবাদ, নীরেন রায়ের মার্কসবাদ, অচিন্ত্যর পরমপুরুষবাদ, পণ্ডিচেরীর মাদার-বাদ ইত্যাদি বহু ভাবের নায়াগারা ভাঙিয়া পড়িয়াছে। অর্থাৎ বাঙালী-অন্তঃকরণের পজিটিভ-নেগেটিভ তারের মধ্য দিয়া ১২৫ রকম ওয়েভ-লেংথের তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চালিত হইতেছে। তার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি উত্থিত হইবে না?

সঙ্কল্পের ফল সৃষ্টি। সমাজ-মনে যখন এত বিভিন্নমুখী বাসনা, ইচ্ছা হুড়-হুড় দুড়-দুড় করিতেছে, তখন উহার একটা সৃষ্টিমুখী কর্ম প্রচেষ্টা অবশ্যম্ভাবী। বাঙালীর বাচ্চার এনার্জির বহিঃপ্রকাশের ধারা কি? সে তো খামখা হিমালয়ের তুষারপ্রদেশে যাইয়া স্কী লইয়া হুড়াহুড়ি করে না! সে তো মাউন্টেনিয়ারিং কাহাকে বলে জানে না! পাহাড়ে জঙ্গলে যাইয়া গাছ কাটিয়া মাটি কোপাইয়া আড্ডা বাঁধিতে জানে না! কর্ম—বিশেষত তাহাতে যদি শারীরিক শক্তির প্রয়োজন হয়—তাহা সে ছোটলোকের কাজ মনে করে। কলিকাতা ও মফস্বলের চায়ের দোকানগুলিতে বাঙালীর যৌবন-শক্তির বিকাশ-গণ্ডী আবদ্ধ। সন্ধ্যা-সকালে ছুটির দিনের মাঠে, পথে বা বাগানে তাহাদের দেখা

যায় না—পক্ষী-পর্যবেক্ষণে, জন্তু-জানোয়ারের আচরণে, গাছপালার বৈচিত্র্যে তাহার কোনও আকর্ষণ নাই। দুইটা ফুল-ফলের গাছ লাগাইয়া তাহার যত্ন করিয়া তাহাতে বৈজ্ঞানিক অভিনিবেশ প্রয়োগ করা, এগুলি তার বাল্যকৈশোরের বিকাশোন্মুখ অন্তঃকরণের দ্বারপথে কেহ আনিয়া ধরে না। যৌবনের কর্মপ্রবণতা কর্মের পথ খুঁজিয়া পায় না। যাহাদের মন ততটা চেতন ও সজাগ নহে, তাহারা স্লোগানের দ্বারা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া কতকগুলি রাজনৈতিক বা ধার্মিক দলের কাষ্ঠযন্ত্র বা 'রোবটে' পরিণত হয়। যাহাদের মনে কিঞ্চিৎ বুদ্ধির সংযোগ ঘটে, তাহারা সাহিত্যে ঝুঁকিয়া পড়ে। সাহিত্য করাটাই তাহাদের কাজ —তাহাদের এনার্জির বিকাশক্ষেত্র হইয়া পড়ে। কর্মবুভুক্ষা তাহাদের সাহিত্য করার পথে টানিয়া লইয়া যায়।

সকলের মনই কর্মলোলুপ। আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তর যেমন গলিত ধাতু ও তেজে বিলোড়িত হইতেছে ও কখনও কখনও বিস্ফোরিত হইতেছে—প্রত্যেক মানুষের অন্তঃকরণেও তেমনই সৃজন-ধর্মী সঙ্কল্প কার্য করিতেছে। শিশু-চরিত্রে তাহা প্রকাশিত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-ব্যবস্থা, শিক্ষা-দীক্ষার পাষাণ-কারা গড়িয়া উঠায় তাহা অবলুপ্ত হয়। কর্ম মানুষের ইষ্টকামধুক। কর্মপথে বুদ্ধি বিকশিত হয়, জ্ঞানের বদ্ধ দুয়ার খুলিয়া যায়, মানুষ বিরাটের সাক্ষাৎ পায়। যে কর্মের দ্বারা মানুষ আনন্দ পায়, তার সৃজনী মন সাফল্যের পরিতৃপ্তি লাভ করে, সেই কর্মই তার "স্বধর্ম", "নিয়ত" কর্ম। ইহাতেই নিধন শ্রেয়, অন্য কর্ম পরধর্ম ও ভয়াবহ। কিন্তু "কর্ম" যতক্ষণ ঠিক করা যায় না, তখন বিকর্ম, অকর্ম ও কুকর্ম অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

বাঙালীর ছেলেরা যে "সাহিত্য" করিতেছে, অনেকের পক্ষেই তাহা কর্মের ব্যভিচার মাত্র। ইহার জন্য তাহারা দায়ী নহে, ইহার জন্য দায়ী "সমাজ" এবং যে সব সঙ্ঘ ও প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সমাজ-মন বিধৃত, তাহারা, যথা—বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, অবতারবাদী মিশনগুলি, কংগ্রেস ও অন্যান্য অসুর-ধর্মী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং সংবাদপত্র।

১৩৬খানি পত্রিকা বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া দুঃখ করিয়া লাভ নাই। ইহা কিছু অপ্রাকৃত ব্যাপার নহে। বর্ষার জল অনেক নোংরা ধুইয়া গায়ে মাখিয়া লয়—সব জলই সমুদ্রে যায় না। কিছু পথে আটকা পড়িয়া পচা ডোবারও সৃষ্টি করে। আবার জীব-জগতেও, অন্তত বিহঙ্গদের মধ্যে দেখিতেছি—কাক, বুলবুলি, ঘুঘু, কপোত বহুবার নীড় বাঁধে, বহুবার ডিম পাড়ে, বহুবার ডিম নষ্ট হয়, চুরি যায়, অন্য পাখি বা পশু খাইয়া ফেলে এবং শেষ পর্যন্ত একবারের বেশি বাচ্চা হয় না। কোকিল যদি কাকের বার্থ কন্‌ট্রোল না করিত, মানুষ টিকিতে পারিত কিনা সন্দেহ। উদ্ভিদ-জগতেও দেখি চূতমুকুলে আম্রবৃক্ষ ভরিয়া গিয়াছে। কুঁড়িতেই ফুলের অর্ধেক ঝরিয়া যায়। অর্ধেকে ফল ধরিবার পর ঝড়ে ও বৃষ্টিতে তাহারও অর্ধেক পড়িয়া যায়। মানুষের খাদ্যশস্যের বেলায়ও এ রকম প্রায়ই হইতে দেখা যায়। সুতরাং তথাকথিত অপচয় প্রকৃতির স্বভাব। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বৃহত্তর, পূর্ণতর আবির্ভাবের পূর্বাভাস যে এইরূপ জন্ম-মৃত্যু নহে, তাহা হলফ করিয়া কি বলা যায়?

জীবমাত্রেই যেমন সুষুপ্তি ও জাগরণ অবস্থা, সমাজ-চেতনারও দিবা ও নিশা আছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ খ্রীষ্টীয় শতকে আমরা বেশ নির্বিকার ভাবে নিদ্রা দিয়াছি। রাজা রামমোহন সোনার কাঠির স্পর্শ দিবার পর আমরা আধ-জাগরণ আধ-ঘুমঘোরে কাটাইয়াছি, বিংশ শতাব্দীতে রীতিমত জাগিয়া উঠিয়াছি। আজ আমরা নিদ্রিত—এ কথা বলার উপায় নাই। কবির বাণী, ঋষিবাক্য সফল হইয়াছে। আজ দেশ দেশ নন্দিত করি আমাদের ভেরী মন্দ্রিত। তবে সম্পূর্ণ সজাগ, আত্মসমাহিত চেতনা এখনও হয়তো আসে নাই। মাঝে মাঝে দিদিমার ঘুমপাড়ানী গান আমাদের চোখ ঘুমে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। যেমন অচিন্ত্য-উপন্যাস পরমপুরুষ পরমহংস। অ্যাটম্‌-বোমা ও জেট্‌বিমানের ধাক্কা খাইয়াও যে সমাজ অবতারবাদী গঞ্জিকায় এমন জোর দম দিতে পারে, সে সমাজ আত্মসচেতন হইয়াছে বলা যায় না। মনে হয়, রাজা রামমোহন বৃথাই বাঙালীকে উপনিষদ পড়িতে ও বুঝিতে শিখাইয়াছিলেন। ১৩৬টির

দোষ নয়, দুর্ভাগ্য। তাহারা অচিন্ত্য-উপায় জানিলে সাতের জায়গায় হয়তো আরও ৭৭ টিকিয়া থাকিত।

এই সব পত্রিকার পরিচালক ও লেখকদের মধ্যে যাহারা অজ্ঞাত অপরিচিত ছিল, হয়তো এখনও তাহারা আপনাদের নিকট তদ্রূপই আছে। কিন্তু কালোহ্যয়ং নিরবধি। সাহিত্য-ভ্রূণের পরিণতির কোনও বয়স-নির্দেশ আছে কি? "সম্বুদ্ধ," শ্রী(?) অমলা দেবী, শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী প্রভৃতি বেশ বড়সড় হইয়াই তো সাহিত্য-গগনে উদ্ভাসিত হইয়া দেখা দেন। ওই ১৩৬টি পত্রিকার অপরিজ্ঞাত লেখকদের অনেকে যে বছর দশেক পরে অন্তত একবার উল্কার হল্কা দেখাইবে না, তাহার গ্যারাণ্টি দিতে পারেন কি? যে 'কল্লোলে'র কলকোলাহল রোধ করিতে 'শনিবারের চিঠি' পয়দা হইল, সে 'কল্লোল' অনেকদিন খতম হইয়াছে, কিন্তু তার জাতকেরা যে বঙ্গসাহিত্যের বুকে ভৃগু-পদচিহ্ন আঁকিয়া গিয়াছে এবং তাহাদের অনেকেই 'শনিবারের চিঠি'কে এখন আঁকড়িয়া ধরিয়া আছে বলা যায় না কি? 'বসন্ত কেবিনে' যেদিন 'শনিবারের চিঠি'র আটকৌড়ে হইয়াছিল, তখন কি কুলীন সাহিত্যিকরা দুন্দুভি বাজাইয়াছিলেন? কোন্ সূচিকা-ভরণে অপমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া আজ আপনারা মর্যাদাশিখরে তেনসিং হইয়াছেন তাহা আপনারা জানেন। যাহারা মরিয়াছে, তাহারা লাভ-লোকসানের বাহিরে গিয়াছে। কিছুদিন বাপের ধনে বা পরের ধনে পোদ্দারি করিয়া লইয়াছে। ক্ষতি কাহার?

শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়

[আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া "লাভবান কে?" লিখিয়াছিলাম, সুধীন্দ্রলাল তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া "ক্ষতি কোথায়?" লিখিয়াছেন। সুতরাং জবাব নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার প্রকৃতি-অনুগ অনুবাদ আমাদিগকেও আশান্বিত করিয়াছে।—স. শ. চি.]

ডানা

ছয়

কবি হাজতে গিয়ে মন্দ ছিলেন না। তাঁর বিবেকে কোনও গলদ ছিল না, মনে তাই কোন অশান্তিজনক আশঙ্কা জাগে নি। তিনি যে অবিলম্বে ছাড়া পেয়ে যাবেন—এ বিষয়েও তাঁর সন্দেহ ছিল না। পুলিসের কাণ্ডজ্ঞানহীনতা দেখে এবং অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে একটা অভিনব পারিপার্শ্বিকে নীত হয়ে বরং একটু মজাই লাগছিল তাঁর। কোনও অদৃশ্য বিধাতা তাঁকে যেন দৈনন্দিন একঘেয়েমির বন্দীশালা থেকে মুক্তি দিয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিতলোকে এনে হাজির ক'রে দিলেন, রূপকথার হারুন-অল-রশিদ যেমন দিয়েছিলেন আবুহোসেনকে। আর একটা কথা ভেবেও পুলকিত হচ্ছিলেন তিনি। ডানা নিশ্চয়ই খবরটা পাবে, পেয়ে উতলাও হবে নিশ্চয়। উতলা হয়ে জানলার গরাদে ধ'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবার মেয়ে সে নয়, কিছু একটা করবেই। কি করবে, কি করা সম্ভব? কল্পনা নানা রকম ছবি আঁকছিল। মশগুল হয়ে এক-একটা ছবির দিকে চেয়ে দেখছিলেন তিনি। ডানা কি রূপচাঁদের শরণাপন্ন হবে? অমরেশবাবুকে টেলিগ্রাম করবে? হঠাৎ একটা সম্ভাবনা মনে হওয়াতে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মন্দাকিনীকে খবর দিয়ে দেবে না তো? তা হ'লে কিন্তু হুলুস্থূল বেধে যাবে। মন্দাকিনীর ঠিকানা অবশ্য ডানার জানা নেই। রূপচাঁদ জানে। চিন্তিত হয়ে হাঁটু দোলালেন খানিকক্ষণ। চিন্তার অন্তরালেও কিন্তু একটা পুলকের স্রোত ফল্গুর মত বইছিল। ডানা যা-ই করুক, তাঁকে নিয়েই যে সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে—উঠেছে নিশ্চয়ই—এই ধারণাটা পুলকিত ক'রে তুলেছিল তাঁকে।

যে ঘরটায় ছিলেন তিনি সে ঘরে জানলা ছিল একটা। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল নীল আকাশ। নীল আকাশের পটভূমিকায় দেখা যাচ্ছিল একটি গাছের কঙ্কাল। পাতা সব ঝ'রে গেছে। যে শাখা-প্রশাখাগুলি অসংখ্য সবুজ পত্রকে আঁকড়ে ধরেছিল তারা আজ রিক্ত। একটি পাতাও নেই। গাছের শীর্ষদেশে ব'সে আছে এক গোদাচিল। খানিকক্ষণ চিলটার দিকে চেয়ে থেকে তাঁর মনে ভাব জাগল। একটা

ছোট খাতা আর পেন্সিল তাঁর পকেটে সর্বদা থাকত। বার ক'রে লিখতে লাগলেন। অনেক কাটাকুটির পর যা দাঁড়াল, তা এই—

যে নিগূঢ় মিল আছে ছবি আর পটভূমিকায়
ফুটিবে তা কোন্ বর্ণে কার তুলিকায়?
পিছনে আকাশ গাঢ় নীল,
এই পটভূমিকায় গাছের কঙ্কাল আঁকা
শিরে তার ব'সে আছে চিল।
তীক্ষ্ণ নখ-চঞ্চুবাণ ব'সে আছে অশঙ্কিত হিয়া
তাম্রবর্ণ পক্ষ দুটি সূর্যালোকে ওঠে ঝলসিয়া,
শক্তি-দৃপ্ত অকুণ্ঠিত মহিমার প্রতীক যেন সে,
দৃষ্টি তার প্রশ্ন করে এখনও কেন সে
পায় নি শিকার;
গাছের কঙ্কাল কিম্বা আকাশের নীল বর্ণ
চিত্তে তার তোলে নি বিকার।
আমি কবি, আমি শুধু মুগ্ধ নেত্রে হেরি এই ছবি;
মনে মনে খুঁজি সেই মিল
রিক্ত-বৃক্ষ, ক্ষুব্ধ-চিল, নির্বিকার আকাশের নীল
যে মিলে মিলিত হ'লে
খুলে যাবে সমস্যার খিল।
স্বপ্নে দেখি যেন এক নূতন ধরণী,
নূতন নদীর স্রোতে ভেসে চলে নূতন তরণী;
আরোহী ওরাই
আকাশের নীল আর গাছের কঙ্কাল আর ওই চিলটাই;
সে তরীতে আমিই নাবিক
কোন ঘাটে ভিড়িব যে তাও যেন জানি আমি ঠিক।

কবিতাটা লেখা শেষ ক'রে অন্যমনস্ক হয়ে ব'সে রইলেন তিনি কিছুক্ষণ। নূতন ধরণীর নূতন নদীস্রোতে ভাসতে ভাসতে চ'লে গেলেন

কোথায় যেন। হঠাৎ চমক ভাঙল, জানলার ঠিক নীচেই খুব চেনা পাখি ডেকে উঠল একটা। ছোট ছেলেরা 'টু' শব্দ ক'রে যেমন লুকোয়, অনেকটা তেমনি মনে হ'ল তাঁর। মনে হ'ল, তাঁকে ডেকে যেন বলছে—কি যা-তা ভাবছ তুমি! আমি এত কাছে রয়েছি দেখতে পাচ্ছ না! কবি চেয়ার ছেড়ে উঠে জানলার কাছে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, ঠিক নীচেই কুন্দফুলের ঝাড় রয়েছে একটা। আর কিছু দেখতে পেলেন না প্রথমে। একটু পরেই পেলেন। দরজিপাখি একটি, কুন্দ-ঝাড়ের নীচের ডালটিতে ব'সে আছে, ডালটি দুলছে, একফালি রোদ এসে পড়েছে তার ওপর। দরজিপাখিকে একাধিক বার দেখেছেন তিনি ইতিপূর্বে, তার নানা রকম ডাক শুনেছেন, তার পাতায় পাতায় শেলাই-করা বাসাও দেখেছেন—সংগ্রহ করা আছে একটি অমরেশবাবুর মিউজিয়মে; কিন্তু এত কাছে, এমন ঘনিষ্ঠভাবে দরজিপাখিকে দেখবার সুযোগ তিনি পান নি। বইয়ে যে বর্ণনা পড়েছিলেন তা মনে করবার চেষ্টা করলেন। বইয়ে লেখা আছে 'অলিভ গ্রীন' রঙ, লালচে পা, ছোট্ট মুখ, ছোট্ট ঠোঁট, গলায় কালো কণ্ঠী। সবই মিলে যাচ্ছে। হঠাৎ ল্যাজটা সোজা খাড়া হয়ে উঠল পিঠের ওপর। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে 'টোয়িট্' 'টোয়িট্' 'টোয়িট্' শব্দ ক'রে ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে গেল দরজিপাখি। বোঝা গেল, কবিকে দেখতে পেয়েছে এবং চটেছে। 'স্পাই'কে পাখিরাও ঘৃণা করে। কবির মুখে ফুটে উঠল মৃদু হাসি, ছোট নাতির কাণ্ডকারখানা দেখে দাদামশায়ের মুখে যেমন ফোটে। খানিকক্ষণ স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন তিনি। তারপর ঝুঁকে আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে, এঁকে বেঁকে নানারকমে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পাখিটাকে আর দেখতে পেলেন না। একটু দূরে ডাক শোনা গেল—পীপ্ পীপ্ পীপ্। ঠিক এর পরই কবি বুঝতে পারলেন, বন্দীত্বের দুঃখটা কোথায়! তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল, বেরিয়ে গিয়ে পাখিটার খোঁজ করেন; কিন্তু তার উপায় নেই এখন। অনেকক্ষণ অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়ালেন ঘরের মধ্যেই। তারপর চেয়ারে এসে বসলেন। একটু পরে খাতা পেন্সিল বেরুল পকেট থেকে, ভাব ছন্দ আর মিলের সন্ধানে

দিশাহারা হয়ে পড়ল মন, ভেসে চলল কল্পনা-তরণী নূতন নদীর নূতন স্রোতে। অনেকক্ষণ লাগল কবিতাটা লিখতে, অনেক কাটাকুটি হ'ল, তবু মন খুঁতখুঁত করতে লাগল, মনে হ'ল বক্তব্যটা ঠিক যেন বলা হ'ল না।

দরজিপাখি শিল্পী মানুষ মরজি মতন চলেন
'পীপ্' 'পীপ্' 'পীপ্' দু-চার কথা খেয়াল মাফিক বলেন।
তোমার আমার দৃষ্টিটিকে পারতপক্ষে এড়ান,
পুচ্ছটিকে উচ্চে তুলে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ান।
চ'টে গেলেই ধমকে ওঠেন 'টোইট্' 'টোইট্' 'টোইট্'
যার অর্থ সরল ভাষায়—চটছি আমি, 'নো ইট'।
মনটা যখন তলিয়ে ছিল বিষণ্ণতার তলায়
হঠাৎ গানের উঠল গমক দরজিপাখির গলায়।
চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে দেখি, সবুজ কুন্দ-শাখায়
দোল খাচ্ছেন দরজিপাখি রোদ পড়েছে পাখায়।
বুকটি সাদা পিঠটি রঙিন গলায় আভাস কালোর,
হচ্ছে মনে দুলছে যেন রঙিন সুরের ঝালর।
জলপাই রঙ সাধছে সারং শুনছে স্বয়ং তপন
বইছে হাওয়া মন্দ-মৃদু আকাশ দেখছে স্বপন।
দেখছে যেন বসুন্ধরাই দরজিপাখির মতন
রূপের হট্টলোকের মাঝে খুঁজছে অরূপ রতন।
আকাশ-ভরা সূর্য তারা লক্ষ পাতা শাখীর
সব ছাড়িয়ে সুর উঠেছে বসুন্ধরা-পাখির।
পাতায় পাতায় শেলাই ক'রে সেও তো বাসা বানায়
কিন্তু সে যে নয়কো ছোট গান গেয়ে তা জানায়।

কবিতাটা বার দুই মনে মনে পড়লেন তিনি। তারপর জোরে জোরে

পড়লেন একবার। 'ছোট্ট' কথাটাকে কেটে 'ছোট' করলেন। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইলেন কবিতাটার দিকে; ভাবতে লাগলেন, আরও গোটা দুই লাইন জুড়ে দেবেন কি না! এমন সময় জেলারবাবু এসে দাঁড়ালেন দ্বারপ্রান্তে।

আপনার 'বেল' হয়ে গেছে। আসুন।

কবি দাঁড়িয়ে উঠলেন হঠাৎ। খাতাটা প'ড়ে গেল তাঁর কোল থেকে। সেটাকে তুলে আবার পকেটে পুরলেন। খবরটা শুনে তিনি মনে মনে একটু হতাশই হয়ে গেলেন যেন। এত সহজে সব শেষ হয়ে গেল? তিনি আশা করেছিলেন, অনেক হৈ-চৈ হবে এ নিয়ে।

'বেল' হয়ে গেছে?

হ্যাঁ। একজন ভদ্রমহিলা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন আপনার সঙ্গে দেখা করবেন ব'লে। উনিই সম্ভবত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আর এস.পি.র সঙ্গে দেখা ক'রে 'বেলে'র ব্যবস্থা করেছেন। আসুন।

কবি বেরিয়ে দেখলেন, ডানা দাঁড়িয়ে আছে।

কয়েক মুহূর্ত তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুল না। তারপর হঠাৎ গদগদ হয়ে বললেন, চমৎকার! এইটেই আশা করেছিলাম।

চলুন, ট্রেনের বেশি দেরি নেই আর

এ ঘোড়ার গাড়ি কি আমাদের জন্যে?

হ্যাঁ। ওইটে ক'রেই তো ঘুরছি সকাল থেকে।

ও। খুব ঘুরতে হয়েছে বুঝি?

এ কথার উত্তর না দিয়ে ডানা কেবল বললে, চলুন।

গাড়িতে উঠে কিছুই কথা হ'ল না খানিকক্ষণ। ডানা বাইরের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল। কবি উস্‌খুস্‌ করতে লাগলেন। ডানাই কথা কইলে প্রথম।

মনে হচ্ছে, এরা আমাদের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলছে।

ষড়যন্ত্র? মানে? কারা ষড়যন্ত্র করছে?

মল্লিক মশাইরা।

আগে যে মল্লিক ম্যানেজার ছিল, সেই ?

হ্যাঁ।

লোকটা তো খারাপ নয়। তুমি জানলে কি ক'রে ?

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন। মল্লিক মশাই নাকি গোপনে পুলিস সাহেবকে খবর দিয়েছিলেন যে, এ খুনের সঙ্গে আপনি জড়িত ?

কি রকম ?

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সব কথা খুলে বললেন না। ইঙ্গিতে শুধু বললেন যে, আপনাদের নিজের লোকই তো পুলিসকে এ খবর দিয়েছে। নিজের লোকটি কে তা জিজ্ঞেস করাতে একটু ইতস্তত ক'রে তিনি মল্লিক মশাইয়ের নামটা বললেন। তাঁর ধারণা, মল্লিক মশাই এস্টেটেরই কর্মচারী একজন। আমি যখন তাঁকে বললাম যে, মল্লিক মশাই আগে এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন এবং অমরেশবাবুর স্ত্রী তাঁকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় আপনাকে বসিয়েছেন, তখন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে রইলেন খানিকক্ষণ। মনে হ'ল, মল্লিকের এই অদ্ভুত আচরণের হেতুটা যেন তাঁর কাছে স্পষ্ট হ'ল। তারপর যখন শুনলেন আপনি প্রফেসার ছিলেন, তখন তাঁর ভুরু আরও কুঁচকে গেল। জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ কলেজের প্রফেসার ছিলেন ? আমি জানতাম না, বলতে পারলাম না। তিনি বললেন, আমি এক আনন্দবাবুর ছাত্র ছিলাম, ইনি তিনি নন তো ? প্রশ্ন করলেন, কবিতা লেখেন কি খুব ? এ খবরটা জানা ছিল। বললাম, লেখেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, ইনি তা হ'লে সেই আনন্দবাবু। আমাকে একটা দরকারে এখুনি এক জায়গায় বেরিয়ে যেতে হচ্ছে, তা না হ'লে আমি নিজেই যেতাম তাঁর কাছে। যাই হোক, তাঁর 'বেলে'র ব্যবস্থা আমি এখুনি ক'রে দিচ্ছি।...

কবি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

নাম কি বল তো ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ?

তা তো ঠিক জানি না।

আমার এক ছাত্র—নিখিল বোধ হয় তার নাম—কোথায় যেন এস.ডি.ও. হয়েছিল শুনেছিলাম, এ হয়তো সেই—

ডানা বললে, উনি একদিন আসবেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

কবি হাসিমুখে চুপ ক'রে রইলেন। তাঁর কল্পনা-তরণী তখন বিশাল সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছিল—অকূলে কূল খোঁজবার আশায় নয়, আনন্দের আবেগে।

ডানা বললে, মিছিমিছি কি কাণ্ড দেখুন তো! খুব কষ্ট হয়েছে নিশ্চয় আপনার?

কিছুমাত্র না। আমি কবিতা লিখছিলাম। শুনবে?'

এখন থাক্। বাড়ি গিয়ে শুনব।

না, অত তর সইবে না আমার। এখনিই শোন।

ছ্যাকড়া গাড়ির ঘড়ঘড় শব্দের সঙ্গে কবির কণ্ঠস্বর পাল্লা দিতে লাগল।

ডানা ইণ্টার ক্লাস টিকিট করতে চেয়েছিল, কবি কিন্তু শুনলেন না। ফার্স্ট ক্লাস টিকিট করতে হ'ল।

কবি বললেন, তোমাকে ভিড়ের মধ্যে দেখলে ঠিকমত দেখা হয় না। মনের সঙ্গে চোখের ঝগড়া চলতে থাকে খালি।

ডানা মৃদু হেসে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রইল। হাওয়ার বেগে বিস্রস্ত হতে লাগল তার চুলগুলো।

কবি মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন তার দিকে। হঠাৎ বললেন, তুমি যদি আমার মেয়ে হতে, বেশ হ'ত তা হ'লে—ভারি খুশি হতাম।

কেন?

অসঙ্কোচে আদর করতে পারতাম। আদর ক'রে যা বলতাম তা বেমানান হ'ত না। এখন কিছু বললেই তুমি চ'টে যাবে, লোকে শুনলেও ছি-ছি করবে।

কেন, কি বলতে চান?—ডানা মুখ টেনে নিলে ভিতরে।

বলতে চাই—। ব'লেই কবি পকেট থেকে খাতা বার ক'রে পড়তে লাগলেন—

তুমি সুন্দরী, সন্ধ্যার মালা,
তুমি কর্পূরলতা,
দিবসের আলো, রাতের আঁধার
যাচে তব সখ্যতা।

জ্যোৎস্না-সাগরে তোমার তরণী
পাড়ি দেয় যবে রাতে
বেরসিক যারা ঘুমাইয়া থাকে
কবি জেগে থাকে ছাতে।

তাহারই কাব্য-তীর্থে, ক্ষণিকা,
ক্ষণতরে অবতরি,
মর্ত্য-মলিন কল্পনা তার
দাও যে সুধায় ভরি।

তুমি দেহ নও, তুমি কেহ নও,
অথচ তুমি যে সব,
তোমারে ঘিরিয়া হয় যে মূর্ত
নিখিলের উৎসব।

তোমারই নয়নে, তোমারই অধরে,
তোমারই ডাহিনে বামে
সত্য-শিবের চির-সহচর
সুন্দর এসে নামে।

জানি না তাহারে, চিনি না তাহারে,
নাম নাই তার জানা,
তবু তারি লাগি কাব্যে ও গানে
সাজাই ছন্দ নানা।

ডানা স্মিতমুখে শুনছিল। কবি থামতেই হেসে বললে, আমি তা হ'লে, আপনার মত, স্টেজ মাত্র—

স্টেজের মহত্ত্ব কম নাকি! স্বয়ং শেক্‌সপীয়র ব'লে গেছেন—সমস্ত পৃথিবীটাই স্টেজ।

ডানা হাসিমুখে চুপ ক'রে চেয়ে রইল। তারপর জানলা দিয়ে আবার মুখ বাড়াল। কোন কথা কইল না। যে আমগুলো স্টেশন থেকে কেনা হয়েছিল, কবি তাই একটা তুলে নিয়ে ছুরি দিয়ে কাটতে লাগলেন—হাত বেয়ে রস পাঞ্জাবিতে লাগল। হঠাৎ ডানা মুখ ফিরিয়ে বললে ও কি করছেন, ? দিন, আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি। ক্ষিধে পেয়েছে আপনার? বলেন নি কেন?

কবির হাত থেকে আমটা নিয়ে ডানা নিপুণভাবে কাটতে লাগল। কবি নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন।

কি দেখছেন অমন একদৃষ্টে?

মেয়েকে, মাকে।

ডানা চোখ তুলে চাইল। কবি দেখলেন, চোখে যে হাসি চিকমিক করছে তাতে আর শঙ্কার ছায়া নেই। তা প্রসন্ন, সুন্দর, স্নিগ্ধ।

[ক্রমশ]

"বনফুল"

মহাস্থবির জাতক

পনের

সিঁড়ি বেয়ে ঘুরতে ঘুরতে তো তেতলায় ওঠা গেল। তেতলায় প্রকাণ্ড একটা হল-ঘর। সেখানে তিন-চারটি বাঙালী যুবক নিজের নিজের বিছানায় ব'সে আছেন—বিছানাগুলি ঘরের মেঝেতে পাতা। ঘরের মধ্যে আরও দশ-বারোটা বিছানা গোটানো অবস্থায় রয়েছে। তিন-চারটে দড়ি টাঙানো—তাতে গামছা ইত্যাদি ঝুলছে। মেঝেতে আরও টুকিটাকি জিনিস এলোমেলোভাবে ছড়ানো রয়েছে।

ঘরে ঢুকে একজনকে জিজ্ঞাসা করলুম, রমেশবাবু আছেন?

উত্তর পেলুম, রমেশবাবু নেই, তিনি সকালবেলা কাজে বেরিয়েছেন—এগারোটা সাড়ে-এগারোটার মধ্যেই এসে পড়বেন। আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

—আমরা কলকাতা থেকে আসছি।

কলকাতার নাম শুনেই তাঁরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বাংলা দেশ থেকে বহুদূর সেই আহ্‌মেদাবাদে ব'সে কলকাতা থেকে আগত কারুকে দেখলে বাঙালীর প্রাণ যে একটু চঞ্চল হবে সে আর বেশি কথা কি!

দেখলুম, তাঁরা আমাদের সম্বন্ধে অনেক কথাই জানেন। আমাদের নিয়ে ইতিমধ্যে তাঁদের মধ্যে আলোচনাদিও হয়ে গেছে। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের মধ্যে রমেশদার ভাই কেউ আছেন?

সুকান্ত বললে, আজ্ঞে, আমি তাঁর ভাই।

হলের মধ্যে অনেক খালি জায়গা তখনও প'ড়ে ছিল। একজন উঠে আমাদের সেই দিকটায় নিয়ে গিয়ে বললেন, আপনারা এখানে বিছানা পেতে বিশ্রাম করুন, রমেশদা এখুনি এসে পড়বেন।

সেইখানে ব'সে ব'সে আমরা তাঁদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করতে লাগলুম। জানা গেল যে, ওখানে বাংলা দেশের নানা জায়গা থেকে প্রায় কুড়িটি ছেলে এসে কাপড়ের কলে কাজ শিখছে। বছর তিনেক

লাগে কাজ শিখতে—পরে মিলে চাকরি পাওয়া যায়। ভাল ক'রে কাজ শিখতে পারলে ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনা আছে। ওখানে মাসে চোদ্দ-পনেরো টাকা খরচ লাগে। এখানকার ছেলেদের মধ্যে একদল সেই ভোরে উঠে কাজে বেরিয়ে যায় আর ফিরে আসে দশটা নাগাদ—আবার যেতে হয় একটা নাগাদ আর ছুটি হয় বেলা পাঁচটায়। আর একদল যায় দশটায় আর ফিরে আসে বেলা পাঁচটায়।

সকলেই বলতে লাগল, ভারি খাটুনি—বাঙালীর ছেলের পক্ষে এত খাটুনি সহ্য করা মুশকিল।

আমরা বললুম, ওই কাজে ঢুকব ব'লেই তো এখানে এসেছি।

আমাদের কথা শুনে সকলেই বেশ একটু গম্ভীর হয়ে পড়লেন। একটু পরে একজন বললেন, খাটুনি সহ্য করতে পার তো ভালই। প্রথমটা খুবই কষ্ট হয়, তারপরে সহ্য হয়ে যায়।

আর একজন একটু পরেই বললেন, এখানে ঢোকা খুবই শক্ত—ঢুকব বললেই ঢোকা যায় না।

এই রকম সব কথাবার্তা চলছে, এমন সময় সুকান্তর দাদা রমেশবাবু ও আরও কয়েকজন সকালের কাজ থেকে ফিরে এলেন। চার ঘণ্টা মিলে খেটে তার ওপরে প্রায় মাইলখানেক পথ হেঁটে এসে গলদঘর্ম শরীরে তেতলায় উঠে রমেশবাবু আমাদের দেখে তো পরম পুলকিত হয়ে উঠলেন। একটি গেলাস ঠাণ্ডা জল টেনে ও আর একটি গ্লাস জল সামনে রেখে ভদ্রলোক আমাদের—বিশেষ ক'রে সুকান্তকে গাল পাড়তে আরম্ভ করলেন। ভদ্রলোক গাল দিতে দিতে মাঝে মাঝে উত্তেজিত হয়ে সুকান্তকে মারতে যান আর অন্যান্য সকলে ধ'রে ফেলে—এই রকম ক'রে প্রায় বেলা একটা অবধি গালাগালি দিয়ে আর একটি গেলাস জল টেনে তখনকার মতন স্নান করতে নেমে গেলেন। এতক্ষণ যে যুবকরা আমাদের সঙ্গে আলাপ করছিলেন ও বেশ সহানুভূতির সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি এবং অন্যান্য প্রায় সকলেই আমাদের সম্বন্ধে বেশ চটকদার টিপ্পনি কাটতে আরম্ভ করলেন। ইতিমধ্যে রমেশদা স্নান ক'

এলেন। স্নানের ফলে মেজাজ ঠাণ্ডা হওয়ার পরিবর্তে দেখা গেল, তাঁর উষ্মা বেড়েই গিয়েছে।

রমেশদা বললেন, তোমরা যে সেখান থেকে এমন ক'রে পালিয়ে এলে—সেখানকার অবস্থা কিছু জান? সেখানে যে তোমাদের জন্যে মারপিট খুনখারাপি চলেছে তার কিছু খবর রাখ?

সুকান্ত চুপ ক'রে রইল। বড় ভাইয়ের কথার ওপর কোন কথা বলা সে-যুগে ভদ্ররীতির বহির্ভূত ছিল। আমি কিছুক্ষণ সহ্য ক'রে থেকে বললুম, আমরা চ'লে এসেছি—কারুর কিছু ক্ষতি ক'রে তো আসি নি। যদি ক্ষতি ক'রে থাকি তো নিজেরই করেছি—

আমার কথা থামিয়ে দিয়ে একজন বললেন, খুব লম্বা লম্বা কথা ছাড়ছ যে ছোকরা! জান, তোমাদের জন্যে সেখানে কি হচ্ছে?

—কি হচ্ছে?

—যা তো শচে, নীচে থেকে কাগজগুলো নিয়ে আয় তো!

বলামাত্র একজন উঠে গিয়ে একতাড়া খবরের কাগজ নিয়ে এল। দেখলুম, সবগুলোই কলকাতার কাগজ, তার মধ্যে বাংলা সংবাদপত্রও আছে।

—এই দেখ।—ব'লে কাগজের তাড়াটা রমেশদা আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন। দেখলুম, অনেকগুলো কাগজের নানা জায়গায় সব লাল পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই সব স্থান দেখিয়ে রমেশদা বললেন, প'ড়ে দেখ।

কাগজ প'ড়ে বুঝতে পারা গেল যে, আমরা কলকাতা ছাড়বার আগে ছেলেধরা ব্যাপার নিয়ে যে হাঙ্গামা সেখানে শুরু হয়েছিল, আমাদের পলায়নের পর সে হাঙ্গামা আরও বেড়ে উঠেছে। এই নিয়ে এক দলের কাগজ বলছে যে, ছেলে-ধরা-টরা কিছুই নয়—এই সব বালকেরা অতি দুর্বৃত্ত, অতি খলিফা—কলকাতার নামজাদা ছেলে এরা—এদের ধরে নিয়ে যায় এমন ছেলে-ধরা এখনও জন্মায় নি। এই তিনটির মধ্যে দুটির স্বভাবই হচ্ছে বাড়ি থেকে পালানো ইত্যাদি ইত্যাদি। অপর দল

পুলিস ও গবর্মেণ্টের প্রতি দোষারোপ করছেন। তাঁরা বলছেন—ছেলেধরার কথা তো অনেকদিন থেকেই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। গুজব মনে ক'রে আমরা এতদিন চুপচাপই ছিলুম, কিন্তু অমুকের মতন অমন সোনারচাঁদ ছেলেও যখন গায়েব হতে আরম্ভ করেছে তখন এ সম্বন্ধে আর নীরব থাকা অন্যায় হবে। এই ব'লে পুলিসের অসতর্কতা ও গবর্মেণ্টের উদাসীনতাকে লক্ষ্য ক'রে তুড়ে খিস্তি করেছে।

টুর্গেনিভের বিখ্যাত সেই চুট্‌কি গল্পের নায়ক মাল টেনে গাড়ি চাপা প'ড়ে খবরের কাগজে নিজের নাম দেখে নিজেকে যেমন বিখ্যাত লোক ব'লে মনে করেছিল—এই খবরের কাগজগুলো প'ড়ে আমাদের মনেরও প্রায় সেই অবস্থা হ'ল। রমেশদা যতই বকতে থাকেন ও তাঁর আশপাশ থেকে যুবকেরা যতই বিনামূল্যে পরামর্শ বিতরণ করতে থাকেন—মনে হতে লাগল, তাঁরা আমাদের চেয়ে ঢের ঢের নিম্নশ্রেণীর জীব। আর যাই হোক না কেন, আমরা হচ্ছি সেই শ্রেণীর লোক যাদের নিয়ে খবরের কাগজে আন্দোলন চলতে থাকে।

বলা বাহুল্য, এক 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' ছাড়া সে কাগজগুলির একখানিও আজ জীবিত নেই।

আমাদের বকুনি দিতে দিতে রমেশদা ও অন্যান্য অনেকে সেদিন কাজে যেতেই ভুলে গেলেন—রমেশদা তো খেতেই ভুলে গেলেন।

বেলা চারটের পর আমরা নীচে নেমে স্নান ক'রে এলুম। রমেশদা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কাছে টাকাকড়ি কিছু আছে ?

আমাদের বিস্কুটের টিন প্রায় খালিই হয়ে এসেছিল। বললুম, টাকা-কড়ি বিশেষ কিছু নেই।

আগ্রাতে আমরা ধরা প'ড়েও ফাঁকি দিয়ে পলায়ন করেছিলুম ব'লে রমেশদা আবার এক পক্কড় বক্‌-বক্‌ শুরু করলেন। তারপরে প্রায় সন্ধ্যা অবধি এই ভাবে কাটিয়ে আমাকে ও জনার্দনকে বললেন, তোমরা বাড়িতে টাকা চেয়ে চিঠি লিখে পাঠাও। এখান থেকে কলকাতা ভাড়া আঠারো টাকা—এখানে ক'দিন খাওয়া-দাওয়ার খরচ আছে

ত্রিশটি টাকা চেয়ে পাঠাও। আমি সুকান্তর বাড়িতে টাকার জন্যে চিঠি লিখছি।

এত সব সত্ত্বেও আমরা মিনতি ক'রে বললুম যে, আমরা কলে কাজ শিখব ব'লে এসেছি। তা না হ'লে কোথাও কিছু নেই খামোখা তাঁদের খপ্পরে এসে পড়বার অন্য কোন কারণই নেই। দয়া ক'রে আমাদেরও মিলের কাজে ঢুকিয়ে দিন, এখানে থাকার খরচা আমরা বাড়ি থেকে আনিয়ে নেব।

আমাদের কথা শুনে রমেশদা তো বটেই, তা ছাড়া উপস্থিত প্রায় সকলেই অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন।—কী, আস্পা তো তোমাদের কম নয়! বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে এ কথা বলতে লজ্জা করছে না!

অবিশ্যি ওখানে থাকতে থাকতেই আমরা জানতে পেরেছিলুম যে, সেখানকার অনেকগুলি ছেলেই বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে।

কিছুক্ষণ বাদে ঘরে বাতি জ্বালার পর আমরা উঠে পড়লুম। বিস্কুটের টিনটি রমেশদা ইতিপূর্বেই হাতিয়ে রেখেছিলেন। আমরা বললুম, বিস্কুটের টিনটা দেখি!

—আবার কেন?

—আজ্ঞে, ওতে এখনও কিছু অর্থ আছে। বাজারে যাই, কিছু খেতে-টেতে হবে তো—উপদেশ আর বকুনি খেয়ে তো পেট ভরবে না।

আমাদের কথা শুনে একজন বললেন, বুক্‌নি-টুক্‌নি তো বেশ শিখেছ ছোকরা!

কি আর বলব! চুপ ক'রে থাকাই সমীচীন বোধ করলুম। রমেশদা বললেন, তোমাদের সঙ্গে বকাবকি ক'রে সারাদিন আমারও খাওয়া হ'ল না। চল, আমরা যে হোটেলে খাই সেখানে তোমাদেরও বন্দোবস্ত ক'রে দিই—দু বেলা গিয়ে সেখানে খেয়ে আসবে।

আহ্‌মেদাবাদে সে সময় চায়ের দোকানের মতন যেখানে-সেখানে 'ভিসি' দেখা যেত—'ভিসি' বলে ভাত ও রুটির হোটেলকে। সেখানে অসংখ্য লোক দু বেলা এই সব ভিসিতে খেত। যে সময়ের কথা বলছি,

সে সময় কলকাতাতেও যত্রতত্র ভাতের হোটেল দেখতে পাওয়া যেত। তখনকার দিনে এই সব হোটেলে একজন প্রমাণ লোকের পেট ভ'রে খেতে লাগত ছ পয়সা। ছ-পয়সায় ভাত, একটা নিরামিষ তরকারি, ডাল ও মাছের ঝোল পাওয়া যেত—তাতে এক টুকরো মাছ থাকত। সাত পয়সা দিলে একটা ভাজা মাছ পাওয়া যেত। কলকাতার এই সব ভাতের হোটেলে সকাল ও সন্ধ্যায় অসংখ্য লোক খেত বটে, কিন্তু সে সব জায়গা ছিল নোংরার ডিপো। পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে কোন নিয়মেরই ধার সেখানে ধরা হ'ত না। তার ওপরে বাঙালীর খাবারই এমন যে একদল লোক খেয়ে গেলে সেখানে আর একদল বসা প্রায় অসম্ভব। আহ্‌মেদাবাদে সে সময় জীবনযাত্রার খরচ ছিল কলকাতার প্রায় দ্বিগুণ। ভিসিগুলোতে এক বেলা খেতে দশ কি বারো পয়সা লাগত। খাবার দিত খুব মিহি চালের ভাত, পাতলা রুটি, একটা তরকারি—শুকনো ঝুরো মতন, জলের মত ডাল, ঘি ও চিনি—যে যত পার। খাদ্য হিসাবে কলকাতার তুলনায় সে কিছুই নয় বটে, কিন্তু সেখানকার পরিচ্ছন্নতা অনুকরণীয়। গুজরাটীরা যে পরিচ্ছন্ন জাতি, তার প্রমাণ এই সব ভিসিতে পাওয়া যায়।

যা হোক, সন্ধ্যাবেলায় আমাদের নিয়ে রমেশদা ভিসিতে উপস্থিত হলেন। তখনও বুভুক্ষুর দল আসতে আরম্ভ করে নি। তক্‌তকে পরিষ্কার ঘরের তিন দিকের দেওয়াল ঘেঁষে কাঠের পিঁড়ে পাতা রয়েছে। দেখেই চক্ষু জুড়িয়ে গেল। সকালবেলা রমেশদাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবার আগে এক কাপ ক'রে চা পেটে পড়েছিল। সমস্ত দিন আহার নেই—তারপর সেই বেলা বারোটা থেকে সন্ধ্যে অবধি নিরবচ্ছিন্ন গালাগালি খেতে খেতে মন একেবারে বিষিয়ে উঠেছিল। কিন্তু চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ—ভিসিতে গিয়ে আমাদের সর্বসন্তাপ কোথায় উবে গেল। আপনারা হয়তো মনে করছেন, গুজরাটী আহার দেখে একেবারে মোহিত হয়ে গেলুম। কিন্তু তা নয়। ভিসিওয়ালা ছিল খুব উঁচুদরের মনস্তত্ত্ববিদ। পার্থিব আহার্যের সঙ্গে সঙ্গে খদ্দেরদের মনের কথাটা সে একেবারে ভুলে যায় নি।

রাস্তা থেকে একটা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে তো ভিসিতে ওঠা গেল। পিঁড়ি পাতার কথা আগেই বলেছি। আরও দেখলুম, ঘরের খানকটা জায়গা ইঁট দিয়ে উচু ক'রে সেখানটা মাটি দিয়ে লেপা হয়েছে। এই জায়গাটা হচ্ছে চৌকা অর্থাৎ এইখানেই রান্না হয়। পাশাপাশি তিনটে উনুন জ্বলছে—যতদূর মনে পড়ে কাঠকয়লার উনুন। একজন ব্রাহ্মণ রন্ধনকার্যে ব্যস্ত—ব্রাহ্মণের দীর্ঘ চেহারা, যেমন লম্বা তেমনই চওড়া। টকটক করছে গায়ের রঙ—দেখলে মনে হয় বাড়ি তার ছান্দোগ্য-উপনিষদে।

ব্রাহ্মণ রন্ধন করছিলেন দাঁড়িয়ে, তাঁরই পায়ের কাছে একটি মেয়ে ব'সে—শাঁখের মতন লাল্‌চে সাদা তার দেহের বর্ণ, একটি মোটা সাদা থান পরা, তুলি দিয়ে আঁকা মুখখানি, টিকোলো নাকে একটা হীরে অথবা সাদা পোখরাজের নাকছাবি ঝক্‌ঝক করছে। অঞ্চল দিয়ে যতটা সম্ভব অঙ্গ আবৃত, ডান বাহু ও বাঁ হাতের খানিকটা দেখা যাচ্ছে—সুন্দর গড়ন, যেন 'অমিয় ছানিয়া সে দেহ তৈরি—ঘাড় হেঁট ক'রে একমনে রুটি বেলে যাচ্ছে। সামনেই তিনটে গন্‌গনে উনুন, তারই লাল আভা প'ড়ে তার মুখখানি ক্লান্ত দেখাচ্ছিল—এমন সুশ্রী মেয়ে খুব কমই দেখেছি। প্রথম দর্শনেই কবির লাইন মনে প'ড়ে গেল। ইচ্ছে হ'ল ব'লে ফেলি—এত শ্রম মরি মরি, কেমনে চলেছ করি, কোমল করুণ ক্লান্ত কায়?

তারপর অনেক দিন অতীত হয়েছে—এই দুর্ধর্ষ দুর্ভাগার বন্ধুর দীর্ঘ জীবনপথে সেই সপ্তদশী আমায় ত্যাগ করে নি। আজ বিশেষ ক'রে তার মুখখানা মনে পড়ছে—সে যেখানেই থাক্, তাকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা পাঠিয়ে দিলুম।

ভিসিতে উঠে একটা পিঁড়িতে গিয়ে বসতেই সেই ব্রাহ্মণ—'আও বেটা' ব'লে রমেশদাকে অভিবাদন ক'রে বললে, ও-বেলা আসা হয় নি কেন?

রমেশদা বললেন, আমার এক ভাই ও তার দুই বন্ধু বাড়ি থেকে

পালিয়ে আমাদের এখানে এসে উঠেছে। সেই হাঙ্গামায় ও-বেলা খেতে পর্যন্ত আসতে পারি নি। এই তিনজনকে চিনে রাখ—এরা এখন দিন কয়েক এখানে দু বেলা খেয়ে যাবে।

রমেশদার কথা শুনে মুহূর্তের জন্য সেই সুন্দরী একবার মুখ তুলে কমল-নয়ন দিয়ে মাল তিনটিকে দেখে নিলেন—এই একবার ছাড়া দিন দশেকের মধ্যে তাকে আর ঘাড় তুলতে দেখি নি।

আহ্‌মেদাবাদে আমাদের অবস্থা হ'ল এক অদ্ভুত রকমের। কলে কাজ শেখবার যে সব কল্পনা নিয়ে সেখানে গিয়েছিলুম, তা কল্পনাতেই পর্যবসিত হ'ল। গোড়াতেই এক কথায় রমেশদা আমাদের আশার বাতি ধমকের ফুৎকারে নিবিয়ে দিয়েছিলেন তার ওপর রমেশদার নির্দেশমত কিনা জানি না, দ্বিতীয় দিন থেকে সেখানকার সকলেই আমাদের সঙ্গে বাক্যালাপই বন্ধ ক'রে দিলেন। নেহাত কোনও কথা গায়ে-প'ড়ে জিজ্ঞাসা করলে কেউ কেউ উত্তরমাত্র দিতেন, কেউবা তাও দিতেন না—কেবল রমেশদা প্রতিদিন একবার ক'রে জিজ্ঞাসা করতেন বাড়ি থেকে কোনও খবর এল ?

বলতুম, এখনও কোনও জবাব আসে নি।

বলা বাহুল্য যে, বাড়িতে কোনও চিঠিপত্রই লেখা হয় নি—কিন্তু এ রকমও যে বেশিদিন চলতে পারে না তাও বেশ বুঝতে পারছিলুম। ঘটনার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় আর ছিল না। মনে মনে আশা করতে লাগলুম, আমাদের অনুকূলে নিশ্চয় একটা কিছু ঘটবে।

সকালবেলা সকলে কাজে বেরিয়ে যাবার পর আমরাও স্নান ক'রে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তুম। চা পান বা বিড়ি ফোঁকা বন্ধ, কারণ ট্যাঁকে একটা পয়সাও নেই। তখন আবার বর্ষাকাল—আহ্‌মেদাবাদে বর্ষা নেমেছে। জলে কাদায় পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে বেলা দশটা নাগাদ ভিসিতে গিয়ে খেয়ে-দেয়ে আবার ঘুরতে বেরুই। বিকেল অবধি ঘুরে ঘুরে একটু দিন থাকতে থাকতেই ভিসিতে গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে গ

জমাবার চেষ্টা করি—উদ্দেশ্য সেই সুন্দরীর রূপসুধা পান করা। তারপরে সেখানে অন্যান্য খদ্দের আসতে আরম্ভ করলেই খেয়ে-দেয়ে চ'লে আসি।

একদিন রাত্রিবেলা আশ্রয়ে ফিরে গিয়ে শুনলুম যে, সুকান্তর বাড়ি থেকে টাকা এসে গিয়েছে। আমরা বাড়িতে চিঠি লিখেছি কি না, সে বিষয়ে রমেশদা সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলেন। শেষকালে তিনি আমাদের কাছ থেকে বাড়ির ঠিকানা চেয়ে নিলেন। গত্যন্তর না দেখে সত্যি ঠিকানাই দিয়ে দিলুম।

পরের দিন সেখানকার ভিক্টোরিয়া পার্কে একটা বেঞ্চির ওপর ব'সে আমরা পরামর্শ করছি, এমন সময় দেখতে পেলুম দুটি গুজরাটী ভদ্রলোক পথ চলতে চলতে আমাদের দেখে দাঁড়িয়ে গেল। আহ্‌মেদাবাদে এসে অবধি এ রকম দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলুম। আশা করতে লাগলুম, এখুনি এগিয়ে এসে তারা প্রশ্ন করবে—কোথায় বাড়ি তোমাদের? তোমাদের মাথায় টুপি নেই কেন?

নিজেদের মধ্যে এই সব কথা বলাবলি করতে না করতে দেখলুম, তারা আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমাদের কাছাকাছি এসে তাদের মধ্যে একজন পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বললে, মশায়দের আমারই সমগোত্রীয় ব'লে বোধ হচ্ছে! কতদিন হ'ল ভেগেছেন?

সুকান্ত ব'লে উঠল, আসতে আজ্ঞা হোক। বুলি শুনে মনে হচ্ছে যেন একই গাছের বাসিন্দা আমরা। আমরা প্রায় ছ-সাত মাস হ'ল পাওয়া হয়েছি। আপনি?

—আমার প্রায় ছ-সাত বছর হবে।

—তা হ'লে তো আপনি আমাদের দাদা—বসতে আজ্ঞা হোক।

লোকটি তার সঙ্গীকে বললে, শেঠজী, আপনি দোকানে যান। এরা আমার দেশের লোক, এদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা ব'লে আমি আপনার ওখানে যাচ্ছি।

লোকটির কথা শুনে তার সঙ্গী আমাদের নমস্কার ক'রে তাকে বললে,

তা হ'লে আসবার সময় আপনার এই বন্ধুদেরও নিয়ে আসবেন, আমাদের ওখানেই চা খাবেন।

সঙ্গী চ'লে যেতে লোকটি আমাদের কাছে এসে বসলেন। মাথা থেকে টুপি খুলে ফেলে বললেন, ভাই, যস্মিন দেশে যদাচার। মাথায় টুপি না থাকার কৈফিয়ৎ দিতে দিতে মাথা বিগড়ে যাওয়ার পর এই টুপি ধরেছি।

ভদ্রলোকের বয়স পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। একহারা চেহারা। সুকান্ত ঠিকই ধরেছিল, কথায় সামান্য পূর্ববঙ্গীয় টান আছে, দিব্যি মজলিশী ও দিলখোলা লোক ব'লে মনে হ'ল।

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিলুম, দু-এক জায়গায় চাকরির চেষ্টা যে করি নি তা নয়, কিন্তু কোথাও কিছু হয়ে উঠল না। ছ-সাত বছর আগে একদিন কি রকম মনে হ'ল, বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে না পারলে আর কিছুই হবে ব'লে মনে হচ্ছে না। যাঁহা মনে হওয়া অমনি বেরিয়ে পড়া—নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে শেষকালে এক জংলী রাজার ওখানে চাকরি পেয়ে গেলুম। রাজার অন্যান্য কর্মচারীরা আমাকে প্রাইভেট সেক্রেটারি বলত, কিন্তু আসলে করতে হ'ত রাজার মোসাহেবি।

রাজা মশায় ঘুম থেকে উঠতেন দুপুর বারোটায়। তখন থেকে বেলা প্রায় তিনটে অবধি তাঁর সঙ্গে থাকতে হ'ত। ওই সময় তিনি স্নানাহার করতে চ'লে যেতেন, আমার ছুটি হ'ত। তারপর রাত্রি এগারোটার পর তিনি আবার দেখা দিতেন। রাজার তিন স্ত্রী থাকেন হারেমে আর তিনটি রক্ষিতা রাত্রিবেলা প্রাসাদে আসতেন—আসতেন মানে, প্রতিদিন একটি একটি ক'রে তাদের নিয়ে আসা ও রাত্রি তিন-চারটের সময় একটি একটি ক'রে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া—এই ছিল আমার খাশ ডিউটি।

রাজা বলতেন, প্রাইভেট সেক্রেটারিকেই এই সব প্রাইভেট কাজ করতে হয়।

রাত্রিবেলা রাজার সঙ্গে সমানে মদ খেতে হ'ত—মদ খেয়ে তাসখেলা ছিল তাঁর শখ। রাত্রি তিনটে অবধি তাস খেলে যেদিন যে রক্ষিতার ওপর প্রসন্ন হতেন তাকে রেখে অন্যদের ছুটি দিতেন।

এই রকম নিত্যি প্রাইভেট কাজ করতে করতে আমি একটির প্রেমে প'ড়ে গেলুম। শুধু আমি প্রেমে পড়লে ক্ষতি ছিল না, দুর্ভাগ্যক্রমে সেও আমার প্রেমে পড়ল। উভয়ে উভয়ের প্রেমে মশগুল—আমাদের আর দিনরাত্রি জ্ঞান নেই, এমন সময় ব্যাপারটা রাজার অন্যান্য কর্মচারীদের কানে উঠল। দু-একজন কর্মচারী আমাকে সাবধান ক'রে দিয়ে বললে, তুমি এখান থেকে পালাও, নইলে রাজা মশায়ের কানে যদি এই কথা ওঠে তবে আর প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে হবে না।

আমি স্থির করলুম, মরতে হয় মরব, তাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। ক্রমে প্রাসাদের প্রায় সবাই ব্যাপারটা জেনে গেল। শত্রু মিত্র সকলেই আমাকে পরামর্শ দিতে লাগল, পালাও—পালাও—নইলে মরবে।

আমি প্রতিদিন সকাল ও বিকালে লুকিয়ে যেতুম আমার প্রিয়তমার কাছে। সেদিন বিকেলবেলা সেখানে যাওয়ামাত্র সে বললে, তুমি এখুনি পালাও। আমি জানতে পেরেছি যে, আজ ওরা তোমাকে এইখানেই মেরে ফেলবে।

আমি বললুম, আমি মরতে রাজী আছি, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যাব না।

সে আমায় ধিক্কার দিতে লাগল। বললে, একটা বেশ্যার জন্যে এই অমূল্য মানব-জীবন কেন নষ্ট করবে? পালাও—পালাও, নইলে আমি মরব।

সে এক শিশি বিষ নিয়ে এসে বললে, এই দেখ আমি ঠিক ক'রে রেখেছি তোমাকে মারলেই আমিও বিষ খেয়ে মরব। আমায় যদি ভালবাস তো আমার কথা শোন—এখুনি পালাও।

সে-ই আমায় কতকগুলো টাকাকড়ি দিলে। নিজের সব জিনিস, এমন কি টাকাকড়ি পর্যন্ত সব প্রাসাদে প'ড়ে রইল—আমি সেই এক কাপড়েই বেরিয়ে পড়লুম।

বললুম, দাদা তো একেবারে বিল্বমঙ্গল! "ভেবে দেখ মন, কত তোরে নাচায় নয়ন। ছিলি ব্রাহ্মণকুমার—"

ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন, ব্রাহ্মণকুমার নয় ভাই—আমি কায়স্থ-কুমার। নাম উপেন্দ্রনাথ ঘোষ। সেই থেকে আজ বছর দেড়েক ধ'রে ঘুরেই বেড়াচ্ছি। এই অবধি ব'লে ভদ্রলোক বললেন, এবার ভাই তোমাদের কথা বল। নিজের কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে উঠেছি।

আমরা আমাদের কাহিনী বললুম এবং বর্তমানে অবিলম্বেই একটা সুরাহা না হ'লে যে পিঞ্জরাবদ্ধ হতে হবে সেটাও জানিয়ে ফেললুম। ভদ্রলোক বললেন, কুছ পরোয়া নেই—সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি ভাই সঙ্গীর অভাবে বড় কষ্ট পাচ্ছি। সারাজীবন ধ'রে আড্ডাই মেরে এসেছি। বুদ্ধিশুদ্ধি সবই ছিল, কিন্তু আড্ডার জন্যে কিছুই করতে পারি নি। এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, এই নিঃসঙ্গ জীবন অবসান ক'রে দিই। একলা এই বাগানের নির্জন কোন জায়গায় ব'সে কবিতা লিখি, নয় তো ব'সে ব'সে ভাবতে থাকি আমি কি হতে পারতুম আর কি হয়েছি! এবার ভগবান যখন তোমাদের মিলিয়ে দিয়েছেন তখন আর ছাড়ছি না। আমরা চারজনে মিললে কত কাজ করতে পারি।

দেখলুম, ভদ্রলোক আমাদের চাইতেও আশাবাদী। তার কথা শুনতে শুনতে আবার আশায় বুক ভ'রে উঠতে লাগল। পৃথিবী আবার সোনার রঙে রঙিন হয়ে উঠল। উপেনদাকে বললুম, এক্ষুনি আহ্‌মেদাবাদ থেকে আমাদের স'রে পড়তে হবে, অথচ ট্যাঁকে একটি কপর্দকও নেই।

উপেনদা বললে, কুছ পরোয়া নেই—আমার কাছে একশোটা টাকা আছে। তা ছাড়া ওই যে গুজরাটী লোকটি আমার সঙ্গে দেখলে সোনারূপোর গয়না তৈরি করে—ওকে আমি শান-পালিসের কাজ সে কাজের জন্যে শানটা কি দিয়ে তৈরি করতে হয় তা শিখিয়ে দিয়েছি—

এখানকার কেউ তা জানে না। এ জন্যে ওর কাছ থেকে একশোটা টাকা পাব। এই দুশো টাকায় আমাদের অন্তত দু-মাস তো চলবে—তারপরে দেখা যাবে কি হয়।

বাগান থেকে উঠে আমরা সেই গুজরাটী স্যাকরার ওখানে গেলুম। মাঠকোঠার মতন বাড়ির দোতলায় রাস্তার দিকের একখানা ঘরে দোকান। দক্ষিণ দেশে ছোট বড় প্রায় সব বাড়িতেই বসবার ঘরে একটা ক'রে কাঠের দোলনা টাঙানো থাকে। একখানা কাঠের বড়-গোছের পিঁড়ি যাতে জন দুই লোক বসতে পারে—তারই চার কোণে ছ্যাদা ক'রে লোহার শিক বা শিকল দিয়ে ছাতের সিলিংয়ে টাঙানো হয়। এই দোলনা খুব খাতিরের আসন। আমরা উপস্থিত হওয়া মাত্র দোকানদার খাতির ক'রে দুজনকে সেই দোলনায় বসালে। খবর পাওয়া মাত্র দোকানদার ও আরও অন্যান্য বাড়ির মেয়েরা আমাদের অর্থাৎ বাঙালীদের দেখতে আসতে লাগল। দেখলুম, দোকানদার ও তার বাড়ির মেয়েরা উপেনদাকে একেবারে দেবতার মত ভক্তি করে। চায়ের কথা বলামাত্র তখুনি ডালচিনির আরক দেওয়া চা এসে হাজির হ'ল—বিড়িও এসে পড়ল এক বাণ্ডিল। বিস্কুটের টিন হাতছাড়া হওয়ার পর থেকে চায়ের আস্বাদ ভুলেই গিয়েছিলুম। কয়েকদিন পরে চা খেয়ে বিড়ি টেনে ধাতস্থ হওয়া গেল। খানিক পরে দোকানদার উপেনদার শেখানো সেই 'শান' বের করলে। সেটাকে কি ক'রে বসিয়ে কেমন ক'রে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গয়না পালিশ করতে হয় তা উপেনদা দেখিয়ে দিতে লাগল।

সব দেখাশোনা হয়ে গেল বটে, কিন্তু টাকা সেদিন পাওয়া গেল না—দোকানদার বললে, কাল তিনটের মধ্যে নিশ্চয় টাকা দিয়ে দেবে।

সেখান থেকে বেরিয়ে একটা চায়ের দোকানে ঢুকে চা খেতে খেতে আমরা পরামর্শ করতে লাগলুম, কি করা যায়! ঠিক করা গেল স্যাকরার কাছ থেকে টাকাটা আদায় হ'লেই কাল চারটের ট্রেনে আমরা আহমেদাবাদ ত্যাগ ক'রে বরোদা যাব।

সে সময় রমেশচন্দ্র দত্ত মশায় ছিলেন বরোদা রাজ্যের দেওয়ান। স্থির করা গেল যে, সেখানে গিয়ে তাঁকে ধ'রে সে রাজ্যে একটা কাজ জুটিয়ে নেব। সেখানে কিছু না হয়, চ'লে যাব সুরাটে—সেখানে না হয় বোম্বাই শহরে। আমরা চারজনেই চিরদিন কিছু বেকার ব'সে থাকব না। একজনের একটা কিছু জুটে গেলেই ক্রমে সকলেরই হবে—তারপরে ব্যবসা তো আছেই।

পরামর্শ ঠিক হয়ে যাবার পর উপেনদার কাছ থেকে বিদায় নেওয়া গেল। কথা রইল, কাল বেলা তিনটের মধ্যে আমরা সেই স্যাকরার ওখানে গিয়ে জুটব। উপেনদা আমাদের এই বিপদের সময় যে রকম ঈশ্বরপ্রেরিত হয়ে উপস্থিত হলেন, তাতে মনে হতে লাগল ভগবান বুঝি এতদিন বাদে আমাদের পানে মুখ তুলে চাইলেন।

মহা উৎসাহ বুকে নিয়ে ভিসিতে গিয়ে উপস্থিত হওয়া গেল। আমাদের সুন্দরী সেই ঘাড় হেঁট ক'রে রুটি বেলে চলেছেন। মনে মনে বলতে লাগলুম, তোমায় ছেড়ে চললুম সুন্দরী। তুমি রুটি বেলছ বটে, কিন্তু এখানে আমার রুটির সংস্থান হ'ল না। তার ওপরে তোমার মতন রূপসীর যেখানে আগুনের সামনে ব'সে দিনরাত রুটি বেলতে হয়—রূপের উপাসকের অবস্থা সেখানে আর কি হবে! তবুও তোমায় নিয়ে চললুম বুকের মধ্যে ক'রে—সারাজীবন তুমি সেইখানেই থাকবে।

প্রাণপণে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে লাগলুম, যদি একবার সে ঘাড় তুলে আমার দিকে চায়। কিন্তু ইচ্ছাশক্তি যদি ঈপ্সিতের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারত, তবে অধিকাংশ সুন্দরীর পক্ষেই দুনিয়ায় বাস করা অসম্ভব হ'ত। খাওয়া শেষ হয়ে যাবার পরও অনেকক্ষণ ব'সে থাকলুম, কিন্তু প্রেয়সী মুখ তুললে না দেখে আস্তে আস্তে ভিসি থেকে বেরিয়ে এলুম।

পরের দিন ছেলেরা সকালবেলাকার কাজ সেরে বাড়ি ফেরবার আগেই স্নান সেরে আমাদের ছোট ছোট পুঁটলিগুলি বগলদাবা ক'রে বেরিয়ে পড়লুম। তাড়াতাড়ি আহারপর্ব শেষ ক'রে ভিক্টোরিয়া বাগানে

বেলা প্রায় আড়াইটে অবধি কাটিয়ে সেই স্যাকরার ওখানে গিয়ে হাজির হওয়া গেল। গিয়ে দেখি, উপেনদা সেখানে খুব জমিয়েছে। তার চারদিকে স্যাকরার ও তার প্রতিবেশীদের বাড়ির মেয়েরা বসেছে—তাদের মধ্যে ফলাও ক'রে সে গীতার মাহাত্ম্য বোঝাচ্ছে।

আমরা উপস্থিত হতেই সে বললে, ওই দেখ আমার বন্ধুরা এসে পড়েছে, বেলা চারটেয় আমাদের গাড়ি। এবার আমায় বিদায় কর।

উপেনদার কথা শুনে স্যাকরা উঠে গিয়ে তার প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুক খুলে একটা আংটি বার ক'রে এনে তার আঙুলে পরিয়ে দিলে। উপেনদা তখুনি আংটিটা আঙুল থেকে খুলে হাতের তেলোয় ফেলে ওজন দেখে বললে, তা আধ ভরির ওপর হবে হে!

ইতিমধ্যে স্যাকরা আর একটি বাক্স খুলে তিন খানা দশ টাকার নোট নিয়ে উপেনদার সামনে ধরতেই সে তো চটে আগুন! সে বলতে লাগল, কি! এই ক'টি টাকার জন্যে কি আমি তোমাদের এই গুপ্তবিদ্যা শিখিয়ে দিলুম!

দুই পক্ষে ধস্তাধস্তি লেগে গেল। উপেনদাও নেবে না, তারাও এর বেশি দেবে না—শেষকালে স্যাকরা-গিন্নী তার আঁচলের খুঁট খুলে আর একটা দশ টাকার নোট বের ক'রে বললে, আমরা তোমার ছেলেমেয়ে, এই নিয়ে ছেলেমেয়েদের অব্যাহতি দাও।

উপেনদা বললে, তা হ'লে আমার এক পয়সাও চাই না। আমি মনে করব আমার ছেলেমেয়েদের একটা বিদ্যা শিখিয়ে দিয়েছি।

উপেনদা আমাদের দিকে ফিরে বললে, চল ভায়া, আমাদের ট্রেনের দেরি হয়ে যাচ্ছে। ঘরের এক কোণে তার ছোট বিছানা বাঁধা প'ড়ে ছিল, সেই পুঁটলিটা তুলে বগলদাবা ক'রে উপেনদা তাদের বললে, আচ্ছা, তা হ'লে চললুম, তোমাদের ভাল হোক।

উপেনদার কাণ্ড দেখে স্যাকরা, স্যাকরা-বউ কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিলে। শেষকালে তারা আরও দশটা টাকা বের করতে তবে শান্তি হ'ল।

একখানা টাঙ্গা ভাড়া ক'রে তখুনি ছুটলুম স্টেশনে। উপেনদাকে বললুম, দাদা, টিকিট কিনে ট্রেনে চড়া তো একদম ভুলেই গিয়েছি।

উপেনদা বললে, ট্যাঁকে যখন পয়সা রয়েছে তখন টিকিট কিনতে আপত্তি হওয়া উচিত নয়। ট্যাঁকে যখন থাকে না তখন আমিও টিকিট কাটি না। ব্রাদার, এ সবই 'গিভ্ অ্যাণ্ড টেক্'-এর প্রশ্ন।

টিকিট কাটা হ'ল বটে, কিন্তু তবুও বিনা টিকিটের যাত্রী হয়ে এসে এই স্টেশনে যে ধরা পড়েছিলুম, সে কথা ভুলি নি। তাই অতি সন্তর্পণে চেকারদের এড়িয়ে একখানা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় ঢুকে পড়া গেল।

আহমেদাবাদ থেকে বরোদা খুব বেশি দূর নয়। বরোদায় গিয়ে যখন গাড়ি পৌঁছল, তখন সন্ধ্যে হতে দেরি আছে। স্টেশনে নেমেই দেখি, সামনেই দু-তিনজন প্যাণ্টালুনধারী লোক দাঁড়িয়ে—তাদের মধ্যে এক-জনের হাতে একখানা মোটা বাঁধানো খাতা। লোকগুলো যেন আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যেই দাঁড়িয়েছিল। আমরা প্ল্যাটফর্মে পদার্পণ করা-মাত্র তাদের মধ্যে একজন বেশ একটু অভ্যর্থনাসূচক হাসি হেসে বললে, আসুন। কোথা থেকে আসা হচ্ছে মশায়দের?

আজ্ঞে, আমরা আসছি এই আহ্‌মেদাবাদ শহর থেকে।

কিন্তু আপনাদের দেখে তো গুজরাটের লোক ব'লে মনে হচ্ছে না! দেশ কোথায় বলতে আজ্ঞা হয়।

বললুম, আমাদের দেশ বাংলা দেশে।

লোকটি তার সঙ্গীদের দিকে চেয়ে একটু অর্থসূচক হাসি হেসে বললে, তাই বলুন। এখন আমাদের সঙ্গে আসতে আজ্ঞা হয়।

লোকটির সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যাটফর্মের পুলিস-আপিসে যাওয়া গেল। তারা খাতির ক'রে বসবার জন্যে আমাদের টুল দিলে।

(ক্রমশ)

"মহাস্থবির"

উলুখড়

কাতি মেহ্‌তর হো—এ কাতি মেহ্‌তর।

আর্ত চিৎকারে আমার তন্দ্রা টুটে যায়। বিরক্তির সঙ্গে পাশের বেডের দিকে দৃষ্টিপাত করি। চোখ, কান ও নাকের কাছে কয়েকটি ছোট ছোট ফুটো ছাড়া লোকটার আপাদমস্তক নিরেট প্ল্যাস্টার দিয়ে বাঁধা। তার গলার স্বর প্ল্যাস্টারের ভেতর থেকে অদ্ভুত রকম বিকট হয়ে বেরিয়ে আসছে।

এ মেহ্‌তরোয়া, কাঁহা গয়োরে? জলদি আ।—আবার আর্তনাদ ক'রে ওঠে লোকটা।

কোন জবাব মেলে না। জমাদার বোধ হয় ঘুমোচ্ছে।

খুব কম পাওয়ারের দুটো বাল্‌ব্ ওয়ার্ডের দুদিকে জ্বলছে। আলোর চেয়ে অন্ধকারই বেশি। ওয়ার্ড প্রায় শূন্য। বারোটি বেডের মধ্যে আটটি খালি। বাকি চারটের মধ্যে সামনেরটি আজ শেষরাত্রেই খালি হয়ে যাবে—রুগীটির শ্বাস উঠেছে। আর আমার পাশের ওই ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা লোকটির পরমায়ু নাকি বড়জোর আগামী কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত, ডাক্তার বলেছেন। রুগীদের মৃত্যু বিষয়ে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয় না কখনও, এ অবধি সকলেই জানে।

দুটো দিন একটু কষ্ট ক'রে থাকুন স্যার।—ডাক্তার একটু হেসে বলেছিলেন আমাকে। ব্যাস্, তারপর পুরো একটি খালি ওয়ার্ড আপনার সেবায় লাগিয়ে দোব। কেবিনেরও বড় হয়ে যাবে এত বড় ওয়ার্ড।—ব'লে হো-হো ক'রে হেসে উঠেছিলেন তিনি। যেন কতবড় একটা রসিকতা ক'রে ফেলেছেন।

এ মেহ্‌তর, এ জমাদার। লোকটার চিৎকার অসম্ভব রকম তীব্র হয়ে ওঠে। অধৈর্য হয়ে উঠে ব'সে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চিৎকার ক'রে ডাকলাম আমি, জমাদার—জমাদার।

আমার ডাকে ফল হ'ল। জমাদার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে ঘরে ঢুকে বললে, বোলাতেঁ হায় হুজুর?

আমি পাশের বেডের দিকে চেয়ে বললাম, উধার ইউরিন্যাল দেও।

ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা লোকটার দিকে হিংস্রদৃষ্টিতে চেয়ে জমাদার বললে, শালা হামারা জান্ নিকাল দেগা। মরতা কাহে নেহি ?

মার ডাল্ না ভেইয়া।—লোকটা কেঁদে ওঠে।—এতনা তকলিফ দেকে বাঁচা রখতা হায় কাহে ? তুরন্ত মার ডাল্। এ রুক্মিণী! হামার বিটিয়ে রে!

ঘাবড়াতে কেঁও রে?—হাসতে হাসতে জমাদার বললে, মরেগা তো জরুর। লেকিন কাল তক্ জিন্দা রহনা চাহিয়ে। পুলিস এনকোয়ারি হোগা। এস. পি. সাহেব শহরমে হায়। উস্কা—

জমাদার!—আমি ধমক দিয়ে উঠি।

জমাদার চুপ করল। ভীরু দৃষ্টি তুলে আমার মুখের পানে চেয়ে ইউরিন্যালটি তুলে ধরে সে।

জমাদার চ'লে যেতে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে লোকটি ডাকলে, বাবু, এ বাবু! প্ল্যাস্টারের ফুটোর মধ্যে তার জলভরা কাতর চোখ দুটি দেখতে পাচ্ছিলাম।

কি রে?—আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকাই তার পানে।

হামার বিটিয়াকো লা দে সরকার।—লোকটা কাতরস্বরে ব'লে ওঠে. আরে মেরে বিটিয়া রে, তোহার মানা না শুনল্কর ক্যা হালৎ ভওল হামার! দেখ্ যা রে রুক্মিণী! আবার কান্নায় ভেঙে পড়ে সে।

ভাঙা হিন্দীতে আমি বললুম, কেঁদো না। তোমার মেয়ের কাছে খবর নিশ্চয় পৌঁছে গেছে। কালই সে আসবে তোমাকে দেখতে।

লোকটা একটু শান্ত হ'ল। সজল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত আমার মুখের পানে চেয়ে থেকে সে বললে, সাচ সরকার! হামার বিটিয়া আইবো কাল ?

নিশ্চয়।

আমার মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে শান্ত হয়ে শুয়ে রইল সে কিছুক্ষণ। তারপর অনেকটা আত্মগতভাবে সে ব'লে চলে, তনিভর রখ্কর উনকি মাতারি মর্ গয়ী। তবসে হামহি পালিন বেটিয়াকো। তনিভরসে এত্তৎ বড়া হুয়ী—বাপকো ছোড়কর কভি ন রহলকে।

হামতো মর যাউব—বিটিয়াকো কৌন্ খিলাইবো, কৌন দেখবো? জান-পঁহচান হামার কোই নেহিবা!

হঠাৎ বিকট একটা গোঙানিতে লোকটার বিলাপ চাপা প'ড়ে যায়। আওয়াজ আসছিল আমার সম্মুখের বিছানা থেকে। চমকে উঠে চেয়ে দেখলুম, মরণাপন্ন রুগীটির চোখ দুটি অসম্ভব রকম বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে—যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেছে তার সর্বাঙ্গ।

রীতিমত ভয় পেয়ে আমি চিৎকার ক'রে উঠলুম, জমাদার!

জমাদার জেগেই ছিল বোধ হয়—দুবার ডাকতে হ'ল না তাকে। ঘরে ঢুকে সে বললে, ক্যা হুয়া হুজুর?

আমার মুখে কোন কথা ফুটল না। কম্পিত হাত তুলে আঙুল দিয়ে সামনের বিছানাটি দেখিয়ে দিলাম আমি।

বিছানাটির দিকে কয়েক মুহূর্ত নিস্পৃহ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে জমাদার বললে, এ তো মরতেঁ হায়। পাঁচ মিনিটমে খতম্ হো জায়েগা—ঘাবড়াইয়ে মাত্।

অ্যাঁ!—আর্তনাদ ক'রে উঠি আমি, ডাক্তারবাবুকে তাড়াতাড়ি খবর দাও তা হ'লে।

ডাক্তারবাবু সোতেঁ হায়।—জমাদর গম্ভীর মুখে বললে, খবর দেনেকা হুকুম নেহি।

আমি নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকি তার মুখের দিকে। তারপর আবার বললাম, নার্সকো বোলাও তব্।

আয়ে বাপ!—আমার প্রস্তাব শোনামাত্র চমকে ওঠে জমাদার।—হামকো মার ডালেগী মেমসাহেব। উভি সোতী হায়।—ব'লে সে বেরিয়ে গেল ওয়ার্ড থেকে।

রুগীর দেহ ততক্ষণে অনেকটা স্থির হয়ে এসেছে। কিন্তু চোখ দুটি অস্থির ভাবে সঞ্চালিত হচ্ছে ইতস্তত। যেন কাকে খুঁজছে সে।

হঠাৎ তার দৃষ্টি এসে পড়ল আমার মুখের ওপর। আমার মুখে এসেই গেল আটকে। তারপর ধীরে ধীরে তার দেহের সমস্ত স্পন্দন গেল বন্ধ হয়ে।

দেহে প্রাণ নেই—পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু উন্মীলিত চোখ দুটি অসম্ভব রকম জীবন্ত। একটা উগ্র ভর্ৎসনা যেন চোখ দুটো থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে বিদ্ধ করছে।

একটা ঠাণ্ডা শিহরণ আমার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, জমাদার!

ঘরে ঢুকে রূঢ়কণ্ঠে জমাদার বললে, কেয়া বাত্? কিয়া হুয়া আপকো? চিল্লাচিল্লি করতেঁ হায় কাহে?

পাংশুমুখে জমাদারের মুখের পানে চেয়ে কম্পিত স্বরে আমি বললুম, লোকটা ম'রে গেছে জমাদার। ওকে সরিয়ে নিয়ে যাও এ ওয়ার্ড থেকে।

মৃতদেহটির দিকে এক পলক দৃষ্টিপাত ক'রে জমাদার বললে, মর্ তো গিয়া! লেকিন হটানা কেইসে হিঁয়াসে? ডাক্তার সাবকা হুকুম বিনা হটানা মানা হায়।

তা হোক। সরিয়ে নিয়ে যাও ওকে তুমি। নইলে আমার বিছানাটি নিয়ে চল বারান্দায়।

ঠিক হায়—ওহি কর্ দেতেঁ হায়। উতারিয়ে আপ।

বিছানা থেকে আমি নেমে পড়লুম। সে খাটটিকে দরজার ভেতর দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে বাইরে নিয়ে এল। তারপর আমার মুখের পানে তীব্র দৃষ্টি হেনে বললে, লিজিয়ে, শো যাইয়ে। আওর গোলমাল মাৎ কিজিয়ে। শান্ত সুবোধ ছেলের মত বিছানায় উঠে শুয়ে পড়লাম আমি। জমাদার চ'লে গেল।

কৃষ্ণপক্ষের নিরেট অন্ধকার আমাকে ঘিরে ফেলে। রাস্তার কয়েকটি মিটমিটে আলো অন্ধকারের গাঢ়তার পরিমাপ ক'রে জ্বলতে থাকে।

হাসপাতালের দেউড়িতে ঢং ঢং ক'রে দুটো বাজল।

আকাশের তারাগুলোর দিকে চেয়ে আমার চোখ দুটি হঠাৎ জলে ভ'রে আসে। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের স্নেহ ও সাহচর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে চ'লে এসেছি বিহারের এই ছোট্ট শহরটিতে। এই নির্বান্ধব শহরের এক প্রান্তে তাঁবু ফেলে কতকগুলো দুর্লভ খনিজ পদার্থের সন্ধানে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। তারপর হঠাৎ পড়লাম জ্বরে

কাউকে চিনি না এখানে। তাই এসেছি হাসপাতালে। ডাক্তারের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও।

ডাক্তারের আপত্তির কারণটি পরিস্ফুট হয়েছে এখন। যাদের মাথা গোজবার ঠাঁই নেই, রোগের চিকিৎসার জন্য এক কপর্দকও খরচ করবার সামর্থ্য নেই, একমাত্র সেই সব নিরুপায় হতভাগ্যের দল এখানে আসে। তাদের দলে অবস্থাগতিকে আমাকে ভিড়তে হয়েছে।

বিশ্বসংসারের ওপর একটা নিদারুণ অভিমান আমার বুকের ভেতর উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

ঘুম ভাঙল ডাক্তারবাবুর ডাকে। চোখ মেলে চেয়ে দেখলুম, বারান্দা রোদে ভেসে যাচ্ছে, বেলা অনেক হয়েছে।

কি মশাই? ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, বাইরে এসে শুয়েছেন যে? নিন উঠুন, বিছানাটা ভেতরে নিয়ে যাক ওরা। এ জমাদার, এ কাতি—

চোখ রগড়াতে রগড়াতে বিছানা থেকে নেমে পড়লুম আমি। আবার বিছানাটা ঠেলতে ঠেলতে ওয়ার্ডের ভেতর ঢোকানো হ'ল।

ওয়ার্ডে ঢুকে প্রথমেই চোখে পড়ল আমার সুমুখের শূন্য বিছানাটি। তাতে নতুন একটি চাদর পাতা, বালিশের ওয়াড়গুলোও বদলানো হয়েছে। নির্নিমেষে চেয়ে থাকি আমি।

আমার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে বিছানাটির দিকে চেয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, কেমন, বলেছিলুম না, শেষরাত্রের মধ্যেই লোকটা টেঁসে যাবে? দেখলেন তো, সুনীল ডাক্তার যা বলে তার এক চুল এদিক ওদিক হয় না। ব'লে বোধ হয় তাঁর উক্তির সমর্থনে কিছু শোনবার আশায় আমার মুখের পানে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকালেন তিনি। কিন্তু আমি নির্বাক। সুমুখের বিছানার শূন্যতা আমার কথা বলবার শক্তি যেন কেড়ে নিয়েছে। আমার মৌনতায় বোধ হয় ক্ষুণ্ণ হলেন ডাক্তারবাবু। অপ্রসন্ন-দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চেয়ে দেয়াল থেকে আমার জ্বরের চার্টটি টেনে নিয়ে এলেন তিনি। তারপর মুখে যথাসম্ভব একটা প্রফেশন্যাল গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুলে বললেন, মোটামুটি ভালই আছেন দেখছি। কাল সকালে জ্বর ছিল নিরানব্বই ডিগ্রী, সন্ধ্যাবেলা একশো।

কিন্তু একটু ইতস্তত ক'রে আমি বললুম, জ্বরটা দুপুরের দিকে খুব বেশি হয়েছিল।

আই অ্যাম নট কনসার্নড উইথ দ্যাট।—ডাক্তারবাবু গম্ভীরমুখে বললেন, তার কোন রেকর্ড তো নেই চার্টে!

আমি সবিস্ময়ে ডাক্তারবাবুর মুখের পানে চেয়ে থেকে বললুম, দুপুরবেলা জ্বরটা দেখলেই তো রেকর্ড থাকে ডাক্তারবাবু।

সে কি ক'রে হয়? ডাক্তারবাবু ঝাঁঝালো স্বরে ব'লে ওঠেন, জ্বর না হয় দেখলাম, কিন্তু জ্বরটা এন্‌ট্রি কোথায় করব? জাস্ট হ্যাভ এ লুক অ্যাট দি চার্ট।

চার্টটি হাতে নিয়ে দেখলুম, প্রত্যেকটি তারিখের তলায় মাত্র দুটি ক'রে ঘর, একটির মাথায় 'মর্নিং ও অন্যটির মাথায় 'ইভনিং' লেখা রয়েছে ছোট্ট ছোট্ট অক্ষরে।

আমার হাত থেকে চার্টটা এক রকম ছিনিয়ে নিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, এখন বুঝতে পারছেন তো, ভোর আর সন্ধ্যে—মাত্র দুটি বার ছাড়া আর জ্বর দেখার নিয়ম নেই আমাদের? আর ইউ স্যাটিসফায়েড?

সকৌতুকে ডাক্তারবাবুর মুখের পানে চেয়ে থেকে আমি বললুম, নিশ্চয়ই। আপনি বে-আইনী কাজ করবেন, এতটা আশা করবার মত ধৃষ্টতা আমার নেই।

ডাক্তারবাবুর মুখ এবারে খানিকটা প্রসন্ন হয়ে ওঠে। চার্টটা আবার দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে তিনি বললেন, আজকেও কালকের ডায়েট চলুক আপনার। এম. আর. না হয় কাল খাবেন।

এম. আর.?

মানে মিল্ক রাইস্। জ্বরটা একদম ছেড়ে না গেলে—

হঠাৎ টেবিলের ওপর রাখা কুইনিন মিক্‌শ্চারের বোতলের দিকে দৃষ্টি পড়তেই তাঁর মুখের কথা মুখেই থেকে গেল।—কাল রাত্তিরে তো ওষুধ খান নি আপনি! আবার প্রফেশন্যাল গাম্ভীর্য এসে গেল তাঁর মুখে।

মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললুম, না, এই—ভুলে গিয়েছিলুম।

হ্যাট অউন্ট্ ডু। খেয়ে ফেলুন এখন। এক দাগ শুধু নয়—কাল রাত্রের দাগসুদ্ধ দু দাগ।

মিক্শ্চারের বোতলটি হাতে নিয়ে ছিপিটা খুলে আলগোছে মুখের মধ্যে ওষুধ ঢালতে থাকি আমি। হাসপাতালে ওষুধ খাবার বা অন্য কোনও রকমের গেলাস পাওয়া যাবে না। ভর্তি হবার সময়েই ডাক্তারবাবু আমাকে ব'লে দিয়েছেন—এখানে থাকতে হ'লে আলগোছে ওষুধ খাবার অভ্যাস রপ্ত করতে হবে, গেলাসে ওষুধ খাবার বাবুয়ানি চলবে না। দু দাগের জায়গায় আড়াই দাগ ওষুধ খেয়ে বিকৃতমুখে শুয়ে পড়লুম একটি লবঙ্গ মুখে পুরে।

এখন চুপচাপ শুয়ে থাকুন আপনার এস. ডি. যতক্ষণ না আসছে।

এস. ডি.—মানে সাবুদানা।

এমন সময় একজন ক্ষীণকায় প্রৌঢ় ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলেন ওয়ার্ডের মধ্যে। ইতস্তত চঞ্চল দৃষ্টি সঞ্চালিত ক'রে অনেকটা আত্মগত-ভাবে বলতে থাকেন তিনি, ভোজো কই ? ভোজো ?

ডাক্তারবাবু কঠিন স্বরে বললেন, নো ভোজো হিয়ার। পুরো নাম বলুন। শুধু ভোজো ব'লে খুঁজলে ইউ অউন্ট্ ফাইণ্ড হিম আউট।

ডাক্তারবাবুর মুখের পানে ভীরু দৃষ্টি তুলে ভদ্রলোক বললেন, আজ্ঞে, অন্য কোন নাম যে জানি না। দশ বছর ধ'রে ভোজো ব'লে ডেকে এলুম—ওই নামেই সাড়া দিয়ে এয়েছে। বেঁটেখাটো কালোমত লোকটা। জাতে কাহার।

বেঁটেখাটো কালোমত শত শত লোক এখানে এসে ভর্তি হচ্ছে—সেরে উঠছে, টেঁসে যাচ্ছে, অ্যাণ্ড সো অন্। শুধু বেঁটেখাটো কালো বললেই চলবে না। নাম চাই—প্রপার নেম্ ইন্ ফুল।

ভোজো কি তা হ'লে বেঁচে নেই !—ভদ্রলোক কাঁদো কাঁদো মুখে ব'লে উঠলেন।

আমি তো সে কথা বলি নি। হি মে অর মে নট বি লিভিং। বেঁচে থাকার ও ম'রে যাওয়ার চান্স ফিফ্‌টি টু ফিফ্‌টি—বুঝেছেন ? কোথা থেকে আসছেন বলুন ? আপনার ভোজোর কি অসুখ হয়েছে ?

আজ্ঞে, আমি আসছি সুরযগড় থেকে। সুরযগড় এস্টেটের নায়েব আমি। আমার নাম ষষ্ঠী চক্কোত্তি। ভোজো দাঙ্গায় জখম হয়ে এখানে এয়েছে।

এবারে বুঝেছি। আপনার ভোজো আপনার পেছনের বেডে। লুক বিহাইণ্ড্।

ষষ্ঠীবাবু পিছন ফিরে আপাদমস্তক ব্যাণ্ডেজবন্দী লোকটির দিকে বিস্ফারিত চোখে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে আর্তস্বরে ব'লে উঠলেন, কি বলছেন ডাক্তারবাবু—এর ভেতরে ভোজো রয়েছে ? আমাদের ভোজো কাহার ?

নিশ্চয়ই রয়েছে। ইট ইজ নট এ ডল্ অব প্ল্যাস্টার।

ষষ্ঠীবাবু সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে ডাক্তারবাবুর মুখের পানে একবার তাকিয়ে ভজুয়ার বিছানার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর প্ল্যাস্টারের ওপর গোটা দুই টোকা মেরে তিনি বললেন, ভোজো, অ ভোজো, আচিস তুই ?

ব্যাণ্ডেজের স্তূপটি ন'ড়ে ওঠে একটু। যন্ত্রণাবিকৃত স্বর বেরিয়ে আসে তার ভেতর থেকে, কোউন রে ? রুক্মিণী, আগয়ী তু ?

আমার গলা কি তোর রুক্মিণীর গলার মত শোনাচ্ছে রে বাপধন ?—ষষ্ঠীবাবুর মুখের গোঁফদাড়ির জঙ্গলের মধ্যে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে।—তা শোনাতেও বা পারে। ওর ভেতর থেকে শুনতে যে পাচ্চিস এই আশ্চর্যি! তারপর ভজুয়ার মাথার খুব কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন, আমি তোদের ম্যানেজারবাবু রে ভোজো, আমার গলা চিনতে পাচ্চিস না ?

ও, মানিজারবাবু, তু আ গয়া! হামার বিটিয়াকো লা দে মানিজারবাবু।—সকরুণ মিনতি ফুটে ওঠে ভজুয়ার ক্রন্দনকম্পিত কণ্ঠে।

কাঁদিস নে রে ভোজো। গাঁয়ে ফিরে গিয়েই পাঠিয়ে দিচ্চি রুক্মিণীকে তোর।

এই তা হ'লে আপনার ভজুয়া ?—ষষ্ঠীবাবুর পাশে এসে দাঁড়িয়ে ডাক্তারবাবু বললেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ। গলার স্বর ভোজোরই বটে। তা কেমন বুঝচেন ডাক্তারবাবু ? বাঁচবে তো ?

মুখে যথাসম্ভব প্রফেশন্যাল গাম্ভীর্য এনে ডাক্তারবাবু বললেন, না, এর আয়ু বড় জোর বেলা দেড়টা দুটো পর্যন্ত।

অ্যাঁ!—পাংশু হয়ে ওঠে ষষ্ঠীবাবুর মুখ।—তা হ'লে উপায়! পুলিস-সুপার যদি ওই সময়ের মধ্যে না এসে পৌঁছোন!

তা হ'লে পোস্ট্ মর্টেম্ রিপোর্ট নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে আপনাদের। মড়াকে জেরা করা চলবে না বোধ হয়।

ডাক্তারবাবুর একটি হাত খপ ক'রে ধ'রে ফেলে মিনতিপূর্ণ স্বরে ষষ্ঠী-বাবু বললেন, না না, আপনার দুটি পায়ে পড়ি ডাক্তারবাবু। ভোজোকে অন্তত বিকেল চারটে পাঁচটা পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখুন। পুলিস এন্‌কোয়ারি ওই সময়ের মধ্যেই হয়ে যাবে। তারপর মরে মরুক, বাঁচে বাঁচুক—কিছু এসে-যায় না।

ব্যঙ্গের হাস হেসে ডাক্তারবাবু বললেন, আপনি বরং যমরাজার দোরে গিয়ে ধন্না দিন। হি মে হেল্‌প্ ইউ। কিন্তু আমি নাচার। সো ফার অ্যাজ আই নো, এই লোকটা দেড়টা থেকে দুটোর মধ্যেই মারা যাবে। এ বিষয়ে আমার কথার একচুল নড়চড় হবার জো নেই। ওই ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস ক'রে দেখতে পারেন—ইনি সাক্ষী আছেন।

কিন্তু ডাক্তারবাবু, মামলা যে ফেঁসে যাবে! ভোজোর জবানবন্দী না হ'লে মামলা দাঁড়াবে কিসের ওপর?

দ্যাট্‌স্ নট মাই লুক আউট।—ব'লে ডাক্তারবাবু গম্ভীরমুখে ওয়ার্ড থেকে গট্ গট্ ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

আমার বেডের পাশে রাখা একটি কাঠের টুলের ওপর ধপ ক'রে ব'সে পড়লেন ষষ্ঠীবাবু। আমার মুখের পানে বিপন্নের মত মুখভঙ্গী ক'রে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে তিনি বললেন, কি বিপদ বলুন তো! ওদিকে হাসগড়ের রাজাসাহেব পুলিস-সুপারকে নিয়ে খানাপিনায় মেতে উঠেছেন। কখন যে ওঁরা আসবেন তার ঠিকঠিকানা নেই।

বিছানার ওপর উঠে ব'সে আমি বললুম, ব্যাপার কি বলুন তো? লোকটা এমন জখম হ'ল কি ক'রে?

আর বলবেন না মশাই!—ষষ্ঠীবাবু বিরক্তিবিকৃত মুখে ব'লে ওঠেন, ষাঁড়ে ষাঁড়ে যুদ্ধ হয়—উলুখড়ের প্রাণ যায়।

ব্যাপার কি?—রীতিমত কৌতূহলী হয়ে আমি প্রশ্ন করলুম।

ব্যাপার সেই সনাতন জমিদারে জমিদারে লড়াই—দ্বৈরথ আর কি! সুরযগড় ও জব্ওয়ানারী—পাশাপাশি দুটো বড় জমিদারি। জমিদারি যত না বড়, তার চেয়েও বড় হ'ল জমিদারদের দাপট। ওঁদের দাপট সহ্যি করার মত বুকের পাটা এ তল্লাটে কারু নেই। কাজেই সমানে সমানে পাল্লা চলেছে। আমাদের রাজাসাহেব তাঁর দাপট ঝাড়ছেন জব্ওয়ানারীর মহাদেও সিং-এর মাথায়—মহাদেও সিং-এর দাপট রাজাসাহেবের ওপর এসে বর্তাচ্ছে। তাই মারামারি চুলোচুলি লেগেই আছে। জমির সীমানা বা স্বত্ব নিয়ে মামলা-মোকদ্দমার অন্ত নেই। এই আপনাকে ব'লে রাখছি আমি, মামলা-মোকদ্দমা করতে করতেই এঁরা একেবারে ফতুর হয়ে যাবেন।

কিন্তু ওই লোকটা জখম হ'ল কি ক'রে?—আমি অধৈর্য হয়ে ব'লে উঠি।

বলছি। দাঁড়ান।—ব'লে ট্যাঁক থেকে নস্যির ডিবেটি বের ক'রে এনে এক টিপ নস্য দু নাকে ছুঁইয়ে নস্যটুকু তিনি মুখের মধ্যে পুরে ফেললেন। তারপর চারদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ঈষৎ চাপা গলায় তিনি বলতে শুরু করলেন, আপনাকে বলছি বটে, কিন্তু সাবধান, আর কারুর কানে যেন না ওঠে। সত্যি সত্যি যা ঘটেছিল তাই আপনাকে বলব কিনা।

এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।—একটু হেসে আমি বললুম।

হেঁ-হেঁ, তাতে আর সন্দেহ কি! ষষ্ঠী চক্কোত্তি লোক চেনে। সে যাক গে। বলছিলুম কি—না ওই ভোজো—তা মশাই যে যাই বলুক না কেন, আমি কিন্তু দোষ দোব ওই ভোজোকেই। চার-পাঁচ বিঘে জমি-জমা নিয়ে বাপে-বেটীতে মিলে বেশ তো ছিলি—নির্ঝঞ্ঝাটে দিন গুজরান হচ্ছিল, মাত্তর দশটি টাকার লোভে প'ড়ে কেন বাপু দাঙ্গা-হাঙ্গামা করতে

গেলি? অত লোভ কেন তোর? আমি ওকে কত বুঝিয়েছিলুম—ভোজো, বাপধন, অমন কাজও করিস না। রাজাসাহেব হলেন গিয়ে ক্ষত্রিয়, তাঁর রক্ত হরদম গরম হয়েই রয়েচে। উনি নিজে যত খুশি মারামারি কাটাকাটি করুন গে, তার মধ্যে তোর জড়িয়ে পড়বার কি দরকার বাবা? কেন বেঘোরে প্রাণটা দিবি? কিন্তু ব্যাটা কিছুতেই আমার কথা কানে তুলল না। বললে, ওর মেয়ের জন্যে শাড়ি ও গয়না কিনবে, দশ টাকা ওর চাই-ই। যে ক'রে হোক, টাকাটা উপায় করতেই হবে। আমি বললুম, মর্ গে যা—আমি কিছু জানি নে। হতভাগা তখুনি ওর দলবল লাঠিসোটা নিয়ে গিয়ে হাজির হ'ল সুরযগড় ও জরুওয়ানারীর সীমানার একটি জমি থেকে জোর-জবরদস্তি ক'রে ধান লুঠ ক'রে আনতে। জমিটির স্বত্ব নিয়ে বিবাদ বহুদিন যাবৎই চ'লে আসছে। বহু মামলা-মোকদ্দমা হয়েছে, কিন্তু কোন মীমাংসা হয় নি এ পর্যন্ত। জমিটার চাষ-বাস অবিশ্যি মহাদেও সিং-এর প্রজারাই ক'রে থাকে। শুধু ধান কাটবার সময় রাজাসাহেব জমিটার ওপর এসে হানা দেন। জোর ক'রে ধান কাটিয়ে নেন তিনি ফি বছর। এবার কিন্তু মহাদেও সিং আগের থেকেই প্রায় একশোটা জোয়ান তাগড়া লাঠিয়াল ঠিক ক'রে রেখেছিলেন। ভোজো তার লোকজন নিয়ে ওই জমিতে গিয়ে উপস্থিত হতেই রে-রে ক'রে তেড়ে এল মহাদেও সিং-এর লাঠিয়ালের দল। বাস্, আর যায় কোথায়? ভোজোর দলে ছিল মাত্তর পঁচিশটে লোক। একশো লেঠেলের তাড়ায় তারা ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে বাঁচল। ভোজো আর কি করে—সেও পালাল। রাজাসাহেব কাছেই ছিলেন। ভোজোদের পালাতে দেখে তাঁর মাথায় রক্ত উঠল চ'ড়ে। ভোজোর পথ আগলে দাঁড়িয়ে তাকে ধ'রে ফেললেন তিনি। তারপর তার হাত থেকে লাঠিটা কেড়ে নিয়ে আচ্ছা ক'রে তাকে কয়েক ঘা দিলেন লাগিয়ে। মাথা হ'ল ফুটিফাটা, হাত-পায়ের হাড়গোড় ভেঙে তচনচ। আধমরা হয়ে ভোজো মুখ থুবড়ে প'ড়ে গেল রাজাসাহেবরই একটি জমিতে।

তারপর?—আমি রুদ্ধশ্বাসে ব'লে উঠলুম।

তারপর রাজাসাহেব থানাতে খবর পাঠালেন যে, মহাদেও সিং-এর

লোকজন তাঁর জমি থেকে ধান লুঠ করতে এসেছিল। তাদের আটকাতে গিয়ে ভোজো জখম হয়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে এক দঙ্গল পুলিস-কনস্টেবল নিয়ে দারোগা এল। এসে দেখলে, সত্যিই রাজসাহেবের জমিতে ভোজো জখম হয়ে প'ড়ে রয়েছে। পুলিস-এন্‌কোয়ারী হ'ল, ভোজোকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হ'ল। এখন এস. পি. এসে ভোজোর জবানবন্দী নেবেন। তার ওপরই সব ভরসা। মানে, মহাদেও সিং-এর ওপর ফৌজদারী মামলা রুজু করতে হবে কিনা!

সে কি ক'রে হবে? ভোজোকে সত্যি সত্যিই তো মহাদেও সিং-এর লোকেরা মার দেয় নি! জবানবন্দীতে সে কি আর—

আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা কইতে যাওয়াই ঝকমারি!—ব'লে রাগ ক'রে ষষ্ঠীবাবু আপন মনে গজর গজর করতে করতে ভজুয়ার বেডের দিকে এগিয়ে গেলেন। প্ল্যাস্টারের ওপর বার দুই টোকা মেরে মৃদুস্বরে তিনি ডাকলেন, ভোজো, অ ভোজো, শুনতে পাচ্ছিস?

আঁ!—অস্ফুটস্বরে ভজুয়া জবাব দিল

আমার কথা তোর কানে যাচ্চে তো?—গলার স্বর ঈষৎ চড়িয়ে বললেন ষষ্ঠীবাবু, অ ভোজো!

কি কহিলা মানিজারবাবু?—জড়িত স্বরে বললে ভজুয়া।

বলছিলুম কি যে, পুলিসের বড় সাহেব আসচেন তোর কাছে। কি ক'রে জখম হ'লি, কে তোকে মারল—এ সব তোকে জিগেস-টিগেস করবেন আর কি। তুই কি জবাব দিবি, বল্?

কুছু নাহি বোল্ সক্‌বো হাম।

দাঁত খিঁচিয়ে ব'লে উঠলেন ষষ্ঠীবাবু, কিছু না বললে চলবে কেন? বলতেই হবে তোকে। বলবি, মহাদেও সিং-এর লেঠেল রামসিং, তার সাকরেদ লছমন ও রহিম তোকে মেরেছে। বুঝেচিস?

আঁ?

বলি কানের মাথা খেয়ে বসেছিস না কি রে হারামজাদা?—গলার স্বর সপ্তমে তুলে ষষ্ঠীবাবু ব'লে ওঠেন, এস. পি. জিজ্ঞেস করলে বলবি, তোকে রাম সিং, লছমন তেওয়ারী ও রহিম মেরে জখম ক'রে দিয়েছে।

বুঝেচিস তো? এদের নাম বলতে পারলে রাজাসাহেব তোকে বিশ টাকা ইনাম দেবে—তোর মেয়ে রুক্মিণীকেও এনে দেবে তোর কাছে।

সচ্!

সচ্ নয় তো কি ঝুট বলছি তোকে? তোদের ম্যানেজারবাবু কি কখনও ঝুট বাত্ বলে রে? এখন বল্ দিকি নি বাপধন, এস. পি. তোকে জিগেস করলে কি বলবি?

জড়িত স্বরে টেনে টেনে ভজুয়া বলতে থাকে, রা—ম, ল—ছ্—ম—ন আ—ও—র—

রহিম।—ভজুয়ার কানের কাছে মুখ এনে ষষ্ঠীবাবু হাঁক দিলেন। আবার বল্—রাম।

রা—ম।

লছমন।

ল—ছ্—মন।

রহিম।

র—হি—ম।

নামতা পড়াবার কায়দায় অন্তত বার পঁচিশেক নামগুলো ভজুয়াকে দিয়ে বলালেন ষষ্ঠীবাবু। অস্ফুটস্বরে ভজুয়া নামগুলির পুনরাবৃত্তি ক'রে গেল।

সহসা হুড়মুড় ক'রে ওয়ার্ডের মধ্যে এসে ঢুকলেন ডাক্তারবাবু। হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, এস. পি. সাহেব এসে গেছেন। ও ষষ্ঠীবাবু, টুলটা ছেড়ে দিন। আর সব টুলগুলো যে কোথায় গেল? ব'লে ইতস্তত দৃষ্টি চালিয়ে আবার তিনি দ্রুতপদে ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ষষ্ঠীবাবু টুল ছেড়ে আমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন। স্মিত-হাস্যে মুখ উদ্ভাসিত ক'রে আমার মুখের পানে চেয়ে তিনি বললেন, যাক, ঠিক সময়েই এসে গেছেন ওঁরা—

ভারী বুটের শব্দে ষষ্ঠীবাবুর মুখের কথা মুখেই থেকে গেল। রীতিমত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে তাড়াতাড়ি ভজুয়ার বেডের কাছে গিয়ে মৃদু করাঘাত ক'রে তিনি ব্যগ্রস্বরে ডাকলেন, ভোজো, অ ভোজো—শুনতে পাচ্ছিস?

আঁ!—ভজুয়ার কণ্ঠস্বর যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসছে।

এস. পি. সাহেব এসে গ্যাছেন রে ভোজো। ওঁর কথার ঠিকমত জবাব টবাব দিস রে বাবা। আমাকে আবার ফ্যাসাদে ফেলিস নি।

আঁা?

আঁা-আঁা করচিস্ কেন রে বাপধন? পুলিস সাহেবের সামনে আঁা-আঁা করিস নে রে বাপ—ঠিকমত কথার জবাব দিস।

পুলিসের ইউনিফর্ম-পরা একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, তাঁর পেছনে দুটি কন্‌স্টেবল, পুলিস সাব-ইন্‌স্পেক্টরের পোশাক-পরা একজন বিহারী এবং সবার পেছনে বিরাট লম্বা-চওড়া গোছের একজন বিহারী ভদ্রলোক ওয়ার্ডে এসে ঢুকলেন। ভদ্রলোকের পরনে ফিন্‌ফিনে ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি—চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে এলেন ডাক্তারবাবু। এস. পি.র সামনে এসে এক গাল হেসে বললেন, গুড মর্নিং স্যার।

ডাক্তারবাবুর মুখের পানে একবার কটাক্ষ হেনে এস. পি. ভজুয়ার বিছানার দিকে এগিয়ে গেলেন—প্রত্যভিবাদন জানাবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা ভজুয়ার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে তিনি ইংরেজীতে বললেন, এই লোকটা নাকি?

হ্যাঁ স্যার।—ষষ্ঠীবাবু জবাব দিলেন।

সাব-ইন্‌স্পেক্টরের দিকে চেয়ে এস. পি. বললেন, আরম্ভ ক'রে দাও তুমি। লোকটাকে জিজ্ঞাসা কর—কারা ওকে মেরেছে, তাদের ও চেনে কি না এবং নাম কি?

সাব-ইন্‌স্পেক্টর ভজুয়ার মুখের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে জোর গলায় হাঁক দিলেন, আরে ভজুয়া, শুন্—হামার বাত্‌কা জবাব দে।

আঁা! হামার রুক্মিণী আ গেইলো? কাঁহা রে বিটিয়া মেরি?

কাঁহা তোহার বিটিয়া!—দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে সাব-ইন্‌স্পেক্টর ব'লে ওঠেন, হাম দারোগা বা। জবাব দে যো পুছল্ বা। কৌন্ কৌন্ তুম্‌কো লাঠিয়া দেকে মারিস্—বতা দে জল্‌দি।

হামার বিটিয়া না আয়ী!—নিদারুণ হতাশা ভজুয়ার অস্ফুট আর্তস্বরে ফুটে ওঠে। তার বুকচেরা দীর্ঘশ্বাসে কেঁপে ওঠে ব্যাণ্ডেজের স্তূপ।

আরে বেল্লিক!—সাব-ইন্‌স্পেক্টরের গলার স্বর সপ্তমে চ'ড়ে ওঠে, বিটিয়া ন আয়ী তো কেয়া ভওল! বতা জল্‌দি, কৌন্ মারিস্ তুম্‌কো?

কেয়া জানে!—জড়িত স্বরে জবাব দেয় ভজুয়া।

ও কি বলছে হরি সিং?—এস. পি. জিজ্ঞাসা করলেন, ও কি বলতে চায় রুক্মিণী ওকে ধ'রে ঠেঙিয়েছে?

না স্যার।—হরি সিং বললে, লোকটা বলছে, ওকে যে কে মেরেছে তা ও জানে না।

ইজ্ ইট সো?—এস. পি.র ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি ফুটে উঠল। রাজাসাহেবের মুখের ওপর তীব্র কটাক্ষ হেনে তিনি বললেন, লোকটা কি আদৌ মার খেয়েছে? না, ব্যাপারটা আগাগোড়া সাজানো? ডাক্তারকে ঘুস-টুষ দিয়ে প্ল্যাস্টারে বেঁধে শুইয়ে রাখা হয়েছে এখানে?

রাজাসাহেবের ফরসা মুখ লাল হয়ে উঠল। বিছানার কাছে এগিয়ে এসে দু হাত দিয়ে ভজুয়ার দেহে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গর্জন ক'রে উঠলেন তিনি, কেয়া বোল্‌তা রে তু শূয়ারকা বাচ্চা? ঠিক্ ঠিক্ বোল্ কৌন্ তুম্‌কো মারিস্?

ভজুয়ার কণ্ঠ থেকে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে আসে। ভীতিশিহরিত ক্ষীণ কণ্ঠে সে বললে, রাজাসাহেব! হাম তো না জানল্ কে! মানিজারবাবুনে বোলিস্—কেয়া বোলিস্ হাম তো ভুল গেইলো!

পাংশু হয়ে ওঠে রাজাসাহেবের মুখ। ঈষৎ চমকে মুখ তুলে তাকালেন তিনি ষষ্ঠীবাবুর দিকে। ষষ্ঠীবাবুর মুখও ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে।

যথাসম্ভব আত্মসংবরণ ক'রে নিয়ে মুখে একটা কষ্টকৃত হাসি ফুটিয়ে তুলে ষষ্ঠীবাবু বললেন, বল্ না ভোজো কে কে মেরেছে তোকে? আমি তো পষ্ট দেখলুম রে রাম সিং, লছ্‌মন তেওয়ারী ও রহিম তোকে ধ'রে পিটুচ্ছে লাঠি দিয়ে। মনে পড়ছে না তোর বাপ?

জড়িতস্বরে ভজুয়া বললে, হাঁ, হাঁ, রা—ম, র—হি—ম, ল—ছ্—

হঠাৎ ভজুয়ার গলার স্বর আটকে যায়। তার ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা দেহটি বারকয়েক ন'ড়ে-চ'ড়ে স্থির হয়ে আসতে থাকে। ভজুয়ার ডান হাতটি তুলে ধ'রে নাড়ী পরীক্ষা করতে শুরু করলেন ডাক্তারবাবু ভুরু কুঁচকে।

ঠিক আছে।—ব'লে এস. পি. হেসে রাজাসাহেবের মুখের পানে তাকালেন—তুমি যে নামগুলি বলেছিলে, সেই নামগুলোই বলেছে ও।

রাজাসাহেবের মুখ প্রসন্ন হয়ে ওঠে।

লোকটা ম'রে গেছে।—ডাক্তারবাবু বললেন। হার্টফেল করেছে।

রাজাসাহেব রিস্টওয়াচের দিকে চেয়ে শশব্যস্ত হয়ে ব'লে উঠলেন, লাঞ্চ বোধ হয় এতক্ষণে তৈরি হয়ে গেছে স্যার। চলুন, এবারে আমরা যাই।

চলুন।—এস. পি. বললেন।

ষষ্ঠীবাবু ও ডাক্তার ছাড়া সকলেই বেরিয়ে গেলেন ওয়ার্ড থেকে। তাঁদের গমনপথের দিকে চেয়ে ষষ্ঠীবাবু বললেন, যাক্, ফৌজদারির রাস্তা পরিষ্কার হ'ল। মহাদেও সিংকে এবার জুৎমত শিক্ষা না দিয়ে ছাড়ছি নে আমরা।

লোকটা কিন্তু ম'রে গেল ষষ্ঠীবাবু।—আমি বললুম।

মরেচে তো কি!—অপরিসীম বিরক্তির সঙ্গে ষষ্ঠীবাবু বললেন, ও-রকম কত লোক মরচে! আপনার সঙ্গে কথা কইতে যাওয়াই ঝক্‌মারি!—ব'লে তিনিও ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে গেলেন।

যাক।—ডাক্তারবাবু হেসে বললেন আমাকে, এবার পুরো ওয়ার্ডটা আপনার দখলে এল। কিন্তু লোকটার আরও অন্তত ঘণ্টা দুই বাদে মরা উচিত ছিল। আমি ষষ্ঠীবাবুকে বলেছিলাম না যে, দেড়টা থেকে দুটোর মধ্যে লোকটা মরবে?—ব'লে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে ডাক্তারবাবু আমার মুখের পানে তাকালেন। গম্ভীরমুখে নিরুত্তর হয়ে ব'সে রইলুম আমি। মুখে কোন কথা জোগাল না।

কয়েক মুহূর্ত বাদে ডাক্তারবাবু আবার বললেন, ঘণ্টা দুয়েক বাদেই মরত লোকটা। ওই গুণ্ডা রাজাসাহেবের ঝাঁকুনিতেই বেচারা অক্কা পেল। নইলে দেড়টা দুটোর মধ্যেই ও মরত। এ ব্যাপারে আমার কথার একচুল এদিক ওদিক হয় না।

আত্মপ্রসাদের হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ডাক্তারবাবুর মুখ।

শ্রীসঙ্কর্ষণ রায়

ধনপতি পাগ্‌লার ডায়েরি

রাহুল ও দময়ন্তী

দুটি অনতিকায় মোটর গাড়িও কোনরকমে পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে, অতটা দরাজ বুক নয়; গলিটির গলিত্ব তবু নামে প্রকাশ পায় নি। নাম নকড়ি নস্কর রোড। নকড়ি নস্কর হয়তো বেঁচে নেই, হয়তো উঁচুদরের আইন-ঠকানো তস্করি ক'রে প্রচুর কড়ি কামিয়ে সাধনোচিত ধামে চ'লে গেছেন, তাঁর নাম বেঁচে আছে এই রাস্তানাম-ধারী গলিটির মোড়ের মাথায় নাম-ফলকে। নাম বেঁচে আছে, কিন্তু স্মৃতি বেঁচে নেই। নকড়ি নস্কর রোডের সন্ধানে যাঁরা আসেন, তাঁরা নাম-ফলকে রোডের সন্ধান পেয়েই অমুক বা তমুক নম্বর বাড়ির সন্ধানে ঢুকে পড়েন। অনুসন্ধান করেন না—নকড়ি নস্কর কে ছিলেন, কবে ছিলেন, কোথায় ছিলেন, কেন ছিলেন! হায় রে নাম-কাঙালের দল! নাম টিকে থাকলেই স্মৃতি টিকে থাকে না। স্মৃতি মুছে গিয়ে জেগে থাকে শুধু নাম। তারপর নামও মুছে যায়; পুরাতন নামের চিতাভস্মের বুকে ফুটে ওঠে নতুন নামের মঞ্জরী।

নকড়ি নস্কর রোডে কোন নস্করের বাড়ি নেই। তরুণ কেরানী রাহুল রায় যে পুরাতন বাড়ির এক খুপরিতে বাস করার অভিনয় করে, সে বাড়িটা দময়ন্তী দালালের বাবা এবং সৌদামিনী দালালের স্বামী দিবাকর দালালের দখলে। বাড়ির সামনে গলির মুখোমুখি সাদা পাথরের ফলকে কালো হরফে লেখা আছে 'সৌদামিনী ভবন'।

দিবাকর দালাল এককালে দালালি করতেন কি না জানি না, কিন্তু এই বাড়িটি দখলে আনবার কয়েক বছর আগে থেকে তিনি ছিলেন তাঁর আপন-হাতে-গড়া 'দি গ্রেট এশিয়াটিক ব্যাঙ্ক'-এর কর্ণধার। ব্যাঙ্কটিকে তিনি অনেক শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়েছিলেন। তাঁর সচিত্র জীবন-কাহিনী বিচিত্র কায়দায় ছাপা হয়েছিল বাংলার অনেক দৈনিকে, সাপ্তাহিকে আর মাসিকে; সে সব প্রশস্তি প'ড়ে গর্বে প্রশস্ত হয়ে উঠেছিল অনেক বাঙালীর অপ্রশস্ত বুক। যুগাবতার দিবাকর দালাল বাঙালী জাতির

আর্থিক বনেদ পোক্ত করবার জন্যেই অবতীর্ণ হয়েছেন—এ বিষয়ে বাংলা দেশের কোনও কাগজের এক ফোঁটা সংশয় ছিল না; আর জাতিকে বাঁচাতে হ'লে জাতির কাগজগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা একান্ত দরকার, তাই তাদের জীবন-প্রদীপে দরাজ হাতে 'দি গ্রেট এশিয়াটিক ব্যাঙ্কে'র বিজ্ঞাপনের তেল যোগাতেন দিবাকর দালাল। বাংলার গৌরব দিবাকর দালালের ব্যাঙ্কের উদাত্ত আহ্বানে অনেক বাঙালী সধবা, বিধবা, কেরানী, মাস্টার, দোকানদার, কারবারী, বাড়িওয়ালা, ডাক্তার, মোক্তার ইত্যাদি আরও অনেকের টাকা এসে উদার ছন্দে পরমানন্দে জমা হ'ত গ্রেট এশিয়াটিক ব্যাঙ্কের মহাতীর্থে। সেই সব টাকাকে ব্যাঙ্কের বাইরে পাঠিয়ে নানা কায়দায় বেনামে খাটাতেন ব্যাঙ্কিং-যাদুকর দিবাকর দালাল। খাটতে খাটতে ব্যাঙ্কের অধিকাংশ টাকা হয়রান হয়ে ভেগে গেল। তারপর ব্যাঙ্কের শেকড় থেকে শাখা-প্রশাখায় একদিন সর্বত্র যে বাতি জ্ব'লে উঠল তার রঙ লাল—টাটকা তাজা খুনের মত লাল। আর শোনা যেতে লাগল দিবাকর দালালও লাল হয়েছেন। বাংলার অলিখিত অর্থনৈতিক ইতিহাসে অলক্ষ্যে জেগে রইল এই একটি লাল তারিখ।

এই লাল তারিখের আগে এই বাড়িটির (যার নাম এখন 'সৌদামিনী ভবন') মালিকের শেষ পাইটি পর্যন্ত জমা ছিল গ্রেট এশিয়াটিক ব্যাঙ্কে। লাল তারিখের পর তিনি ভেবে দেখলেন, মাথায় হাত দিয়ে ব'সে থেকে কোন লাভ নেই; আর্থিক প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে তিনি বাড়ির মালিকানা বেচে দিয়ে অন্যত্র ভাড়াটে হতে চ'লে গেলেন। তারপর চক্ষুলজ্জার মেয়াদশেষে বাড়িটি হয়ে গেল 'সৌদামিনী ভবন'।

সৌদামিনী ভবনের গ্যারাজে যে ছোটখাট অস্টিন গাড়িখানা গলিতে দাঁড়ালে কোলাপ্‌সিব্‌ল্ গেটের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায়, তার ভূতপূর্ব মালিকে আর এই বাড়িটির ভূতপূর্ব মালিকে কোনও ভেদ নেই। দিবাকর দালাল সহধর্মিণীর বেনামে এই গাড়িখানার তৃতীয় মালিক।

কম পেট্রোলে বেশি মাইল চলার স্বভাবটা এখনও গাড়িখানা হারায়

নি। গ্যারাজের ঠিক ওপরেই গ্যারাজের মতই যে নীচু ছাতওয়ালা ঘরের ছানা, তাইতে কম ভাড়ার ভাড়াটে রাহুল রায়; কম মাইনেতে সে বেশি খাটে ভুজঙ্গ চৌধুরীর মস্ত সওদাগরী অফিসে। কম নিয়ে বেশি দেবার দুই দোস্ত—নীচে অষ্টিন গাড়ি আর তার ওপরে তরুণ কেরানী রাহুল রায়।

আসলে ওপরের ঘরটি তৈরি গাড়ির ড্রাইভারের জন্যে। সেই সঙ্গে প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দেবার এবং স্নানের জায়গাও আলাদা আছে, বাড়ির সঙ্গে যার অন্তরঙ্গ যোগ নেই। দিবাকর দালালের কুমার ড্রাইভার গণেশ হালদার বিয়ে ক'রেই এ আবাস ছেড়ে অন্য আবাসে নীড় বেঁধেছে কাছেই, এখানে রেখে গেছে নব বন্ধু রাহুল রায়কে। গণেশের মাইনে বাড়াতে হয় নি, তার ওপর কিঞ্চিৎ ভাড়া ফি মাসে দিচ্ছে রাহুল রায়—সুতরাং আপত্তি হয় নি দিবাকর দালালের। অর্থাগমে এক ফোঁটা অনাসক্তি বা অনাগ্রহ নেই দিবাকরের—তা সে যত সামান্যই হোক।

আজ রবিবার। কেরানীদের অফিস নেই—ছুটির সুর নীরবে বেজে চলেছে আকাশে বাতাসে। বাইবেলের ভগবান ছ দিন ধ'রে দুনিয়া সৃষ্টি ক'রে সপ্তম দিনে আরাম করলেন, সেটা হ'ল বিশ্রামের দিন। সপ্তাহের সেই সপ্তম দিন এই রবিবার। দুনিয়ার হে কেরানীকুল, বাইবেলের ভগবানকে অন্তত এই দিনটির জন্য ধন্যবাদ দিও।

আমি ভোরবেলা উঠে চ'লে গেলাম রাহুল রায়ের ঘরে। রাহুল রোজই বেশ ভোরে ওঠে—রবি সোম ভেদ নেই। টোকা দিতেই খুলে দিলে দরজা, দাঁড়াল স্তম্ভিত হয়ে। বললে, চিনি না তো আপনাকে। বললাম, চেনা দিতেই তো এসেছি, যেমন ক'রে কুঞ্জবনের পাতায় পাতায় শিহরণ জাগিয়ে এগিয়ে আসে নব বসন্তের মাধবীমঞ্জরী। এই পৃথিবীর বিপুল জনারণ্য জুড়ে ছড়িয়ে আছে অপরিচয়ের কুয়াশা, যা আবছা আলোর ভেজালের জোরেই নিরেট অন্ধকারের চেয়ে বেশি রহস্যময়। সেই কুয়াশা ভেদ ক'রেই তো প্রভেদ ঘোচাতে হবে পরিচয়ের মধুর আলোতে। পরশু রাতে আপনাকে দূর থেকে দেখেছিলাম

সার্কাসের অগণিত দর্শকের ভিড়ে অন্যতম; আজ প্রাতে আপনার পরিচয় পেতে এসেছি সম্মুখ থেকে—আপনার ঘরের একান্তে একমাত্র রূপে। আমি জানি, আপনার নাম রাহুল। আমার নাম ধনপতি।

ওঃ, আপনিই ধনপতি ? নমস্কার। কিন্তু আপনার নাম এর আগে কখনও শুনেছি কি ?

আমি বললাম, আপনি এর আগে কি কি শুনেছেন তার ফিরিস্তি আমার কাছে নেই রাহুলবাবু। কিন্তু তাতে কোনও ক্ষতি হবে না। হয়তো শুনেছেন, অথবা হয়তো শোনেন নি। যাই হোক, আসুন, আরাম ক'রে বসা যাক। কি বলেন ?

রাহুল রায় জবাব দেবার আগেই আবার বললাম, পরশু কেমন দেখলেন সার্কাস ? দি গ্রেট ডাংকি অ্যাক্ট কেমন লাগল ?

হঠাৎ কথার বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন ওর মাথায়। বললে, তখন ভাল লাগে নি, ক্ষেপে উঠেছিলুম পুঁজিবাদী ভুজঙ্গ চৌধুরীর ওপরে। আগুনে পাহাড় হয়ে উঠেছিল আমার শোণিত, নিপীড়িত অবহেলিত লাঞ্ছিত বঞ্চিত আত্মা। কিন্তু স্মৃতির পটভূমিকায় আজ তা ভাল লাগছে। কাল আমায় ডেকে দশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন ভুজঙ্গ চৌধুরী।

পদ্মপাতায় শিশিরবিন্দুর মত প্রশান্ত হাসি রাহুল রায়ের মুখে। পুঁজিপতি ভুজঙ্গ চৌধুরীর চরিত্র মহৎ, দশ টাকা মাইনে বেড়েছে কেরানী রাহুলের।

ভেতরে নিয়ে বসাল রাহুল। তক্তপোশ নেই, মেঝের ওপর কায়েমী বিছানা পাতা। ও-পাশে জানলার ধারে একটা সস্তা প্যাকিং কাঠের টেবিল; তার পাশে একটা হালকা চেয়ার, যাকে ভাঁজ ক'রে গুটিয়ে রাখা চলে। ঘরের দেয়ালে চিত্র-তাড়কাদের একটি ছবি টাঙানো নেই। ফ্রেম ছাড়া একখানা ছবি ঝুলনো আছে পুরু পিজবোর্ডে সাঁটা। ছবিটি রবি ঠাকুরের বুড়ো বয়সের, মুখের আদ্ধেক ঢাকা ঋষিদের মত দাড়িতে। টেবিলের তলায় একটা সস্তা পুরাতন সুটকেস।

আমি নিজের পরিচয় যা দিলেম তাতেই খুশি হ'ল রাহুল; খুশি হবার ক্ষমতা তার অসাধারণ। বললে হেঁয়ালির সুরে, যে ধনে ধনী হয়ে আপনি ধনপতি, বিচিত্র তার সুর, বিচিত্র তার ছন্দ। তবু আমার সত্যিকারের পরিচয় কেউ যদি চায় তো বলব—আমি কবি।

ছবিতে রবি ঠাকুরের দাড়ি দুলে উঠল যেন। না, কি গোটা ছবিটাই বাতাসে দুলছে? তা দুলুক। বুড়ো কবির ছবি দুলুক কচি কবির ঘরে। মনে প'ড়ে গেল আর এক কবি অতনু ভাদুড়ীর কথা, খাতা-ভরতি তার দেখেছি কত কবিতা! জানি না আজ কোথায় সে, কোথায় তার কবিতার খাতা! ঠিকানা সে দিয়েছিল, আমি তা অনায়াসে হারিয়ে ফেলেছি। বললাম, কবিগুরুর ছবি দেখেই আন্দাজ করেছিলুম। রবীন্দ্রকাব্য সব প'ড়ে ফেলেছেন?

রাহুল রায় বললে, ক্ষেপেছেন? তা হ'লে তো অনেক বাজে লেখা প'ড়ে অনেক সময় গচ্চা দিতে হ'ত। উনি লিখেছেন বিস্তর, তাই বিস্তর বাজেও লিখেছেন। আর সেই সব বাজে লেখা তাঁর গ্রন্থাবলীতে ভিড়ও জমিয়েছে, যাদের ঐতিহাসিক মূল্য থাকতে পারে, কিন্তু সাহিত্যিক মূল্য আমি মানি না।

শুধালাম, গুরুদেবের ছবিখানা তা হ'লে অত আদর ক'রে টাঙিয়েছেন কেন?

ওঁকে বড্ড আপন মনে হয় ব'লে।—বললে রাহুল, এই ছবিতে যখন ওঁর মুখের পানে তাকাই, মনে হয় উনি আমার পানে তাকিয়ে আছেন। উনি আছেন আর আমি আছি। তাই তো এ ঘরে কখখনো একা মনে হয় না। আর মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানেন?

জানি না।

মনে হয়, গুরুদেব বিদায় নিয়ে যাবার আগে 'এসো' ব'লে যে কবিকে ডাক দিয়ে গেছেন, হয়তো আমিই সেই কবি। মনে নেই আপনার কবিগুরুর সেই আহ্বান?—ব'লে ৺কবিগুরুর কবি-আহ্বান আবৃত্তি ক'রে শোনাল রাহুল রায়:

"এসো কবি অখ্যাত জনের
নির্বাক মনের।
মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার।
প্রাণহীন এ দেশেতে গান-হীন যেথা চারিধার,
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি' দাও তুমি।…
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা, তাহাদের বাণী যেন শুনি।
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি,
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারি খ্যাতি—
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার।"

রাহুল রায় আবৃত্তি মন্দ করে না, কান আমার খুশি হ'ল। কিন্তু আতঙ্কিত হয়ে উঠল মন, পাছে সে-ই যে ৺কবিগুরুর 'এসো' ব'লে ডাক দেওয়া অখ্যাত জনের নির্বাক মনের কবি সেইটে প্রমাণ করবার জন্যে রাহুল স্যুটকেস থেকে খাতা বার ক'রে তার স্বরচিত কবিতা শোনাতে শুরু করে! কিন্তু সে আশঙ্কার অমূলকতা অচিরেই প্রমাণিত হ'ল। কবিতা শোনাবার নামগন্ধও শোনা গেল না তার মুখে। সে যে কবি, এবং হয়তো কবিগুরুর 'এসো' ব'লে ডাক দেওয়া কবি, এইটুকু জানিয়েই সে খালাস—প্রমাণ করবার দায়িত্ব সে স্বীকার করে না।

কিন্তু খারাপ লাগে কি জানেন?—বললে রাহুল রায়, ওই যে গুরুদেব বলেছেন 'তোমারে করিব নমস্কার'। ওঁর আশীর্বাদ পারব শিরোধার্য ক'রে নিতে, কিন্তু ওঁর নমস্কার গ্রহণ করব কোন্ লজ্জায়?

কবিতা থেকে কথার মোড়টা অন্য দিকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে বললাম, ঠাণ্ডাটা কি রকম হঠাৎ বেড়ে উঠেছে দেখেছেন?

মুক্ত বাতায়নের মধ্য দিয়ে পথের দিকে তাকিয়ে রাহুল রায় বললে, ঠাণ্ডার দাওয়াইও আসছে। ভাববেন না ধনপতিবাবু।

দাওয়াই সত্যি সত্যিই একটু বাদে এল একটি কেট্‌লির ভেতরে। কেট্‌লির বাহককে রাহুল বললে, দুটো কাপে এখন আধাআধি ভাগ ক'রে দাও গোবিন্দ। তারপর আর এক কাপ নিয়ে এস।

গোবিন্দ বললে, দু কাপই নিয়ে এসেছি দাদাবাবু। এনাকে আসতে দেখেছিলাম কিনা আপনার কাছে। তাই আপনার এক কাপের সঙ্গে এনার জন্যেও এক কাপ নিয়ে এসেছি।

রাহুল খুশি হয়ে বললে, তোমার হবে গোবিন্দ, তোমার হবে। হাতের ঠোঙার ভেতর কি এনেছ গোবিন্দ?

আজ্ঞে, দুটো টোস্ট আর দু টুকরো কেক। দুটো মামলেট ক'রে নিয়ে আসি। কি বলেন?

রাহুল বললে, তার আর দরকার নেই গোবিন্দ।

আমি বললাম, না না না, মামলেট আবার কেন?

গোবিন্দ রাহুলের টেবিলের তলা থেকে এক জোড়া পেয়ালা পিরিচ বার ক'রে আমাদের সামনে চা টোস্ট আর কেক সাজিয়ে দিয়ে চ'লে গেল।

রাহুল বললে, এ হচ্ছে গোবিন্দ গরাই। এ গলির ও-মোড়ে যে 'চা-ভারতী' নামে রেস্তোরাঁ আছে, গোবিন্দ তার একমাত্র মালিক। চমৎকার চা ওর চা-ভারতীতে, তাই অন্য পাড়া থেকেও এ পাড়ায় লোক আসে চা-ভারতীতে চা খেতে। ধারের কারবার করে না গোবিন্দ গরাই। কিন্তু আমার বেলায় ওর নিয়ম আলাদা। সারা মাস আমায় চা খাওয়ায়, মাসকাবারে মাইনে পেলে টাকা দিই। অতিথি এলে নিজে যে এখানে এসে চা পৌঁছে দিয়ে যায়, তার জন্যে একটি আধলাও বেশি নেয় না। কেন আমায় সে এ খাতির করে জানেন? কেমন ক'রে ও টের পেয়েছে—আমি কবি। কবিদের ওপর শ্রদ্ধা ওর অসীম।

আবার কবির প্রসঙ্গ এসে পড়ছে দেখে বললাম, আপনার এখানে তো রান্নার কোন ব্যবস্থা দেখছি না? আহার করেন কোথায়?

রাহুল বললে, চা-ভারতীর পেছনেই গোবিন্দ গরাই থাকে তার বউ আর ছেলেমেয়ে নিয়ে। ওর বাড়ির হোটেলে আমায় সে একমাত্র খদ্দের ব'লে যেচে নিয়েছে, তাও মাসিক হিসেবে। গরাইয়ের এই সরাইখানার জন্যে গরাইয়ের কাছে আমি ঋণী ধনপতিবাবু। এ ঋণ আমি শোধ করতে পারব না কোনদিন।

আমি বললাম, কোন ঋণই কোনদিন শোধ করা যায় না রাহুলবাবু। যে ঋণ শোধ ক'রে চুকিয়ে দেওয়া যায়, সে ঋণ ঋণই নয়।

এমন সময় বাইরে শোনা গেল কার পরুষ কর্কশ কণ্ঠ—স্কাউন্ড্রেলটাকে কাল বার বার ব'লে দিলাম, সাতটার আগে এসে গাড়ি বার ক'রে রাখবে। আটটা বাজতে চলল এখনও তার দেখাটি নেই। পৌঁছুতেই যদি শেষে বারোটা একটা বেজে যায় তো পিকনিক করবে কখন? চাবুক মেরে শায়েস্তা করা দরকার এই সব বেইমান দায়িত্বজ্ঞানহীন লোককে।

মেয়েলী কণ্ঠে শোনা গেল—জিভে একটু লাগাম কসতে শেখো বাবা। একে রবিবার, তায় এমনি ঠাণ্ডা পড়েছে। আসতে একটু দেরি হচ্ছে ব'লেই ভদ্রলোকের ছেলেকে যা-তা বলবে, এ তোমার ভারি অন্যায়। উনি যে আজ ছুটির দিনেও কাজ করতে রাজী হয়েছেন সেজন্যেই তো তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। রাজী না হ'লে কি করতে তুমি?

আমার নীরব প্রশ্নের জবাবে রাহুল রায় বললে, আমার বাড়িওয়ালা দিবাকর দালাল এবং তাঁর একমাত্র সন্তান কুমারী দময়ন্তী দালাল। সম্পর্কটা অবশ্য বিশ্বাস করা শক্ত।

চাকরি খতম ক'রে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিতাম।—বললেন দিবাকর দালাল।—দিবাকর দালালের গাড়ি চালাবার জন্যে ড্রাইভারের অভাব হবে না কোনদিন। ভাত ছড়ালে অনেক কাক জোটে।

কুমারী দময়ন্তী দালাল বললেন, ওই যে ড্রাইভারবাবু আসছেন। তুমি কোনও কথা ব'লো না বাবা, চুপ ক'রে থাক।

ড্রাইভার গণেশ হালদার এসে জানালে, তার স্ত্রীর হঠাৎ কাঁপুনি

হয়ে জ্বর এসেছে, শরীর বিশেষ খারাপ। তাকে এ অবস্থায় একা ফেলে আসা চলে না, তাই পাশের বাড়ির গিন্নীকে বিশেষ অনুরোধ ক'রে রাজী করিয়ে তার জিম্মায় স্ত্রীকে রেখে গণেশ এসেছে। অর্থাৎ বাধ্য হয়েই এসেছে সে দুর্দিনের চাকরি বজায় রাখতে। অসুস্থা স্ত্রীকে ফেলে সে সপরিবার প্রভু দিবাকর দালালকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবে শহর থেকে দূরে কোথায় বাগান-বাড়িতে পিকনিক করতে। স্ত্রী যদি না-ই বা বাঁচে, চাকরি বাঁচবে।

স্ত্রীর হঠাৎ-আসা জ্বরের বর্ণনা শুরু করতেই গণেশকে ধমক দিয়ে দিবাকর বললেন, বাক্য আর ব্যয় না ক'রে গাড়ি বার কর তাড়াতাড়ি। সূর্য তো ওদিকে মাথায় উঠছে কিন্তু তোর মা যে এখনও নামছেন না দময়ন্তী। যা মা, তুই তাড়া দিয়ে নামিয়ে নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি।

আবদারী আদেশের মিঠে-কড়া সুরে দময়ন্তী বললে, তুমি যাও বাবা, আমি দাঁড়িয়ে ততক্ষণে গাড়িটা বার করিয়ে রাখি।

সহধর্মিণী শ্রীমতী সৌদামিনী দালালকে নামিয়ে আনতে ওপরে চলে গেলেন দিবাকর দালাল। এই ফাঁকে রাহুলের ঘরের জানলার পাশে দাঁড়িয়ে সৌদামিনী-ভবনের গেটের ধারে দণ্ডায়মানা দময়ন্তী দালালকে দেখলাম। দময়ন্তী কালো নয়, ফরসাও নয়, দুয়ের মাঝামাঝি। স্বাস্থ্যের জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল পাতলা গড়ন। রূপের ব্যাকরণ মানলে রূপসী বলা চলে না তাকে। অথচ সব কিছু মিলিয়ে রূপের যেন অভাব নেই তার। তাকে বর্ণনা ক'রে বোঝাবার ভাষা হয়তো আছে, কিন্তু আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য! এই দময়ন্তীর জীবনের অংস ওই দিবা-দ্বিপ্রহরে-পুষ্করিণী-অপহারক দিবাকর দালাল? রাহুল ঠিকই বলেছিল—সম্পর্কটা বিশ্বাস করা শক্ত।

নেমে এলেন দিবাকর দালাল, এলেন শ্রীমতী সৌদামিনী। কিন্তু ঝিমঝিম ক'রে উঠল কুমারী দময়ন্তী দালালের মাথা। দুটি চোখের সামনে দু হাজার সরষে-ফুল। সারা দেহ কম্পমান, অবসন্ন। ব্যস্ত

হয়ে উঠলেন দালাল-দম্পতি। তারপর ফোন গেল ডাক্তারের কাছে। ওপরে শয্যাশায়িনী হতে চ'লে গেল দময়ন্তী। গ্যারাজের গাড়ি রইল গ্যারাজে। ছুটি পেয়ে ফিরে গেল ড্রাইভার গণেশ হালদার তার অসুস্থা স্ত্রীর কাছে। মুখে তার উদ্বেগ আর হাসি।

আমি বললাম, আহা!

রাহুল রায় বললে, ভাববেন না আপনি। কুমারী দময়ন্তী স্রেফ ধাপ্পা দিয়ে গণেশ হালদারের ছুটির ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে গেল, যেন স্ত্রীর কাছে সে সারাক্ষণ থাকতে পারে। অভিনয়, শুধু অভিনয়। কিছু হয় নি দময়ন্তীর।

শুনে সত্যি আশ্বস্ত হলাম, দময়ন্তীর প্রতি শ্রদ্ধায় ভ'রে উঠল মন।

রাহুল বললে, শুনুন তা হ'লে দময়ন্তী দালালের আর একটি কাহিনী। আমার এই ঘরে এক বিকেলে আমার বন্ধু গজেন ঘোষ বাজাল সেতার। আহা, কি সে বাজনা! একাগ্র সাধনার আশ্চর্য সাফল্য! আমার এই ছোট ঘরে অল্প লোককেই জায়গা দিতে পেরেছিলাম। শ্রোতার ভিড় জ'মে গিয়েছিল আমার ঘরের বাইরে, ভিড় জমেছিল রাস্তায়। বাজনা শেষ হ'লে কানে স্মৃতির মধু নিয়ে শ্রোতারা ফিরে গেল, মিনতি জানিয়ে গেল, আর একদিন যেন হয়। ভিড় ক'মে গেলে এল দিবাকর দালালের বাড়ির পুরাতন ভৃত্য কানাই।

তারপর?

রাহুল বললে, তারপর কানাই বললে—বাবু ব'লে পাঠালেন তাঁর বাড়িতে যদি একদিন দয়া ক'রে আপনি বাজনা শোনান। গজেন বললে—তোমার বাবুকে বল গে, তাঁর বাড়িতে আমি বাজাব না। কানাই চ'লে গেল। বোধ করি মনিবকে গিয়ে খবরটা দিয়েওছিল। তার একটু পরেই নিতান্ত অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব দময়ন্তী দালালের। সে যে গ্যারাজের ওপরের ঘরে এমনভাবে উঠে আসবে তা কে কবে ভাবতে পেরেছিল? দময়ন্তীর দুই চোখে চাপা আগুনের ইশারা। সেতারী বন্ধু গজেনের দিকে তাকিয়ে দময়ন্তী বললে—ওঃ, আপনি বুঝি

পেশাদার? পয়সা না নিয়ে বাজান না? গজেন সেতারের মীড়ের মত অচপল সুরে জবাব দিলে—জায়গা-বিশেষে বাজাই। সর্বত্রই যদি খাতিরে বাজাতে হয়, তা হ'লে আমরা শিল্পীরা বাঁচি কি ক'রে? দময়ন্তী বললে—বেশ। আপনার দক্ষিণা কত? পঁচিশ? পঞ্চাশ? এক শো? গজেন বললে—যদি বলি এক শো? দময়ন্তী উত্তর দিলে—তাই দেব। আপনি কবে বাজাবেন বলুন? কাল? পরশু? তার পরদিন? কিংবা তারও পরদিন? কিংবা—। গজেন হাতজোড় ক'রে বললে—মাপ করবেন। কোনদিনই নয়। আপনার বাবার বাড়িতে বাজিয়ে আমি সঙ্গীত-সরস্বতীর অপমান করতে পারব না, কলুষিত করতে পারব না আমার সেতারযন্ত্র। ক্রোধে দাঁতে অধরোষ্ঠ চেপে তারপর দময়ন্তী বললে—তার মানে? গজেন বললে—তার মানে আপনার বাবার প্রত্যেকটি টাকা পাপার্জিত। আগে তিনি আরও কত কি করেছেন তার খোঁজ আমি জানি না। কিন্তু জানি তাঁর গ্রেট এশিয়াটিক ব্যাঙ্কের কাহিনী—বাঙালী জাতির বিরাট কলঙ্কের কাহিনী। তাতে লাল বাতি জ্বালাবার সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে আপনার বাবা লাল হয়েছিলেন, হাজার হাজার বাঙালী পরিবারকে নির্মম ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে। তাঁর এত বড় ঘৃণ্য পাপের ক্ষমা আছে ব'লে আমি মনে করি না। আর তাঁরই বাড়িতে আমি যাব সেতার বাজাতে? অসম্ভব। মাপ করবেন আমাকে।

রাহুলের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে দময়ন্তী প্রশ্ন করেছিল, আপনিও কি তাই বলেন?

রাহুল বলেছিল, এ বিষয়ে আমাকে কিছু বলা বৃথা দময়ন্তী দেবী।

বেশ।—ব'লে দময়ন্তী দ্রুতবেগে নেমে চ'লে গেল।

রাহুল ভাবলে, যে ব্যাপারটা হয়ে গেল এর ফল ভোগ করতে হবে তাকেই। হয়তো তাকে এই বিশ্রী অপমান করেছে যে তার বন্ধু গজেন, তারই বন্ধু ব'লে তাকে তাড়িয়ে ঘরে হয়তো অন্য ভাড়াটে আবার ব্যবস্থা করবেন বাড়িওয়ালা দিবাকর দালাল।

তা কিন্তু হ'ল না। পরদিন ভোরবেলার কিছু পরে দময়ন্তী দালাল এসে বললে, আমি রাগ করেছিলুম বটে, কিন্তু রাগ করবার অধিকার আমার হয়তো নেই। আপনার বন্ধুর কথাগুলো কঠোর হ'লেও সত্য; তাঁকে জানাবেন আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

কাহিনী শেষ ক'রে রাহুল রায় বললে, আশ্চর্য মেয়ে এই দময়ন্তী দালাল। দময়ন্তীও যে দালাল, এটা বিধাতার একটা বীভৎস ইয়াকি ছাড়া আর কিছু ব'লে ভাবতে পারি না। দময়ন্তীর গুণ অনেক, শ্রদ্ধার দাবি তার জোরালো। তবু কিছুতেই ভুলতে পারি না তার বাবা দিবাকর দালাল। আর এ কথা যতই মনে পড়ে, ততই দময়ন্তীর ওপর মন ঘৃণায় ভ'রে ওঠে। এই আমার এক ট্র্যাজেডি। যাকে সারা হৃদয় দিয়ে চাই শ্রদ্ধা করতে, তাকেই কিনা ঘৃণা করতে হয় সবচেয়ে বেশি! এমন বেয়াড়া, বেখাপ্পা, মর্মান্তিক ব্যাপার কখনও দেখেছেন ধনপতিবাবু?

কণ্ঠস্বর ভারী রাহুল রায়ের। দুই চোখে তার জল ছলছল ক'রে উঠেছে।

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

বনলতা সেনের প্রতি

রাত্রি অনেক হ'ল
ঘুমে চোখ চায় আজ জড়াতে
এখন কোথায় তুমি চল
হৃদয়কে কোন্ সুরে ভরাতে।

শোন, তুমি কোথা যাও, শোন বলি আস্তে
এ যুগের কবিদের নবতর কাব্যে
চিরকেলে চাঁদ হ'ল কিষাণের কাস্তে
পুরোনো দিনের গান কেন আজ ভাববে?

দারুচিনি দ্বীপ নয়
বিবর্ণ এ নগরের গলির কোটর
এইখানে জীবনের তিলে তিলে ক্ষয়
হাওয়ায় হাওয়ায় কাঁপে মৃত্যুর ছায়া থরথর।

এখানে হঠাৎ আজ যদি
আসে কোনও বনলতা সেন
রুদ্ধগতি আজিকার জীবনের নদী
এখানে কোথায় তিনি হৃদয়ের তৃষা মেটাবেন ?
পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে একবার চেয়ে দেখ বনলতা সেন,
পৃথিবীর ঘরে ঘরে সিংহল সমুদ্র হতে মালয় সাগরে
তিমির-স্তিমিত রাত্রি, শকুনেরা করে লেনদেন
এখানে কোথায় তুমি ? প্রেতায়িত আজিকার বিদর্ভ নগরে ?

শ্রীঅসিতকুমার চক্রবর্তী

নাটক

ট্রাম বন্ধ থাকায় বাসে অত্যধিক ভিড় ছিল ব'লে হেঁটে আপিস থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। নিন্দুকরা বলবে—পয়সা বাঁচাতে ; কিন্তু আমি জানি, গায়ের চামড়া বাঁচাতে। ময়দান-এলাকা প্রায় শেষ ক'রে এনেছি, পা দুখানা স্ট্রাইক-নোটিস দিলে। সুতরাং ঘরমুখো বাঙালী হয়েও মাঠের প্রান্তসীমায় এক জায়গায় ব'সে পড়লাম।

সন্ধ্যা হয় হয়। পশ্চিম-আকাশে মেঘের খেলা মিলিয়ে গিয়ে অন্ধকারের জাল নেমে আসতে আরম্ভ করেছে। চৌরঙ্গী রোডের ওপর দিয়ে মাঝে মাঝে আকণ্ঠ যাত্রীঠাসা এক-একখানা বাস হুস্ হুস্ ক'রে বেরিয়ে যাচ্ছে। মনে ভাবছি অনেক কিছু, গান্ধীজীর কথা। কেমন ক'রে আধুনিক যন্ত্রযুগ তিলে তিলে মানুষকে যন্ত্রনির্ভরশীল ক'রে তুলছে। সুদূর গ্রীস, মহাচীন থেকে উত্তর ভারত পর্যন্ত তীর্থযাত্রায় আসতে পেরেছিল মানুষ, আজ সে শক্তি কোথায় গেল ? কোথায় গেল সে মাংসপেশীর বলিষ্ঠ সহযোগিতা ? দু মাইল রাস্তা হেঁটে চলৎশক্তি কেন বঞ্চনা করছে আমার আট ঘণ্টাব্যাপী অদর্শনপীড়িত মনের সঙ্গে ? তবুও চোখের ওপর দেখছি, জনতা ছুটেছে বিরামবিহীন গতিতে, দৈত্যের মত ছুটেছে ডবল ডেকার, প্রাইভেট কার, ট্যাক্সি, রিক্‌শা, দ্বিচক্রযান।

ক্লান্তিভারাক্রান্ত পা দুটোকে সচল করবার চেষ্টা করছি, উঠেও

দাঁড়িয়েছি কোন রকমে, হঠাৎ চোখে পড়ল আমার অত্যন্ত কাছে বড় একটা মেহগনি গাছের আড়ালে কে একজন সমস্ত শরীর এলিয়ে দিয়ে শুয়ে আছে।. গাছের ব্যবধান ছিল ব'লেই হয়তো লক্ষ্য করি নি লোকটিকে। নিম্নশ্রেণীর লোক, সম্পূর্ণ খালি গা, কাপড়খানাও অত্যন্ত জীর্ণ, অপরিষ্কার এবং স্বল্পপরিসর। মোট কথা, খাঁটি প্রলেটেরিয়েট: ভাবলাম, দরিদ্র হ'লেও এরা অত্যন্ত সহজ। সকালে দশটার খবর রাখে না, পাঁচটায় উর্ধ্বপুচ্ছ হয়ে ঘরে ফিরতে হয় না। খাওয়া শোয়ার সময় নেই, জীবনকে নিয়মিত করবার কোন গরজ নেই। শ্রীশঙ্করাচার্যের দর্শনমতে, কৌপিনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।

কিন্তু ভাগ্যবানকে ভাল ক'রে দেখতে গিয়ে আমার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত ভয়ে শিউরে উঠল। ভাগ্যবানই বটে! অত্যন্ত ভাগ্যহীন কোন মানুষের শব। নিতান্ত সাধারণ দৃশ্য। পথে ঘাটে, ফুটপাথে, মাঠে ময়দানে অহরহ জনতার চোখে পড়ছে এ অপমৃত্যু। কেউ ফিরে দেখে, কেউ দেখেও দেখে না। আমিও তো অনেক দেখেছি এ জিনিস। ১৯৪৩-এর মন্বন্তরে ভুখা মানুষকে দলে দলে মরতে কে না দেখেছে? সমাজসেবী, সাহিত্যসেবীর কতই না খোরাক জুগিয়েছে এই সমস্ত হতভাগ্যের দল। দেখতে দেখতে সে আন্দোলন থেমে গেল, কিন্তু সে মৃত্যু তো বন্ধ হ'ল না? মানুষের মনের অপার সহিষ্ণুতা ব্লটিঙের মত বেমালুম শুষে নিল অসহায় মৃত্যুর বেদনাবোধটুকু।

আবার চেয়ে দেখলাম বিগতপ্রাণ দেহটার দিকে। দীর্ঘাবয়ব দেহ, হাত পা বুক পিঠে সুগঠিত স্বাস্থ্যের ছাপ লেগে রয়েছে। গায়ের চামড়ায়, মাথার চুলে, মুখাবয়বের সুদৃঢ় সংস্থানে যৌবনের বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ তখনও মিলিয়ে যায় নি। তবে কেন অকালে মারা গেল লোকটি? জীবনের কক্ষপথ থেকে কেন ছিটকে পড়ল? কিসের অভাব ছিল তার? তিল তিল ক'রে স্বাস্থ্য আহরণ করল যে প্রাণশক্তি, বিশ্বপ্রকৃতির কোন্ নির্দেশে অকালে স্তব্ধ হয়ে গেল তার যাত্রা? অশীতিপর, জীর্ণ, বিগলিতদেহ জোড়াতালি দিয়ে বেঁচে থাকে কোন্ শক্তিতে? সে শক্তির সহায়তা থেকে কেন বঞ্চিত হ'ল এই হতভাগ্য তরুণ?

দেখতে দেখতে মনের ভেতর প্রশ্নের ভিড় জ'মে গেল। ঘর বাড়ি, স্নেহের আশ্রয় ছেড়ে কেন মানুষ বাইরে এসে মরে? কোন্ প্রতিকার-বিহীন দুঃখের তাড়নায় নিভৃত গৃহকোণ ছেড়ে রাজপথের প্রকাশ্য নির্লজ্জতায় অনাবৃত ক'রে দেয় নিজস্ব মর্যাদাবোধ? যুবতী নারী পর্যন্ত লজ্জাশরম লুটিয়ে দেয় পথচারীর লোলুপ দৃষ্টির সামনে। যদি কারুর দয়া হয়, কেউ যদি একটা তৃণাঙ্কুরও ফেলে দেয় তার সামনে, জীবনের চলন্ত স্রোতে কোন রকমে যদি ভেসে থাকতে পারে! ঠিক যেমন ক'রে চ'লে আসে লোক দলে দলে পল্লীগ্রাম থেকে শহরে, ঘরবাড়ি ফেলে রেখে।—ওই দেখুন বাবু ছেলেমেয়েদের অবস্থা। তিন দিন খাওয়া নেই। দু চার পয়সার মুড়ি কিনে গ্যান বাবু, গরিবের প্রাণ বাঁচান। সুন্দরবন থেকে আসছি বাবু।

অথবা এমনও তো হতে পারে, কারুর কাছে হাত পাততে পারে নি ব'লেই বাঁচবার অধিকার পায় নি লোকটি। হয়তো নিষ্ফল প্রত্যাশায় পথের দিকে চেয়ে থেকেই শেষনিদ্রায় ঢেকে গেছে ওর চোখ দুটি! মানুষের মমত্ববোধকে স্পর্শ করতে পারে নি ওর মূক আবেদন! তবুও তো নির্মম নয় মানুষ। পথে ঘাটে কেউ হোঁচট খেলে, মূর্চ্ছা গেলে, চারদিক থেকে ভিড় ক'রে লোক ছুটে আসে সাহায্য করতে। প্রকাশ্য রাজপথে অবাধ্য একগুঁয়ে ছেলেকে শাসন করতে গিয়ে পথচারীর হাতে নিগৃহীত হয় বাপ—এ দৃশ্যও তো বিরল নয়। তবে কেন রিক্ত সর্বহারা মানুষকে শেয়াল-কুকুরের মত পথে পথে মরতে দেখেও মুখ ফিরিয়ে চলে যায় লোক?

ইতিমধ্যে কখন যে অন্ধকার হয়ে গেছে খেয়াল ছিল না। রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বেলে গেছে। বিদেশী আসব আর দেশী পণ্যের বিজ্ঞাপন-বাহী বিচিত্রবর্ণের নিয়ন সাইনগুলো জ্ব'লে উঠেছে। সারাদিনের কর্মক্লান্ত প্রবাহে ভাঁটার টান ধরেছে। পরিবর্তিত পটভূমিকায় ঘন অন্ধকারের মধ্যে আমার মনের সামনে অতি করুণ, অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী এক বিয়োগান্ত নাটকের শেষ অঙ্কের ওপর মহাকালের অদৃশ্য যবনিকা নেমে আসছে।

এ নাটকের কুশীলবগণ অজ্ঞাত। ঘাত-প্রতিঘাত অপরিজ্ঞাত।

শুধু শেষ পরিণতিটুকু দিনান্তের বিদায়ী লগ্নে মনটাকে আমার আচ্ছন্ন ক'রে আনছে। মনের মধ্যে কাঁটার মত বিঁধছে আক্ষেপ, ম'রেও কিছু জুটল না বেচারীর ভাগ্যে, না এক ফোঁটা চোখের জল, না একটা দীর্ঘনিশ্বাস। একটু পরেই পুলিসের গাড়ি এসে তুলে নিয়ে যাবে বেওয়ারিশ শবটাকে। ডোমেরা নাকে মুখে কাপড় বেঁধে অবজ্ঞার সঙ্গে নামিয়ে নেবে দেহটা। তারপর চলবে কতকগুলো প্রহসন, আইনের বাঁধা ফরমুলায় গোটাকতক অনুসন্ধান—হত্যার কোন সম্বন্ধ আছে কি না এই মৃত্যুর সঙ্গে? কেউ গলা টিপে মেরেছে কি না, বিষ দিয়েছে কি না, শরীরে কোন আঘাতের দাগ আছে কি না, অথবা গোপন অঙ্গে কোন মৃত্যুদায়ক চিহ্ন? না। কিছুই পাওয়া গেল না। বাস্, এক কলমেই কর্তব্য সেরে দেবেন বিচারক। মনুষ্যসমাজকে, দেশকে, জাতিকে বেকসুর খালাস দিয়ে দেবেন এই হতভাগ্যের মৃত্যুর যাবতীয় দায়িত্ব থেকে। আপনিই মরেছে। নৈসর্গিক ব্যাপার। গাছের পাতা ঝরে। জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে আবর্জনার মত উড়ে বেড়াচ্ছে মানুষ। আপনিই জন্মায়, আপনিই মরে। না খেয়ে ম'রে থাকে, তাতেই বা ক্ষতি কি? কারুর কেড়ে না খেলেই হ'ল। মরেছে, উপায় নেই, কেউ না মেরে ফেললেই হ'ল। ভাল লোক। সমাজকে বিব্রত করল না, আইনকে কলুষিত করল না।

তবুও অবাধ্য মনকে শায়েস্তা করতে পারলাম না। একগুঁয়ে ছেলের মত রুখে দাঁড়িয়ে বললে, কেন?

কি দেখছ বাবা দাঁড়িয়ে? সারাদিন খাওয়া হয় নি। কিছু দেবে? চেয়ে দেখি, আমার বিয়োগান্ত নাটকের নায়ক উঠে এসেছে। হাসব কি কাঁদব ঠিক করতে পারলাম না। পকেট হাতড়ে দেখলাম, ফিরতি বাসভাড়া বাবদ পয়সাটা খরচ হয় নি। কাছে গিয়ে হাতে তার পয়সাগুলো দিতে যেতেই উৎকট একটা গন্ধ লাগল নাকে।

বুঝলাম, অপাত্রে দানটা করলাম।

তবুও মনে হ'ল, নাটকটার বিয়োগান্ত পরিণতি না হয়ে ভালই হয়েছে।

শ্রীতারকদাস চট্টোপাধ্যায়

ধূমাবতী

অস্তিত্ব অনড় নয়, সতত অস্থির
বারম্বার এই সত্য করি আবিষ্কার।
কল্পনা-নয়নে দেখি অস্তিত্ব আমার
মহাস্রোতে চলেছে ভাসিয়া।
ঘিরিয়া তাহারে জন্মমৃত্যু করিতেছে খেলা
নানা সাজ পরাইছে তারে
চতুর্দিকে কল্লোলিছে মহাবর্তধ্বনি।

সহসা আবার দেখি থেমে গেছে সব
দেখি আমি স্থির, চির-স্থির
স্থাণু মহাকাল।

কুয়াশা-গুণ্ঠনে ঢাকা ধূমাবতী কহে কানে কানে
(গুণ্ঠনের অন্তরালে মাঝে মাঝে দেখা যায় লোল-জিহ্বা তার)
কহে চুপি চুপি—
স্থির-অস্থিরের দ্বন্দ্ব ঘুচিবে যখন
জীবন-কাব্যের ছন্দে হবে না পতন।
আমি ক্ষুধাতুরা দুর্গা এই দ্বন্দ্ব নিরসন তরে
শিবেরে করিয়াছিনু গ্রাস ;
তবু দ্বন্দ্ব ঘোচে নাই,
ধূমাচ্ছন্ন হইয়াছি শুধু।
আমারি মতন তুই ক্ষুধাতুর কবি
সমিধ পড়িয়া আছে, কোথা অগ্নি, কোথা তোর হবি!

কানে কানে বলে আর হাসে।

"বনফুল"

হ্যামলেট, ডেনমার্কের কুমার

৪র্থ দৃশ্য। দুর্গসম্মুখস্থ মঞ্চ

[হ্যামলেট, হোরেসিয়ো ও মার্সেলসের প্রবেশ]

হ্যাম। তীব্রভাবে দংশিছে বাতাস ; বড় ঠাণ্ডা আজ।
হোরে। বাতাসটা তীক্ষ্ণ খরধার।
হ্যাম। কটা হ'ল ?
হোরে। মনে হয় বারোটা বাজে নি।
মার্সে। না, বেজে গেছে।
হোরে। তাই না কি ? আমি তো শুনি নি।
তা হ'লে তো পূর্বের মতন
আসার সময় হয়ে এল।
[ভিতরে তূর্যধ্বনি ও কামানের শব্দ]
এ সবের হেতু কি কুমার ?
হ্যাম। আজ রাজা সারারাত্রি জাগি'
মত্ত হয়েছেন সুরাপান-মহোৎসবে।
সুরাপাত্র যত তিনি করেন নিঃশেষ,
ঢলিয়া পড়েন যত মহাদম্ভ ভরে,
তত বাজে তূরী ভেরী, গাজে জগঝম্প
রাজ-মহিমার জয় ঘোষিয়া সঘনে।
হোরে। প্রথাই কি এই ?
হ্যাম। তাই বটে ; কি বলি, প্রথাই এটা বটে।
আমি জন্মিয়াছি হেথা,
এরই মাঝে পালিত বর্ধিত ;
আমার তো মনে হয়,—
পালন হইতে এর লঙ্ঘনই অধিক।
তথাপি আসব নিয়ে এই মাতামাতি,
কি প্রাচী কি প্রতীচ্যে সবাই

অখ্যাতি রটায় আমাদের।
তারা বলে আমরা মাতাল,
শূকরবর্গীয় ব'লে করেঁ অভিহিত ;
যে সব সদ্‌গুণ আছে চরিত্রে মোদের,
জাতিটার অস্থিমজ্জা গঠিত যাহাতে,
সে সকলই ব্যর্থ হয় এই এক দোষে।
শুধুই জাতির নয়,
মানুষেরও ভাগ্যে তাই ঘটে।
হয়তো কাহারও আছে জন্মগত ত্রুটি,—
জন্ম কারও নহে ইচ্ছাধীন,
সে ত্রুটির অপরাধও জাতকের নহে,—
অথবা কাহারও ধাতু এমনই গঠিত
একরোখা বেড়ে যায়
ভেঙে চূরে বিবেকের বাধা ও নিষেধ,
কিংবা কারও সুন্দর স্বভাবে
ওতপ্রোত হয়ে গেছে কোন কদভ্যাস,
এই সব লোক, জেনো, শুধু এক দোষে
সমাজে নিন্দিত হয়ে রহে চিরকাল।
তাহাদের গুণাবলী,
হোক না তা যতই মহৎ আর যতই প্রচুর,
ভেসে যায় নিন্দাস্রোতে ওই এক দোষে ;
সে দোষ হয়তো স্বভাবজ,
কিংবা গ্রহবৈগুণ্যের ফল,
যাই হোক, এক ফোঁটা গোমূত্র-প্রভাবে
অমেধ্য হইয়া যায় দুগ্ধের কলস।

হোরে। দেখুন কুমার, সে এসেছে!

[প্রেতের প্রবেশ]

হ্যাম। ক্ষেমঙ্কর দেব যক্ষ রক্ষ আমাদের!
শুদ্ধ আত্মা হও কিংবা অভিশপ্ত প্রেত,
বহি এনে থাক সাথে স্বর্গ-সমীরণ
অথবা রৌরবতপ্ত ঝঞ্ঝার ঝাপট,
উদ্দেশ্য মহৎ হোক কিংবা কলুষিত,
যে জিজ্ঞাসাময় মূর্তি ধরিয়া এসেছ
কথা মোরে কহিতেই হবে।
ডাকিব হ্যামলেট বলি, রাজা, পিতা, ডেনমার্ক-ভূপতি
বলি সম্বোধিব তোমা।
কথার উত্তর দাও, ওগো!
না জেনে যে বুক ফেটে যায়।
বল, বল, যথাবিধি সমাহিত তব শবদেহ
কেন বাহিরিল ছিঁড়ি আবরণ তার?
শান্তভাবে ছিলে শুয়ে যে সমাধিতলে
কেন সে ব্যাদিল তার গুরুভার পাষাণ-বদন
উদ্গারিয়া ফেলিতে তোমায়?
তুমি মৃত শব,
বর্মে চর্মে এলে ফিরে—
ক্ষীণচন্দ্রা রজনীরে করিয়া বিকট,
প্রকৃতির ক্রীড়নক আমাদের বুকে
জাগাইয়া অপ্রাকৃত মহা আলোড়ন
প্রাণ যার না পায় পরিধি!
এ সবের অর্থ ই বা কী?
বল, কেন, কোথা হতে এলে,
কী করিতে পারি মোরা?

[প্রেত হ্যামলেটকে হাতের ইশারায় ডাকিল]

হোরে। সাথে যেতে করিছে ইঙ্গিত,
মনে হয় কোন বার্তা চাহে জানাইতে
শুধু আপনারই কাছে।

মার্সে। দেখুন, কি ভদ্রভাবে করিছে সংকেত
আপনারে নিয়ে যেতে দূরে।
ওর সাথে যাবেন না যেন।

হোরে। না না, কিছুতেই নয়।

হ্যাম। কথা তো কহে না ; যাব আমি ওর সাথে।

হোরে। যাবেন না দেব।

হ্যাম। কেন? ভয়টা কিসের?
এ প্রাণের মূল্য এক কপর্দকও নহে।
পরকাল? কি ক্ষতি সে পারে করিবারে?
আত্মা মোর ওরই মত চিরমৃত্যুহীন।
আবার ডাকিছে মোরে। যাই পিছু পিছু।

হোরে। শুনুন কুমার,
ও যদি ভুলায়ে লয় সমুদ্রের পানে,
কিংবা ভয়াবহ তুঙ্গ পর্বতচূড়ায়
নিম্নে পাদদেশে যার অথই সাগর,
সেখানে ধরিয়া কোন ভীষণ মূরতি
জ্ঞান বুদ্ধি লুপ্ত ক'রে
উন্মাদ করিয়া দেয় যদি?
ভাবিয়া দেখুন। সমুচ্চ পর্বতশৃঙ্গ হতে
যাহে যেবা গর্জমান সিন্ধুর অতলে,
ভয়ভীত তারই চিত্তে
জেগে ওঠে অকারণে মরণের লোভ!

হ্যাম। এখনো ডাকিছে মোরে।

চল চল আমিও যেতেছি।

মার্সে। না কুমার, কিছুতে হবে না যাওয়া।

হ্যাম। যেতে দাও মোরে।

হোরে। ক্ষান্ত হোন, যাবেন না।

হ্যাম। শুনিতেছি নিয়তির ডাক ;
এ দেহের প্রতি পেশী হইয়াছে আজ
সিংহসম সুদৃঢ় সতেজ।
এখনো ডাকিছে। ছেড়ে দাও মোরে।
সত্য কহি, যে আমারে দিবে বাধা
যমদ্বারে পাঠাইব তারে।
স'রে যাও। চল যাই।

[প্রেত ও হ্যামলেটের প্রস্থান]

হোরে। উত্তপ্ত মস্তিষ্ক তারে করেছে মরিয়া।

মার্সে। আমরাও পিছে পিছে যাই ;
এ সময় ঠিক নয় আদেশ-পালন।

হোরে। তাই চল। কোথা এর শেষ পরিণতি ?

মার্সে। ডেন্‌মার্কের রাষ্ট্রমূলে
কি একটা ঘটেছে গলদ।

হোরে। সবই ঈশ্বরের হাতে।

মার্সে। না না, চল মোরা পিছু পিছু যাই। (প্রস্থান)

৫ম দৃশ্য। মঞ্চের অপর পার্শ্ব

[প্রেত ও হ্যামলেটের প্রবেশ]

হ্যাম। কোথা নিয়ে যেতে চাও মোরে ? কথা কও ;
আর আমি যাব না কোথাও।

প্রেত। হও অবহিত।

হ্যাম। হইয়াছি।

প্রেত। সময় ফুরায়ে এল মোর ;
এখনি ফিরিতে হবে
জ্বলন্ত-গন্ধকগন্ধী দারুণ যন্ত্রণাময় অনলশিখায়।

হ্যাম। হায় রে দুর্ভাগা !

প্রেত। অনুকম্পা ক'রো না আমায়,
যে কথা বলিব তাই শোন মন দিয়ে।

হ্যাম। বল, নিশ্চয় শুনিব।

প্রেত। শুনিবার পরে প্রতিশোধ নিতে হবে।

হ্যাম। সে কি !

প্রেত। আমি তব পিতার প্রেতাত্মা ;
যত যত মহাপাপ করেছি জীবনে
পুড়িয়া নিঃশেষ নাহি হয় যতদিন
ততদিন প্রায়শ্চিত্ত করি এইভাবে,—
সারারাত্রি ঘুরিয়া বেড়াই,
সারাদিন অগ্নিকুণ্ডে কাটে উপবাসে।
যে কারার বন্দী আমি
সেথাকার সব কথা প্রকাশের নয় ;
তা না হ'লে শুনাতাম এমন কাহিনী
স্বল্পমাত্র শুনিলেই,—
বিকল হইত প্রাণ, শুকাত বুকের রক্ত,
দুই চক্ষু নক্ষত্র সমান হ'ত কক্ষচ্যুত,
গাঢ়বদ্ধ কেশগুচ্ছ এলায়িত হয়ে
শিহরি উঠিত যেন পুচ্ছ সজারুর।
কিন্তু সে অকূল পরজগতের কথা
রক্তমাংসে গড়া নরে শুনাবার নয়।
অন্য যাহা বলি তাহা শোন, শোন, শোন এইবার।
যদি কোনদিন তুমি ভালবেসে থাক
আপন পিতারে—

হ্যাম। ভগবান্!

প্রেত। জঘন্য অস্বাভাবিক সে হত্যার লহ প্রতিশোধ।

হ্যাম। হত্যা

প্রেত। হত্যা মাত্র সর্বক্ষেত্রে জঘন্যই হয়,
এ হত্যা জঘন্যতম, অশ্রুত, অদ্ভুত!

হ্যাম। শীঘ্র মোরে খুলে বল,
মনের মনন কিংবা প্রেমোচ্ছ্বাস সম
দ্রুত পক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িবারে চাই
প্রতিশোধ নিতে।

প্রেত। এ তোমারি যোগ্য কথা;
শুনিয়াও যদি তুমি নিষ্ক্রিয়ই থাক,
তা হ'লে বুঝিতে হবে
যে ঘন শৈবালদাম বেড়ে উঠে সুখে
নরকের রুদ্ধস্রোতা বিস্মরণী-নীরে,
তা হতে স্থবির তুমি।
শোন তবে হ্যামলেট, রটনা হয়েছে—
ঘুমায়ে ছিলাম যবে উদ্যানে আমার,
বিষধর সর্প এক দংশিল আমায়।
আমার মৃত্যুর এই মিথ্যা কাহিনীতে
ডেনমার্কের সর্বজন হ'ল প্রতারিত।
জেনে রাখ পুত্র মোর,
যে সর্প লইল তব পিতার জীবন
মুকুট তাহারই শিরে আজ।

হ্যাম। সত্যশংসী রে মোর অন্তর!
পিতৃব্য আমার!

প্রেত। সেই সে অগম্যাগামী ব্যভিচারী পশু
সুচতুর ছলনায়, বিবিধ গোপন উপহারে
ভুলাইল লজ্জাহীন কামলিপ্সা-পথে

আমার পত্নীর চিত্ত,—
সতীধর্মপরায়ণা জানিতাম যারে।
কি বলিব হ্যামলেট! কি অধঃপতন!
যে মন্ত্র উচ্চারি তারে করেছিনু পত্নীত্বে বরণ—
তা হতে ঘটে নি মোর তিলেক বিচ্যুতি;
সে মহান প্রেম ত্যজি
নিল সে আশ্রয় এক দুর্বৃত্তের পদে,
জ্ঞান বুদ্ধি শক্তি যার
অতি তুচ্ছ মোর তুলনায়!
কিন্তু, সতীধর্ম যথা নাহি টলে কভু
স্বর্গ হতে সাধে যদি কন্দর্প আপনি,
তেমনি অসতী যদি দেবপত্নী হয়
জঘন্য লালসা-পঙ্কে করে কলঙ্কিত
সতীশয্যা তার। থাক্, আর নয়!
মনে হয় গন্ধ পাই প্রাতঃ-সমীরের।
সংক্ষেপেই বলি।—
সেদিনও অভ্যাসমত ঘুমাইতেছিনু
অপরাহ্ণে উদ্যানে আমার;
চোরের মতন চুপে চুপে
এল তব খুল্লতাত
নিদ্রামগ্ন অসহায় আমার শিয়রে;
হাতে ছিল পাত্রভরা বিষলতারস,
সেই জ্বালাময়ী বিষ ঢেলে দিল মম
শ্রবণ-বিবরে। কি দারুণ বিষক্রিয়া!
দেহযন্ত্রে রন্ধ্রে রন্ধ্রে
দ্রুত সে ছুটিল তীব্র পারদের প্রায়,
জমাট করিয়া দিল প্রাণরূপী তরল শোণিত,
দুগ্ধ যথা অম্লের প্রক্ষেপে।

তখনি ফুটিল মোর সর্বাঙ্গ ছাইয়া
নিদারুণ কুষ্ঠব্যাধি সম
কুৎসিত স্ফোটক যত।
এই ভাবে সুপ্ত অবস্থায়,
আপন ভ্রাতার হাতে হারাইনু আমি
জীবন, রাজত্ব, রাণী সব এক সাথে।
আমার সকল পাপ প্রবল তখনো ;
প্রায়শ্চিত্ত, অনুতাপ, শান্তি-স্বস্ত্যয়নে
পেলাম না অবসর খণ্ডিতে সে পাপ ;
তারই বোঝা শিরে বহি
দাঁড়াতে হইবে মহা বিচারের দিনে।
কী ভীষণ এই হত্যা! কী ভীষণ!
ভীষণ হতেও কী ভীষণ!
যদ্যপি হৃদয় থাকে সহিও না ইহা।
ডেনমার্কের রাজশয্যা দেখো যেন আর
কলঙ্কিত নাহি হয় ঘৃণ্য ব্যভিচারে।
কিন্তু বৎস, চলিতে এ পথে
কলুষিত করিও না চিত্ত আপনার,
স্বহস্তে দিও না শাস্তি নিজ জননীরে।
সে ভার থাকুক বিধাতার,
আর তার আপনার বিবেকদংশনে।
এবার বিদায় বৎস !
ক্ষীয়মাণ জ্যোতিমুখে জানায় খদ্যোৎ—
প্রভাত নিকট হ'ল ওই।
বিদায়! বিদায়!
হ্যামলেট! মনে রেখো মোরে। (প্রস্থান)

হ্যাম। কোথা সব স্বর্গের দেবতা!
কোথায় ধরিত্রী! আরঁও কে কোথায়?

নরকেরও লব কি শরণ ?
হায়, শত ধিক !
যেয়ো না যেয়ো না থেমে হৃদয় আমার !
সর্বাঙ্গের পেশীচয় !
হ'য়ো না হ'য়ো না যেন সহসা স্থবির,
খাড়া ক'রে ধর মোরে।
তোমারে রাখিব মনে ! হা দুর্ভাগা প্রেত,
এই মোর বিধ্বস্ত গোলকে
যতক্ষণ স্মৃতির আসন।
তোমারে রাখিব মনে ! তাই বটে ;
স্মৃতির ফলক হতে ফেলিব মুছিয়া
যত তুচ্ছ অসার লিখন,
পুঁথিগত নীতিকথা যত ছবি, ছাপ,
আশৈশব অভিজ্ঞার যা কিছু সঞ্চয়।
মস্তিষ্কের পাতে পাতে
লিখিত রহিবে শুধু তোমারি আদেশ,
অবিমিশ্র অকৃত্রিম।
এই সত্য করিলাম, সাক্ষী ভগবান।
ওরে সর্বনাশী নারী !
ওরে নরাধম, নরাধম,
হাসিমাখা ঘোর নরাধম !
খাতাখানা, খাতাখানা ? এই যে,
লিখে রাখা ভাল,—
মুখে হাসি, মুখে হাসি, বুকে নরাধম,
অন্তত এমন লোক ডেনমার্কে রয়েছে।
(লিখিতে লিখিতে)
তা হ'লে পিতৃব্য,
তুমি হেথা রহিলে লিখিত।

এইবার সেই কথা ;—
'বিদায় ! বিদায় ! মনে রেখো মোরে ।'
সত্য করিলাম আমি শপথ লইয়া ।

মার্সেলস
হোরেসিয়ো } (ভিতর হইতে) কুমার ! কুমার !

মার্সে । (ভিতর হইতে) কুমার হ্যামলেট !

হোরে । (ভিতর হইতে) ঈশ্বর করুন রক্ষা ।

হ্যাম । তথাস্তু ।

হোরে । (ভিতর হইতে) কোথায় গো, কুমার কোথায় ?

হ্যাম । এই যে, এই যে, এস এস ভাই !

[হোরেসিয়ো ও মার্সেলসের প্রবেশ]

মার্সে । ভাল তো কুমার ?

হোরে । সংবাদ কি ?

হ্যাম । কি বলিব, অদ্ভুত !

হোরে । দয়া ক'রে বলুন কুমার ।

হ্যাম । না, তোমরা প্রকাশ ক'রে দেবে ।

হোরে । সত্য কহি, বলিব না কারে ।

মার্সে । আমিও না ।

হ্যাম । কি বল তোমরা ?
মানুষে এমন কথা ভুলেও কি ভাবে ?
কিন্তু, তোমরা তো গোপনে রাখিবে ?

হোরে
মার্সে । } নিশ্চয় রাখিব, সাক্ষী ভগবান ।

হ্যাম । সারা ডেনমার্কের মাঝে
নাই নাই একজনও হেন নরাধম
যে নয়কো পাজীর পাঝাড়া ।

হোরে । এ কথা জানাতে

কবর ছাড়িয়া কোন প্রেতাত্মা আসার
প্রয়োজন ছিল না কুমার।

হ্যাম। ঠিক, ঠিক, ঠিকই বলিয়াছ তুমি।
অতএব আর বেশি কথায় কি ফল?
পরস্পর নমস্কার ক'রে
যে যার নিজের কাজে চ'লে যাই মোরা।
সবারই যা হোক কিছু কাজ তো থাকেই,
অভিলাষও থাকে। আমি যাই, বসি প্রার্থনায়।

হোরে। কুমার, কথাগুলি এলোমেলো, বিভ্রান্তিজনক।

হ্যাম। অপরাধ হয়ে গেছে,
আন্তরিক অনুতপ্ত আমি,
সত্য কহি, আন্তরিক।

হোরে। সে কি কথা? অপরাধ কেন হবে?

হ্যাম। ঈশ্বরের নাম নিয়ে কহি হোরেসিয়ো
ঘটেছে প্রচণ্ড অপরাধ।
যে দৃশ্য দেখিনু হেথা
তাহারি প্রসঙ্গে বলি তোমাদের কাছে,—
সে প্রেতাত্মা চলে সত্য পথে।
তার সাথে কি কথা হইল, যথাশক্তি
দমন করহ ভাই সেই কৌতূহল।
এইবার বন্ধুগণ,
তোমরা বিদ্বান, বীর, সুহৃৎ আমার,
একটি সামান্য কথা দাও।

হোরে। কি কথা কুমার? নিশ্চয় তা দিব।

হ্যাম। আজ রাত্রে যা দেখিলে
জীবনে তা বলিবে না কারে।

হোরে। সত্য করি, বলিব না কারে।

মার্সে। আমিও কব না কারে, সত্য করিলাম।

হ্যাম। অসি স্পর্শ কর মোর।
মার্সে। সত্যবদ্ধ হয়েছি তো পূর্বেই কুমার।
হ্যাম। তবু, তবু, অসিস্পর্শে সত্য কর।
প্রেত। (নিম্নে) সত্য কর।
হ্যাম। আঃ হাঃ, বৎস, তুমিও বলিছ তাই ?
ওইখানে আছ বুঝি ? চ'লে এস,
শুনিলে তো কি কথা সে জানাইল
ভূগর্ভ হইতে ?
এখন সম্মত হও সত্য করিবারে।
হোরে। কি সত্য করিতে হবে বলুন কুমার ?
হ্যাম। অসিস্পর্শ করি মোর এই সত্য কর,—
যা দেখিলে বলিবে না কখনো কাহারে।
প্রেত। (নিম্নে) সত্য কর।
হ্যাম। এ কি ! সর্বব্যাপী নাকি ?
দেখি আরও স'রে যাই মোরা।
এইখানে এস বন্ধুগণ।
পুনরায় স্পর্শ কর এই অসি মোর।
অসিস্পর্শে সত্য কর,—
যা শুনিলে বলিবে না কখনো কাহারে।
প্রেত। (নিম্নে) সত্য কর।
হ্যাম। বাঃ, বেশ, মূষিকপ্রবর !
এত শীঘ্র মাটি খনি' এতখানি এলে ?
চমৎকার পুরোগামী তুমি।
বন্ধুগণ, আরও কিছু সরে এস তবে।
হোরে। সাক্ষী দিনরাত,
এমন অদ্ভুত পূর্বে ছিল না তো জানা !
হ্যাম। তা হ'লে সে অজানারে স্বাগত জানাও।
হোরেশিয়ো,

স্বর্গে মর্ত্যে হেন বস্তু বহু কিছু আছে
তোমার দর্শনশাস্ত্র স্বপ্নে যা ভাবে নি।
এস তবে, পূর্বেরই মতন সত্য কর।
এর পরে, প্রয়োজন বুঝি যদি আমি
ধারণ করিতে পারি অদ্ভুত প্রকৃতি ;
যতই বিকৃত, অসঙ্গত হোক না আমার আচরণ,
সত্য কর, সে সময় আমারে দেখিয়া
তোমরা নীরব রবে।
ভাব ভঙ্গি আভাসে ইঙ্গিতে
কারও কাছে জানাবে না জানো মোর কথা।
আপন সঙ্কটকালে
আশা যদি কর পেতে ঈশ্বরের কৃপা,
যা বলিনু সেই সত্য কর।

প্রেত। (নিম্নে) সত্য কর।

হ্যাম। স্বস্তি, স্বস্তি, ক্লিষ্ট আত্মা !

(তাহারা সত্য করিল)

বন্ধু সব,
পরিপূর্ণ প্রীতিভরে করিতেছি আত্মনিবেদন।
এই দীন হ্যামলেট, ঈশ্বর-ইচ্ছায়,
প্রীতি ও সখ্যতা দিয়ে যা পারে করিতে,
সেটুকুর অভাব হবে না। চল যাই ;
দয়া ক'রে ওষ্ঠাধরে রাখিও তর্জনী।
মর্মসন্ধি ভেঙেছে কালের,
হায় অভিশাপ বিধাতার,
সেই ভাঙা জুড়িবার তরে
জন্ম হ'ল এই দুর্ভাগার !
না, না, চল এক সাথে যাই। (প্রস্থান)

অনুবাদ° শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

অতি-প্রাকৃত

ফুরাল দিনের মানস-সরের নীলোৎপলের খেলা :
দিগন্ত জুড়ে আসন্ন ঝড় ঈগলের ডানা মেলে—
পাহাড়তলীতে ক্রমে নেমে আসে সন্ধ্যার ধূপছায়া।

বেগুনী কুয়াশা ঢেকে দিল ঢেকে একাকার বনবাট—
গুহায় গুহায় ঘা দিয়ে ফিরিছে মত্ত ঝড়ের হাওয়া :
পাহাড়ের পারে কোন্ গুম্ফার ঘণ্টা কেবল বাজে।

তুষার-মানব নামিছে আজকে দু চোখে আগুন জেলে—
সর্পিল পথে ধাপে ধাপে ওঠে প্রাক্‌পুরাণিক ছায়া :
অকল্যাণের শঙ্কায় নীচে পর্ণকুটির কাঁপে।

নেকড়ের দল লুকিয়েছে কোথা রন্ধ্রবিহীন বনে,—
মাথা গুঁজে রেখে থরো থরো কাঁপে একপাশে জাগুয়ার
সুপ্তি-হারানো জান্তবলোক ভোরের শান্তি যাচে।

পাথরে পাথরে ক্ষুরধার স্রোত শঙ্খের মত বাজে,
হাজার ঝরনা চৌদিকে মেলে সূক্ষ্ম রূপোর তার,
আয়োজন শেষ, নটনাথ বুঝি এবার প্রলয় নাচে।

পাহাড় ধ্বসল মৃত্যুর খদে, শাল্মলী-বন ফাটে,
অশরীরী কোন্ নেপথ্য হতে ছড়ায় কী হাহাকার :
আছে কি না-আছে রঙ্গমঞ্চে এ কাল রাতের শেষ!

ইস্পাত-মেঘে আকাশ ছেয়েছে : পঞ্চমাঙ্ক শুরু :—
মড়ার খুলির মত চাঁদ ডোবে একবার উঁকি মেরে :
লোমশ শরীরে মনে হয় কে যে চ'লে গেল নিশি ডেকে।

স্বপ্নচালিত জানোয়ারগুলো তিনবার কেঁদে ওঠে—
গহ্বরে বাজে প্রতিধ্বনি যে গুনে গুনে ছয়বার :
বেবুন-শিশুর কম্পিত মুখ স্তন থেকে খ'সে পড়ে।

শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ

চিরায়ু বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৩৫২ পৃষ্ঠার পর)

টানিয়া আনিলেন বলেন্দ্রনাথ, সেখানে বর্ণবিচিত্র শোভাযাত্রা কখনও ফুরায় না এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিভাসে ললিতে ইমনে কেদারায় বাহারে বেহাগে অনুক্ষণ কোন্ সানাই বাজিয়া চলিয়াছে'? এই পর্যায়ের রচনা হিসাবে উল্লেখ করা যায়—কণারক, বোম্বায়ের রাজপথ, গুজরাটে গরবা, দিল্লীর চিত্রশালিকা বা এমন আর কয়েকটি প্রবন্ধ। সর্বশেষোক্ত প্রবন্ধের বিষয় অবশ্য একটি প্রাচীন চিত্রের অ্যাল্‌বাম মাত্র, দিল্লী নয় বা দিল্লীর কোনো চিত্রাগার নয়। ক্ষুদ্রকায় কখানি অ্যাল্‌বাম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খুঁটিয়া দেখার গুণে আর অপূর্ব ভাষায় দৃষ্টিগ্রাহ্য করার কৌশলে, আমরা সত্যই-যে কোনো যাদুবিদ্যার প্রভাবে বিস্মৃত বিগত কোনো ঐশ্বর্যদীপ্ত দেশে কালে সশরীরে উপস্থিত হই নাই তাহা তো বলা যায় না। অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষীভূত আর অপরিচিতকে পরিচিত করিবার আকাঙ্ক্ষায় লেখক অনুবীক্ষণ আর দূরবীক্ষণ দুই যেন ব্যবহার করিয়াছেন, মনে হয়। কেবল কাব্যে নয়, আলেখ্যসৃষ্টির লোকেও বলেন্দ্রনাথের ঔৎসুক্য আগ্রহ ও প্রবেশ ছিল যে, উক্ত প্রবন্ধে ইহাও জানা যায়। (রবিবর্মা সম্পর্কেও বলেন্দ্রনাথের মনোজ্ঞ প্রবন্ধ আছে।) বলেন্দ্রনাথের সময়ে সুশিক্ষিত বাঙালীরও বুদ্ধিবৃত্তির আর রসবোধের এতটা প্রসার খুব অল্পক্ষেত্রেই দেখা যাইত। নিঃসন্দেহই ছয় নম্বরের লাগাও পাঁচ নম্বর বাড়িতে ভারতীয় চিত্রকলার পুনরুজ্জীবনের যে নিঃশব্দ আয়োজন চলিতেছিল, লেখক সে সম্পর্কে অন্ধ বা অজ্ঞ ছিলেন না।

বলেন্দ্রনাথের তৃতীয় বা সর্বশেষ পর্যায়ের লেখাগুলিতে দেখি সুস্মিত ইশারায় অতীতে নয়—বর্তমানে, বাহিরে নয়—অন্তঃপুরে, বাঙালীর ঘরের ভিতরে, কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীর উজ্জ্বলমধুর দৃষ্টিপ্রসাদের স্নেহচ্ছায়াতলে আমাদের আহ্বান করা হইয়াছে। বর্তমানই বটে, কিন্তু সখেদে সনিশ্বাসে বলেন্দ্রনাথ অনুভব করিয়াছিলেন, কল্যাণে প্রেমে স্নেহে সেবায় সোহাগে বিজড়িত সেই পুণ্য প্রভাব, সেই স্নিগ্ধ সৌন্দর্য, সেই ধারাবাহী জীবন-

যাত্রাছন্দ অস্তপথেই পা বাড়াইয়া দিয়াছে, অতীতে মিলাইতে বসিয়াছে—এবং আজ আমাদের কালে এই কলিকাতা শহরে ত্রিতল বাড়ির একফালি ফ্ল্যাটের বাসিন্দা আমি বলিতে পারি না, আছে কি'নাই। বাংলার স্নিগ্ধান্তঃপুরের মর্মবাণী নানা ছলে শুনাইয়াছেন বলেন্দ্রনাথ, সকল প্রাণ ঢালিয়া, প্রাণের সকল দরদ ঢালিয়া, উপলক্ষ্য যাই হোক-না কেন—নিত্যকার জীবনযাত্রা, নৈমিত্তিক উৎসব, বারব্রত-পালন, নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণের সামাজিকতা বা সেদিনের নারীর প্রসাধনকলা। স্নিগ্ধ সুন্দর প্রাচীন রীতি আর হৃদয়হীন বুদ্ধিহীন অনুকরণসর্বস্ব উগ্র আধুনিকতা উভয়ের তুলনা-প্রসঙ্গে লেখকের কী আন্তরিক বেদনা আর কী তীব্র কষাঘাত (তীব্র কিন্তু অভব্য নয়) ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে! লেখক বলিয়াছেন, 'আমরা সেই গৃহকোণমুখী প্রবাসী' যে গৃহের সর্বত্র লক্ষে অলক্ষে 'শিবসুন্দর' চিরবিরাজমান এবং 'শুচিস্নাতা সুসংযতবেশা গৃহিণীর ভক্তিভরে অবনত চারুমূর্তিখানি'র 'পরে তাঁহার স্মিত প্রসন্নতা ত্রিসন্ধ্যা বর্ষিত হইতেছে। শেষ পর্যায়ের এই রচনাগুলিতে দরদী বলেন্দ্রনাথের নিগূঢ় অন্তরের অতি নিকট পরিচয়ই আমরা পাই ও এই লেখকের সহিত নিবিড় আত্মীয়তা-বন্ধনেই বদ্ধ হইয়া পড়ি। এই সুগভীর দরদ বিচ্ছিন্নভাবে আপন গৃহসীমায় বদ্ধ না থাকায় জীবনের শেষ দিকে শুনিতে পাই বলেন্দ্রনাথ সাহিত্য ছাড়া নানাবিধ সামাজিক কল্যাণকর্মেও আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন, দীন স্বাস্থ্যের বাধাকে বার বার অস্বীকার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সমাজসেবী বলেন্দ্রনাথ, কর্মী বলেন্দ্রনাথ—তাঁহারও পরিচয় আমরা পাই 'বেনোজল' প্রভৃতি অল্প কয়েকটি লেখায়। গভীর প্রাণের কথা হইলে প্রচারকার্যও যে আপনার জাত খোয়াইয়া, বা জাত্যন্তরে উন্নীত হইয়া কী সুন্দর সাহিত্য হইতে পারে এই লেখাগুলিই তাহার নিদর্শন। ঘরে এবং বাহিরে, (অর্থাৎ সমাজে) শিবসুন্দরের ধ্যানে ও আরাধনায় বলেন্দ্রনাথের শেষ কয়েক বৎসরের কায়মনোবাক্যের সমুদয় শক্তি নিযুক্ত ছিল তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারি। তাঁহার শেষ অসমাপ্ত একটি রচনা

স্নেহশীল খুল্লতাত একটি উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিশ্বাস এবং এক বিন্দু উদ্‌গত অশ্রু সংবরণ করিয়া সমাপ্ত করিয়া দিয়াছেন জানি—'শিবসুন্দর'। সার্থক নামকরণ বলিতে হইবে।

বলেন্দ্রনাথের জীবনে আমরা দেখিতে পাই কৈশোর ও প্রথম যৌবন ব্যাপিয়া প্রথমেই নিরাকার ও নিরাধার ভাবাবেগের একটা কাল। প্রতিভাবিকাশের মুখে উহাই অনিবার্য অথবা তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের মানসিক আবহাওয়া হইতে সংক্রামিত, অতি সূক্ষ্ম সেই বিচারে নাইবা প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু রূপরসিক, সজাগ-ইন্দ্রিয়-চারী, বাস্তবনিষ্ঠ, স্পর্শযোগ্য স্বপ্নের অনুরাগী ও অভিসারী বলেন্দ্রনাথের হৃদয়, বুদ্ধি। সাময়িক মোহ কাটিয়া বা স্বাভাবিক শক্তি উদ্‌গত হইয়া যেমনি সেই মনবুদ্ধি চোখ মেলিয়া কিছু একটা দেখিল, একটা নির্দিষ্ট বিষয় পাইল, তখনি তাহার ঘুমন্ত ভাব কিছুই রহিল না এবং রসিক পাঠকও তাঁহার ঈজি-চেয়ারে সোজা হইয়া বসিলেন। নূতন জগৎ—পুরাতন জগৎই বটে, আনকোরা নূতন কোথায় পাওয়া যাইবে? কিন্তু, কেই বা দেখে? কাজেই নূতন আবিষ্কার—সেই নূতন জগৎ শোভাযাত্রাবৎ আমাদের সম্মুখে প্রাণে গানে রূপে রঙে চঞ্চল হইয়া উঠিল। প্রত্যক্ষ বিষয় পাইয়া বলেন্দ্রনাথের প্রতিভা বাঁচিয়া গেল। আর, অন্য একদিন দেখিলাম, প্রত্যক্ষ বিষয় লাভ করিয়া, কল্যাণকর্মে নিযুক্ত হইয়া, বলেন্দ্রনাথের জীবনও বুঝি বাঁচিয়া উঠিতে, জাগিয়া উঠিতে, উদ্যত হইল। কী যে হইতে পারিত কিছুই জানি না, এইমাত্র জানি অন্ধ নিয়তি সেই মুহূর্তেই আপনার খামখেয়ালে, আপনার স্বতন্ত্র ইচ্ছায়, অমূল্য আয়ুসূত্রটি সহসা ছিন্ন করিয়া দিল। তা হউক, বলেন্দ্রনাথ অল্প যা রচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যেও এমন অনেকগুলিই রহিয়াছে সাহিত্যে যাহার স্থায়ী মূল্য আছে বা থাকিবে; রসিকজন চিরদিনই মুগ্ধ ও পুলকিত হইয়া উঠিবেন। মাত্র উনত্রিশ বৎসরের জীবনেই এই লেখক চিরায়ু অর্জন করিয়া গেলেন।

বলেন্দ্রনাথের অপূর্ব রচনাবলীর বহু অংশ সঙ্কলন করি, এ বিষয়ে আমাদের অপার-অপার-নাই লোভ ছিল। কোথায় ক্ষান্ত হইব কী জানি, এই আশঙ্কায় লোভ সংবরণ

করিয়াছি। আর, টুকরা টুকরা উদ্‌ধৃতিতে পাঠক তেমন সুখ কি পাইবেন যাহা অবসরকালে আদ্যন্ত রচনার পাঠে নিভৃতচিত্তে সঞ্চিত হইয়া উঠিবে ?

বর্তমান গ্রন্থাবলীতে বোধ হয় বলেন্দ্রনাথের প্রায় সকল লেখাই একত্র সঙ্কলিত হইয়াছে। (বলেন্দ্রনাথ আপন জীবনকালে নানা প্রবন্ধের একখানি সঙ্কলন—'চিত্র ও কাব্য'—নামটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার মতো—এবং দুইখানি কবিতার বই প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।) নির্বিচারে সকল লেখা সঙ্কলন করা সঙ্গতই হইয়াছে, কিন্তু সুলভে ও সহজে সাহিত্যসম্ভোগ যাহাতে সম্ভব হয় এজন্য বাছাই প্রবন্ধের একটি পৃথক সঙ্কলন আশু প্রকাশ করাও বিশেষ প্রয়োজন ; তাহাতে 'চিত্র ও কাব্য' বইখানির সব লেখাই দিতে হইবে এমন নয়, অপর পক্ষে মাসিক পত্রিকাগুলি হইতে চয়ন করা অনেক লেখাই স্থান পাইবে—মোটের উপর সাহিত্যরসিকদের চোখের সামনে, মনের সামনে, সেই লেখাই তুলিয়া ধরিতে হইবে যাহাতে বলেন্দ্রনাথের কল্পনার ও ভাবব্যক্তির সংযম সংহতি ও প্রৌঢ়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে, বাস্তবের দৃঢ়ভূমিতে তাহার প্রতিষ্ঠা দেখা যাইতেছে—তবেই এক কালের প্রতিভা আর-এক কাল অনায়াসে চিনিয়া লইবে এবং হর্ষে সুখে চঞ্চল হইয়া উঠিবে। (বর্তমান গ্রন্থ 'প্রবাসী'র আকারে কিঞ্চিদধিক ৬০০ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, ইহার এক-চতুর্থাংশ নির্বাচন করিয়া লইয়া আঁটি বাঁধিলেই অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ হইতে পারিবে।) বলেন্দ্রনাথের সকল লেখা একত্র পাওয়াতে যাঁহারা সমালোচক, যাঁহারা যে-কোনো প্রতিভার প্রকৃতি ও পরিণতি সম্পর্কে ঔৎসুক্য রাখেন, তাঁহাদের বিশেষ সুবিধা হইবে। সেদিক দিয়া আরও ভাল ছিল, ইতিহাসের খাতিরে (কিন্তু তাই কি ?) পুরানো সীমানার খুঁটিগুলার মায়া না করিয়া প্রত্যেক লেখাই যদি প্রথম প্রকাশের কাল অনুসারে পর পর সাজানো হইত ! রচনার কাল অবশ্য পাওয়া যায় না।

কানাই সামন্ত

বেতালের বৈঠকী

মেকীরাই সব চেয়ে চলে দুনিয়াতে।
মেকী টাকা একদিনে ঘুরে দশ হাতে,
আসল টাকারে করি ক্যাশবাক্সে বন্দী,
মেকী চালাবারই তরে আঁটে সবে ফন্দী।

বেতালভট্ট

সংবাদ-সাহিত্য

"কল্যাণী একা সেই জনশূন্য স্থানে প্রায় অন্ধকার কুটীরমধ্যে চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার মনে বড় ভয় হইতেছিল। কেহ কোথাও নাই, মনুষ্যমাত্রের কোন শব্দ পাওয়া যায় না, কেবল শৃগাল-কুক্কুরের রব। মনে করিলেন, চারিদিকে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসি। কিন্তু একটি দ্বারেও কপাট বা অর্গল নাই। এইরূপ চারিদিক্ চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সম্মুখস্থ দ্বারে একটা কি ছায়ার মত দেখিলেন। মনুষ্যাকৃতি বোধ হয়, কিন্তু মনুষ্যও বোধ হয় না। অতিশয় শুষ্ক, শীর্ণ—অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ, বিকটাকার মনুষ্যের মত কি আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে সেই ছায়া যেন একটা হাত তুলিল, অস্থিচর্ম-বিশিষ্ট অতিদীর্ঘ শুষ্ক হস্তের দীর্ঘ শুষ্ক অঙ্গুলি দ্বারা কাহাকে যেন সঙ্কেত করিয়া ডাকিল। কল্যাণীর প্রাণ শুকাইল। তখন সেইরূপ আর একটা ছায়া—শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, উলঙ্গ—প্রথম ছায়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর একটা আসিল, তার পর আরও একটা আসিল। কত আসিল, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তাহারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই প্রায় অন্ধকার গৃহ নিশীথ শ্মশানের মত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। তখন সেই প্রেতবৎ মূর্তি সকল কল্যাণীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কল্যাণী মূর্ছিতা হইলেন।"

ইহাই হইল 'উপক্রমণিকা'; ইহার পর 'ব্যাকরণ-কৌমুদী'ও আছে :—

"যে বনমধ্যে দস্যুরা কল্যাণীকে নামাইল, সে বন অতি মনোহর। দেশে আহার থাকুক না থাকুক—বনে ফুল আছে, ফুলের গন্ধে সে অন্ধকারেও আলো বোধ হইতেছিল। মধ্যে পরিষ্কৃত ভূমিখণ্ডে দস্যুরা কল্যাণীকে নামাইল। ঘিরিয়া বসিল। কিছু অলঙ্কার ছিল, এক দল তাহার বিভাগে ব্যতিব্যস্ত। এক জন বলিল, আমরা সোনা-রূপা লইয়া কি করিব, একখানা গহনা লইয়া কেহ আমাকে এক মুঠা চাল দাও, ক্ষুধায় প্রাণ যায়—আজ কেবল গাছের পাতা খাইয়া আছি। এক জন এই কথা বলিলে সকলেই সেইরূপ বলিয়া গোল করিতে লাগিল, চাল দাও, চাল দাও, ক্ষুধায় প্রাণ যায়, সোনা-রূপা চাহি না। দলপতি তাহাদিগকে

থামাইতে লাগিল, কিন্তু কেহ থামে না; ক্রমে উচ্চ উচ্চ কথা হইতে লাগিল, গালাগালি হইতে লাগিল, মারামারির উপক্রম। যে যে-অলঙ্কার ভাগ পাইয়াছিল সে সে-অলঙ্কার রাগে দলপতির গায়ে ছুঁড়িয়া মারিল। দলপতি দুই একজনকে মারিল। তখন সকলে দলপতিকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। দলপতি দুই এক আঘাতেই ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তখন ক্ষুধিত, রুষ্ট, উত্তেজিত, জ্ঞান-শূন্য দস্যুদলের মধ্যে এক জন বলিল, শৃগাল কুক্কুরের মাংস খাইয়াছি। ক্ষুধায় প্রাণ যায়, এস ভাই! আজ এই বেটাকে খাই। তখন সকলে জয় কালী! বলিয়া উচ্চনাদ করিয়া উঠিল, বম কালী! আজ নরমাংস খাইব। এই বলিয়া সেই বিশীর্ণদেহ কৃষ্ণকায় প্রেতবৎ মূর্তি সকল অন্ধকারে খলখল হাস্য করিয়া করতালি দিয়া নাচিতে লাগিল।”

‘ব্যাকরণ-কৌমুদী’ চতুর্থ ভাগ পর্যন্ত পাঠ এখনও আয়ত্ত না হইলেও শেষরক্ষার জন্য ‘মুগ্ধবোধে’রও ব্যবস্থা আছে—

“কল্যাণী এক বৃহৎ বৃক্ষতলে কণ্টকশূন্য তৃণময় স্থানে বসিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলেন, কোথায় তুমি, যাঁহাকে আমি নিত্য পূজা করি, নিত্য নমস্কার করি, যাঁহার ভরসায় এই বনমধ্যেও প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলাম, কোথায় তুমি হে মধুসূদন! এই সময়ে ভয়ে, ভক্তির প্রগাঢ়তায়, ক্ষুধাতৃষ্ণায়, অবসাদে কল্যাণী ক্রমে বাহ্যজ্ঞানশূন্য, আভ্যন্তরিক চৈতন্যময় হইয়া শুনিতে লাগিলেন, অন্তরীক্ষে স্বর্গীয় স্বরে গীত হইতেছে—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে,
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে
হরে মুরারে মধুকৈটভারে।”

অবশ্য মন্ত্র বদল হইয়াছে, “হরে মুরারে” আর নাই, এখন “রঘুপতি রাঘব সীতারাম” হইয়াছে।

—

আমরা বরাবরই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি এই কংগ্রেস অধিবেশনের সময় গোপালদার বায়ু কিছু প্রবল হয়। অনেক কাল তিনি দেশছাড়া; সচরাচর কি অবস্থায় থাকেন তাহা অবশ্য জানি না। কাঠমুণ্ডু হইতে

তাঁহার শেষ সংবাদ পাই, তাহাও দীর্ঘদিন হইতে চলিল। গত দুই-চারি বৎসর কংগ্রেস-অধিবেশন তেমন জোরাল হয় নাই, তাই হয়তো গোপালদার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। প্রয়াগে কুম্ভের মত কল্যাণী-কংগ্রেসেও এবার পূর্ণকুম্ভ, চূড়ামণি যোগ। গোপালদার এবার অতিরিক্ত বায়ু-আধিক্যের তাহাই কারণ হইতে পারে। তিনি আমাদিগকে সহসা কিঞ্চিৎ কাব্যাঘাত করিয়াছেন, ঠিকানা দেখিতেছি—কেয়ার অব দালাইলামা, তিব্বত। তাঁহার বামপন্থাপ্রীতিতে পূর্বে বেশ একটু ভয় পাইয়াছিলাম; কিন্তু এবার তিনি যে কবিতাগুচ্ছ ছুঁড়িয়াছেন তাহাতে বাম-উগ্রতা নাই, বরঞ্চ দক্ষিণের প্রতি আকর্ষণজনিত উদ্বেগ ও অসন্তোষ প্রকাশ পাইয়াছে; কল্যাণীর নেতাদের লইয়া যে কবিতা লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের প্রতি অনাবিল অকপট প্রীতি সুস্পষ্ট। আর একটা কথা। তিনি অত দূরে থাকিয়াও স্বদেশীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে যে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল তাহা দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও পুলকিত হইয়াছি, নিশ্চয়ই তাঁহার কোনও তৎপর নিজস্ব প্রতিনিধি আমাদের কাছাকাছিই আছেন। যাহা হউক, তাঁহার নেতা-প্রশস্তি কবিতাটি সর্বাগ্রে প্রকট করিতেছি ঃ

খুলে অভিধান
নিজের নিদান
দেখে না বিধান রায়।
হইয়া ফুল্ল
কদলী তুল্য
ঘোষ অতুল্য ধায়।
মহিষ-শৃঙ্গে
ভ্রান্ত ভৃঙ্গ
বিমল সিংহ রহে।
"হাসির বাহার
আর বা কাহার ?"
বিজয় নাহার কহে।

আইন-তত্ত্ব
ফাঁক ও গর্ত্ত
অসীম দত্ত জানে।
চাঁদি-চানাচুর
আসিল প্রচুর
মৃগাঙ্ক সুর-টানে।
সংস্কৃতিধর
নবকলেবর
তারাশঙ্কর চলে।
অতীত কীর্তি
ফিরিয়া ফিরতি
কবি সাবিত্রী বলে।

হেঁসেলেতে রন,
সবার শরণ
শ্রীকালোবরণ ঘোষ

ইঁহাদের মানি
যাস্ কল্যাণী,
গোপালের বাণী ল'স ॥

*   *   *

গোপালদার দ্বিতীয় কবিতাটি বক্রোক্তিপূর্ণ, তথাপি সহৃদয় ব্যঙ্গ বিধায় তাহাও ছাপিতেছি :

কল্যাণী, প্রয়াগ ও সমুদ্র-সঙ্গম,
ভারতের তিন ঠাঁই তিন কেতা রঙ্গম্ !

কপিলাশ্রম আর কংগ্রেস, কুম্ভ
হাজারে লক্ষে ছোটে ভেড়া আর ডুম্ব ।
গড্ডলিকার পায়ে পায়ে ধূলি উড়ল,
জলেতে ডুবল কিছু আগুনেতে পুড়ল ;
ডুবুক পুড়ুক তবু পালা হ'ল ধর্ম,
বুঝিল চড়ক-চোখে মড়কের মর্ম ।

দুদিনের কিঞ্চিৎ হয়রানি ধকলে
স্বর্গও এসে গেল অনেকের দখলে—
সাগরে কুম্ভে যারা গিয়েছিল কষ্টে ।

ইহকাল চায় যারা পরকাল নষ্টে
কল্যাণী-গাঁয়ে গিয়ে মায়ে ঝিয়ে কাঁদল,
বিজলী আলোকে চোখ তাহাদের ধাঁধল ।
গোলোক-ধাঁধায় ঘুরে হয়ে হতভম্ব
খুঁজিয়া না পায় কিছু প্রস্থ ও লম্ব—
পায় না আপন জন খুঁজিয়া পরস্পর
মিলাইয়া দেয় শেষে চোঙার ভগ্নস্বর ।
গাঁট-কাটা গাঁট কাটে—বক্তৃতা বক্তায়
দিয়ে যায় অবিরাম । ডায়াসের তক্তায়

নেতাপদাঘাতে ওঠে ঠক ঠক শব্দ,
তাই শুনে লাখো লোক একদম জব্দ।

রোহিত-কাতলা বেড়ে হ'ল তিমি-মৎস্য,
ভর্ৎসনা করিও না দেখে যাও বৎস।
অজ্ঞ পাড়া-গাঁয়ে খ'ড়ো মণ্ডপ বান্ধি
কি ছাই গ্রামোদ্যোগ চেয়েছিল গান্ধী!
গ্রামে ও শহরে হের একাকার কাণ্ড
আমরা করেছি হাটে ভেঙে সেই ভাণ্ড।
আলোকের ফুলঝুরি মোটরের সমাবেশ—
মনে রেখো তারি নাম কল্যাণী-কংগ্রেস!

হতভাগ্য আমরা কল্যাণী-কংগ্রেস পর্যন্ত পৌঁছিতে পারি নাই। ২৩শে জানুয়ারি নেতাজীর নাম লইয়া উৎসাহে বুক বাঁধিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম, কিন্তু গাড়ি-নিয়ন্ত্রণের চমৎকার ব্যবস্থায় পাক্কা তিন ঘণ্টা আটক পড়িয়া হরিণঘাটার দুধমিশ্রিত জল খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। সরেজমিনে তদারক করিতে পারি নাই। কাজেই পরের মুখে ঝাল খাইতে হইতেছে।

অনেক কাল পূর্বে, তা কমসে কম পনের বৎসর অবশ্যই হইবে, একবার সপরিবারে সবান্ধবে তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়াছিলাম—আগ্রা, মথুরা, হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছমন-ঝোলা। বলাইয়ের পুত্র রন্তু তখন শিশু, বড় জোর বছর পাঁচ বয়স হইবে। ফতেপুরসিক্রি তাজমহল সেকেন্দ্রাবাদ সারিয়া আমরা আগ্রার কেল্লা দেখিতে গেলাম। ঘণ্টা দুই ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া যখন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন সকলেরই মাথা ঘুরিতেছে। রন্তুকে প্রশ্ন করিলাম, কি দেখলে বাবা? রন্তু বোবরই সপ্রতিভ, তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, দেয়াল। বাস্তবিকই গ. সা. গু. কষিলে আগ্রা ফোর্টের গ. সা. গু. ওই দেওয়ালই দাঁড়ায়।

কল্যাণী-কংগ্রেস-ফেরত একজন কিশোর ও একজন প্রৌঢ়কে ওই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। কিশোরটি তৎক্ষণাৎ বলিল, কেন, আলো। প্রৌঢ়

বলিলেন, জওহরলাল। গোপালদা কাছে থাকিলে দুটিতে সন্ধি করিয়া হয়তো বলিতেন, লাল-আলো দেখিলাম।

আলোর প্রাবল্য প্রাচুর্য ও প্রাখর্যের কথা সকলের মুখেই শুনিয়াছি, চক্ষু ধাঁধিয়া যায়। যে পরিমাণ আলো ছিল, সেই পরিমাণ অন্ধকার থাকিলে নাকি পকেটমারদের অসুবিধা হইত। যাহা হউক, নিন্দুকের নিন্দা আমরা শুনিতে চাই না। লক্ষ্মণসেনের আমলে যে নিরন্ধ্র অন্ধকার নবদ্বীপকে গ্রাস করিয়াছিল তাহার গ্লানি ও কালিমা যে বিধান-বাবুর চেষ্টায় এতদিনে ধুইয়া মুছিয়া গেল সেও বড় কম কথা নয়। এখন দীর্ঘস্থায়ী বাতি দিবার জন্য কল্যাণী যদি টিঁকিয়া যায় তাহা হইলেই বিধানবাবুর বুদ্ধি ও যত্ন সার্থক হইবে, বাদশাহী ঝাড়-লণ্ঠনের টুংটাং মিঠা আওয়াজ কালের নিঃশব্দপ্রবাহে মিলাইয়া গেলেও কল্যাণীর স্নিগ্ধ দীপাধার হইতে আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া আমাদের মনের কালোকে দূর করিবে।

শ্রীজওহরলালের একচ্ছত্র প্রভাবের কথাও বহু লোকের মুখে শুনিয়াছি। বস্তুত তিনি একাই নাকি এবার কংগ্রেস পরিচালনা করিয়াছেন এবং মর্যাদার সঙ্গে পরিচালনা করিয়াছেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, পাকিস্তান ও প্রাদেশিকতা—এই তিন প্রসঙ্গে তাঁহার মন্তব্য পড়িয়া আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি। বস্তুত তাঁহার নিকট বাকি আর সকলেই নগণ্য ও তুচ্ছ হইয়া গিয়াছেন। কল্যাণীতে জওহরলালকে ভাবিতে ভাবিতে সার্. এডউইন আর্নল্ডের কয়েকটি পংক্তি আমাদের বারংবার স্মরণ হইয়াছে—

A garden in old days with hanging walks,
Fountains, and tanks, and rose-banked terraces
Girdled by gay pavilions and the sweep
Of stately palace-fronts—the Master sate
Eminent, worshipped, all the earnest throng
Watching the opening of his lips to learn
That wisdom which hath made our Asia mild;
Whereto four thousand lakhs of living souls
Witness this day.

"That wisdom which hath made our Asia mild"—জ্ঞানী জওহরলাল চিরজীবী হউন।

গোপালদা আর একটি টুকরা কবিতা পাঠাইয়াছেন, যাহার অর্থ ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। কোনও বুদ্ধিমান পাঠক অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারিবেন—এই ভরসায় খণ্ডকবিতাটি এখানে মুদ্রিত করিলাম:

কাশ্মীরে যাস নি রে "লেক"-নীরে ভাসতে,
গিরিশিরে চাঁদটি রে হয় ধীরে কাস্তে।
যাস নি রে যাস নি,
শেখ আবদুল্লার পরিচয় পাস নি?
সবাই সমান শেষ-ভালবাসা বাসতে!
পূর্ণিমা চাঁদ হেথা ধীরে হয় কাস্তে॥

পরম্পরায় শুনিলাম, কল্যাণী-কংগ্রেস একজিবিশনে কাশ্মীর সরকার-প্রদর্শিত এম্পোরিয়ামের কেন্দ্রভাগ আলোকিত করিয়া ধৃত ও বদ্ধ শেখ আবদুল্লার একটি চিত্র স্থাপিত আছে। এই সংবাদ নিশ্চয়ই গোপালদার নিকট পৌছিয়াছে এবং ইহাতেই তিনি ক্ষেপিয়া গিয়া থাকিবেন।

কুম্ভ ও কংগ্রেস অপেক্ষা কলিকাতা সেনেট হলের কবি-সম্মেলন কম বড় খবর নয়। ইহারই পরের ধাপ হইবে বাংলার কবি-সম্প্রদায়ের সরকারের নিকট মজদুর-শ্রেণীভুক্ত হইবার আবেদন। ব্রহ্ম-প্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্বে শ্রীনীহাররঞ্জন রায় খাসা চাল চালিয়াছেন, অনেকটা বৈতরণী পার হইবার জন্য গো-লেজ ধারণেরই মত। যে আদর্শে আইয়ুব-রায় অনুপ্রাণিত হইয়াছেন, সত্যকার সেই হিন্দী কবি-সম্মেলন ভাল করিয়া দেখা থাকিলে ইহারা এই ধাষ্টামো করিতে সাহস করিতেন না। কবিতা পাঠক ও শ্রোতার মধ্যে সহৃদয় অন্তরঙ্গতা স্থাপন করিতে হইলে যথাযথ কবিতা-পাঠ অভ্যাস করিতে হয়, হিন্দীওয়ালাদের মত সুরযোজনাসহ পাঠাভ্যাস করিলেও ভাল হয়। যে কল ও কৌশল অবলম্বন করিলে কবিতা স্বভাবতই সুখশ্রাব্য হয়, আধুনিক কবিদের অনেকেই কলার খাতিরে সে কল-কৌশল বর্জন করিয়াছেন। ফলে তাহাদের একূল ওকূল দুই কূল গিয়াছে, তাঁহারা সম্রাট হইয়াও ছাড়পত্র পান নাই, অর্কেস্ট্রা বাজাইতে বাজাইতে চোরাবালিতে পড়িয়াছেন। যাহা হউক, আমরা আদার ব্যাপারী, এই মানোয়ারী জাহাজ লইয়া

মাথা ঘামাইবার অধিকার আমাদের নাই। শুধু গোপালদার পাল্লায় পড়িয়া এই ব্যাপারে আমরা ফাঁসিয়া গিয়াছি। তিনি আমাদিগকে একটি কবিতা পাঠাইয়া হুকুম করিয়াছিলেন, কবি-সম্মেলনে গিয়া স্বর করিয়া পাঠ করিতে। আমরা প্রবেশাধিকার পাই নাই, সুতরাং হুকুম তামিল করিতে পারি নাই। কবিতাটি পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি, তাঁহারা দয়া করিয়া স্ব স্ব রুচি-সংস্কারমাফিক কবিতাটি সুরে অথবা বেসুরে আবৃত্তি করিয়া দেখিবেন, কবি-সম্মেলনে এই কবিতাটি পাঠাইবার কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য গোপালদার আছে কি না! গোপালদা কবিতাটির নাম দিয়াছেন "সাত সমুদ্র তেরো নদী"—নিতান্তই শিশু-কবিতা, 'মৌচাক' 'শুকতারা'তে পাঠাইলেই সমীচীন হইত।

সাত সাগরের পাঁচটি সাগর সদ্য হলাম পার,
দুইটি বাকি, তেরো নদী তার পরে রয় আর।
রাজকন্যা ঘুমোয় কোথায় রূপোর কাঠির ছোঁয়ায়,
সুয়োরাণীর চোখ ভেসে যায় ভিজে কাঠের ধোঁয়ায়।
পক্ষীরাজ যে যায় উড়ে কোন্ তেপান্তরের মাঠে,
ময়ূরপঙ্খী তলিয়ে গেল মরা গাঙের ঘাটে।
ভাবতে গিয়ে আজো মনে লাগছে চমৎকার—
সাত সমুদ্র তেরো নদী হয় নি হওয়া পার।
এ সব তথ্য কিছুই আমার হয় নি আজো জানা,
বয়স নাকি বেড়ে গেছে, জানতে এ সব মানা।
ধর্মকথা, যজ্ঞকথা, কর্মকথা খুলে
চোখের জলে ভাসি এবং কলপ লাগাই চুলে।
তবু শীতের তরুণ রাতে গা ওঠে ছুম্‌ছুমি,
গীতার পাতায় ভেসে ওঠে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী।
যতই পড়ি বেদ, ব্রাহ্মণ আর বেদান্ত-সার—
সাত সমুদ্র তেরো নদী হয় নি হওয়া পার।

শিবের বিয়ে তিন কন্যায়, নদেয় আসে বান

হিসেব-খাতা খুলে বসি জপি নামের মালা,
দাবা-পাশার ছক সাজিয়ে জমাই যে আটচালা।
হঠাৎ দূরে নজর পড়ে লম্বা তালের গাছে,
শাঁকচুন্নীর কাঁধে চেপে ব্রহ্মদত্যি নাচে।
ভয়ে দু চোখ মুদি, ভাবি কোথায় আঁচল মা'র!
সাত সমুদ্র তেরো নদী হয় নি হওয়া পার।
যে সব কথা শোনাতে চাই সে সব কথা ভুল—
কুলোর মত কান নেই তার, শনের মত চুল।
চাঁদের মাঝে হারিয়ে গেছে চরকা-কাটা বুড়ী—
নামে না মন-বটগাছে আর নামাল ঝুড়ি-ঝুড়ি।
রাতের বেলার হাজার পাখি বাঁধে না আর বাসা,
পাকাবুদ্ধি চালায় সেথা করাত সর্বনাশা।
তবু কেন পেছন পানে তাকাই বারংবার—
সাত সমুদ্র তেরো নদী হয় নি হওয়া পার॥

বাংলা দেশের প্রাচীন সংস্কৃতিকেন্দ্র নদিয়ার বুকের উপর চড়িয়া কংগ্রেসের সাধারণ ৫৯ অধিবেশনের বিহারী সভ্যেরা বাঙালী সভ্য শ্রীপ্রতাপ গুহরায়ের কণ্ঠে হিন্দী বক্তৃতা শুনিবার জন্য যে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় কংগ্রেসের সভাপতি ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল উপস্থিত থাকিয়াও তাহার সমর্থন করেন নাই। বিদেশ-বিভুঁয়ে হোমরা-চোমরাদের উপস্থিতিতেই তাঁহারা বুকের ছাতির যে বহর দেখাইয়াছেন, তাহাতে অনুমান করা অসম্ভব নয়— নিজেদের খাসদখল মানভূমে বাংলা টুসুর গান শুনিয়া সে ছাতি কতখানি ফুলিয়া উঠে। অন্তত পণ্ডিতজীর মত সহৃদয় বুদ্ধিমান ব্যক্তির তাহা অনুমান করা উচিত। ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ ঘরের লোকের ব্যাধি যথাযথ না ধরিতেও পারেন! টুসুর গান ও তৎসংক্রান্ত দমন-তাণ্ডবের সরকারী ও বেসরকারী ফাইল দিল্লীর রাজদরবারে আনাইয়া একবার নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য শ্রীজওহরলাল নেহরুকে অনুরোধ করিতেছি। বেসরকারী ফাইলের একটা নকল আমরা

পাইয়াছি। তাহার অর্ধেকও সত্য হইলে বুঝিতে হইবে, বিহার সরকার সম্মিলিত ভারত-রাষ্ট্রের নামেই কলঙ্ক লেপন করিতেছেন। এ কলঙ্ক অচিরাৎ ক্ষালিত হওয়া প্রয়োজন। স্থানীয় সংখ্যাগুরু মানুষদের ভাষা, সংস্কৃতি ও চিরাচরিত পাল-পার্বণ পালনের অধিকারের উপরেও যে ভাবে নিরাপত্তা আইনের প্রয়োগ করা হইতেছে, তাহা সভ্য পৃথিবীর রাষ্ট্র-শাসন-ইতিহাসের এক লজ্জাকর অধ্যায়। দক্ষিণ-আফ্রিকার মালান-সরকারের উপর সমগ্র পৃথিবীতে যে বিক্ষোভ ঘনাইয়া উঠিয়াছে বিহার সরকারও অনুরূপ বিক্ষোভের সম্মুখীন হইবেন, অবশ্য আমরা যদি ন্যায়ানুমোদিত ও অহিংস সত্যাগ্রহ চালাইবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র এই আন্দোলনের কথা প্রচার করিতে পারি। সুদূর দক্ষিণ-আফ্রিকার কথা ছাড়িয়াই দিলাম, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে আমাদের কোন কথাই বলিবার থাকিবে না, যদি আমাদের ঘরে অর্থাৎ ভারতে এই অন্যায় প্রতিবেশী-প্রদেশ-বিরুদ্ধতা দেখা যায়, নিজ প্রদেশের এক বিশিষ্ট প্রজাসম্প্রদায়কে শুধু ভিন্ন ভাষা বলার দরুন এইভাবে পীড়ন করা হয়। এই কথাও আজ আমাদিগকে দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে যে, ভিন্নধর্মানুশাসন-পরিচালিত পাকিস্তানে বাংলা ভাষার উপর যে অত্যাচার সম্ভব হয় নাই মানভূমে তাহাই ঘটিতেছে। কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গেল, কমিশন বসিবার প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে, এখন যাহাতে কৌশলে ভয় দেখাইয়া সাক্ষীসাবুদ না ভাঙানো হয় সে বিষয়ে ভারত-রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের সর্বাগ্রে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

মানভূমের লোকসেবক কর্মীরা যে সকল টুসুর গান গাহিয়া দলে দলে কারাবরণ করিতেছেন, সত্য বটে সেগুলি প্রধানত ভাষা-আন্দোলন লইয়াই রচিত। লোকসঙ্গীত পৃথিবীর কোথায়ও স্থান ও কাল-নিরপেক্ষ হয় না। আমাদের মঙ্গল-কাব্যগুলিতেই তাহার প্রমাণ পাই। চণ্ডী-মঙ্গল লিখিতে গিয়া মুকুন্দরামকে শ্রীচৈতন্য-বন্দনা করিতে হইয়াছে। মালদহের গম্ভীরায় বর্তমান সমস্যা লইয়া রচিত গান গীত হয়, উপলক্ষ্য থাকেন শিবোমহাদের; কিন্তু লক্ষ্য থাকে অন্যায় অসুবিধা পীড়ন অত্যাচার-(সে রাষ্ট্রীয়ই হউক অথবা সামাজিকই)-এর প্রতিবাদ জ্ঞাপন। টুসুর

গানেও বৎসরে বৎসরে সাময়িক সমস্যাগুলি গানের আকারে সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ভিখারীতেও দেশাত্মবোধক গান গাহিত। মানভূমের এখন সর্বাধিক সমস্যা—ভাষা-সমস্যা। এই সমস্যা লইয়া রচিত গান গাহিয়া গত ৯ই জানুয়ারি হইতে মানভূম লোকসেবক কর্মীরা দলে দলে ধৃত হইতেছেন। ১৩ই জানুয়ারি লোকসেবক সংঘের পরিচালক সর্বজনশ্রদ্ধেয় শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ এগারজন সঙ্গীসহ ধৃত হন। তাঁহাদের প্রতি সাধারণ কয়েদীদের মত ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ইহাতে টুসুর গান বন্ধ না হইয়া দিনে দিনে আরও প্রসার লাভ করিতেছে। শান্তিভঙ্গের মিথ্যা অজুহাত দেখাইয়া গায়কদের ধরিয়া ধরিয়া বিহার সরকার এই আন্দোলনের প্রাণশক্তি অব্যাহত রাখিয়াছেন—এ কথা অবশ্য আমরা স্বীকার করিব। আশা করি, অচিরাৎ তাঁহাদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হইবে এবং তাঁহারা ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তি দিয়া সভা ডাকিয়া সম্বর্ধিত করিবেন। বাংলা-ভাষাভাষী হিসাবে আমাদেরও কর্তব্য আছে। মানভূমে কি ঘটিতেছে সে সম্বন্ধে আমরা, অধিকাংশ বাঙালীরা, সম্পূর্ণ উদাসীন আছি। বিহার সরকার আত্মস্থ না হইলে এই আন্দোলনকে যেমন করিয়াই হউক জীয়াইয়া রাখা আমাদের কর্তব্য। পুরুলিয়ার (মানভূম) 'লোকসাহিত্য ভবনে'র সহিত যোগাযোগ করিলেই যে কেহ এই বিষয়ে সকল তথ্যাদি জানিতে পারিবেন।

আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি হইতে বঙ্গদেশ এক বিষম বিপদের সম্মুখীন হইতে চলিয়াছে, বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি না হইলে পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষকগণ ধর্মঘট করিবেন, অর্থাৎ সেই দিন হইতে বাংলা দেশের লক্ষ লক্ষ কিশোর ও তরুণ ছাত্র বাঁধভাঙা বন্যার জলের মত নানা সমস্যার সৃষ্টি করিয়া রাষ্ট্রের সমাজের ও পরিবারের দুশ্চিন্তার কারণ ঘটাইবে। যান-বাহন অথবা কারখানা-শিল্পপ্রতিষ্ঠান কর্মীদের ধর্মঘট অপেক্ষা আপাতদৃষ্টিতে এই ধর্মঘট বিপজ্জনক মনে না হইলেও, আসলে ইহার পরিণতি সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ আকার লইতে পারে।

পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্যদেশে আদায়ীকৃত রাজস্বের একটা মোটা ভাগ শিক্ষাখাতে ব্যয়িত হয়। ভারতবর্ষেরই বরোদা ও মহীশূর রাজ্যের

দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষে শিক্ষা-বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। ফলে যাঁহাদিগকে আমরা ভবিষ্যৎজাতি-গঠনকারী বলিয়া সভায় সমিতিতে বক্তৃতায় প্রশংসা করিয়া থাকি, তাঁহাদিগকেই অনশনে অর্ধাশনে দিন কাটাইতে হয়। দুই-দশজন ভাগ্যবান শিক্ষক অবশ্যই আছেন, যাঁহারা পাঠ্য ও অর্থপুস্তক রচনা ও বিক্রয় করিয়া সরাসরি অর্থবান হইয়াছেন অথবা প্রকাশকদের নিয়মিত কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সংখ্যা বিপুল শিক্ষক-সম্প্রদায়ের পাঁচ-হাজার-করা একজন। বাকি শিক্ষকেরা নিদারুণ দুরবস্থার মধ্যে কাল কাটাইতে বাধ্য হন, যে কোনও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি তাহা দেখিতে পাইবেন। গত ৩০এ জানুয়ারি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু নয়াদিল্লীতে শিশুদের এক সমাবেশে শিশুদিগকে জাতির ভবিষ্যৎনিয়ন্তা বলিয়াছেন, কিন্তু তাহাদিগকে যাঁহারা নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁহাদের বর্তমানের অন্ধকার অবিলম্বে দূর না করিলে শিশুদের ভবিষ্যৎও অন্ধকার। আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, অনশনক্লিষ্ট শিক্ষকেরাই আপনাদিগকে তথাকথিত "সর্বহারা"-শ্রেণীভুক্ত করিয়া আজকাল শিশুদিগকে যাহা শিক্ষা দিতেছেন তাহার প্রত্যক্ষ ফল দেশব্যাপী আত্মঘাতী আন্দোলনে প্রকট হইতেছে। আরও সর্বনাশা পরিণাম হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে শিক্ষকদিগকে ভদ্র আহার ও বাসস্থান দিয়া সহজ ও স্বাভাবিক মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। দিয়াশলাইয়ের কাঠি ও বাক্স যাহাদের হাতে, তাহাদিগকে ক্ষ্যাপাইয়া ঘরের চালে আগুন লাগাইবার কাজে প্ররোচিত না করিয়া ঘরের প্রদীপ জ্বালিবার সহায়তা করিবার জন্যই আহ্বান করা উচিত। চার-হাজারী, তিন-হাজারী, দুই-হাজারী মনসবদারদের পাঁচ-শতী করিলে কোনই ক্ষতি নাই, বরঞ্চ তাহা করাই সমীচীন, প্রজাতন্ত্রী নূতন ভারতবর্ষে রাজকীয় ঐশ্বর্য-আড়ম্বর, অতিথি-পরিচর্যা, পার্টি-লাঞ্চ-ডিনার-এর ব্যয় গান্ধীনীতি-সঙ্গত করিয়া তুলিলেই শিক্ষকদের বর্ধিত বেতন ও মাগ্‌গি ভাতার চাহিদা মিটানো কঠিন হইবে না। সময় থাকিতে অর্থাৎ আগুন ছড়াইয়া পড়িতে না পড়িতেই তাহা করা ভাল!

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্রবিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা ৩৭ হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: বড়বাজার ৬৫২০

Gomes

ফাল্গুন ১৩৬০ : দাম আট আনা

[সম্পা]দক : শ্রীসজনীকান্ত দাস Feb.-Mar. : Price As. Eight

সূচী

ফাল্গুন—১৩৬০

তখন ও এখন ... ৪৪৯

আমার সাহিত্য-জীবন
—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪৫০

চিড়িয়াখানা—শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু ... ৪৫৭

শর্ট স্ট্রীটে কান্না
—দীপক চৌধুরী ... ৪৬৫

শেয়ানে শেয়ানে—"বেতালভট্ট" ... ৪৮১

মহাস্থবির জাতক—"মহাস্থবির" ... ৪৮২

সুব্রহ্মণ্যম্ ভারতী—শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব ...

ডানা—"বনফুল" ...

সংবাদ-সাহিত্য ...

ভুল গণনা ...

কালান্তর ...

হ্যামলেট—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ...

পাগ্‌লা গারদের কবিতা
—শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু ...

মহাভারতের যে অমর কাহিনী নিয়ে কালিদাস তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক রচনা করেছিলেন, সেই দুষ্মন্ত-শকুন্তলার গল্প — ছোটদের জন্য ছোট করে বলেছেন অবনীন্দ্রনাথ। 'শকুন্তলা'য় সেকালের রাজারানী, ছেলেমেয়ে, মুনিঋষি, বন-তপোবন তাঁর বলার গুণে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। যেন ছোট পুকুরের শাকচক্ষু জলে পড়েছে বিরাট আকাশের ছায়া। ··· বইখানির গঠনসজ্জাও বিচিত্র, ছোটদের মুগ্ধ করার মতো পাতায় পাতায় রঙিন ছবি, বড়ো বড়ো অক্ষর। ১৲

সিগনেট প্রেস কলিকাতা ২০

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বাংলার কথা

…প্রসাদ শাস্ত্রী
প্রাচীন বাংলার গৌরব

…বনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাংলার ব্রত

…ক্ষিতিমোহন সেন
বাংলার সাধনা

…র সুকুমার সেন
প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী
মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী

…েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বঙ্গসাহিত্যে নারী
সাময়িক পত্র-সম্পাদনে বঙ্গনারী
বঙ্গীয় নাট্যশালা
বাংলা সাময়িক সাহিত্য

…গেন্দ্রনাথ মিত্র
কীর্তন

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন
বাংলার নদনদী
বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ

ডক্টর শচীন সেন
বাংলার রায়ত ও জমিদার

শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
বাংলার চাষী

ডক্টর কুদরত-ই-খুদা
যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
বাংলার স্ত্রীশিক্ষা
বাংলার জনশিক্ষা
বাংলার উচ্চশিক্ষা। যন্ত্রস্থ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী
বাংলার পালপার্বণ

॥ প্রতি খণ্ডের মূল্য আট আনা ॥

এ যাবৎ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে মোট ১০০ খানি বই প্রকাশিত হইয়াছে। পত্র লিখিলে পূর্ণতালিকা প্রেরিত হইবে।

বিশ্বভারতী

MARGO
SOAP
CONTAINS ACTIVE
TOILET & MEDICINAL
BHRINGOL
MAHA
BHRINGARAJ
OIL
CHEMICAL
Tuhina
রূপরচনায় ক্যালকেমিকোর
কয়েকটী অনুপম প্রসাধনী
মার্গো সোপ
নিমের স্থগন্ধি প্রসাধন সাবান।
ভৃঙ্গল স্থগন্ধি মহাভৃঙ্গরাজ তৈল কেশের
শ্রীবৃদ্ধি হয়; মাথা ঠাণ্ডা রাখে।
রেণুকা পুষ্পসুরভিময় রূপচূর্ণ। মুখশ্রী ও
দেহশ্রী লাবণ্যময় করে।
তুহিনা প্রাকৃতিক রুক্ষতা হইতে গাত্র-
চর্ম্মকে রক্ষা করিয়া কোমল ও মসৃণ রাখে।
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা-২৯

সরলাবালা সরকারের

হারানো অতীত ৩৲

প্রবোধকুমার সান্যালের

হাসুবানু (২য় সং) ৭৷৷৹

শ্যামলীর স্বপ্ন (৪র্থ সং) ৪৲

মনোজ বসুর

চীন দেখে এলাম (১ম পর্ব)

দ্বিতীয় সংস্করণ বেরুল। ৩৲ টাকা

বাঁশের কেল্লা (৩য় সং) ২৷৹

নবীন যাত্রা (৩য় সং) ৩৲

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পুতুল নাচের ইতিকথা (৩য় সং) ৫৲

ইতিকথার পরের কথা ৪৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি ৩৲

নবসন্ন্যাস (২য় সং) ৩৲

১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে

শৈল চক্রবর্তীর

যাদের বিয়ে হল (৩য় সং) ৩৷৷৹

জরাসন্ধের

লৌহ কপাট ৩৷৷৹

লেখক এ-যুগের জেলখানা-রক্ষক, লৌহ কপাট জেলখানার বিচিত্র মানুষের স্মৃতি-চিত্র।

বনফুলের

জঙ্গম ১ম—৪৲ ২য়—৪৷৷৹ ৩য় খণ্ড—৬৷৷৹

মানদণ্ড (২য় সং) ৪৷৷৹ দশভাণ ৩৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

বৈতালিক ৩৷৷৹

স্বর্ণসীতা (৪র্থ সং) ২৷৹

বিক্রমাদিত্যের

দেশে দেশে ৩৲

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

চিড়িয়াখানা ২৷৷৹

জন্তু-জানোয়ারের কাহিনী নয়। ডিটেকটিভ উপন্যাস। সাহিত্যের কৌলীন্যে অভিষিক্ত।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কামধেনু (৩য় সং) ২৷৷৹

শিলাসন ২৷৷৹ চৈতালী ঘূর্ণি ২৲

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

দেহমন ৪৲

সঙ্গিনী ২৷৹ গোধূলি ২৷৷৹

গোপাল হালদারের

অন্যদিন (২য় সং) ৪৷৷৹

আর একদিন ৪৲

আংকুমার সেনের

লীলাসঙ্গিনী ৪৲

শরৎচন্দ্র

"টেবিলের বাম অংশে ইলেক্‌ট্রিক বেলের সুইচ বসানো। পর পর চার বার সুইচ টিপলাম। চার বার ঘণ্টি রঘু বেয়ারাকে ডাকবার সঙ্কেত।

শরৎচন্দ্র বললে, "অত বেল বাজাচ্ছ কেন?"

"রঘুকে ডাকছি।"

"কি দরকার।"

বললাম, "আজ প্রথম গাড়ি চ'ড়ে এসেছ, একটু মিষ্টিমুখ করবে না?"

ব্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে শরৎ বললে, "মিষ্টিমুখ আর-একদিন হবে,—আজ উঠে পড়।"

নিরুপায় হয়ে কৌশলের সাহায্য নিতে হ'ল। বললাম, "চা-টা খেয়েই বেরিয়ে পড়ব শরৎ। চা না খেয়ে তোমার গাড়িতে উঠলে বেড়িয়ে ষোল-আনা আরাম পাওয়া যাবে না।"

চেয়ারে ব'সে প'ড়ে শরৎ বললে, "তবে তাড়াতাড়ি সারো।"

রঘু এসে দাঁড়িয়ে ছিল। বললাম, "সেন মশায়ের দোকান থেকে এক টাকার কড়া রাতাবি নিয়ে আয়। আর আমাদের দুজনের চায়ের ব্যবস্থা কর্।"

ফড়িয়াপুকুর স্ট্রীটে আমাদের অফিসের ঠিক সম্মুখে সেন মশায়ের সন্দেশের দোকান। তখন সেইটেই ছিল তাঁর একমাত্র দোকান। এখন অনেক শাখা-দোকান হয়েছে, কিন্তু ফড়িয়াপুকুরের দোকান এখনও প্রধান দোকান। সে সময়ে সেন মশায় দোকানও চালাতেন, ট্রাম কোম্পানীতে চাকরিও করতেন।

সেন মশায় ও আমার মধ্যে বেশ একটু হৃদ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। অবসরকালে তিনি মাঝে মাঝে আমার দোতলার অফিস-ঘরে এসে বসতেন। মিতভাষী ছিলেন; শুনতেন বেশি, শোনাতেন কম। থাকতেনও অল্পক্ষণ। শরৎ সেন মশায়ের কড়া পাকের রাতাবি সন্দেশের অতিশয় অনুরাগী ছিল। আমার কাছে এলে রাতাবি না খাইয়ে ছাড়তাম না।"

—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়: "বিগত দিনে," 'গল্পভারতী'

বুদ্ধদেব বসু

সম্পাদিত

আধুনিক বাংলা কবিতা

আধুনিক বাংলা কবিতার শ্রেষ্ঠ সঞ্চয়ন। প্রায় ৫০ জন কবির কবিতা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সুকুমার রায় চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, জসীমউদ্দীন, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন দত্ত, প্রমথ বিশী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, রাধারাণী দেবী, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হুমায়ুন কবির, অজিত দত্ত, সুনীলচন্দ্র সরকার, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, নিশিকান্ত, অশোকবিজয় রাহা, জ্যোতিরীন্দ্র মৈত্র, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, দিনেশ দাস, সমর সেন, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, মণীন্দ্র রায়, বাণী রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভটাচার্য প্রভৃতি।

এই কাব্যগ্রন্থে প্রত্যেক কবির বিশিষ্ট ও বৈচিত্র্যপূর্ণ কবিতাসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। আধুনিক বাংলা কবিতার অভিনব প্রকাশ

প্রচ্ছদপট, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও সজ্জা-সৌষ্ঠব অতুলনীয়

২৭০ পৃষ্ঠা ডিমাই সাইজ মূল্য ৫৲ টাকা

এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা-১২

কালি
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কালির সমকক্ষ
BLUE-BLACK
Sulekha
Sulekha
খা ওয়ার্কস লিঃ
খা পার্ক · কলিকাতা-৩২
ফোন · পার্ক ৪২৬৭

তখন ও এখন

নিজের মনে যাচাই ক'রে
তাকাই তোমার পানে,
সেই তুমি তো এই তুমি নও—
বদলেছ কোন্‌খানে।
প্রতিমারে ডুবিয়ে জলে
ব'লেছিলাম—থাক্ অতলে,
আজ সেদিনের ক্ষীণ আদলে
চমকে উঠি প্রাণে।

রূপের জলুস গেছে ধুয়ে
হারিয়েছে গান সুর,
যে ছিলে, স্মরণে মোর
ভেসেই গেলে দূর।
সোফায় ব'সে পাশাপাশি
একটু মলিন হাসাহাসি,
তার পরেতে 'এবার আসি'—
বিদায় সুমধুর॥

* * *

এই বসন্তে পুষ্পপাতায়
ডাক দিতেছে বসুন্ধরা,
এমন সময় শুরু থেকে
এই অনামে বন্ধ করা
নয়কো তোমার উচিৎ সখি,
শেষে তুমিই যাবে ঠকি—
জানো না কি সুখের ছুঁয়ে
আবার বাঁচে ডুবো মড়া?

বুড়ো গাছের আগডালে ওই
প্রাণের প্রকাশ কচি পাতায়,
হলুদ খ'সে সবুজ রসের
ঢেউ খেলে যায় বনের মাথায়
কারণ, বাজিল দখিনা বায়
সোহাগভরে পরশ বুলায়,
বয়েস খাতা বন্ধ ক'রে
অঙ্ক ফেলে জমার খাতায়।

গুঞ্জরিয়া কও কথা কও—
আমার হাতে রাখো দু হাত।
এই জড়তার মধ্যখানে
ধীরে ধীরে হানো আঘাত।
বাঁচি আবার খসিয়ে পাতা
কাঁচিয়ে ফেলি পাকা মাথা
স্বপ্ন-রঙিন তবেই হবে
মৃত্যু ভয়াল তিমির এ-রাত॥

আমার সাহিত্য-জীবন

সাত

'কালিন্দী' নাটক সাতাশ রাত্রি চলবার পর হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। নাট্যনিকেতন প্রতিষ্ঠানটিই উঠে গেল। সে উঠে যাওয়ার ব্যাপারটা অত্যন্ত আকস্মিক। সেবার পূজোর সময় ষষ্ঠীর দিন সকালে নাট্যনিকেতনে গিয়ে দেখি, সারি সারি ঠ্যালা ও গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে এবং তাতে বোঝাই হচ্ছে—থিয়েটারের কাঠ আর কাপড়। অর্থাৎ পিস্ সিন।

কি ব্যাপার? না, নাট্যনিকেতন উঠে গেল। মঞ্চের বাকি ভাড়া বাবদ মামলা চলছিল, সেই মামলায় বাড়ির মালিক প্রবোধবাবুকে উচ্ছেদ করেছেন। প্রবোধবাবু জিনিসপত্র নিয়ে উঠে যাচ্ছেন। নাট্যনিকেতন লিজ নিয়েছেন শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মশায়।

প্রবোধবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন ফুটপাথে। আমাকে দেখে হেসে উঠে বললেন, উঠো মুসাফের, বাঁধো গাঁঠেরি। ডেরা-ডাণ্ডা বেঁধে উঠতি তারাশঙ্করবাবু। তার পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, পৈতৃক ভিটে নিলেম হয়ে যায়। এ তো লীজের বাড়ি। দুঃখ কেবল পূজোর ষষ্ঠীর দিন বউমাদের ছেলেদের নিয়ে পথে বেরুতে হ'ল। আর দুঃখ এর মাঝখানে ভাদুড়ী মশাইয়ের মত ব্যক্তি এসে পড়লেন।

আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কি বলব ভেবে পাই নি। বেশ মনে আছে, সেদিন সকালে বাদল নেমেছিল। প্রবল বর্ষণ ছিল না অবশ্য; রিমিঝিমি বৃষ্টি হচ্ছিল। আমার বই বন্ধ হয়ে গেল। আরও একটা কথা ছিল। আমার টাকা পাওয়ার কথা ছিল। সেই টাকার জন্যেই আমি সেবার ষষ্ঠীর দিন পর্যন্ত বাড়ি যাই নি। ওই দিন সকালেই টাকা দেবার কথা ছিল। তার জন্যেই আমি আগের রাত্রে সারারাত্রি জেগে ভাগলপুর থেকে এসেছি; নেমেছি ভোরবেলা; বরানগর পৌঁছে মুখ হাত ধুয়েই ছুটে এসেছি নাট্যনিকেতনে—টাকা পাব এবং ওই দিনই সন্ধ্যার ট্রেনে বাড়ি যাব।

আগেকার কালে, সাধারণ নাট্যকারেরা নাটকের জন্য বোধ করি কোন দক্ষিণা পেতেন না। ৺গিরিশচন্দ্র, ৺দ্বিজেন্দ্রলাল, ৺ক্ষীরোদপ্রসাদের

কথা স্বতন্ত্র। তাঁদের কথা আমি বলছি না। ৺নির্মলশিববাবু ধনীর সন্তান ছিলেন, তিনি অর্থ দাবি করেন নি। তবে তাঁর কাছে তাঁর সমসাময়িকদের বিষয়ে যা শুনেছি, তাতে সাধারণ নাট্যকারের বই সাফল্য-মণ্ডিত হ'লে কর্তৃপক্ষ তাঁকে বেনিফিট নাইট দিতেন। 'কালিন্দী' যখন অভিনীত হয়, তখন নাটক থেকে নাট্যকারেরা টাকা পেতে শুরু করেছেন। এর জন্যে আমাদের অগ্রজপ্রতিম নাট্যকার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র সেনগুপ্ত মশায়ের কৃতিত্বই বোধ করি সর্বাধিক। বোধ হয় নবপর্যায়ে আর্ট থিয়েটার, নাট্যমন্দিরের আমল থেকেই এর সূত্রপাত। ৺যোগেশ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় এঁরাই এ প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন। শ্রীযুক্ত বিধায়ক নাট্যজগতে আমার অগ্রবর্তী। এঁদের পেছনে এসে আমি সভয়ে না হ'লেও সঙ্কোচের সঙ্গে দক্ষিণার কথা তুলেছিলাম। শচীনদা, বিধায়ক, যোগেশদা এঁরা তখন রয়াল্টি প্রথা চালু করেছেন। কিন্তু প্রবোধবাবু আমাকে বলেছিলেন বেনিফিট নাইটের কথা। অবশ্য বেনিফিট নাইট তখন আর বেনিফিট নাইট নেই, তখন সম্মান-রজনীতে পরিণত হয়েছে। প্রবোধবাবু বলেছিলেন, আমি আপনাকে একটা নাইট দেব মশাই।

সম্মান-রজনীর জন্য বড় বড় পোস্টার দিয়ে অভিনয়ও হয়েছিল একদিন। এই আশ্বিন মাসের প্রথমেই। সেদিন ছিল রবিবার; ম্যাটিনী অর্থাৎ তিনটের সময় অভিনয় হ'ল। আমি বরানগর থেকে বেরিয়ে নাট্যনিকেতনে আসব, এমন সময় আরম্ভ হ'ল বৃষ্টি। সে বৃষ্টি মুষলধারে বৃষ্টি—ইংরেজীতে যাকে বলে বেড়ালকুকুর-ঝরা বৃষ্টি। আমার বাড়ির সামনে প্রায় এক কোমর জল জ'মে গেল। আমি হতাশ হয়ে গেলাম। এই বৃষ্টিতে কি অভিনয় হয়, না, হতে পারে? তবু চারটে নাগাদ বৃষ্টি ধরলে থিয়েটারে এসে দেখলাম, অভিনয় হচ্ছে। কলকাতার দিকে বৃষ্টিটা এত বেশি হয় নি। যানবাহন বন্ধ হয় নি। প্রেক্ষাগৃহে উঁকি মেরে দেখলাম, লোকও মন্দ হয় নি। কিন্তু কত টাকা বিক্রি হয়েছে সেটা জানতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করতে লজ্জায় বাধল। একবার টিকিট বিক্রির জানলার ধারে দাঁড়িয়েছিলাম। কেমন যেন লজ্জা পেলাম।

চ'লে এলাম। সেকালে সম্মান-রজনীতে টিকিট নিয়ে বন্ধুবান্ধব গুণগ্রাহীদের মধ্যে বিক্রি ক'রে আসারও রেওয়াজ ছিল। প্রবোধবাবু আমাকে বলেছিলেনও, কিছু টিকিট নিন না, বিক্রি করুন না। সেও আমার লজ্জায় বেধেছিল। কার কাছে যাব? কাকে বলব, এ অভিনয়ের সমস্ত বিক্রিটা আমি পাব, আপনি টিকিট কিনুন। সে আমি পারি নি।

যাই হোক, প্রবোধবাবু আমাকে নিজেই বললেন, তারাশঙ্করবাবু, বিক্রিটা সুবিধেমত হ'ল না। আপনাকে এর টাকাটা নিতে হবে না। আপনাকে পাঁচ শো টাকা আমি দোব এবং পূজোর আগেই দোব। বহরমপুরে একটা বায়না আছে, সেখান থেকে ফিরেই আপনাকে টাকা দোব। ষষ্ঠীর দিন সকালে পাকা কথা।

সেই কারণেই পঞ্চমীর রাত্রিতে নিদারুণ ভিড়ের মধ্যে সারারাত্রি জেগে ভাগলপুর থেকে ফিরেছি। ভাগলপুর গিয়েছিলাম ওখানকার কলেজের নিমন্ত্রণে। পূজার বন্ধের আগেই সব কলেজেই আনন্দানুষ্ঠান হয়ে থাকে। এ সব অনুষ্ঠানে সাহিত্যিকদের সম্মান এবং চাহিদা বেশি—এ কথা বঙ্গদেশে সর্বজনবিদিত। তার উপর, বন্ধু বনফুল আছেন ভাগলপুরে। তিনিই ছিলেন ঘটক। সেবারকার ভাগলপুরের কথায় পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়ছে। তাঁর কথা না বললে সাহিত্য-জীবনের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। 'শনিবারের চিঠি'তে তাঁর "নরকের কীট" পড়ার পর বিস্ময় জেগেছিল, লেখার মধ্যে এত ধার, এত জ্বালা, এমন প্রচণ্ডতাও প্রকাশ পেতে পারে! তাঁকে দেখার সাধ ছিল। সেবার সেই সাধ মিটেছিল। ভোর চারটের সময় ভাগলপুরে পৌঁছেছিলাম। বলাই নিজেই এসেছিলেন স্টেশনে। বাড়ি পৌঁছে তখনই চা-কৃত্য, এবং চা-কৃত্যের সঙ্গে টেবিল-ল্যাম্পের আলোর সুইচ অন ক'রে আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল সাহিত্যপাঠ। মহাকবি সদ্য মহাপ্রয়াণ করেছেন। বনফুল মহাকবির মহাপ্রয়াণ নিয়ে কবিতা, নাটিকা, প্রবন্ধ, রূপক গল্প রচনা করেছিলেন অনেক। সেই সব পড়া চলছিল। সূর্যোদয় হ'ল। ঠিক এই সময়েই বনবিহারীবাবু এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর লেখার সঙ্গে তাঁর চেহারার আশ্চর্য মিল। তাঁর লেখা যেমন

খাপ-খোলা তলোয়ারের মত উজ্জ্বল ধারালো, চেহারাতেও ঠিক তাই। গৌরবর্ণ মানুষ, মেদবাহুল্যহীন শক্ত সোজা দেহ, চোখে তেমনই দীপ্তি। কথায়-বার্তায় তেমনই তীক্ষ্ণতা, তেমনই উজ্জ্বলতা।

বলাই!—বলাইকে ডেকে তিনি রাস্তা থেকে উঠে এলেন বারান্দায়।

বলাই বললেন, মাস্টার মশাই।

নাম বলতে হ'ল না, বুঝতে পারলাম। বনবিহারীবাবু মেডিকেল কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। তারপর সিভিল সার্জেন হয়ে জেলায় জেলায় ঘুরে অবসর নিয়ে তখন ভাগলপুরেই বাস করছেন। ভোরবেলা বেরিয়েছিলেন প্রাতভ্রমণে। পথে বলাইয়ের বাসায় উঠে এলেন। আমি উঠে তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি বললেন, তুমি তারাশঙ্কর?

বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

ব'স। তোমার শরীর এমন কেন, অ্যাঁ? লেখার সঙ্গে তো মেলে না? তারপরই টেবিলের দিকে তাকিয়ে বললেন, লেখা শোনা চলছে? আচ্ছা!

কিছুক্ষণ ব'সে তিনিও লেখা শুনলেন। তারপর তিনি আরও কিছু আলাপ ক'রে চ'লে গেলেন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এইবার অবসর নিয়ে আর কিছু লিখবেন কি না?

তিনি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, না।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন?

উত্তরে তিনি হেসেছিলেন, আর কিছু বলেন নি। সন্ধ্যায় কলেজের অনুষ্ঠানেও তিনি আসেন নি। কলেজের অনুষ্ঠানে দেখা পেয়েছিলাম, শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মশায়ের। তখন তিনি গৈরিকবস্ত্র পরিধান করেছেন। সন্ন্যাস নিয়েছেন। গাঙুলী মশায় সেদিন সভায় আমাদের অর্থাৎ বিশেষ কয়েক জন সাহিত্যিককে আক্রমণ করেছিলেন সে প্রবন্ধে। সে দলের মধ্যে বনফুল এবং আমি দুজনেই পড়ি। প্রবন্ধের উত্তর আমার লিখিত অভিভাষণে ছিল না; মৌখিক উত্তর দিতে হয়েছিল। যথাসাধ্য বিনীতভাবে তাঁর যুক্তি খণ্ডন ক'রে উত্তর দিয়েছিলাম। শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় গম্ভীরভাবে সভাস্থল

ত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন। ব্যাপারটা মনের মধ্যে কাঁটার মত বিঁধে রইল। এমন ঘটনা জীবনে আরও বার কয়েক ঘটেছে। প্রতিবারেই আমি প্রথম আক্রান্ত হয়েছি। উত্তর দিয়েছি। ফলে অপ্রীতির উদ্ভব হয়েছে। সে অপ্রীতি বেশ কিছুদিন অশান্তির সৃষ্টি করেছে। একবার জামশেদপুরে একজন সাহিত্যিক বন্ধুর সঙ্গে এমনই ধারার বাক্‌যুদ্ধ করতে হয়েছিল। আমার অভিভাষণের মতবাদের সঙ্গে বন্ধুর মতবাদের পার্থক্য ছিল। বন্ধু তাঁর অভিভাষণ লিখে নিয়ে গিয়েছিলেন, আমি আমার অভিভাষণ লিখে ছাপিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। লিখে নিয়ে যাওয়ার কথাটা বলছি এই হেতু যে, সভাস্থলে একজন অপরজনের ভাষণ শুনে ইচ্ছাপূর্বক তার প্রতিবাদ করেন নি। মতবাদের মৌলিক পার্থক্যই আসল কারণ। বন্ধুটি ভাষণ পড়েছিলেন প্রথম, তারপর আমি আমার ভাষণ পাঠ করলাম। বন্ধুটি মনে করলেন, আমি ইচ্ছাপূর্বক তাঁর ভাষণের প্রতিবাদ করলাম। আমার ভাষণটি যে তাঁর ভাষণ শোনবার অনেক আগে লেখা এবং ছাপানো, তিনি এটির কথা বিবেচনা করতে ভুলে গেলেন এবং আমার ভাষণের পরই উঠে প্রতিবাদ করলেন—কঠোর প্রতিবাদ করলেন। সে সময় সভায় আমি সভাপতি। সেই প্রতিবাদের মধ্যে এমন কয়েকটি ইঙ্গিত ছিল যা শিষ্টাচারের বহির্ভূত ছিল বললে বাড়িয়ে বলা হবে না। যার ফলে সমস্ত সভাস্থলটির মধ্যেই অপ্রীতিকর এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হ'ল। আমাকে বাধ্য হয়েই প্রতিবাদ করতে উঠতে হ'ল। আমি অবশ্য অস্বস্তিকর অবস্থাটা কাটাবার জন্য যথাসাধ্য লঘু কৌতুকরসের অবতারণা ক'রে বক্তব্য শুরু করলাম। কথাগুলি মনে রয়েছে। বলেছিলাম, জামশেদপুরের বাঙালীরা অত্যন্ত হুঁশিয়ার সাহিত্যরসিক, এবং সাহিত্যক্ষেত্রের খবরাখবরে তাঁরা প্রায় গুপ্তচরের মত সকল সন্ধান রেখে থাকেন। তাঁরা আমার এবং আমার বন্ধুবরের মতামতের পার্থক্য সম্পর্কে নিখুঁত খবর রেখেছেন এবং দুই বিরোধী মতের সাহিত্যিককে একই আসরে সকৌতুকে নামিয়ে দিয়েছেন। ঠিক জানেন যে, দুই বিরোধী মত উপলক্ষ্য ক'রে একটা কবির লড়াই হবেই। কিন্তু তাঁর

একটা কথা জানেন না যে, মত নিয়ে যত লড়াই এ আসরে হোক না কেন, আসর ভাঙতে না-ভাঙতে আমরা দুজনে পরস্পরের গলা জড়িয়ে ধ'রে সভাস্থল থেকে বেরিয়ে যাব। কথাগুলি এই ধরনের, তবে এই কথাগুলিই হয়তো নয়। আরও অনেক সরস ক'রে বলেছিলাম। সভাতে হাসির ধ্বনিও উঠেছিল। তারপর প্রতিবাদ করেছিলাম এবং সভাশেষে সত্য সত্যই বন্ধুর গলা ধ'রে সভাপ্রাঙ্গণে বেশ খানিকক্ষণ পায়চারী করেছিলাম। কিন্তু মনে মনে অশান্তি ও অস্বস্তির শেষ ছিল না। সভার পর ফেরার পথে ট্রেনে দুজনেই নির্বাক হয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম। আজও পরিণত জীবনে সে সব কথা মনে ক'রে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি। কেন মতবাদ নিয়ে কলহ? সত্যই কি এ মতবাদের প্রতি নিষ্ঠা, না, মতবাদকে উপলক্ষ্য ক'রে প্রতিষ্ঠার দম্ভ থেকে এর উৎপত্তি? তাই যদি না হবে, তবে আক্রমণ মতকে ছাড়িয়ে ব্যক্তির সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে কেন? এই কিছুদিন আগে, বড় একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের গ্রন্থাগার ও ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে তাঁদের ইউনিয়নের কর্ণধার—কোন রাজনৈতিক নেতা—আমাকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেছিলেন। সে সভাতেও আমি সভাপতি ছিলাম। যাঁরা নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করেছিলেন, দুঃখ পেয়েছিলেন। লজ্জিতও হয়েছিলেন। সভাপতি হিসেবে আমার সুযোগ ছিল অনেক। আক্রমণ করলেও প্রতি-আক্রমণের কোন আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু আমি অতীতকালের অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁকে আক্রমণ করি নি। আক্রমণের ভূমিকাটি রচনা ক'রেই আমার বক্তব্য রবীন্দ্র-জয়ন্তীর লক্ষ্যের দিকে চালিত করেছিলাম। সভার শেষে, যিনি আমাকে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি এবং আরও কয়েকজন বার বার প্রশ্ন করলেন, কেন আমি কঠিন জবাব দেবার সূচনা ক'রেও ওঁকে ছেড়ে দিলাম? আমি বলেছিলাম, উনি যা বলেছেন, তাতে দুঃখ পাই নি—এমন কথা বলব না। তবে ওঁকে আক্রমণ করলে দুঃখের সঙ্গে অশান্তির জ্বালা এবং লজ্জার বোঝা বাড়ত, তাই বললাম না। মনে সান্ত্বনা এবং শান্তি রইল।

কথায় কথায় কোথায় চ'লে এসেছি।

ভাগলপুরের সভার কথা বলছিলাম। সভাশেষে সেই রাত্রেই পূজোর ভিড়ে সারারাত্রি জেগে ভোরবেলা কলকাতা পৌঁছলাম ওই 'কালিন্দী'র টাকার জন্য। সেদিন বাদলা ছিল, সে কথা আগেই বলেছি। তারই মধ্যে নাট্যনিকেতনে এসে দেখলাম, প্রবোধবাবু উঠে যাচ্ছেন, থিয়েটার উঠে গেছে।

প্রবোধবাবু শেষে বললেন, ভাববেন না, আবার থিয়েটার করব আমি। আপনার বই দিয়ে থিয়েটার খুলব। 'কালিন্দী'র টাকা আমি ভুলব না।

পরে একদিন প্রবোধবাবুর উঠে যাওয়ার প্রসঙ্গ নিয়ে কথা উঠলে শ্রীরঙ্গমের একজন ব'লেছিলেন, ওঃ, প্রবোধ গুহ বরিশালের ব্যাঘ্রের মত করকরে জিভে চেটে হাড় থেকে মাংস খুলে নেওয়ার মত নাট্যনিকেতনের গোটা বাড়িটা চেটে ইলেক্‌ট্রিক লাইন সাফ ক'রে দিয়ে গেছে। মিটারটাকে হাতুড়ি মেরে চিবানো হাড়ের মত গুঁড়ো ক'রে দিয়ে গেছে।

নাট্যনিকেতনের ভাঙা আসর সংস্কার ক'রে শ্রীরঙ্গমের নতুন আসর পাততে আচার্য শিশিরকুমারকে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

সেদিন আমি শুধুহাতেই বাড়ি গিয়েছিলাম, প্রবোধবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারি নি, আজও পারি নে।

পূজোর পর 'দুই পুরুষ' শেষ ক'রে আবার বের হলাম।

তখন বাংলা দেশে স্টেজ মাত্র দুটি—নাট্যভারতী, ওদিকে মিনার্ভা। রঙমহল স্টার বন্ধ। শ্রীরঙ্গম্‌ প্রস্তুতির মুখে। ভাবলাম, কোথায় যাই? নাট্যভারতী বা শ্রীরঙ্গমে যেতে সাহস হ'ল না। অহীন্দ্রবাবু বা শিশির-বাবুর কাছে কে নিয়ে যাবে? পৌঁছুব কি ক'রে?

[ক্রমশ]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

চিড়িয়াখানা

(ধনপতি পাগ্‌লার ডায়েরি হইতে)

আজ চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়েছিলেন ভুজঙ্গ চৌধুরী। সঙ্গে ছিল অতুল চম্পটী, ভৃত্য ভগবান, ঠাণ্ডা পানীয় জলের ফ্লাস্ক, একটা টিফিন-ক্যারিয়ার ইত্যাদি ইত্যাদি। ভগবানকে ভুজঙ্গবাবু ডাকেন ভগু ব'লে, [illegible]রো নামটা তাঁর অপছন্দ। রেস্তোরাঁ আছে চিড়িয়াখানায়, কিন্তু সেটা ফার্‌পো [illegible]ংবা গ্রেট ঈস্টার্নের মত নয়। সস্তা রেস্তোরাঁয় ঢোকেন না বহুলক্ষপতি [illegible]জঙ্গ চৌধুরী। তাই এ যাত্রায় সহযাত্রী টিফিন-ক্যারিয়ার ইত্যাদি। অতুল [illegible]পটী একা কোন রেস্তোরাঁতেই ঢোকে না, তার নীতি হচ্ছে 'একটি আধলাও [illegible]চানো মানেই এক আধলা রোজগার করা'। ইংরিজী থেকে ধার-করা নীতিটা; [illegible]র করতে আপত্তি আলস্য নেই চম্পটীর, এ ব্যাপারে সে চাবাক। ভুজঙ্গ বা [illegible]পর কোন কাপ্তান সঙ্গে থাকলে অতুল ফার্‌পো বা গ্রেট ঈস্টার্ন কেন, নিউ [illegible]র্কের ওয়াল্‌ডর্ফ অ্যাস্‌টোরিয়া হোটেলে গিয়ে চা খেতেও রাজী। সঙ্গে [illegible]ান গৌরী সেন থাকলে টাকা লাগাতে আলস্য করে না।

ভগবানের দেশ মেদিনীপুরে না হ'লেও কোন ক্ষতি হ'ত না, কিন্তু [illegible]দিনীপুর। রাজনৈতিক আর প্রাকৃতিক ঝড়-ঝাপটা প্রচণ্ডভাবে রুদ্রতালে [illegible] গেছে এই মেদিনীপুরের ওপর দিয়ে, কিন্তু তাতে এক ফোঁটা আঁচড়ও [illegible]গে নি ভগবানের গায়ে—তখন সে কলকাতায় চৌধুরী-বাড়িতে ভৃত্যগিরির [illegible]ক্ষানবিস। মাজতে হয় না বাসন, সাজাতে হয় না আসন, ঘরদোর ঝাঁট-[illegible]পনা ধোয়া-পোঁছা ঝি-ই করে। ভগবান বাজার করে, ভুজঙ্গ-জনক অনঙ্গ চৌধুরী ওরফে বড়কর্তার দেহ দলাই-মলাই করে আর তামাক সাজে, এবং [illegible]ঙ্গের মিশ্র বিচিত্র ফরমাস খাটে। শিক্ষানবিস থেকে কবে কখন পাকা [illegible]রূপে কায়েমী হ'ল জানি না, কিন্তু হয়েছে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গণ্ডার দেখলেন ভুজঙ্গবাবু। গণ্ডার দেখলে [illegible]ঙ্গবাবুকে। তার নাকের ডগায় একটা ভোঁতা খড়্গা, সারা গায়ে বন্দুকের-[illegible]-ঠেকানো সরল চেহারার নির্লোম চামড়া। গণ্ডারের দিকে তাকিয়ে দেখতে [illegible]তে মনে মনে স্বস্তির হাসি উথলে উঠতে লাগল ভুজঙ্গবাবুর। জাঁদরেল [illegible]রদস্ত প্রায়-মালিক ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভুজঙ্গবাবু, তাঁর অফিসে আড়ালে [illegible]কে সবাই বলতে শুরু করেছে 'গণ্ডার'। এ কথা তিনি জানেন, আর জেনে

খুশিও। অফিসে প্রথমে তাঁর গোপন ডাকনাম ছিল 'কালভুজঙ্গ', সে নামে মরচে ধ'রে গেছে, এখন তাই চালু হয়েছে 'গণ্ডার' নামটা। বলে, গণ্ডারের চামড়ার মতই ভুজঙ্গ চৌধুরীর চামড়া। মাইনে বাড়ছে না অথচ কাজের চাপ বেড়ে চলেছে ব'লে যারা ক্ষেপে আছে বা যাদের ক্ষেপে থাকা উচিত, তারা ভুজঙ্গকে 'গণ্ডার' ব'লে গালি দিয়ে গায়ের ঝাল মেটায়। রাগের বিষবাষ্পটা এমনই ক'রে চুপসে বেরিয়ে যায়, ক্রমে ক্রমে জ'মে জ'মে হঠাৎ এক চাপে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হবার জোরাল সম্ভাবনাটা বে-জোর হয়ে যায়।

গণ্ডার-সৃষ্টির কি প্রয়োজন ছিল বিশ্ব-স্রষ্টার? গণ্ডার না থাকলে কি আসত-যেত দুনিয়ার? গণ্ডারের মাংস খায় না কেউ, তার চামড়া দিয়ে তৈরি হয় না জুতো, কবির কাব্যে গণ্ডার এখনও পাতে ওঠে নি। চারুশিল্পে, কারু-শিল্পে, দারুশিল্পে গণ্ডার অদৃশ্য। গণ্ডার গাড়ি টানে না, সিনেমায় নামে না, গণ্ডারের পিঠে চড়ে না কেউ, কোন দেব বা দেবীর বাহনও নয় গণ্ডার। তবে কেন?—ভাবলেন ভুজঙ্গ চৌধুরী।

ভুল ভাবলেন। শিল্পে সাহিত্যে ঢুকেছে গণ্ডার, গণ্ডার সিনেমাতেও নেমেছে। বিশ্ববিধাতার অনেক বিধানের ভেতর গণ্ডারও একটি। তা ছাড়া যদি বলা যায়—গণ্ডারের দরকার কি, তা হ'লে আরও বলা যায়—মানুষেরই বা কি দরকার? চণ্ডী-কবি অবশ্য ব'লে গেছে, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' কিন্তু গণ্ডার-কবি কি বলে, কে জানে?

চম্পটী বললে, বেচারার বউটা সম্প্রতি মারা গেছে হুজুর।

হুজুর ভুজঙ্গের কিছু যায়-আসে না কারও বউ মরলে। তবু নিস্পৃহ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, কার?

চম্পটী জবাব দিলে, আজ্ঞে, এই গণ্ডারটার।

গণ্ডারের বউ? মানে, ম্যারেড ওয়াইফ? চম্পটী বলেছে ভাল! এঃ এঃ এঃ এঃ এঃ! ভেতর দিকে বাতাস টেনে টেনে হাসতে লাগলেন ভুজঙ্গ চৌধুরী গণ্ডারনীর মৃত্যু-সংবাদে। তাঁর হাসি হেঃ হেঃ হেঃ নয়, এঃ এঃ এঃ—মানে বহির্মুখী নয়, অন্তর্মুখী।

হাসি থামলে প্রশ্ন করলেন, দ্বিতীয় পক্ষের ব্যবস্থা করে না কেন?

গণ্ডারনী চট্ ক'রে যোগাড় করা তো চাট্টিখানি কথা নয় হুজুর।—বললে

ফুল চম্পটী, শুনেছি আফ্রিকা না কোথায় গণ্ডার পাওয়া যায়। অত
হাঙ্গামা হুজ্জৎ আর কে করে? মনের দুঃখ মনে চাপতে গিয়েই এ বেচারা ম'রে
রে। গণ্ডার বিরহ সইতে পারে না হুজুর।

ভুজঙ্গ চৌধুরী দেখলেন, বিরহী গণ্ডারের চোখে ঈষৎ উদাস বিষণ্ণ ভাব।
মনি মনে প'ড়ে গেল তাঁর অফিসের কেরানী ছোকরা রাহুল রায়ের কথা।
। ছোঁড়ার আছে কবিতা-লেখার ব্যামো। এখন থাকলে হয়তো এই বিরহী
গুারের ব্যাকুল ব্যথা নিয়ে এক কাঁদ-কাঁদ কবিতা ফেঁদে বসত। এই তো
দিন অফিসে কুমারী সানন্দা সান্যালের টেবিলে মাসিক পত্রের পাতায়
জঙ্গ ছাপা কবিতা দেখেছিলেন রাহুল রায়ের লেখা, প্রথম লাইনটা হচ্ছে:

"মাটিতে পাতিয়া কান, পৃথিবীর অন্তরের শুনি আর্তনাদ।"

বাস্! তবে আর কি! পৃথিবীর চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার ক'রে দিলে হে রাহুল
য়! নাঃ, ঝোঁকের মাথায় ছোঁড়ার মাইনে বাড়িয়ে দেওয়াটা ঠিক হয় নি।
তে তার কবিতার পাগলামি আরও আশকারা পাবে হয়তো। শেষটায় ভক্ত
মপ্রসাদের মত অফিসের জরুরী কাগজপত্রে কবিতা লিখে না বসে!
ড়িয়াখানার ভেতরেই পরম চিন্তিত হয়ে পড়লেন ভুজঙ্গ চৌধুরী।

কবিতা তোমার কেমন লাগে হে চম্পটী?—শুধালেন চম্পটীকে।

পদ্যর কথা বলছেন তো হুজুর? তা, মন্দ কি? ছেলেবেলায় পড়েছি:

"পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।..."

আহা-হা! এ যে কানেও ফুল ফুটিয়ে দেয় হে চম্পটী।—বললেন ভুজঙ্গ
ধুরী, আর আজকালকার কবিতাগুলো যেন হুল ফোটাতে থাকে।
বাপ বাবার চোদ্দ পুরুষ মানে বুঝতে পারে না।

তা যা বলেছেন হুজুর।—বললে চম্পটী। চম্পটী জানে না, কবিতার
মান বদলেছে অনেক। কবিতা হ'লে তার মানে থাকতে হবে তার কোনও
মানে নেই। বেগ মাপা যায়, কিন্তু আবেগ মাপা যাবে কোন্ মাপকাঠিতে?
আজকার কবিতায় বিশ্বজনীনতা প্রচুর পরিমাণে থাকা চাই; আর বোঝবার
দায় পাঠকের, কবির দায় নয় বোঝানো। যে কবিতা বিশ্বজন যত কম বুঝবে,
সে কবিতা তত বেশি বিশ্বজনীন। বোঝা কঠিন, না-বোঝা সহজ, তাই

অবোধ্য কবিতা রচনার সহজিয়া পন্থাই হচ্ছে বিশ্বজনীন কবি হবার সহজ পন্থা।
এত কথা না ভেবেই চম্পটী বললে, তা যা বলেছেন হুজুর।

আবার হুজুর! ছোটলোক চাকরটা 'হুজুর' বলে না, অথচ 'হুজুর' 'হুজুর' করে ভদ্দরলোকের ছেলে অতুল চম্পটী! ভদ্রলোকের ছেলের মুখে অমন বিগলিত 'হুজুর' ডাক মানায় না। কিন্তু বিশেষত্বহীনতাই যেমন তার চেহারার বিশেষত্ব, তেমনই যা-কিছু বেমানান তাই যেন বেশি মানায় চম্পটীকে। যেমন সাহেব, তেমনই মোসাহেব। ভগবান 'হুজুর' বলে না, হুজুর ভাবেও না। বলে —দাদাবাবু, ভাবেও তাই।

টিফিন-ক্যারিয়ার, ফ্লাস্ক ইত্যাদি ব'য়ে ব'য়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে ভগবান। চিড়িয়াখানায় সে এর অনেক আগে শেষ যেদিন এসেছিল তখন দু-নম্বর বিশ্ব-মহালড়াই শুরু হবার ঢের দেরি, রিহার্শাল শুরু হব-হব করছে মাত্র। ভারত তখনও স্বাধীন হয় নি, পরাধীন চিড়িয়াখানার চেহারায় যে জৌলুস ছিল, স্বাধীনতার তাপশ্চিক আবহাওয়ায় তা ঝ'রে গেছে। কমেছে বৈচিত্র্য, কমেছে জানোয়ারেরা প্রকারে আর সংখ্যায়, আর কেমন যেন লঙ্গরখানার লপ্‌সী-খাওয়া চেহারা হয়েছে আগাগোড়া জানোয়ারগুলোর।

জলহস্তী আর স্থলহস্তী দু রকম হস্তীই দেখলেন ভুজঙ্গ চৌধুরী। দেখলেন তুলনামূলক ভাবে, জল-পদ্ম আর স্থল-পদ্মের মত। দেখলেন, জলহস্তীর মুখের ওপর একটি লম্বা অঙ্গ কম, তেমনই ঝামেলাও কম। মাথায় মাহুতের গুঁতো খেতে হয় না। হাওদা-বাঁধা পিঠে সওয়ারী ব'য়ে বেড়াতে হয় না, খামখেয়ালী নির্ঝঞ্ঝাট আলসেমির অখণ্ড অবসর। যখন খুশি পাঁচিল-ঘেরা ডাঙায়, যখন খুশি পিঠ-না-ডোবা ডোবার ঘোলা-জলে।

বিরাট বিশ্রী হাঁ জলহস্তীর। নিজের কাছে ভারি সুশ্রী ব'লে মনে হয় বুঝি, তাই মাঝে মাঝে হাঁ ক'রে দেখায়! অতুল চম্পটী বললে, ঐ হাঁ-র ভেতর একবার একটা বাচ্চা সেঁধিয়ে গিয়েছিল হুজুর।

কিসের বাচ্চা?

মানুষের বাচ্চা হুজুর। ছিল মার হাতে। রেলিং টপকে পড়্‌ তো পড় একেবারে জলহস্তীর মুখে।—চম্পটী বললে, মা তো তাই দেখে রেলিংয়ের এধারে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। হায় হায় হৈ-হৈ প'ড়ে গেল। বাচ্চার আগে

রিয়ে আছে জলহস্তীর মুখ থেকে। হল্লা শুনে মারামারি হচ্ছে ভেবে ড়িয়াখানার অফিসার এলেন বন্দুক হাতে। সবাই বললে—বন্দুক চালাও হস্তীর মুখে, তা হ'লে বাচ্চাকে ব্যাটা ছেড়ে দেবে। বন্দুক চালালে না ফিসার, পাছে জলহস্তী মারা যায়। বাচ্চাটাকে আস্ত গিলে ফেললে হস্তী। মানুষের বাচ্চা আকৃছার মেলে, কিন্তু জলহস্তী ম'লে জলহস্তী লবে কোথায়? সরকার বাহাদুরের কাছে জবাবদিহি করবে কে?

অ্যাঃ!—এইবারে ভগবান আওয়াজ ক'রে উঠল। এটা আসলে তার —মানুষের ছাওয়ালের চাইতে কি একটা জানোয়ারের জানের দাম বেশি? রপর বললে, তারপর?

অতুল চম্পটী ভগবানের প্রশ্নের জবাবটা ভুজঙ্গকে দিয়ে বললে, তারপর িড়িয়াখানার ডাক্তার এসে ওর একটা জোলাপের ব্যবস্থা করলে। তারপর হ'ল জানি না।

ভুজঙ্গ চৌধুরী বাইরে হেসে মনে মনে বললেন, গুল্—গুল্, স্রেফ গুল্। তিনি পুরোপুরি ছুটির মেজাজে, এখানে তিনি মহাদাপটী অফিস-সিংহ । চিড়িয়াখানায় আজ তিনি চান চিড়িয়াখানাই আবহাওয়া আকণ্ঠ তে। অতুল চম্পটী তা জানে, ভুজঙ্গ-চরিত্র তার নখদর্পণে ধরা দিয়েছে। দেবার আনন্দেই দিয়েছে ধরা।

তারপর গেলেন বাঁদর-বিভাগে। দেখলেন নানা বিভিন্ন জাতের বাঁদর। লেন, এরাই ছিল আমাদের পূর্বপুরুষ, জানলি ভগু? ডারুইন সাহেব গেছে। আস্তে আস্তে ন্যাজ খ'সে আমরা মানুষ হয়েছি।

ম্পটী ভুজঙ্গ চৌধুরীর মেজাজের নাড়ি টিপে নিয়ে বললে, তবু বাঁদরামি নি হুজুর।

আবার টেনে টেনে হেসে হেসে ভুজঙ্গ চৌধুরী বললেন, বাঁদরামি তবু নি! এঃ এঃ এঃ এঃ এঃ! বলেছ ভাল হে চম্পটী। আর আমাদের এর এই বাঁদরামি দেখেই তো ডারুইন সাহেবের কথা বিশ্বাস হয় যে, দের পূর্বপুরুষ বাঁদর।

কিন্তু ওহে ভুজঙ্গ! তা যদি বল, তা হ'লে তো সাপ, শেয়াল, শকুন, বাঘ, ক, উল্লুক, প্যাঁচা, হায়না—এঁদেরও আমাদের পূর্বপুরুষ ব'লে বিশ্বাস

করতে হয়। এঁদের মিশ্র প্রভাব তো আমাদের চরিত্রে অহরহ কিলবিল করছে।

হঠাৎ লক্ষ্য করলুম, গা-ঘিন-ঘিন ক'রে উঠল ভুজঙ্গ চৌধুরীর। তাঁর পাশ দিয়ে প্রায় গা ঘেঁষে চ'লে গেল এক ঝাঁক গরিব ছোটলোক নোংরা-কাপড়-চোপড়ী নর-নারী বালক-বালিকা। এই জানোয়ারের দল চিড়িয়াখানায় এসেছে জানোয়ার দেখতে! বলিহারি! এদের দুটো একটাকে ভুজঙ্গ চিনতেও যেন পেরেছেন ব'লে মনে হ'ল, যারা এখানে ওখানে ফুট্‌পাথের ধারে দাঁড়িয়ে, ব'সে, শুয়ে নানা ভঙ্গীতে নানা ঢঙে ভিক্ষে করে। ভিক্ষুক এরা।

কিন্তু আমাদের পুণ্য-ভারতে এরা তো তুচ্ছ নয়। ভিক্ষাদান আমাদের আদর্শ মহাব্রত, ভিক্ষুক নইলে এ ব্রতের সাফল্য কি ক'রে হবে? আদর্শ ভারতে তাই ভিক্ষুক চাই—চাই-ই। ভিক্ষুক নইলে আদর্শ ভারত চলতে পারে না। পিতৃদেবের এই কথাগুলো মনে উদিত হ'ল ভুজঙ্গ চৌধুরীর। দরিদ্র-নারায়ণ! সত্যি, নারায়ণত্বের বিরাট সৌভাগ্যে এরা সৌভাগ্যবান। দারিদ্র্যই এদের জীবনের পরম আশীর্বাদ, চরম গৌরব। অর্থ-প্রাচুর্যের কলুষ এদের স্পর্শ করে নি, বিলাসের ব্যসন এদের পঙ্গু করে নি, ঐশ্বর্যের উদ্বেগ ভারাক্রান্ত করে নি এদের মনকে, সম্পত্তিহীনতাই এদের পরম সম্পদ। এরা সর্বহারা, তাই সর্ব এদের গ্রাস করতে পারে নি। কোন ব্যাঙ্কে এদের একটি কাণা আধলাও নেই, তাই দেশের সবগুলো ব্যাঙ্ক একসঙ্গে লালবাতি জ্বালালেও এরা হ্যারিকেন লণ্ঠন নিভিয়ে সারারাত অনায়াসে নাক ডাকিয়ে ঘুমতে পারে।

তা বটে। কিন্তু সারা দেশ জুড়ে এই যে সব ছোটলোক দরিদ্রনারায়ণের দল কোমর বেঁধে ফি বছর নারায়ণী সেনার সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে হে চম্পটী, আর উঁচুতলার মানুষ সংখ্যা-শাসনের হুজুগী-বিলাসে মেতে বছরের পর বছর দলে পাতলা হয়ে চলেছে, তাতে শেষটায় গোটা দুনিয়াটা যে ছোটলোকে ছোটলোকে কিলবিল ক'রে উঠবে। নিজেদের, মানে উঁচুতলার মানুষের, গুরুতর সংখ্যালঘু কোণঠাসা অবস্থার কথা ভেবে যে শিহরিত অসহায় ভঙ্গী ভান করলেন তিনি, তার মানে—একটা বিহিত করা নিতান্ত দরকার হে চম্পটী, নইলে যে কোণঠাসা হতে হতে শেষটায় নস্যি হয়ে উড়ে যেতে হবে।

ভগবান তখন ভগবানের মতই নীরবে নির্বিকারে বিরহী শিম্পাঞ্জীর

...বাদাম খাওয়া দেখছে। অতুল চম্পটী ভুজঙ্গ চৌধুরীর মুখে যে ভাবে ...াল, তার মানে---বিহিত তো আপনাদের নিজেদেরই হাতে রয়েছে হুজুর।

নিচুতলার ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগোতে হবে।—ভাবলেন ভুজঙ্গ চৌধুরী। ম্যাল্‌থাসের হুঁশিয়ারি মাথায় ঢুকিয়ে ভীষ্মঠাকুর হয়ে ব'সে থাকলে চলবে না। এ হ'ল একেবারে অস্তিত্বের লড়াই, ন্যায়-নীতির কৌপীন প'রে সাধু হয়ে থাকলে এর তুফানে উড়ে বানচাল হয়ে যেতে হবে। মর‍্যালিটি! চরিত্রবানতা! ফুঃ! যত সব পাগলামো, কুসংস্কার, কাপোরুষ, অদূরদর্শী-অবিমৃষ্যকারিতা!

চম্পটী-চরিত অজানা নয় তাঁর। জানা ব'লেই তার এমন অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য শুধু বরদাস্ত নয়, উপভোগ করেন তিনি। কিসের দালালি প্রধানত করে চম্পটী ...। জানেন তিনি, আর জানেন কেন সে তাঁর মোসাহেবরূপে পিছু ধরেছে। জেনেও তিনি না-জানার ভান করছেন; আর এ ভান বুঝতে না পারার ভান করছে অতুল চম্পটী। যেন চাঁদ ঘুরছে পৃথিবীকে ঘিরে আর চাঁদকে ঘিরে ঘুরছে পৃথিবী। আর দোঁহে ঘুরছে যে যার শিরদাঁড়া ঘিরে।

অতুল চম্পটীর আফ্‌সোস, আগে কেন এই শাঁসালো কাপ্তানটির খোঁজ পায় নি? তা হ'লে তো অ্যাদ্দিনে এঁকে দোহন ক'রে ফতুর ক'রে দেওয়া যেত, যেমন বহু কাপ্তানকে সে করেছে। চম্পটী জানে না (হায় চম্পটী!) যত কম চতুরকে ফতুর করা যায় তত কম-চাতুর্য নেই ভুজঙ্গ চৌধুরীর। অভীপ্সোচিত ক্রিয়াকলাপে প্রতি হপ্তায় টাকা ওড়ায় ভুজঙ্গ, কিন্তু এই খাতে খরচের জন্যে তাঁর নিজেরই নির্ধারিত মাসিক উদার বরাদ্দ আছে, যায় না কখনও সে এ বরাদ্দের বাইরে। অনেক পূর্ণ বোতল শূন্য করে ভুজঙ্গ, সেগুলো বিদায় নিয়ে আবার পূর্ণ বোতল আসে। পূর্ণতা আর শূন্যতা বোতলের চাকায় ঘুরে চলে, কিন্তু বরাদ্দের সীমা ছাড়ায় না কখনও। অসংযমের পাকা খেয়ালী সে, দুরূহ শয়তানী খেয়ালের লয়-তানে অদ্ভুত কেরামতি, চমকে তোলে গমকে গিটকিরিতে, আর তারই মাঝে মাঝে লাগায় ঠুংরীর বাহার আর গজলের ...; ৺রবি ঠাকুরের নবীন গাইয়ে কাশীনাথের মত "আপনি গড়ি' তোলে বিপদ-জাল আপনি কাটি' দেয় তাহা।" হিসেবিয়ানার পাকা তবল্‌চী তার ...য়াতির সঙ্গে সঙ্গে ক'ষে দিয়ে চলেছে সঙ্গতি ঠেকা—ধা ধা ধিন্‌ তেরেকেটে, ...র পাকা গাইয়ে ভুজঙ্গ শক্ত শক্ত তান-কর্তবের জোয়ার বইয়ে দিয়েও ঘুরে

ফিরে বার বার ঠিকমত শমে ফিরে আসছে। একমাত্রা এদিক ওদিক হচ্ছে না কখনও। এ হেন পোক্ত লয়দার গাইয়েকে ঘায়েল করতে পারবে কি অতুল্য চম্পটীর মত তবলচী? তা না পারুক, খেলাতে পারবে চম্পটী; কেন .. খেলতে আপত্তি নেই ভুজঙ্গের।

এদিকে ভুজঙ্গের গাড়ির ড্রাইভার রৌশনলাল চিড়িয়াখানার বাইরে গাড়িতে ব'সে প্রণয়-পত্র পড়ছে। পরিণয় আশা ক'রে দিন গুনছে আর অনেক রাত জাগছে রৌশনলালের প্রণয়িনী রোশনী—নামটা রৌশনেরই দেওয়া কিনা কে জানে?—এ চিঠি তারই লেখা, দূর সুন্দরগাঁও থেকে। রৌশন চ'লে এসেছে এ শহরে পয়সা কামাতে, ব'লে এসেছে—কামানো যথেষ্ট হ'লেই দু হাত এক ক'রে ফেলবে সে, রোশনী যেন ভেবে ভেবে মাথা না ঘামায়। হয়ে গেছে বছর খানেক, এখনও হয়তো যথেষ্ট কামানো হয় নি রৌশনলালের, তাই দু হাত এখনও আলাদাই থেকে গেছে। এই বছরখানেক ধ'রে এত প্রেমপত্র পেয়েছে রৌশনলাল রোশনীর কাছ থেকে, যা ওজনদরে বেচলে যে কোনো অর্ডিনারী সিগ্রেটখোরের একদিনের সিগ্রেটের খরচা ওঠে। আসলে হয়তো সেগুলো রোশনীর কাঁচা হাতের লেখা নয়, কোন পাকা হাতের রচনা। হয়তো রোশনীর বাবাই কোন পাকা প্রেমপত্র-লিখিয়েকে দিয়ে রচনা করিয়ে পাঠিয়েছে ঘন ঘন, পাছে রৌশনলালের মন খালি পেলে সেই সুযোগে কোন শহুরে মেয়ে জুড়ে বসে। এসব প্রেমপত্রের জবাব দিতে রৌশনলাল বটতলা-সংস্করণ 'সরল প্রেমপত্র রচনা শিক্ষা'র সাহায্য নিয়েছে, নিচ্ছে, নেবেও। প্রেম যত সহজে এসেছে রৌশনলালের, প্রেমপত্র রচনা তত সহজে আসে না। প্রেমে পড়লেই প্রেমপত্র লিখতে পারা যাবে, বা প্রেমপত্র লিখতে হ'লেই প্রেমে পড়তে হবে, এমন কোন কথা নেই। বরং এমন অনেক দেখেছি, যা না বলাই ভাল। কেন না, শাস্ত্রে বলেছে "শতং বদ, মা লিখ।"

রৌশনলালের মত স্বাপ্নিক শোফার ব্যাবিলোনীয় সভ্যতার যুগ থেকে বর্তমান অসভ্য যুগ পর্যন্ত আর একটি দেখা যায় না। স্বপ্ন, স্বপ্ন—শুধু স্বপ্ন দেখে রৌশনলাল। রোশনীকে নিয়ে নীড় বাঁধার স্বপ্ন। মাইনে পায় ভুজঙ্গ চৌধুরীর কাছ থেকে, থাকে খায় ভুজঙ্গ চৌধুরীর কাছে ভুজঙ্গেরই খরচে

(৫৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শর্ট স্ট্রীটে কান্না

এক

প্রশান্ত লাহিড়ী শর্ট স্ট্রীটেই ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন। তিনতলার ফ্ল্যাট। দোতলায় থাকেন এক ইংরেজ-দম্পতি। এসব অঞ্চলে সাধারণত দম্পতিরাই থাকেন। প্রত্যেকটা ফ্ল্যাট যেন অপরিচয়ের সমুদ্রে এক-একটি দম্পতি-দ্বীপ। জোড়া জোড়া স্বামী-স্ত্রী। দু-একটি ছেলেমেয়ে যা ছিল, তারা সব আছে কার্সিয়ঙের কন্‌ভেণ্টে, নয়তো দার্জিলিঙের সেণ্ট যোসেফ স্কুলে। একতলার সঙ্গে দোতলার সম্পর্ক নেই, দোতলার সঙ্গে নেই তিনতলার। সিঁড়ির পাশে ফ্ল্যাটে ঢোকবার দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলে অতি সহজেই ভুলে যাওয়া যায় গোটা বাড়িটাকে, ভুলে যাওয়া যায় শর্ট স্ট্রীটের অস্তিত্ব। মনে হয়, কলকাতার টোপোগ্রাফির অংশ নয় শর্ট স্ট্রীট।

আজ কদিন হ'ল, একতলার ফ্ল্যাট খালি হয়ে গেছে। একজন জার্মান ইঞ্জিনিয়ার এক বছর এইখানে থেকে গেলেন। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ছিলেন। স্ত্রীও ইঞ্জিনিয়ার। বাবুর্চীদের মারফৎ খবর পাওয়া গেছে, এঁরা এসেছিলেন ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরোধক্রমে চাকরি নিয়ে। বেশ বড় চাকরি। দামোদরের জল থেকে উনিশ শো কত খ্রীষ্টাব্দে যেন কত কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা সম্ভব হবে, তারই খসড়া তৈরি করতেই এঁরা এসেছিলেন। খসড়ার কাজ নিশ্চয়ই শেষ হয়ে গেছে, তাই তাঁরা কদিন আগেই চ'লে গেলেন পশ্চিম-জার্মানিতে। বাবুর্চী-মহলের গুজব থেকে প্রশান্ত লাহিড়ী খবর পেয়েছেন যে, ওঁরা একই সঙ্গে কিলোওয়াট গণনা করতেন এবং একই সঙ্গে বসবাস করতেন বটে, আসলে ওঁরা বিবাহিত ছিলেন না। খবরটা কানে আসবার পর থেকে প্রশান্ত লাহিড়ী নিজের ফ্ল্যাটে ব'সেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। উদ্বিগ্ন হওয়ার কথাই। কোন রকম একটা অনুষ্ঠান ছাড়া শিক্ষিত মানুষরা কেমন ক'রে যে স্বামী-স্ত্রীর মত শর্ট স্ট্রীটে এসে জীবন কাটিয়ে যান—সে কথা ভেবে প্রশান্ত লাহিড়ী তাঁর নিজের ঘরেই পায়চারী ক'রে যাচ্ছেন ক্রমাগত। এই নিয়ে প্রশান্ত লাহিড়ীর ভাবনার শেষ নেই। ভাবতে ভাবতে তিনি চ'লে গেলেন বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট পর্যন্ত।

সেখানে গিয়ে ঢুকে পড়লেন বইয়ের দোকানে। বই কিনবেন তিনি: প'ড়ে দেখবেন যুবক-যুবতীদের প্রেমের কাহিনী। পলাতকার প্রেম: কোন্ কোন্ উপন্যাসে নায়ক-নায়িকারা পালিয়ে গেছে তার একটা লিস্ট চাইলেন প্রশান্ত লাহিড়ী দোকানদার গদাধরবাবুর কাছে। গদাধরবাবু তাঁর জীবনে এমন খদ্দের এই প্রথম পেলেন। প্রশান্ত লাহিড়ীকে নিয়ে তিনি বসলেন এসে শেল্‌ফের পেছনে, প্রাইভেট কামরায়। মুঙ্গের জেলার রামকিষণ ইঙ্গিত পেয়ে ছুটল চা আনতে। ভি.পি.র প্যাকেট প'ড়ে রইল গদাধরবাবুর পায়ের কাছে।

গদাধরবাবু বললেন, ভীষণ-বিক্রি উপন্যাসের সংখ্যা আমার অনেক। পাতায় পাতায় প্রেম, কথায় কথায় মনস্তত্ত্ব, সে কি সংস্কৃতি মশাই! সংস্করণ-সংখ্যা দেখবেন ?

না। আমি এমন সব উপন্যাস দেখতে চাই, যার নায়ক-নায়িকারা সব পালিয়েছে।—বললেন প্রশান্ত লাহিড়ী।

কেন বলুন তো ?

আমি জানতে চাই, পালিয়ে ওরা যায় কোথায় ?

যাবে আর কোথায় মশাই, কলকাতায়ই থাকে। গা-ঢাকা দিয়ে বিদগ্ধ সমাজে বুক ফুলিয়ে চলবার মত সমাজ কলকাতা ছাড়া আর কোথায় পাবেন ? আমাদের লেখকদের মধ্যে অনেকেই কৃষ্টি-মিশনের সঙ্গে প্রায় আধখানা পৃথিবী দেখে এসেছেন। সর্বত্রই এক ব্যাপার।

কি ব্যাপার ?—জানতে চাইলেন প্রশান্ত লাহিড়ী।

নায়ক-নায়িকারা কেউ বিয়ে-সাদি করছে না। দিনরাত কেবল বিড়বিড় ক'রে মনস্তত্ত্ব বলছে। আমিও বলি মশাই, টিটাগড়ে কাগজ আছে, অমুক স্ট্রীটে আছে লাইনো—আরও শ তিনেক পৃষ্ঠা পর্যন্ত নায়ক-নায়িকারা খোলাভাবে ঘুরুক, কৃষ্টির কষে হুগলী কালির মুখ আরও কালো হয়ে উঠুক, চ'লে যাক ওরা হিল্লি-দিল্লি-বোম্বাই।—একটু হেসে গদাধরবাবু পুনরায় বললেন, টিকিট কিংবা থাকা-খাওয়ার তো পয়সা লাগছে না! কি দরকার ওসব বিয়ের কথা উচ্চারণ করার ? অবশ্য লেখকেরা যদি শেষ পৃষ্ঠায় এসে উচ্চারণ করেনই, তাতে কোন ক্ষতি হবে না

না। শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কজনই বা উপন্যাস পড়ে, বলুন? যারা ভাগবে তারা তো আগে থেকেই বেলুনের মত ফুলে রয়েছে, মনস্তত্ত্বের হাওয়া ছাড়লে উড়তে কতক্ষণ?

কিন্তু সামাজিক জীবনে—

প্রশান্ত লাহিড়ীকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে গদাধরবাবু বললেন, ওসব সমাজ-টমাজ ছুঁড়ে ফেলে দিন নর্দমায়, এই নিন ফ্রয়েড। নাম শুনেছেন?

সামনে দাঁড়ানো একজন কর্মচারীর হাত থেকে ছ-সাতখানা রঙ-বেরঙের বই নিয়ে তিনি প্রশান্ত লাহিড়ীকে পুনরায় বললেন, এদের নায়ক-নায়িকারা সব পালিয়েছে। যতীন, ক্যাশমেমো কাটো।

কর্মচারী যতীন পুরনো লোক। সে ক্যাশমেমো কেটেই এনেছে। হিসেবমত সব পয়সাই চুকিয়ে দিয়ে প্রশান্ত লাহিড়ী উঠতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় গদাধরবাবু অনুরোধ করলেন, চা, চা খেয়ে যান। রামকিষণ—

জী!—জবাব দিল রামকিষণ গদাধরবাবুর পেছন দিকের একটা শেল্‌ফের আড়াল থেকে। প্রশান্ত লাহিড়ী দেখলেন, মুঙ্গের জিলার রামকিষণ লুকিয়ে লুকিয়ে চায়ের প্লেটে চুমুক মারছে। কৃষ্টির কষে দেহাতী রামকিষণের মুখের স্বাদও গেছে বদলে।

বিশেষ ধন্যবাদ। আজ আমি চলি। অন্য একদিন এসে চা খেয়ে যাব।—নমস্কার ক'রে বইয়ের প্যাকেটটি হাতে নিয়ে প্রশান্ত লাহিড়ী চ'লে এলেন দোকানের বাইরে। বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট ধ'রেই তিনি পড়লেন কলেজ স্ট্রীটের ওপর। গাড়িটাকে দাঁড় করাতে হ'ল। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সব রাস্তা পার হচ্ছিল। তিনি স্টিয়ারিং ধ'রে চেয়ে রইলেন মেয়েদের দিকে। একটি মেয়ে যেন ঠিক উৎপলার মত দেখতে মনে হ'ল প্রশান্ত লাহিড়ীর। উৎপলা? পলা? তাই তো, পেছন থেকে একটা গাড়ি হর্ন বাজাচ্ছে। রাস্তা ছেড়ে দিয়ে তিনি গাড়ি চালিয়ে চ'লে এলেন চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে। পলার সঙ্গে মেয়েটির কি অত্যাশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে!

শর্ট স্ট্রীটে ফিরে আসতে তাঁর বেশ একটু রাত হ'ল। বাইরের ফটক দিয়ে তিনি এক রকম নিঃশব্দেই ভেতরে প্রবেশ করলেন। নতুন গাড়িতে শব্দ হওয়ার কথাও নয়। কোথাও কোন জনমানব নেই। থাকলেও এ অঞ্চলে মানবসংখ্যা খুবই কম। হিসেব করলে হয়তো প্রতি বর্গ-মাইলে গড়পড়তা আঠার জনের বেশি হবে না। হিসেব করলে হয়তো দেখা যাবে, প্রতি বর্গ-মাইলে গড়পড়তা ছত্রিশটা ক'রে কুকুর বাস করে। বিলিতী কুকুর। প্রশান্ত লাহিড়ীর পায়ের আওয়াজ পেয়ে দোতলার ইংরেজ-দম্পতির অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। রোজই করে। গাড়িটাকে গ্যারেজে তুলে দিয়ে তিনি লাল সুরকির রাস্তা ধ'রে এগুতে লাগলেন বাড়ির দিকে। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে প্রশান্ত লাহিড়ী ডান দিকে চাইলেন একবার। চাইতে হ'ল। এক তলার ফ্ল্যাটের দরজাটা বন্ধ রয়েছে। ইচ্ছে হ'ল, ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলেন তিনি। ভেতরে গিয়ে দেখে আসতে চাইলেন, জার্মান-পরিবারটি তাঁদের জীবনযাত্রার কোন চিহ্ন ফেলে গেছেন কি না! অন্তত এক ফোঁটা চোখের জল যদি ফেলে গিয়ে থাকেন? প্রশান্ত লাহিড়ী শুনতে পেয়েছেন যে, জার্মান মেয়েটির আসল স্বামী আজও বেঁচে আছেন। বেঁচে আছেন জার্মানিতেই। কি এক রাজনৈতিক আদর্শ নিয়ে দুজনের মধ্যে মতানৈক্য ঘটায় মেয়েটি চ'লে এসেছেন সংসার ভেঙে। রাজনৈতিক আদর্শের জন্য তিনি সংসার ভাঙতে পারলেন, অথচ নৈতিক আদর্শ ধ'রে রাখবার জন্য তিনি পারলেন না আপোস-রফা করতে!

প্রশান্ত লাহিড়ী দরজাটার আরও একটু কাছে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। একতলার শূন্য ফ্ল্যাট তাঁকে টানছে। তিনি যেন শুনতেও পেলেন সেই জার্মান মেয়েটির কান্না। অবিবাহিত জীবন-যাপনের প্রেম পরিশুদ্ধ হয় নি অনুষ্ঠানের মন্ত্রোচ্চারণে। উপভোগের মাধুর্য নষ্ট হয়ে গেছে উপাসনার অভাবে। অতএব, প্রশান্ত লাহিড়ী ভাবলেন যে, জার্মান মেয়েটি সবই সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছেন বটে, কিন্তু ফেলে গেছেন একতলার ফ্ল্যাটে তাঁর গোপন কান্না। লক্ষ কিলোওয়াট

চেয়েও এ-কান্না বেশি শক্তিশালী। নইলে প্রশান্ত লাহিড়ীর কান পর্যন্ত এসে তা পৌছতে পারত না।

দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছিল তাঁরই নিজের ভৃত্য সতীশ। প্রশান্ত লাহিড়ী স'রে এলেন দরজার কাছ থেকে। সতীশ বললে, পাপ বিদেয় হয়েছে দাদাবাবু। নতুন ভাড়াটে আসছে।

তাই নাকি ?—সিগারেটে বেশ জোরে টান দিয়ে তিনি পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠতে যাচ্ছিলেন।

সতীশ বললে, আমাদের এলাহাবাদের মত ছোট জায়গায় ইজ্জত আছে। কিন্তু এসব পাড়ায় ইজ্জতের কোন বালাই নেই।

ঠিক, ঠিক কথা। তা ছাড়া এখানে অনেক রকমের স্থবিধেও আছে। স্থবিধেগুলো জানবার জন্যই যেন সতীশ চেয়ে রইল প্রশান্ত লাহিড়ীর দিকে। দু ধাপ ওপরে উঠে তিনি বললেন, লুকিয়ে থাকবার পক্ষে এসব জায়গা খুবই ভাল সতীশ। কিন্তু মানুষ কি তার অপরাধ-উপলব্ধি থেকে চব্বিশ ঘণ্টাই লুকিয়ে থাকতে পারে ?

পারে না।—ভাবলেন প্রশান্ত লাহিড়ী। পারে না ব'লেই জার্মান মেয়েটির কান্না তিনি নিজের আবদ্ধ ফ্ল্যাটে ব'সেও শুনতে পান।

দুই

আজ প্রায় এক বছর হ'ল প্রশান্ত লাহিড়ী তাঁর এলাহাবাদের বাড়িতে তালা লাগিয়ে কলকাতায় এসে বসবাস করছেন। তিনি ব্যবসায়ী। উত্তর-প্রদেশে লাহিড়ী অ্যাণ্ড কোম্পানি মদ বিক্রির বড় প্রতিষ্ঠান, পুরনোও বটে। পিতার আমলের ব্যবসা থেকে তাঁর প্রচুর পয়সা আসে। আসে এক রকম বিনা আয়াসেই। তাঁর পিতা হেরম্ব লাহিড়ী ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া-প্রকৃতির মানুষ।

মদ খাওয়া তো দূরের কথা, মদের গন্ধ পর্যন্ত তিনি সহ্য করতে পারতেন না। উপরন্তু বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে গিয়ে তিনি প্রতি বছরই জানিয়ে আসতেন যে, উত্তর-প্রদেশের মদ্যপায়ীরা যদি মদ খাওয়া ছেড়ে দেয় তা হ'লে তিনি মনে মনে খুশিই হবেন। মরবার সময়ও তিনি তাঁর একমাত্র সন্তান প্রশান্তবাবুকে সেই কথাই জানিয়ে গিয়েছিলেন।

উত্তর-প্রদেশের লোকেরা মদ ছাড়ে নি, কিন্তু প্রশান্ত লাহিড়ী ব্যবসা ছেড়েছেন। ছাড়িয়েছে পলা। পলা মানে এলাহাবাদের উৎপলা বাগচী। ভারতীয় নৃত্যে কৃতিত্ব ছিল তার অসাধারণ, ফৈয়াজ খানের ঘরোয়ানা খেয়াল উৎপলা বাগচীর কণ্ঠে রূপ পেয়েছিল আশাতীতভাবে, ইংরেজী শিক্ষা ও ভাষার ওপর দখল ছিল তার অপরিসীম। ইচ্ছে করলেই উৎপলা বাগচী এলাহাবাদের কিংবা লোকায়ত ভারতবর্ষের যে-কোন লোককে বিয়ে করতে পারত। কিন্তু বিয়ে তার নিজের মতে হ'ল না, হ'ল পিতামাতার ইচ্ছানুসারে। আর হ'ল এক অল্পশিক্ষিত সাধারণ মানুষের সঙ্গে। প্রশান্ত লাহিড়ী সেই সাধারণ মানুষ।

বিয়ের পর প্রশান্ত লাহিড়ী আরও বেশি ক'রে সাধারণ হতে লাগলেন। উৎপলা যখন তার আন্তর্জাতিক বন্ধু-গোষ্ঠীকে নিয়ে বসবার ঘরে বিশ্ব-কলার আলোচনায় ব্যস্ত থাকত, প্রশান্ত লাহিড়ী তখন সবচেয়ে দূরের চান-ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে হাজার ছিদ্রের ঝরনার নীচে দাঁড়িয়ে মাথায় দিতেন ঠাণ্ডা জল। বিয়ের পর তিনি উৎপলার নৃত্য-অনুষ্ঠানেও যোগ দিতেন না। এখানে ওখানে নৃত্য-অনুষ্ঠানে উৎপলা যখন নাচতে যেত, প্রশান্ত লাহিড়ী তখন বিনা কারণে লাহিড়ী অ্যাণ্ড কোম্পানির অফিসে বসে স্কচ হুইস্কির স্টক মেলাতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ক্রমে ক্রমে তিনি তাঁর স্ত্রীর সামনে মাথা তুলে দাঁড়াবার সাহস পর্যন্ত হারিয়ে ফেলতে লাগলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, উৎপলার যোগ্য স্বামী হতে গেলে তাঁকে শিক্ষিত হতে হবে। তিনি ঠিক করলেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক অমিতাভ সেনকে প্রাইভেট টিউটর রাখবেন। অমিতাভ তাঁর বাল্যবন্ধু। রাখলেনও তাঁকে মাসিক এক শো টাকা মাইনেতে।

বিয়ের ছ মাস পর উৎপলার এল জন্মদিন। ড্রয়িং-রুমে বন্ধুবান্ধব সব তার অপেক্ষা করছিলেন। প্রশান্ত লাহিড়ী অপেক্ষা করছিলেন উৎপলার শোবার ঘরের বাইরে। উৎপলা তখন কাপড় পরছিল। একটু পর প্রশান্ত লাহিড়ী বাইরে থেকেই জিজ্ঞাসা করলেন, আসতে পারি কি ?

জবাব এল, এস। আমার হয়ে গেছে।

তিনি প্রবেশ করলেন উৎপলার শয়ন-কামরায়। মাথা নীচু ক'রেই প্রবেশ করলেন।

উৎপলা জিজ্ঞাসা করল, কিছু বলবে?

হ্যাঁ।

বল, আমি শুনছি। ঠোঁটে রঙ মাখছি বটে, কান তো আমার খোলাই রয়েছে।

প্রশান্ত বললেন, আমি জানতে চাইছিলুম, নারায়ণশিলা সামনে রেখে মাস ছয়েক আগে আমরা যে একটা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলুম, তার কোন মূল্য কিংবা অর্থ আছে কি না!

উৎপলা হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারল না। অথবা হঠাৎ কোন জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না এলাহাবাদের উৎপলা বাগচী। প্রসাধন শেষ করবার পর সে বললে, লাহিড়ী অ্যাণ্ড কোম্পানির সাইনবোর্ডের মত অনুষ্ঠান যদি কেবল স্বামী-বিজ্ঞাপন ব'য়ে বেড়ায়, তা হ'লে আমি তার কাণাকড়িও মূল্য দিই না। কোন শিক্ষিত পুরুষ কিংবা মেয়েই দেবে না।

কিন্তু সব দেশেই তো বিয়ের একটা অনুষ্ঠান থাকে, হয়তো নারায়ণ-শিলা সব দেশে থাকে না। তা ছাড়া বিজ্ঞাপনের সবটুকুই তো মিথ্যে নয় পলা?

তুমি কি আজকের দিনে আমার সঙ্গে তর্ক করতে এসেছ?

না। তোমাকে জানাতে এসেছি যে, আমি অমিতাভর কাছে নিয়মিত লেখাপড়া শিখছি। অনেকে ভালবাসার পর বিয়ে করে, অনেকে বিয়ের পর ভালবাসে। আমার বাবা ছিলেন শেষের দলের লোক। মা কিন্তু নাম সই করতে জানতেন না।

উৎপলা কোন জবাব দিল না, কেবল বললে, আজ আর পড়তে ব'সো না। কারণ অমিতাভবাবুকে আমি নেমন্তন্ন করেছি।

প্রশান্ত লাহিড়ী পকেট থেকে একখানা চেক-বইয়ের পাতা বার ক'রে উৎপলার দিকে এগিয়ে ধ'রে বললেন, জন্মদিনে তোমার শতায়ু

কামনা করি। সেই সঙ্গে তোমার হাতে তুলে দিলুম শত হাজার টাকাও।

শত হাজার ?—বিস্ময়ের দৃষ্টিতে প্রশ্ন করল উৎপলা।

হ্যাঁ, এক লক্ষ টাকা।

অঙ্কটা বুঝতে উৎপলার আর কোন অসুবিধে হ'ল না। বোকা পুরুষগুলোর হাতে টাকা পড়লে স্ত্রীর জন্মদিনে ওরা টাকা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না, ভাবলে উৎপলা। সে আরও ভাবলে যে, এই টাকাটা তার জীবনের সবচেয়ে বড় অভাবটাকে ঘুচিয়ে দিতে পারবে।

দু দিন পর প্রশান্ত লাহিড়ী টের পেলেন, অভাবের সবটুকুই উৎপলা ফেলে গেছে এলাহাবাদের বাড়িতে। তাই তার জন্মদিনে কেবল প্রশান্ত লাহিড়ীই নেমন্তন্ন পান নি।

অমিতাভ সেন এলেন সন্ধ্যের সময় অন্য একদিন। বললেন, প্রশান্ত, আমি আজ উন্মোচন করব শতাব্দীর মুখ থেকে অজ্ঞানতার ঘোমটা। আলোচনা করব ডায়লেক্‌টিক্যাল জড়বাদ।

প্রশান্ত লাহিড়ীর মুখের দিকে চেয়ে অধ্যাপক অমিতাভ সেন একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তিনি বুঝলেন, সাংসারিক বিপর্যয়ের ছায়া পড়েছে তাঁর মুখে। এ ছায়ার বিস্তৃতি বুঝি অধ্যাপকের ডায়লেক্‌টিক্যাল জড়বাদকেও ঢেকে ফেলতে চায়। প্রশান্ত লাহিড়ী পকেট থেকে একটা চিঠি বার ক'রে বললেন, প'ড়ে দেখো।

অমিতাভ সেন পড়তে লাগলেন :

আমি এলাহাবাদ ছাড়লুম। তোমাকে কেন্দ্র ক'রে যে-সংসার গ'ড়ে উঠেছে, তাতে আমার স্থান নেই। আমি ছ মাসেই হাঁপিয়ে উঠেছি। ছ বছর বাঁচলে আমার গায়ে আর মাংস থাকত না। থাকত কেবল কখানা হাড় এবং হাড়ের তলায় ক্রনিক হাঁপানি। একটা সূক্ষ্ম ও সঙ্কীর্ণ অ্যানাটমিক্যাল অস্তিত্ব তোমার কি কাজে লাগত প্রভু? নারায়ণশিলার সামনে তুমি কি যে কতগুলো সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছিলে, তাতে তোমার কোন অপরাধ হয় নি। অপরাধ নেওয়ার মত

ক্ষমতা পাথরের নেই—আছে আমার। আমি তোমায় যাবতীয় অপরাধ থেকে মুক্তি দিয়ে গেলাম। আমায় খোঁজবার জন্য অনর্থক সময় নষ্ট করলে লাহিড়ী অ্যাণ্ড কোম্পানির আয় কমবে। কলকাতার আশেপাশে শুনেছি অনেক রিফিউজী এসেছে। তা থেকে একটা কি দুটো লাল-টুকটুকে বউ বেছে নিয়ে আসবার স্বাধীনতা তোমার রইল। বোধ হয় হাজার পাঁচেক বছর আগে থেকেই আছে। ইতি উৎপলা।

চিঠিখানা প্রশান্ত লাহিড়ীর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে অধ্যাপক সেন বললেন, মিসেস লাহিড়ী দেখছি তোমার জীবনে মস্তবড় একটা অভাব সৃষ্টি ক'রে গেলেন।

না অমিতাভ, অভাবের সবটুকুই উৎপলার। মস্ত বড় এবং সর্বনেশে অভাব।

কেন, ব্যাঙ্কে রয়েছে তাঁর তোমারই দেওয়া এক লক্ষ টাকা, আর—আর কেউ কি সঙ্গে নেই?—চশমার কাচ পরিষ্কার করতে লাগলেন অধ্যাপক অমিতাভ সেন।

প্রশান্ত লাহিড়ীর চোখের স্বাস্থ্য ভাল। দু-একটা আকস্মিক ঘটনায় তাঁর চোখের পাতা ভিজে ওঠে না। তিনি তাই বললেন, সঙ্গে যে নিশ্চয়ই কেউ আছে, নইলে আমাকে ও জানিয়ে যেত। পালিয়ে যেত না। টাকাগুলো অন্তত সে ফেলে রেখে যেত এলাহাবাদেই। কিন্তু আমি টাকার কথা ভাবছি না, ভাবছি পলার কথা।

কি কথা?

আমার মনে হয়, ওর প্রেমের দামোদরে যত জলই থাক্ না কেন, তা থেকে এক কিলোওয়াটও কল্যাণ আসবে না। আসতে পারে না। শেষের কথাটা অত্যাধিক জোর দিয়ে উচ্চারণ করলেন প্রশান্ত লাহিড়ী।

অধ্যাপক সেন জিজ্ঞাসা করলেন, কেন পারে না প্রশান্ত? তুমি যদি সারাজীবন নারায়ণশিলার ওপর নির্ভর করতে পার, মিসেস লাহিড়ী কেন পারবেন না বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করতে?

অনুষ্ঠানের সত্য বিজ্ঞানের চেয়েও বড় অমিতাভ। তা ছাড়া বিয়ে কেবল দুজনের মধ্যেই হয় না, তৃতীয় পক্ষও একজন থাকেন।

মিসেস লাহিড়ীর চিঠি প'ড়ে সে কথা মনে হয় না। মনে হয়, তিনি বিবাহের প্রয়োজনই স্বীকার করেন না। দুজনের মধ্যে যদি মন ও মাথার মিল থাকে, তবে অনুষ্ঠানের দরকার কি? হয়তো তোমার চেয়ে অপর পুরুষের সন্তান হবে বেশি বলিষ্ঠ। জারজ কথাটার অভিধানগত অর্থ আছে বটে, কিন্তু অর্থটার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই।

প্রশান্ত লাহিড়ী তর্কের খাতিরেও আর তর্ক করলেন না। ব'সে ব'সে কি যেন ভাবতে লাগলেন। তিনি সাধারণ মানুষ, তাঁর ভাবনার মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের জটিলতা থাকবার কথা নয়। তবুও আজ তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। বউ পালিয়ে গেলে অসাধারণ মানুষদেরও চিন্তা আসে, আসে অপমানবোধ এবং আরও অনেক রকমের উপসর্গ।

একটু পর প্রশান্ত লাহিড়ী বললেন, পালিয়ে গেলেও পলার অভাব ঘুচবে না অমিতাভ। কারণ, অবিবাহিত জীবনের অপরাধ-উপলব্ধি তার সবচেয়ে বড় অভাবের সৃষ্টি করবে।

সমাজতত্ত্বের সর্বজনীন আলেখ্য বদলে গেছে, তুমি বোধ হয় তা টের পাও নি প্রশান্ত?

তাতে কোন ভয়ের কারণ আছে ব'লে আমি মনে করি না। আসল ভয় হচ্ছে, মানুষের মন থেকে যদি অপরাধবোধ লোপ পায়, তবে সমাজ কিংবা সমাজতত্ত্বের মূল্য রইল কি? অপরাধবোধ ওর লোপ পায় নি ব'লেই আমার বিশ্বাস। কারণ, পলার কান্না আমি শুনতে পাচ্ছি।

সেন্টিমেন্টাল হওয়ার মত রস ও রসদ তোমার স্টকে প্রচুর পরিমাণে জ'মে আছে প্রশান্ত। আমার মনে হয়, তোমার বাবা জানতেন তাঁর সন্তানের ভাগ্যবিড়ম্বনার কথা। সেই জন্যেই তিনি তোমার হাতের কাছে রেখে গেছেন অগণিত হুইস্কির বোতল। ছিপি খোলার সময়টুকুই তোমার কেবল নষ্ট হবে।

আমরা তো কেউ মদ খাই না অমিতাভ।

না খেয়েই তবে মাতলামি করছ কেন? নইলে তুমি কান্না শুনছ কেমন ক'রে? মিসেস লাহিড়ী কাঁদতে যাবেন কোন্ দুঃখে?

তার নিজের দুঃখে।—জবাব দিলেন প্রশান্ত লাহিড়ী।

অধ্যাপক যাওয়ার জন্য উঠে পড়লেন। জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনা করবার সময় এ নয়। তিনি চ'লেই যাচ্ছিলেন। আবার কি মনে ক'রে দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পেয়েছি। বিশ্বের আয়তন আমার বাড়ল। যে কোন মুহূর্তে কলকাতায় চ'লে যাব। বউকে খোঁজবার জন্যে কখনও যদি কলকাতা যাওয়ার ইচ্ছা হয়, তবে চ'লে এস সোজা আমার আস্তানায়। বউ তোমায় অতি অবশ্য টানবে।

হাঁা, পলার কান্না আমায় টানছে। সাত দিন তো হয়ে গেল!

গুড-নাইট প্রশান্ত।

প্রশান্ত লাহিড়ী সেন্টিমেন্টাল নন। তিন ফোঁটা চোখের জল পর্যন্ত তাঁর পড়ল না। দিবা-রাত্র তিনি উৎপলার কান্না শুনতে পাচ্ছেন, অথচ খবরের কাগজে একটা সংক্ষিপ্ততম বিজ্ঞপ্তি পর্যন্ত দেওয়ার তাগিদ অনুভব করলেন না প্রশান্ত লাহিড়ী। উৎপলার শয়ন-কামরার দেওয়ালগুলোতে তিনি সময়-অসময়ে হাত বুলোতে লাগলেন। বুঝতে পারলেন, দেওয়ালগুলো সব ভিজে উঠেছে। তবুও তাঁর পাষাণ-হৃদয় বিচলিত হ'ল না। পথ-ক্ষ্যাপা হয়ে তিনি রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন না পলার পালিয়ে-যাওয়া পথটির অনুসন্ধান-উদ্দেশ্যে। পুরনো ভৃত্য সতীশ ছাড়া অন্য কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে তিনি বাক্যালাপ করলেন না পুরো একটি বছর। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের নির্ভর-যোগ্য নীতির গণ্ডি তিনি টানলেন তাঁর নিজের চারদিকে। অনাবশ্যক হা-হুতাশ তাঁর চরিত্রের বাঁধনকে শিথিল করতে পারল না তিলেক-মাত্র। প্রশান্ত লাহিড়ীর বিশ্বাস, পলা ফিরে আসবে। রোমান্টিক ব্যর্থতার রাস্তা দিয়ে সে আসবে না। সে আসবে তার অপরাধ-বোধের সাবেক রাস্তা ধ'রেই। পলাকে খোঁজবার দরকার নেই। পলা তাঁর কাছ থেকে হারায় নি। পলা হারিয়েছে ওর নিজের কাছ থেকেই। অতএব, তিনি কেন কাগজে বিজ্ঞপ্তি দেবেন? লক্ষ টাকার

ওপর আবার কেন তিনি খরচ করবেন সাড়ে বারো টাকা? প্রাইভেট টিক্‌টিকি লাগিয়ে কি দরকার তাঁর পলাকে খুঁজে আনবার?

তবুও তিনি কলকাতায় এলেন। রইলেন প্রায় এক বছর। আর রইলেন এই শর্ট স্ট্রীটের তিনতলার ফ্ল্যাটে। বড় ফ্ল্যাট। অধ্যাপক অমিতাভ সেনের সঙ্গে তিনি দেখা করেন নি। লেখাপড়া শেখবার সময় এ নয়। এটা তাঁর কান্না শোনবার সময়। পুরো দুটো বছরই তিনি কান্না শুনলেন—উৎপলার কান্না।

তিন

জার্মান পরিবারটি চ'লে যাওয়ার পর একতলার ফ্ল্যাটটা খালিই প'ড়ে ছিল। হয়তো দু-একদিনের মধ্যে নতুন দম্পতি এসে দখল করবেন ঘরগুলো। তাঁদেরও থাকবে না সন্তান কিংবা আত্মীয়স্বজনের ভিড়। দু-একটা অ্যালসেশিয়ান নিশ্চয়ই থাকবে।

কিন্তু প্রশান্ত লাহিড়ী আজ মাঝরাতে হঠাৎ বিছানা থেকে উঠে পড়লেন। দরজা খুলে চ'লে এলেন পিছন দিকের বারান্দায়। একতলার ফ্ল্যাট থেকে কান্নার শব্দ আসছে। তবে কি জার্মান মেয়েটি আবার ফিরে এসেছেন? অনুতাপ করছেন কি তাঁর পশ্চাতের ভুল সংশোধন করবার জন্য? কিন্তু গলার আওয়াজটা তো বিদেশিনীর ব'লে মনে হচ্ছে না। অনেকটা উৎপলার গলার মতই শোনাচ্ছে। প্রশান্ত লাহিড়ী ভাবলেন, পাপপুণ্যের মূল্যবোধ বিদেশিনীর মনে হয়তো সর্বজনীন আক্ষেপের সুর তুলেছে আজ। অপরাধ-উপলব্ধির মধ্যে জার্মান মেয়েটিও সম্ভবত ফিরে পেয়েছেন তাঁর সত্য পরিচয়—সে পরিচয়ের বিশ্লেষণের মধ্যে পশ্চিম-জার্মানির স্বামী তাঁর উহ্য হয়ে যান নি। এই উহ্য না হওয়াটাই তো নীতি। নীতি এসেছে অনুষ্ঠানের অংশ থেকে। অংশের পেছনে আছে বহুলাংশ। বহুলাংশের সমষ্টিগত সামগ্রীক সূচনা কোথা থেকে এল? এল 'ইতি' ও 'নেতি'র মহাব্যোমের ঊর্ধ্বলোক থেকে। একই সূচনা, একই সমাপ্তি। পলাই হোক আর জার্মান মেয়েটিই হোক, ব্যথা তাদের একই। কান্নার সুরে তাই অদ্ভুত সামঞ্জস্য রয়েছে। প্রশান্ত লাহিড়ী কান পেতে রইলেন। কান্নার সুর

চড়ছে। খুবই বিস্ময় বোধ করলেন তিনি। কাল্পনিক কান্না নয়, সত্যিকারের কান্না। একটু পরে তাঁর যেন মনে হ'ল, প্যাকেট-বাঁধা গদাধরবাবুর উপন্যাসগুলো থেকেও বুঝি কান্নার শব্দ আসছে। তিনি চ'লে এলেন ভিতরে। ছিঁড়ে ফেললেন প্যাকেটের কাগজ। শব্দ হ'ল, কান্নার শব্দ!

উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা সব বুঝি 'কিউ' দিয়ে দাঁড়িয়েছে আজ কাঁদবার জন্যই! শর্ট স্ট্রীটে কেউ কাঁদে না। আজ কেন নিয়মের ব্যতিক্রম?

ঘরের দরজায় মৃদু করাঘাত হ'ল। প্রশান্ত লাহিড়ী ছুটে এসে দরজা খুলে দিলেন। সামনে দাঁড়িয়ে অধ্যাপক অমিতাভ সেন। মাথার চুল সব পেকে উঠেছে। গালের চামড়ায় তাঁর অসংখ্য ভাঁজ। ডান হাত ও বাঁ হাতের সবগুলো আঙুলেই নিকোটিনের রঙ। দু ঠোঁটের মাঝখানে একটা সিগারেটের অংশ এখনও লাগানো রয়েছে। থুতুর সঙ্গে নিকোটিনের রঙ মিশে সিগারেটের গোড়ার দিকটা ভিজে উঠেছে প্রায় সিকি ইঞ্চি। অধ্যাপক অমিতাভ সেন হাঁপাচ্ছিলেন।

প্রশান্ত লাহিড়ী জিজ্ঞাসা করলেন, এ কি চেহারা তোমার অমিতাভ? ভেতরে এস।

অধ্যাপক সেন প্রশান্ত লাহিড়ীর হাতে ভর দিয়ে অতি কষ্টে প্রথম ঘরটা পার হতে হতে জিজ্ঞাসা করলেন, আর কটা ঘর পার হতে হবে বন্ধু?

এটা অতিথিদের থাকবার ঘর। তারপর আমার বসবার ঘর। তারপর আমার নিজের শোবার ঘর। উপস্থিত তোমাকে আমার ঘরেই নিয়ে যাচ্ছি।

প্রশান্ত লাহিড়ীর কথা শুনে দাঁড়িয়ে পড়লেন অধ্যাপক সেন। বললেন, এত বড় বড় ঘর দিয়ে কি কর? যত সব অপদার্থ ক্যাপিটালিস্টদের টাকার গরম!

প্রশান্ত লাহিড়ী বললেন, ঘরগুলো তো আমি তৈরি করি নি অমিতাভ।

তুমি কর নি, তোমার মতই একজন ক্যাপিটালিস্ট করেছে। আর

করেছে একজন বউ-পাগলা উন্মাদের জন্যেই। তোমার এখানে থাকবার কি দরকার ছিল?

দরকার ছিল তোমার মত একজন বন্ধুকে আশ্রয় দেবার। তোমার বোধ হয় হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে অমিতাভ।

কষ্ট হচ্ছে ব'লেই তো তোমার কোলে উঠতে চাই। আমরা ক্যাপিটালিস্টদের কোলে উঠেই তাদের ঘাড় মটকাব। চুক্ চুক্ ক'রে রক্ত শুষে খাব। ভয় পাচ্ছ নাকি প্রশান্ত?

ভয়? না, ভয় পাব কেন? কতই বা তোমার ওজন হবে!

বেশি নয়, জামা জুতো নিয়ে নব্বুই পাউণ্ড।

মাত্র নব্বুই?

হ্যাঁ, বন্ধু। উদ্বৃত্ত কিছু নেই। গত দু বছরে পঞ্চাশ পাউণ্ড ক'মে গেছে। আমাকে দেখে বোধ হয় তোমার মনে হচ্ছে, আমি বুঝি পৃথিবীর প্রাইমোরডিয়াল যুগ এখনও উত্তীর্ণ হতে পারি নি। নৃতত্ত্ববিদ্‌রা বলবেন, আমি এখনও জন্মাই নি বন্ধু। নাও, কোলে নাও। কোলে ওঠবার জন্য অধ্যাপক সেন একটু ঝুঁকে দাঁড়ালেন প্রশান্ত লাহিড়ীর বলিষ্ঠ বাহুর দিকে। তিনি দেখলেন, অধ্যাপক সেন টলছেন। তিনি তাই তাড়াতাড়ি তাঁকে আলগা ক'রে তুলে ফেললেন কোলে। কোলে উঠে অধ্যাপক সেন জিজ্ঞাসা করলেন, বড্ড বেশি হালকা মনে হচ্ছে, না?

হ্যাঁ।

আমি হালকা, তুমি ভারী। তুমি পুরনো, আমি আধুনিক। বন্ধু, সেই জন্যেই আমরা চাই শ্রেণীহীন সমাজ। সংগ্রাম আমাদের পদে পদে

দুগ্ধফেননিভ শয্যায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেন অধ্যাপক সেন।

প্রশান্ত লাহিড়ী জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার অসুখটা কি?

ধমকে উঠলেন অমিতাভ সেন, অসুখ? কার অসুখ? যত বড় অসুখই হোক, শ্রেণী-সংগ্রাম তো সোজা কথা নয়। চালিয়ে যেতে হবে নিজে যদিও এখন চলতে পারছি না। প্রশান্ত, সমাজ-বিপ্লব আসছে। তোমার একতলা পর্যন্ত বোধ হয় এসেই গেছে।—এই ব'লে তিনি চোখ বুজলেন। ঘুম আসছে অধ্যাপক অমিতাভ সেনের।

তবুও প্রশান্ত লাহিড়ী সাধারণ মানুষের মতই প্রশ্ন করলেন আবার, চ দিকে এত বড় বড় সব ডাক্তার রয়েছেন, চিকিৎসা করাও নি কেন ?

চিকিৎসা ? কান্নার আবার কোন চিকিৎসা আছে না কি ? সেই যে এলাহাবাদে তুমি আমায় কান্নার গল্পটি শুনিয়ে দিলে, তারপর থেকে গত দুটো বছর আমি ঘুমোতে পারি নি বন্ধু। আমি বিষ খেয়েছি প্রশান্ত।

বিষ ? মানে, কি বিষ ?—ভয় পেয়ে প্রশান্ত লাহিড়ী ঝুঁকে দাঁড়ালেন অধ্যাপক সেনের মুখের ওপর। অমিতাভ সেন জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে লাগলেন, বিষ খেয়েছি আমি, তরল বিষ। জলীয় বিষ। সে কি কান্না! আমার ঘুম আসছে প্রশান্ত। একটা ভদ্র এবং ভয়শূন্য পরিবেশে এই তো আমার প্রথম ঘুম আসছে। দুটো বছর আমি যেন শরশয্যায় শুয়ে ছিলুম।

অধ্যাপক সেনের মুখ থেকে পোড়া সিগারেট গড়িয়ে পড়ল বিছানার ওপর। তিনি চোখ বুজলেন। ঘুমিয়ে পড়লেন দু-এক মিনিট পরেই। পোড়া সিগারেটের অংশটাকে ফেলে দিলেন প্রশান্ত লাহিড়ী ছাইদানির মধ্যে। তারপর তিনি অধ্যাপক সেনের পা থেকে স্ট্র্যাপ-ছেঁড়া কাবুলী চটিটা খুলে নিয়ে ফেলে রাখলেন মেঝের ওপর। ছোট টি-পয়টা নিয়ে এলেন বিছানার কাছে। জলের গেলাসটা সাজিয়ে রাখলেন তারই ওপর। গেলাসের পাশে রেখে দিলেন 'পাঁচ পাঁচ পাঁচ' মার্কা একটা আনকোরা নতুন টিন। অধ্যাপক সেন কেবল অসুস্থ নন, অস্বাভাবিকও বটে—ভাবলেন প্রশান্ত লাহিড়ী। তিনি আরও ভাবলেন, অসুস্থ এবং অস্বাভাবিক ব'লেই অমিতাভ সেনের বন্ধুত্ব তিনি অস্বীকার করতে পারলেন না। পারলেন না তাঁকে ফেলে দিয়ে আসতে শর্ট স্ট্রীটের বাইরে যে-কোন দাতব্য চিকিৎসালয়ে। প্রশান্ত লাহিড়ী সাধারণ মানুষ, উচ্চশিক্ষিত নন। তাই অমিতাভ সেনের ব্যথা নিজের ব্যথা ব'লেই অনুভব করলেন তিনি। বুঝলেন, ব্যথার রাজ্যে কোন শ্রেণী-বিভাগ নেই।

একতলার ফ্ল্যাট থেকে কান্নার শব্দটা উঠে আসছিল ওপর দিকে,

একেবারে প্রশান্ত লাহিড়ীর ঘর পর্যন্ত। জানলা-দরজাগুলো বন্ধ ক'রে দিলেন তিনি। অধ্যাপক সেন ঘুমোচ্ছেন। শর্ট স্ট্রীটের কান্না যেন তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটায়। নিবিয়ে দিলেন বাতিটাও। অক্ষিপটে যদি আলোর আঘাত সহ্য না হয়? নেত্রগোলক জুড়ে তাঁর ছড়িয়ে রয়েছে বছর দুইয়ের অন্ধকার। হঠাৎ আলো হয়তো তাঁকে আরও বেশি ক'রে অসুস্থ ক'রে তুলবে। পীড়া তাঁর বেড়েই যাবে। প্রশান্ত লাহিড়ী পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলেন ঘরের বাইরে। একতলার কান্না তাঁকে টানছে।

সিঁড়িতে বাতি নেই ব'লে একতলার ফ্ল্যাটের দরজাটা তিনি দেখতে পেলেন না। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললেন প্রশান্ত লাহিড়ী। মনে হ'ল, ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করা নেই। আস্তে একটু ঠেলা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। কান্নার শব্দটা স্পষ্টতর হ'ল। উৎপলার কণ্ঠস্বর ব'লেই তাঁর মনে বিশ্বাস জন্মেছে। তিনি ভাবলেন, পলার কণ্ঠে তার অপরাধ-স্বীকৃতির ঘোষণাটাই ধ্বনিত হচ্ছে নির্ভুলভাবে। জার্মান মেয়েটির ব্যথাও পলার ব্যথা। হয়তো বা এ শতাব্দীর শরশয্যায় বিশ্বনারীর দেহ আজ ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠেছে।

প্রশান্ত লাহিড়ী দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লেন ঘরে। ঘর-ভর্তি আসবাব। আজই এসেছে ব'লে মনে হ'ল তাঁর। সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবার সময় হয় নি ভাড়াটেদের। কিংবা আসবাবের প্রয়োজন হয়তো এঁদের আর কারও নেই।

ডান দিকের একটা ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ আসছিল। তিনি দাঁড়ালেন এসে সেই ঘরটার বাইরে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি শুনতে লাগলেন কান্নার ভাষা। প্রশান্ত লাহিড়ী সাধারণ মানুষ। ভাষা যদি জটিল না হয়, তবে তিনি তার অর্থ অবশ্যই বুঝতে পারবেন। বুঝতে তিনি পারলেনও। উৎপলা ক্ষমা চাচ্ছে। ওরই কান্নার মধ্যে দিয়ে ক্ষমা চাচ্ছে অস্বামিক বিংশ শতাব্দী।

ঘরের বাইরে দাঁড়িয়েই প্রশান্ত লাহিড়ী অনুরোধ করলেন, আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি পলা। চ'লে এস।

কোথায় যাব ?—জানতে চাইল পলা।

শর্ট স্ট্রীটের বাইরে।— জবাব দিলেন প্রশান্ত লাহিড়ী।

একটু পরে গ্যারেজ থেকে নতুন গাড়িটা বার ক'রে নিয়ে এলেন প্রশান্ত লাহিড়ী। উৎপলা বসল তাঁরই পাশে। পেছন দিকে ফিরে চাইবার প্রয়োজন বোধ করলেন না তিনি। প্রয়োজন বোধ করলেন না তিনতলার অস্থাবর সম্পত্তিগুলো সঙ্গে নিয়ে আসবার। বিলিতী স্প্রিংয়ের খাটখানা তাঁর অনেক টাকায় কেনা। ডবল খাট। সেখানাও প'ড়ে রইল। প'ড়ে রইলেন খাটের ওপর তাঁরই বাল্যবন্ধু। প'ড়ে রইলেন উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপক অমিতাভ সেন।

দীপক চৌধুরী

শেয়ানে শেয়ানে

[কবি শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পুত্রের বিবাহের যৌতুক খাট বিছানা যখন বৈবাহিক "বেতালভট্ট" প্রায় হজম করিয়া আনিয়াছেন তখন কবি যতীন্দ্রনাথের তৎপর তাগিদে মাল-গুলি তাঁহাকে উদ্গিরণ করিতে হয়। সুতরাং, সম্ভবত প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া তিনি খাট-গদির অতিরিক্ত আর কিছু পাঠাইয়াছিলেন। যতীন্দ্রনাথের অভিযোগের উত্তরে "বেতালভট্ট"র অ্যাপলজি পত্রখানি এখানে প্রকাশিত হইল। এ বিষয়ে কোন বাদানুবাদ আর প্রকাশিত হইবে না। কবি যতীন্দ্রনাথের অবশ্য "রাইট অব রিপ্লাই" রহিল।—স, শ. চি.]

আরশুলা আমি পাঠাই নি ভাই, নিজেই গিয়েছে তারা,
লুকিয়ে খাটের মোড়কে ঢুকিয়া ফাঁকি দিয়ে রেলভাড়া,
চুষে শুষে হেথা রচনার রস গভীরতরের তরে
দল বেঁধে তারা গিয়েছে পলায়ে জবর কবির ঘরে।
আমি যাহাদের পাঠায়েছি তারা জড়সড় হয়ে শীতে
গদির গর্তে সেলায়ের ফাঁকে রয়েছে অলক্ষিতে।
জরায় দৃষ্টি ক্ষীণ যে তোমার তার মাঝে তা না ঢোকে,
আরশুলাগুলা বড় বড় তাই পড়েছে তোমার চোখে।
শীতটা ফুরুক, ফাগুন ফিরুক, তখন পাইবে টের,
শাস্তি তোমার জাস্তি কেমন অবিরত তাগিদের!

"বেতালভট্ট"

মহাস্থবির জাতক

ষোল

তারপরে সেই প্রকাণ্ড খাতায় আমাদের নাম ধাম ইত্যাদি লিখে নি . বললে, দেখুন, এটা গাইকোয়াড়ী জায়গা—এখানে অন্য জায়গা থেকে লোক আসবার নিয়ম নেই। আপনারা কি করতে এখানে এসেছেন ?

উপেনদা খুব বিনীতভাবে বললে, দেখুন, আপনাদের জ্ঞাতার্থে নিবেদন করছি যে, আমরা ব্রিটিশ গবর্মেন্টের প্রজা—ভারতবর্ষের সমস্ত দেশে যাবার অধিকার আমাদের আছে। যদি আমরা কোনও অপরাধ করি তো ধ'রে সাজা দেবার অধিকার আপনাদের আছে।

উপেনদার কথা শুনে লোকগুলো চ'টে একেবারে কাঁই হয়ে গেল। একজন বেশ উত্তেজিত হয়ে বললে, আপনারা এখানে কি করতে এসেছেন তা না বললে এ রাজ্য থেকে চ'লে যেতে হবে।

উপেনদা এবার বললে, আপনাদের রাজ্যের দেওয়ান সার্ রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ করতে চাই।

ঘরের মধ্যে আরও অনেকগুলি লোক ব'সে ছিল—কথাটা শুনে তাদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সাড়া প'ড়ে গেল। তারপরে নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ গুজগাজ ফুসফাস ক'রে কোথায় যেন টেলিফোন করলে . তার খানিকক্ষণ পরে আমাদের বললে, দেখুন, আমাদের দেওয়ান সাহেব তো এখন এখানে নেই। বিশেষ কাজে তিনি ইংলণ্ড গিয়েছেন—ফিরতে দু-তিন মাস দেরি হতে পারে।

বলা বাহুল্য, এবারকার সুর অনেক নরম।

—তা হ'লে এখানে থাকবার আর আমাদের কোনও প্রয়োজন নেই। শহরটা একটু দেখে কাল এই ট্রেনেই আমরা আপনাদের এই স্বর্গরাজ্য ছেড়ে চ'লে যাব।

আমরা এত সহজেই চ'লে যাচ্ছি দেখে লোকগুলো খুশি হয়ে উঠল জিজ্ঞাসা করলুম, তোমাদের এখানে ধর্মশালা আছে? আজ রাত্রির মতন একটু আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে ?

দেওয়ানের সঙ্গে যারা দেখা করতে চায় তারা ধর্মশালায় আশ্রয়

খুঁজছে দেখে তারা বেশ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, হোটেলের কথা ... ছেন? ভাল ভাল হোটেল আছে এখানে—টাঙ্গাওয়ালাকে বললেই ...য়ে যাবে।

বেরিয়ে আসবার সময় লোকগুলো বললে, কাল যখন চ'লে যাবেন ...ন আমাদের এই আপিসে দয়া ক'রে একটু খবর দিয়ে যাবেন।

স্টেশনের সামনেই বিরাট ধর্মশালা। সেখানে জিনিসপত্র রেখে ...নি শহর দেখতে বেরুনো গেল। পরের দিন যথাসময়ে সুরাট যাত্রা ...লুম। বরোদা ত্যাগ করবার সময়ে ইচ্ছা ক'রেই পুলিসে কোনও ...র দিলুম না। যা হোক, রাত্রি দশটা এগারোটার সময় সুরাটে পৌঁছলুম। স্টেশনের কাছেই একটা হোটেলে তখনকার মত গিয়ে ...া গেল। এই সব জায়গায় খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নেই, অনেকটা ...ার হোটেলের মত। মাথা-পিছু বা ঘর-পিছু দৈনিক ভাড়া দেওয়া ... আমরা যে ঘরখানায় উঠলুম সেটা বেশ সাজানো ছিল। একটা ছোট ...ের টেবিল-হারমোনিয়াম রয়েছে দেখে বাজাতে গিয়ে দেখলুম, তার ...পরে বিরাট ছিদ্র—একটু পিঁ-পিঁ ক'রে সুর বেরোয় বটে, কিন্তু ...পরের সেই ছেঁদা দিয়ে 'বাব্বা' 'বাব্বা' শব্দ বেরুতে লাগল তার ...গুণ জোরে। হোটেলের একটি ছোকরা দালাল আমাদের স্টেশন ...কে নিয়ে এসেছিল, কিছুক্ষণ পরে আসল মালিক এলেন আলাপ ...বার জন্যে। আমরা বাঙালী শুনে ভারি খুশি হয়ে বললেন, এখানে ...রও একজন বাঙালী আছেন—তিনি আমার বন্ধু। ভদ্রলোক রোজই ...কালে আমার এখানে আসেন।

উপেনদা বললেন, কাল যখন তিনি আসবেন তখন আমাদের ডেকে ...বেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে আলাপ করব।

হোটেলওয়ালা বললে, নিশ্চয় ডাকব।

সে রাত্রে হোটেলেরই চাকরকে দিয়ে খাবার আনানো হ'ল—অতি ...্য খাদ্য। কি আর করা যাবে! তাই খেয়ে তখনকার মত শুয়ে ...া গেল।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। চা পানের

ব্যবস্থা করা হচ্ছে, এমন সময় হোটেলের একটি ছোকরা চাকর এসে বললে, শেঠ ডাকছে।

আমি যাচ্ছি।—ব'লে সুকান্ত সেই ছেলেটির সঙ্গে বেরিয়ে গেল। মিনিট কয়েক পরেই দেখি, সুকান্ত একজনকে জড়িয়ে ধ'রে আমাদের ঘরের দিকে আসছে। লোকটি আমাদের চেয়ে বোধ হয় তিন-চার বছরের বড় অর্থাৎ কুড়ি-একুশের বেশি বয়স হবে না। তার মাথায় একটা ছোট পাগড়ির মত বাঁধা, বাঙালীর মত কোঁচা ঝুলছে। তাকে ঘরের মধ্যে এনে সুকান্ত বললে, আমার চেনা লোক।

পরিচয় হ'ল। সুকান্তদের দেশেই তাদের বাড়ি। নাম নিশিকান্ত গুহ। কথায় বার্তায়, চাল ও চলনে খুবই খলিফা ব'লে মনে হতে লাগল। আমাদের দেখাবার ও শোনাবার জন্যে নানারকম চটকদার কথাবার্তা বলতে লাগল। একবার হারমোনিয়ামে ব'সে সেই ছেঁদা হাপর ঠেলেই গান শুরু ক'রে দিলে—দিদি লাল পাখিটি আমায় ধ'রে দেনা লো। ওরই মধ্যে কথায় বার্তায় বের হয়ে গেল, মস্ত জমিদার-ঘরের ছেলে সে। বাপ খুড়ো মামা পিসে মেসো কেউ জজ কেউ বা ম্যাজিস্টর। বাংলা দেশের প্রায় সব বড়লোকদেরই সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আছে—নিদেন চেনাশোনা তো আছেই।

সত্যিই, তার হালচাল দেখে মনের মধ্যে একটা ছাপ পড়ল। নিশিকান্ত বললে, বছরখানেক আগে প্রায় হাজার টাকা নিয়ে সে বাড়ি থেকে চম্পট দিয়েছিল, তারপর অনেক ঘাটের জল খেয়ে শেষকালে এই সুরাটে এসে আড্ডা গেড়েছে এবং এইখানেই সে ব্যবসা করবে। কিসের ব্যবসা করবে এই নিয়ে বাড়ির সঙ্গে লেখালিখি চলেছে—মস্ত ফলাও ব্যবসা, সব একরকম ঠিকঠাকও হয়ে গিয়েছে।

নিশিকান্ত বলতে লাগল, তোমরা এসেছ ভালই হয়েছে—আমরা এতগুলো বাঙালী ছেলে একসঙ্গে জুটলে কি না করতে পারি! আমি যে ব্যবসা করব তাতে অনেক বিশ্বাসী লোকের দরকার, ভগবান তোমাদের জুটিয়ে দিয়েছেন।

ইতিমধ্যে হোটেলওয়ালা এসে জানালে, কাল রাত্রে আমাদের

নাম-ঠিকানার জন্যে পুলিসের লোক এসেছিল, কিন্তু অনেক রাত্রি হয়ে যাওয়ায় তোমাদের আর খবর দিই নি। নিশিকান্ত তাকে বললে যে, আমি বাড়ি যাবার মুখে পুলিস-আপিসে গিয়ে এদের কথা ব'লে যাব।

দেখলুম, নিশিকান্ত কাজ চালানো গোছের গুজরাটী ভাষা আয়ত্ত ক'রে ফেলেছে। সে বললে, এখানে আর হোটেলওয়ালাকে পয়সা দিয়ে কি হবে, চল আমার ওখানে। আমার যা ঘর তাতে আরও পাঁচ-সাত জন লোক ধরতে পারে।

তখুনি হোটেলওয়ালাকে তার পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে দিয়ে আমাদের পোঁটলা নিয়ে নিশিকান্তের সঙ্গে বেরিয়ে পড়া গেল। পথে পুলিসের ফাঁড়িতে ঢুকে সে বললে, এরা আমার লোক, এখন এখানেই থাকবে।

নিশিকান্তকে দেখে পুলিসের লোক আমাদের নাম ধাম পর্যন্ত জানতে চাইলে না।

নিশিকান্তের ডেরায় পৌঁছনো গেল। দিল্লি-দরজার কাছেই এক মাঠকোঠার দোতলায় বড় একখানা ঘর। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এই ঘরখানা ছাড়া সেদিকে আর অন্য ঘর নেই। ঘরের মধ্যে আসবাব জিনিসপত্র কিছু নেই বললেই হয়। দড়িতে একখানা ধুতি ঝুলছে, একখানা বড় চেটাই-গোছের জিনিস মাটির মেঝেতে পাতা, তার ওপরে এখানে ওখানে অগোছালভাবে কয়েকটা জিনিস প'ড়ে আছে। এক কোণে একটা ঝাটার মতন জিনিস প'ড়ে আছে বটে, কিন্তু ঘরের অবস্থা দেখে মনে হয় না যে কোনও জন্মে ঝাড়ু লাগানো হয়। ঘরের মধ্যিখানে একটা ছাই-ভর্তি উনুন, তার চার পাশে ভাত ছড়ানো। ঘরের অবস্থা দেখলেই বুঝতে পারা যায়, যে সেখানে থাকে সে অত্যন্ত অপরিষ্কার ও অগোছাল লোক।

একটু ব'সেই আমরা ঝাঁটা নিয়ে মেঝে সাফ ক'রে কাপড়চোপড় ও অন্যান্য জিনিসগুলিকে গুছিয়ে ঘরখানিকে তকতকে ঝকঝকে ক'রে ফেললুম। ঘরেই কাঠকয়লা ছিল, তাই দিয়ে উনুন ধরিয়ে খিচুড়ি চাপিয়ে দেওয়া হ'ল। নিশিকান্তের ঘরেই চাল-ডাল পেঁয়াজ ছিল— বাজার থেকে কিছু মসলার গুঁড়ো ও ঘি আনানো হ'ল।

খিচুড়ি খেয়ে দুপুরবেলা পরামর্শ-সভা বসল। নিশিকান্ত বললে, সে সাবান তৈরি করতে জানে। ঘরের কোণ থেকে একটা ঝুড়ি টেনে এনে সে কতকগুলো সাবান দেখিয়ে বললে যে, সেগুলো সে নিজে তৈরি করেছে। দেখলাম, তার মধ্যে দু-তিন রকমের গায়ে মাখবার ও দু-তিন রকমের কাপড় কাচবার সাবান রয়েছে।

নিশিকান্ত বলতে লাগল যে, এখানকার জনকয়েক মহাজন তার পেছনে লেগেছে ; কিন্তু সে বাড়ির টাকার জন্য অপেক্ষা করছে। কারণ মহাজনের হাতে পড়লে ক্রমে তার হাতে কারবার চ'লে যাবার সম্ভাবনা আছে। সে ভরসা করছে, বাড়ি থেকে শীগগিরই কিছু অর্থ এসে পড়বে।

জনার্দন বললে, আমি চেষ্টা করলে বাড়ি থেকে কিছু টাকা যোগাড় করতে পারি। আমি ও সুকান্ত বললুম, আমরা গায়ে খাটব, টাকা-কড়ি কিছু দিতে পারব না। উপেনদা বললে, আমার কাছে ভাই মাত্র একশোটি টাকা আছে।

নিশিকান্ত খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠল। সে বললে, আমরা পাঁচজনে আছি, এই পাঁচজনের লোকবল কিছু কম নয়। আপাতত শতখানেক টাকার সাবান তৈরি ক'রে বিক্রি তো করি—তারপরে কিছু এসে গেলে আবার ভিয়েন চড়ানো যাবে।

মনে পড়ে, উৎসাহের চোটে সেদিন সে কোথা থেকে নোনা ইলিশের ডিম কিনে নিয়ে এল। তিলের তেল দিয়ে ভাজা সেই মাছের ডিম দিয়ে খিচুড়ি খেতে যা লাগল তা আর কি বলব!

চার-পাঁচ দিন এমনিভাবে কেটে গেল, কিন্তু নিশিকান্ত সাবান তৈরির কিছুই করে না। বরঞ্চ দেখতে লাগলুম, আমার ও সুকান্তর প্রতি তার ব্যবহারের পরিবর্তন হতে লাগল। ক্রমে তারা তিনজন যেন আলাদা হয়ে পড়তে লাগল।

বিকেলবেলা তারা তিনজনে কোথায় বেরিয়ে যায়—আমি ও সুকান্ত সঙ্গে যেতে চাইলেই বলে, কাজের জায়গায় অত ভিড় করবার দরকার নেই। আমরা দুজনে শহরের অন্যান্য রাস্তায় ঘুরে বেড়াই।

কয়েকদিন বাদে নিশিকান্ত হঠাৎ স্পষ্টই ব'লে দিলে, এক জায়গা

পাঁচজনে ব'সে গুঁতোগুঁতি করলে কারুরই কিছু হবে না, তোমরা অন্যত্র চেষ্টা কর।

সেই অপরিচিত জায়গায় অকস্মাৎ এই রকম বিপদে প'ড়ে সুকান্ত অত্যন্ত ভগ্নহৃদয় হয়ে পড়ল। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি—নিশিকান্তর এই ব্যবহার আমাকে খুব কাবু করতে পারে নি। উপেনদার সঙ্গে আমাদের নতুন আলাপ। তাকে আমরা একরকম পথে কুড়িয়ে পেয়েছিলুম বললেই হয়। অতি দুর্দিনে সে আমাদের সাহায্যও করেছিল এবং ভবিষ্যতের অনেক ভরসাও দিয়েছিল। আজ যদি সে আমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাকে কিছু বলবার নেই। নিশিকান্তর সঙ্গেও তাই। কিন্তু জনার্দন!—যার সঙ্গে একসঙ্গে বাড়ি ছেড়ে বেরুলুম, এত দুঃখ কষ্ট একসঙ্গে সহ্য করলুম, সে আজ আমাদের ছেড়ে ওদের দলে গিয়ে মিশল কি ক'রে! এই চিন্তাটাই আমার মনের মধ্যে অত্যন্ত পীড়া দিতে লাগল যে, মানুষ কেমন ক'রে এত সহজে বিচ্ছিন্ন হতে পারে!

আমাদের বিভিন্ন অস্তিত্ব বন্ধুত্বের আশ্রয়ে অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছিল। এই ব্যবহার আমাদের সেই যুক্ত-অস্তিত্বের শিকড়ে টান দিলে, মূলোৎপাটনের সেই বেদনাই আমাকে পীড়া দিতে লাগল। বন্ধু ব'লে যাকে টেনেছিলুম, আজ সুবিধাবাদী ব'লে তাকে ছেড়ে দিতে কষ্ট হচ্ছিল।

জনার্দনের সঙ্গে খোলাখুলি একটা কথাবার্তাও কইতে পারছিলুম না। তাকে উপেনদা ও নিশিকান্ত দিনরাত এমনভাবে আগলে থাকতে লাগল যে, তাকে নিরিবিলি একটু পাওয়া পর্যন্ত অসম্ভব হয়ে উঠল। আমরা বুঝতে পারলুম যে, জনার্দনের বাড়ি থেকে টাকা পাবার আশায় নিশিকান্ত তাকে এত খোশামোদ করছে। আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করবার সুযোগ হ'লে পাছে আমরা তাকে বিগড়ে দিই—এই ভয়ে তারা তাকে এমন ক'রে আগলে রাখছে। যাই হোক, তাদের স্বার্থের জন্যে তারা হয়তো এমন করেছিল। কিন্তু জনার্দনের নিজেরও তো একটা মতামত আছে? সে কি ব'লে ওদের দলে গিয়ে ভিড়ল! এই অভিমানটাও সেদিন আমার লেগেছিল বড় ক'রে। কারণ, বিপদের মধ্যে বাস ক'রে

ক'রে আমার মনের মধ্যে একটা সংস্কার হয়ে গিয়েছিল যে, বিপদ একদিন নিশ্চয়ই কেটে যাবে, নয়তো অভ্যেস হয়ে যাবে।

সেইজন্যে জনার্দন নিশিকান্তর সঙ্গে যোগ দেওয়ায় যে বিপদের সম্ভাবনা আসন্ন হয়ে উঠেছে সে ভাবনা তেমন কাতর আমাকে করতে পারে নি, যতখানি করেছিল সুকান্তকে।

এই রকম চলেছে, সেই সময় একদিন বিকেলবেলা উপেনদা, নিশিকান্ত ও জনার্দন কোথায় বেরিয়েছে—আমরাও দুজনে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছি, এমন সময় সুকান্ত বললে, কদিন উপরি-উপরি দু বেলা আধসেদ্ধ খিচুড়ি খেয়ে আমার ভয়ানক আমাশা হয়েছে, ঘুরতে পারছি না—চল, বাড়ি ফিরে চল।

ঘরে ফিরে এসে দেখি, ওরা তিনজনেই ফিরেছে। আমরা যেতেই নিশিকান্ত বললে, এই যে, আড্ডা দিয়ে ফেরা হ'ল! লজ্জা করে না এমন ভাবে ব'সে ব'সে খেতে?

সুকান্ত তো কথা না ব'লে শুয়ে পড়ল। আমি বললুম, কি করব বল, কাজকর্ম যতদিন না জোটে—

নিশিকান্ত বললে, কাজকর্ম জোটাবার কি চেষ্টা হচ্ছে শুনি? এখানে তোমাদের কিছু হবে না। আগেই বলেছি, সবাই মিলে এক জায়গায় মাথা ঠোকাঠুকি-ক'রে মরলে কিছুই হবে না। আমরা এখানে রইলুম। তোমরা দুজনে অন্য কোন শহরে চ'লে যাও—দেখ, সেখানে কিছু করতে পার কি না!

জিজ্ঞাসা করলুম, কোন্ শহরে যাব?

—এখান থেকে কিছু দূরে নোভাসারি অর্থাৎ নয়া সরাই ব'লে একটা শহর আছে—সেখানে চ'লে যাও। চেষ্টা-চরিত্র ক'রে দেখ। একজনের জুটে গেলে আর একজনেরও জুটতে দেরি হবে না।

নিশিকান্তর কাছে টাইম-টেব্‌ল্ ছিল। সে তাই দেখে তখুনি ব'লে দিলে, ভোর পাঁচটায় একটা গাড়ি আছে, চ'লে যাও—ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই সেখানে পৌছে যাবে।

বললুম, আচ্ছা, তাই যাব।

আমাদের সঙ্গে কথা ব'লে নিশিকান্তরা আবার বেরিয়ে গেল। ওরা বাইরে যাবার পর সুকান্তর অসুখ বাড়তে লাগল। সন্ধ্যের মধ্যেই বোধ হয় আট-দশবার তাকে উঠতে হ'ল। পেটের যন্ত্রণায় সে একেবারে ছটফট করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। ঘরে রাঁধবার জন্যে যে তিলের তেল ছিল, তাই একটু নিয়ে জল দিয়ে তার পেটে কিছুক্ষণ মালিশ করতে করতে সে নিঃঝুম হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে আমিও তার পাশে শুয়ে পড়লুম। শুয়ে শুয়ে কেবলই মনে পড়তে লাগল, সেই ঝড়ের রাতের কথা—যেদিন জনার্দন বিছুর দংশনে কাতর হয়ে চিৎকার করছিল আর একান্ত অসহায়ের মতন আমরা দুজনে তার শিয়রে ব'সে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছিলুম। ভাবতে ভাবতে আবার নিরাশার অন্ধকারে আশার জ্যোতি ঝিলিক দিতে লাগল। মনে হতে লাগল, সেদিনও যখন কেটেছে, এদিনও তখন কেটে যাবে।

সন্ধ্যা উতরে রাত্রি অনেকখানি গড়িয়ে গেল, তখনও নিশিকান্তরা ফিরল না। তার ঘরে ছোট্ট একটা ঘড়ি ছিল, সেটাতে দেখলুম নটা বাজে। দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়ব কি না ভাবছি, এমন সময় কাঠের সিঁড়িতে খট খট শব্দ শুনে মনে হ'ল তারা আসছে। আর বাক্যব্যয় না ক'রে শুয়ে পড়া গেল। ওরা ঘরের মধ্যে ঢুকে জামা খুলে বসল। নিশ্চয় বাইরে কোন জায়গা থেকে খেয়ে এসেছিল, কারণ রান্নাবান্নার কোনও আয়োজন করলে না বা আমি জেগে আছি দেখেও একবার জিজ্ঞাসা করলে না, খাওয়া হয়েছে কি না!

রাত্রি প্রায় এগারোটার সময় ওরা আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। চারটের সময় উঠতে হবে ব'লে ঘড়িটা কাছেই রেখে দিলুম। সমস্ত রাত্রি এক রকম জেগেই কাটল। চারটের সময় উঠে মুখ-টুখ ধুয়ে সুকান্তকে নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল।

বিদায়ের সময় উপেনদা একটা টাকা দিয়ে বললেন, টাকাটা রাখ্‌ সে. সময়ে অসময়ে দরকার হতে পারে।

ভাবলুম, টাকাটা নেব না। কিন্তু **Discretion is the best part of valour**—মনে ক'রে টাকাটা নেওয়াই গেল।

স্টেশনে যখন গাড়ি থামল, তখন বেলা প্রায় আটটা। ছোট পরিষ্কার স্টেশনটি—লোকজন নেই বললেই হয়। আমাদের সঙ্গেও কেউ নামল না। সুরাট থেকে আনা সাতেক ভাড়া—দুজনের চোদ্দ আনার টিকিট কেনা হয়েছিল, আর মাত্র দু আনা ট্যাঁকে আছে। এই সম্বল ক'রে নোভাসারিতে পদার্পণ করলুম ভাগ্য অন্বেষণ করতে।

স্টেশন থেকে বেরিয়েই একটা সরু পথ চ'লে গিয়েছে শহরের দিকে। আশ্চর্য নির্জন শহর, পথে লোকজন গাড়ি-ঘোড়া কিছুই নেই। মনে হতে লাগল, গল্পের দৈত্যের সেই ঘুম-পাড়ানো শহরে ঢুকে পড়লুম নাকি! রাস্তার দু পাশে ছোট ছোট সুদৃশ্য বাড়ি—ইংলণ্ডের গ্রামের যে সব ছবি দেখতে পাওয়া যায় অনেকটা সেই রকম।

আমরা ঠিক করেছিলুম, বাড়ি বাড়ি ঢুকে কাজের চেষ্টা করব—দেখি কি হয়! সুকান্তকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে আমি বাড়ির মধ্যে ঢুকতে লাগলুম।

কিন্তু কোথায় সেই দুর্লভ চাকরি! কোন বাড়িতে ঢোকামাত্র দূর-দূর ক'রে তাড়িয়ে দিতে লাগল। কোথাও বা আমার দুঃখের কাহিনী শুনে বললে, এখানে কিছু হবে না। নোভাসারি জায়গাটা দেখলুম পার্শীপ্রধান জায়গা। পার্শীদের বাড়িতে ঢুকলে তো দেখ তাড়া করতে লাগল। বেলা বারোটা নাগাদ প্রায় পঞ্চাশখানা বাড়িতে চেষ্টা ক'রে নিরাশ হয়ে আবার স্টেশনের দিকে ফেরা গেল।

শহরের কোথাও ব'সে একটু বিশ্রাম করবার মতন জায়গা নেই। কলকাতার বাড়ির মত সেখানে কোনও বাড়িতে একটু রক নেই যে, একটু বসব। এদিকে সুকান্তও অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগল। ওরই মধ্যে ঝোপে-ঝাড়ে সে কাজ সারতে লাগল। রাস্তায় লোকজন কম ব'লে সেদিকে একটু সুবিধাই ছিল। ঘুরতে ঘুরতে আমরা স্টেশনের কাছেই একটা ঘাসওয়ালা জমিতে ব'সে পড়লুম।

কাল রাত্রি থেকে আহার নেই, তার ওপর এতখানি ঘোরা হয়েছে—শরীর যেন ভেঙে পড়তে লাগল। সুকান্ত তো ব'সেই শুয়ে পড়েছিল। আমিও খানিকক্ষণ ব'সে ব'সে গা এলিয়ে দিলুম।

বেলা প্রায় আড়াইটে-তিনটের সময় ঘুম ভাঙল। অবসাদে শরীর অত্যন্ত ভারী ব'লে বোধ হতে লাগল। দেখলুম, সুকান্ত আমার আগেই উঠে বসেছে। আমিও আর না গড়িয়ে উঠে বসলুম। খিদেয় পেটের মধ্যে পাক দিচ্ছিল। বলাবলি করতে লাগলুম, আজ আর নারায়ণ অন্ন জোটাবেন না। যাক, যা হয় ভালর জন্যেই হয়—হয়তো আমাশার ওপর খেয়ে তোর অসুখ আরও বেড়ে যেত।

এই রকম আলোচনা করছি ও মাঝে মাঝে বলছি—নারায়ণ, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক! বলতে বলতে নারায়ণ এসে একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে ভক্তকে অভিবাদন করলেন—নমস্কার!

পাঠক! চমকিত হবেন না। মানুষের রূপ ধ'রে বুভুক্ষু ভক্তের সামনে এমন ভাবে এর আগে নারায়ণ অনেকবার এসে দাঁড়িয়েছেন—পরমান্ন ব'য়ে এনেছেন গোপবালকের বেশে, দধিভাণ্ডকে অফুরন্ত করেছেন অপমানিতের অশ্রুমোচন করতে, আর শরণাগতের মহিমা প্রচার করেছেন এক কুচি শাকান্ন দিয়ে সহস্র উগ্রচণ্ড ব্রহ্মর্ষির অমিতোদর পরিপূরণে। তুঁহু জগতারণ জগতে কহায়সি—ত্রাণকর্তার জগতে বুভুক্ষু যখন আছে তখন আসতেই হবে তাঁকে তার কাছে।

—নমস্কার! কে বাবা তুমি?

মুখ তুলে দেখলুম, একটি লোক, রোগা লম্বা একহারা চেহারা, মাথায় গোল টুপি, বয়স ত্রিশের মধ্যেই হবে—সস্মিত মুখে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। আমরা প্রতিনমস্কার করতেই সে রাস্তা ছেড়ে একেবারে আমাদের কাছে এসে ব'সে হিন্দী ভাষায় বললে, আপনাদের বাড়ি বোধ হয় কলকাতায়!

বললুম, ঠিক অনুমান করেছেন।

লোকটি বললে, আমি কলকাতায় থাকি কিনা, বাঙালী দেখলে চিনতে পারি।

—কি উপলক্ষ্যে কলকাতায় থাকা হয়?

সেখানে আমার এক আত্মীয়ের ব্যবসা আছে, সেখানে চাকরি করি।

জিজ্ঞাসা করলুম, এইখানে দেশ বুঝি?

—হ্যাঁ, দু বছর পরে কিছুদিনের জন্যে দেশে এসেছি, আবার শীগগিরই চ'লে যেতে হবে। একটু চুপ ক'রে থেকে লোকটি আবার বললে, এখানে আমার বাপ-মা আছেন তাই আসতে হয়, নইলে কলকাতাই আমার ভাল লাগে। আসলে সেইটেই আমার দেশ, এইখানে আমি বেড়াতে এসেছি।—এই ব'লে নিজের রসিকতায় লোকটি হো-হো ক'রে হেসে উঠল।—কিন্তু আপনারা এখানে কি করতে এসেছেন?

—চাকরি খুঁজতে।

কলকাতা ছেড়ে এসে এখানে চাকরি! এখানে কি কোন ব্যবসা আছে যে, চাকরি পাবেন?

বললুম, আমরা লোকের বাড়ির চাকরের কাজ পেলেও করতে পারি। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে চুরি ডাকাতি ছাড়া আর সব কাজই আমরা করতে রাজী আছি।

—তা কিছু কাজের সন্ধান মিলেছে কি?

—না, অনেক বাড়ি তো ঘুরলুম, কেউ রাখতে রাজী হয় না।

আমাদের কথা শুনে লোকটির মুখ চিন্তায় গম্ভীর হয়ে উঠল। ভাবলুম, একটা চাকরি-বাকরির আশা বোধ হয় পাব তার কাছ থেকে। কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে সে বললে, চলুন, ওই দোকানে ব'সে চা খেতে খেতে আপনাদের সঙ্গে গল্প করা যাবে।

জানি না, রাধার কানে শ্যামনাম কি মধুবর্ষণ করেছিল, কিন্তু সেদিন চায়ের নামে আমার কর্ণকুহরে যে অমৃতবর্ষণ হয়েছিল, সে কথা স্মৃতিপথে উদিত হ'লে আজও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি।

রাস্তার ওপারেই একটা ছোট্ট চায়ের দোকান ছিল, তিনজনে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হওয়া গেল। দোকানে তখন খদ্দেরপাতি কিছুই ছিল না। সামান্য দোকান, একটা লম্বা টেবিলের দু পাশে দুখানা অত্যন্ত সরু বেঞ্চি পাতা। আমরা বসতেই সঙ্গের লোকটি দোকানদারকে বললে, তিন কাপ গরম চা দাও তো। ব'লেই বললে, আচ্ছা দাঁড়াও, কিছু খাবার-দাবার আছে?

—খাবার? নিশ্চয়ই। আমার কাছে ভাল খাবার আছে।

বোম্বাই অঞ্চলে ব্যাসন দিয়ে ভাজা বেগুনি-ফুলুরি খাবারের খুব প্রচলন আছে। সম্ভব অসম্ভব যত রকমের পাতা ফুল তরকারি আছে তাই কুটে ব্যাসন লেপটে ভেজে দোকানীরা বিক্রি করে। ওখানকার লোকেরা সকাল বিকালে রাশি রাশি সেই সব পত্র-পুষ্প ইত্যাদি ভর্জিত দ্রব্য ভক্ষণ ক'রে থাকে। আমি সে সব ভাজাভুজি ইতিপূর্বে খেয়ে দেখেছি, কিন্তু চিনেবাদাম বা সমজাতীয় অন্য তেলে ভাজা সেই সুখাদ্য আমার মোটেই ভাল লাগে নি। আমি জোর ক'রে বলতে পারি যে, আমাদের এখানকার সরষের তেলে ভাজা বেগুনি-ফুলুরি তার চেয়ে খেতে ঢের ভাল।

দোকানদারকে খাবার আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় সে একটা বড় থালার দিকে চেয়ে বললে, ওই যে রয়েছে। কত চাই ?

থালার দিকে চেয়ে দেখলুম। সকালবেলাকার ভাজা সেই রাবিশ কতকগুলো থালার এক কোণে প'ড়ে রয়েছে। সেগুলোর চেহারা দেখলেই মনে হয়, খদ্দেরে নেহাৎ নেয় নি ব'লেই প'ড়ে রয়েছে। সকাল-বেলা থেকে তার ওপরে পরতে পরতে ধূলো প'ড়ে সে দ্রব্যগুলি তখন একেবারে অখাদ্যে পরিণত হয়েছে। যে আমাদের দোকানে নিয়ে এসেছিল, সে ওই খাবারের দিকে চেয়ে শিউরে উঠে দোকানদারকে বললে, আরে, বাবুরা কলকাতার লোক, ওঁরা কি ওই খাবার খেতে পারবেন! তারপর আমাদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কি বলেন, দেবে ওই ভাজি ?

আমাদের অবস্থা তখন শোচনীয়। খিদের চোটে হাত-পা কাঁপতে আরম্ভ করেছে। সেই ভাজাভুজির থালার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত ক'রে অত্যন্ত অবহেলাভরে বলা গেল, দাও, বিদেশে নিয়মো নাস্তি।

দোকানদার তাড়াতাড়ি একটা পিরিচ ধুয়ে নিয়ে থালা থেকে সেই মাল তেলসমেত সাপটে তুলে নিয়ে পিরিচে সাজিয়ে আমাদের সামনে রাখলে।

আমরা টপ টপ ক'রে সেই ভাজি গোটা কয়েক মুখে দিয়ে তাকে বললুম, আপনি খান।

লোকটি বললে, না না, আমি খেয়ে এসেছি, আপনারা খান।

একটু পরেই আমাদের লোকটি দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করলে, কিছু মিষ্টি-টিষ্টি নেই?

দোকানদার ঘাড় নেড়ে বললে, খুব ভাল মিষ্টি আছে, দেব?

—কি মিষ্টি আছে?

দোকানদার আমাদের মাথার ওপরের দিকে হাত তুলে দেখিয়ে বললে, ওই যে।

মাথার ওপর চেয়ে দেখি, একটা প্রকাণ্ড গোল তিলে-খাজার মধ্যিখানে ছেঁদা ক'রে সেটাকে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। তার ওপরে মৌমাছি, বোলতা, নীল কালো বেগুনী ইত্যাদি নানা রঙের মাছি ব'সে আছে, দু-চারটে মশাও দেখলুম উড়ছে সেটাকে ঘিরে।

আমাদের কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে মুড়ি, মুড়কি, চিঁড়ে, বেগুনি-ফুলুরির মেলা দোকান ছিল। এই সব দোকানের অধিকাংশেরই মালিক ছিল উড়িষ্যাদেশবাসী। উড়ের দোকান বললেই এই সব দোকান বোঝাত। এদের জ্বালাতন করা আমাদের ছেলেবেলার খেলা ছিল। এই সব দোকানে ওই রকম গোল তিলে-খাজা ঝুলতে দেখেছি বটে, কিন্তু ওই খাদ্যটির প্রতি কখনও কোন আকর্ষণ বোধ করি নি এবং আস্বাদনও কখনও করি নি। আমাদের নারায়ণ জিজ্ঞাসা করলে, খাবে ওই জিনিস?

বললুম, মন্দ কি?

দোকানদার তখন অগ্রসর হয়ে সেই তিলে-খাজার প্রায় অর্ধেকটা ভেঙে আমাদের দিলে। ফলে রাজ্যের মাছি-মৌমাছি-বোলতা প্রথমে গোঁ-গোঁ ক'রে আপত্তি জানিয়ে শেষকালে আমাদের তাড়া করলে। তাড়াতাড়ি সেখান থেকে উঠে বাইরে পালিয়ে এলুম।

দোকানদার বলতে লাগল, ওরা কিছু বলবে না, ওরা কিছু বলবে না, সব পোষা—

যা হোক, সেগুলোকে তাড়িয়ে দেবার পর আমরা আবার খাবারের সামনে গিয়ে বসলুম। কিন্তু সেই তিলে-খাজা বহু দিন ধ'রে মশা-মাছির তিল তিল পীড়নে এমন নেতিয়ে পড়েছিল যে, মুখের মধ্যে গিয়ে তা দাঁতে লেপটে যেতে লাগল। তার ওপরে দীর্ঘকালব্যাপী শোষণের ফলে

বস্তুটি একেবারেই মাধুর্যহীন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পাকস্থলীর প্রচণ্ড তাগাদায় আহার্যের ভালমন্দের দিকে মনোযোগ দেবার অবস্থা আমাদের ছিল না। কোন রকমে পাকলে পাকলে সেই তিলে-খাজা ও তেলে-ভাজা উদরস্থ ক'রে তার ওপরে কাপ দুই ক'রে চা চাপিয়ে আমরা দোকান থেকে বেরিয়ে আবার সেই জায়গায় এসে বসলুম।

আমাদের প্রাণদাতা অত্যন্ত সমীহ ক'রে বলতে লাগল, আপনারা কলকাতার লোক, এই খাবার আপনাদের পক্ষে অযোগ্য। কিন্তু কি উপায়! এইখানে এর চেয়ে ভাল খাবার আর পাওয়া যায় না।

আমরা বললুম, এই খাবারটুকু আমাদের পেটে আজ না গেলে কি যে হ'ত বলতে পারি না। যতদিন প্রাণধারণ করব ততদিন আপনার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করব।

ভদ্রলোকের নাম ও ঠিকানা চেয়ে নিলুম। কলকাতার পর্তুগীজ চার্চ লেনে বাড়ি। পরে কলকাতায় এসে দু-তিনবার তার খোঁজ করেছি, দেখা পাই নি। কিন্তু সে কথা যাক।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলে, এখন আপনারা কি করবেন? এখানে আপনাদের চাকরি-বাকরির কিছু সুবিধে হবে ব'লে তো মনে হয় না। কারণ এটা অত্যন্ত ছোট জায়গা, তার ওপর আপনাদের এখানে কেউ চেনে না—কোন জামিনও যোগাড় করতে পারবেন না।

আমরা বললুম, কাজ আমাদের যোগাড় করতেই হবে, নইলে অনাহারে মরতে হবে।

লোকটি বললে, তবে আপনারা বোম্বাই চ'লে যান। বোম্বাই বড় শহর, সেখানে কোন রকম কাজ যদি না পাওয়া যায় তবে মুটেগিরি ক'রেও ভরণপোষণ চালানো যেতে পারে।

কথাটা আমাদের মনে লাগল। কিন্তু বোম্বাই যেতে হ'লে অন্তত দু-চার দিনের খরচও সঙ্গে থাকা চাই। কিন্তু আমাদের পকেটে যে কিছুই নেই! লোকটি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদের সঙ্গে আলাপ ক'রে খাইয়ে এক রকম প্রাণ বাঁচিয়েছে—মনে হ'ল, গোটা দুই টাকা তার কাছে চাইলে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু বলি বলি ক'রেও তার কাছে

মুখ ফুটে চাইতে পারলুম না। ওদিকে রোদ প'ড়ে আসতে আরম্ভ করলে। সম্মুখে রাত্রি—কোথাও আশ্রয় পাব কি না তা জানা নেই।

লোকটি বললে, এবার আমি আসি ভাই। চার মাইল দূরে গ্রামে আমার বাড়ি, এই চার মাইল পদব্রজে যেতে হবে। তারপরে হাসতে হাসতে বললে, কলকাতা হ'লে তো ট্রামেই চ'লে যাওয়া যেত। তারপরে একটা বিড়ি ধরিয়ে বললে, তারপরে—

আমরা বললুম, আপনার কথামত আমরা বোম্বাই শহরেই চ'লে যাব। কিন্তু যাবার আগে এখানে আরও দিন দুয়েক দেখব।

সেই ভাল কথা।—ব'লে লোকটি উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও উঠলুম। বললুম, চলুন, আপনাকে কিছুদূর অবধি এগিয়ে দিয়ে আসি।

কয়েক পা অগ্রসর হয়ে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলে, রাত্রে কোথায় থাকবে? এটা আবার গাইকোয়াড়ী জায়গা, নতুন লোক দেখলে পুলিসে হাঙ্গামা করে। ধ'রে নিয়ে থানায় আটক ক'রে রেখে দেয়।

গাইকোয়াড়ী জায়গার কিছু পরিচয় পেয়েছিলুম বরোদায় নেমে। সে কথা মনে হওয়ায় ভয় পেয়ে গেলুম। বললুম, তাই তো, কোথায় থাকব তা হ'লে?

লোকটি সামনেই একখানা বড় বাড়ি দেখিয়ে দিয়ে বললে, এই বাড়িটা হচ্ছে ধর্মশালা। রাত্রে এইখানেই থেকে যাও। এত বড় বাড়ি, এর এক কোণে প'ড়ে থাকলে কেউ জানতেও পারবে না।

এইখানেই—আচ্ছা সাহেবজী—ব'লে সে বিদায় নিলে। আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলুম, লোকটি হন-হন ক'রে এগিয়ে যেতে লাগল। ক্রমে তার মূর্তি পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল। সে অদৃশ্য হওয়ার পর আমরা পথের ধারে এক জায়গায় গিয়ে বসলুম। যতক্ষণ সে ছিল ততক্ষণ কথায় বার্তায় নিজেদের অবস্থার কথা এক রকম ভুলেই ছিলুম। কোথা থেকে এসে কে সে অজানা অচেনা আমাদের সংশয়াকুল হৃদয়-সমুদ্রে একটু আশার তরঙ্গ তুলে দিয়ে চ'লে গেল! সে চ'লে যেতে মনটা বড় খারাপ হয়ে পড়তে লাগল। অজানা দেশ, সামনেই রাত্রি; মনে হতে লাগল, এতক্ষণে জনার্দনেরা সুরাটের রাস্তায় নিশ্চিন্ত মনে

বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আর কিছু না থাকলেও অন্তত রাত্রের আশ্রয়টুকু তাদের আছে। নিরাশায় বুকের মধ্যে কেমন করতে লাগল। আমরা অনেকক্ষণ সেই নির্জন রাস্তায় এক রকম নর্দমার ধারে চুপ ক'রে ব'সে রইলুম—আমাদের চারিদিকে ক্রমে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠতে লাগল।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে স্থকান্ত ব'লে উঠল, দেখ্, এই যে লোকটা হঠাৎ কোথা থেকে এসে আমাদের খাইয়ে গেল, এ কে বুঝতে পেরেছিস কি ?

বললুম, না, কে এ ?

—লোকটি হচ্ছে ঈশ্বরপ্রেরিত। এদেরই বলে দেবদূত। মানুষের রূপ ধ'রে এসে আমাদের প্রাণে বাঁচিয়ে দিয়ে চ'লে গেল। এ রকম হয়—এদের কথা 'অলৌকিক রহস্য' ব'লে একটা মাসিকপত্রে আমি পড়েছি। কিছুক্ষণ ব'সে থেকে স্থকান্ত বললে, রাত্রে যে ধর্মশালায় থাকব—তা একটা আলো চাই তো। চল্, বাজার থেকে মোমবাতি কিনে আনিগে।

সেখান থেকে উঠে বাজারে চললুম। সেদিন সকাল থেকে শরীরটা আমার ভাল লাগছিল না। দুপুরবেলাটায় একটু জরও এসেছিল। বাজারের দিকে যেতে যেতে বুঝতে পারলুম, বেশ জর এসেছে। শরীরের গ্লানি ও ক্লান্তিতে পথ চলা দুষ্কর হ'তে লাগল। তার ওপরে বিকেলে ওই সব যাচ্ছেতাই খাবার খেয়ে আরও খারাপ লাগতে লাগল। বাজারে পৌঁছে সারা বাজার ঘুরে কোথাও মোমবাতি পেলুম না। আমার যতদূর মনে হয়, দোকানদারদের বোঝাতেই পারলুম না, আমাদের কি দ্রব্য চাই! মোমবাতি তো কিনতে পারলুম না, এক পয়সার বিড়ি ও আধ পয়সার একটা দেশলাই কিনে স্টেশন অর্থাৎ ধর্মশালার দিকে চললুম। পথ এক রকম অন্ধকার বললেই হয়, যেটুকু আলো আছে তাতে বড় শহরে পথ-দেখায় অভ্যস্ত এই চোখে অন্ধকারই ঠেকতে লাগল।

শরীরও এত খারাপ বোধ হ'তে লাগল যে এক রকম স্থকান্তর ওপর ভর দিয়েই চলতে লাগলুম। পেটের মধ্যে থেকে থেকে একটা বেদনার

সঙ্গে সঙ্গে গা-বমি-বমি করতে লাগল। শেষকালে পথের ধারে ব'সে বমি করবার চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু বমি কি হয়! অনেক চেষ্টা ক'রে এক চামচটাক জল ভেতর থেকে উঠে এল। জোর ক'রে বমি করবার চেষ্টা করায় পেটের যন্ত্রণা অসম্ভব রকমের বেড়ে গেল। একটুখানি বিশ্রাম ক'রে নিয়ে আবার চলব ভেবে সেইখানেই থেবড়ে ব'সে পড়লুম। সুকান্ত আমার পাশে ব'সে বিড়ি টানতে টানতে লেকচার দিয়ে যেতে লাগল। সে বললে, তোর নিশ্চয় আমাশা হয়েছে। আমারও আমাশা হবার আগে ওই রকম পেটের ব্যথা শুরু হয়েছিল। কিন্তু বলতে নেই—ওই সব অখাদ্য খেয়ে পেট একদম ভাল হয়ে গিয়েছে। কাল ও আজ সারাদিন ধ'রে পেটে যা কিছু ময়লা ছিল সব সাফ হয়ে গেছে। বিষস্য বিষম্ ঔষধম্—ইত্যাদি ইত্যাদি—

সে নানা ভাবে নানা ভঙ্গীতে আমাকে উৎসাহ দিতে লাগল, ও সব কিছু নয়। এক্ষুনি ভাল হয়ে যাবে।

এইভাবে সেখানে কিছুক্ষণ ব'সে থাকবার পর গুটিগুটি ধর্মশালার দিকে অগ্রসর হলুম। যখন বাড়িটার কাছে গিয়ে পৌঁছলুম তখন চারিদিক বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। বাড়িটার ভেতরে ঢুকে মনে হ'ল যেন হানাবাড়ি। চতুর্দিকে কেউ কোথাও নেই, অন্ধকার ঘুটঘুট করছে। প্রকাণ্ড বাড়ি—দরজা-জানলা সব খোলা হাঁ-হাঁ করছে। অন্ধকারে দেশলাই জেলে হাতড়াতে হাতড়াতে আমরা সিঁড়ি খুঁজে বার করলুম। দোতলায় উঠে লম্বা টানা বারান্দা। বারান্দার দু দিকে বড় বড় ঘর, ঠিক স্কুলবাড়ির মতন। স্টেশনের কাছে ব'লে সেখানকার একটু আলো ছটকে এসে বাড়িটার কোন কোন জায়গায় পড়েছে। অন্ধকার ও দূরাগত সেই স্বল্প আলোকে জায়গাটা যেন আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

বাড়িটায় যে কতদিন লোক ঢোকে নি তা বলা যায় না। এমন বেপোট জায়গায় ধর্মশালা করারও মানে বুঝতে পারা গেল না। কোথাকার কোন্ শেঠ যাত্রীদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তৈরি ক'রে দিয়েছেন—কথায় বলে, পয়সা থাকলে ভূতের বাপেরও শ্রাদ্ধ হয়—এই প্রকাণ্ড ধর্মশালা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

একটুখানি ঘোরাঘুরির পর একটা ঘোর অন্ধকার ঘরে ঢুকে আমরা তো আশ্রয় নিলুম। ব'সেই বুঝতে পারলুম, সেখানে প্রায় আধ ইঞ্চিটাক ধুলোর আস্তরণ পাতা রয়েছে। এখন আর সে সব বিচার করবার অবসর নেই। সুতরাং সেই ধুলোর ওপরেই গড়িয়ে পড়া গেল।

পেটের মধ্যে তখন সেই সাংঘাতিক খাদ্যগুলি ও পাকস্থলী—এই দুই পক্ষে ভীষণ ঝগড়া শুরু হয়েছে। কে এসেছ, চোপ্ রাও—ড্যাম্ রাস্কেল—কোঁওও—পোঁওও—চোঁওও—ইত্যাদি তো অনেকক্ষণ থেকেই চলেছিল, এবার দু পক্ষে যুদ্ধ শুরু হ'ল। পটকা, হাউই, বোমা, ছুঁচোবাজি ছাড়তে লাগল উভয় পক্ষেই। প্রাণ যায় যায়! তার ওপরে এতক্ষণ পেটে যে একটু কুন্‌কুনে ব্যথা চলেছিল সেটা বাড়তে লাগল সাংঘাতিকভাবে। ক্রমে সেটা পেট জুড়ে বুকের দিকে উঠতে লাগল। শেষে নিশ্বাস নিতে পারি না এমন অবস্থা!

যন্ত্রণায় আমি ঘরময় গড়াতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। একবার সুকান্তকে ডেকে বললুম, সুকান্ত ভাই, আমার বোধ হয় শেষ হয়ে এসেছে। আমি ম'রে গেলে তুই বাড়ি ফিরে যাস।

সুকান্ত জিজ্ঞাসা করলে, তোর কি রকম হচ্ছে?

বললুম, পেটের যন্ত্রণায় নিশ্বাস নিতে পারছি না, দম বন্ধ হয়ে আসছে, এই দেখ্, হাত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

সুকান্ত আমার একটা হাত নিয়ে দু হাত দিয়ে ঘ'ষে ঘ'ষে গরম করতে করতে বললে, তোর খুব সম্ভব শুকো কলেরা হয়েছে। কিচ্ছু ভয় নেই, কিচ্ছু ভয় নেই, ভগবানের নাম কর্।—এই অবধি ব'লেই সে উঠে এক রকম দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, আমি সেই ধুলিশয্যায় প'ড়ে রইলুম।

অন্ধকার ঘর, জনমানবশূন্য বাড়ি, চিৎকার করবার শক্তি পর্যন্ত নেই, অব্যক্ত যন্ত্রণা—মনে হচ্ছে, এখুনি মৃত্যু হবে। কিন্তু তার মধ্যেও একলা ভয় করতে লাগল—মৃত্যুভয় নয়, ভূতের ভয়। ভাবছি, ম'রে যাব দেখে সুকান্ত বোধ হয় পালাল, আবার মনে হ'ল এ সময়ে কি কেউ ফেলে পালাতে পারে? তবে সে কোথায় গেল? পেটের ব্যথা অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। শেষকালে অজ্ঞান হয়ে গেলুম।

আমার মনে হয়, খুব অল্প সময়ই সংজ্ঞাহীন ছিলুম। জ্ঞান ফিরে আসার একটু পরে দেখলুম, সুকান্ত ছুটে ঘরের মধ্যে এসে একবার আমার মাথার কাছে এসে বসল। একবার যেন আমার মাথায় হাত দিলে, তারপর চাপা কণ্ঠে একবার কেঁদে উঠে বললে, ওঃ, বাবা গো, আর পারি না।

একটুক্ষণ পরে আবার সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমার মনে হ'ল, হয়তো সুকান্ত আমার এই যন্ত্রণা দেখতে পারছে না তাই চোখের আড়ালে স'রে গেল। হযতো বা সে কোন ডাক্তারের সন্ধানে এমন ভাবে ছুটোছুটি করছে। ওদিকে পেটের মধ্যেকার যন্ত্রণা এমন হ'ল যে, সে সময়ে একমাত্র সেই চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা অসম্ভব হয়ে উঠল। মাঝে মাঝে হাতে-পায়ে খাল ধরতে আবম্ভ করলে। আমি প্রায় সংজ্ঞাহীনের মত প'ড়ে প'ডে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগলুম। এর মধ্যে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, সুকান্ত একবার ঘরের মধ্যে এল, আমার কাছেই এসে বসলে, কিছুক্ষণ পরে আবার যেন ছুটে বেরিয়ে গেল।

এই রকম কিছুক্ষণ চলতে চলতে হয়তো যন্ত্রণাটা একটু কম পড়ায় একবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলুম ; এমন সময় স্বপ্নে যেন মনে হ'ল, কে আমায় কাতর কণ্ঠে ডাকছে। যেন অনেক দূর থেকে কোন দুঃস্থ লোক কাতরে আমার নাম ধ'রে ডাকছে—স্থবির, ও স্থবির!

চট্ ক'রে ঘুমের সেই আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গিয়ে দেখি, সুকান্ত আমায় ডাকছে। জিজ্ঞাসা করলুম, কি বলছ ?

সে ফিসফিস ক'রে বলতে লাগল, দুপুরবেলা যে লোকটা এসেছিল না—

—কোন্ লোকটা ?

—ঐ যে, আমাদের খাবার খাইয়ে গেল—

বললুম, হ্যাঁ, কি হয়েছে ?

—বলছি, সেই লোকটা দেবদূত নয়, ও লোকটা হ'ল আসলে যমদূত। আমাদের দুজনকেই খাবার খাইয়ে মেরে দিয়ে চ'লে গেল।

জিজ্ঞাসা করলুম, কেন, তোমার কি হয়েছে ?

সুকান্ত বললে, সেই থেকে পেটে অসহ্য যন্ত্রণা আর মিনিটে মিনিটে পেট নামাচ্ছে।—বলতে বলতে সুকান্ত "ওরে বাবা, ওরে বাবা" ব'লে চেঁচাতে চেঁচাতে আবার ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

আমার পেটের ব্যথা তখন অনেক ক'মে গিয়েছিল। মনে হতে লাগল, জরও যেন ক'মে গিয়েছে। খানিক বাদে সুকান্ত ফিরে আসতে তাকে বললুম, একটু সহ্য ক'রে থাক্, পেটের ব্যথা ক'মে যাবে। আমার পেটের ব্যথা যেন অনেক ক'মে গিয়েছে।

কিন্তু সুকান্তর অসুখ ক্রমে বাড়তে লাগল। ক্রমে তার এমন অবস্থা হ'ল যে, সেই ঘরেতেই কাজ সারতে লাগল। সুকান্ত বলতে লাগল, তার পেটের অসুখ তো প্রায় সেরে গিয়েছিল, সেই লোকটাই কোথা থেকে এসে কি সব খাইয়ে দিয়ে তার এই হাল ক'রে দিয়ে চ'লে গেল।

কিছুক্ষণ এই রকম দাপাদাপি ক'রে সুকান্ত যেন এলিয়ে পড়ল। শেষকালে সে আমার পাশে এসে গা ঢেলে দিলে। দু-একবার ডাক দিয়ে দেখলুম, সে ম'রে গেল কি না! সুকান্ত বললে, বড্ড ঘুম পেয়েছে।

দুজনে পাশাপাশি শুয়ে আছি। সুকান্তর লাফালাফি দাপাদাপিতে আমার ঘুম ছুটে গিয়েছে। পেটের যন্ত্রণাটাও যেন ক্রমে মন্দীভূত হয়ে আসতে লাগল। মাঝে মাঝে হাত বাড়িয়ে সুকান্তকে ছুঁয়ে দেখি, তার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে কি না! বাড়ির মধ্যে খুট-খাট দুম-দাম অনেকরকম সন্দেহজনক শব্দ হয় আর ভয়ে শিউরে উঠি। একবার মনে হয়, সুকান্ত যদি ম'রে গিয়ে থাকে, তবে কি হবে? মনে হতেই তাকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে তখুনি জাগাই। সে একবার অতি ক্ষীণ একটু শব্দ ক'রে আবার পাশ ফিরে শোয়। এমনি করতে করতে আমিও আবার ঘুমিয়ে পড়লুম।

কতক্ষণ শুয়েছিলুম জানি না, একবার একটা বিকট চিৎকার শুনে ঘুমটা ভেঙে গেল। মনে হ'ল, একটা লোক সেই বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গলা ছেড়ে চিৎকার ক'রে কি বলছে। লোকটা মারাঠী ভাষায় বললেও ভাবে বুঝতে পারলুম যে সে বলছে—ধর্মশালায় যদি কেউ থাক তা হ'লে নেমে এস। সুকান্তকে ধাক্কা দিতে গিয়ে দেখলুম, সেও জেগে গেছে।

লোকটা খানিকক্ষণ সেই রকম ষাঁড়ের মতন বিকট চিৎকার ক'রে চুপ করলে। আমি সুকান্তকে বললুম, কিছু দরকার নেই ওর কথায় জবাব দেবার। চুপ ক'রে প'ড়ে থাকা যাক। সে যে পুলিসের লোক তা তার হাঁক-ডাকেই বোঝা গিয়েছিল। আমরা ঠিক করলুম, তার যদি প্রয়োজন থাকে তো সে এখানে আসুক, আমরা যাব না।

[ক্রমশ]

"মহাস্থাবর"

সুব্রহ্মণ্যম্ ভারতী

তামিল দেশীয় এই কবি-শ্রেষ্ঠের সহিত আমার পরিচয় ঘটে ১৯০৬ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে। ওই সময়ে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এখন যেখানে আলেক্জেন্ড্রা কোর্টের বিরাট অট্টালিকা বিদ্যমান, সেই স্থানে তখন খোলা মাঠ ছিল। দাদাভাই নৌরজী সেই অধিবেশনের সভাপতিপদে বৃত হন। তিনি দারভাঙ্গার মহারাজের অতিথি ছিলেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ।

সুব্রহ্মণ্যম্ ভারতীর চক্ষে নব-জাতীয়তার অনুভূতি ও উন্মাদনা লক্ষ্য করিয়া অনেক বাঙালী যুবক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন; এবং আমার সমবয়সী বলিয়া তাঁহার সঙ্গে আমারও বন্ধুত্ব ঘটে।

সেই সময়ে নব-জাতীয়তার অন্যতম ব্যাখ্যাতারূপে বিপিনচন্দ্রের খ্যাতি ছিল। সেই জন্য কংগ্রেস উপলক্ষ্যে সমগ্র ভারতবর্ষের বহু জাতীয়তাবাদী যুবক বিপিনচন্দ্রের রসা রোডের বাড়িতে মিলিত হইতেন। তন্মধ্যে তামিল ও অন্ধ্রবাসীয় যুবকবৃন্দ অগ্রণী ছিলেন। তামিল অঞ্চলের সুব্রহ্মণ্যম্ ভারতী, অন্ধ্র দেশের হনুমন্ত রাও, মুৎসুরী কৃষ্ণরাও, ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়া ছিলেন প্রধান। তাঁহারা উদ্যোগী হইয়া বিপিনচন্দ্রকে দক্ষিণ দেশে নব জাতীয়তাবাদ প্রচারের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। তন্মধ্যে কৃষ্ণরাও প্রায় চার মাস কাল বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে বাংলা দেশ পরিভ্রমণ করিলেন। বিপিনচন্দ্র পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ বঙ্গ পরিভ্রমণ করিয়া নব-জাতীয়তার ব্যাখ্যা করিতেন। সেই বক্তৃতাবলী সম্বন্ধে ৺বিজয়চন্দ্র

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন—তাঁহার বক্তৃতায় ভারতবর্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লোকচক্ষে রূপ ধারণ করিতেন। সে রূপ উমা-হৈমবতীর রূপ, যাহা রূপান্তরিত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্" গানে প্রতিফলিত হইয়াছে।"

সুব্রহ্মণ্যম্ ভারতী ছিলেন কবি—"মরমী" কবি। তাঁহার কবিতায় ও গানে সেই রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তামিল সভ্যতা ও সাধনা কত প্রাচীন, তৎসম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। অন্তত তিন-চার হাজার বৎসর পূর্বে তামিলেরা সাগরময় ভারত ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিজেদের উপনিবেশ স্থাপন করিতেন; নিজেদের মন্দিরাদি নির্মাণ করিতেন—তাহার প্রমাণ আছে। মধ্যযুগের তামিল সভ্যতার পরিচয় 'কুরাল' নামক রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি বিষয়ক পুস্তকে দেখিতে পাই। ৺নলিনীমোহন সান্ন্যাল মহাশয় অনেক তামিল গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনূদিত করেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ তাহা মুদ্রিত করিয়াছেন। এই ঐতিহ্যের ধারক ছিলেন সুব্রহ্মণ্যম্ ভারতী। বর্তমান যুগে তাঁহাকে তাহার দিক্‌পাল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার জীবনের সমগ্র পরিচয় তামিল পুস্তকাদিতে আছে। কিন্তু বিশেষ চেষ্টা করিয়াও ইংরেজী ভাষায়—আমাদের বোধগম্য ভাষায়—তাহা পাই নাই। কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলে দেশপ্রিয় পার্কের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে "ভারতী তামিল সংঘ" নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। সেই প্রতিষ্ঠান সুব্রহ্মণ্যম্ ভারতীর কয়েকটি কবিতা ইংরেজী ভাষায় ছাপাইয়াছেন। তাহা পাঠ করিলে সুব্রহ্মণ্যম্ ভারতীর পরিচয় পাওয়া যায়। বইখানি—'Songs of a Poet'—'একজন কবির গান' এই উপাধিতে ভূষিত হইয়াছে।

কয়েকটি গানের ভাবার্থ নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম।—

গান গাও—এমন একটি গান গাও
যার আগুনে, দেশের এই দুঃখ দুর্দশা,
এই কৃপণ, ভীরু স্বভাব পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়।
গান গাও, এমন গান গাও যার ফলে
দুনিয়ার নানা জাত, নানা মত ঐক্যবন্ধনে গ্রথিত হইতে পারে।

তখনই মায়ের স্নেহাকুল স্বর ফুটিয়া উঠিবে।

তিনি আমাকে বলিতেছেন—কাব, আমার নাম কর।

সুব্রহ্মণ্যম্ ভারতী দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অল্পবয়সে তাঁহার পিতৃদেবের ভগ্নীর আশ্রয়ে আসেন। তিনি কাশীবাসিনী ছিলেন। ভারতী সেই পুণ্যতীর্থের বিরাট ঐতিহ্যে অভিভূত হন; তাঁহার সেই অভিজ্ঞতার কথা তিনি নিশ্চয়ই কবিতায় রূপ দিয়াছিলেন। এই পুস্তিকায় তাঁহার "স্বাধীনতা" শীর্ষক একটি কবিতা ১ম পৃষ্ঠায় স্থান পাইয়াছে। ইহা ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন শ্রী চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী। এই কবিতার মধ্যে দক্ষিণ-ভারতের অচ্ছ্যুৎ সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রবল অভিযান ঘোষণা করা হইয়াছে।

স্বাধীনতা! স্বাধীনতা! স্বাধীনতা!

পারিয়ার জন্য স্বাধীনতা, থিয়ার (Tiyas) জন্য স্বাধীনতা, পুলীইয়াদের জন্য স্বাধীনতা!

পারাভাদের জন্য স্বাধীনতা, কুরুভদের জন্য স্বাধীনতা, মারাভাদের জন্য স্বাধীনতা!

এস, আমরা সকলে পরিশ্রম করিয়া যাই সকলের জন্য; পরিশ্রমে আমরা পিছপাও হইব না—কাহারও স্বার্থের হানি করিব না;

আমরা সত্যের পথে আলোকের পথে চলিব। কেহই এই ব্যবস্থায় হীন থাকিবে না; কেহই অত্যাচারিত হইবে না।

ভারতভূমিতে যাহার জন্ম সেই আর্য, অন্ত্যজ কেহই থাকিতে পারে না।

* * *

অজ্ঞানতা দূর হউক—আত্মজ্ঞানের জ্যোতির আলোতে।

পুরুষ ও নারী কেহই কারো পদানত নই।

জীবনের সকল কর্তব্যে তাহারা একসঙ্গে চলিবে; তাহাদের কর্তব্য ও অধিকার থাকিবে সমান—আমাদের এই ভারতভূমে।

স্বাধীনতা! স্বাধীনতা! স্বাধীনতা!

পারিয়ার জন্য, থিয়াদের জন্য, পুলীইয়াদের জন্য স্বাধীনতা!

পারাভাদের জন্য, কুরভাদের জন্য,
মারাভাদের জন্য স্বাধীনতা!

এইরূপ পুনরুক্তি কবিবৃন্দের একটি সাহিত্যিক কৌশল। ইহাতে পাঠকবর্গের মনে ভাব ও আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা গাঢ় হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবার পাহাড়, মেবার পাহাড়' গানটির প্রথম কলি উল্লেখযোগ্য।

সুব্রহ্মণ্যম্ ভারতী রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন, দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে আজীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। ১৮ পৃষ্ঠায় একটি কবিতা আছে—শিরোনামা তাহার—"এদের জন্য আমি প্রার্থনা করি।"

কথা বল মা! আমাকে তুমি সৃষ্টি করিয়াছ—ভাস্বর মন-প্রাণ দান করিয়াছ।

এখন তুমি কি আমাকে শক্তি দিবে না পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য কাজ করিবার?

অথবা, আমি কি প্রেরিত হইয়াছি—দুনিয়ার আর একটি ভার বাড়াইবার জন্য?

৪৪ পৃষ্ঠাতে মুদ্রিত কবিতার উপাধি—"কানন আমার ভৃত্য"। কবি গার্হস্থ্য-জীবনের দুঃখ ও লাঞ্ছনার কথা বর্ণনা করিতেছেন—

তাঁহার মায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী আর তাঁহাকে শান্তিতে থাকিতে দেন নাই—

আজ তিল-তৈল বাড়ন্ত—সে জন্য দোষী আমি; অভাবের সংসারে ভৃত্যেরা একটু বেয়াড়া হয়, এবং ভৃত্যাদি না থাকিলে নাকি চলে না।

এই সব নানা চিন্তায় যখন আমি বিব্রত বোধ করিতেছি। এমন সময় অজানা একটি বালক আসিয়া বলিল—সে একজন গো-মহিষ পালক। তারপর বক্‌বক্ করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল—

আমি তোমাদের ছেলেমেয়েদের যত্ন করিব—তোমার গো-মহিষ মাঠে লইয়া চরাইব—তোমার ঘর-দোর পরিষ্কার করিব, তোমার দীপদান পরিষ্কার করিয়া বাতি জ্বালাইব—তোমার আদেশ সব পালন করিব—তোমাদের সোনা, জহরৎ, মণি-মাণিক্য রক্ষা করিব।

আমি সুন্দর সুন্দর গান-গাথা রচনা করিয়া তোমার ছেলে-মেয়েদের শুনাইব।

নাচিব গাহিব তাহাদের সঙ্গে। কোলের খুকীটি তাহাতে হাসিয়া কুটিকুটি হইবে। আমি মূর্খ বর্ণজ্ঞানহীন।

কিন্তু লাঠি খেলা, অস্ত্র-শস্ত্র পরিচালনাতে অপটু নহি।

সেইজন্য দস্যু-তস্করের ভয় তোমাদের নাই।

চারিদিকের ঝাড়-জঙ্গল-পরিবৃত স্থানে তাহারা গোপনে বাস করে।

আমি তাদের দমন করিতে পারিব।

তোমার টাকা-পয়সা আমি লইব না, এই সত্য তোমাকে দিতে পারি।

এই সব কথা বলিয়া সে একটু দম লইল, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—

তোমার নাম কি ?

সে উত্তর করিল, লোকে আমাকে কানন বলিয়া ডাকে।

এমন কোন সুন্দর নাম তা নয়।

আমি তার ব্যূঢ়-রস্কো-বৃষ-স্কন্ধ মূর্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। আমি মনে মনে বলিলাম, যাহাকে আমি মনে-প্রাণে আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলাম তাহাকে পাইয়াছি ; যে আমার সব ভার লইবে—আমার পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিবে।

আমি ঠাট্টা করিয়া তাহাকে বলিলাম—

খুব তো বড় বড় কথা বলিতেছ। তুমি প্রতিজ্ঞা করিতেছ যে, আমি তোমাকে কার্যে নিযুক্ত করিলে আমার সর্ববিধ সুবিধা হইবে। এখন বল দেখি, তোমার মাহিনা কত ?

সে উত্তর করিল—

যুগ যুগ ধরিয়া আমি একাই জীবন কাটাইয়াছি—বিবাহ করি নাই, সন্তানাদি আমার জন্মে নাই, যাহার জন্য আমায় উপার্জন করিতে হইবে—যাহাদের জন্য আমায় ভাবিতে হইবে। আমি ভালবাসার কাঙাল, আমি টাকাপয়সা চাই না।

নির্বিকারে সে এই উত্তর দিল।

আনন্দিত মনে আমি এই প্রাচীন মনোভাবাপন্ন, বোকা ছেলেটিকে নিযুক্ত করিলাম।

তারপর আমি তাহার ব্যবহার ও কাজ-কর্ম দেখিয়া বুঝিতেছি যে, সে মিথ্যা বলে নাই। চক্ষুর পাতা যেমন চক্ষের মণিকে রক্ষা করে, সেইরূপ সে আমাদের পরিবারকে রক্ষা করিতেছে। সে নিজেকে আমাদের মধ্যে এমন ভাবে মিশাইয়া দিয়াছে যে, সে আমাদের কোন অন্যায়ের জন্যও ভর্ৎসনা করিতে কুণ্ঠিত হয় না। আমার সন্তানদের সে শিক্ষক, রোগে চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারী—একাধারে সে এইসব কর্তব্য করিয়া যায়, এবং কত কাজ যে সে আমার পরিবারের জন্য করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সে কি করিয়া যে আমাদের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া রাখে—দুধ, মাখন, মুখরোচক নানারূপ খাদ্য যে সে কি প্রকারে, কোথা হইতে যোগাড় করে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। পরিবারের মেয়েদের সে মায়ের মতন; আমার সে বন্ধু, পথের সঙ্গী ও ধর্মজীবনের পথ-প্রদর্শক। লোকচক্ষে সে আমাদের ভৃত্য, কিন্তু আমি তো জানি যে সে নররূপী নারায়ণ।

আমার কোন্ পুণ্যের ফলে যে সে আমার ঘরে আসিয়াছে এবং থাকিতেছে তাহা ভগবানই জানেন।

তাহার উপর সংসারের বোঝা ও মানসিক ও আধ্যাত্মিক আশা-আকাঙ্ক্ষা চাপাইয়া দিয়া আমি বেশ আরামে ও নিশ্চিন্তে আছি।

তাহার সাহচর্যে আসিয়া আমার জীবনের অধ্যাত্ম-দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে। শিবের ত্রিনয়ন হইতে যে জ্যোতি বিকীর্ণ হয় তাহা তাহার প্রসাদে আমি আজ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

কানন যে দিন হইতে আমার ভৃত্যরূপে এই সংসারে আসিয়াছে, সেই দিন হইতে আমাদের ধনৈশ্বর্য ও সুখ-শান্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কে এই কানন, কোথা হইতে সে আমার এখানে আসিল, কেন সে আমাদের ঘরে আসিল? কিছুই যে আমি বুঝিলাম না।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

ডানা

সাত

ফিরে এসেই ডানা আবার বেরিয়ে পড়ল সন্ন্যাসীর খোঁজে। ঝাঁ-ঝাঁ করছে দুপুরের রোদ। এই রোদে কেন যে সে বেরিয়ে পড়ল তা নিজেও সে বিশ্লেষণ ক'রে দেখবার চেষ্টা করল না। আমাদের সব কাজের আসল কারণ কেউ আমরা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করি না। অজুহাত অবশ্য সকলেরই একটা থাকে, ডানারও ছিল। যে আমগুলো কাল স্টেশনে কিনেছিল, তাই সে দিতে যাচ্ছিল সন্ন্যাসীকে। পরে দিলেও চলত, চাকরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেও চলত। কিন্তু পিপাসার্ত পশু যেমন সহজ বুদ্ধিবলে টের পায়—জল কোথায় আছে এবং সে জলের সমীপবর্তী কি ক'রে হতে হয়, ডানাও ঠিক তেমনই অনুভব করছিল সন্ন্যাসীর সান্নিধ্য তাকে এমন কিছু একটা দেবে যার জন্যে সে মনে মনে আকুল। কিন্তু সেটা যে কি, সে সম্বন্ধেও স্পষ্ট ধারণা ছিল না তার। ধারণা করবার প্রয়োজনও অনুভব করে নি সে। সন্ন্যাসীর কাছে গেলে ভাল লাগে, এই হেতুটুকুই যথেষ্ট ছিল তার কাছে।···বেরিয়েই চোখে পড়ল ছাই-রঙের একটা পাখি জিওলগাছের ডালে ব'সে আছে। অনেকটা বাজের মত। বুকের কাছটা বাদামী, তাতে ডোরাও দেখা যাচ্ছে অস্পষ্টভাবে। চোখ দুটো লাল্‌চে। ডানার মনে হ'ল, বাজ নয়, বাজ হ'লে ঠোঁটটা বাঁকা হ'ত। কি পাখি ওটা? এর আগে দেখে নি তো এ পাখি! পাখিটা যেই দেখলে ডানা তাকে লক্ষ্য করছে, সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গেল। উড়তেই ডানার নজরে পড়ল, পাখিটার ল্যাজের নীচে কালো রঙের ডোরা রয়েছে। পাখিটা উড়ে গিয়ে দূরে একটা আমগাছে বসল। ডানা চলতে শুরু করল আবার। চলতে চলতে ভাবতে লাগল, কি পাখি ওটা! মনে পড়ছে, অথচ পড়ছে না। ঘুরতেই আবার পাখি। এক ঝাঁক ছাতারে একটা ঝোপের ধারে কচবচ করছে লাফিয়ে লাফিয়ে। দূরে টেলিগ্রাফ-পোস্টের উপর ব'সে আছে ফিঙে। আর একটু দূরে মন্দিরের চূড়ার উপর নীলকণ্ঠ—ট্যাক্ ট্যাক্ শব্দ করছে আর ল্যাজ নাড়ছে। শালিকের বাসা চোখে পড়ল একটা। পক্ষীজগতের সঙ্গে আগে তার কোনও পরিচয় ছিল না, কোন ঔৎসুক্যও ছিল না।

বাড়ির বাইরে বেরুলে পাখিদের সম্বন্ধে চোখ কান আগে সজাগ হয়ে উঠত না। এখন হয়। পাখিদের সামান্য সাড়াও মনে সাড়া জাগায়। অমরেশবাবু তাকে নূতন একটা রহস্যলোকের সন্ধান দিয়ে গেছেন। অমরেশবাবুর মুখটা মনে পড়ল। কত বড় বিদ্বান, অথচ কত সরল। এ দেশের এত রকম পাখি দেখেও তৃপ্তি হয় না ভদ্রলোকের। আরও টাকা থাকলে বিদেশে গিয়ে আরও পাখি দেখতেন। ছোট শিশু যেন। ডানার মনের নিভৃত কন্দর থেকে মাতৃস্নেহ উচ্ছলিত হয়ে উঠল। তার মনে হ'ল, কত টাকা লাগে বিদেশে যেতে? আমার যদি থাকত আমি নিশ্চয় দিয়ে দিতাম। কবির কথাও মনে হ'ল, উনিও একটি শিশু, কিন্তু একটু অন্যরকম। ছিটগ্রস্ত। ভাবের ঘোরে কখন যে কি বলেন, কি করেন—কিছু ঠিক নেই। অনুকম্পা হ'ল। চিন্তাধারায় বাধা পড়ল হঠাৎ। রাস্তার ধারে একটা কাক কি যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল, তাকে দেখেই উড়ে গেল। ডানা দেখলে, মরা ইঁদুর একটা। পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে, নীচের দাঁত দুটোও দেখা যাচ্ছে। আকাশের দিকে মুখ ক'রে ব্যঙ্গ করছে যেন। কাকে? বিধাতাকে? মৃত্যুর সম্মুখীন হ'লে সকলেরই যেমন ক্ষণকালের জন্য জীবনের নশ্বরতার কথা মনে জাগে, ডানারও জাগল। বর্মা থেকে পালাবার সময় একবার মৃত্যুর মুখোমুখী হয়েছিল সে। মনে পড়ল সে কথা। অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। বাবার মুখটা স্পষ্ট ফুটে উঠল মনে। মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়? হারিয়ে যায় কি চিরকালের মত? নিশ্চিহ্ন [illegible]ারিয়ে যাওয়াই ভাল বোধ হয়। এই জীবনের সমস্ত সুখদুঃখবোধ [illegible] স্মৃতিসত্তার বহন করার সার্থকতা কি থাকতে পারে, জীবনের সঙ্গে [illegible]সূত্রই যদি চিরকালের মত ছিন্ন হয়ে যায়? যায় কি? তার এ [illegible]স্রোতও ব্যাহত হ'ল। দূরে কোথায় যেন ডেকে উঠল আর একটা [illegible]—বউ কথা কও! চমৎকার মিষ্টি ডাকটি। 'থা'টির উপর একটু [illegible] জোর দিয়ে, সামান্য একটু টান দিয়ে কি অপরূপ ক'রে বললে—[illegible] কথা কও! একবার ডেকেই কিন্তু চুপ ক'রে গেল। ডানা এদিক [illegible] চেয়ে দেখতে লাগল, কোন্ গাছের ফাঁকে কোথায় লুকিয়ে আছে

কে জানে যে ছাই-রঙের পাখিটাকে একটু আগে দেখতে পেয়েছিল, সেটা বউ-কথা-কও নয়। যদিও সে চোখে দেখে নি এখনও, কিন্তু বইয়ে পড়েছে বউ-কথা-কও পাখির রঙ কালো, ঠোঁটের দিকটা সাদা। ওর ইংরেজী নাম Indian Cuckoo···ছাই-রঙের পাখিটা কি তা হ'লে? পর-মুহূর্তেই পাখিটা তারস্বরে আত্মপরিচয় ঘোষণা করল। স্বরের উৎস পৃথিবী থেকে আকাশের দিকে উৎসারিত হ'ল, দ্বিপ্রহরের রৌদ্রতপ্ত নির্মেঘ আকাশ সে উচ্ছ্বাসে বিব্রত হয়ে পড়ল। চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল—দিগ্‌দিগন্তকে আকুল ক'রে তুলল যেন। ডানার তখন মনে পড়ল, অনেক কষ্টে এই চোখ-গেলকে একবার মাত্র দেখতে পেয়েছে সে। আরও মনে পড়ল, এর সঙ্গে বাজের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে ব'লে এর ইংরেজী নাম Hawk Cuckoo··· ডানা চেয়ে দেখলে, কিছুদূরে একটা আমগাছের শাখা ফলভারে অবনত হয়ে পড়েছে। আরও কিছুদূরে দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণচূড়া শাখায় শাখায় আগুনের শিখা জ্বালিয়ে, তার পাশেই কর্ণিকার, মনে হচ্ছে অসংখ্য হলুদ-রঙের প্রজাপতি যেন কোনও মন্ত্রবলে অচঞ্চল হয়ে গেছে ওর পত্র-পল্লবে। সমুজ্জ্বল উত্তপ্ত রৌদ্র-কিরণেও উৎসবের আনন্দ ফুটে বেরুচ্ছে, সরবে-নীরবে, আভাসে-ইঙ্গিতে স্পষ্টতা-অস্পষ্টতায় সে উৎসব আত্মপ্রকাশ করছে নানা স্বরে নানা ছন্দে। বউ-কথা-কও আবার ডেকে উঠল অপ্রত্যাশিত ভাবে। ডানার আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। নিজের কাছেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল একটু। সন্ন্যাসীর কাছে যাবে ব'লে বেরিয়েছিল, রাস্তার মাঝখানে ছেলেমানুষের মত দাঁড়িয়ে পড়েছে পাখির ডাক শুনে আর ফুলের গাছ দেখে। আবার চলতে শুরু করল। অনেক দিন আগে কবি একটা কবিতা লিখে শুনিয়েছিলেন তাকে। তার লাইনগুলো মনে পড়ল :—

নকল কাজেতে মত্ত থাকিয়া আসল কাজটি হয় নি করা
মিলন-সভায় যাইতে পারি নি, সে যে হবে ওগো স্বয়ম্বরা।
সে বারতা লেখা তারায় তারায় ফুলে ফুলে তাহা উঠেছে ফুটি।
অকাজের পাকে রয়েছি জড়ায়ে কিছুতেই যেন পাই না ছুটি।

কবিতার লাইনগুলো গুঞ্জন করতে লাগল মনের ভিতর। এর যে অর্থ সে আগে বোঝে নি, সেই অর্থটা ক্রমশ যেন প্রতিভাত হ'ল তার মনে। মনে হ'ল, আনন্দের একটা উৎসব অহরহ অনুষ্ঠিত হচ্ছে চোখের সামনে, কিন্তু তাতে যোগ দেওয়ার সামর্থ্য নেই তার।

সন্ন্যাসীর বাসার কাছাকাছি গিয়ে ডানা যখন পৌঁছল, তখন আবার দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল তাকে। দূর থেকে সে যা দেখতে পেলে তা অপ্রত্যাশিত। দেখলে, একটা শাবল নিয়ে সন্ন্যাসী একটা নারকেলের ছোবড়া ছাড়াবার চেষ্টা করছেন প্রখর রৌদ্রে ব'সে। ডানার মনে পড়ল কাকের ইঁদুর খাওয়ার দৃশ্যটা।

কি করছেন আপনি ?

সন্ন্যাসী একটু অপ্রতিভ হলেন।

ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করছি। তুমি এই রোদে বেরিয়েছ কেন ?

এই আমগুলো দিতে এসেছি আপনাকে।

দেখ, কি অদ্ভুত যোগাযোগ !

শাবল ও নারকেল সরিয়ে রেখে হাসিমুখে সন্ন্যাসী চুপ ক'রে রইলেন খানিকক্ষণ।

যোগাযোগ মানে ?—ডানা আমগুলি রেখে জিজ্ঞেস করল।

আর একটু হেসে সন্ন্যাসী বললেন, যোগাযোগ বলছি এইজন্যে যে, ভগবানই আমার নিতান্ত দৈহিক ক্ষুধায় বিচলিত হয়ে প্রথমে নারকেল পাঠিয়ে দিলেন, তারপর যখন দেখলেন নারকেলটা আমি ছাড়াতে পারছি না তখন তোমাকে দিয়ে আম পাঠালেন—এ কথা ভাবতে পারছি না। যাঁকে নির্বিকার পরমব্রহ্ম ব'লে ভাববার চেষ্টা করছি, তিনি এভাবে বিচলিত হচ্ছেন, এ কথা আমার পক্ষে ভাবা শক্ত। তাই যোগাযোগ বলছি।

নারকেলটা কে দিলে ?

কেউ দেয় নি। নদীর ধারে ব'সে ছিলাম, নদীর স্রোতে ভাসতে ভাসতে এসে আমার সামনে ঠেকল, ঠেকেই রইল অনেকক্ষণ, তাই তুলে নিয়ে এলাম। ক্ষিদেও পেয়েছিল খুব।

আপনি তো রোজ ভিক্ষা করতেন! ভিক্ষেয় কিছু পান নি বুঝি?

ভিক্ষা আজকাল আর করি না। আজকাল উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করেছি।

উঞ্ছবৃত্তিটা আবার কি?

তুমি মহাভারত পড়েছ?

না। কেন?

মহাভারতে শান্তিপর্বে এক উঞ্ছবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণের কাহিনী আছে। পদ্মনাভ সে কাহিনী ধর্মারণ্য নামক এক ব্রাহ্মণকে বলছেন।

কি বলুন না শুনি!

এখানে বড্ড রোদ, ঘরে চল।

ঘরের ভিতর ঢুকে দেখা গেল, সেখানেও খুব ছায়া নেই। ভাঙা চালের ভিতর দিয়ে সেখানেও রোদ ঢুকেছে।

ডানা বললে, এই ঘরে কি ক'রে যে আপনি আছেন! আনন্দবাবু আজকাল অমরেশবাবুর ম্যানেজার হয়েছেন, তাঁকে বলব আপনার ঘরটা সারিয়ে দিতে।

না, থাক্। কদিনই বা আর আছি!

ভাঙা ঘরটার আসল মালিক যে তিনিই, অমরেশবাবু নন—এ কথা তিনি ডানাকে বললেন না। অমরেশবাবু নিজেও সে কথা জানতেন না বোধ হয়।

চ'লে যাবেন না কি এখান থেকে?

সবাইকেই যেতে হবে, তোমাকেও। এক জায়গায় বেশিদিন থাকবার জো আছে কি! স্রোতের মুখে ভাসছি যে সব।

স্রোতের মুখে থেকেও তো মনে হয়, নড়ছি না।—ডানা হেসে জবাব দিলে।

বাইরের জগৎটা কার চোখে যে কেমন ঠেকে, কার মনে যে কি ভাবে প্রতিফলিত হয় তা বলা শক্ত। কারও সঙ্গে কারও মিল নেই, সেইজন্য কারও মাপের সঙ্গে কারও মেলে না।

ওসব আধ্যাত্মিক কথা থাক্ এখন। আপনি আমগুলো খান আগে।

এনেছ যখন খাবই তো। তুমি ওই কোণের দিকটায় ব'স, যদি বসতে চাও অবশ্য। দাঁড়াও, আমগুলো নিয়ে আসি বাইরে থেকে।

সন্ন্যাসী বেরিয়ে গেলেন আবার। ঘরের কোণে ছেঁড়া মাদুর গোটানো ছিল একটা। সেইটে পেতেই ডানা বসল। সন্ন্যাসী আমগুলি নিয়ে ফিরে এলেন। এসে বললেন, তুমি ওই মাদুরটা পেতে বসলে! আচ্ছা থাক্, বসেছ যখন--

কেন, কি হয়েছে মাদুরে?

হবে আবার কি! নদীর চরে শ্মশানে প'ড়ে ছিল, কুড়িয়ে এনেছিলাম একদিন। ওতেই শুই রাত্তিরে। তোমার ওতে যদি বসতে আপত্তি থাকে আমার ওই আসনটায় ব'স। আমি আমগুলো কাটি ততক্ষণ।

মাদুরের ইতিহাস শুনে ডানার উঠে পড়তেই ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু সেটা অশোভন হবে ভেবে উঠল না। মনে হ'ল, সন্ন্যাসী এতে শুতে পারেন আর আমি ব'সে থাকতে পারব না?

সন্ন্যাসী ঝুলি থেকে ছুরি বার ক'রে আমগুলি ধুয়ে কাটতে লাগলেন। ঝুলি থেকেই বার করলেন কয়েকটি শালপাতা। একটি আম কেটে শালপাতায় রেখে এগিয়ে দিলেন ডানার দিকে।

তুমি খাও।

আমি এইমাত্র ভাত খেয়ে এসেছি।

তবু খাও। তুমি সামনে ব'সে থাকবে, আর আমি একা খাব---সেটা কি ভাল দেখায়!

তা হ'লে আমি উঠি। আপনি খান।

তুমি না খেলে আমি খাবই না। তা ছাড়া একটা আমই যথেষ্ট আমার পক্ষে। অতগুলো আম নিয়ে কি করব আমি? তুমি একটা খাও, আমি একটা খাই। বাকিগুলো নিয়ে যাও তুমি।

রেখে দিন, কাল খাবেন।

আমি সঞ্চয় করি না। কালকের আহার কাল জুটেই যাবে কোথাও থেকে।

ডানার মনে একটু খটকা লাগল। সন্দেহ হ'ল, লোকটা তাক্

লাগিয়ে দেবার জন্য বাজে ভাঁওতা দিচ্ছে না তো! মুখে কিন্তু কিছু বললে না। শালপাতা থেকে আমের একটা চোকলা তুলে নিয়ে খেতে লাগল হাসিমুখে। খাওয়া শেষ হয়ে গেলে সন্ন্যাসী নিজের এবং ডানার শালপাতাটা তুলে বাইরে ফেলে দিয়ে এলেন, ডানাকে কিছুতেই ফেলতে দিলেন না। ডানা হাত মুখ ধুয়ে নিজের আঁচলেই হাত মুখ মুছতে মুছতে বললে, আপনি এত একগুঁয়ে কেন বলুন তো ?

সন্ন্যাসী হাসিমুখে চুপ ক'রে রইলেন।

কিছু বলছেন না যে ?

যা বলতে ইচ্ছে করছে তা বললে তুমি আমাকে হয়তো ভণ্ড মনে করবে। এ সব জিনিস বললেই খেলো শোনায়। চুপ ক'রে থাকাই ভাল।

এবার ডানা একটু অবাক হয়ে গেল। সত্যিই তো, একটু আগে ওঁকে ভণ্ডই মনে হচ্ছিল। তার মনের কথা টের পেয়ে গেছেন নাকি! শক্তিশালী সন্ন্যাসীরা অন্তর্যামী—এ কথা সে শুনেছিল যেন কার কাছে। সরলভাবে সত্য কথাই বললে সে, আমরা সাধারণ লোক, অনেক সময় আপনাদের বুঝতে পারি না, তাই ভণ্ড ব'লে মনে হয়। ভণ্ড সাধুরও অভাব তো নেই দেশে।

সন্ন্যাসী খুশি হলেন। বললেন, সত্যি কথা বললে বলতে হয়—আমিও ভণ্ড। আমার বাইরেটা দেখে বা আমার কথাবার্তা শুনে আমার সম্বন্ধে যে ধারণা লোকের হওয়া স্বাভাবিক, আমি ঠিক তা নই। অথচ মুশকিল, আমি আমার বাইরের প্রকাশটা ঠিক আমার অন্তরে অনুরূপ করতেও পারি না। তাই চেষ্টা করি লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে—

এই স্বীকারোক্তির পর কি বলা উচিত, ডানার মাথায় এল না। কিন্তু আনন্দে তার মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সে নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলে, লোকটা ভণ্ড নয়।

উঞ্ছবৃত্তির সম্বন্ধে আপনি কি একটা গল্প বলবেন বললেন! বলুন না শুনি।

এ সব আজগুবি গল্প কি ভাল লাগবে তোমার ? মহাভারতের

শান্তিপর্বে আছে গল্পটা। ধর্মারণ্য ব'লে একজন ব্রাহ্মণ কোন্ ধর্ম আচরণীয় তা ঠিক করতে পারছিলেন না। তাঁকে একজন পরামর্শ দিলেন—তুমি পদ্মনাভের কাছে যাও, তিনি তোমাকে নির্দেশ দেবেন। ধর্মারণ্য পদ্মনাভের বাড়ি গিয়ে শুনলেন, পদ্মনাভ সকালে উঠে সূর্যের রথচক্র বহন করতে গেছেন। রোজই যান। সূর্য অস্ত গেলে তিনি বাড়ি ফিরবেন। ধর্মারণ্য শুনে অবাক হয়ে গেলেন। নদীর ধারে ব'সে অপেক্ষা করতে লাগলেন তাঁর জন্য। নির্দিষ্ট সময়ে এলেন তিনি। ধর্মারণ্য তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—সূর্যলোকে কি কি আশ্চর্য জিনিস দেখেছেন আপনি? পদ্মনাভ নানারকম আশ্চর্য জিনিসের বর্ণনা ক'রে শেষে বললেন, কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য হয়েছিলাম একটি জ্যোতির্ময় মহাপুরুষকে দেখে। তিনি সূর্যের মতই জ্যোতিষ্মান। তিনি যেন দ্বিতীয় সূর্য। দেখলাম, তিনি এসে সূর্যের মধ্যেই বিলীন হয়ে গেলেন। আমি সূর্যকে জিজ্ঞাসা করলাম—ঠিক আপনার মত দীপ্তিশালী এই মহাপুরুষ কে? সূর্য বললেন—ইনি একজন উঞ্ছবৃত্তিধারী তপস্বী। এই গল্পটি শুনেই ধর্মারণ্য উঠে পড়লেন। পদ্মনাভ জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি প্রয়োজনে আমার কাছে এসেছিলেন তা তো বললেন না? ধর্মারণ্য উত্তর দিলেন—আমি যা জানতে এসেছিলাম তা জেনেছি, আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে, তাই আমি চ'লে যাচ্ছি।—এই ব'লে প্রণাম ক'রে তিনি চ'লে গেলেন।

গল্পটি ব'লে সন্ন্যাসী চুপ ক'রে রইলেন। ডানাও চুপ ক'রে রইল। তার কানে এল অনেক দূরে বউ-কথা-কও পাখিটা আর একবার ডেকে উঠল। মনে হ'ল, পাখিটাই যেন তাকে বললে—চুপ ক'রে আছ কেন? কথা কও, যা জানতে চাইছ জেনে নাও। একটু ইতস্তত ক'রে ডানা বললে, উঞ্ছবৃত্তি কাকে বলে তা আমি জানি না। আমার মূর্খতায় আপনি হাসবেন হয়তো।

কুড়িয়ে খাওয়ার নাম উঞ্ছবৃত্তি। ফল ফুল শস্য কন্দ কত রকম খাবার ছড়িয়ে প'ড়ে থাকে চতুর্দিকে। কুড়িয়ে খেলে একজনের অনায়াসে চ'লে যায়। বিষয়ী মানুষরাই কেবল খাদ্য সঞ্চয় ক'রে রাখে, পৃথিবীর

বাকি সমস্ত প্রাণীই তো কুড়িয়ে খায়। পৃথিবীই অন্নপূর্ণা, তিনিই সকলের জন্য অন্নের ভাণ্ডার পূর্ণ ক'রে রাখছেন অহরহ। আমাদের ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কি ?

ডানা হেসে বললে, পশুত্বের স্তরে নেমে আসাই তা হ'লে সাধুত্বের লক্ষণ বলুন !

পশুরা অসহায়। উঞ্ছবৃত্তি না ক'রে ওদের উপায় নেই। মানুষ কিন্তু স্বাধীন, সে ইচ্ছে করলে রাজরাজেশ্বর হতে পারে আবার উঞ্ছবৃত্তি-ধারীও হতে পারে। সাধুরা রাজরাজেশ্বর হতে চান না, কারণ রাজ-রাজেশ্বর হ'লে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা ক্ষণস্থায়ী আনন্দ। সাধুরা চিরানন্দলোকে উত্তীর্ণ হতে চান—

সেই চিরানন্দলোক কোথায় ? ঠিকানা পেলে চেষ্টা করতাম।

ঠিকানা কেউ ব'লে দিতে পারবে না। তোমাকেই খুঁজে বার করতে হবে।

কেন ?

কারণ, ঠিকানাটা তোমার মনের মধ্যেই আছে। তুমি যদি খোঁজ, পাবেই নিশ্চয়।

কই, কোনদিন আভাস মাত্র তো পাই নি !

চেষ্টা করলেই পাবে। শুধু আভাস কেন, তোমার তেমন আগ্রহ যদি থাকে সাক্ষাৎদর্শন পর্যন্ত পাবে।

কার সাক্ষাৎদর্শন পাব ?

সত্যের।

কিন্তু আপনি চিরানন্দলোকের কথা বলছিলেন যে !

সত্যই চিরানন্দময়। সত্যই আনন্দ, সত্যই শিব, সত্যই সুন্দর যে মুহূর্তে সত্যকে প্রত্যক্ষ করবে সেই মুহূর্তে এমন আনন্দ তোমার সমস্ত সত্তায় ওতপ্রোত হয়ে যাবে, যার শেষ নেই, যা অবর্ণনীয়।

কি রকম সে ব্যাপারটা—কিছুই বুঝতে পারছি না।

সেটা কেউ কাউকে বোঝাতে পারে না। প্রভাতের সূর্যোদয় যে দেখে নি, তাকে বর্ণনা ক'রে তা বোঝানো অসম্ভব। তোমার বাড়ির

শেষ হ'লে নিজেই তুমি প্রত্যক্ষ ক'রে তা বুঝতে পারবে একদিন। সে উপলব্ধি এ জন্মে হতে পারে, জন্মজন্মান্তর অপেক্ষা করতে হতে পারে তার জন্য। কারও বক্তৃতা শুনে তাড়াহুড়ো ক'রে তা হবে না। কাছে বা দূরে সে প্রতীক্ষা করছে তোমাব জন্য। তোমাকে যেতে হবে সেখানে।

কিন্তু আপনি এখনই তো বললেন, তা আমার মনেব মধ্যেই আছে। তবে আবার দূবে আছে বলছেন কেন ?

মনের মধ্যেই আছে। কিন্তু তোমাব মন কি ছোট? সে যে বৃহৎ, অতি বৃহৎ। তাবও সীমা নেই, শেষ নেই, তাও দূব থেকে দূবান্তে, জন্ম থেকে জন্মান্তবে বিস্তৃত। তা তোমাব ওই দেহটুকুব মধ্যেই নিবদ্ধ নয়। তাব স্বরূপ আবিষ্কাবই তো আত্ম আবিষ্কার। সে আবিষ্কাব সকলকেই করতে হবে একদিন, আর সেই আবিষ্কাবেব পথেই সত্য-দর্শনও হবে। তখনই বুঝতে পারবে, চিবানন্দলোক কোথায়।

ডানা আনত দৃষ্টিতে শুনছিল। শুনতে শুনতে তার মনে হ'ল, সে যেন খব-স্রোতে ভেসে চলেছে। ছোট একটা নৌকোর উপব ব'সে আছে সে। কোথাও কূলকিনাবা নেই। মনে হচ্ছে, স্রোতেব ধাবা দূবদিগন্তে আকাশে গিয়ে বিলীন হয়ে গেছে। দিগন্ত রেখা স'রে স'বে যাচ্ছে কেবল। সে যে কঠিন মাটির উপব সন্ন্যাসীর সামনে ব'সে, তা ভুলে গেল সহসা। কযেক মুহূর্তেব জন্য অসীম যাত্রাপথের যাত্রী হয়ে পডল সে যেন, স্থান কাল অবলুপ্ত হযে গেল তার চেতনা থেকে। একটা সুনিশ্চিত অবলম্বনেব আশায় আকুল হয়ে উঠল সে ভয়-ভয় করতে লাগল···মনে হ'ল, নৌকাটা এই স্রোতেব ধাক্কা কতক্ষণ সইতে পারবে -টুকরো টুকরো হযে যাবে এখনই · আশ্রয চাই, অবলম্বন চাই একটা। আশ্রয মিলল। বাইরে একটা দোয়েল পাখি তীক্ষ্ণ মধুর কণ্ঠে আশ্বাস দিলে। কি বললে, ভাষায় তা প্রকাশ করা যাবে না, কিন্তু মনে হ'ল, যেন আশ্রয় মিলল।

ডানা চেয়ে দেখলে, সন্ন্যাসী চোখ বুজে ব'সে আছেন।

[ক্রমশ]

"বনফুল"

সংবাদ-সাহিত্য

কোন বন্ধুর মুখে গল্প শুনিলাম : ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক সেতার-বাদক আমন্ত্রিত হইয়া সংস্কৃতি-অভিযানে চীন গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি অতি মোলায়েম খাস উর্দু-জবানে চৈনিক আতিথেয়তার উচ্চ প্রশংসা করিয়া সেই বাবদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনও করিয়াছিলেন। পরে একজন সন্দেহবাদী দুষ্টপ্রকৃতির লোক তাঁহাকে চাপিয়া ধরিয়া সরাসরি প্রশ্ন করেন, চীনারা খানদানী বনেদী জাত তা তো বুঝলাম মিঞা সাহেব ; চীনা সঙ্গীত আপনার কেমন লাগল সে কথা তো বললেন না! মিঞা সাহেবের মনের ক্ষতে যেন প্রশ্নকর্তা আঘাত করিলেন। তিনি বিচলিত ও বিরক্ত হইয়া বলিয়া ফেলিলেন, সঙ্গীতের বাত ছেড়ে দাও ভাই। চীনে সঙ্গীত ব'লে কোনও পদার্থ নেই। যেখানেই গেছি, লোক "ফোক্" "ফোক্" করেছে—সেটা আর যাই হোক, গান নয়।

ইদানীং দেখিতেছি ভারতবর্ষের সর্বত্র, বিশেষ করিয়া দিল্লী ও কলিকাতায় কথায় কথায় সংস্কৃতির বান ডাকিয়া যাইতেছে এবং মিঞা সাহেবের দেখা চীনের মত এই সংস্কৃতির প্রধান অবলম্বন হইল "ফোক্" অর্থাৎ লোক-সঙ্গীত এবং নৃত্য। উচ্চকোটির সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র-শিল্প ও ভাস্কর্য লইয়া মাতামাতি হয় তাহার অর্থ বুঝি, জনসাধারণের রুচির মান উন্নত করার সেই চেষ্টা দেখিয়া আনন্দিতও হই ; কিন্তু যখন দেখি, অধিকাংশ তথাকথিত সংস্কৃতি-সম্মেলনে আহ্লাদীপুতুল, কালীঘাটের পট, পুথির পাটা ; গম্ভীরা, ঘেঁটু ও গাজীর গান অথবা রিকশাওয়ালা ও পালকি-বেহারার গান ; এবং ইতর গ্রাম্যজনের শিল্প-সুষমাহীন স্বভাবসাহিত্য লইয়া উদ্যোক্তারা পাঁচ কাহন করিতেছেন, তখন সন্দেহ হয় ইঁহাদের মতলব ভাল নয়। ভ্রূণ ও গর্ভস্রাবেদের লইয়া মাথা ঘামাইবে ডাক্তারেরা, দেশশুদ্ধ লোককে তাহা লইয়া ক্ষেপাইয়া তুলিতে হইবে—এটা কোনও কাজের কথাও নয়, গর্বের কথাও নয়। কিন্তু কাজে তাহাই হইতেছে। মনোবিকলনকারী ডাক্তারের অন্ধকার ঘরের সোফায় শুইয়া নিজের মনকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়া বা এলাইয়া দিয়া রোগী

যখন* অবচেতন মনের রহস্য উদ্ঘাটন করে, চিকিৎসার সুবিধার জন্য ডাক্তারের তাহাতে আগ্রহ থাকিবার কথা; কিন্তু আসল অবচেতন (দৃঃ জীবনানন্দ দাশ) অথবা নকল বা সেয়ানা অবচেতন (দৃঃ অমিয় চক্রবর্তী) মনের বাণীস্রাবকে কবিতা আখ্যা দিয়া জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়া যে অতিশয় গর্হিত, সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠানগুলি একদিকে যেমন সে কথা চাপিয়া যাইতেছেন অন্যদিকে তেমনই নিতান্ত অ্যান্থ্রপলজির বিচার্য নানা চিত্র ও সঙ্গীত নামধেয় স্পেসিমেনগুলিকে "ফোক্ আর্ট" বা "ফোক্ লিটারেচার" আখ্যা দিয়া ঢাক-ঢোল পিটাইয়া সর্বসমক্ষে জাহির করিয়া নানা-কারণে-অনাদৃত সত্যকার শিল্প সাহিত্য ও সঙ্গীতের ক্ষতি করিতেছেন। সাহিত্য-শিল্প-সঙ্গীতে এই পশ্চাদপসরণ-(atavism)-এর প্রশ্রয় দিতেছেন সমাজে প্রতিষ্ঠাবান অথচ বিকৃতরুচি এক শ্রেণীর মানুষ; বংশগতভাবে ভাল খাইতে খাইতে যাঁহাদের রসনায় জড়তা আসিয়াছে তাঁহারা মুখ বদলাইবার জন্য চানাচুর চিবাইয়া উল্লাস করিতেছেন আর আমরা দেশশুদ্ধ লোক বড়লোকের চাট-প্রশস্তিতে মুগ্ধ হইয়া নিজেদের সর্বনাশ করিতেছি। দেশের অধিকাংশ সংস্কৃতি-সম্মেলনের এই ইতিহাস। "এলোমেলো-ক'রে-দে-মা-লুটে-পুটে-খাই"-এর দলও ইহাদের সহিত জুটিয়া সস্তায় নিজেদের কাজ হাঁসিল করিয়া লইতেছেন। ইহারা কথায়-কথায় পার্কে-স্কোয়ারে যেখানে-সেখানে সংস্কৃতি-সম্মেলন ডাকিয়া দুই-চারিজন আধাগ্রাম্য-কবিওয়ালাকে শিখণ্ডী খাড়া করিয়া রাষ্ট্র ও সমাজ-বিরোধী প্রচারে অপোগণ্ড তরুণদের তাতাইয়া নানা দিকে নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিতেছেন। সংস্কৃতির হাতে দলীয় স্বার্থ অহরহ তামাক খাইয়া যাইতেছে। শহরে নিরীহ ভদ্রলোকেরা সপরিবারে এই সংস্কৃতির ফাঁদে পড়িয়া কি ভাবে দুহিত হইতেছেন, তাহা দেখিলেও কষ্ট হয়।

অবশ্য আমাদের কলিকাতা শহরে ব্যাপারটা আজ নূতন নয়, বহু পুরাতন। প্রায় নব্বই বছর আগে ১৮৬৮ সনে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

"আমি যদি এই সময় একবার কলকাতায় যেতে পাত্তুম, আর

এই কচ্ছপটাকে রংচঙে কর্‌য়ে মানুষের ন্যাজ বের্‌য়েচে বলে মাঠের ধারে একটা তাঁবু ফেলে বসতে পাত্তুম ত কত পয়সাই লাত হতো;—সেখানকার বাবুরা আজকাল ভারি হুজুগে হয়ে উঠেছে; ঘোড়ার নাচ, বিবির নাচ, ভূত নাবান, সং নাচান নিয়ে বড়ই সাখরচে হয়ে পড়েচে—কিন্তু এদিকে একজন ভিকিরি এলে একমুটো চাল যোটে না।—টোল-চৌপাড়িগুলো একেবারে লোপ পাবার যো হয়েছে, তবুও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের এক পয়সা দিয়ে সাহায্য করেন না!"

সর্বাপেক্ষা দুঃখ ও বিপদের কথা এই যে, এই পচ-ধরা সংস্কৃতির সর্বনাশা ছোঁয়াচ সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত স্বদেশী সরকারের মনেও লাগিয়াছে; বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি-পাদ্‌রীদের পিছনে এই দরিদ্র দেশের একটা মোটা অঙ্ক খরচ হইয়া যাইতেছে। শুধু আসা নয়, এদেশে ওদেশে যাওয়াও চলিতেছে। অর্থাৎ পাদ্‌রী-লেনদেন একটা হুজুগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চীন দেশ, সোভিয়েট দেশ হইতে নাচিয়েরা আসিতেছেন, জওহরলাল নাচিতেছেন, বিজয়লক্ষ্মী নাচিতেছেন, শারীরিক বাধা সত্ত্বেও রাজেন্দ্রপ্রসাদও কম নাচিতেছেন না। অথচ যখন নাচানাচি ছিল না, তখনই আমরা রুশ ও চীনের সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক বেশি জানিতাম। গোগোল পুশকিন লারমনটভ টুর্গেনিভ টলস্টয় শেখভ ডস্টয়ভস্কি এবং পুরাতন গর্কির রুশিয়াকে আমরা জারের নির্মম অত্যাচার-কাহিনীর মধ্য দিয়া যতখানি জানিতাম, আজ সংস্কৃতির পরদাফাঁাই হওয়া সত্ত্বেও লৌহ-যবনিকার গুণে ততখানি জানি না। কনফুসিয়াস হইতে আরম্ভ করিয়া সান-ইয়াৎ-সেনের চীনকেও অনেক বেশি জানিতাম। সত্যকার সাহিত্যের মধ্য দিয়াই জানা যায়, প্রোপাগাণ্ডা-সাহিত্য একেবারেই জানিতে দেয় না। অধুনা সংস্কৃতি নামে যাহা চলিতেছে তাহা এই বিষকুম্ভ প্রোপাগাণ্ডারই পয়োমুখ। এই সংস্কৃতিই আমাদিগকে ধীরে ধীরে পাইয়া বসিতেছে, আসল সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত মাটি হইতেছে।

সেদিন ভারতবর্ষে যে রুশ-সংস্কৃতি-পাদরীরা আসিয়াছেন, তাঁহাদের একজন আমাদিগকে ব্যাকুল কণ্ঠে অনুরোধ জানাইয়াছেন—সোভিয়েট কালচারকে জানুন। খুব ভাল কথা। নিশ্চয়ই জানিব। কিন্তু

সোভিয়েট কালচার বস্তুটা কি, তিনি তাহা বলেন নাই। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত সাহিত্যের মধ্য দিয়া রুশিয়ার যে প্রাণশক্তির পরিচয় আমরা পাইয়াছিলাম, তাহা তো সোভিয়েট কালচার নয়; কারণ সেই লেখকদের অনেকেই আজ বাতিল হইয়াছেন। কার্ল মার্ক্স বা এঙ্গেল্‌স্‌ তো সোভিয়েট কালচার নন, লেনিন নন, গোর্কিও নন, এমন কি, বেরিয়ার ফাঁসিতে জানা যাইতেছে মহামতি স্টালিনও নন। তবে সোভিয়েট কালচার কি? মজদুরতন্ত্র এখনও কালচারের কোঠায় উঠে নাই। ১৯১৭ হইতে আজ পর্যন্ত রুশিয়ায় যে সাহিত্য শিল্প সিনেমা থিয়েটার সঙ্গীত গজাইতেছে, তাহাতে কর্তাদের প্রোপাগাণ্ডা-শক্তির বিপুল বিস্ময় আছে, পুলিসী শাসনের নিশ্ছিদ্র ক্ষমতার ভীতি আছে, কিন্তু প্রেমের আকর্ষণ নাই। আধুনিক রুশিয়া আমাদের বিস্ময় ও ভয় উদ্রেক করে, কিন্তু যাহার প্রতি আমাদের পূজা নিবেদন করিব সে সংস্কৃতি-দেবতা কোথায়? কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?

তাই বলিতেছিলাম, সংস্কৃতিতে একটু ঢিল দেওয়া হউক, সাহিত্য হউক, শিল্প হউক, সঙ্গীত হউক, কিন্তু ওই জগাখিচুড়ি সংস্কৃতি নয়। উহা নল-ভাগ্য ভারতবর্ষের দেহে শনি-প্রবেশের মারাত্মক ছিদ্র হইয়া দেখা দিতেছে। অতএব সাবধান!

সাবধান বাংলা দেশের সাহিত্যিক বন্ধুরা, তোমাদের অন্ন মারিবার জন্য ধর্ম-অক্টোপাস ধীরে ধীরে এক-একটি বাহু বিস্তার করিতেছে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে আমরা দুঃখ-জরা-ব্যাধিসঙ্কুল সংসারের সাধারণ মানুষের বিপদ-আপদের আশ্রয়স্থল সাধুপুরুষ বলিয়া জানিতাম; হঠাৎ দেখিতেছি, তিনি কবিদের যশে ভাগ বসাইতে আসিতেছেন। ঠাকুর অনুকুলচন্দ্র শিষ্য-শিষ্যা লইয়া নিভৃতে একান্তে ধর্মচর্চা করিতেছিলেন, হঠাৎ গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি সেই 'যুগান্তরে'র মূল সংবাদ-পৃষ্ঠায় দেখিলাম—

"ঋত্বিগাচার্য গীতা, বাইবেল, ত্রিপিটক ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ধর্মীয় সাহিত্যের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বেদবর্ণিত ঋষিদের উপলব্ধির সূত্র ধরিয়া যে ভাষায়

তিনি ঈশ্বরকেন্দ্রিক জীবন যাপনের বিধানাবলী রচনা করিয়াছেন, ধর্ম ছাড়াও সাহিত্যের দিক হইতে তাহা অভিনব।...শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের রচনাবলী বিশ্ব-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।"

ধর্মের হস্ত এই ভাবে সমস্ত কাঙাল সাহিত্যিকদের আশা ভরসা হরণ করিতে থাকিলে তাঁহারাই বা যান কোথায়?

—

হেমন্তকুমার-শিশিরকুমার মতিলাল-মৃণালকান্তির বহুকষ্টে হাতে-গড়া ভক্তি গাব-মাখানো তরণীখানি এতদিন অমিয়-নিমাইয়ের পাল তুলিয়া ভবার্ণবে নিশ্চিন্ত পাড়ি জমাইয়াছিল, এমন কী বিপদে তাহা পতিত হইল যে এখন পালে অনুকূল বাতাস লাগাইবার প্রয়াস চলিতেছে? এখনও যুগান্তর হয় নাই মৃণালকান্তি গিয়াছেন, ইহার মধ্যেই তবে কি অমিয়-নিমাইয়ের ভরাডুবি হইল? যেখানে পরলোকের কথা নিত্যই স্মরণ করা হয়, সেখানে এই আকস্মিক পরিবর্তনে পরলোকে পূর্বপুরুষদের জ্যোতির্ময় দেহে যে মুহুর্মুহু স্বেদকম্পপুলক হইতে পারে সে কথা ভাবিবার লোকও কি কেহ নাই? সৎসঙ্গে কি তুষারও বিগলিত হইয়াছে? জয় গৌর!

—

মাস্টার মশাইদের ভাতাবৃদ্ধি ব্যাপারে পিছনে থাকিয়া যাঁহারা তাঁহাদের অনাবৃত মাথায় ছাতা ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, মাস্টার মহাশয়রা—অন্তত বারো বছরের কম চাকুরি যাঁহাদের তাঁহারা—নিশ্চয়ই এই সকল পরছত্রধারীদের চিনিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা ছাতা ধরিবার উপলক্ষ্য খুঁজিতেছিলেন, মাস্টার মশাইরা সেই সুযোগ তাঁহাদের দিয়াছেন। তাঁহাদের ভাতাবৃদ্ধি লইয়া ইঁহাদের কাহারও মাথাব্যথা নাই, ইঁহারা চাহিয়াছিলেন স্বদেশী সরকারকে জব্দ করিতে। প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন, নতুবা প্রতিরোধ-ক্ষেত্র হইতে ছত্রভঙ্গ হইয়া ফিরিবার সময় ইউনাইটেড স্টেটস্ ইনফরমেশন সার্ভিসের অফিসের কোলাপসিব্‌ল গেট, চার ইঞ্চি পুরু কাঁচ ইত্যাদি ভাঙিবার যন্ত্রপাতি ইঁহারা সঙ্গে সঙ্গে পাইলেন কোথায়? একসঙ্গে শহরের বারো জায়গায় স্টেট বাস ও

ট্রামই বা পুড়িল কি করিয়া? ইহা আকস্মিকের খেলা নয়। ইহার পিছনে সুচিন্তিত ষড়যন্ত্র আছে। আমেরিকার ক্ষতিতে না হয় কাহারও কাহারও উল্লাস হইতে পারে, কিন্তু দেশের লোকের পয়সায় নির্মিত সরকারী বাসগুলি পুড়িতে দেখিয়া মাস্টার মশাইরা নিশ্চয়ই লজ্জিত, দুঃখিত ও শঙ্কিত হইয়াছেন। তাহা হইলেই হইল। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে মতলববাজদের তামাক খাইবার সুবিধা দিবার জন্য নিরীহ ভাল মানুষদের আর কেহ হাত না বাড়াইয়া দেন—সেই কারণেই এই প্রসঙ্গের অবতারণা।

—

দ্রুতপদ রাজার চাকুরি করিবার কালে রাজপুত্রদের দুগ্ধপান দেখিয়া পুত্র অশ্বত্থামার দুগ্ধপিপাসা নিবারণ করিবার জন্য আচার্য দ্রোণ তাঁহাকে পিটুলিগোলা জল খাইতে দেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে জাল ও ভেজালের ইহাই সূত্রপাত। আচার্য অবশ্য নিরুপায় হইয়া স্বীয় আত্মজকে ঠকাইয়াছিলেন, কিন্তু এত বড় একটা আবিষ্কার কেবল আত্মীয়মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবার কথা নয়। ধীরে ধীরে ইহা চালু হইতে থাকে। দুধে জল, ঘিয়ে চর্বি, চালে কাঁকর, তেলে শিয়ালকাঁটা, সুপারিতে খেজুর-বিচি, ময়দায় সাবানপাথর বা তেঁতুল-বিচি, মাখনে পাকাকলা-মার্গারিন* অর্থলোভী মানুষের অপূর্ব উদ্ভাবনী শক্তি ধীরে ধীরে খাদ্যবস্তুতে যুগান্তর আনিতে থাকে। ধাতুমুদ্রা, ধাতুঅলঙ্কার, ঔষধাদির কথা তুলিলে প্রসঙ্গ বিপুলাকার ধারণ করিবে। মোট কথা, জাল-ভেজালে মানুষের বুদ্ধি যতখানি প্রযুক্ত হইয়াছে, বিবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারেও ততখানি হয় নাই। কুৎসিতা কুরূপাকে সুন্দরী সাজাইতে এই বুদ্ধির ব্যাপক প্রয়োগ এখনও হইতেছে, বৃদ্ধকে নবযুবক করিবার জন্য পূর্বপুরুষ বানরদের হনন করিতেও নরেরা দ্বিধা করিতেছে না। জাল-ভেজাল প্রসঙ্গে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ লিখিবার অবকাশ আছে। শাস্ত্রে মধু অভাবে গুড় দেওয়ার বিধিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

* "Margarine—Legal name for all substances made in imitation of butter."—Concise Oxford. Legal name—কি সর্বনাশ!

সংবাদপত্রে চায়ে চামড়ার ভেজাল চলিতেছে—এই সংবাদ সন্থ প্রচারিত হইয়াছে। অন্য বস্তু তো অর্থাভাবে খাইতে পাই না। ক্ষুধা মারিবার জন্য সময়ে অসময়ে ওই চা-ই খাইতাম, তাহাতেও যদি শুকনো চামড়ার ছাঁট ভেজাল দেওয়া হয় এবং অলস অথবা ফুর্তির মুহূর্তে চামড়ার গরম নির্যাস খাইতে হয়, তাহা হইলেই তো গিয়াছি। মনকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিতেছি, এই সংবাদ নিশ্চয়ই কফিওয়ালাদের কারসাজি অথবা টিনে লেবেল আঁটিয়া যাঁহারা চা বিক্রয় করেন তাঁহারাও ব্যবসায়ে মন্দা দেখিয়া লুজ বা বন্ধনমুক্ত চায়ের বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য এই মিথ্যা রটনা করিতেছেন। যাহারা ধরা পড়িয়াছে, তাহারাও বোধ হয় আপোসে ধরা পড়িয়াছে।

—

'পথের পাঁচালী'র বিভূতিভূষণের মৃত্যুতীর্থ ঘাটশিলায় তাঁহার স্মৃতিমন্দির স্থাপনের উদ্যোগ-সভা নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যিকদের স্মৃতিরক্ষায় এতকাল ধনী মানী অথচ অসাহিত্যিকরাই চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন—এই প্রথম কেবলমাত্র সাহিত্যিকেরাই অগ্রণী হইলেন। এই ব্যাপারে সর্বশ্রেণীর সাহিত্যিকদের যে একপ্রাণ ঐকান্তিকতা দেখা গেল, বাংলা দেশের ইতিহাসে অনেককাল পরে তাহা অভিনব। বনগ্রাম বারাকপুর, রানাঘাট মুরাতপুর, কলিকাতা ভাগলপুর, ইসমাইলপুর বহু স্থানই বিভূতিভূষণের স্মৃতিমণ্ডিত; কিন্তু ঘাটশিলার দাবি সর্বাধিক, কারণ তাঁহার নশ্বর দেহ সেখানকার ধূলিতেই শেষ পর্যন্ত মিশিয়াছে। উদ্যোগপর্ব এমন সুঅনুষ্ঠিত হইয়াছে যে, ইংরেজী প্রবাদ মতে বলিতে পারি—অর্ধেক কাজ আগাইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় বাংলা দেশের সাহিত্যিকদের কাঁধে গুরুদায়িত্ব চাপিয়াছে। তাঁহারা নিশ্চয়ই শেষ রক্ষা করিবেন। স্মৃতিরক্ষার পরিকল্পনাটিও সুন্দর। বিভূতিভূষণের নামাঙ্কিত স্মৃতিসৌধের একাংশে ক্লান্ত শ্রান্ত পীড়িত সাহিত্যিকদের সাময়িক বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকিবে। স্বাস্থ্যকর স্থানে এই বিশ্রামের অবকাশ পাইলে বাংলা দেশের বহু সাহিত্যিক নবজীবন লাভ করিবেন। যদি অন্যত্র অর্থসংগ্রহ নাও হয়, বাংলা

দেশে যাঁহারা লেখেন তাঁহাদের সংখ্যা হাজারের কম হইবে না; তাঁহারা প্রত্যেকে সাড়ে সাত টাকা করিয়া দিলেই কলিকাতার "কোটা" সাড়ে সাত হাজার পূর্ণ হইবে। ঘাটশিলা দিবেন সাড়ে সাত হাজার। তন্মধ্যে ধলভূমগড়ের সচিব শ্রীবঙ্কিম চক্রবর্তী ও ঘাটশিলার ব্যবসায়ী শ্রীঅনিল সেনের সহধর্মিণী শ্রীমতী রেণুকা সেন ৭৫০৲+৫০১৲=১২৫১৲ টাকা দিয়াছেন। উপযুক্ত জমিও বঙ্কিমবাবু ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। সুতরাং আশা করা যায়, আগামী বৎসর হইতেই আমরা বিশ্রামাগার ব্যবহার করিতে পাইব। রুশিয়াতে শুনিয়াছি সরকার সাহিত্যিকদের জন্য এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা যদি বেসরকারী ভাবে ইহার সূত্রপাত করিতে পারি, বিভূতিভূষণের সঙ্গে আমরাও অমর হইব।

—

জনমতের সমর্থনে যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশব্যবস্থা যে বিচারক দিয়াছিলেন, তাঁহাকে আজ আমরা যীশুখ্রীষ্টের জন্যই স্মরণ করিয়া থাকি। বারাব্বাস না খ্রীষ্ট তিনি তাহা জানিতেন—কিন্তু ইহুদী সম্প্রদায়ের ভয় তাঁহাকে অসত্যে লিপ্ত করিয়াছিল। "সত্য কি" বলিয়া তিনি হাত ধুইয়া ফেলিলেও সত্য চাপা থাকে নাই। মানভূম-টুসু-সত্যাগ্রহে ভারতবর্ষে গান্ধীজীর পাঁচজন অনুরক্ত ভক্তের একজন মাননীয় বৃদ্ধ শ্রীঅতুল ঘোষকে যে বিচারক কারারুদ্ধ করিয়াছেন তাঁহার বিবেকও আজ নিশ্চয়ই পরিষ্কার নাই। বিহার-সরকার জানিয়া শুনিয়া এ কি করিলেন? খ্রীষ্টকে মারিয়া খ্রীষ্টের ধর্মকে যদি উৎখাত করা যাইত তাহা হইলেও কথা ছিল, অতুল ঘোষকে বাঁধিয়া মানভূমে বাঙালীর দাবিকেও হঠানো যাইবে না। দুই হাজার বছরের ইতিহাসের ইহাই সাক্ষ্য। ভগবান বুদ্ধদেব ও জৈন তীর্থঙ্করদের পুণ্যলীলাক্ষেত্র বিহারে আর যাহাই পাক, অন্যায় অত্যাচার বেশিদিন প্রশ্রয় পাইতে পারে না।

—

আমাদের দেশে ভীষণদৃশ্য স্থূলকায় পাহাড়-পর্বত-অরণ্যের অন্তরালে সূক্ষ্ম শিল্পকলাচর্চার নিদর্শন অনেক আছে—অজন্টা, এলোরা,

এলিফ্যাণ্টায় গেলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা হিন্দুরা শ্মশানে সব কিছু মূল্যবান বস্তুকে ছাই করিয়া উড়াইয়া দিই। ইসলামী মর্ত্যে একসঙ্গে মা ও মেয়ের দৃষ্টান্ত পাশাপাশি দেখিতে পাই—আগ্রায় মমতাজমহলের দরুন তাজমহল এবং দিল্লীতে জাহানারার কবরের দরিদ্র পরিবেশ। পুঁথিটাই এতকাল আমাদের কাছে বড় ছিল, মলাটটাকে আমরা উপেক্ষা করিতাম, এবং করিতাম বলিয়াই বটতলা হিতবাদী বঙ্গবাসী বসুমতী আমাদের যাবতীয় জাতীয় ঐশ্বর্যকে ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছে। ভিতরের বস্তুর ভার ছিল, বাহিরের ধারের ধার আমরা ধারি নাই। এখন কম্পিটিশনের যুগ। ভারের অর্থাৎ বস্তুর ভাগ-বাঁটোয়ারা হইয়াছে, কাজেই পুস্তকের মলাট আর পুস্তনি একটা আর্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই আর্টে বর্তমানে চরম সাফল্য দেখাইতেছেন সিগনেট প্রেস। ভিতরে ঢুকিবার পূর্বেই তোরণদ্বারে আমরা বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া পড়িতেছি, কাজেই ভিতরে ঢুকিবার পূর্বে অন্তরে স্বতঃউৎসারিত শ্রদ্ধার উদ্রেক হইতেছে। এ কথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, শুধু সিগনেট প্রেসের যত্নে ও চেষ্টায় বাংলা দেশে পুস্তকের বহিঃপ্রকাশ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে, আজ সকল পিতাই রূপগুণনির্বিশেষে কন্যাকে সাজাইয়া গুছাইয়া ছাঁদনাতলায় বাহির করিতেছেন। ভিতরের মাল যাচাই—সে স্বতন্ত্র বিচার।

একসঙ্গে সিগনেট প্রেসের অনেকগুলি বই উপহার পাইয়া এবম্বিধ চিন্তা আমাদের মনে উদিত হইল। আগে দুরবীন কষিয়া বসুমতী-সংস্করণ পুরাণাদি পাঠ করিয়াছি, কিন্তু এখন আর তাহা করিবার প্রবৃত্তি নাই। ভাল ছাপাই বাঁধাই ছবির জন্য মন কাঁদে। সিগনেট প্রেস এবং দেখাদেখি অনেক প্রকাশকের কৃপায় সে চাহিদা মিটিতেছেও। অবনীন্দ্রনাথের 'বুড়ো আংলা' 'নালক' ও 'শকুন্তলা'র সিগনেটী সংস্করণ অনবদ্য। ছবি ও ছাপা দেখিলে স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ খুশি হইতেন। জিম করবেটের অনুবাদ 'কুমায়ুনের মানুষখেকো বাঘ' এবং লীলা মজুমদারের 'পদিপিসীর বর্মি-বাক্স'—কিশোর-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। অচিন্ত্যকুমারের 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ' রামকৃষ্ণ-কথিত কাহিনী-

গুলির মনোহারী সংস্করণ। অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যগ্রন্থ 'পারাপার', বিষ্ণু দের কাব্যগ্রন্থ 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' ও 'এলিঅটের কবিতা', অচিন্ত্যকুমারের কাব্য 'অমাবস্যা', সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য 'সংবর্ত' এবং বিষ্ণু দের সাহিত্য-প্রবন্ধ 'সাহিত্যের ভবিষ্যতে'র আবেদন সাহিত্যিকদের কাছে শুধু মলাটেই আবদ্ধ থাকিবে না।

বিশ্বভারতীর রূপসজ্জা সস্তা ও সাধারণ হইলেও রুচির। 'স্বরবিতানে'র ২৯, ৩০, ৩১, ৩২ সংখ্যা আরও শতাধিক অ-ধরা রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে স্বরবদ্ধ করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের ৯৭, ৯৮, ৯৯ ও ১০২ যথাক্রমে শান্তিদেব ঘোষের 'জাভা ও বলির নৃত্যগীত,' প্রবোধচন্দ্র বাগচীর 'বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য', প্রবোধচন্দ্র সেনের 'ধম্মপদ-পরিচয়' ও মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের 'সিংহলের শিল্প ও সভ্যতা' বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত বলিয়াই বোধ হয় প্রচলিত রূপসজ্জা ছাড়িয়া চিত্রভূষিত মলাট লইয়াছে। পরবর্তী ১০৫ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের 'কুইনিন' ও ১০৬ সুখময় ভট্টাচার্যের 'বৈশেষিক-দর্শন'। ভারতীয় সংস্কৃতি সাহিত্য ও শিল্প এবং সর্বদেশ ও সর্বকালের বিজ্ঞান বিষয়ে বিশ্বভারতী এই যে মিনিয়েচার লাইব্রেরির রচনা করিলেন, অদূরভবিষ্যতে তাহা বাংলা-সাহিত্যের গৌরবের বস্তু হইবে। বিশ্বভারতীর বৃহত্তর প্রকাশ প্রমথনাথ বিশীর 'বাংলা সাহিত্যের নরনারী' বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' হইতে পরশুরামের 'গড্ডলিকা' পর্যন্ত চল্লিশটি পুথিবদ্ধ সাহিত্য-রসিকদের পরিচিত চরিত্রকে সাধারণের দরবারে উপস্থিত করিয়াছে; এমন সরস উজ্জ্বল সহাস্যমধুর মূর্তিতে প্রমথনাথ তাহাদের অবতীর্ণ করাইয়াছেন যে, এই পুস্তক পাঠ শেষ হইলেই প্রত্যেক পাঠকের পরিচিতের সংখ্যা চল্লিশ বৃদ্ধি পাইবে।

এই কিস্তিতে সর্বাধিক ধন্যবাদ জানাইতেছি উদ্বোধন কার্যালয় ও অদ্বৈত আশ্রমকে। ইঁহারা বিষয়বস্তু ও রূপসজ্জার সামঞ্জস্যবিধান করিয়া পুস্তক প্রকাশের ধারা উন্নততর করিয়াছেন। মাতা সারদামণির শত-বার্ষিক উপলক্ষে অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশ করিয়াছেন 'Great Women of India'—স্বামী মাধবানন্দ ও রমেশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় বৃহৎ মূল্যবান গ্রন্থ, প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান কাল অবধি

ভারতের মহিয়সী নারীরা এই গ্রন্থের বিষয়। গবেষণা হইলেও সুখপাঠ্য। উদ্বোধন এই শতবার্ষিক উপলক্ষে বাহির করিয়াছেন স্বামী গম্ভীরানন্দের 'শ্রীমা সারদা দেবী।' নির্ভরযোগ্য জীবনী। স্বামী গম্ভীরানন্দের উপনিষৎ, স্তবমালা, রামকৃষ্ণভক্তদের জীবনী দুই খণ্ড আমরা সর্বদা রেফারেন্স গ্রন্থ হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকি। 'শ্রীমা সারদা দেবী'ও সেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করিবে। ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত 'শ্রীরামকৃষ্ণচরিত' উদ্বোধনের আর একখানি উল্লেখযোগ্য বই—নির্ভরযোগ্য বইও বটে, অল্পপরিসরের মধ্যে সব কথাই আছে। উদ্বোধন আরও বাহির করিয়াছেন শ্রীমৎ সুরেশ্বরাচার্যের 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ'র একটি মূল ও বঙ্গানুবাদ সহ সংস্করণ, অনুবাদক ও সম্পাদক স্বামী জগদানন্দ। 'কৈলাস ও মানসতীর্থ' স্বামী অপূর্বানন্দের অপূর্ব ভ্রমণ-কাহিনী।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠও অতিশয় তৎপর; ইঁহাদের বইয়ের বহিঃসজ্জাও নিপুণ ও রুচিসম্মত। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' নামক অতিশয় প্রয়োজনীয় ও সুলিখিত বইখানির সর্বজনগ্রাহ্য স্বীকৃতির অপেক্ষায় আছি এমন সময়ে স্বামী অভেদানন্দের 'কাশ্মীর ও তিব্বতে' উপহার পাইয়া ধন্য হইলাম। কাশ্মীরের প্রশ্ন আজ আমাদিগকে চিন্তাকুল করিয়াছে, এই গ্রন্থে কাশ্মীর সম্পর্কে অনেক নূতন অনেক গুহ্য খবর আছে।

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানির উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচায কৃত 'রবীন্দ্র-কাব্য পরিক্রমা'র দ্বিতীয় সংস্করণ সুদৃশ্য চেহারা লইয়াছে। বিষয়বস্তুর বিপুলতা সত্ত্বেও এত অল্পদিনে বইখানির সংস্করণান্তর হওয়া সত্যই বইখানির আভ্যন্তরীণ গুণের পরিচয় দিতেছে।

এ মুখার্জি অ্যাণ্ড কোম্পানির ১৯৫৪ সনের *Current Affairs* এবং এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেডের ১৯৫৪ সনের *Hundusthan Year Book* বিবাগী না হইয়া যাওয়া পর্যন্ত সকলকে অনিবার্যভাবে ব্যবহার করিতে হইবে। যে কোনও প্রসঙ্গে বিপদে পড়িয়া যাঁহারা মাথা চুলকাইতে চাহিবেন না, তাঁহারা এই বই দুইখানি নিশ্চয়ই সংগ্রহ করিবেন।

ভুল গণনা

একটু একটু ক'রে ক্রমে সত্য হচ্ছে গণৎকার,
শূন্য আমার সিন্দুকেতে উঠছে টাকার ঝনৎকার।
অবাক হয়ে চেয়ে থাকি—মোর সমতল পন্থা ঢাকি
যশের পাহাড় ছোঁয় আকাশে আমি চড়ি শীর্ষে তার ;
যা ছিল না হচ্ছে তাহাই—বললে যেমন গণৎকার।

বিবাগী মন এরি মাঝে গুনগুনিয়ে গায় যে গান—
"যা হবে তা থাকবে না রে ভাসিয়ে দেবে প্রেমের বান!
মিলবে যশ মিলবে টাকা—সবি ক্রমে লাগবে ফাঁকা,
শেষে প্রেমের বৃন্দাবনে মাধুকরীই তোমার ত্রাণ।"
জমছে অনেক হচ্ছে অনেক তার মাঝে মন গাইছে গান

গণৎকার সে জানত সবি, মানত না এই সত্যটাই—
এই জনমের লগ্নে জনম সেই আমি যে খণ্ড, তাই
যুগে যুগে চলছি ভেসে—ঠেকনু হেথা খানিক এসে
যশ বা টাকা এসব শুধু দুদিনের ভোগ-লাঞ্ছনাই ;
গণক জানে এই জনমই, জানে না সব সত্যটাই।

কালান্তর

যাচ্ছি যাব ক'রে আমার
দিনগুলো সব যায় ব'য়ে
শুক্‌নো ফুলের পাপড়ি যেমন
যায় খ'সে আর যায় ক'য়ে—
"রঙ-তামাসার ফুরলো কাল,
বিদায় নিল মধুপজাল
ফল যে এবার ধরেছে হাল,
ফুল যায় বিদায় ল'য়ে—"

এতদিন মোর দিনগুলি সব
ছিল ফুলের মঞ্জরী,
সেই গুণেতে ছিলাম আমি
মৌমাছিদের মন ভরি,
এখন ফলের সম্ভাবনায়
মনের দেহে ব্যথা ঘনায়
পারি না আর অন্যমনায়
চলতে তারিখ সন ধরি।

হ্যামলেট, ডেনমার্কের কুমার

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য। পলোনিয়সের গৃহে একটি কক্ষ।

[পলোনিয়স ও রেনাল্‌ডোর প্রবেশ]

পলো। রেনাল্‌ডো, দিও তারে এই টাকা—
আর এই জরুরী কাগজ।

রেনাল্‌। দেব কর্তা।

পলো। রেনাল্‌ডো, তুমি তো বিচক্ষণ ;
বিশেষ বুদ্ধির কাজ হবে,
সাক্ষাৎ করার পূর্বে
তার চালচলনের
কিছুটা সন্ধান যদি নাও।

রেনাল্‌। কর্তা যাহা বলিলেন আমিও ভেবেছি তাই।

পলো। বেশ বেশ, খাসা বলিয়াছ।
শোন পুনরায়, প্রথমে সন্ধান লবে
কোন্ কোন্ ডেন্‌মার্কের লোক রয়েছে প্যারিসে
কে কেমন, কারা তারা, কি থেকে কতটা আয়,
কে কোথায় থাকে, কারা সঙ্গী, ব্যয় কত ;
এমনি জিজ্ঞাসাবাদে, পাকে চক্রে বোঝ যদি
আমার ছেলেকে তারা চেনে,
তখন আসল কথা পাড়িবে কৌশলে।
দেখাবে এমন ভাব তুমি তারে কিছু কিছু চেন ;
হয়তো বলিলে—'উহার পিতাকে চিনি বটে,
বন্ধুদেরও চিনি, ওকেও কতক চিনি।'
বুঝেছ রেনাল্‌ডো ?

রেনাল্‌। আজ্ঞে, বুঝেছি বইকি।

পলো। বলিবে—'কতক চিনি, পুরোপুরি নয়,
তবে যদি সেই হয়, সে বড় দুর্দান্ত ছেলে,

এই এই ঝোঁক আছে।' এইখানে
বলিবে বানায়ে খুশিমত দু-দশটা দোষ।
তবে দেখো, বেইজ্জৎ হয়—
ব'লো না এমন কোন দোষ।
যৌবনে পাইলে ছাড়া
যে সকল দোষ ত্রুটী প্রায়ই ঘ'টে থাকে,
সেই সব করিবে উল্লেখ।

রেনাল্। এই বাজি রেখে খেলা, কি বলেন ?

পলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিংবা সুরাপান,
অসিক্রীড়া, বিরোধ, কলহ,
এতদূরও যেতে পার।

রেনাল্। তা হ'লে যে অসম্মান হবে তাঁর।

পলো। অসম্মান হবে কেন ?
সাথে সাথে জুড়ে দেবে কৈফিয়ৎ কিছু।
তা ব'লে দিও না যেন লাম্পট্যের দোষ,
ততটা চাই নে যেতে আমি।
দোষগুলো ব'লে যাবে আভাসে ইঙ্গিতে,
স্বভাব কোপনচিত্ত বাধাবন্ধহীন
রক্তের উগ্রতা আজও প্রশমিত নয়,
এমন যুবকদের যে দোষ প্রায়শ ঘ'টে থাকে।

রেনাল্। কিন্তু, কর্তা—

পলো। এ সব করিবে কেন ?

রেনাল্। ঠিক তাই ; সে কথা বলেন যদি, শুনি।

পলো। ঠিক ঠিক, উদ্দেশ্যটা বলি তবে শোন।
আমার বিশ্বাস,—
এ পথে উদ্দেশ্যসিদ্ধি স্থির সুনিশ্চিত।
আমার ছেলের ত্রুটী ছোটখাট ত্রুটী,
যেন কোন শুভ্র বস্ত্রে ময়লা ধরেছে কিছু,—

বুঝলে তো? কিন্তু সেই কথায় কথায়
শ্রোতার পেটের কথা পারিবে জানিতে;
সে যদি চিনিতে পারে আমার ছেলেকে,
জানা যদি থাকে তার ঐ সব দোষ,
তখনি সে প্রাণ খুলে বলিবে তোমায়—
'ঠিক বাবু, সাচ্ দোস্ত, ঠিক মহাশয়'
যে দেশের সম্বোধনে যেমন দস্তুর।

রেনাল্। ঠিক বলেছেন।

পলো। তার পরে, সে তখন, হ্যাঁ, তখন সে,—
কি কথাটা বলছিলাম? কি যেন,—
দূর কর,—শেষের কথাটা কি?

রেনাল্। 'প্রাণ খুলে', তবে 'সাচ্ দোস্ত,' 'ঠিক মহাশয়'।

পলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রাণ খুলে, প্রাণ খুলে বলিবে—তোমায়
ছোকরাকে জানি আমি,
কালই দেখিয়াছি তারে,
অথবা বলিবে—দেখেছি অমুক দিন,
অমুক অমুক স্থানে জুয়া খেলিতেছে,
কিংবা করিতেছে সুরাপান,
টেনিস খেলার পরে মেতেছে কলহে,
বুঝলে এখন? তোমার মিথ্যার টোপে
ধরা প'ড়ে যাবে সত্যের পোনাটি।
জ্ঞানবৃদ্ধ বুদ্ধিমান আমরা এ ভাবে
বাঁকা পথে সিধা পথ করি আবিষ্কার,
চালে চালে বাজিমাৎ করি।
সুতরাং যে নির্দেশ উপদেশ দিলাম তোমায়
সেই পথে পাবে ঠিক ছেলের সংবাদ।
এবার তো বুঝেছ কথাটা!
না, এখনও বোঝ নি?

রেনাল্। হুজুর, বুঝেছি এইবার।
পলো। বেশ, বেশ, যেতে পার তুমি।
রেনাল্। প্রণাম হই প্রভু।
পলো। নিজ বুদ্ধি ব্যয় ক'রে বুঝিবে তাহারে।
রেনাল্। তাই হবে।
পলো। চলুক সে আপন খেয়ালে।
রেনাল্। ঠিক কথা, কর্তা।
পলো। এস তবে।

[রেনাল্ডোর প্রস্থান ও ওফেলিয়ার প্রবেশ]

এ কি, ওফেলিয়া? ব্যাপার কি?
ওফে। পিতা, পিতা! পেয়েছি বিষম ভয়!
পলো। সে কি? ভয়টা কিসের?
ওফে। সূচীকর্মে লিপ্ত ছিনু নিজ কক্ষ মাঝে,
সহসা কুমার হ্যামলেট উপস্থিত হইল সম্মুখে।
জামার বোতামগুলো খোলা, টুপি নেই শিরে,
অবাঁধা নোংরা মোজা ঝুলিয়া ঠেকেছে গোড়ালিতে,
বিষম ফ্যাকাশে মুখ,
হাঁটুতে ঠেকিছে হাঁটু ঠক্ ঠক্ ক'রে;
চোখে মুখে কি একটা ভাব—
নরক হইতে যেন সদ্য ছাড়া পেয়ে
কহিতে এসেছে তারই বীভৎস কাহিনী!
পলো। তা হ'লে তোমারি প্রেমে উন্মত্ত হ'ল কি?
ওফে। তা জানি না পিতা,
কিন্তু আমি সত্য সত্য হইয়াছি ভীত।
পলো। এসে কি বলিল?
ওফে। দৃঢ়ভাবে হাত ধ'রে দাঁড়াল আমার;
পরক্ষণে খানিকটা হ'টে
অন্য হাত এইভাবে রাখিয়া কপালে

নিরীক্ষণ করিতে লাগিল মোর মুখ
যেন সে আঁকিবে তার ছবি।
বহুক্ষণ কেটে গেল ;
অবশেষে মোর হাতে ধীরে ঝাঁকি দিয়ে
ফেলিল সে দীর্ঘশ্বাস করুণ গভীর ;
মনে হ'ল সেই শ্বাসে
ফেটে গিয়ে সারা দেহ
জীবনান্ত হ'ল বুঝি তার।
তার পরে ছেড়ে দিল মোরে।
পিছু ফিরে, ঘাড় বাঁকাইয়া
ধীরে ধীরে চ'লে গেল দ্বার-অভিমুখে,
সম্মুখের পথপানে না চাহি বারেক
আপন চোখের আলো ফেলি মোর মুখে।

পলো। চল, আমার সঙ্গেই চল ;
যেতে হবে রাজ-সন্নিধানে।
এরই নাম প্রেমোন্মাদ ;
চিত্তের বিভ্রান্তিকর যত রিপু আছে
লঙ্ঘিয়া আপন সীমা ঘটায় যা বহু অঘটন,
এও হ'ল তারই অন্যতম।
বড়ই দুঃখের কথা।
সম্প্রতি কঠিন বাক্য বলেছ কি তারে ?

ওফে। না পিতা ; তবে, যেমন আদেশ ছিল তব
চিঠি দিলে দিতেছি ফিরায়ে,
সাক্ষাতেরও অনুমতি দিই নাই আর।

পলো। তাই সে পাগল হ'য়ে গেল।
দুঃখ হইতেছে ;
সাবধানে যথেষ্ট বিচারবুদ্ধিযোগে
ভাবি নাই পূর্বে এ কথাটা।

ভেবেছিনু, এ তাহার খেলা ও খেয়াল,
সর্বনাশ ঘটাবে তোমার।
হায় মোর অভিশপ্ত স্নেহ!
কিন্তু এ যে বয়সের ধর্ম;
তরুণ যেমন বেপরোয়া,
বৃদ্ধেরা তেমনি হয় অতিসাবধানী।
চল, রাজার নিকটে যাই।
এ কথা জানাতে হবে।
প্রকাশ কারলে প্রীতি হারাবার ভয়,
গোপন করিলে হবে বিপদ নিশ্চয়। [প্রস্থান]

২য় দৃশ্য। দুর্গপ্রাসাদের একটি কক্ষ।

[রাজা, রাণী, রোজেন্‌ক্রান্‌জ, গিলডেন্‌স্টার্ন এবং সহচরগণের প্রবেশ]

রাজা। এস হে রোজেন্‌ক্রান্‌জ, এস গিলডেন্‌স্টার্ন,
তোমরা একান্ত প্রীতিভাজন আমার।
বহুদিন ইচ্ছা ছিল দেখি তোমাদের।
তা ছাড়া বিশেষ প্রয়োজনও
সহসা হয়েছে উপস্থিত;
তাই এই জরুরী আহ্বান।
অবশ্যই শুনেছ তোমরা
হ্যামলেটের পূর্ণ ভাবান্তর;
কি বাহিরে কি অন্তরে
সে যা ছিল, আজ সে তা নয়।
পিতার দেহান্ত ছাড়া, এমন কি ঘটিল কারণ
যা হতে সে আত্মবোধ ফেলিল হারায়ে
সে কথা আমার স্বপ্নাতীত।
তোমরাই বাল্যবন্ধু,
স্বভাব প্রকৃতি তার জান ভাল মতে;

তাই মোর অনুরোধ, আরও কিছুদিন
দুইজনে থেকে যাও রাজসভা মাঝে।
সঙ্গ দিয়ে, আমোদ-আহ্লাদে চিত্ত করি আকর্ষণ
যদি কোনক্রমে কিছু কুড়াইয়ে পাও
তাহার মনের কথা,
কী সে ব্যথা মোদের অজ্ঞাত,
প্রতিকার আমাদের সাধ্যায়ত্ত কিনা!

রাণী। প্রায়ই সে কহিয়া থাকে তোমাদের কথা;
আমি জানি তোমাদের দুজনের মত
অন্য কোন বন্ধু তার নাই।
সদিচ্ছা ও প্রীতিবশে আরও কিছুদিন
রাজ-পরিবারে থেকে, পূর্ণ কর যদি
আমাদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ও আশা,
তা হ'লে কৃতজ্ঞ হব মোরা।

রোজেন। আপনারা রাজা-রাণী, মোরা বাধ্য প্রজা;
রাজ-অভিপ্রায়ই রাজাদেশ।

গিলডেন্। সেবকের অসংকোচ সেবা
শ্রীচরণে করিয়া অর্পণ
রাজাদেশ পালিব নিশ্চয়।

রাজা। ধন্যবাদ রোজেন্‌ক্রান্‌জ, সাধু গিলডেন্‌স্টার্ন!

রাণী। ধন্যবাদ গিলডেন্‌স্টার্ন, সাধু রোজেন্‌ক্রান্‌জ!
করি অনুনয় এখনি সাক্ষাৎ কর
আমার বিকৃতমতি পুত্রের সহিত।
সঙ্গে কেহ যাও,
নিয়ে যাও দুইজনে হ্যামলেটের কাছে।

গিলডেন্। ঈশ্বর-ইচ্ছায়—
আমাদের সঙ্গ যেন আনন্দই দেয়
কার্যে যেন সাহায্য করিতে পারি তাঁরে।

রাণী। তাই যেন হয়।

[রোজেন্‌ক্রান্‌জ, গিলডেন্‌স্টার্ন ও কয়েকজন সহচরের প্রস্থান]

[পলোনিয়সের প্রবেশ]

পলো। মহারাজ, নরোয়ে হইতে দূত সানন্দে ফিরিল।

রাজা। সব শুভ সংবাদের জনকই আপনি।

পলো। তাই নাকি ? সবিনয়ে করি নিবেদন,
আমার জীবন আর কর্তব্য আমার
সমভাবে সমর্পিত ভগবৎপদে
আর রাজার চরণে।
এ মাথার শক্তি ছিল, পথচিহ্ন ধ'রে
পাইত সে শিকারের নির্ভুল সন্ধান ;
সে শক্তি এখনো যদি থাকে, তবে বলি,
হ্যামলেট উন্মাদ কেন
পেয়েছি আসল হেতু তার।

রাজা। বলুন, বলুন ; ও-কথা জানিতে আমি একান্ত উৎসুক।

পলো। প্রথমে আসুন রাজদূত ;
আমার সন্দেশ দিয়ে সে আনন্দভোজে
মধুরেণ সমাপিত করিব তখন।

রাজা। সসম্মানে দূতদ্বয়ে আনুন এখানে। [পলোনিয়সের প্রস্থান]
প্রিয়তমে গার্‌ট্রুড্‌!
ও তো ব'লে গেল পাইয়াছে সুনিশ্চিত
তোমার পুত্রের চিত্তবিকৃতির মূল।

রাণী। মূল তো জানাই আছে ;
জনকের মৃত্যু আর এত দ্রুত বিবাহ মোদের।

রাজা। বেশ, নেড়ে-চেড়ে দেখা যাক।

[ভল্‌টিম্যান্‌ড ও কর্নিলিয়সকে লইয়া পলোনিয়সের প্রবেশ]

স্বাগত হে বন্ধুগণ!
তুমি বল ভল্‌টিম্যান্‌ড্‌ কি সংবাদ নরোয়েরাজের ?

ভলৃটি। ভবদীয় শুভেচ্ছা ও প্রীতিবিনিময়ে
নিবেদন করিলেন প্রীতি-শুভেচ্ছাই।
প্রথম দর্শনে তখনি আদেশ গেল
কুমারের প্রতি, বন্ধ কর সৈনিক সংগ্রহ।
তিনি জানিতেন,—
পোলদের সহযুদ্ধে এই সৈন্যসাজ ;
পরে বুঝিলেন,
আপনারই বিরোধিতা উদ্দেশ্য তাহার।
দুঃখ করিলেন,—
বার্ধক্য ও ব্যাধি তাঁরে করিয়াছে এমনই দুর্বল
সবাই সুযোগ নেয় তার।
যাই হোক, নির্দেশ তাঁহার
ফর্টিন্‌ব্রাস করেছে পালন।
লভিয়া রাজার তিরস্কার
শপথ সে করিয়াছে পিতৃব্যের কাছে—
আপনার বিরুদ্ধে সে অস্ত্র কভু
ধরিবে না আর।
তাই শুনে বৃদ্ধ রাজা মহা আনন্দিত,
ভ্রাতুষ্পুত্রে লিখিয়া দিলেন জায়গীর
ত্রিসহস্র মুদ্রা যার বাৎসরিক আয় ;
পুনশ্চ দিলেন অধিকার
পূর্বসংগৃহীত সৈন্য ল'য়ে
পোলদের আক্রমণ করিতে সে পারে।
এই পত্রে (পত্র দিলেন) আছে অনুরোধ,
অবশ্য সম্পত্তি পেলে,
আপনার রাজ্য হয়ে যাবে সে বাহিনী।
এ দেশের নিরাপত্তা কি কি শর্তে
হইবে রক্ষিত তাহাও সঠিক লেখা আছে।

রাজা। সমস্তই সন্তোষজনক।
সময় বুঝিয়া এই লিপি পাঠ করি
দিব প্রত্যুত্তর; আমাদের কি কর্তব্য
তাও হবে স্থির। সার্থক হয়েছে শ্রম,
লও ধন্যবাদ। করগে বিশ্রাম;
রাত্রে একসাথে মোরা করিব আহার।
পুনরায় জানাই স্বাগত।
[ভল্‌টিম্যান্‌ড ও কর্নিলিয়সের প্রস্থান]

পলো। এ ব্যাপার সুসম্পন্ন।
মহারাজ, মহারাণী, কারে বলে রাজ-আভিজাত্য,
কর্তব্য কাহাকে কহে, দিন কেন দিন,
রাত্রি রাত্রি কেন,
কালেরে কেন বা কাল বলি,
এ সবের নিরূপণে আলোচনা করা
শুধু অপব্যয় করা দিন রাত্রি কাল।
অতএব, যেহেতু সংক্ষেপে বলা বিজ্ঞতার প্রাণ,
শ্রান্তিকর দৈর্ঘ্য শুধু প্রত্যঙ্গ তাহার,
কিংবা অলঙ্কার, সংক্ষেপেই কব আমি।
গুণবান পুত্র তব হয়েছে উন্মাদ।
উন্মাদই বলিব তারে; যেহেতু,
উন্মাদ হওয়া ছাড়া উন্মাদের কি আর অভিধা?
যাক, তাও যাক।

রাণী। অলঙ্কার কম ক'রে সত্যটা বলুন।

পলো। দিব্য ক'রে কহি দেবি,
নহে ইহা মিথ্যা অলঙ্কার।
উন্মাদ সে, সত্য ইহা।
সত্য ইহা, দুঃখ ইহা;
দুঃখ, তাই সত্য ইহা।

হাস্যকর শব্দরীতি হ'ল ?
যেতে দিন, রচিব না মিথ্যা অলঙ্কার।
তা হ'লে সিদ্ধান্ত হ'ল এই—উন্মাদ সে।
এখন দেখিতে হবে, এ ফলের মূল কোথা ?
বলিতেও পারি—
এই কুফলের মূল কোথা ?
যেহেতু, নিশ্চয়
মূল হতে ফলিয়াছে এ কুফল ফল।
আমরা এসেছি এতদূর ;
এইবার করুন বিচার।
আমার একটি কন্যা আছে,—
আছে অর্থ, যতক্ষণ আছে সে আমার,—
কর্তব্য ও আদেশানুসারে
সে আমায় দিয়াছে এখনি।
এইবার ভাবুন, করুন অনুমান।
(পাঠ করিলেন)
"দেবীরূপা ওফেলিয়া, প্রাণের পুত্তলি
অপ্সরাবিনিন্দী প্রতিমাষু"—
এ একটি কুভাষণ, কুৎসিত বচন,
"অপ্সরাবিনিন্দী প্রতিমাষু"
অতিশয় নিন্দার্হ রচনা।
তার পরে—
(পাঠ করিলেন)
"অপরূপ শুভ্রবক্ষে তার এই সব"—ইত্যাদি।

রাণী। হ্যামলেটে লিখেছে তাকে ?

পলো। কিছু ধৈর্য ধরুন আপনি,
সবটাই করি পাঠ।
(পাঠ করিলেন)

"সন্দেহ করিতে পার তারা অগ্নিময় ;
সন্দেহ করিতে পার তপনেরও গতি,
সন্দেহ করিও সত্য মিথ্যা কথা কয়,
সন্দেহ ক'রো না মোর এ প্রেমের প্রতি।
প্রিয়তমা ওফেলিয়া, আমার ছন্দ দুর্বল,
মর্মবেদনা প্রকাশের ভাষা আমার অজ্ঞাত,
কিন্তু তুমিই আমার প্রিয়তমা প্রিয়া ;
অয়ি শ্রেষ্ঠতমা, এ কথা বিশ্বাস করিও।
বিদায়!

তোমারই চিরানুরক্ত যন্ত্রতুল্য
হ্যামলেট।"

এই পত্র কন্যা মোর আদেশানুযায়ী
দেখাইল মোরে ; উপরন্তু সব কথা
শ্রুতিগত করিল আমার,—
কবে, কোথা, কি প্রকারে,
পাইল সে প্রেমনিবেদন।

রাণী। কিন্তু কন্যা তব
কি ভাবে সে সেই প্রেম করিল গ্রহণ ?

পলো। আমাকে কেমন লোক জানেন আপনি ?

রাজা। আপনাকে বিশ্বাসী ও ন্যায়নিষ্ঠ জানি।

পলো। সেই পরিচয়ই দিতে চাই।
তখনও শুনি নি কিছু কন্যামুখ হতে,
দেখিলাম, দৃঢ় পক্ষভরে সমুড্ডীন হইয়াছে প্রেম।
সে সময় রহিতাম যদি
জড় পত্রাধার সম নীরব নিশ্চল
কিংবা মূক বাক্যহীন, চক্ষের ইঙ্গিতে
নিরস্ত করিয়া দিয়া অন্তর আমার
রহিতাম যদি আমি পূর্ণ উদাসীন,

তা হ'লে কি ভাবিতেন আপনি আমায় ?
এই মহীয়সী রাণী,
তিনিও কি ভাবিতেন মোরে ?
তা না ক'রে,
তখনি সুচারুভাবে আরম্ভিনু কাজ ;
কন্যারে ডাকিয়া কহিনু সতর্ক বাণী—
"রাজপুত্র হ্যামলেট, তব ভাগ্যাতীত তিনি,
এ সব হবে না কোন মতে।"
তারপরে দিলাম নির্দেশ—
"দূরে থেকো তাঁর পথ হতে,
কোন দূতে দিও না সাক্ষাৎ,
নিও নাকো কোন উপহার।"
নির্দেশ পাইয়া মোর
দুহিতা তা করিল পালন।
ওদিকে কুমার হয়ে ব্যর্থমনোরথ,
সংক্ষেপেই বলি,—
প্রথমে বিমর্ষ, পরে উপবাস,
তা হতে অনিদ্রা, ক্রমে দুর্বলতা,
ক্রমে লঘুমস্তিষ্কতা,
এই ভাবে ধাপে ধাপে নেমে
উন্মাদ হইয়া এবে বকিছে প্রলাপ।
এ সকলি আমাদেরও বিলাপের হেতু।

রাজা। এটা কি সম্ভব মনে কর ?

রাণী। হতে পারে, অসম্ভব নয়।

পলো। নিবেদন করি—
এমন কি ঘটেছে কখনও
আমি যদি ব'লে থাকি 'হয়',
'নয়' হয়ে গেল তাহা ?

রাজা। তা কভু হয় নি
পলো। এবারও যা বলিলাম অন্যথা হইলে
এটা হতে ওটাকে নেবেন।
(নিজের স্কন্ধ ও মাথা দেখাইয়া)
সূত্র যদি পাই
সত্য যদি ধরাকেন্দ্রে রহে লুকাইয়া
খুঁজে তারে করিব বাহির।
রাজা। কোন্ পথে করি এর পরীক্ষা সঠিক ?
পলো। অবগত আছেন আপনি,—
সমস্ত প্রহর ধরি কখনো কখনো
অলিন্দের 'পরে তিনি করেন ভ্রমণ।
রাজা। তা সে করে বটে।
পলো। তেমনি সময়ে, কন্যারে ছাড়িব তাঁর কাছে।
আপনি ও আমি রহিব পর্দার পিছে;
লক্ষ্য রেখে যাব উভয়ের আচরণ।
কুমার কন্যারে যদি না বাসেন ভাল,
প্রেমই যদি নাহি হয় উন্মাদ-নিদান,
রাজসচিবের কার্য ছেড়ে দিয়ে তবে
চাষ-বাস ক'রে খাব।
রাজা। বেশ, এই পরীক্ষাই করা যাবে।
রাণী। দেখ দেখ, পাঠরত বিষণ্ণবদন
আসিছে দুর্ভাগা ওই।
পলো। চ'লে যান, উভয়েই চ'লে যান
করি অনুরোধ।
আমি তাঁরে ঠেকাই এখন।
[রাজা, রাণী ও অনুচরগণের প্রস্থান]

[ক্রমশ]

অনুবাদ॰ শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

পাগ্‌লা-গারদের কবিতা

(পাগলা-গারদে অবস্থানোচিত অবস্থায় রচিত)

কোনো ? ! ; : । ?......!!! কবির প্রতি

কে গো তুমি বারে বারে প্রাত্যহিক আকাশের মত
অগাণত গণনার প্রান্তে ব'সে কর চক্রমণ ?
ইস্পাতের নীল বুকে গোষ্পদের প্রতিধ্বনি হয়েছে বিগত,
লগ্ন এলো বিশ্রামের, শ্রম ছাড়ো হে মহা শ্রমণ !

খেঁকি কুকুরের সাথে খেঁকশিয়ালের আড়াআড়ি
লেখা আছে ইতিহাসে, ভূগোলের পত্র ঝরে তবু।
বাঁশরীর সপ্তস্বর স্বপ্ত বাঁশে করে বাড়াবাড়ি,
নস্য টানে হবুরাজা, হেঁচে মরে মহামন্ত্রী গবু।

এসো তবে নিরালায়, নাড়ী দেখি আমি কাত্যায়ন,
কিম্বা এসে জনতার কোলাহলে করো কোলাকুলি।
বাতায়নে কুলাবে না, তোমা লাগি' চাহি বাত্যায়ন,
মন্ত্রহারা মহাদেব, কণ্ঠে ধরো ভৈরবী মাদুলি।

গাধারে কাঁদালে যদি হাতীবক্ষে সুড়সুড়ি লাগে,
ফলের লাগিয়া যদি আনমনে কাঁদে ফুলদানি,
ধ্বনি যদি পিছু নেয়, প্রতিধ্বনি চলে আগে আগে
তবু যে দানব-কণ্ঠ কানে ধ'রে হানে দৈববাণী।

অমৃতের পুত্র ঢালে বিষবৃক্ষ-মূলে আঁখিজল,
নন্দন-উদ্যান কোথা ? সাহারার বেড়েছে কি বালু ?
পিয়ানোর কাব্য এসে বীণারে কি করিবে বিফল ?
পটলি দাপটে আহা নিরালায় কাঁদিবে কি আলু ?

হাতের হাতুড়ি খ'সে সূত্রহারা হ'লো সূত্রধর,
নৈর্ব্যক্তিক ব্যঞ্জনায় ব্যর্থ হ'ল নিরুক্ত আভাস।
দুস্তর সাগর-তলে স্তরে স্তরে জমিছে প্রস্তর,
উর্ধ্বে আকাশের ক্ষেতে অনন্ত নীলের নিত্য চাষ॥

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

চিড়িয়াখানা

(৪৬৪ পৃষ্ঠার পর)

বখশিশ ইত্যাদি পায় কখনও কখনও, পোশাক-আশাকও দেন ভুজঙ্গ চৌধুরী। শোফার-সমাজের কুলাঙ্গার রৌশনলাল—বিড়ি-সিগ্রেট-চুরুট-তামাক খায় না, পান করে না মদ্য, যায় না ঘোড়দৌড়ে, মারে না আড্ডা। গাড়ি চালিয়ে, স্নান-আহার-ক্ষৌরকর্ম-নিদ্রা-প্রেমোপন্যাসপাঠ-প্রাতর্সান্ধ্যকৃত্যাদি অবশ্যকরণীয় কাজকর্ম ক'রে বাকি সময়টা অহোরাত্র সে রোশনীর স্বপ্ন দেখে চোখ মেলে মেলে। রোশনী তার কাছে ছ-পাই মানবী আর সাড়ে-পনেরো-আনা কল্পনা। রবি-ঠাকুরী কায়দায় মানবী আর কল্পনায় আধা-আধি বখরা নয়। রোশনীর আধ ইঞ্চি হাসিকে সে স্বপ্নের সাঁড়াশি দিয়ে টেনে টেনে আড়াই ফুট লম্বা করে, আর তার ওপর মোনালিসার রঙ চড়ায়।

রোশনীর এবারের চিঠিখানা আড়াই পাতা লম্বা, আবেগে এত বোঝাই যে হজম করতে বেগ পেতে হচ্ছে। চিঠির প্রেম-গদগদ অন্তিম অনুচ্ছেদটি পাঠ ক'রে দুটি চোখ প্রেম-ছলছল হয়ে উঠল রৌশনলালের। রৌশন-প্রেম-পাগলিনী রোশনীর মুখচ্ছবি চোখের সামনে কল্পনা ক'রে নিয়ে সপ্রেম স্নেহভরে এবং সস্নেহ প্রেমভরে রৌশনলাল বললে, পগলী কহীঁকা!

চমকে উঠলাম চিড়িয়াখানার ভেতরে চম্পটী-কণ্ঠে এর তর্জমা-প্রতিধ্বনি শুনে। অতুল চম্পটী হাঁ-হাঁ ক'রে ব'লে উঠল, আরে, আরে, করিস কি, করিস কি পাগলী কোথাকার ?

চেয়ে দেখি, এক বুড়ী ভুজঙ্গ চৌধুরীর পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে মাথা কুটে বলছে, দে বাবা, রাজা-বাবা, এই গরিব দুখিনীকে কিছু উপুড়-হস্ত ক'রে যা বাবা। কেমন ক'রে ভুজঙ্গকে সে রাজা-বাবা ব'লে চিনতে পেরেছে চম্পটীর বাবাও তা জানে না।

পা ছিনিয়ে নিতে গিয়ে ভুজঙ্গ চৌধুরী টের পেলেন, তাঁর মোটা পায়ের চাইতে বুড়ীর রোগা হাতের জোর কম নয়, হস্ত উপুড় না করলে শোভনভাবে পা ছাড়িয়ে নেওয়া যাবে না। বুড়ী বলছে, সে মানৎ করেছিল তার ছেলের ব্যামো সারলে জোড়া পাঁঠা দেবে কালীঘাটে। ছেলেকে মা সারিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর পাওনা-গণ্ডা এখনও মেটানো হয় নি। তাই দে বাবা, একটা পাঁঠার দামও না দিস, অন্তত দুটো টাকা দিয়ে যা।

লম্বগ্রীব জিরাফ দেখতে দেখতে আনমনা হয়ে হঠাৎ এই বিপত্তিতে বিচলিত হয়ে উঠলেন ভুজঙ্গ চৌধুরী। মনে হ'ল, জিরাফটা যেন তাঁকে বেকায়দায় দেখে মনে মনে হো-হো ক'রে হাসছে। খস্ ক'রে এক টাকার একখানা নোট ফেলে দিতেই বুড়ীর হাত আলগা হয়ে গেল ভুজঙ্গ চৌধুরীর পা থেকে। বুড়ী চ'লে গেল অন্য পায়ের খোঁজে এক টাকার নোটখানা আঁচলে বেঁধে। দেখে বিধাতা অলক্ষ্যে হাসলেন, কিন্তু তাঁর অলক্ষ্য হাসিতে দমবার নয় বুড়ী। এক দল লোক যেখানে ছোট বড় ক্যাঙারুর তামাসা দেখছিল, সেইখানে গিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে হুকুম ঝরাতে লাগল—আমার সোয়ামী আজ দু মাস ব্যামোতে বিছানায় শুয়ে আছে। পয়সা অভাবে তার ওষুধ-পথ্যি করতে পারছি না। তোমরা এই দুখিনীকে কিছু কিছু সাহায্য কর বাবারা। বাবারা তখন ক্যাঙারুদর্শনে মশগুল, আর রাজা-বাবা কেউ নেই তাদের ভেতর। বুড়ী তাড়া খেয়ে হ'টে গেল।

জানি, এ বুড়ী মাঝে মাঝে আসে চিড়িয়াখানায়, এসে চিড়িয়া দেখে আর করুণকাহিনীর অভিনয় শুনিয়ে পয়সা কামায়। নিজের জন্যে একটি আধলা কোনদিন চায় না বুড়ী—দান-ভিক্ষা করে কোনদিন পুত্র, কোনদিন বিধবা কন্যা, কোনদিন স্বামী, কোনদিন বা বিধবা মুমূর্ষু পুত্রবধূর জন্যে। কিন্তু বুড়ী জানে না আমি জানি বুড়ীর কেউ নেই, কে—উ নেই। ছেলে, বউ, মেয়ে সব মরেছে। আধ-মরা বিবাগী সোয়ামী কোথায় চ'লে গেছে; ঠিকানা রেখে যায় নি, ফিরেও আসে নি। এতদিনে হয়তো বুড়ীকে সে বিধবা করেছে অথবা হয়তো করে নি। এই দু-নম্বর 'হয়তো'টাকেই 'নিশ্চয়' ভেবে নিয়ে বুড়ী বৈধব্যের মুখে তুড়ি মেরে সিঁদুরী-সাধব্য ঘোষণা ক'রে চলেছে ললাটে সিঁথিতে। এবং যারা তার নেই, তাদেরই অস্তিত্ব ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঘোষণা ক'রে চলেছে, নিজের অস্তিত্বের খোরাক সংস্থানে।

ভগবানের হাতস্থ টিফিন-ক্যারিয়ার থেকে হালকা মিঠে গন্ধ এসে খোঁচা মারছিল অতুল চম্পটীর নাকের ভেতর। সে খোঁচায় উদাস হয়ে উঠল চম্পটীর মন। চম্পটী শুধালে, আপনার ঘড়িতে কটা বাজল হুজুর?

হুজুর ভুজঙ্গের হাতঘড়ি ছিল পাঞ্জাবির চুড়িদার হাতার ঝাপসা আড়ালে, আড়াল ঘুচিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন চম্পটীর দিকে। নীরব ইশারায় বললেন,

দেখে নাও হে চম্পটী, কটা বাজল। প্রশ্নের জবাব দেওয়াকে কৈফিয়ৎ দেওয়ার সামিল মনে করেন ভুজঙ্গ চৌধুরী। আর কৈফিয়ৎ দিয়ে খানদানের ঝাণ্ডা নিচু করবার ছেলে তিনি নন।

হুজুরের হাতঘড়িতে সময় দেখে বিচলিত হয়ে বিচলিততর কণ্ঠে অতুল চম্পটী সবিনয় নিবেদন জানালে, এই বেলা কিছু খেয়ে নিন হুজুর। নিবেদনী কায়দায় হুকুম করতে চম্পটী অদ্বিতীয়। তারপর ভগবানকে বললে, চাদরটা এই গাছতলে পেতে ফেল হে ভগবান। বেশ ছায়া আছে এই-খানটায়। ওপর দিকে চেয়ে ইতিমধ্যে তার দেখা হয়ে গেছে গাছের ডালে কোন পাখি নেই যে, আপন দেহ থেকে সহসা কিছু ত্যাগ ক'রে নীচে ভোজ-ভণ্ডুল ঘটাতে পারে। ভগবানের নিজের অন্তরের তাগিদও যে ছিল না, এ কথা বলা যায় না; তাই সবুজ ঘাসের ওপর চট্ ক'রে সাদা চাদর বিছানো হয়ে গেল।

হুজুর খুব জাঠরিক তাগিদ বোধ করছিলেন না। কেন না, প্রথমত প্রাতঃরাশ খাবার বেলায় মোটেই আজ রাশ টানেন নি; দ্বিতীয় কারণটা মানসিক। তাই বললেন, পরেই হবে 'খন। এত ব্যস্ত হবার কি চম্পটী?

জিভে কামড় দিয়ে চম্পটী বললে, ছি ছি, সে কি কথা হুজুর! ব্যস্ত হব না তো কি? আগেই আমার খেয়াল করা উচিত ছিল। আপনাদের কি আর আমাদের মত চাষাড়ে পেট হুজুর যে, ভোর থেকে ইস্তক এক পেয়ালা চা পর্যন্ত না পড়লেও চোঁ-চোঁ করবে না?

সে কি? এক পেয়ালা চা-ও এখন পর্যন্ত মুখে দাও নি চম্পটী?—ব্যথামুখর জিজ্ঞাসা ভুজঙ্গ চৌধুরীর।—আমি যে বলেছিলাম, তোমার ভোরের কাজ-টাজ সেরে বাড়ি ফিরে চান-টান ক'রে ঠাণ্ডা হয়ে তারপর আমার কাছে আসবে সাড়ে দশটা এগারোটা নাগাদ—

চম্পটী বললে, চান ক'রে ঠাণ্ডা হয়েছিলাম হুজুর, কিন্তু চা খেয়ে গরম হবার আর সময় ছিল না। এগারোটার ভেতর আপনার এখানে পৌঁছুবার কথা কিনা! কথার খেলাপী হওয়া চম্পটীর ধাতে নেই, তাতে চা খাওয়া হোক আর না-ই হোক।

ভারি লজ্জার কথা হে চম্পটী। এস, তবে এখুনি বসা যাক।

জোর ক'রেই বসালেন চম্পটীকে চাদরের ওপর। চম্পটী যাচ্ছিল ঘাসের ওপর বসতে। কেন? না, হুজুরের সঙ্গে কি আর একসঙ্গে বসা চলে? চাঁদের সঙ্গে এক চাদরে বসবে কেরোসিন কুপি? চাঁদ তখন জেদ ক'রে রেড়ির তেলের মেটে প্রদীপকেও সঙ্গে বসালেন।—ঘাসে নয়, ঘাসে নয় রে ভগু। পাশে আয়। জায়গার অভাব নেই সাদা চাদরে। যাঁহা সবুজ তাঁহা সাদা। আমরা সবাই এক চিড়িয়াখানার চিড়িয়া হে চম্পটী।

এক চিড়িয়াখানার তিন চিড়িয়া কাছাকাছি বসল এক চাদরে। টিফিন-ক্যারিয়ারের ভেতরের জিনিস বাইরে এসে সদ্ব্যবহৃত হতে লাগল। ড্রাইভার রৌশনলালের টিফিন আলাদা ক'রে গাড়িতে দেওয়া আছে। তার ব্যবহার তখনও শুরু করে নি রৌশনলাল। রোশনীর মূল প্রেমপত্র পড়া শেষ ক'রে সে তখন তার "পুনশ্চ" পড়ছে শেষ পৃষ্ঠার তলানিতে। রোশনী লিখেছে—এমনিতেই রৌশনলালের বিরহে মন তার অহোরাত্র কাঁদে, তার ওপর সম্প্রতি রোশনীর বাবা মাত্র দু শো টাকা দেনার দায়ে মুশকিলাপন্ন; অথচ এমন কোন মুশকিল-আসান দরদী দোস্ত নেই যে, এই টাকা কটা মনিঅর্ডার ক'রে পাঠিয়ে দিতে পারে। ছলছল চোখে রৌশনলাল রুমাল বুলিয়ে নিলে। কালই দু শো টাকা রৌশনলালের ব্যাঙ্কের জমা থেকে বেরিয়ে রোশনীর বাবার নামে রওনা হয়ে যাবে। আজ ব্যাঙ্ক বন্ধ। হায়! আজ ব্যাঙ্ক বন্ধ! দুঃখ ভোলবার জন্য সঙ্গে আনা প্রেমের উপন্যাসখানা পড়তে লাগল রৌশনলাল। তবু থেকে থেকে তার মনে হতে লাগল, দু শো টাকার অভাবে রোশনীর বাবা বিপন্ন।

কিন্তু চিড়িয়াখানার মাঠে পাতা চাদরের মাঝামাঝি ব'সে ভুজঙ্গ চৌধুরী ভাবছিলেন আজকের মিঠে পরিকল্পনাটা মাঠে মারা গেল। প্রফেসর ট্যালপেট্রোর গ্রেট রয়েল বেঙ্গল সার্কাস দেখতে যেতে এক কথায় রাজী হয়েছিল মিস্ সানন্দা সান্যাল; ভুজঙ্গ ধ'রে নিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে চিড়িয়াখানায় আসতেও রাজী হবে। প্রাইভেট সেক্রেটারি হয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের অনুরোধকে তুড়ি মারতে আর ভরসা পাবে না, নরম যে হয়ে এসেছে তা তো সার্কাসযাত্রার সঙ্গিনী হওয়াতেই বোঝা গেছে। কিন্তু না। চিড়িয়াখানায় আসতে সে রাজী হয় নি। সোজা ব'লে দিয়েছে, তার সময় হবে না। অথচ এদিকে তার আগেই ভুজঙ্গ চৌধুরী ব'লে বসেছিলেন, কাল ছুটির দিনটা

চিড়িয়াখানা দেখব হে রৌশনলাল। আর রৌশনলাল বলেছিল, যো হুকুম সাহেব। তাই আসতেই হয়েছে চিড়িয়াখানায়। সঙ্গিনী হয় নি সানন্দা, সঙ্গী ক'রে নেওয়া হয়েছে অতুল চম্পটীকে। খুশি হয়ে সঙ্গী হয়েছে অতুল চম্পটী। কেন না, তার মনের চৌবাচ্ছায় সাঁতার কাটছে মতলবের পুঁটিমাছ।

ভুজঙ্গের পাশে ব'সে সঙ্কুচিত ভঙ্গীতে খেতে খেতে চম্পটী বললে, কত পুণ্যি করেছিলেম জানি না হুজুর, কিন্তু ঢের অপরাধ জমা হচ্ছে জানি।

কুমারী সানন্দা সান্ন্যালের অমার্জনীয় অপরাধের কথা মনে ক'রে ভুজঙ্গ চৌধুরী বললেন, কিছু না, কিছু না চম্পটী। তুমিও যা, আমিও তা। তলিয়ে দেখলে মানুষে মানুষে কোনও ভেদ নেই। মাথায় গাঁট্টা মারলে তোমারও লাগবে, আমারও লাগবে। চায়ে চিনি তোমারও চাই, আমারও চাই—যদি না ডায়েবিটিস থাকে; শুধু এক-আধ চামচ এদিক আর ওদিক। জ্বর হ'লে তোমার টেম্পারেচার ওঠে, আমারও ওঠে। শীত তোমার আমার দুয়ের কাছেই ঠাণ্ডা, গ্রীষ্মিতে দুয়েরই গরম। ক্ষিদে পেলে খাওয়া আর তেষ্টা পেলে পান করা—এ তোমাকেও করতে হয়, আমাকেও করতে হয়।

কিন্তু হুজুর আপনারা ছিনিমিনি খেলেন রাজভোগ নিয়ে, আর আমাদের সময় সময় প্রজাভোগও জোটে না।—অনুদাত্ত কায়দায় চম্পটী বললে, আর আমাদের তেষ্টা সাদামাটা জলেই মেটে, কিন্তু আপনাদের তেষ্টা মেটাবার জন্যে যাদের বোতলে বসতি, তাদের সব কড়া কড়া বিলিতী নামে আমরা দাঁতও ফোটাতে পারি না হুজুর।—ব'লে হুজুরের আমীরী দেহ থেকে নিজের গরিবী শরীরটাকে সরিয়ে নেবার ভান একটু করলে অতুল চম্পটী। ভ্রূক্ষেপবিহীন ভগবান তখন আনমনে টিফিন খাচ্ছে। ভুজঙ্গ চৌধুরী তার হুজুর নয়, দাদাবাবু; আর মানুষে মানুষে সাম্য বা অসাম্য নিয়ে সে মাথা ঘামাবার দরকার বোধ করে না। মাঝে মাঝে দু-একবার পান-উচ্ছল উদার অবস্থায় ভুজঙ্গ ভগবানকে বলেছে, তোতে আমাতে কোনও তফাত নেই রে ভগু। আর ভগবান অম্লানবদনে বিনা দ্বিধায় সেই তফাতহীনতা মেনে নিয়েছে; বলেছে, সে তো বটেই দাদাবাবু। প্রতিবাদের নামগন্ধও আনে নি মনে বা মুখে। এ-হেন সব অপ্রতিবাদী পাঁঠার কাছে সাম্যবাদী তত্ত্ব আউড়ে আনন্দ মেলে না। আনন্দ পেলেন চম্পটীর কাছে, চম্পটীর বিনয়-বিগলিত বচনামৃতধারায়। এমন

সবিনয়-জোরালো-প্রতিবাদমুখর বশম্বদ বয়স্য থাকলে তার কাছে নিজের পরম ঐশ্বর্যকে পরম দৈন্যের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়ে পরমানন্দ মেলে। ভুজঙ্গ চৌধুরীর হৃদয়ের বৈঠকখানা পেরিয়ে একেবারে অন্দরমহলের অন্তরঙ্গ অতিথি হয়ে বসল অতুল চম্পটী।

ভগবান, ওরফে ভগু, ভুজঙ্গের কাছে জানোয়ার বা দেয়ালের সামিল। যে দেয়ালের কান আছে ব'লে শোনা যায় সে-জাতের দেয়াল নয়, আলাদা জাতের।

পুরো দিনটা চিড়িয়াখানায় না কাটিয়ে ফিরে গেলে খবর পেয়ে (আর পাবে তো নিশ্চয়) সানন্দে অট্ট-উপহাসি হাসবে সানন্দা। সানন্দা-সঙ্গ-হীনতা ভুজঙ্গ চৌধুরীর চিড়িয়াখানা-দর্শন-পরিকল্পনাকে জব্দ করতে পারে নি, এইটে প্রমাণ করবার জন্যেই বিকেলের আগে ফেরা চলবে না।

তুমি তো অনেক খবরই রাখ, অনেক কিছুই জান চম্পটী।—বললেন ভুজঙ্গ চৌধুরী, বল দেখি, অফিস ছুটির দিনে কোন ম্যানেজিং ডিরেক্টর যদি তার প্রাইভেট সেক্রেটারিকে বলে, আমার সঙ্গে অমুক জায়গায় যেতে হবে—এই ধর কোন পার্টিতে কিংবা অপর কোথা, তা হ'লে প্রাইভেট সেক্রেটারির কি 'না' বলার হক্ আছে? আফিসের চোহদ্দির বাইরে আর লাল তারিখগুলোতে কি প্রাইভেট সেক্রেটারির কোন ডিউটিই নেই?

চম্পটী বললে, তা হ'লে আর প্রাইভেটই বা কি হ'ল, আর সেক্রেটারিই বা কি হ'ল? প্রাইভেট সেক্রেটারিকে প্রাইভেটও হতে হবে, সেক্রেটারিও হতে হবে। তার আবার অফিসের ভেতর আর বার! তার আবার কালো তারিখ আর লাল তারিখ! প্রাইভেট সেক্রেটারি তো আর অর্ডিনারি কেরানী নয় হুজুর। বে-আদবি করলে হুজুর, অমন প্রাইভেট সেক্রেটারিকে সটান জবাব দেওয়া উচিত।

আনমনা উদাসভাবে ভুজঙ্গ চৌধুরী বললেন, কিন্তু জবাব দিলেও তার কাজের অভাব হবে না চম্পটী। এমন লোক আছে যে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে বিধাতার চাঁটির মত এক প্রকাণ্ড চিল এসে প্রচণ্ডবেগে ছোঁ মেরে ভুজঙ্গ চৌধুরীর হাতের সিকি-খাওয়া খাবারগুলো প্লেটসুদ্ধ ছড়িয়ে ফেলে দিল চিড়িয়াখানার অবুঝ সবুজ মাঠে।

আহা হা হা হা!—আর্তনাদ ক'রে উঠল অতুল চম্পটী। শালার কাণ্ডটা দেখলেন হুজুর? আপনার ভোগে লাগতে দিলে না, অথচ ওর নিজের ভোগেও লাগল না।

এমনই চিলের ভয়েই জবাব দিতে চাইলেও দেওয়া যায় না চম্পটী।—মনে মনে বললেন ভুজঙ্গ চৌধুরী তাঁর উল্টো অফিসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন. ডি. হোড়ের কথা ভেবে।

ভগবানের খাওয়া আগেই সাবাড় হয়ে গিয়েছিল। ভুজঙ্গ চৌধুরীর জোর করার ফলে অতুল চম্পটীকে শেষ পর্যন্ত খেতেই হ'ল। সপ্রতিবাদে খেল চম্পটী, চিল সম্বন্ধে প্রচুর হুঁশিয়ার হয়ে। খাওয়া শেষ ক'রে চম্পটী বললে, আপনার জন্যে হুজুর ওই রেস্টুরেণ্ট থেকেই বরং কিছু—

দরকার নেই চম্পটী। পেটে আর ঠাঁই নেই।

তেষ্টা যদি পেয়ে থাকে হুজুর, তা হ'লে সে ব্যবস্থাও বলেন তো—

ক্ষেপে গেলে না কি হে চম্পটী? তেষ্টা পেলে ফ্লাস্কের দিশী জলেই চলবে। এটা চিড়িয়াখানা হে চম্পটী, ভুজঙ্গ চৌধুরীর বাগানবাড়ি নয়।

এইবারে তা হ'লে বলি হুজুর, যদি নির্ভয় দেন।—বললে অতুল চম্পটী, ভোরে যে আজ বেরিয়েছিলাম সে আপনারই কাজে। তোফা একখানা বাগানবাড়ি জলের দামে পাওয়া যাচ্ছে হুজুর। শহরেরই উপকণ্ঠে, মোটরে গেলে মাইল বারোর পথ।

বাগানবাড়ি? বাগানবাড়ি দিয়ে কি হবে চম্পটী?

একাধিক বাগানবাড়িতে বহু নৈশ-বিহার এবং দৈন-বিহারে আজও যাঁর তৃষ্ণা মেটে নি, তিনি শুধাচ্ছেন—বাগানবাড়ি দিয়ে কি হবে! কিন্তু চম্পটী জানে, এই বাগানবাড়ি-বৈরাগ্যের বাণী বেরিয়েছে ভুজঙ্গের মুখ থেকে, বুক থেকে নয়। সোজা জবাব দিলে না প্রশ্নের। বললে, জীবনে অনেক বাগানবাড়ি দেখেছি হুজুর, কিন্তু এটির মত আর দেখি নি। মোগলাই আমীরী কায়দার ওপর এ যুগের রঙ-চড়ানো। চম্পটী বর্ণনায় ভবভূতির আর উপমায় কালিদাসের বাবা। কথার ফুলঝুরি দিয়ে রামধনু রঙে মন-পাগলানো ছবি এঁকে মায়াকাজল বুলিয়ে দিল ভুজঙ্গ চৌধুরীর চোখে। দুখানা মহাশৌখিন বাগানবাড়ি আছে ভুজঙ্গের, দুটোরই প্রচুর সদ্ব্যবহার করেন তিনি। কিন্তু

চম্পটীর চমক-লাগানো বর্ণনা শুনে তৃতীয় বাগানবাড়ির জন্য লোভাচ্ছন্ন হয়ে উঠল তাঁর অন্তরাত্মা।

দুখানা বাগানবাড়ি নিয়ে খোড়-বড়ি আর বড়ি-খোড় তো বেশ কিছুদিন ক'রে ক'রে জান হায়রান হয়ে উঠল হে ভুজঙ্গ, এইবারে তিন নম্বর হ'লে কিছুকাল খোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-খোড় চালাতে পারবে। বৈচিত্র্য, বৈচিত্র্য, বৈচিত্র্য চাই জীবনে হে, নইলে আত্মাটা যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে।

নিতেই হবে এই বাগানবাড়িটা। আজ চিড়িয়াখানায় আসবার যার সময় হয় নি, এই নতুন বাগানবাড়িতে মাঝে মাঝে নৈশ নিমন্ত্রণ রক্ষার সময় তার হতেই হবে। আর তা না হ'লে—

প্রাইভেট সেক্রেটারি বেয়াড়া হ'লে তাকে জবাব দেবার কথা বলছিলে না চম্পটী? কিন্তু তার শূন্য আসন পূর্ণ না হ'লে যে আমার চলবে না, সেটা ভেবে দেখেছ?

চম্পটী বললে, আজ্ঞে, দেখেছি। আর সে ব্যবস্থাও একরকম ক'রেই রেখেছি হুজুর। পছন্দসই মাল সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা না রেখে অতুল চম্পটী অমনি কথা কয় না। ঠিক যেমনটি চান হুজুর—প্রাইভেটকে প্রাইভেট, সেক্রেটারিকে সেক্রেটারি।

হাতের পাঁচের ব্যবস্থা নিশ্চিত জেনে আশ্বস্ত হলেন ভুজঙ্গ চৌধুরী। তাঁর সেক্রেটারি হিসেবে অফিসে আড়াই শো টাকা মাইনে পায় সানন্দা, তার ওপর প্রাইভেট আরও আড়াই কি তিন শো মাসিক দক্ষিণা অফার করবেন তাকে, দরকার হয় তো আরও কিছু চড়ানো যাবে। তাতেও যদি ন্যাকামি বেয়াড়াপনা না সারে সানন্দা সান্যালের, তা হ'লে তাকে পথে নামবার খোলা দরজা দেখিয়ে দিয়ে চম্পটী-ভাণ্ডার থেকেই নতুন মাল নিতে হবে। মেয়েদের বাধাবন্ধহীন মোহমুক্ত নিঃশরম অকুণ্ঠ উদার রূপ দেখে দেখে অভ্যস্ত ভুজঙ্গ, সানন্দা-মার্কা সংকীর্ণ ন্যাকামি তাঁর অসহ্য।

হ্যাঁ, বাগানবাড়ির কথাটা যে বলছিলে চম্পটী?—বললেন ভুজঙ্গ।

হ্যাঁ হুজুর। কথাবার্তা মোটামুটি কয়েছি। নেয্য দাম হেসে-খেলে দেড় লাখ হবে, কিন্তু আপনাকে হুজুর লাখেই করিয়ে দিতে পারব।

গোটা চারেক শূন্যের আগে দশ আর পনেরোর তফাত কিছু আকাশ-

তা নয় চম্পটী। কিন্তু দেড় লাখের বাগানবাড়ি যে এক লাখে ছাড়বে, কানার কোন গোলমাল আছে? না, কি ভূতের দৌরাত্ম্যি?

চম্পটী বললে, মালিক মেয়েমানুষ হুজুর। দিবাকর দালালের নাম নেন তো? দেবতুল্য ব্যক্তি। ওঁরই ধর্মপত্নী সৌদামিনী দেবীই হচ্ছেন মান মালিক।

দিবাকর দালাল? যার গ্রেট এশিয়াটিক ব্যাঙ্ক লাটে উঠেছিল হে চম্পটী?

হ্যাঁ হুজুর। অন্য ব্যাঙ্কগুলো সব একসঙ্গে জোট বেঁধে সাঁট ক'রে লাটে ল দিয়েছিল।—বললে চম্পটী, ভাড়াটে দালাল লাগিয়ে চারধারে গুজব য়ে দিলে—গ্রেট এশিয়াটিক ব্যাঙ্ক পটল তুলবে, তার আগে যে যার জমা টাকা ন নিয়ে স'রে পড়। অমনি মরিয়া হয়ে টাকা তোলার হিড়িক প'ড়ে গেল। সঙ্গে সবাই সব টাকা ফেরত চেয়ে বসলে দুনিয়ার কোন ব্যাঙ্ক টেঁকে র? গ্রেট এশিয়াটিক ব্যাঙ্ক—বাঙালীর একটা কত বড় বুক-ফোলাবার নিস, ভেবে দেখুন, দশচক্রে প'ড়ে লাল বাতি জ্বালতে হ'ল তাকে। আর উ হ'লে সেই দুঃখে আত্মঘাতী হ'ত হুজুর। দালাল মশাই শুধু একবার লম্বা শ্বাস ফেলে বললেন—মা তারা, তোরই ইচ্ছে। দেবতুল্য লোক হুজুর।

তা তো বটেই চম্পটী। এত বড় একটা ধাক্কা অমন সহজে সামলানো!

বাগানবাড়িখানার মালিকের যত কিছু টাকা তার শেষ পাইটি পর্যন্ত ছিল ই গ্রেট এশিয়াটিক ব্যাঙ্কে। তা হ'লেই বুঝুন হুজুর, শেষটায় দেনার দায়ে কে বাগানবাড়িটা তাঁকে বেচে দিতে হ'ল। তার পরেই মালিক হলেন দামিনী দেবী, মানে তাঁর বেনামীতে দিবাকর দালাল মশাই। তাঁরই সঙ্গে জ ভোরে কথা ক'য়ে এসেছি হুজুর। বললুম, আপনি তো বাগানবাড়ি ক রকম ব্যবহারই করেন না, তার ছায়াও মাড়ান না বলতে গেলে। তা লে আর খামোখা ওটাকে রেখে দিয়েছেন কেন?

মন কি চম্পটী? এমনি ফেলে রেখে দিয়েছেন?

এক রকম তাই হুজুর। এই ন'মাসে ছ'মাসে হয়তো এক-আধবার পিকনিক করতে গেলেন। ওর জন্যে তো হুজুর চিড়িয়াখানা আছে, বটানিক্যাল গার্ডেন আছে—বাগানবাড়ি পুষে রাখার দরকারটা কি? এ ন'ল গিয়ে আপনার ইয়েও করব না, রাস্তাও ছাড়ব না। হুজুরের চেহারা

চোখ দিয়ে একটু চেখে নিয়ে খাটো গলায় চম্পটী আবার শুরু করলে, দেবতুল্য ব্যক্তি তিনি, মানি। কিন্তু হুজুর, বাগানবাড়ি রাখতে হ'লে কাপ্তানী কলজে চাই। দেবতুল্য মানুষ মাথায় থাকুন, তাঁদের ভক্তি-ছেদ্দা করতে পারি, ভালবাসতে পারি নে। তাঁরা আমাদের আপনার জন নয়। আমাদের চাই মানুষের মত মানুষ।—ব'লে চোখের ইশারা ছুঁড়লে ভুজঙ্গ চৌধুরীকে লক্ষ্য ক'রে।

চম্পটী আমড়াগাছি করছে এটা ভুজঙ্গ চৌধুরী বুঝলেন না এমন নয়। বুঝলেন যে, সেটা চম্পটীও বুঝলে। কিন্তু চম্পটী জানে, তোয়াজ করলে তোয়াজকে তোয়াজ ব'লে চিনতে পেরেও মানুষ খুশি হয়।

চম্পটী বলতে লাগল, শুনে হুজুর, দালাল মশাই বললেন, তা তো বটেই; আমি তো হলেম গিয়ে ও-রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস। নেহাত ভদ্রলোক দায়ে ঠেকেছিলেন ব'লেই টাকা দিয়ে রাখতে হয়েছিল বাগানবাড়িটা। খদ্দের পেলেই ছেড়ে দেব, তবে কিনা এমন খদ্দের হওয়া চাই যে এ বাগানবাড়ির মর্যাদা দিতে পারবে। তখন হুজুর, আমি বললুম—আপনার কথা ভেবে—খদ্দের আমার হাতেই আছে। কি বলেন হুজুর? আছেন না?

একটু ভাবলেন ভুজঙ্গ চৌধুরী যেন হিমালয় পাহাড়ের বুকের ফাঁপায় পেণ্ডুলাম দুলছে। চৌধুরীর চোখে চোখে চেয়ে রইল চম্পটী, কোন হিপনোটিস্ট চোখের চাউনি দিয়ে হিপনোটিক পাস দিচ্ছে যেন। তারপর বললেন ভুজঙ্গ, ব্যবস্থা তা হ'লে কর চম্পটী। বাগানবাড়ি আমি নোব। অবিশ্যি তার আগে একদিন নিজের চোখে একবার দেখে আসা দরকার।

চম্পটী হাসি-গদগদ মুখে বললে, সে তো একশোবার হুজুর। খনার বচনে তো বলেইছে: "বলে বলুক হাজার লোকে, আগে দেখ নিজের চোখে।' নিজের চোখের ওপর হুজুর, আর কোন কথা নেই। দেখাবার ব্যবস্থা আমি করছি হুজুর। তবে কিনা, আপনি যেন কেনবার তেমন একটা গরজ দেখিয়ে বসবেন না। গরজ দেখলে হয়তো ওই দেড় লাখেই উঠে ব'সে থাকবেন, লাখে নামতে চাইবেন না দালাল মশাই। আপনি হুজুর, দেড় লাখ ঝনাৎ ক'রে ফেলে দিতে পারেন; কিন্তু আমার একটা ডিউটি আছে তো আপনার কিফায়েৎ দেখা! নইলে ধর্মে পতিত হব যে!

দেখলাম, নিশ্চিন্ত খুশিতে ফুলে উঠছে ধর্মভীরু চম্পটীর হৃদয়। চৌধুরীকে পটিয়ে ঠিক করা গেছে, এইবারে দালালের সঙ্গে রফা করতে হবে। একচোটে মোটা দাঁও মারা হয় নি বেশ কিছুদিন, বেশ কিছু এইবারে হবে হয়তো—গুরুজীর যদি কৃপা হয়। গুরুজী মানে চম্পটীর আধ্যাত্মিক-পারমার্থিক গুরু শ্রীশ্রীমৎ নিরালানন্দ বাবাজী। নিরালা গোলাপডাঙার নিরালা নদীতীরে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এবং পাঁচিল দিয়ে না-ঘেরা অনেকখানি নিরালা জায়গা জুড়ে বাবাজীর "নিরালাশ্রম"। আশ্রম-ভাণ্ডারে নিয়মিত চাঁদা দেয় চম্পটী, মাঝে মাঝে গুরুপদরজ শিরোধার্য এবং রসনাধার্য ক'রে নিয়ে আসে।

একটু দম নিয়ে চম্পটী বললে, তারপর ওই যে নতুন প্রাইভেট সেক্রেটারির কথা বলছিলুম হুজুর। প্রাইভেটে আই. এ. পড়ছে, চেহারায় চলনে বলনে আদবে কায়দায় আপনার অপছন্দ হবে না—এ আমি গ্যারান্টী দিতে পারি। অথচ মোস্ট ওবিডিয়েন্ট, যা বলবেন তাই করবে, 'না' বলবে না। অফিসে বলুন, বাড়িতে বলুন, পার্টিতে, পিকনিকে, হাওয়া-বদলে, যেখানে খুশি নিয়ে যান না কেন। মানে এমন প্রাইভেট সেক্রেটারি রেখে আপনি সুখ পাবেন হুজুর। বলবেন, প্রাইভেট সেক্রেটারি দিয়েছিল বটে অতুল চম্পটী।

ভাবছিলেন নীরবে ভুজঙ্গ চৌধুরী। কিছু বলা দরকার বোধ করছেন ব'লে বোধ হ'ল না। হয়তো শুনতে ভাল লাগছে, শুনে যাচ্ছেন আর হৃদয়ে গেঁথে রাখছেন অথবা রাখছেন না।

হুজুর অবশ্য নিজে দেখে শুনে বাজিয়ে নেবেন।—বললে চম্পটী, আদেশ করেন তো ওঁকে কালই আপনার সঙ্গে অফিসে—

শত-সহস্র-বৃশ্চিক-দংশনাহতের মত একটু চমকে উঠে ভুজঙ্গ চৌধুরী বললেন, না না না না, অফিসে নয়, অফিসে নয় চম্পটী।

আপনার বাড়িতে হুজুর?

বাড়িতেও নয়।

চম্পটী ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে ভেবে নিয়ে সাবধানের হাসি মুখে মাখিয়ে নিয়ে বললে, তা হ'লে হুজুর এইখানে, এই চিড়িয়াখানাতেই?

সে কথা যথাসময়ে ভেবে ঠিক করা যাবে 'খন চম্পটী।—বললেন ভুজঙ্গ চৌধুরী, আমি এখন অন্য কথা ভাবছি।

তিনি ভাবছিলেন, আজকেই এ সময়ে এন. ডি. হোড় কেন এল চিড়িয়াখানায়! ভুজঙ্গের উলটো অফিসের সর্বেসর্বা এন. ডি. হোড়; অফিসে আসতে যেতে প্রায়ই মুখোমুখি হয়। মাঝে মাঝে হয় মামুলী প্রীতিহীন প্রীতিসম্ভাষণ, অবশ্য নেহাতই যখন চোখোচোখি হয়ে যায়। হোড় কথা কয় কম—হয়তো অনেক বেশি ভাবে ব'লেই বেশি কইবার সময় মেলে না তার।

এন. ডি. হোড় দূরে দাঁড়িয়ে শিম্পাঞ্জী দেখছিলেন। ভুজঙ্গের মনে হ'ল ওটা হোড়ের ভান, নিছক ভণ্ডামি। শিম্পাঞ্জী দেখবার ভান ক'রে আড়চোখে লক্ষ্য করছে অতুলচম্পটী-সম্বলিত ভুজঙ্গ চৌধুরীকে। শিম্পাঞ্জীর সঙ্গে ভুজঙ্গের কোথায় কোথায় মিল, তারই ক্যাটালগ মনে মনে তৈরি করছে যেন।

এন. ডি. হোড়ের স্পর্ধা কল্পনা ক'রে মনের গহনে পরম গোপনে ক্ষেপে উঠলেন ভুজঙ্গ চৌধুরী। ক্ষ্যাপামির কোন আভাস বাইরে বেরুতে দিলেন না; পাশেই অতুল চম্পটী রয়েছে। এন. ডি. হোড় বড় কোম্পানির কর্তা, কিন্তু ভুজঙ্গ চৌধুরীর কোম্পানি প্রায় অনায়াসেই সেটাকে তুড়ি মেরে কিনে নিতে পারে। অবশ্য হোড় যদি বেচে। কিন্তু বেচবে না, বেচবে না, বেচবে না এন. ডি. হোড়। কথা কম কয়, ভাবে বেশি—এ লোক মানুষ খুন করতে পারে। এন. ডি. হোড়কে খুন করতে পেলে খুশি হতেন ভুজঙ্গ চৌধুরী। মেকলে সাহেবের তৈরি পেনাল কোড চালু না থাকলে হয়তো চেষ্টার ত্রুটি রাখতেন না।

সন্দেহের প্রলয় ঝঞ্ঝায় তচনচ হতে লাগল ভুজঙ্গ চৌধুরীর মন। অমন ন্যাকা সেজো না হে এন. ডি. হোড়। নিশ্চয় তুমি খবর পেয়েছ ভুজঙ্গ চৌধুরীর আজকের নিমন্ত্রণকে মুখোশ-পরা আদেশ জেনেও প্রাইভেট সেক্রেটারি কুমারী সান্ন্যাল সে নিমন্ত্রণ হেলায় প্রত্যাখ্যান করেছে, আসে নি ভুজঙ্গের সঙ্গে চিড়িয়াখানায়। সেক্রেটারি-বঞ্চিত ভুজঙ্গ চৌধুরীর ট্রাজেডি-তামাসা দেখতে ধাওয়া করেছ চিড়িয়াখানা পর্যন্ত। সামান্য মেয়ে সানন্দার এই যে অসামান্য বুকের পাটা, এই দুর্দিনের বাজারেও এমন মোটা-মাইনে রোগা-কাজের সেক্রেটারিয়ানাকে অনায়াসে তুড়ি দেখানো, এর মূলে ভরসার মূলধন যোগাচ্ছ তুমিই হে এন. ডি. হোড়। কুমারী সান্ন্যাল অবলীলায় দেখাচ্ছে এই দুঃসাহসিক উঁচু ট্রাপিজের খেলা; সে জানে তুমি নীচে আছ জাল ছড়িয়ে, পড়তে না পড়তেই তোমার জালে তাকে লুফে নেবে।

ত্রাণকর্তা ৺যীশুর পুণ্যস্মৃতি-ধন্য আজকের এই দিন। সেই উপলক্ষ্যে আজ চিড়িয়াখানায় একটু বিশেষ ভিড়, অনেকে এই শুভদিনে জানোয়ার দেখতে এসেছেন। ৺যীশু বলেছেন "প্রতিবেশীকে ভালবাস"। কিন্তু জানোয়ার এন. ডি. হোড়কে ভালবাসতে পারছিলেন না ভুজঙ্গ চৌধুরী।

ভেতরের বিমর্ষতা বাইরে দেখালে চলবে না এখন। জানোয়ার এন. ডি. হোড় নিজের চোখে দেখে যাক, সানন্দা চিড়িয়াখানায় সঙ্গে না আসাতে ভুজঙ্গের আনন্দের কিছুমাত্র কমতি হয় নি। আনন্দ উল্লাসের একটা উচ্ছ্বাস দেখিয়ে দিতে হবে হোড়কে; এই বেকায়দার আসরে ভড়কে গেলে কোন ফায়দা হবে না। প্রাণপণ-হাসি-হাসি মুখে ভুজঙ্গ বললেন, ওই যে প্রাইভেট সেক্রেটারি হবার পাত্রটির কথা বললে হে চম্পটী, বলি ওর এটা আসে তো?—ব'লে বিলিতী সোমরস পানের ভঙ্গী ক'রে দেখিয়ে দিলেন।

চম্পটী পরমোৎসাহিত হয়ে ভরসাপ্রাপ্ত-হাসি হেসে বললে, আপনি আদেশ করলে হুজুর, পিপে পিপে সাবাড় করবে।

সাবাস সাবাস! এমনটিই তো চাইছিলুম চম্পটী।—ব'লে উঁচু হেসে চম্পটীর পিঠে সজোরে একটি মেকী আহ্লাদী চাপড় লাগালেন ভুজঙ্গ। দেখুক, এন. ডি. হোড় দেখুক, সানন্দা সান্ন্যাল না আসায় ভুজঙ্গ চৌধুরীর ফুর্তির ফোয়ারার একটি ফোঁটাতেও ভাঁটা পড়ে নি।

বিনা সোমরসে সহসা এই উচ্ছ্বাসের কারণ বুঝতে না পেরে হকচকিত চম্পটীর চমক কাটাবার জন্যে ভুজঙ্গ বললেন, অজানা অচেনা কোথাকার যাকে-তাকে ঘাড়ে চাপাচ্ছ না তো হে চম্পটী? বলি, তোমার বেশ জানাশোনা তো? ভুজঙ্গ এইবার ঠিক কাপ্তানী মেজাজে এসেছেন ভেবে চম্পটী বললে, আমারই দূর-সম্পর্কের ভাগনী হুজুর।

এন. ডি. হোড় আড়চোখে একবার এই দিকেই যেন দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছে মনে হ'ল। মরিয়া হয়ে চম্পটীর পাঁজরে আঙলের খোঁচা মেরে ভুজঙ্গ বললেন, ওই রকম দূর-সম্পর্কের ভাগনী তোমার হাতে আর কটি আছে হে চম্পটী? এঃ এঃ এঃ এঃ...

জবাবে পালটা না হাসলে মহা বে-আদবি হবে ভেবে হুজুরের হুজুরী

রসিকতায় মুগ্ধ চম্পটী হো-হো ক'রে প্রাণপণে হেসে উঠল। ভগবান নীরব হয়ে ব'সে ; ভগবান সহজে হাসে না।

হাল্‌-লো! মিস্টার চাউডরী যে! হোয়াট এ প্লেজার টু মিট্‌ ইউ ইন দি জু! একাই এসেছেন দেখছি।

ভুজঙ্গ চৌধুরী চেয়ে চেয়ে দেখলেন ইন্‌টার-কন্‌টিনেণ্টাল একস্‌পোর্ট-ইম্‌পোর্ট করপোরেশনের মোটা অংশীদার মিস্টার জি. গসেইন (আদি নাম গীষ্পতি গোস্বামী)। তিনি কিন্তু একা নন, তাঁর বামহস্ত-লগ্না জনৈকা তন্বীগৌরী শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী ভ্যানিটিব্যাগ-পাণি। সঙ্গিনীটির কেশপাশ আস্কন্ধ লম্বিত বব-ছাটা মোলায়েম বিদেশী আমদানী ভঙ্গীতে গোল ক'রে পাকিয়ে রাখা। মাথা থেকে শুরু ক'রে উঁচু হীলের নিচুতলা পর্যন্ত একটা সলজ্জ নির্লজ্জতার বিজড়িত ভঙ্গিমা বুলানো। চরণযুগলে অভিনব ফ্যাশানের শৌখিন বিনামা, দুটি চরণপদ্মের সবগুলো পাপড়ির ডগায় মাখানো পুরু লাল প্লাস্টার। বেশবাসের স্বচ্ছ উদারতা এবং বাহুল্যবিহীন হ্রস্ব সারল্য কল্পনার অবকাশ অল্পই রেখেছে। দেহোর্ধ্ব-ভঙ্গিমার নিবিড়-ঔদ্ধত্য-সংবর্ধন ব্যবস্থা সযত্নে সদ্ব্যবহৃত। বিস্তৃত বর্ণনা (পেনাল কোডের ভয়ে) অনাবশ্যক।

মিস্টার গসেইন সঙ্গিনীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন ভুজঙ্গ চৌধুরীর। বললেন, আমার পার্সোনাল সেক্রেটারি মিস রীটা বিসোয়াস। মিস্টার বি. চাউডরী, যাঁর কথা তোমার কাছে আর নতুন ক'রে বলার কিছু নেই রীটা।

আত্ম-যৌবন-অসচেতনতার বিগলিত ভঙ্গীতে হাত বাড়িয়ে মিস বিসোয়াস বললেন, হাউ ডু ইউ ডু? যেন উচ্চারণে হা-ডু-ডু শোনায়।

অচেনা মেয়েমানুষ দাদাবাবুর সঙ্গে হাত বাড়িয়ে হাডুডু খেলতে চাইছে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত ভগবান ভূতের মত চুপ ক'রে ব'সে রইল।

ভুজঙ্গ চৌধুরী জানিয়ে দিলেন, তিনি মিস বিসোয়াসের সঙ্গে এই প্রথম আলাপিত হয়ে কৃতার্থ বোধ করছেন এবং আশা করছেন এ আলাপই শেষ আলাপ হবে না। জবাবে রীটা বিসোয়াস লিপস্টিক-রাঙা এক ঝলক হাসির ফাঁক দিয়ে জানালেন, এই কৃতার্থবোধ এবং আরও আলাপের আশাটা উভয়ত।

ভুজঙ্গের মনে হ'ল, তিনি ছোট হয়ে গেছেন এই তিন জনের কাছে। মনে হ'ল রীটা বিসোয়াসের যে পুরু লাল প্লাস্টারমাখা পাতলা হাসি, তাতে যেন

।কটু প্রচ্ছন্ন অনুকম্পা মেশানো আছে। মনে হ'ল আই.সি.ই.আই. ুর্পোরেশনের সিনিয়র পার্টনার মিস্টার গসেইন যেন বাঁকা হেসে বলছেন, সক্রেটারিটি এল না বুঝি? মান করেছে না কি? এ প্রশ্নের কি একটা ুখোড় জবাব দেওয়া যায় ভেবে ঠিক করতে না পেরে মুখর হতে পারলেন না জঙ্গ চৌধুরী। কিন্তু এটা বুঝলেন যে, সঙ্গিনীবিহীন চৌধুরীর কদর হ'ল না ।ঙ্গিনী-সৌভাগ্যবান গসেইনের কাছে—এ ক্ষেত্রে ৫৫৫-ক্লাবের রীতি অনুযায়ী ।ঙ্গিনী-বিনিময় সম্ভব নয় ব'লে। ৫৫৫-ক্লাবের ঝুনো সভ্য গসেইন, সাম্প্রতিক ।ভ্য ভুজঙ্গ চৌধুরী। ইংরিজী বুলিতে আর আদব-কায়দায় (অর্থাৎ বে আদবি বেকায়দায়) তেমন পোক্ত নন ব'লে চৌধুরী নিজেই প্রাণপণে এই অভিজাত িশাচরদের ক্লাবকে এড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভুজঙ্গ চৌধুরীর দ্রুতবর্ধমান অগুনতি টাকার ঝাঁজালো গন্ধ ৫৫৫-ক্লাবের কার্যকরী সমিতির নাসারন্ধ্রে এমন অপ্রতিরোধ্য খোঁচা দিতে শুরু করল যে, নাছোড়বান্দা ৫৫৫-ক্লাবের পাল্লায় প'ড়ে অ-সভ্যপদে ইস্তফা দিয়ে সভ্য-তালিকায় নাম লেখাতে বাধ্য হলেন ভুজঙ্গ চৌধুরী।

হঠাৎ একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলাম (মাঝে মাঝে আমি এ রকম হয়ে থাকি)। তাই "আচ্ছা, এখন তবে আসি"-নমস্কার-বোধক কি যে বললেন সেটা ঠিক খেয়াল করলুম না, কিন্তু টের পেলুম কেটে পড়লেন মিস্টার গসেইন তাঁর সহচরী সেক্রেটারি মিস রীটার কটি-বেষ্টন ক'রে।

শিম্পাঞ্জীর দিকে তাকিয়ে দেখলেন ভুজঙ্গ চৌধুরী। শিম্পাঞ্জী আছে, এন. ডি. হোড় নেই। হয়তো অন্য দিকে অন্য কোন জানোয়ার দেখতে চ'লে গেছে অথবা সটান বেরিয়ে গেছে চিড়িয়াখানা থেকে। তামাসা যা দেখবার তা তো দেখা হয়েই গেছে, আর কি? ভুজঙ্গের সন্দেহ হতে লাগল, গসেইনের স-সেক্রেটারি আবির্ভাবের পেছনেও কাজ করেছে ভিজে বেড়াল শয়তান এন. ডি. হোড়ের অদৃশ্য হস্ত। হোড় ৫৫৫-ক্লাবের সভ্য নয়, কিন্তু সেইনের সঙ্গে আছে তার কারবার-সূত্রী দহরম মহরম। সে-ই পাঠিয়েছে সেইনকে তামাসা দেখতে। যাও, দেখে এস সেক্রেটারিকে নিতে পারে নি জঙ্গ। সেক্রেটারি-বিরহী বেচারা ভুজঙ্গকে দেখে এস চিড়িয়াখানায়।

ধীরে ধীরে দূরে অপস্রিয়মানা গজগামিনী রীটা বিসোয়াসের পেছনে নিবদ্ধ

ভুজঙ্গের ব্যাকুল দৃষ্টি দেখে ভয় হ'ল অতুল চম্পটীর, এই বে-আব্রু বিলাসিনী মেয়েটা বুঝি বা তার দূর-সম্পর্কীয় ভাগনীটির পথ মেরে রেখে গেল।

সন্তর্পণে বললে, সেক্রেটারিটি হুজুর ইনি ভাল জুটিয়েছেন, এ কথা বলব বই-কি। একশো বার বলব। কিন্তু আমার দূর-সম্পর্কের ভাগনীটির কাছে এটি একেবারে ছেলেমানুষ। আপনার নিজের চোখেই আপনি দেখে নেবেন হুজুর।

পকেট থেকে একখানা পোস্টকার্ড সাইজের অ্যাল্‌বাম বেরুল চম্পটীর। তার ভেতর চম্পটীর দূর-সম্পর্কীয়া ডজন দেড়েক ভাগনীর বিভিন্ন ভঙ্গীর ফোটো আছে। প্রাইভেট-সেক্রেটারি-সরবরাহ-বিশারদ অতুল চম্পটী এই অ্যাল্‌বামটিকে প্রয়োজনবিশেষে ক্যাটালগের মত ব্যবহার করে। গসেইন-সেক্রেটারি রীটা বিসোয়াস যার কাছে ছেলেমানুষ, সেই ভাগনীটির (স্টুডিয়োর সমুদ্রসৈকতে তোলা) আনমনা উদার ফোটোগ্রাফখানা ভুজঙ্গ চৌধুরীকে দেখাবার কথা ভাবছে সে, এমন সময় গসেইন-বিসোয়াস-যুগল একটা বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভুজঙ্গ চৌধুরীর মুখ দেখে এখন আর তাঁকে ঘাঁটাতে ভরসা পেল না চম্পটী। রেখে দিলে পকেটে তার ভাগনীদের ফোটো-ক্যাটালগ।

চিড়িয়াখানায় এলে দুটো চারটে জানোয়ারের দেখা মিলে যায়। কি বল হে চম্পটী ?—বললেন ভুজঙ্গ চৌধুরী।

হুজুরের মুখে হাসি না দেখে শুকনো মুখে চম্পটী বললে, তাই তো দেখে গেলুম হুজুর।

এইবারে তা হ'লে চল, ফেরা যাক।

নীরবে ফিরে চললেন ভুজঙ্গ চৌধুরী ; পেছনে চলল চম্পটী আর ভগবান। পিছে প'ড়ে রইল চিড়িয়াখানা আর আমি। অথবা আমি আর চিড়িয়াখানা।

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা ৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : বড়বাজার ৬৫২০

আদর্শ
লিভার টনিক
লিভারের রোগে কুমারেশ
নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয়—কিন্তু
সুস্থ অবস্থায়ও কুমারেশ কম
প্রয়োজনীয় নয়। কুমারেশ
অসুস্থ লিভারকে আরোগ্য
করে এবং সুস্থ অবস্থায়
লিভারকে সবল ও কার্য্যক্ষম
রাখে।
QUMARESH
কুমারেশ
ও. আর. সি. এল. লিমিটেড. সালকিয়া. হাওড়া।

১৯৫১-৫২ রবীন্দ্র-স্মারক-পুরস্কারপ্রাপ্ত

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সংবাদপত্রে সেকালের কথা ঃ ১ম-২য় খণ্ড

সেকালের বাংলা সংবাদপত্রে (১৮১৮-৪০) বাঙ্গালী-জীবন সম্বন্ধে যে-সকল অমূল্য তথ্য পাওয়া যায়, তাহারই সঙ্কলন।

মূল্য ১০৲+১২॥০

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস ঃ (৩য় সংস্করণ)

১৭৯৫ হইতে ১৮৭৬ সাল পর্য্যন্ত বাংলা দেশের সখের ও সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রামাণ্য ইতিহাস। মূল্য ৪৲

বাংলা সাময়িক-পত্র ঃ ১ম-২য় ভাগ

১৮১৮ সালে বাংলা সাময়িক-পত্রের জন্মাবধি বর্ত্তমান শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সকল সাময়িক-পত্রের পরিচয়।

মূল্য ৫৲+২॥০

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

১ম-৮ম খণ্ড (৯০খানি পুস্তক)

আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের জন্মকাল হইতে যে-সকল স্মরণীয় সাহিত্য-সাধক ইহার উৎপত্তি, গঠন ও বিকাশে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী। মূল্য ৪৫৲

প্রত্যেক খণ্ডও পৃথক কিনিতে পাওয়া যায়।

১৯৫২-৫৩ রবীন্দ্র-স্মারক-পুরস্কারপ্রাপ্ত

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান

(বঙ্গে নব্যন্যায় চর্চ্চা) মূল্য ১০৲

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

শৌখিন নাট্যসম্প্রদায়ে অভিনয়োপযোগী কয়েকটি নাটক

মন্মথ রায়ের

উর্বশী নিরুদ্দেশ ॥০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দুই পুরুষ ২৲

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ডিটেকটিভ ১৲

প্রমথনাথ বিশীর

ঘৃতং পিবেৎ ১॥০ গভর্মেণ্ট ইন্সপেক্টর ২৲

ভূপেন্দ্রমোহন সরকারের

অনেক স্বর্গ ১॥০ ইতিহাসের নাটক ৸০

প্রবোধকুমার মজুমদারের

শুভযাত্রা ॥০

অমলকুমার রায়ের

পরীক্ষিৎ ১॥০

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের

শহরতলী ১॥০

প্রবোধকুমার চট্টখণ্ডীর

ধর্মঘট ১৲

কৃষ্ণদাসের

খুনে ১৲ হোটেল ১৲

কংগ্রেস-সাহিত্য-সঙ্ঘের

অভ্যুদয় ১৲

—ছোটদের জন্য—

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

ভারত-মঙ্গল ১।০

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের

আজব দেশ ।০

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর

গান্ধী চরিত

গান্ধী লোকটিকে জানতে হ'লে 'গান্ধী-চরিত' অপরিহার্য। গান্ধীজীর জীবনী নয়, তাঁর চরিত্র লেখকের চোখে যেমন ভাবে ফুটেছে তাই এই বইয়ে অঙ্কন করার চেষ্টা লেখক করেছেন।

দাম তিন টাকা।

●

সজনীকান্ত দাসের

ছন্দ ও ভাববৈচিত্র্যে পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ

প্রকাশিত হ'ল। সুমুদ্রিত ও সুদৃশ্য।

দাম আড়াই টাকা।

●

ডক্টর সুহৃৎচন্দ্র মিত্রের

সমীক্ষণ

কেন দেখি ইত্যাদি বিষয়ে যাঁরা

উপহার দেবার মত বই

ছেলেদের জন্য

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

ভারত-মঙ্গল

কিশোর-কিশোরীদের অভিনয় এবং পাঠের উপযোগী নাটিকা।

এক টাকা চার আনা।

●

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মোগল-পাঠান

মোগল-আমলের কয়েকটি চমকপ্রদ মনোরম ঘটনা অবলম্বনে রচিত ছোট গল্পের বই। ঝকঝকে বাঁধাই।

আড়াই টাকা।

জহান্‌-আরা

সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বিদুষী জাহানারার দুঃখময় জীবনের বিচিত্র এবং কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী। দেড় টাকা।

●

ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তের

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

(সমসাময়িক দৃষ্টিতে)

শ্রীরামকৃষ্ণের বিচিত্র জীবনের তথ্যবহুল আলোচনা। সাড়ে তিন টাকা।

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস

চৈত্র ১৩৬০ : দাম আট আনা

সম্পাদক : শ্রীসজনীকান্ত দাস ● Mar.-April. : Price As. Eig'

সূচী

চৈত্র—১৩৬০

নববর্ষের গান	...	৫৬১	দাদের দাবি—"বনফুল"	...	৫৮৯
আমার সাহিত্য-জীবন			মহাস্থবির জাতক—"মহাস্থবির"	...	৫৯১
—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৫৬২	আরোগ্য—শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়		৬০৯
প্রশ্ন—শ্রী গোপাল ভৌমিক	...	৫৬৬	বেতালের বৈঠকী—"বেতালভট্ট"	...	৬২২
মন্তব্য—শ্রীকুমারেশ ঘোষ	...	৫৬৭	হ্যামলেট—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	...	৬২৩
বাতিঘর—শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ	...	৫৭৫	ইন্‌ফ্লুয়েনজা—শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু	...	৬২৯
বিনোবা—শ্রীপ্রভাত বসু	...	৫৭৬	ভারতবর্ষের সার্বজনীন ভাষা		
ডানা—"বনফুল"	...	৫৭৭	—শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়	...	৬৪৫
উতোর—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	...	৫৮৯	সংবাদ-সাহিত্য	...	৬৫৩

"হরিদ্বার, হৃষীকেশ, মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী ও জয়পুরকে কেন্দ্র করিয়া তীর্থভ্রমণের কাহিনী। অনেকটা ডায়েরির ভঙ্গীতে লেখা। লেখিকা তাঁহার বড় ননদ, ননদাই ও ব্রজরমণ নামক এক বৈষ্ণবের সঙ্গিনী হইয়া এই তীর্থভ্রমণের সুযোগ লাভ করেন। কিন্তু ভ্রমণকাহিনী বলিতে সাধারণত যাহা বুঝায় ইহা তাহা নহে। এ এক অভিনব রচনা। ঐতিহাসিক তথ্য-প্রীতি, শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি, প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা, দেবদেবতার প্রতি গভীর ভক্তি এবং মানুষের প্রতি গভীরতর সংবেদন সমস্ত মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া এই সুবৃহৎ গ্রন্থের পাতায় পাতায় ছবির মালা হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাংলা ভাষায় তীর্থস্থান সম্পর্কে এমন একখানি বই যে রচিত হইতে পারে তাহা না পড়িলে বিশ্বাস করা শক্ত হইত। দেখিবার মতো যত মন্দির আছে, পুণ্য স্নান করিবার মতো যত ঘাট বা কুণ্ড আছে, দর্শনের মতো যত সাধক ও সাধু আছে, শুনিবার মতো যত কথা আছে, অসাধারণ দুঃখ বরণ করিয়াও লেখিকা তাহার কোনোটাই বাদ দেন নাই। যেখানে ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন দরকার সেখানে তিনি তাহা করিয়াছেন, যেখানে কিংবদন্তী বা লীলাকাহিনী অবিশ্বাস্য, সেখানে তাহাও তিনি যথাপ্রাপ্ত দিয়াছেন, যেখানে মনে রং ধরিয়াছে, সেখানে তিনি রঙীন ছবি আঁকিয়াছেন। রচনা এক এক স্থানে কাব্যধর্মী হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু উচ্ছ্বাস নাই, মাত্রাধিক্য নাই। অসাধারণ সংযত ভাষায়, কোথায়ও পূর্ণ ব্যঞ্জনায়, কোথায়ও দ্যোতনা ইঙ্গিতে, কোথাও লঘু কৌতুকে, কোথায়ও সহৃদয় ব্যঙ্গের সঙ্গে লেখিকা তাঁহার চিত্র রচনা সার্থক করিয়াছেন। সকল পাষাণ মন্দির, সকল প্রাচীন দেবদেবতা, সকল তীর্থযাত্রী সাধুসন্ত, সাধারণ নরনারী— এমনকি সমস্ত আকাশ-বাতাস, বৃক্ষ-লতা, ফুলফল লেখার ভিতর দিয়া বাঙ্ময় হইয়া উঠিয়াছে। ভাষাহীন যেন হঠাৎ ভাষায় মুখর হইয়া উঠিয়াছে।"—যুগান্তর

॥ ১৯৫৩-৫৪ সালে রবীন্দ্রস্মৃতি-পুরস্কার প্রাপ্ত ॥

কাগজের বাঁধাই ৪৲ বোর্ড বাঁধাই ৫৲

৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭

ইণ্ডিয়া
ল্যাম্প, বেল,
ফর্ক-প্রভৃতির
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
প্রস্তুত কারক
ইণ্ডিয়া সাইকেল ম্যাঃ কোং লিঃ কলিকাতা-১

কুহকিনীর ফাঁদ ২৲	গিরিচূড়ার বন্দী ২৲
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত পঞ্চভূত ২॥০	অমরেন্দ্র ঘোষ প্রণীত দক্ষিণের বিল ১ম—৪৲ ২য়—৪৲
ভোলা সেন প্রণীত উপন্যাসের উপকরণ ২॥০	ননীমাধব চৌধুরী প্রণীত দেবানন্দ ৪৲
অনুরূপা দেবী প্রণীত হারানো খাতা ৩৲	মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত স্বাধীনতার স্বাদ ৪৲
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত মুস্কিল আসান ২॥০ আঁধি ৩৲	সীতা দেবী প্রণীত বন্যা ৪৲
রামপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত কাল-কল্লোল ৪॥০	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত কাক-জ্যোৎস্না ৩৲
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ঝড়ো হাওয়া ২॥০	রবীন্দ্রনাথ মৈত্র প্রণীত উদাসীর মাঠ ২৲
উপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত নকল পাঞ্জাবী ২৲	প্রিয়কুমার গোস্বামী প্রণীত কবে তুমি আসবে ২॥০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত লাল মাটি ৪॥০ উপনিবেশ ১ম—২৲ ২য়—২৲ ৩য়—২॥০	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নীলকণ্ঠ ২৲ তিনশূন্য ৩৲
প্রভাত দেবসরকার প্রণীত অনেক দিন ৩॥০	রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত কলঙ্কিনীর খাল ২॥০
সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য প্রণীত মিলন-মন্দির ৩৲	শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত করুণাদেবীর আশ্রম ২৲

La bonny
SNOW
KANTA
CASTOROIL
উৎসব অনুষ্ঠানে
ক্যালকেমিকোর অপরিহার্য্য অঙ্গরাগ
কান্তা মনোমুগ্ধকর সুরভিসার, পরিবেশ আমোদিত করে।
লাবণি স্নো দিনের প্রসাধনে লাবণি স্নো মুখের ঔজ্জ্বল্য বাড়ায়।
লাবণি ক্রীম রাত্রে লাবণি ক্রীম ব্যবহারে চর্ম্ম নরম ও মসৃণ হয়।
মলয় চন্দন সাবান শরীর স্নিগ্ধ রাখে ও চিত্ত প্রসন্ন করে।
ক্যাষ্টরল মধুর সুগন্ধি কেশতৈল। কেশশ্রী অপরূপ উৎকর্ষ লাভ করে।।
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা-২৯

কাশ্মীর
ও
তিব্বতে
স্বামী অভেদানন্দ

শনিবারের চিঠি
২৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৬০

নববর্ষের গান

(১)

নতুন দিনের গান গাবি কে আয়,
নতুন বছর ডাকছে ইশারায়—
পুরাতনের ভিতের 'পরে
নতুন ভারত নেব গ'ড়ে
অনেক ভুল তো শুধরে এলাম,
চলতে পায় পায় ॥
পায়ে পায়ে মিলিয়ে এবার চলি,
চলব সিধে ছাড়ব অলিগলি,
কণ্ঠ পূরে ভারত জুড়ে
তুলব এ গান একটি সুরে—
ভায়ে ভায়ে এক আমরা
মায়ের চরণছায় ॥

(২)

নূতন ভারতে নববর্ষের গান
রহিয়া রহিয়া গাহিয়া উঠিছে প্রাণ—
শুভদিনে হোক জয়যাত্রার শুরু,
আশিস্ করুন এ মহাজাতির গুরু,
আমরা রাখিতে পারি যেন মার মান ॥
বিশ্বে শোনাতে হবে কল্যাণ-বাণী
থামাইতে হবে হিংসার হানাহানি
নূতন পথের দিতে হবে সন্ধান ॥
বল—ভারতের, নব ভারতের জয়
প্রাচীন প্রাচীর নূতন অভ্যুদয়
তিমিররাত্রি হ'ল হ'ল অবসান ॥

আমার সাহিত্য-জীবন

আট

'দুই পুরুষে'র বীজ ছিল "নুটু মোক্তারের সওয়াল" নামক ছোটগল্পে। গল্পটি 'প্রবাসী'তে বের হয়েছিল। নুটু মোক্তার কল্পনার মানুষ নয়, সত্যকারের মানুষ। রামপুরহাট সাব-ডিভিশনের লোক। প্রথমে ছিলেন ইস্কুল-মাস্টার, তারপর হয়েছিলেন মোক্তার। সে আমলের বিচিত্র স্পষ্টবাদী মানুষ ছিলেন। তাঁর স্পষ্টবাদিতার অনেক গল্প আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। তার মধ্যে বাবুদের বাড়িতে নেমন্তন্নতে মাছ কম দেওয়ার গল্প, নীচে খেতে দেওয়ার গল্পটি অন্যতম: তাঁর স্ত্রী নাকি এইভাবে অপমানিতা হয়েছিলেন এবং বাড়িতে এসে স্বামীর কাছে কেঁদেছিলেন। সেই কারণেই নাকি জেদের বশে ইস্কুল-মাস্টারি ছেড়ে মোক্তারি পাস ক'রে নুটুবাবু মোক্তারি আরম্ভ করেন এবং কয়েক শো টাকার একটি তোড়া স্ত্রীর হাতে দিয়ে নেমন্তন্ন খেতে পাঠান। ব'লে দেন যে, যখন মাছ দিতে আসবে, তখন তোড়াটি নামিয়ে দিয়ে বলবে—আমার এই গয়নার টাকা হয়েছে, গয়না গড়ানো হবে, সুতরাং যাদের গয়না আছে তাদের সমান না হোক, একখানার চেয়ে কম দিলে চলবে না।

কঙ্কণার বাবুদের নিয়ে গল্পটিও সত্য। এমনি অনেক গল্প আছে। একটি গল্পের কথা বলি। বহরমপুরে ব্রাহ্মণ-মহাসভার অধিবেশনে গিয়েছিলেন। সেখানে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, সভাও বটে, মহাসভাও বটে, দেখলাম অনেক, দেখলাম না শুধু ব্রাহ্মণ। বক্তৃতা দিয়ে চ'লে আসছিলেন এমন সময় স্বর্গীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁকে ধরেন। বলেন, চমৎকার স্পষ্টবাদী মানুষ আপনি। আপনাকে প্রণাম। আমাকে দুটো স্পষ্ট কথা শুনিয়ে যান। নুটুবাবু উত্তরে মার্জনা চেয়ে বলেন, দেখুন দেখি, আপনাকে কি স্পষ্ট কথা বলব? আপনি মহারাজা, আপনি দাতা, আপনি পুণ্যবান।

মহারাজ হেসে বলেন, কিন্তু মানুষ তো। মানুষ মাত্রেরই দোষ আছে। আমার নেই? আপনি আমাকে ভয় করেন, না, খাতির করেন যে, দোষের কথা বলবেন না?

হেসে হুটুবাবু বলেন, দেখুন তবে বলি। মহারাজা, গোকুল থেকে গোপবালক কৃষ্ণ এসে যখন মথুরায় রাজা হয়েছিলেন, তখন ব্রজের রাখালগুলিকে সঙ্গে আনেন নি। আপনার দোষ ওইখানে। আপনি রাজা হতে জন্মেছেন—জন্মেছেন মাথরুনে, রাজা হয়েছেন কাশিমবাজারে; আসবার সময়ে আসা উচিত ছিল একা, কিন্তু আপনি এসেছেন রাখালের দল নিয়ে।

হুটুবাবুর পুত্র যিনি, তিনি অরুণের মতই বিদ্যার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ছেলে। কৃতী পুরুষ। ছেলেকে বহরমপুরে পড়তে দিয়েছিলেন। মধ্যে ছেলেকে দেখতে বহরমপুর গেলেন হুটুবাবু। গিয়ে হস্টেলের রুমে হঠাৎ হাজির। চোখে পড়ল বিড়ি-সিগারেটের টুকরো। ছেলেকে কিছু না ব'লে বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন হুঁকো কল্কে তামাক টিকে প্রভৃতি সরঞ্জাম নিয়ে। ছেলেকে দিয়ে বললেন, খেতে যখন শিখেছ, ধোঁয়া তখন খাবে। কিন্তু সিগারেট বিড়ি না—তামাক খাবে।

'দুই পুরুষে'র হুটু মোক্তার অন্য মানুষ।

নাটক লেখবার তাগিদে কল্যাণীর সৃষ্টি। যাই হোক, নাটক লেখবার পর কোথায় যাব ভাবছি, এমন সময় খবর পেলাম—নতুন ক'রে রঙমহল খুলছে। খবর দিয়েছিলেন স্বর্গীয় ভূমেন রায়। শুনলাম, অভিনেতা শরৎচন্দ্র চটোপাধ্যায় সম্প্রদায় গঠন করেছেন, তাঁর সঙ্গে আছেন শরৎবাবুর ভায়রা-ভাই অর্থাৎ শ্যালীপতি ভাই বেচুবাবু। ভূমেনবাবুই আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। শরৎ চট্টোপাধ্যায় একটু উচ্ছ্বসিত মানুষ। কথায় কথায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। তবে ভাল মানুষ। তখন সারকুলার রোড ও গ্রে স্ট্রীটের জংশনে বাজারের দোতলায় তাঁদের আড্ডা। শরৎবাবুর সঙ্গে তখন রবি রায় এবং নাট্যনিকেতনের অনেকে যোগ দিয়েছেন, ভূমেনবাবুও আছেন। কাজেই আবহাওয়া বেশ স্বচ্ছন্দ মনে হ'ল। নাটক পড়লাম। শুনে সকলে খুব খুশি হলেন। বেচুবাবু ছিলেন বিচিত্র মানুষ, তিনি টাকা-পয়সা বোঝেন, নাটক বোঝেন না, শোনেনও না। তিনি বললেন,

জমবে কি না বল? প্রশ্ন করলেন শরৎবাবুকে। শরৎবাবু টেবিলের উপর চড় মেরে বললেন, জ্ব'লে যাবে—ফায়ার হয়ে যাবে।

লেখাপড়া হয়ে গেল। লেখাপড়া মানে চিঠি। ক্রমে রঙমহলে ওঁরা আসর পাতলেন। ওদিকে হুটুর ভূমিকায় কে অভিনয় করবে সমস্যা উঠল। শেষ ঠিক হ'ল, নির্মলেন্দু লাহিড়ীকে আনা হবে। যে দিন নির্মলেন্দুবাবু আসবার কথা সেই দিন বিকেলবেলা পাঁচটার সময় রঙমহলে যেতেই বেচুবাবু আমাকে ডাকলেন।—শুনুন একবার।

কি?

দেখুন, কিছু মনে করবেন না, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

বলুন।

আপনি কি জেল খেটেছেন? মানে, ন্যাশনাল মুভমেণ্টে?

হ্যাঁ। তা খেটেছি।

তাই তো—

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন বেচুবাবু। আমিও অপেক্ষা ক'রে রইলাম। তারপর বললেন, আপনার বইখানি আপনি নিয়ে যান।

নিয়ে যাব?

হ্যাঁ। পারব না·এ বই স্টেজ করতে। মানে, পুলিসের কর্তাদের সঙ্গে আমার একটু দহরম-মহরম আছে। তা ছাড়া বন্ধুবান্ধবও আছেন দু-চারজন, যাঁরা অনেক রকম খবর রাখেন। তাঁরা আপনার বই করছি শুনে বললেন, তাই তো।

বুঝলাম, তাঁদের বলা 'তাই তো' যখন বেচুবাবুর মনে বাসা গেড়েছে, তখন ও 'তাই তো'কে বের করবার কোন উপায়ই নেই। এবং দলের কর্তৃত্ব শরৎবাবুর হ'লেও টাকা যখন বেচুবাবুর, তখন শরৎবাবুও এ ক্ষেত্রে অসহায় হয়ে পড়বেন। সে বই 'ফায়ার' হ'লেও না।

বইখানি বগলে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। পথে ফুটপাথে রূপবাণীর সামনে দেখলাম, শ্রীযুক্ত নরেশ মিত্র মশায় দাঁড়িয়ে। বলতে ভুলেছি, এর আগেই নরেশবাবুকে বইখানি শুনিয়েছিলাম। তিনি আমাকে

দেখেই বললেন, ও মশাই, করেছেন কি? আপনি বইখানি নাকি রঙমহলে দিয়েছেন?

হেসে বললাম, দিয়েছিলাম, কিন্তু ফিরে নিয়ে যাচ্ছি।

ফিরে দিলে? কে? শরৎ?

না। বেচুবাবু।

সমস্ত বিবরণ বললাম। নরেশবাবু হেসে বললেন, আমি বলব—গুড লাক্‌, আপনার স্টার এখন ভাল। শুনুন, আমার এক বন্ধু মিস্টার মল্লিক—শিশির মল্লিক, বীতেন কোম্পানির মুরলীবাবুদের নিয়ে নতুন থিয়েটার খুলছেন। মিস্টার মল্লিক এই রঙমহলে 'মহানিশা' করেছিলেন। থিয়েটারকে যত ভাল করা যায় তাই করবেন। আপনি বই নিয়ে তাঁর কাছে অ্যাপ্রোচ করুন।

প্রশ্ন করলাম, কোন্ স্টেজে থিয়েটার হবে? সব স্টেজই তো চলছে?

হেসে নরেশবাবু বললেন, বিচিত্র স্থান থিয়েটার-মহল। কবে যে তলায় তলায় কার পালা শেষ হয়, সে বিধাতাও বোধ হয় বলতে পারবেন না। নাট্যভারতী হস্তান্তর হচ্ছে জানেন?

নাট্যভারতী? যেখানে অহীন্দ্রবাবুর অধিনায়কতায় অভিনয় চলছে? যেখানে দর্শকদের ভিড় সব থেকে বেশি?

হ্যাঁ। আপনি এই ঠিকানায় শিশির মল্লিক মশায়ের সঙ্গে দেখা করুন। ঠিকানা লিখে দিয়ে তিনি চ'লে গেলেন।

পরের দিনই পত্র লিখলাম শিশির মল্লিক মশায়কে। বোধ করি দিন দুয়েক পরেই সংবাদ পেলাম, নাট্যভারতী স্টেজ বিক্রি হয়ে গেল। কিনলেন দীপচাঁদ এবং মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় মশায়। দিন পাঁচেক কি এক সপ্তাহ পরে একটি ছেলে আমার কাশীনাথ দত্ত রোডের বাড়িতে এসে বললে, আমাকে সতু সেন পাঠালেন। আপনাকে একবার ডাকছেন।

সতু সেন? আমাকে? মনে পড়ল সংক্ষিপ্তভাষী সতু সেনকে।

সতু সেনও থাকতেন ওই কাশীনাথ দত্ত রোডে। এখনও থাকেন। গেলাম, বেশ একটু সপ্রশ্ন এবং শঙ্কিত অন্তর নিয়েই গেলাম।

সোজা শক্ত মানুষ সতু সেন, বললেন, এই চিঠি আপনি লিখেছেন? দেখলাম, শিশির মল্লিক মশায়কে লেখা আমার চিঠি। বললাম, হ্যাঁ।

সতু সেন বললেন, এই রবিবার সকাল নটায় রাণী হেমন্তকুমারী স্ট্রীটে মুরলীবাবুর বাড়িতে যাবেন বই নিয়ে। আপনার বই শুনব। বাস্।— ব'লেই সতু সেন বারান্দায় উঠে গেলেন এবং আর একবার ঘুরে বললেন, রবিবার সকাল নটা। নমস্কার।

[ক্রমশ]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রশ্ন

জয়ী কি হয়েছি ?
আজও সংশয় জাগে
ভোরের আকাশ রাঙা হয় যবে
সূর্যের ফাগে ফাগে—
একটি ঘাসের ডগায় যখন
বিশ্বের ছোঁয়া লাগে।

জয়ী কি হয়েছি ?
আজও বিস্ময় জাগে
নববধূ এই পৃথিবী যখন
গোপনে অস্তরাগে
কাছে এসে তবু দূরে থেকে যায়
লজ্জায় অনুরাগে।

জয়ী কি হয়েছি ?
প্রবল শঙ্কা জাগে
কুয়াশা-জড়ানো শীতের রাত্রে
তাকিয়ে পিছনে আগে
অশরীরী-ছায়া বিছাতে যখন
দেখি পৃথিবীর নাগে।

শ্রী গোপাল ভৌমিক

মন্তর

মেজাজটা কিছুদিন ধরিয়া খিঁচড়াইয়া আছে।
কারণ, পকেট খালি। পকেট খালি থাকিলে কাহার না মেজাজ খিঁচড়াইয়া থাকে! আমারও তাহাই হইয়াছে।

কাহারও কথা সহ্য হয় না। কেহ এক কথা বলিলে তাহাকে দশ কথা শুনাইয়া দিই। কেহ ভাল কথা বলিতে আসিলে মনে হয়, ঠাট্টা করিতেছে।

সেদিন গৃহিণী কি একটা ভাল কথা হাসিয়া হাসিয়া বলিতে আসিলেন, কিন্তু তাঁহার কথাটাকে মন্দ ভাবিয়া এমন দুই-চারিটা বাক্যবাণ ছাড়িলাম যে, বেচারা হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া সারা। শুধু তাহাই নহে, স্ত্রীলোক-জনোচিত নানারূপ আক্ষেপও করিতে লাগিলেন: যথা, কেন তাঁহার বাবা তাঁহাকে হাত-পা বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দেন নাই, কিংবা তাঁহার মা ভাতের সঙ্গে বিষ মিশাইয়া দেন নাই? যমকেও দোষারোপ করিলেন, দেবতাটি এত লোককে শাস্তি দিতেছেন, অথচ তাঁহার উপর নজর নাই কেন? সন্দেহ করিলেন, চোখের মাথা খাইয়াছেন নাকি দেবতাটি!

তারপর আরও কি কি বলিবেন, তাহা আমার জানা ছিল। কলের গানের একখানা রেকর্ড একবার শুনিলে পরের বার বাজাইলে যে তাহাই ফের শোনা যাইবে, তাহা কে না জানে! অতএব গৃহিণীর আক্ষেপের জানা-রেকর্ডখানা না শুনিয়াই বুদ্ধিমানের মত সেখান হইতে কাটিয়া পড়িলাম।

এসব সময়ে অর্থাৎ গার্হস্থ্য-রঙ্গমঞ্চ হইতে কাটা সৈনিকের মত বেকায়দায় পড়িয়া কাটিয়া পড়িবার পর একমাত্র সান্ত্বনার স্থল—চায়ের দোকান। অতএব স্রেফ গোপালদার চায়ের দোকানে গিয়া হাফ-কাপ চায়ের অর্ডার দিলাম। সবে চায়ের কাপে চুমুক দিয়া একটি আরামের 'আঃ' করিয়াছি, দেখি দাঁত বার করিয়া পাড়ার ফটকে আমার সামনের বেঞ্চে বসিল। বুঝিলাম, এখনই রাজনীতির কচকচি শুরু হইবে। ছোঁড়াটা নেহেরু হইতে কমরেড কেলো পর্যন্ত গুলিয়া খাইয়াছে এবং

যেখানে পারে বমি করিতে থাকে। তাই সে সবে হাঁ করিতেই একটি বিরক্তির 'আঃ' ছাড়িলাম। ফটুকে ধমক খাইয়া থমকাইয়া থামিয়া গেল বটে, কিন্তু মুখখানা তাহার ভার হইয়া গেল। বুঝিলাম, ফটকে চটিয়াছে। আমি আর দেরি না করিয়া কট্ করিয়া চটিতে পা গলাইয়া এবং চাটুকু কোন প্রকারে গিলিয়া চট্ করিয়া কাটিয়া পড়িলাম। অবশ্য মনে মনে বুঝিলাম, আমার মেজাজ রীতিমত তিরিক্ষে হইয়া রহিয়াছে—বাহিরেও।

বেশ বুঝিলাম, এ গরম মেজাজ চাঁদির চাঁটি না খাইলে ঠাণ্ডা হইবে না। কিন্তু চাঁদি যে চাঁদের মতই নাগালের বাহিরে? উপায়ও তো কিছু মনে পড়ে না। অন্যের পকেটের টাকা নিজের পকেটে আনিবার যে সব কৌশল চলিত আছে, তাহা আমার কাছে অচল। পকেট কাটা, পকেট মারা, ৪২০এর সাহায্যে অন্যকে পকেটস্থ করিয়া তাহার মাথায় হাত বুলানো—ইত্যাদি কৌশলগুলি বহুদিনের অভ্যাসেব ফল। ইচ্ছা করিলেই তো হয় না।

ফোকট্‌সে টাকা পাইবার একটি উপায় হঠাৎ মাথায় আসিল—লটারির টিকেট কাটা। আমাদের পাশের বাড়ির স্যাণ্ডা লটারির টিকেট বিক্রয় করে, তাহাকে ভজন-ভাজন দিয়া বাকিতে একখানা দুই টাকার টিকিট কাটিলাম। শুনিয়াছি, যা-তা নম-ডিপ্লুম দিলে ভাল রকম টাকা জুটিয়া যায় কপালে। অতএব টিকিটে লিখাইয়া দিলাম "কচু পোড়া খাও।"

কিন্তু মন কি মানিতে চায়, কচু পোড়া খাইবার জন্যই আমার এই সংসারে আসা! আশা, লুচি মণ্ডা খাইবার দিন একদিন আসিবেই আসিবে। এসব ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ জীবনটাকে যাচাইয়া লইবার ইচ্ছা কাহার না হয়? আমারও হইল। শুধু তাই নয়, সুযোগও মিলিল।

জীবনের উপর তিক্ত হইয়া সেদিন কখন না জানি নিজের অজ্ঞাতেই নিমতলার শ্মশানঘাটে উপস্থিত হইয়াছিলাম। ভাবিতেছেন, আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলাম? না, না। আত্মহত্যা যাহারা করে, বাড়িতে

বসিয়া ঘরে খিল আঁটিয়া চিঠি লিখিয়া সবাইকে দায়মুক্ত করিয়া পরে 'তুগ্‌গা' বলিয়া ঝুলিয়া পড়ে বা কিছু গিলিয়া মরে। পরে তাহাদের দেহখানাকে সাতঘাটের জল খাওয়াইয়া শ্মশানঘাটে আনা হয়। আমি গিয়াছিলাম, আমার প্রাণপাখিকে দেহের খাঁচায় ভরিয়া লইয়া একটু গঙ্গার ধারে গিয়া বসিব বলিয়া।

সেখানে দেখা হইয়া গেল এক সাধুর সঙ্গে। গায়ে ছাই মাখা। পাশে ধুনী জ্বলিতেছে, সামনে কাপড় পাতা, তাহাতে চার-পাঁচটা পয়সা। শহুরে সাধু!

সাধু আমাকে দেখিয়া হাঁক দিলেন, এই বেটা, শুন্ যাও।

কেয়া?—কাছে গেলাম।

দোঠো পয়সা দেও, সেবাকো লিয়ে।

পকেটে একটা আনি ছিল, সেটা বাহির করিয়া তাহার সামনে পাতা কাপড়ের উপর দিয়া সেখান হইতে দুইটা পয়সা তুলিয়া পকেটে ভরিলাম। দুইটা চাহিয়াছে, চারটা দিব কেন?

সাধু বলিলেন, বেটা, তোম বৈঠো। দোঠো পয়সা দিয়া তোম্‌কো হাম দোঠো বাত বোল্ দেগা। চার পয়সা দেনেসে দো-চার বাত বোলনে শেকতা থা।

কথা শুনুন একবার! বললাম, আচ্ছা বাবা, দো বাতই বলিয়ে না—কেয়া বোলে গা?

সাধু বলিলেন, তব্ কান ইধার লে আও।

বলিয়া ফট্ করিয়া আমার ডান কান ধরিয়া টানিয়া তাঁহার মুখের কাছে আনিয়া শুধু বলিলেন, হুঁ হুঁ।

ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিবার আগেই সাধু ডান কান ছাড়িয়া আমার বাঁ কান তাঁহার মুখের কাছে আনিয়া এবার বলিলেন, হেঁ, হেঁ!

কান ধরায় সাধুর উপর চটিব কি—অদ্ভুত দুটি কথা শুনিয়া স্রেফ থ' বনিয়া গেলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম ভক্তিগদগদ হইয়া, বাবা, কথা দুটোর মানে কি?

উবু হইয়া বসিয়া ছিলাম। আচমকা আমাকে পিছন দিকে ঠেলিয়া দিলেন সাধু; চিত হইয়া পড়িতে পড়িতে নিজেকে সামলাইয়া লইলাম।

সাধু বলিলেন, দো পয়সামে দো মন্তর দিয়া। যায়দা মাঙ্গে গা তো মারে গা দো ঝপ্পড়!

বুঝিলাম, ব্যাপার বেগতিক। অতএব সরিয়া পড়িলাম তাড়াতাড়ি।

কিন্তু 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল মোর' দুইটি কথা শুধু—হুঁ-হুঁ আর হেঁ-হেঁ। ওই দুইটি হেঁয়ালী কথা মাথার ভিতর যেন হু-হু করিয়া ঘুরপাক খাইতে লাগিল। একে অর্থ-সমস্যায় মাথা খারাপ—এখন ওই হেঁয়ালী দুইটির অর্থ-সমস্যায় পাগল হইবার যোগাড় যে!

সকালের বাঁকিয়া থাকা গৃহিণীকে রাত্রে বিছানায় পাশে পাইলেও, ও-পাশ ফিরিয়া শুইয়া ছিলেন। তাঁহাকে নানারকম মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলাম এবং আমি যে 'কিছু নই, অপদার্থ, তাঁহার মত দেবীর পদযোগ্য নই', ইত্যাদি যথাযোগ্য কথাগুলি যোগ্যতার সঙ্গে বলিয়া তাঁহাকে সহজ ও সরল করিয়া আমার দিকে পাশ ফিরাইলাম এবং খুলিয়া বলিলাম সাধুর সব কথা। শুনিয়া তিনিও যেন চুপ মারিয়া গেলেন। কিন্তু বুদ্ধিমতীদের পক্ষে চুপ করিয়া থাকা নাকি নির্বুদ্ধিতার পরিচয়—কাজেই কথা দুইটাকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। বলিলেন, লোকটা পাগল বোধ হয়। বেশি গাঁজা খেলে এই রকমই হয়। লোকটা যে তোমার কান দুটো কামড়ে নেয় নি, সেই তোমার ভাগ্যি!

বুঝিলাম, সকালবেলার ঝাল ঝাড়িতেছেন রাত্রে। ওস্তাদের মার শেষরাত্রে, কিন্তু গৃহিণীদের মার সব রাত্রেই।

অতএব জাগিয়া নাক ডাকাইতে লাগিলাম।

ভাগ্য ভাল, সমস্যার সমাধান হইল পরদিন।

টাকার খোঁজে বাহির হইয়া কথা দুইটার টীকার খোঁজ পাওয়া গেল। খুলিয়া বলি:

বাজার যাওয়ার পথে হরিশদা আসিয়া বলিল, কি খাওয়াবি বল্ ?

অবাক হইয়া বলিলাম, কেন দাদা ?

হরিশদা দাঁত খিঁচাইলেন, কেন দাদা ? কেন, মনে নেই আমাদের আফিসে চাকরির জন্যে বলেছিলিস্ ?

খালি আছে চাকরি ? বল কি ?—আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলাম যেন।

হরিশদা বলিলেন, আমাদের আফিসের একজন টাইপিস্ট ভাল একটা চাকরি পেয়ে চ'লে যাচ্ছে—তার জায়গায় তোকে বসিয়ে দেব ভাবছি। ছোটসাহেব মিঃ দত্তকে ব'লে রেখেছি। আজ এগারোটায় যাস—ইণ্টারভিউয়ে। সেখানে সব বুঝিয়ে দেব। এখন চলি।

হরিশদা চলিয়া গেলেন। আপিসের বড়বাবু তিনি। কাজেই বলিয়া রাখিয়াছিলাম একটা চাকরির জন্য, এখন ভগবান মুখ চাহিলেই হয়।

বাড়ির মধ্যে আসিয়া একগাল হাসিয়া গৃহিণীকে সব বলিলাম। আরও বলিলাম, তোমার গয়নাগুলো দেখি এবার যদি ছাড়াতে পারি।

গৃহিণীও হাসিলেন।

রাস্তায় গাড়িঘোড়ার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া দুর্গানাম জপ করিতে করিতে হরিশদার আপিসে আসিলাম যথাসময়ে।

হরিশদা তাঁহার ঘরে বসিয়া কি সব ফাইলপত্র ঘাঁটিতেছিলেন। অদ্ভুত কায়দায় নাকের ডগায় নিকেলের চশমা লাগানো, পড়ি-পড়ি করিয়াও পড়িতেছে না কিন্তু। ঘরের হাফ-দরজা হাফ-ফাঁক করিয়া হাফ-ঘরে ঢুকিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম—ভয়ে ও সংকোচে হুট্ করিয়া ঢুকিয়া পড়িবার সাহস হয় নাই। অথচ পাড়ার রকে বসিয়া ওই হরিশদার সঙ্গে ঘুগনি খাইতে খাইতে কতদিনই না আড্ডা দিয়াছি! মানে, আপিসের পার্টিশানগুলা বড় নিষ্ঠুর—আপনকেও পর করিয়া দেয়।

সাহস করিয়া একবার গলা-খাঁকারি দিলাম। হরিশদা চশমার উপর দিয়া চাহিতেই আমাকে দেখিয়া বলিলেন, এইচিস্ ?

হ্যাঁ, এলাম তো।

ব'স্ ওই চেয়ারে।

সামনের চেয়ারটায় জড়সড় হইয়া বসিলাম। হরিশদা ফাইলের চিঠির কোণে কি সব খস্ খস্ করিয়া নোট লিখিয়া ফাইলের ফিতা বাঁধিয়া বলিলেন, দত্ত সাহেব একটু কাজে বেরিয়েছেন, টিফিনের পর ফিরবেন। তোকে ততক্ষণ দু-একটা টিপ্‌স্ দিয়ে দি।

বলিয়াই তাঁহার অতিপরিচিত নস্যের কৌটাটি বার করিয়া এক টিপ নস্য লইয়া নাকে গুঁজিলেন। রকে আড্ডা দিবার সময় আমিও ওই সময় কতদিন নস্য চাহিয়া নিজের নাকে গুঁজিয়াছি, কিন্তু চেয়ারে বসা হরিশদার কাছে নস্য চাহিবার সাহস হইল না। নাকটা সুড় সুড় করিয়া উঠিল একবার।

হরিশদা বলিলেন, আমি যখন রেকমেণ্ড করেছি, চাকরি তোর হয়ে যাবে ঠিকই ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাকরিটা বজায় রাখতে পারবি তো ?

কেন ?—ভয়ে ভয়ে বলিলাম।

ভারি তিরিক্ষি মেজাজ সাহেবের। অবশ্য ওপরওয়ালাদের নিয়মই এই। পান থেকে চুন খসলেই ক্ষেপে লাল। যে কথাটি বলবেন, সেইটি করা চাই-ই। কথার উপর কথা বলেছ কি গেছ। অবশ্য এতে ভয় পাবার কিছু নেই। সর্বত্রই তো এই। জল উঁচু তো জল উঁচু—জল নিচু তো জল নিচু—যদি বলতে পার, দেখবে জল ক'রে দিয়েছ তাকে, নইলে ওই জলে ডুবেই মরণ তোমার। এই যে তোর হরিশদা—ঢুকেছিল তিরিশ টাকা মাইনের কেরানী হয়ে, আজ তিন শো টাকার বড়বাবু—শুধু দুটি মন্তরের জোরে, হুঁ-হুঁ আর হেঁ-হেঁ !

বলেন কি দাদা !—অবাক হইয়া গেলাম। চকিতে নিমতলার সাধু আমার চোখের সামনে দাঁড়াইয়া সবজান্তার হাসি হাসিতে লাগিলেন যেন।

হরিশদা বলিলেন, ওই হুঁ-হুঁ আর হেঁ-হেঁ যদি করতে পার তবেই পারবে এই সংসারে টিকে থাকতে। ঘরে বউমার মুখে ফুটবে হাসি,

আপিসে সাহেবের মন খুশি। বাস্, আর তোমায় মারে কে? আর তা না করতে পারলেই নো হোয়ার, যাও বাহার!

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো হরিশদার কথা শুনিতেছিলাম। একই মন্তর দুইজনের কাছে শুনিয়া হতভম্ব আমি। সাধু মন্তর বলিয়া দিয়া হটাইয়াছিলেন, হরিশদা যেন কাছে টানিয়া তাহার মানে বুঝাইতেছেন। সাধু যেন টেক্সটবুক-লেখক, হরিশদা তাহার মেড-ইজি।

হরিশদা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার কথাগুলো মনে লাগছে তো?

লাগছে না আবার!

সত্যই, সাধুর মারফত মন্তর দুইটি পাইয়া মাথায় ঘুরপাক খাইতেছিল এতদিন, আজ হরিশদার কাছে তাহার অর্থ বুঝিলাম মন-প্রাণ দিয়া।

হরিশদা বলিলেন, তবে হ্যাঁ, এখন আমাদের যে স্টেজ এসেছে, তাতে আরও দুটো মন্তর ছাড়তে হয় প্রায়ই নিজেদের মান রাখতে। তবে সেগুলো ছাড়তে হয় নিম্নস্তরে যারা আছে তাদেরই লক্ষ্য করে! মানে, তাদের কাজে-কর্মে, কথায়-বার্তায় নাক সেঁটকানো। কেবল বলা— উঁহুঁ আর এঃ হেঃ! তবে এ মন্তরের সাধনা পরে—নিজের আসন পাকা ক'রে নিয়ে তবে।

হেসে বললাম, ওঃ, এতও জান তুমি হরিশদা!

হরিশদা বলিলেন, এত জানি ব'লেই তো এই পার্টিশন ঘরের চেয়ারে ব'সে আছি। নইলে বাইরে ওই গাদায় ব'সে আজও কলম পিষতে হ'ত। যাক, যা বলি শোন্, ওই ঊর্ধ্বভেদী মন্ত্র দুটি জপতে থাক্ এখন থেকে। দত্ত সাহেব কিছু জিজ্ঞেস করলেই বলবি—হুঁ-হুঁ, আর কিছু বললেই বলবি—হেঁ-হেঁ। বুঝলি তো?

বলিলাম, হুঁ-হুঁ! এ আর বুঝব না, হেঁ-হেঁ!

হরিশদা হাসিয়া ফেলিলেন।

তারপর দত্ত সাহেবের সামনে গিয়া টাইমমাফিক জুতসই হুঁ-হুঁ আর হেঁ-হেঁ করিতে পারিয়াছিলাম নিশ্চয়ই, কারণ চাকরিটা জুটিয়া গেল নির্বিঘ্নেই।

কাজেই আর দেরি না করিয়া ছুটিয়া গেলাম নিমতলায় সেই সাধুর খোঁজে। কান ধরিয়া যে মন্ত্র দিয়াছিলেন তিনি, প্রাণ ভরিয়া সে মন্ত্র উপলব্ধি করিয়াছি আজ। শুধু তাহাই নহে, সেই মন্ত্রই আজ প্রাণ-ধারণের উপায় হইয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু সাধু কই ?

চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। জায়গাটা খালি পড়িয়া আছে। মালগাড়িগুলা সান্টিং করিতেছে। লেবেল ক্রসিঙের গেটের পাশেই তো তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম সেদিন। বসিবার যোগ্য জায়গাই বটে ! ইহজগতে বাঁচিয়া থাকিবার মহামন্ত্র দেন যিনি, তিনি তো বসিবেন ওই পার্থিব মালগুদামেরই কাছে—যেখানে মালগাড়িরা আসা-যাওয়া করে।

পার্থিব জগৎ ছাড়িয়া যাহারা গিয়াছে, আর যাহাদের খাইবার বা খাওয়াইবার ভাবনা নাই—তাহাদের মন্ত্র আলাদা। এ শ্মশানে মৃতের কানে সেই মন্ত্র দেওয়া হয়—বল হরি হরিবোল !

কেন যেন মনে হইল, পার্থিব সাধুটি নিশ্চয়ই আসিবেন তাঁহার রোজগারের জায়গায়। আজ দেখা হইলে তাঁহাকে দুইটা টাকা দিব ঠিক করিয়াছি। পকেটের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া রূপার টাকা দুইটাকে চাপিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

আমার একপাশে ঘটাং ঘটাং শব্দ করিয়া মালগাড়িগুলা তখনও গুদামের কাছে সান্টিং করিতেছে ; অদূরে গঙ্গার তীরে শ্মশান হইতে উঠিতেছে আকাশ-কালো-করা ধোঁয়া—নিশ্চিহ্ন হইবার চিহ্ন।

শ্রীকুমারেশ ঘোষ

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

এই চৈত্র সংখ্যায় যাঁহাদের চাঁদা শেষ হইতেছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বৈশাখ সংখ্যা বাহির হইবার পূর্বে ৭ই বৈশাখের (২০শে এপ্রিল) মধ্যে মনি-অর্ডার যোগে চাঁদা পাঠাইয়া দিয়া আমাদের কার্যের সহায়তা করিলে বাধিত হইব। ওই তারিখের মধ্যে টাকা না পাইলে ভি. পি. করিয়া পরবর্তী সংখ্যা পাঠানো হইবে। যাঁহাদের আর গ্রাহক থাকিবার ইচ্ছা নাই, তাঁহারাও অনুগ্রহপূর্বক পত্র দ্বারা জানাইবেন। নচেৎ ভি. পি. ফেরত আসিলে আমাদের অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

বাতিঘর

লাল কুয়াশায় ঢাকে চারিধার রক্তসন্ধ্যা ঝরে—
ঘর বাড়ি সাঁকো কাছের মানুষ কোন্ দূরে যায় স'রে।
কান পেতে শুনি জলতরঙ্গে ওঠে মমতার গান,
লঘু হয়ে যায় এই দেহভার খুলে পড়ে শেষ টান।
আহা, চকোলেট সোনালী সে ঢেউ ভেঙে ভেঙে যায় চ'লে,
আহা, সে মায়ায় ছু চোখ ধাঁধায় আগুন লেগেছে জলে!
যেন মিশরের মরুস্থানের আড়ালে সূর্য ডোবে,—
যেন সভ্যতা উন্মাদ হয়ে ছোটে ধ্বংসের লোভে!
একাকী তো নই—ছায়ার মতন কে যেন সঙ্গে আছে
অনুভব করি কোন্ মোনালিসা পাশে পাশে চলিয়াছে!
মনে হয় ওই বিরাট আগুনে একে একে সব যদি
ব্যথা-বেদনার ফেলে দিই ভার—থাকে অপরূপ নদী।
তটরেখা বেয়ে গেছে যেই পথ স্বপ্নের অলকায়,
হাত ধরাধরি ক'রে যাই যদি সীমাহীন সীমানায়!

সেখানে কি আছে আলোক-স্তম্ভ সেই দূর মোহানায়—
সেখানে কি সব প্রশ্নের শেষ উত্তর জানা যায়?
সেই বাতিঘরে যায় না কি ধ'রে ক্লান্ত ক্লিষ্ট মন,
সুখ-দুঃখের ছোট সে বুনুনি পরিমিত আয়োজন।
সে কি মানুষের অসীম আরতি মহাসমুদ্র-বুকে—
প্রতিকূল যত শক্তির বেগ দৃঢ় ক'রে বাঁধে রুখে।
সামনে আছে সে ডুবানো পাহাড়, কালো আর শুধু কালো—
কিনারার কাছে ধ'রে থাকি একা সেই বাতিঘর-আলো।

শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ

বিনোবা

আলো নিভে গিয়েছিল—
আমাদের পথের আলো,
পৃথিবীর আশার আলো
১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি তারিখে ! ··
সেই আলো আবার জ্ব'লে উঠল—
তেমনি স্নিগ্ধ, তেমনি ভাস্বর
দাক্ষিণাত্যের পঞ্চমপল্লী গ্রামের এক প্রার্থনা-সভায় ,
সে তারিখও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে—
১৯৫১ সালের ১৮ই এপ্রিল। ··
পুণ্যক্ষণে ভূদান-যজ্ঞের আলো জ্বালালেন
মহা ঋত্বিক বিনোবা।
তেলেঙ্গানার হিংস্র বিষধর
মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত নির্জীব হয়ে পড়ল।
মানুষের বুকে জাগল আশা,
নিপীড়িত অন্তরাত্মা খুঁজে পেল বেদনাপাবের ভাষা।
শুরু হ'ল প্রজাসূয় যজ্ঞ—
রাজারা প্রমাদ গনলেন ! ··
ধীরপদবিক্ষেপে গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে চলেছেন
মহাত্মার সার্থক উত্তরাধিকারী ,
ভগবান্ বুদ্ধের মত
তিনি দ্বারে দ্বারে চাইছেন 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' !
আমরা কি দুয়ার রুদ্ধ ক'রে মুখ ফিরিয়ে থাকব ?
মহাভিক্ষুকের ঝুলি কি পূর্ণ হবে না সকলের আত্মদানে ?
এ প্রশ্নের উত্তর আজ সবাইকে দিতে হবে—
শুধু কাব্যে নয়, রেখা ও রঙের মাধ্যমে নয়,
জীবনের প্রতি মুহূর্তে
যেন বেজে ওঠে এই সর্বগ্রাসী প্রশ্নের—
'সর্বোদয়ে'র অনাহত ধ্বনি।

শ্রীপ্রভাত বসু

ডানা

সন্ন্যাসীর কাছ থেকে ডানা যখন চ'লে এল, তখনও বাইরে রোদের তেজ একটুও কমে নি। তখনও 'লু' বইছে। বাইরের এই রুদ্র রূপ কিন্তু ডানার মনকে একটুও স্পর্শ করল না। সে সন্ন্যাসীর কথাই ভাবছিল কেবল। ভাবছিল, উনি নিশ্চয়ই এমন একটা কিছুর সন্ধান পেয়েছেন, যার তুলনায় ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিষ্প্রভ হয়ে গেছে ওঁর কাছে। নিদারুণ কৃচ্ছ্রসাধনের ভেতর দিয়ে কি পেতে চাইছেন উনি? ভগবানকে? উঞ্ছবৃত্তিধারী না হ'লে ভগবানকে পাওয়া যাবে না? প্রশ্ন করলে উত্তর দেন না, চুপ ক'রে থাকেন, মাঝে মাঝে একটু হাসেন। কখনও অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন, কখনও আবার সোৎসাহে এমন সব কথা বলেন যার মানে বোঝা যায় না। অথচ ওঁকে পাগলও ঠিক বলা চলে কি? এই সব ভাবতে ভাবতে ডানা পথ চলছিল।

মাসীমা, মাসীমা, শুনুন—

ডানা ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, চণ্ডী ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে। কয়েক দিন আগে রূপচাঁদবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে এই ছেলেটি এসেছিল—ডানার মনে পড়ল।

কি?—ডানা দাঁড়িয়ে পড়ল।

চণ্ডী কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, চৌধুরীদের বাগানে একটা গাছে হলদে পাখির বাসা দেখে এসেছে গণেশ।

ও, আচ্ছা। গণেশকে নিয়ে এস। একটা চাকরকে নিয়ে যাব আমি। বাসাটা দেখব।

আপনি নিজে যাবেন?

যাব।

কখন আসব?

তোমাদের যখন সুবিধে। এখনই যেতে পারি।

গণেশকে নিয়ে আসছি তা হ'লে।—চণ্ডী একছুটে চ'লে গেল আবার।

সন্ন্যাসীর কথাটা ডানার মনের প্রত্যক্ষলোক থেকে স'রে গেল, কিন্তু

একেবারে অবলুপ্ত হ'ল না। সে তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে এসে দেখলে, কবি ব'সে আছেন। ডানাকে দেখেই বললেন, ছিলে কোথা? অমরেশবাবুর একখানা চিঠি এসেছে। আমি ভাবছিলাম, কাজে ইস্তফা দিয়ে দেব। কিন্তু ভদ্রলোকের কাণ্ড দেখ। উনি সিমলায় গিয়ে পাখি দেখে বেড়াচ্ছেন। কাশ্মীর ঘোরবারও ইচ্ছে আছে। অথচ চিঠিতে কোনও ঠিকানা নেই যে, চিঠি লিখি।

ডানা চিঠিখানা হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

কোথা গিয়েছিলে তুমি এই দুপুর রোদে?

সন্ন্যাসীটিকে কয়েকটা আম দিতে গিয়েছিলাম।

ও। সেই সন্ন্যাসী এখনও আছেন নাকি?

আছেন।

চিঠিটা আর একবার পড় দেখি চেঁচিয়ে।

ডানা পড়তে লাগল।—

প্রীতিভাজনেষু,

আনন্দবাবু, গতবার 'প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার'-এর (Paradise Flycatcher) যুগ্মমূর্তির একটা রঙিন ক্রিশমাস্ কার্ডে আপনি একটি কবিতা লিখে দিয়েছিলেন আমাকে। নকল ক'রে রেখেছিলেন কি না জানি না। তাই প্রতিলিপি আপনাকে আবার পাঠালাম। প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচারের দেশী নাম—দুধরাজ। কেউ কেউ শাহবুলবুল বলে; কিন্তু ওটা সম্ভবত ঠিক নয়। আপনার কবিতাটি এই।—

১

সমাজ মানে আঁধার গলি
বাধার কাদা মানার পলি
পরদানশীন আনারকলি
ছদ্মবেশে তাই বুঝি।
চুলগুলো তাই বব্ করেছে
নাই বুঝি তাই বোরখাটা
পরদা-ভাঙা সুর ধরেছে—
জরদা-রঙের ওড়নাটা।

২

তেপান্তরি মাঠের শেষে
রূপান্তরি স্বপনদেশে
শঙ্খধবল পাখির বেশে
রাজপুত্র ওই বুঝি
নূতন ধরন নূতন বরণ
নূতন রকম ছন্দ রে
সাদায় কালোয় মেলায় চরণ
কষ্টি এবং মর্মরে।

কবিতাটি টুকে রাখবেন। আমার খুব ভাল লেগেছে। মেয়ে পাখিটির মধ্যে আপনি যে আনারকলিকে প্রত্যক্ষ করেছেন, এতে আপনার কবি-কল্পনার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে।

আমরা এখন সিমলায় আছি। কাশ্মীরের নানা জায়গায় বেড়াবার ইচ্ছে আছে। আপনাকে কাশ্মীরের পাখি বিষয়ে একটি বই পাঠালাম। ছবি দেখে যদি কবিতার প্রেরণা পান খুশি হব। যদি কবিতা লেখেন আমাকে পাঠাবেন।

এখানে অনেক নূতন পাখি দেখলাম।

আমাদের শালিকের মত অনেকটা দেখতে একরকম পাখি আছে, গায়ে সাদা সাদা দাগ, নাম Striated Laughing Thrush (স্ট্রায়েটেড্ লাফিং থ্রাশ্)—এদের দেশী নাম কি জানি না। তবে থ্রাশ পাখির কাস্তুরা, পাণ্ডু, শামা এসব নাম শুনেছি, পড়েওছি। এদের হুইশলিং ডাকটা খুব অদ্ভুত—'ও সি হোয়াইটি—ও হোয়াইটি'। এ অঞ্চলে এ পাখি অনেক। হিমালয়ের বসন্ত-বউরি পাখিও দেখলাম। বেশ বড় পাখি। প্রায় পায়রার মতো। সালিম আলির 'ইণ্ডিয়ান হিল বার্ড্‌স্' বইটাতে ছবি আছে দেখবেন। পাখিটার সর্বাঙ্গে চমৎকার রঙ। নানা রকম রঙ। তা ছাড়া গ্রেহেডেড ফ্লাইক্যাচার, ভারডাইটার ফ্লাইক্যাচারও (Verditer Flycatcher) অনেক দেখলাম এখানে। এই শেষোক্ত পাখিটি চমৎকার দেখতে। নীল রঙের ওপর

সবুজের আভা। আপনি দেখলে নীল-পরী বা ওই ধরনের কিছু একটা নামকরণ ক'রে ফেলতেন। আসামের দিকে ফেয়ারি ব্লু-বার্ড (Fairy Blue Bird) নামে নাকি এক রকম পাখি আছে, দেখি নি এখনও। এখানে হিমালয়ান হুইশলিং থ্রাসের একটানা শিস ঝরনার কলধ্বনি ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে বেশ। কোকিলের কুহু কুহু ডাকেই অভ্যস্ত আমরা। এখানে কুলু উপত্যকায় কুক্কুর 'কুক্-উ' ডাক শুনলাম। কিন্তু সালিম আলির বইয়ে এ কথা লেখা নেই। আর একটি নতুন পাখি দেখে ভারি আনন্দ পেলাম। ব্রাউন ডিপার। ব্যাল নদীর স্রোতে খেলতে দেখলাম পাখিটিকে। এর কথা প'ড়ে দেখবেন। অদ্ভুত লাগবে। এরা খুব উঁচুতে তুষারাচ্ছন্ন অঞ্চলে থাকে। আর খেলা করে স্বচ্ছ বরফ-গলা নদী-স্রোতে। কথাটা যত সহজ শোনাল আসলে ততটা সহজ নয়। পাহাড়ের বরফ-গলা নদী তোড়ে নেবে আসে—ফেনায় আবর্তে কলকলধ্বনিতে চতুর্দিক মাতিয়ে। এ দুর্দম দুরন্ত নদীর জলে ওই ছোট্ট বাদামী রঙের পাখিটি (আমাদের দোয়েলের চেয়ে বড় নয়) ঝাঁপাই ছুঁড়তে ভালবাসে। জলের তলায় ডুব-সাঁতার কেটে খাদ্য অন্বেষণ করে। ব্যাপারটা কল্পনা করুন। একে যদি জল-পরী বলেন ঠিক মানাবে না। জলদস্যু বললে খানিকটা ঠিক হবে হয়তো। দু রকম ডিপার আছে, এক রকম পুরোপুরি বাদামী, আর এক রকমের বুকটা সাদা (এর ছবি সালেম আলিতে পাবেন)। ব্লু ম্যাগপাইও এ অঞ্চলে যথেষ্ট। আপনারা ওখানে যে ল্যাজঝোলা পাখি দেখেন (যার ইংরেজী নাম টি পাই, বাংলায় কেউ কেউ হাঁড়িচাঁচাও বলে) তারই জ্ঞাতি এই ব্লু ম্যাগপাই। বেশ বড় পাখি। প্রায় বাইশ তেইশ ইঞ্চি লম্বা হবে। ল্যাজটা খুবই লম্বা। নীল (প্রায় কালো) রঙের সঙ্গে সাদা ও ধূসরের অপূর্ব সমন্বয়। ঠোঁটটি লাল। হলদে ঠোঁটওলা আর একটা জাতও আছে, কিন্তু এখানে লাল-ঠোঁটই বেশি। কালিজ ফেজাণ্ট (Kalee Pheasant), মোনাল ফেজাণ্টও (Monal Pheasant) দেখেছি চমৎকার বর্ণসজ্জা। একটা 'স্কিন' জোগাড় করেছি। এখানে বার্কিং ডিয়ারও (Barking Deer) পাওয়া যায়। শিকার করতে দেখেছি

আরও নানা রকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। সব চিঠিতে লেখা যাবে না। আপনারা আশা করি ভাল আছেন। আমি দিন সাতেক পরে এখান থেকে চ'লে যাব আরও উঁচুতে। সম্ভব হ'লে নূতন ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখব। শ্রীমতী ডানা আশা করি ভাল আছেন। আমার পাখিগুলি কেমন আছে ?

আমরা ভাল আছি। আপনারা আমাদের ভালবাসা নিন। বুল্লা ডানাকে একটা চিঠি দেবে বলেছিল, কিন্তু আর ডাকের সময় নেই। ইতি

আপনাদের অমরেশ

চিঠি পড়া শেষ হতেই কবি বললেন, কাণ্ড দেখ! এ এক আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেল দেখছি! এই খুনের মোকদ্দমা এখন কতদিন চলবে তার ঠিক নেই। এখুনি আমার কাজে ইস্তফা দিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।

ডানা একটু মৃদু হেসে বললে, কিন্তু আমি যা শুনলাম তাতে কাজে ইস্তফা দিলেও আপনি মোকদ্দমার হাত থেকে উদ্ধার পাবেন না।

কেন ?

যে মেয়েটি খুন হয়েছে, তার ঘর খানাতল্লাসি ক'রে পুলিস আপনার লেখা এক টুকরো চিঠি নাকি বার করেছে। বাকী খাজনার নোটিশের পিছনে 'পুনশ্চ' দিয়ে আপনি কিছু লিখেছিলেন নাকি ?

লিখেছিলাম হয়তো। শুধু তার নয়, অনেকেরই নোটিশের পিছনে লিখেছি। দেখলাম, অনেক খাজনা বাকি প'ড়ে রয়েছে, যদি কিছু মাপ ক'রে দিলে আদায় হয় তাই সে কথা লিখে দিয়েছিলাম অনেক নোটিশের পেছনে। কেন, তাতে অন্যায়টা কি হয়েছে ?

অন্যায় কিছু হয় নি। তবে পুলিস নাকি ওই সূত্র ধ'রেই আপনাকে জড়িয়েছে এতে ?

কে বললে ?

রূপচাঁদবাবু।

রূপচাঁদ কবে এসেছিল তোমার কাছে ?

আপনি যেদিন সদর এস.ডি.ও.র কাছে যান, সেই দিনই। ও নিয়ে

মিছিমিছি মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? আপনার কোনও ভয় নেই। আমাদের এস্টেটের ভাল উকিল আছেন, তিনি যা করবার করবেন। আমি ফিরে এসেই অমরবাবুর স্ত্রীকে একটা চিঠি লিখেছি। কিন্তু তিনি সে চিঠি পাবেন না বোধ হয়।

কি লিখেছ?

এখানকার সব ঘটনা। আপনি অমরবাবুকে কিছু লেখেন নি? ওঁদের সব ঘটনা জানানোই তো ভাল।

আমি ভাবছিলাম, কাজে একেবারে ইস্তফা দিয়ে দেব। কিন্তু মন স্থির করতে পারি নি, তাই দেরি হচ্ছে। তোমার মতে তা হ'লে কাজ ছাড়া ঠিক নয়?

ডানা হেসে বললে, সেটা আপনি ঠিক করুন। আমি কি বলব!

না, তুমিই ঠিক কর। তুমি যা বলবে তাই করব। আমার নিজের ওপর আর আস্থা নেই।

কবির কণ্ঠে যে অসহায় স্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল তা শিশুর কণ্ঠেই মানায়।

ডানা হাসিমুখে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। তারপর বললে, তাড়াতাড়ি এখন কাজ ছাড়বার দরকার কি! যেমন চলছে চলুক না। এ মোকদ্দমার কিছু হবে না।

বেশ।

গণশাকে সঙ্গে ক'রে চণ্ডী এসে হাজির হ'ল। গণশা চণ্ডীরই সমবয়সী, কিন্তু বেশ সপ্রতিভ। মাথার চুল দশ-আনা ছ-আনা, পরিধানে হাফপ্যাণ্ট হাফশার্ট, হাতে একটি গুলতি। ডানার দিকে ফিরে প্রশ্ন করলে, আপনি ডেকেছেন আমাকে?

ডানা একবার চণ্ডীর দিকে একবার গণশার দিকে চেয়ে দেখলে।

তুমি হলদে পাখির বাসা কোথায় দেখেছ?

অমরবাবুর বাগানে।

আমাকে দেখিয়ে দিতে পারবে?

পারব। অনেক উঁচুতে আছে। গাছে না উঠলে দেখা যাবে না কিন্তু।

আমার দুরবীন আছে, আমি নীচে থেকেই দেখতে পাব।

বেশ, চলুন তা হ'লে।

ডানা কবির দিকে ফিরে বললে, আপনি বসুন। আমি হলদে পাখির বাসাটা দেখে আসি চট ক'রে।

কবি বললেন, এরা কে?

চণ্ডী আর গণেশ। এদের হলদে পাখির বাসার সন্ধান করতে বলেছিলাম। আপনি বসুন, আমার বেশি দেরি হবে না।

চল না, আমিও যাই।

না, এই রোদে আপনার কষ্ট হবে। আপনি বরং বসুন এখানে। এই বইগুলো ওলটান কিংবা লিখুন কিছু।

বেশ। বেশি দেরি ক'রো না কিন্তু।

না, দেরি হবে না।

চণ্ডী ও গণশাকে নিয়ে ডানা বেরিয়ে পড়ল।

অমরবাবুর বাগানে ডানা ইতিপূর্বে আসে নি কখনও। দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। মনে হ'ল, এ একটা আলাদা জগৎ যার পরিচয় সে জানত না। নানা রকম পাখি ডাকছে—কোকিল, বসন্ত-বউরি, চোখ-গেল, দোয়েল, ফিঙে, নীলকণ্ঠ। ভগীরথের অবিশ্রান্ত টুক্-টুক্-টুক্ও ধ্বনিত হচ্ছে কোথায় যেন। প্রজাপতি উড়ছে নানা রঙের। পতঙ্গের বিচিত্র ডাক মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। দূরে একটা তালগাছের ওপর শকুনি ব'সে আছে একটা। আর সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে আমগাছেরা—কেউ ফল-ভারনত, কেউ মুকুল-ভূষিত, কেউ রিক্ত, কারও বা শাখায় কিশলয়ের শোভা। তারা নীরব ভাষায় যা বলছে তা অবর্ণনীয়। ডানা বাগানের মাঝখানে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তার মনে হ'ল সন্ন্যাসীর কথা। মনে পড়ল তিনি একদিন বলেছিলেন—পৃথিবীর এই বৈচিত্র্যের অন্তরালে যিনি আছেন, তিনিই সত্য, তিনিই ব্রহ্ম। তাঁকে জানলে মানুষের কোন ভয় থাকে না, তাই তিনি অভয়। এমন ভাবে বলেছিলেন যেন তিনি চেনেন তাঁকে। অথচ স্বীকার করেন না

সে কথা। বলেন—পাই নি এখনও, খুঁজছি। ডানা ভাবতে চেষ্টা করল, ওই মুকুল-ভরা আমগাছ, ওই দোয়েলের গিটকিরি, ওই পতঙ্গের কর্কশ চিৎকার আর ওই শকুনির বীভৎস চেহারা—এ সবই ব্রহ্মের প্রকাশ? এদের মধ্যে মিল কোথায়? কথাটা জিজ্ঞাসা করতে হবে একদিন।

চণ্ডী আর গণেশ এসেই চ'লে গিয়েছিল খুব বড় একটা আমগাছের তলায়। গণেশ গাছটায় উঠেছিল। ডানা দেখতে পেলে, গণেশ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ডানা এগিয়ে গেল। গণেশ গাছের ওপর থেকেই ফিসফিস ক'রে বললে, আমি যেদিকে আঙুল দেখাব, সেইদিকে দূরবীন দিয়ে দেখুন। ওই যে ডালটা বাইরের দিকে বেরিয়ে আছে, তারই ডগায় দেখুন বাটির মত ঝুলছে, তার ওপর হলদে পাখিটা ব'সেও আছে। ওই দেখুন, উড়ে গেল।

ডানা দূরবীন দিয়ে বাসাটা দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু পাখিটাকে দেখতে পায় নি। বললে, দেখেছি। নেবে এস। রোজ এসে খবর নিতে হবে। ওটা হলদে পাখিরই বাসা।

গণেশ তরতর ক'রে নেবে পড়ল।

রোজ খবর নেওয়া তো মুশকিল। ইস্কুল পালিয়ে আসা যাবে না। মাসী জানতে পারলে খাওয়াই বন্ধ ক'রে দেবে।

ও! মাসীমা বুঝি খুব কড়া গার্জেন?

আর বলবেন না। সমস্ত সকালটি তাঁর সামনে ব'সে পড়া করতে হয়। দুপুরে ইস্কুল, সেখানে আছেন রামবাবু। আসলে তিনি রাবণবাবু। একটি ভুল হ'লে আর রক্ষে নেই। বিকেলে ফিরে জলখাবার খেয়ে মাসীমার সামনে ব'সে দুখানি বাংলা, দুখানি ইংরিজী হাতের লেখা লিখে তবে ছুটি। তখন অন্ধকার হয়ে যায়, তখন এই বাগানে এসে কি পাখির খবর নেওয়া যায়? রবিবারে কিংবা ছুটির দিনে নিতে পারি।

ডানা জিজ্ঞেস করলে, তোমার মা-বাবা কোথা?

তাঁরা অনেক দিন আগেই মারা গেছেন। মাসীই আমাকে মানুষ করেছেন।

তোমার মেসোমশাই কি করেন?

তিনিও মারা গেছেন। অমরবাবুর এস্টেটে চাকরি করতেন আগে।

এখন তোমাদের চলে কি ক'রে তা হ'লে ?

অমরবাবুর এস্টেট থেকেই মাসী মাসোহারা পান। কিছু জমিও দিয়েছেন অমরবাবু।

তোমার মাসীমার ছেলেপিলে কটি ?

মাসীর কোনও ছেলে হয় নি।

চলতে চলতে কথাবার্তা হচ্ছিল। চণ্ডী চুপ ক'রে ছিল এতক্ষণ। হঠাৎ সে বললে, গণশা প্রতিবার ফার্স্ট হয়।

গণেশ ধমক দিয়ে উঠল, চুপ কর্‌, ফাজিল কোথাকার।

চণ্ডী যেন চুপসে গেল।

এই দুটি কিশোরের সঙ্গ খুব ভাল লাগছিল ডানার। একটা গোপন মাধুর্য ধীরে ধীরে তার মনকে পরিপূর্ণ ক'রে তুলছিল। তার এও মনে হচ্ছিল, পৃথিবীর চারিদিকে—দূরে নিকটে এই যে এত মাধুর্য ছড়িয়ে রয়েছে তার সঙ্গে তার যেন ঘনিষ্ঠ কোন যোগ নেই। সকলের কাছেই সে যেন পর। কারোরই আপন লোক নয় সে। সবাই তাকে খাতির করে, অনেকেই তার সঙ্গে আত্মীয়ের মত কথাও কয়, খুব ঘনিষ্ঠভাবে পেতেও চায় দু-একজন (যেমন আনন্দবাবু, রূপচাঁদ); কিন্তু দূরত্বটা যেন ঘুচতে চায় না। মনে হয়, সে যেন এদের মাঝখানে আগন্তুক একজন। এসেছে আবার চ'লে যাবে। সন্ন্যাসীর কথা মনে হ'ল হঠাৎ। মনে হ'ল, আজই আবার দেখা করতে হবে তাঁর সঙ্গে। চণ্ডী বললে, আমি এসে খোঁজ নিয়ে যাব রোজ। কিন্তু মুশকিল হয়েছে আমি গাছে উঠতে পারি না ভাল।

তোমাদের কাউকে আসতে হবে না। আমিই আসব এখন বিকেলের দিকে।

আমিও থাকব আপনার সঙ্গে। আমাকে দূরবীন দিয়ে দেখিয়ে দেবেন তো ?

দেব।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর চণ্ডী সসঙ্কোচে বললে, রূপচাঁদবাবুর বাড়ি যাবেন ? কাছেই খুব।

রূপচাঁদবাবু আপিস থেকে ফিরেছেন এখন। বকুলদি ব্যস্ত আছেন। পরে যাব কোনদিন দুপুরে।

কবে যাবেন ?

চণ্ডীর কণ্ঠস্বরে আগ্রহ ফুটে উঠল। ডানা কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই সে আবার বললে, দুপুরে যাওয়াই ভাল। আপনি যেদিন বলবেন এসে নিয়ে যাব আপনাকে। কাল যাবেন ?

ঠিক বলতে পারছি না।

কাল সকালে এসে তা হ'লে জেনে যাব। কেমন ?

আচ্ছা।

চণ্ডীর কেমন যেন মনে হচ্ছিল, ডানার সঙ্গে বকুলবালার যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে পারলে তার এয়ার্-গান্ পাওয়া সহজ হয়ে যাবে।

গণেশ হঠাৎ বললে, ফিঙে পাখির বাসাও দেখেছি আমি একটা। অনেকটা হলদে পাখির বাসার মত দেখতে। একবার দেখেছিলাম, একই গাছে প্রায় পাশাপাশি ফিঙে পাখি আর হলদে পাখির বাসা ছিল—

গণেশের কথাবার্তায় ডানা বুঝতে পেরেছিল যে, ছেলেটি সত্যিই বুদ্ধিমান। তার মনে হ'ল, অমরেশবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে তিনি হয়তো ছেলেটিকে ভাল ক'রে মানুষ ক'রে তুলতে সাহায্য করবেন।

পাখির বাসা দেখবার খুব ঝোঁক বুঝি তোমার ?

গণেশ বললে, ঝোঁক আগে ছিল না। কিন্তু অমরেশবাবু বলেছেন যে, পাখি সম্বন্ধে স্কুলের ছেলেদের মধ্যে যে সবচেয়ে ভাল প্রবন্ধ লিখবে তাকে তিনি এক শো টাকার প্রাইজ দেবেন। প্রাইজটা আমাকে নিতে হবে। অমরেশবাবু বলেছেন—বই দেখে লিখলে চলবে না, নিজের চোখে পাখিদের লক্ষ্য ক'রে লিখতে হবে। তাই সময় পেলেই পাখি দেখে বেড়াই।

তুমি লক্ষ্য করেছ কিছু ?

কিছু কিছু করেছি।

খাতায় লিখে রেখেছ ?

রেখেছি।

দেখিও তো আমাকে একদিন।

আচ্ছা। আমি এবার যাই। আমার বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছি। ওই যে আমার বাড়ি।—গণেশ আঙুল দিয়ে ছোট একটি মাটির বাড়ি দেখিয়ে দিলে।

ও, আচ্ছা। তোমার মাসীমার সঙ্গে এসে আলাপ করব একদিন।

আসবেন।

গণেশ চ'লে গেল।

গণেশ সব দিক দিয়েই চণ্ডীর চেয়ে ভাল ছেলে। উঁচু ক্লাসে পড়ে, ফার্স্ট হয়, পাখির সম্বন্ধে অনেক কিছু জানে—এ সবই সত্য; কিন্তু এ সত্য ডানার কাছে এমন ভাবে প্রকটিত হওয়াতে চণ্ডী একটু মন-মরা হয়ে পড়ল। সে স্কুল-পালানো খারাপ ছেলে। এক বকুলবালা ছাড়া আর কেউ তাকে প্রশ্রয় দেয় না। তার আশা হয়েছিল, ডানাও হয়তো দেবে। কিন্তু গণেশের মত একটা জ্যোতিষ্ক এসে পড়াতে সে একটু নিষ্প্রভ হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে বললে, গণশা মাথায় মাথায় আমার মত দেখতে। কিন্তু ওর বয়স হয়েছে বেশ। ষোল পেরিয়ে গেছে—ওর মাসী বলছিল।

ডানা অন্যমনস্ক হয়ে ছিল, কোনও উত্তর দিলে না। চণ্ডী আড়চোখে একবার চেয়ে দেখলে ডানার দিকে, আর কিছু বলা সমীচীন মনে হ'ল না তার। নীরবেই বাকি পথটুকু হেঁটে ডানার বাসার কাছাকাছি যখন এল, তখন বললে, মাসীমা, আমি তা হ'লে এবার যাই। কাল আসব সকালে!

এসো। কিছু খাবে না কি?

না, আমার খিদে পায় নি।

তবু দুখানা বিস্কুট নিয়ে যাও।

ডানা ঘরে ঢুকে চারখানা বিস্কুট এনে দিলে তাকে। মহানন্দে চ'লে গেল চণ্ডী। ডানা ঘরে ঢুকে দেখলে, কবি টেবিলের উপর কবিতা লিখে গেছেন একটা।

অমরবাবুর নির্দেশ অনুসারে একটি পাখির ছবি দেখে কবিতা লেখবার চেষ্টা করলাম। এই দাঁড়াল—

১

খাঁচার টিয়ার সাথে বুনোটার মিল নেই
এটা পড়ে, ওটা পড়ে না
আসল পাখির সাথে ছবিটার মিল নেই
এটা নড়ে, ওটা নড়ে না।
কার সাথে কার কত মিল বা অমিল আছে
খুঁজি খালি দিবা-রাতি রে
হিসাবের গোলমালে বেসামাল হয়ে পাছে
ছুঁচো ব'লে ফেলি হাতীরে
এই ভয়ে ক্রমাগত কষিতেছি অঙ্ক
ওদিকে কমল ফোটে ভেদ করি পঙ্ক।

২

জীবনের পথে যেতে দেখা হ'ল যার সাথে
সে যেন রাগিণী ললিতা
কিংবা পাহাড়ি-পথে ঝরনার ধারা। যেন
উচ্ছলা কল-কলিতা!
তারে ল'য়ে কি করিব ভাবিতে ভাবিতে মোর
বেলা ব'য়ে গেল হায় রে
কি লেবেল গায়ে তার জানি না মানাবে ঠিক
বিবেক যে ধমকায় রে
ঠিক ক'রে যুক্তির তুলোটাকে ধোন্ না
ওটা তোর মাসী, পিসী, প্রেয়সী না কন্যা!

৩

কবি কয়—তুত্তোর
দেব নাকো উত্তর!

[ক্রমশ]

"বনফুল"

উতোর

আরশুলা নিয়ে রসের ভিয়ান, ইচ্ছা ছিল না ভাই,—
এড়াতে পারি না স. শ. চি.র দেওয়া "রাইট অব রিপ্লাই"।
শুনে সুখী হ'নু—পাঠাও নি তুমি, এল তারা চুরি ক'রে
মেয়ে-জামাইকে যৌতুক-দেওয়া খাটের মোড়ক ভ'রে।
রেলভাড়া নাকি ফাঁকি দিল তারা; কি তাদের অপরাধ?
মনে বুঝে দেখ, তুমি আমি তাহে নয় কম ওস্তাদ।
যা হোক, তাদের সহ্য হ'ল না জবর কবির ঘর
বাঞ্ছিত রস বিহনে শুকাল সে চিকণ কলেবর।
দল বেঁধে সব গেল মোরে ছাড়ি, আশা করি নিরাপদে
পৌঁছেছে তারা কবিশেখরের অফুরান রসহ্রদে।
আর যাহাদের পাঠাইলে তুমি লুকায়ে গদির ফাঁকে
তাদের খোঁজ তো পেলাম না কই চশমা এঁটেও নাকে!
শুনিয়াছি রেলে আছে নাকি বহু অসৎ কর্মচারী,
এ তাদেরি কাজ, দামী জিনিসটা সরিয়েছে তাড়াতাড়ি।
বেহাই-ঠকানো সে খাট কিন্তু মেয়ে-জামাইয়ের ঘরে;
গদির গর্তে যদি কিছু থাকে কে তার খবর করে?
কোন্ ফাগুন যে কোথায় ফিরেছে, বুঝেও বুঝ না তা কি?
বৃদ্ধ হইয়া বেতালভট্ট বেতালা হইল না কি?

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

দাদের দাবি

[রোগজগৎও যে শ্রেণী-সচেতন হইয়াছে তাহা জানিতাম না। আমার জনৈক রোগীর স্কন্ধে দাদ হইয়াছিল। তাঁহার জন্য একটি মলম ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম, ভীষণাকৃতি একটি মহিষের

মত লোক তর্জনী আস্ফালন করিয়া নিম্নলিখিত কবিতাটি আবৃত্তি করিতেছে। দাদ কেন যে নিজেকে প্রোলিটারিয়েট মনে করিলেন বুঝিলাম না। ডাক্তারী শাস্ত্রে তো এরূপ শ্রেণীবিভাগ নাই!]

শোন ডাক্তার, আমার আওয়াজ—আমিই মহিষা দাদ,
প্রোলিটারিয়েট-বংশোদ্ভব নব-যুগ-প্রহ্লাদ।
না হয় তোমার রোগীর স্কন্ধে দু দিন বেঁধেছি বাসা
অমনি আমারে মারিয়া ফেলিবে ? যুক্তি তো বেশ খাসা!
শোন ডাক্তার, আমার আওয়াজ, শোন শোন মন দিয়া—
যদিও নহিকো যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, সিরিংগোমায়েলিয়া,
তবু মোর নামে বাগদাদ আজ বিখ্যাত ধরণীতে,
দাদুরি-অঙ্গে আমিই রয়েছি খালে বিলে সরণীতে!
আমারই নামের মহিমা বাখানে দাদখানি নামে চাল,
মজলিসে ব'সে শোন নি কখনও ডুলকি দাদরা তাল ?
জ্যেষ্ঠ যে এত শ্রেষ্ঠ হয়েছে কে দিবে তাহারে বাধা,
আমারই নামেতে আকার লভিয়া হয়েছে সে জন দাদা।
সাধক দাদুও আমার নামটি সাদরে গেছেন বরি',
দাদন রূপেতে সকলের ঘরে নিত্য বিরাজ করি।
না হয় তোমার রোগীর ঘাড়েতে থাকিতে দিবে না মোরে,
তা ব'লে ভেবো না, ওগো ডাক্তার, লোপ পাব চিরতরে।
চাঁদের মুখে যে কলঙ্ক দেখ, কলঙ্ক তাহা নয়—
নিশানাথ-মুখে বাঁধিয়াছি বাসা, আমিই হে মহাশয়।
হেন ঠাঁই তুমি খুঁজিয়া পাবে না যেথা নাহি মোর গতি,
দেহের গোপন অন্তঃপুরে পোষে মোরে সৎ সতী।
চুলকায়ে পাছে বিরক্ত করে 'চুলকোনা' নাম ধরি',
তবু চুলকায় ধনী দরিদ্র পরম আরাম করি।
সবার চর্মে সবার মর্মে বাজে মোর জয়-ভেরি—
হাটাও তোমার মলম-ফলম ক'রো না ক'রো না দেরি।

"বনফুল"

মহাস্থবির জাতক

সতেরো

অনেকক্ষণ আর কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমের সাধনায় মন দিলুম। কিন্তু নিশ্চিন্ত হবার উপায় কি! একটু পরেই আবার সেই রকম হাঁক-ডাক শুনতে পাওয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে খুব ভারী পদক্ষেপে লোহা-বাঁধানো জুতো প'রে কে যেন ওপরে উঠে আসতে লাগল। আমি সুকান্তকে বললুম, মট্‌কা মেরে প'ড়ে থাকা যাক, হাজার চেঁচামেচি করলেও ওঠা নয়।

লোকটা সেই রকম হৈ-হৈ করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠল। তারপর এ-ঘর ও-ঘর করতে করতে আমাদের ঘরে এসে সেই রকম চীৎকার ক'রে তার বৃষচক্ষু লণ্ঠন দিয়ে ঘরের চারিদিকে কি খুঁজতে আরম্ভ করলে। আমরা চোখ চেয়েই প'ড়ে প'ড়ে দেখতে লাগলুম। চক্রাকার এক টুকরো আলো এ-কোণ ও-কোণ এদিক সেদিক ঘুরে ঘুরে শেষকালে আমাদের ওপরে এসে স্থির হ'ল।

আমাদের দেখে লোকটা আরও ভীষণ চীৎকার ক'রে সেইখানে দাঁড়িয়েই কি সব বলতে লাগল; কিন্তু আমরা কোন সাড়া না দিয়ে তখনও মটকা মেরে প'ড়ে রইলুম। তখন লোকটা ঘরের মধ্যে ঢুকে প্রায় আমাদের কাছে এসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কি সব বলতে লাগল। সুকান্ত আর চুপ ক'রে থাকতে না পেরে উঠে প'ড়ে বললে, কেয়া হ্যায়?

লোকটা একটু ভড়কে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তুম্ কাঁহাকা আদমী হ্যায়?

সুকান্ত বললে, আমরা কলকাতার লোক।

কিন্তু এখানে বাইরের কোনো লোকের আসবার হুকুম নেই।

সুকান্ত আবার বললে, আমরা বাইরের লোক নই, আমরা এই ভারতবর্ষেরই লোক।

লোকটা বোধ হয় বুঝতে পারলে যে, এদের সঙ্গে তর্ক ক'রে কিছু হবে না, তখন সে অন্য উপায় অবলম্বন করলে। সে বললে, তোমাদের থানায় যেতে হবে।

সুকান্ত বললে, বেশ, যাওয়া যাবে। কাল সকালে যাব থানায়।

এখুনি যেতে হবে।

এখুনি যেতে পারব না।

কেন পারবে না?

আমার এই বন্ধুর জ্বর হয়েছে, এ এখন উঠতে পারবে না।

জ্বর হয়েছে শুনে লোকটা টপ ক'রে তিন-চার পা পেছনে স'রে গিয়ে বললে, জ্বর হয়েছে! কখন থেকে জ্বর হয়েছে?

আজ সকাল থেকে জ্বর হয়েছে।

পুলিস-কন্স্টেবল আরও কয়েক পা পেছনে ছটকে গিয়ে চেঁচাতে লাগল, আরে, ওর তো নির্ঘাত পেলেগ হয়েছে, এবারে এদিকে খুব পেলেগ হচ্ছে, ও মরলে পরে মুর্দা ফেলবে কে? ও তো কালই মরবে।

সুকান্ত বললে, সে মরলে দেখা যাবে।

লোকটা বললে, তা হ'লে তুমি একাই থানায় চল। সেখানে গিয়ে ওর যা ব্যবস্থা হয় করা যাবে।

সুকান্ত বললে, ওকে ছেড়ে এই রাতে আমি কোথাও যাব না। কাল সকালে যা হয় তখন দেখা যাবে।

সুকান্তের সঙ্গে লোকটা চেঁচামেচি করতে লাগল। আমি প'ড়ে প'ড়ে ভাবতে লাগলুম, প্লেগ হয়েছে কি রে বাবা! কালই মরতে হবে!

ওদিকে লোকটা সুকান্তকে মারতে উদ্যত হয়েছে দেখে আমি টপ ক'রে উঠে ব'সেই জিজ্ঞাসা করলুম, কি হয়েছে? তুমি অত চেঁচাচ্ছ কেন?

মুমূর্ষু প্লেগ-রুগীকে ওই রকম ঝাঁকি মেরে উঠতে দেখে লোকটা স্পর্শের ভয়ে একেবারে ঘরের বাইরে গিয়ে সেই বৃষচক্ষু লণ্ঠনটা আমার মুখের ওপর ধরলে। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলুম, কি চাই তোমার? রাত-দুপুরে এসে কেন হাঙ্গামা লাগিয়েছ?

সে বললে, তোমাদের থানায় যেতে হবে।

এবারের ভাষা এবং ভঙ্গী অনেক নরম। জিজ্ঞাসা করলুম, কেন থানায় যেতে হবে? আমরা কি চোর, না, ডাকাত?

লোকটা খুবই নরম হয়ে বললে, না না, তা নয়, থানার অফিসার তোমাদের ডাকছেন।

চল্ সুকান্ত।—ব'লে তার হাত ধ'রে টেনে তুলে সেই লোকটাকে বললুম, চল, তোমার থানায় যাই।

লোকটার সঙ্গে সেই রাত্রে ধর্মশালা ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। স্টেশন-সংলগ্ন জায়গা ব'লে সেখানটা বেশ আলো। স্টেশনের পাশেই রেল-পুলিসের থানা। লোকটা আমাদের সেই থানার মধ্যে নিয়ে গেল।

সেখানে একটা ঘরের মধ্যে খুব উজ্জ্বল আলো জ্বলছিল। এখানে ওখানে দু-তিন জন লোক চেয়ারে ব'সে কাজ করছে দেখলুম। পুলিস-কন্স্টেবল এদেরই মধ্যে একজন মুরুব্বি গোছের লোকের কাছে আমাদের নিয়ে গিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে "ইকৃড়ে-তিকৃড়ে" ক'রে কি সব বললে। তার বলা শেষ হয়ে গেলে কর্মচারীটি আমাদের ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের বাড়ি কোথায়?

বললুম, আমাদের বাড়ি কলকাতায়।

এখানে কি সিধে কলকাতা থেকে আসছেন?

না, আমরা সুরাট থেকে আসছি।

লোকটির কথাবার্তা বেশ নম্র এবং ভদ্র—ঠিক পুলিসজনোচিত নয়। একটু পরে জিজ্ঞাসা করলেন, সুরাটে আপনারা কি করেন, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

বললুম, সুরাটে আমরা কিছুই করি না, সেখানে আমাদের বন্ধু আছেন—তিনি ব্যবসা করেন, আমরা সেখানে এসেছি কর্মের সন্ধানে।

কি কর্ম?

কোন চাকরি-বাকরি।

তবে নোভা-সারিতে এসেছেন কেন?

ওই একই উদ্দেশ্যে।

এবার লোকটি বললেন, আপনারা বসুন।

আমরা বসতেই ভদ্রলোক বললেন, দেখুন, এই জায়গাটি হচ্ছে গাইকোয়াড়ের রাজত্ব। এখানে বাইরের লোক এলে তার ওপর নজর

রাখা হয়। আমি আপনাদের ভালর জন্যেই বলছি—আপনারা এখান থেকে এখুনি চ'লে যান, নচেৎ নানা রকম ফ্যাসাদে পড়বেন। আপনারা ছেলেমানুষ এবং এখানে কেউ চেনে না। হয়তো এমন বিপদে পড়বেন যে, ফাটক পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া কিছুদিন থেকে এখানে খুব প্লেগ হচ্ছে, সেদিক দিয়েও বিশেষ ভয় আছে।

লোকটির কথা আমাদের যুক্তিযুক্ত মনে হ'ল। কিন্তু আমরা যাব কোথায় আর কি ক'রেই বা যাব ?—এই সব চিন্তা করছি, এমন সময় ভদ্রলোক বললেন, কি ঠিক করলেন ?

বললুম, দেখুন, আপনার উপদেশ খুবই সমীচীন ব'লে মনে হচ্ছে; কিন্তু আমাদের কাছে তো কিছুই নেই—রেল-ভাড়া দেব এমন পয়সাও আমাদের কাছে নেই।

ভদ্রলোক বললেন, কিছুই নেই ?

আনা দুই আছে।

তিনি সেই দু আনা আমাদের কাছ থেকে চেয়ে নিলেন। সেখান থেকে সুরাটের ভাড়া বোধ হয় তখন জনপ্রতি সাত আনা ছিল। বাকি পয়সা থানার ক্যাশ থেকে বার ক'রে থানার একজন লোককে দিয়ে বললেন, সুরাটের দুখানা টিকিট কেটে এদের চড়িয়ে দিয়ে এস।

আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কিছু মনে করবেন না। এতে আপনাদের ও আমাদের দু পক্ষেরই ভাল হবে। দুটো ক'মিনিটে একটা গাড়ি আছে। এতেই আপনারা ফিরে যান।

লোকটির সঙ্গে আমরা স্টেশনে ফিরে এলুম। একটু পরেই একখানা সুরাটযাত্রী গাড়ি এল। তারই তৃতীয় শ্রেণীর একখানা কামরায় আমাদের তুলে দিয়ে, গাড়ি যখন বেশ চলতে আরম্ভ করেছে সেই সময় সঙ্গের লোকটি টিকিট দুখানা আমাদের হাতে দিয়ে দিলে।

আমরা সেখানে এতই অবাঞ্ছিত যে, পুলিস গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে সেখান থেকে ভাগিয়ে দিলে। নলরাজার হাত থেকে পোড়া শোল মাছ পালিয়ে গিয়েছিল। নলের নাক কাটতে গিয়ে কলি পোড়া-শোলের প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছিল। শোলের ভাগ্যে কলির কোপ পড়েছিল নলে

ওপর। পুরাণের অনেক কাহিনীর মধ্যে নলের কাহিনীটি একটি আশ্চর্য কাহিনী। কিন্তু আমাদের কাহিনীটি ছিল অত্যাশ্চর্য কাহিনী। পুলিস যে কেন গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে আমাদের নোভা-সারি থেকে সরিয়ে দিলে, নিজের নাক বাঁচাবার জন্যে না পরের নাক কাটবার জন্যে—সে ইতিবৃত্ত আজও অপরিজ্ঞাত হয়ে আছে।

এর সঙ্গে আর একদিনের কথা মনে পড়ছে। তখন আমি বোম্বাই শহরে বাস করি। এই নোভা-সারির একটি বিশিষ্ট পার্শী পরিবারের দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়ে সবান্ধবে ও সপরিবারে একবার সেই গাইকোয়াড়ী রাজ্যে গিয়েছিলুম। ভদ্রলোক সেখান পুলিস-বিভাগে বড় চাকরি করতেন। সেখানে কয়েকদিনের খাতির-যত্নে আদরে-আপ্যায়নে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিলুম। একদিন রাত্রে ডিনারের পর আমরা পুরুষ ক'জন টেবিলে ব'সে খুব গল্প ওড়াচ্ছি, মেয়েরা আমাদের টেবিলের একটু দূরে ব'সে গল্প-গাছা করছিলেন। কি জানি কার একটা গল্প শুনে পুরুষদের মহলে খুব একটা হাসির হররা উঠতেই বাড়ির গিন্নী যিনি তিনি তাঁদের দল থেকে উঠে এসে আমাদের বললেন, দেখ, তোমাদের এখানে খুব হাসি উড়ছে দেখে আমাদেরও এখানে এসে বসতে ইচ্ছে করছে।

আমরা বললুম, তা দয়া ক'রে এখানে এসে বসুন না।

গিন্নী বললেন, বসতে পারি যদি একটা প্রতিজ্ঞা করেন তা হ'লে।

কি প্রতিজ্ঞা ?

আমাদের দলে ছোট ছোট কুমারী মেয়েরাও রয়েছে। আপনারা যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে, কোন অসভ্য গল্প করবেন না তা হ'লে সকলে এসে বসতে পারি।

মেয়েরা এসে বসবার পর একজন প্রস্তাব করলেন, আচ্ছা, এখানে উপস্থিত প্রত্যেকের জীবনের কোন একটা অদ্ভুত ঘটনার বর্ণনা কর। মেয়েরা ইচ্ছা করলে বলতেও পারে, কিন্তু পুরুষদের প্রত্যেককেই বলতে হবে।

প্রথমেই আমার পালা পড়ল। আমি তো ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেকক্ষণ

ধ'রে আমাদের নোভা-সারির এই অভিজ্ঞতাটির বর্ণনা করলুম। আমার কাহিনী শুনে পুরুষেরা কোন মন্তব্য না ক'রে তাঁদের খালি পাত্র পূর্ণ করার দিকে মন দিলেন। মেয়েদের মন বোধ হয় আমার দুঃখে একটু ভিজেছিল। আমার পাশেই বাড়ির বড় মেয়ে দ্বাবিংশবর্ষীয়া সুন্দরী নাজু ব'সে ছিল। সে বললে, আপনি কাজের জন্যে এত বাড়ি ঘুরলেন, কিন্তু আমাদের বাড়িতে যদি আসতেন তো নিশ্চয় সাহায্য পেতেন।

বললুম, আসবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আসি নি এই জন্যে যে, কন্যে! তখনও তুমি জন্মাও নি।

হালকা হাসির ফুৎকারে ব্যথার বাষ্প উড়ে গেল।

এখন যা বলছিলুম। সুরাটে এসে যখন পৌঁছলুম, তখনও প্রায় দু ঘণ্টা রাত্রি আছে। পুলিসের সঙ্গে বকাবকি করার ফলে আমার জ্বর ও পেটের ব্যথা সেরে গিয়েছিল। সুকান্তরও পেট নামানো বন্ধ। স্টেশনের কাছেই দিল্লী-দরওয়াজা। গুটিগুটি গিয়ে আবার নিশিকান্তের দরজায় ধাক্কা দেওয়া গেল। কোন কিছু না ক'রে ফিরে আসায় তারা বিরক্তই হ'ল।

নিশিকান্ত তার স্বভাবসিদ্ধ কাটা-কাটা বুলি ছাড়তে লাগল। কিন্তু তখন আর সে সব কথায় কান না দিয়ে শুয়ে পড়া গেল। পরের দিন অনেক বেলাতেই ঘুম ভাঙল।

উঠে দেখি, ওরা কেউ ঘরে নেই। অনেক বেলায় নিশিকান্তরা এসে রান্না-বান্না ক'রে নিজেরা খেলে ও আমাদেরও খেতে দিলে। নোভা সারিতে কাল সারাদিন কি করেছি ও কেমন ক'রে পুলিসের অত্যাচারে চ'লে আসতে হয়েছে, সে কথা সব খুলে তাদের বললুম।

নিশিকান্ত বললে, এখানকার সব চেয়ে বড় ইঞ্জিনিয়ার যে সে বাঙালী। রোজ সকালে সে অমুক জায়গায় কাজ দেখতে আসে। তোমরা কাল সকালে গিয়ে তাকে ধর—একটা চাকরি-বাকরির জন্যে। সেখানে কোন সাহায্য যদি না পাও তো ওই কাছেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়ি। সোজা চ'লে যাবে তাঁর কাছে। তিনি কোন না কোন উপায় ক'রে দেবেনই।

ওখানকার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব অতিশয় দয়ালু ব'লে আমরাও শুনেছিলুম। কাল সকালে ইঞ্জিনিয়ার কিংবা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে যাওয়া যাবে স্থির ক'রে তখনকার মত তো শুয়ে পড়া গেল। আমাদের সঙ্গে নিশিকান্ত, উপেনদা, জনার্দনও শুয়ে পড়ল। তারপর বিকেল হতে না হতে তারা জনার্দনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। এতক্ষণের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যও জনার্দনকে আমরা একলা পেলুম না। স্নান করতে যাবার সময়ও নিশিকান্ত তাকে নিয়ে গেল।

আমরা দুজনে পরামর্শ ক'রে স্থির করেছিলুম যে, এখানে যদি কিছু না হয় তা হ'লে বোম্বাই চ'লে যাব। জনার্দন যদি আমাদের সঙ্গে যায় তো ভালই, নচেৎ গোটা কয়েক টাকা তাকে দিয়ে নিশিকান্ত কিংবা উপেনদার কাছ থেকে চেয়ে নেব। কিন্তু এতক্ষণের মধ্যে তার সঙ্গে নিরিবিলি একটা কথা কইবারও অবকাশ পেলুম না।

অনেক রাত্রে নিশিকান্তরা ফিরে এসে শুয়ে পড়ল। তারা নিশ্চয় বাইরে আহারাদি সেরে এসেছিল, কারণ রান্না-বান্না কিছু করলে না এবং আমরা খেয়েছি কি না তাও জিজ্ঞাসা করলে না।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে আমরা যাত্রা করলুম সেই বাঙালী ইঞ্জিনিয়ারের উদ্দেশে। লোককে জিজ্ঞাসা করতে করতে অনেক দূরে সেই একেবারে প্রায় শহরের প্রান্তে এক জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হলুম। দেখলুম, রাস্তার ধারেই কতকগুলো বাড়ি তৈরি হচ্ছে। তারই এক প্রান্তে আমাদের এই ইঞ্জিনিয়ার সাহেব দাঁড়িয়ে কয়েকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন।

রাস্তায় আরও কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারলুম যে, ইনিই সেই ইঞ্জিনিয়ার যাঁর উদ্দেশে আমরা এসেছি। ভদ্রলোক তখন অন্য লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে ব্যস্ত তাই আমরা দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলুম, আশা—একটু ফাঁক পেলেই আমরা গিয়ে উপস্থিত হব। কিন্তু তাঁর কাজ আর শেষ হয় না—এক দলের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ হ'ল তো আর একদল এসে গেল।

এই রকম চলেছে, এমন সময় আমাদের ওপর তাঁর দৃষ্টি পড়ল।

দেখলুম, অন্য লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে ঘন ঘন তিনি আমাদের দিকে তাকাচ্ছেন। শেষকালে এক দলের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ ক'রে এগিয়ে এসে আমাদের তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কে হে তোমরা, বাঙালী নাকি?

বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরা বাঙালী।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব চীৎকার ক'রে উঠলেন—পরে দেখেছি যে ঐ রকম চীৎকার ক'রে কথা বলাই তাঁর অভ্যাস—বাড়ি কোথায়? কলকাতায় নিশ্চয়।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তোমরা সব এই রকম বাড়ি থেকে পালিয়েছ আর সেখানে হৈ-হৈ খুনোখুনি চলেছে, তার কিছু খবর রাখ?

কিছু কিছু ক'রে যে না রাখতুম তা নয়। তবে এ ক্ষেত্রে চেপে যাওয়াই সমীচীন বোধ ক'রে তূষ্ণীম্ভাবই অবলম্বন করা গেল।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আবার হাঁক ছাড়লেন, দেখে শুনে তো মনে হচ্ছে ভালঘরের ছেলে, কিন্তু এমন দুর্মতি কেন হ'ল!

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন, তার পর? এখানে কি চাই? এখানে এসেছ কি করতে?

বললুম, বাইরে বেরিয়েছিলুম কাজকর্ম করব ব'লে। আমেদাবাদে কাপড়ের কলে কাজ শেখবার উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু তারা নিলে না। আপনার কাছে এসেছি যদি একটা কাজকর্ম দেন—কুলিগিরিও করতে আমরা রাজী আছি। একটা কাজকর্ম পেলে তবে প্রাণরক্ষা হয়। বিদেশে বড় কষ্টে পড়েছি, আপনি বাঙালী তাই আপনার কাছে এসেছি।

আমাদের কাতর প্রার্থনায় ভদ্রলোকের মন গলল না। এক মুহূর্ত চিন্তা না ক'রে তিনি ব'লে দিলেন, এখানে কিছু হবে না। আমি কিছু করতে পারব না।

বাস্, হয়ে গেল! ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের চীৎকার শুনে তাঁর যত কর্মচারী সেখানে ছিল, সব এসে সেখানে দাঁড়িয়ে গেল। রাহী লোকেও

কেউ কেউ দাঁড়াল। তিনি আরও কিছু উপদেশ দিয়ে আবার স্বস্থানে ফিরে গেলেন। আমরাও আস্তে আস্তে স'রে পড়লুম।

কিছুদূর গিয়ে সুকান্ত বললে, চল্, এখান থেকেই স্টেশনে গিয়ে বোম্বাইযাত্রী ট্রেন ধরা যাক। বোম্বাইয়ের কেরামতিটা দেখে ওইখানেই শেষকালে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া যাবে।

সুকান্তকে বললুম, আরও একটা জায়গা এখনও দেখতে বাকি আছে। ওই সামনেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়ি দেখা যাচ্ছে। চল, একবার ওখানকার কৃত্যটা শেষ ক'রে আসি। পেছুটান রেখে যাওয়াটা কিছু নয়।

সামনেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পাথরের বাড়িটা দেখা যাচ্ছিল, প্রকাণ্ড গেট দুটো খোলা, যেন উচ্চহাস্যে আমাদের ব্যঙ্গ করছে। তবুও আমরা যুগলে অগ্রসর হলুম। গেটের কাছে গিয়ে দেখা গেল, দরোয়ান ইত্যাদি কিছুই নেই।

আমরা ভেতরে ঢুকে গেলুম। খাঁ-খাঁ করছে গোটা বাড়িটা -কেউ কোথাও নেই। কি ক'রে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের দেখা পাওয়া যাবে তাই ভাবছি ও একটু একটু ক'রে সেই প্রাসাদের গভীরে প্রবেশ করছি, এমন সময় দীর্ঘ সোপানশ্রেণী চোখে পড়ায় আস্তে আস্তে সেদিকে অগ্রসর হতে লাগলুম। তখনও লোকজন চোখে পড়ল না।

সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ উঠেই দেখলুম যে, সিঁড়িটা গিয়ে পৌঁছেছে একেবারে বড় একটা সাজানো ড্রয়িং-রুমের মধ্যে। আমরা রাস্তার ভিখিরী—একেবারে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ড্রয়িং-রুমে গিয়ে পৌঁছব, সাহায্যের বদলে জেল হয়ে যেতে পারে ভেবে সেইখানেই দাঁড়ানো গেল। কিন্তু ভেবে দেখলুম, জেল যদি হয় তা হ'লেও তো কিছুকালের জন্যে নিশ্চিন্ত—কুছ পরোয়া নেই মন! উঠে পড়।

গুটিগুটি সিঁড়ি ভেঙে একেবারে গিয়ে উঠলুম সেই ড্রয়িং-রুমে।

ঘরের মধ্যে—সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বললে হয়—একজন লম্বা একটা ঈজি-চেয়ারে শুয়ে কি পড়ছিলেন। আমরা উঠে ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াবার পর বেশ কয়েক সেকেণ্ড পরে মুখ থেকে বইখানা সরিয়ে কিছুমাত্র আশ্চর্য না হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাই?

কি বলব ইতস্তত করছি—ইতিমধ্যে তিনি চেয়ার থেকে পিঠ তুলে পা দুটো নামিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। যতদূর মনে হচ্ছে, ভদ্রলোকের বয়স তখন চল্লিশ পার হয়ে গিয়েছে, তাঁর মাথার চুল কম হ'লেও লম্বা কেশবিরল লম্বা দাড়ি, রোগা লম্বা একহারা চেহারা, একটা ঢোলা পাজামা ও বাংলা পাঞ্জাবির মত ঢোলা-হাতা একটা জামা—পাজামা ও জামা দুটোই আধময়লা। বুঝতে পারলুম, ইনিই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব।

বললুম, মশাই, আমরা বাঙালী। দেশ থেকে বেরিয়েছিলুম নিজেদের পায়ে নিজেরা দাঁড়াব ব'লে; কিন্তু কিছু না করতে পেরে অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছি। ইচ্ছে ছিল, আমেদাবাদে কাপড়ের কলে কাজ শিখব, কিন্তু সেখানে ঢুকতে পারলুম না। আশা আছে, বোম্বাই শহরে যদি যেতে পারি হয়তো সেখানকার মিলে ঢুকতে পারব। কিন্তু আমাদের কাছে একটি পয়সাও নেই—আপনার কাছে এসেছি যদি কিছু সাহায্য পাই।

আমাদের কথা শেষ হওয়া মাত্র ভদ্রলোক তড়াক ক'রে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমরা ভাবতে লাগলুম, কি রকম হ'ল? এখান থেকে এখন বোধ হয় স'রে পড়াই উচিত।

এই রকম ভাবছি, বোধ হয় মিনিট পাঁচেক গেছে, এমন সময় তিনি কর্‌করে দুখানা দশ টাকার নোট নিয়ে এসে একখানা আমাকে ও একখানা সুকান্তকে দিয়ে বললেন, যাও, বম্বে যাও। সেখানে গিয়ে কি করতে পারলে তা যদি আমাকে জানাও তো খুশি হব।

কি ব্যাপার! আমাদের সব হিসাব ধুয়ে মুছে দিয়ে এ কি ঘটল! উদ্‌গত অশ্রুতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল—কৃতজ্ঞতা ভাষায় আর প্রকাশ করতে পারলুম না। ভদ্রলোক আবার বললেন, দেখ, তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে তোমরা অত্যন্ত ক্লান্ত, আমার এখানে খেতে যদি তোমাদের আপত্তি না থাকে তো খেয়ে গেলে আমি খুশি হব।

বললুম, খেতে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

ভদ্রলোক আবার লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এবার প্রায় দশ মিনিট বাদে ফিরে এলেন, তাঁর পেছনে একটি লোক—

তার দু হাতে দুখানা থালা। লোকটা থালা দুটো নিয়ে এসে একটা টেবিলের ওপর রাখলে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমাদের বললেন, যাও, ওখানে ব'সে খাও।

আমরা গিয়ে ব'সে পড়লুম। থালার ওপরে দুখানা ক'রে ঘি-মাখানো ছোট ছোট হাতে-গড়া রুটি আর থালার কোণে একটু তরকারি। আমেদাবাদ ত্যাগ ক'রে অনেক দিন সুখাদ্য খাই নি। আমরা তো মিনিট খানেকের মধ্যেই দুখানা ক'রে রুটি চট ক'রে মেরে দিলুম। একটু বাদেই লোকটা আবার চারখানা রুটি এনে দিলে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমাদের সামনেই ব'সে ছিলেন—তিনি নিজেই উঠে গিয়ে কোথা থেকে দুটো কাচের গেলাস ও এক জগ জল নিয়ে এসে আমাদের দুজনের সামনে দুটো গেলাস রেখে তাতে জল ভ'রে দিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর লোক এসে খানকয়েক ক'রে রুটি দিয়ে গেল। আমাদের পাতের তরকারি ফুরিয়ে যাওয়ায় আমরা শুধু রুটি খেতে আরম্ভ করেছি দেখে তিনি টেবিলের ওপর থেকে একটা জ্যামের টিন নিয়ে ছুরি দিয়ে আমাদের দুজনের পাতেই রাশীকৃত ক'রে জ্যাম ঢেলে দিলেন।

আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে যাবার পর সেই লোকটা এসে আমাদের নিয়ে গিয়ে হাতে জল ঢেলে দিলে। হাত-মুখ ধুয়ে এসে দেখি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সেই ঈজি-চেয়ারে শুয়ে আবার পাঠে মন দিয়েছেন। আমরা কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি মুখ থেকে বইখানা সরিয়ে হাস্যমুখে বললেন, এবার তোমরা যাবে!

যাবার আগে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভণিতা করব, এমন সময় সিঁড়িতে ধপ্‌ধপ্‌ ক'রে আমাদের সেই পূর্ব-বর্ণিত ইঞ্জিনিয়ারের আবির্ভাব হ'ল। আমাদের দেখে ভদ্রলোক সেইখান থেকে একরকম ছুটে বাকি সিঁড়িগুলো পেরিয়ে এসে চীৎকার ক'রে বলতে আরম্ভ ক'রে দিলেন, এই যুবকেরা বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। কলকাতায় এদের বাড়ি। আমার কাছে প্রতিদিন সেখান থেকে সংবাদপত্র আসে। এরা পালাবার পর সেখানে হৈ-হৈ ব্যাপার চলেছে, এমন কি খুন-খারাপি পর্যন্ত বাদ যায় নি—আর এখানে এরা দিব্যি মজাসে আছে।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কিঞ্চিৎ স্থূলকায় ছিলেন। একসঙ্গে এতগুলো কথা ব'লে হাঁপাতে লাগলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব অত্যন্ত ধীরভাবে তাঁর কথার জবাবে বললেন, কিন্তু সেখানকার হাঙ্গামার জন্যে এদের কি ভাবে দায়ী করতে পারেন? একটু চুপ ক'রে থেকে তিনি আবার বললেন, এরা নিজের পায়ে দাঁড়াবে ব'লে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব দমবার পাত্র নন। তিনি আবার সেই রকম চীৎকার ক'রে বললেন, তা ব'লে বাপ-মাকে কাঁদিয়ে বাড়ি থেকে লম্বা দেবে? জানেন, এরা সব ভাল ঘরের ছেলে?

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, সেই জন্যেই তো এদের সাহায্য করা উচিত। এরা বোম্বাই গিয়ে সেখানকার কাপড়ের কলে কাজ শিখতে চায়। পরে ওদের দেশে যখন কাপড়ের কল হবে তখন সেখানে যোগ দিতে পারবে।

শোনেন কেন ওদের কথা! এই সব ছেলে মন দিয়ে কাজ শিখবে?

আহা, ও-বেচারীদের একটা সুযোগ দেবার আগেই ও-কথা বলছেন কেন? আপনার কোনও কাপড়ের কলের মালিকের সঙ্গে পরিচয় আছে?

আমার তিন-চারটে কাপড়ের কলের ডিরেক্টারদের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় আছে, কিন্তু তাদের না লিখলে তো কিছু বলতে পারছি না।

তা হ'লে আপনি তাদের লিখুন।

তাতে তো কয়েক দিন সময় যাবে। আপনি কি ওদের কিছু টাকা-কড়ি দিয়েছেন নাকি?

হ্যাঁ, দিয়েছি।

কই, টাকা আমাকে দাও।—ব'লে তিনি আমাদের দিকে তাকালেন।

আমরা নোট দুখানা তাঁর হাতে দিয়ে দিলুম। তিনি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হাতে টাকাগুলো ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, এখন ওদের হাতে টাকা দিয়ে কোনও লাভ নেই। আমি তাদের চিঠি লিখে আগে সব ঠিক করি। তারপর তিনি আমাদের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় থাক তোমরা?

ইতিপূর্বে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে বলেছিলুম, আমাদের থাকবার কোন আশ্রয় নেই, পথে পথে ঘুরে বেড়াই। আমাদের হয়ে তিনিই আগে জবাব দিয়ে দিলেন, ওদের থাকবার কোন আশ্রয় নেই। এই ক'দিনের জন্যে আমাদেরই ব্যবস্থা করতে হবে।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ফাঁপরে প'ড়ে গেলেন। একটু ভেবে আমাদের বললেন, আচ্ছা, দেখি, কি করতে পারি! আপনারা বসুন।

আমরা যেখানে ব'সে খেয়েছিলুম, সেই চেয়ারে গিয়ে বসলুম। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ঈজি-চেয়ার থেকে উঠে একটা লেখার টেবিলের সামনে গিয়ে ব'সে কাকে চিঠি লিখলেন। তারপরে একজন চাকর ডেকে তাকে কি সব ব'লে চিঠিখানা দিয়ে আবার ঈজি-চেয়ারে গিয়ে বসলেন।

আমরা এদিকে ব'সে রইলুম, ওদিকে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব সশব্দে আলাপচারী করতে লাগলেন। চা এল, তিনি চা খেলেন। আমরা ব'সে আছি তো ব'সেই আছি। আবার ভাগ্য কোথায় নিয়ে যায় তাই ভাবছি। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছি যে, কোন কলে ঢুকতে পারি তো ভালই হয়। আমাদের দিন চলবার জন্যে নিশ্চয়ই তারা একটা মাসোহারা দেবে।

ঘরের মধ্যে একটা বড় ঘড়ি প্রতি আধ ঘণ্টায় একবার ক'রে চমকে দিয়ে যাচ্ছে। আমাদের কোন তাড়া নেই; দুদিন একরকম অনাহারে থেকে আজ পেটে যা পুরেছি তাতে অন্তত দু দিনও চলবে—এই রকম সব চিন্তা মনের মধ্যে লাফালাফি করছে, এমন সময় ঘরের মধ্যে আনন্দের তুফান তুলে একটি ভদ্রলোক ঢুকলেন।

যিনি ঢুকলেন, রোগা লম্বা তাঁর চেহারা, পেণ্টুলান ও গলাবন্ধ কোট পরা। রঙ একেবারে ইউরোপীয়দের মত বললেই হয়, মাথায় গোল টুপি, কপালে চন্দনের সঙ্গে কালো মতন কি একটা মিলিয়ে তারই ফোঁটা কাটা, তাঁকে দেখলে সেদিক থেকে চোখ ফেরানো যায় না, মনে হয় যেন খানিকটা জ্যোতি কোথা থেকে ঠিকরে এল। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই তিনি হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব উঠে তাঁকে ঈজি-চেয়ারে বসতে অনুরোধ করলেন। তিনি কিছুতেই এমন বেয়াদবি করবেন না,

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও ছাড়বেন না। শেষকালে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব উঠে এক দিক থেকে একটা চেয়ার তুলে নিয়ে গেলেন। আবার একটা হাসাহাসি পড়ল।

যা হোক, সকলে উপবেশন করার পর তাঁরা কথাবার্তা শুরু করলেন। কথাবার্তার মধ্যে মধ্যে এই নবাগত ভদ্রলোকটি এক-একবার ফিরে ফিরে আমাদের দিকে তাকাতে লাগলেন, কখনও হাস্যমুখে, কখনও গম্ভীর হয়ে। বেশ বুঝতে পারলুম, আমাদেরই কথা হচ্ছে। কথাবার্তার মধ্যেও মাঝে মাঝে উচ্চহাস্য হতে লাগল। এই রকম কথাবার্তা ও হাসাহাসি হতে হতে তাঁরা তিনজনেই হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন। এই সময় ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আমাদের ডাক দিলেন, ওহে ছোকরারা, এদিকে এস।

আমরা তটস্থ হয়ে উঠে সেখানে যেতেই তিনি সেই রকম চীৎকার ক'রে বলতে লাগলেন, তোমরা এখন আমাদের এই পণ্ডিতজীর বাড়িতে গিয়ে থাক। ও-দিকে মিলের মালিকদের চিঠি লেখা হচ্ছে, সেখান থেকে খবর এলেই তোমাদের পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। দেখো, যেন পণ্ডিতজীকে জ্বালিয়ে আর বাঙালীর বদনাম ক'রো না, যা সব গুণধর ছেলে—তোমাদের দ্বারা সব সম্ভব।

আমরা পণ্ডিতজীকে ঘাড় নীচু ক'রে নমস্কার করতেই তিনি সস্মিতমুখে আমার পিঠে হাত দিয়ে ইংরিজীতে বললেন, চল।

আমরা অগ্রসর হবার আগেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এগিয়ে এসে বললেন, আমি আশা করি, পণ্ডিতজীর পরিবারের মধ্যে তোমাদের কোন কষ্ট হবে না। তোমরা ভবিষ্যতে উন্নতি করলে আমি খুশিই হব, আমার কথা ভুলো না যেন।

আবার তাঁদের মধ্যে একটা হাসাহাসি প'ড়ে গেল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আরও বললেন, যতদিন এখানে আছ মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করতে পার। বিকেলবেলা আমার কাজ থাকে না—

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পণ্ডিতজী আমার একটা বাহু আকর্ষণ ক'রে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে বললেন, আচ্ছা,

আমরা তা হ'লে এখন যাই। আমাকে আবার একবার আপিসে যেতে হবে। আপনি ডাক দেওয়ায় কিছু কাজ ফেলেই আসতে হয়েছে।

এই অবধি ব'লেই আবার সেই রকম হো-হো ক'রে হেসে আমাকে একরকম টানতে টানতে দুড়-দাড় ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। আসবার সময় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে একটা কৃতজ্ঞতা জানানো তো দূরের কথা, বিদায় নেবারও অবসর পেলুম না। গেটের সামনেই ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। পণ্ডিতজী বললেন, উঠে পড়, চট্‌পট্।

আমরা যতটা চটপট সম্ভব গাড়িতে উঠে বসলুম। আমরা ওঠবার পর পণ্ডিতজী গাড়িতে উঠলেন। উঠেই আদেশ দিলেন, চল দফ্‌তর।

গাড়ি ছুটল। গাড়িতে উঠেই বোধ হয় এক মিনিটের মধ্যেই পণ্ডিতজীর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। এই লোকই যে এক মুহূর্ত আগেই প্রতি কথায় উচ্চ হাস্যে দিক প্রতিধ্বনিত করছিলেন তা এখন তাঁকে দেখলে বোঝাই যায় না।

আমি ঠিক তাঁর সামনেই ব'সে ছিলুম। টকটকে গৌরবর্ণ তাঁর মুখমণ্ডল থেকে লাল আভা ফুটে বেরুচ্ছে। চোখের দৃষ্টি যেন ইহলোক ছাড়িয়ে কোন সুদূরে প্রসারিত। কি যেন এক বেদনায় ক্লিষ্ট-মধুর সেই মূর্তি আমার কাছে অপূর্ব ব'লে মনে হতে লাগল। যে আনন্দময় মূর্তি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ওখানে দেখেছিলুম, তার ওপরে বিষাদের ছায়া এসে পড়ায় যেন আরও সুন্দর হয়ে উঠল সে মূর্তি—আমি হাঁ ক'রে পণ্ডিতজীর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। অনেক রাস্তা ঘুরে ঘুরে অনেকক্ষণ পরে গাড়ি এসে আপিসের কাছে দাঁড়াতেই পণ্ডিতজী টপ ক'রে নেমে গেলেন।

কিন্তু পণ্ডিতজীর কথা এখন থাক, আগে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কথা শেষ করি।

আমরা সুরাটে পৌঁছবার দু-চার দিন পরেই সেই দেশের একজন লোকের মুখে শুনেছিলুম যে, সেখানকার বর্তমান ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব অত্যন্ত ভাল লোক। ক্রমেই এর ওর তার কাছ থেকে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সম্বন্ধে নানান কিম্বদন্তী শুনতে লাগলুম। শুনলুম যে, সকালবেলা তিনি পকেটে পয়সা ভর্তি ক'রে নিয়ে অনেক দূরে দূরে দরিদ্র পল্লীগুলির

মধ্যে বেড়াতে চ'লে যান। সেখানে গিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে লোকের দুঃখ মোচন করবার চেষ্টা করেন—পকেটের সমস্ত টাকা-পয়সা দরিদ্রদের মধ্যে ব্যয় ক'রে চ'লে আসেন। দাতার ধর্ম হচ্ছে কেউ এসে সাহায্য চাইলে তাকে নিরাশ না করা। কিন্তু ইনি চাইবারও অবকাশ দিতেন না—তেড়ে গিয়ে দুঃখ ও দারিদ্র্যকে আক্রমণ করতেন। এই রকম করাতে মাস শেষ হবার অনেক আগেই তাঁর মাইনের টাকা ফুরিয়ে যেত এবং অনেক সময়েই নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অন্যের কাছে কর্জ পর্যন্ত করতে হ'ত। অনেক সময় অনেক দুঃস্থ লোক তাঁর কাছে গেলে উপকৃত হবে জেনেও দয়া ক'রে সেখানে যেত না। তাঁর এই স্বভাবের কথা সেখানে সকলেই জানত ব'লে সেখানকার উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও তাঁর বন্ধুরা সর্বদাই কড়া নজর রাখতেন, যেন কেউ তাঁদের অগোচরে তাঁর কাছে পৌঁছে ভাঁওতা লাগিয়ে কিছু মেরে নিয়ে না যায়। আমরা পরে শুনেছিলুম যে, সেই বাঙালী ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে হতাশ হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়িতে ঢুকেছি, এই সংবাদ পেয়েই ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ছুটতে ছুটতে এসেছিলেন—আমাদের কবল থেকে তাঁকে রক্ষা করবার জন্যে।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নাম ছিল মিস্টার গয়ারাম। তাঁর লম্বা চুল-দাড়ি দেখে প্রথম দর্শনেই তাঁকে শিখসম্প্রদায়ের লোক ব'লে মনে হয়েছিল—কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, শিখের নাম গয়ারাম হওয়া সম্ভব নয়। আমার বিশ্বাস, তিনি বিশেষ কোন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। সংসারে সবচেয়ে বড় ধর্ম হচ্ছে মনুষ্যত্ব—তিনি সেই মনুষ্যত্বে বিশ্বাস করতেন।

জীবনযাত্রার প্রাক্কালে আমরা যে মহাপুরুষের দর্শনলাভ করেছিলুম, আজ জীবন-সন্ধ্যায় বিশেষ ক'রে তাঁকে স্মরণ ক'রে বলি—হে মহাত্মন্! আজ হতে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে যে দুটি দীন ও তুচ্ছ বাঙালী-বালক কম্পিত হৃদয়ে সাহায্যের জন্য আপনার দ্বারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, দুঃখে সুখে তাদের দিন কেটে গিয়েছে। তাদের মধ্যে একজন মধ্যপথেই বিদায় নিয়েছে, আর একজন পথের শেষে এসে অতিক্রান্ত

অতীতের দিকে চেয়ে আপনাকে স্মরণ করছে। সেদিন তাদের জীবনে নেমেছিল ঘোর অন্ধকার, আশ্রয়দাতা হয়েছিল বিমুখ, বন্ধুরা নির্দয়ভাবে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল—সমস্ত সংসার বিকটমূর্তি ধ'রে তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ পৃথিবীর সেই বীভৎস মরুদাহে জীবন-লতা যখন শুষ্কপ্রায়, তখন দুর্দিনের সেই দারুণ দিনে আপনাকে অবলম্বন ক'রে ঈশ্বরের যে করুণাধারা তাদের ওপর বর্ষিত হয়েছিল, সে কথা তারা কোনদিন ভোলে নি। তাদের চিত্তাকাশে সে স্মৃতি চিরদিন ধ্রুবতারার মতই জ্বলজ্বল করেছে। যতবার তা স্মরণ করেছি, ততবার কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধায় নত হয়েছি। আজ বিদায়বেলায় বিশেষ ক'রে তাঁকে প্রণাম জানাচ্ছি।

পণ্ডিতজী নেমে যেতেই কোচোয়ান গাড়ি ঘুরিয়ে একটা গাছের ছায়ায় নিয়ে গিয়ে ঘোড়া খুলে দিলে। আমরা ব'সে আছি তো আছিই—আপিসে কত রকম লোক যাতায়াত করছে দেখছি। একবার দেখলুম, আমাদের সেই বাঙালী ইঞ্জিনিয়ার মশাই পাশ দিয়ে গাড়ি ক'রে চ'লে গেলেন। ব'সে ব'সে ঢুলুনি এসে গেল। তখন দিনে ঘুম এমন সাধা ছিল না, তবুও দুজনে এক ঘুম দিয়ে উঠলুম। কিন্তু তখনও দেখি, কোচোয়ান গাড়ির ছাতে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে আর ঘোড়া দুটো নিশ্চিন্ত মনে ঘাস চিবুচ্ছে, ঘুমের ঝোঁকে দুপুরটাও যেন অনেকখানি গড়িয়ে গেছে।

আরও কিছুক্ষণ এমনি নিশ্চিন্তভাবেই কেটে গেল। খানিকটা সময় পরে সহিস গাড়িতে ঘোড়া জুতলে ও যেখানে পণ্ডিতজীকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল তারই কাছাকাছি গাড়িখানা আবার এনে রাখলে। তখনও আমরা ব'সে আছি তো ব'সেই আছি। আরও কিছুক্ষণ বাদে পণ্ডিতজী হন্তদন্ত হয়ে এসে গাড়িতে চড়লেন। গাড়িতে উঠেই তিনি সেই আগের মতন হাসতে হাসতে বললেন, তোমাদের অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখে কষ্ট দিলুম। তোমাদের পাঠিয়ে দিতে পারতুম, কিন্তু আগে যে পাঠিয়ে দিই নি তার কারণ বাড়িতে তোমাদের তো কেউ চেনে না। এ অবস্থায় সেখানে গিয়ে অসুবিধা হ'ত। খুব কষ্ট হয় নি তো?

বললুম, না, কষ্ট কিসের! দিব্যি গাড়িতে ব'সে নানা রকমের লোক দেখতে দেখতে সময়টা কেটে গেল।

যা হোক, গাড়ি অনেক রাস্তা ঘুরে ঘুরে একটা বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল। নদীর খুব কাছেই বাড়িটা। অনেকখানি জমির মধ্যে বাগান, তার চারপাশ পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা—সেই জমির মধ্যে একটা কোণে বাড়ি—অনেকটা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়ির মতনই দেখতে।

পণ্ডিতজীর সঙ্গে আমরা দরজার কাছে আসতেই দেখলুম, একটি বারো তেরো বছরের প্রিয়দর্শন ছেলে সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছেলেটির চুল-ছাঁটাই, পোশাক ও হালচাল দেখলেই মনে হয় যেন ফিরিঙ্গীর ছেলে। পণ্ডিতজীকে দেখেই সে ছুটে এসে তাঁর হাত ধরলে, তারপর আমাদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, এরা কারা বাবা?

পণ্ডিতজী হাসতে হাসতে ছেলেকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন। আমরাও তাঁর পিছু পিছু চললুম।

বাড়ির মধ্যে ঢুকে মনে হ'ল, বেশ বড় বাড়ি—প্রায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মত বললেই হয়। ওপরে উঠেই একটা বড় হল। সেখানকার আসবাবপত্র সব ইংরিজী কায়দায় সাজানো। শুধু ঘরের মাঝখানে ছাতের সিলিং থেকে একটা কাঠের দোলনা ঝুলছে। সে রকম দোলনা গুজরাটী ও মারাঠীদের বাড়িতেই শুধু দেখতে পাওয়া যায়। আমরা গোয়ালিয়রে অনেক বড়লোকের বাড়িতেও এই রকম দোলনার নানারকম সংস্করণ দেখেছিলুম। কিন্তু এত সুন্দর ও এত কারুকার্যমণ্ডিত দোলনা সেখানেও দেখি নি। এই রকম একটা কাঠের দোলনা একবার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের ঘরে দেখেছিলুম। শুনেছিলুম কে যেন সেটা তাঁকে উপহার দিয়েছে।

যা-ই হোক, আমাদের সেখানে বসতে ব'লে পণ্ডিতজী ছেলের হাত ধ'রে আর এক দিকে চ'লে গেলেন।

[ক্রমশ]

"মহাস্থবির"

আরোগ্য

পিছনে শব্দ হতেই অসিত আড়াল ক'রে দাঁড়াল। দু পা জোড় ক'রে। দেখতে পেলে এখনই হাজার প্রশ্ন, হাজার কৈফিয়ৎ। কিছু জিজ্ঞাসা না করলেও বুক ধড়ফড় করে। জ্বলন্ত চাউনি লতিকার। মুখের চেহারা দেখে মনের খবরের আঁচ পায়। কোন কিছু গোপন থাকে না।

লতিকা কিন্তু ধীর পায়ে বারান্দার কাছ বরাবর এসে দাঁড়াল। আর এগোল না। আশ্চর্য কাণ্ড, মানুষটা মুখ ধুতে আরম্ভ করেছে আধ ঘণ্টা আগে, দু-দুবার ঠাণ্ডা-হয়ে-যাওয়া চায়ের জল লতিকা গরম করল, কিন্তু কারুর দেখা নেই।

কি গো, অফিস-টফিস আজ বন্ধ নাকি? কটা বাজে সে খেয়াল আছে?

খেয়াল আবার নেই! এখান থেকে মুখ তুললেই দেয়ালে লটকানো ঘড়িটা নজরে আসে। কত আর, বড় জোর মিনিট দশেক ফাস্ট। কিন্তু তা হ'লেও দেরি হয়েছে বইকি। বেশ দেরি হয়েছে।

এই হয়ে গেছে, তুমি চা ঢালতে শুরু কর।— অসিত জায়গা ছাড়ল না। ঘাঁটি ছাড়লেই কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। সব কিছু ফাঁস।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে লতিকা নীচে নেমে গেল। শরীরটা কদিন অসিতের খারাপই হয়েছে। মাঝরাতে গায়ে আলতো গা ঠেকতেই লতিকা চমকে উঠে বসেছে। বেশ গরম। হাত দিয়ে দিয়ে দেখেছে কপাল, গাল আর বুক। কারুর কথা তো শুনবে না! শুরু শীতের হিম লাগিয়ে ফিরবে মাঝরাতে। তাসের বিবি হাতে পেলে ঘরের বিবির কথা মন থেকে উধাও। শুধু কি বিবিরই কথা! ঘরসংসার, এমন কি এক বছরের খোকনের কথাও মনে থাকে না। ব'লে ব'লে লতিকা হয়রান। রাতের প্রতিজ্ঞা ভোরেই খতম। প্রতিশ্রুতির পরমায়ু চৌকাঠ পর্যন্ত। ওপারে গেলেই যে-কে-সেই।

সেদিন ঘুমন্ত মানুষটাকে লতিকা ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছিল।— জ্বর হয়েছে, বলতে হয়। মাঝরাতে বাড়ি ফিরে ঠাণ্ডা ভাত খাচ্ছ? জানতে পারলে দুখানা রুটিই না হয় ক'রে রাখতুম।

আচমকা জেগে উঠে অসিত প্রথমটা কিছু বুঝতে পারে নি। অন্ধকারে চোখ কুঁচকে কুঁচকে দেখেছিল। চোর ছ্যাঁচোড় না কি? সিঁদ কেটেছে ঘরের দেয়ালে? সর্বনাশ! কিন্তু একটু পরেই আসল ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল। তা জেনে সর্বনাশের মাত্রাটা অবশ্য কমে নি একটুও। তবু ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করেছিল অসিত। জামার আস্তিনে বসা শ্যামাপোকা ঝেড়ে ফেলার মতন।

ওই ঠাণ্ডা লেগে একটু জরভাব হয়েছে, ও কিছু নয়।—পাশ ফিরে শোবার চেষ্টা করতেই লতিকা বাধা দিয়েছিল, একটু জরভাব মানে? গা তো বেশ গরম। ধান দিলে খই হয়ে যায়।

অসিত আর কথা বাড়ায় নি। কেঁচোর তল্লাসে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে শেষকালে বিষধরের সঙ্গে মোলাকাৎ। তা চায় নি অসিত। কিন্তু অসিত না চাইলেও লতিকা ছাড়বার পাত্রী নয়। পরের দিন অফিস ফেরত ডাক্তার সেনের ফার্মাসিতে যেতে হবে, সেখান থেকে ওষুধ নিয়ে সোজা বাড়ি। এ কথা যদি রাখা না হয় তো অনর্থ ঘটবে, লতিকা মিত্তিরের সাফ কথা।

গায়ে চাদর মুড়ি দিতে দিতে অন্ধকারেই অসিত ঘাড় নাড়ল নিশ্চয়, এ কথার আর নড়চড় হবে না।

পর পর দু দিন অফিস থেকে সোজা বাড়িই এল অসিত। মাঝপথে ডাক্তার সেনের ফার্মাসিতে গিয়েছিল কি না জানা গেল না, কারণ হাতে ওষুধের শিশি নেই, তার বদলে চোষবার জন্যে গোটা চারেক পিল যে কোন মনিহারীর দোকানেই তা পাওয়া যায়।

সেদিন অসিত কিন্তু ধরা প'ড়ে গেল। কতকটা নিজের কাছেই।

অফিসে বাথরুমে মুখ-হাত ধোয়ার সময় কাশির দমক। থামাতে চেষ্টা করল। কিন্তু বৃথা। বার দুয়েক থুতু ফেলার পরেই অসিত চমকে উঠল। জানলার পাল্লা দুটো খুলে দিল ভাল ক'রে। না, আর ভুল নয়। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে রক্তের ছিটে। জবাকুসুমসঙ্কাশং। এমন হতে পারে, কাশতে কাশতে গলাটা চিরে গেছে। সামান্য রক্তের ফোঁটা

ভয় পাবার কিছু নেই এতে। অসিত অনেক বোঝাল নিজের মনকে। কিন্তু বোঝানোই সার। এক ফোঁটা রক্তেই সারা শরীরের রক্ত হিম।

ভাল ক'রে মুখ ধুয়ে অসিত বাইরে এসে দাঁড়াল। চেঁচামেচি চলবে না, একটি বেফাঁস কথা নয়। একটু জানাজানি হ'লেই কেলেঙ্কারি। তিলকে তাল করবে মানুষ। গলা দিয়ে রক্ত পড়া তো নয়, চিত্রগুপ্তের খাতা ছোঁয়ানো। এপারে বসবাসের পালার ইতি। তারই নির্দেশ। ঠাই বদলের ইশারা।

বেসরকারী অফিস, তাও টলমলে। ব্যবসার যা অবস্থা, পাল-ছেঁড়া পাটাতন-ভাঙা নৌকোয় পারাপার হওয়া। এখন ছুটি চাইতে গেলেই একেবারে ছুটি দিয়ে বসবে। এমুখো হবার উপায় রাখবে না।

অসিত চুপচাপ টেবিলে ব'সে আঁচড় কাটতে লাগল। কালো কালো আঁচড় ব্লটিং-প্যাডের ওপর। রাজরোগ বটে, কিন্তু হয় গরিবের। গরিবং বাদশাহী। ভাল ফল আর মেওয়া, দামী দামী বিদেশী ওষুধ। রক্তের বদলে রক্ত, কিন্তু গরিবের বেলায় রক্তপাতেই শেষ হয়। রাজসূয় চিকিৎসা, শুরুতেই মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

ছুটির পর অসিত সোজা বাড়ি গেল না। পার্কে বসল কিছুক্ষণ। কথাটা লতিকা জানতে পারলেই সর্বনাশ। কান্নাকাটি করবে। নিজের গায়ের সোনাদানা খুলে চিকিৎসা শুরু করবে। এ-কোণে ও-কোণে জমানো পুঁজি নিঃশেষ। তারপর অসুখের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে খালি হাতে হা-হুতাশ। কপাল চাপড়ানো ছাড়া আর কিছু করবার থাকবে না।

মনকে প্রবোধ দিল অসিত। অযথা চিন্তা করছে। এসব কিছু নাও তো হতে পারে। গলা দিয়ে রক্ত মানুষের কত কারণে বেরোয়। সাত পুরুষে কারুর এ রোগ নেই। মিছামিছি ভয় পাচ্ছে। তার চেয়ে অসিত মতলব ঠিক ক'রে ফেললে, এখান থেকে সোজা যাবে চাঁদনিতে। সন-ফার্মাসির দোলগোবিন্দ সেন পড়ত একসঙ্গে। এক-আধ বছর নয়, স্কুল থেকে শুরু ক'রে কলেজে বছর দুয়েক। মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ হয়। অবশ্য অসিতের নিজের গরজেই। বাড়িতে ছোট ছেলে-পিলে থাকলে একটা-না-একটা লেগেই থাকে। আজ পেট খারাপ, কাল

সর্দি-জ্বর, পরশু দাঁত ওঠার ঝামেলা। তার ওপর লতিকার মাথার যন্ত্রণা বাড়লে তো ছুটোছুটি করতেই হয়। পশার হয়েছে দোলগোবিন্দর, নেই নেই ক'রেও দু বেলায় মন্দ রোগী জোটে না ডাক্তারখানায়। কিন্তু ভাগ্য বদলালেও, দোলগোবিন্দ বদলায় নি। অসিত গেলেই খোঁজখবর নেয়, বাড়ির খবর, বাচ্চার খবর সব কিছু। দু-একদিন অসিতের সঙ্গে বাড়িও এসেছে, যত্ন ক'রে দেখেছে খোকনকে। নামবার মুখে অসিত পকেটে টাকা গুঁজে দেবার চেষ্টা করতেই ভুরু কুঁচকেছে: বেশ, দে টাকা, কিন্তু এই শেষ ব'লে দিচ্ছি। হাজার খোসামোদ করলেও দোলগোবিন্দ এ বাড়িতে আর পা দেবে না।

পাশ থেকে লতিকাও অনুযোগ করেছে, সে কি কথা! আপনি, ডাক্তার মানুষ, আপনার ফী আপনি নেবেন বইকি।

দোলগোবিন্দ হেসেছে, আমিও তো তাই বলছি বউঠান। ডাক্তারই শুধু নই, মানুষও তো বটে। নির্বিবাদে লোকের চামড়া ফুঁড়ি ব'লে নিজের চোখের চামড়ারও বালাই রাখি নি—এ অপবাদ দেবেন না।

টাকা অসিতের হাতে গুঁজে দোলগোবিন্দ নেমে গিয়েছিল।

অনেক ভেবে-চিন্তে অসিত সেন-ফার্মাসিতে যাওয়াই ঠিক করল। এই তো কাছে। বেড়াতে বেড়াতেই পৌঁছনো যায়।

ভাগ্য ভাল অসিতের। রোগীর সংখ্যা কম। যে কটা ছিল, আধ ঘণ্টার মধ্যেই উঠে গেল। অসিত গুছিয়ে-গাছিয়ে বললে ব্যাপারটা। একটু রেখে-ঢেকে। সাত জন্মে কারুর এ রোগ ছিল না, তার ওপরই জোর দিল বেশি ক'রে। সর্দির ধাত, একটুতেই ঠাণ্ডা লেগে কাশি শুরু হয়। সারা রাত মাঝে মাঝে ব'সে কাটাতে হয় কাশির ঠ্যালায়। রক্ত পড়ার প্রসঙ্গ একেবারে বাদ।

চোখ কুঁচকে দোলগোবিন্দ সব শুনল। স্টেথিসকোপ দিয়ে বুক পিঠ দেখল ভাল ক'রে। জিভ, চোখের পাতা, নাড়ী। কিছুই বাকি রাখল না। সে রকম কিছু তো বোঝা যাচ্ছে না! তবু সাবধানের মার নেই। এক্স-রে ক'রে ফেলাই সমীচীন। হাতুড়ে ডাক্তারকে দিয়ে নয়, অলিতে গলিতে মাকড়শার জালের মতন বাজে ক্লিনিকের ভিড়, ভাল কাউকে দিয়েই দেখানো ভাল। মিছামিছি মনে সন্দেহ পুষে রেখে লাভ!

অসিত চুপচাপ শুনল। না রাম, না গঙ্গা। ভাল কাউকে দেখানো মানে তো নজরানাও সেই মাফিক। দুখানা ফোটো তুলতেই অর্ধেক মাইনে কাবার। ফোটো যদি নিষ্কলঙ্ক হয় তবেই বাঁচোয়া, নয়তো কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ঠিক আছে! এমনিতেই মাসের শেষে মাইনে যা হাতে আসে, সারা মাস দু মুঠো গ্রাস জোটাই দুষ্কর। বাড়তি বিলাসিতার ঠাঁই হওয়াই দায়।

তবু অসিত চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, আছে নাকি জানাশোনা কেউ?

দোলগোবিন্দ খাঁজ ফেলল কপালে। গোটা তিনেক আঁচড়। চোখের কোণে কাকের পায়ের হিজিবিজি দাগ। হাত দিয়ে স্টেথোস-কোপটা লোফালুফি করতে করতে বললে, আছে বইকি। কর্নেল সর্বাধিকারী রয়েছেন। পাকা লোক। নিজের হাতে আর এসব করেন না, তবে আমি চিঠি লিখে দিলে নিশ্চয় করবেন। এক সময়ে আমি ওঁর প্রিয় ছাত্র ছিলুম।

তাই দাও তবে।—অসিত প্রায় মরীয়া। এস্পার, নয় ওস্পার। রোগ পুষে রেখে আর লাভ কি! মনে মনে একবার হিসেব ক'রে নিলে, বিয়ের ঘড়ি রয়েছে সোনার চেন লাগানো, আংটি অবশ্য নিজের রোজগারে, কিন্তু ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে এমন দাঁড়িয়েছে চিমটি কাটলেও সোনা উঠবে কি না সন্দেহ।

আমি আবার হপ্তা দুয়েকের জন্য বাড়ি যাচ্ছি। জমিজমা নিয়ে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মন-কষাকষি। ভাগ-বাঁটোয়ারা একটা না ক'রে আসা পর্যন্ত নিস্তার নেই। নয়তো, আমি সঙ্গে ক'রেই তোমায় নিয়ে যেতুম।—খস খস ক'রে চিঠিটা লেখার ফাঁকে ফাঁকে দোলগোবিন্দ বললে। চিঠিটার ওপর চোখ বুলিয়ে কাগজটা অসিতের দিকে এগিয়ে দিল।

কাগজ নয়, যেন বিশল্যকরণী হাতে আসছে—এইভাবে অসিত কাগজটা হাতে নিল। সযত্নে মুড়ে পকেটে রেখে উঠে দাঁড়াল।—তা হ'লে তুমি ঘুরে এস দেশ থেকে, আমি এক্স-রে প্লেট নিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করব।

দিন দুয়েক সংকল্প অটুট ছিল অসিতের। কথায় কথায় অফিসের বাবুকে কথাটা একবার জিজ্ঞাসাও করেছিল। অবশ্য নিজের

ব্যাপারটা চেপে। পাড়াব এক ছোকবাব রোগটা কেমন কেমন। ক‍ সর্বাধিকারীব কাছে যেতে চায় একবাব।

পুরু পাওয়াবেব চশমা কপালেব ওপর তুলে বডবাবু আতকে উ বলেছিলেন, বাঘে ছুঁলে আঠাবো ঘা, জান তো? কর্নেল ছুঁলে আটাশ এক-একটি ফোটোতে বত্রিশটি ক'বে টাকা। আমার শালার পিসতু‍ ভাইযেব বেলা দেখলুম কি না। দিব্যি জোয়ান ছেলে, উঠে হেঁ বেডাচ্ছে। কেবল বুকেব বাঁ দিকে একটু ব্যথা। বডলোকের ছে‍ সবই সাজে। ছেলেব কাতবানিতে বাপও কাত। ডাক্তাব, বদ্যি কবিবাজ কাউকে বাদ নয। যেটুকু বক্ত বাকি ছিল, ওই কর্নেল চু‍ খেল, একেবাবে বুকে হাটু দিযে।

অসিত আর কথা বাডাল না। তা ছাড়া কদিন একটু ভালই আছে সামান্য কাশি, বাত্রে গাটা একটু গবম হয়, ভোবের দিকে সব ঠিক।

ব্যাপাবটা প্রায় মিটেই এসেছিল, কিন্তু সেদিন মুখ ধুতে গিয়েই বেলেঙ্কাবি। বেশ বড একটা ফোঁটা, আব রঙটাও যেন আগেব চেযে অনেক গাঢ।

অফিসে গিয়েও অস্বস্তি। ব্লটিং প্যাডে লাল কালিব ছিটে দেখেই চমকে উঠল। কাশি এলেই মুখে রুমাল চেপে বাথরুমে দৌড। একটি ফোঁটা বক্ত কোথাও পডলে মুখ দিযে বক্ত-ওঠা খাটুনিবও খতম। শত্রুকে নিয়ে ঘব কবতে মানুষ রাজী, কিন্তু ছোঁযাচে বোগকে নয়।

খুব ক্লান্ত মনে হ'ল নিজেকে। কিন্তু ভিড ঠেলে অসিত পাযে পায়ে সেন ফার্মাসিতে গিযে হাজিব। লুকোচুবিব পালা শেষ। রোগ তো ধবা পডেছে অনেক দিন, এবার রোগীও ধবা পড়ুক। উটপাখিব মতন বালিতে মুখ গুঁজে বাঁচবার হাস্যকব প্রচেষ্টার কোন মানে হয় না।

এবারেও দোলগোবিন্দ মনোযোগ দিয়ে সব শুনল ভুরু আরও কুঁচকে। কপালেব, গালেব হিজিবিজি আঁচড আবও জটিল। সব শুনে কেবল বললে, রাস্কেল। রোগেব সঙ্গে রসিকতার কোন মানে হয় না। তুমি নিজে সংসারী লোক, সে খেয়াল আছে? জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার তোমাব কোন এক্তিযার নেই। কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে

পাসিভার তুলে ধরল। নম্বর পেয়ে চাপা গলায় ফিসফাস কয়েক মিনিট। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে বললে, চল আমার সঙ্গে।

কর্নেল সর্বাধিকারী নেই। ক্ষতি হ'ল না কিছু। জন তিনেক জাঁদরেল সহকারী হাজির। ফোটো নেওয়া হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে রক্ত-কফ পরীক্ষার বন্দোবস্ত। দিন তিনেক পরে আবার দেখা করার পরামর্শ।

অসিতকে যেতে হ'ল না। প্লেট হাতে দোলগোবিন্দ বাড়ি এসে হাজির। সিঁড়ির মুখেই লতিকার সঙ্গে দেখা। মুখোমুখি। মেঘ-থমথম মুখ। ভিজে চোখের পাতা। সর্বনাশের ছায়া দু চোখের তারায়। দোলগোবিন্দ সামলে নিল নিজেকে। ভয় পাওয়া মানেই— রোগকে প্রশ্রয় দেওয়া। তা ছাড়া প্লেট দুটো দোলগোবিন্দ দেখেছে। সর্বনাশের সবে শুরু। গোটা কয়েক আঁচড়। বলয় গ্রাস নয়, মাত্র রাহুর স্পর্শ। তাও আলতো। বাসা-বাঁধার কাঁচা বন্দোবস্ত। ঠিক সময়েই ধরা পড়েছে রোগ। বিজ্ঞান আর বীজাণুর মল্লযুদ্ধের উপক্রম।

অসিত কোথায় বউঠান?—দোলগোবিন্দ আরও এক ধাপ ওপরে উঠল।

কথা বললে না লতিকা। হাত দিয়ে মাথার খাটো ঘোমটা একটু টেনে দিয়ে ঘরের দিকে আঙুল দেখাল।

বাইরের ঘরে ছোট খাট। একজনের মতন, কিন্তু গুটিয়ে সুটিয়ে তারই ওপর আড়াই জনের ব্যবস্থা। দেয়ালে হেলান দিয়ে অসিত চুপচাপ ব'সে আছে। ইঁটের পাঁজরা-সর্বস্ব বিবর্ণ দেয়াল, বছর কয়েক চুনের প্রলেপ পড়ে নি। কিন্তু মানুষটা যেন তার চেয়েও বিবর্ণ। উঁচু চোয়াল আর বিষণ্ণ দৃষ্টি। এই কদিনেই ভেঙে পড়েছে। তিল তিল ক'রে নয়, একেবারে আচমকা।

দোলগোবিন্দ কাছে গিয়ে দাঁড়াল। হাসি হাসি করল মুখ। একটু দম নিয়ে বললে, ভয় পাবার কিছু নেই। সামান্য একটু স্পট। মাস খানেকের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে।

অসিত কোন উত্তর দিল না। আড়চোখে চাইল প্লেট দুটোর দিকে। হাতে তুলে নিল না। কি দরকার চোখ বুলিয়ে! নিশ্চয়কে

সুনিশ্চিত করা! ফোটোর সামান্য দাগ মনের মধ্যে বিরাট হয়ে বসবে আলজিভে কাঁটা বিঁধে থাকার মতন সর্বদা অস্বস্তি।

চিকিৎসা কি তুমিই শুরু করবে?—অসিত খুব আস্তে জিজ্ঞাস করল। ডাক্তারকে নয়, যেন নিজেকেই জিজ্ঞাসা করছে এমনই ভাব।

না, আমি কেন?—দোলগোবিন্দ ঘাড় নাড়ল, হসপিটালে বেড নেওয়াই সবচেয়ে ভাল।

অসিত ম্লান দুটি চোখ তুলে চাইল সামনের দিকে। দোরগোড়ায় লতিকা এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে গরম দুধের কাপ। যুদ্ধ আসন্ন, তার চিহ্ন লতিকার উস্কোখুস্কো চুলে, উদাস চাউনিতে, নিরক্ত দুটি ঠোঁটে।

আপনি হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারেন? এমনিতে তো শুনেছি বেড পাওয়াই মুশকিল।

যেমন ক'রেই হোক ভর্তি করাতেই হবে। কাল সারাটা দিন চেষ্টা করব। উপায় একটা হয়ে যাবে।

দোলগোবিন্দ চ'লে যাবার অনেকক্ষণ পরে দুজনে বসল মুখোমুখি। অসিত আর লতিকা। কোন কথা নয়, অথচ সব কথাই যেন বলা হ'ল। বিছানার ওপর প্লেট দুটো প'ড়ে। দুজনের কেউ সেগুলো ছোঁয়া দূরে থাক্, সেদিকে চাইলও না ফিরে। বিষধর সাপই বুঝি কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে ওর মধ্যে। ছুঁতে গেলেই ছোবলে ছোবলে অস্থির ক'রে তুলবে।

কাজের লোক দোলগোবিন্দ। খুঁজে-পেতে ঠিক যোগাড় করেছে বেড। শহরে নয়, শহরতলীতে। তা হোক, ডাক্তার চেনা। যত্ন-আত্তির কমতি হবে না। খরচপত্রের দিক থেকেও সুবিধা।

অফিসে এক মাসের ছুটি, পুরো মাইনেতে প্রায় ধস্তাধস্তি ক'রে। বাড়তি ছুটি চাইলেই মাইনে ক'মে অর্ধেক। লতিকার পুঁজিপাটা নিঃশেষ। বন্ধুবান্ধবের কাছে ধার, তাও লতিকার মারফৎ। এখন পয়সাকড়ির কথা ভাববার সময়ই বটে। মানুষটাই সেরে উঠুক, তবেই না সব কিছু। আশা আনন্দ সবই তো একটা মানুষকে ঘিরে।

অন্ত কোন অসুবিধা নয়, রোজ বিকালে দেখতে যাওয়াই মুশকিলের ব্যাপার। খোকনকে পাশের বাড়ি গছিয়ে বেলা তিনটের মধ্যেই লতিকা রওনা হয়ে পড়ে। দুবার বাস বদল। রাস্তাটাও কম নয়। বেশির ভাগ মেয়েরা সাইকেল-রিক্‌শা চাপে। যেতে আসতে বারো আনা বাঁধা রেট। লতিকা জোর পায়ে পার হয়ে যায়। কতটুকুই বা পথ, এর জন্যে আবার এত পয়সা খরচ !

চিকিৎসা শুরু হতেই দিন পনেরো। ডাক্তারদের মন খুঁতখুঁতুনি। আবার প্লেট নেওয়ার বন্দোবস্ত। দামী দামী ওষুধ।

অসিত একদিন লতিকার হাতই চেপে ধরল ঃ কি হবে লতা, কোথা থেকে এসব যোগাড় হবে ?

আঃ, তুমি থাম তো। রোগী মানুষ তোমার এত মাথা ঘামাবার কি দরকার ?—লতিকা মুখ ঝামটা দিল। কারুর ভাববার দরকার নেই। সব কিছু ভাবনা-চিন্তা লতিকার।

যতক্ষণ অসিতের সামনে থাকে লতিকা, হাসির রঙ মাখে মুখে, গলার আওয়াজে আনন্দের সুর, কিন্তু বাইরে যাবার ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে লতিকার মুখ-চোখের চেহারা পাল্টে যায়। বেদনার ছায়া নামে দুটি চোখের চাউনিতে। সারা শরীরে ক্লান্তি আর অবসাদ।

লেখাপড়া খুব বেশি শেখে নি লতিকা, অন্তত বিদ্যা বেচে জীবিকা অর্জনের মতন নয়। তাই অন্য পথ বেছে নিয়েছে। গলির মোড়ে চোখ-ঝলসানো সাইনবোর্ড 'দি ইণ্ডিয়ান টেলার্স'। যতটা গাল-ভরা নাম, ব্যবসা অবশ্য ততটা নয়, কিন্তু একেবারে নিন্দারও নয়। প্রোপ্রাইটর রজনীবাবু মুখ-চেনা। যেতে আসতে দেখা। পুরনো আলাপের কজায় লতিকা নতুন ক'রে পালিশ ক'রে নিল। ছুটকো বন্দোবস্ত। কাটাই-ছাঁটাইয়ের কাজে পাকা হাত লতিকার। ওস্তাগরকে হার-মানানো। ছোট ছেলেমেয়েদের জামা ফ্রক বিশেষ ক'রে। রাত জেগে কাজে লেগে গেল লতিকা। কল চালিয়ে হাত টনটন, একদৃষ্টে চেয়ে জ্বালা ক'রে ওঠে দুটো চোখ, অনবরত হাই ওঠে। মন পাতা-বিছানা হাতড়ে বেড়ায়। তবু কাজ ছেড়ে লতিকা ওঠে না।

একটি দিনের জন্য নয়। ওষুধের দাম, পথ্য, মেওয়া—সবই জোটাতে হবে ওকে। হাত পাতবার মতন আর কে আছে ধারে কাছে! যারা ছিল, তারা সবাই ছাপোষা। নিজেদের সংসার আছে, সুখদুঃখ আছে, মাপা আয়ে বাড়তি সাহায্য সম্ভব নয়।

এক-একদিন ধরা প'ড়ে যায় অসিতের কাছে। পিঠে বালিশ দিয়ে উঠে বসেছে অসিত। সামনের জানলার ফ্রেমে বাঁধানো পত্রবহুল দেওদারের সার। সবুজ ঘাসে ভরা মাঠ। বাঁচার ইশারা। লতিকার দিকে মুখ ফিরিয়েই অসিত গম্ভীর হয়ে যায়, বলে, তোমার চোখের কোণে এত কালি পড়েছে কেন বল তো? এক ফোঁটা রক্ত নেই সারা মুখে। আমাকে সারাতে গিয়ে তুমি আবার অসুখ ডেকে আনবে নাকি?

লতিকা আলতো হাসে। মনে মনে ভাবে, মেয়েমানুষের প্রাণ যে। রোগ বালাই কিছু আসবে না এ শরীরে। মুখে বলে, কালি পড়তে যাবে কেন? বালাই যাট। খোকনকে কাজল পরাতে গিয়ে নিজেব একটু পরতে সাধ হ'ল। বেশি হয়ে গেছে বুঝি? ছিঃ ছিঃ, ডাক্তার আব নার্স কি মনে করল বল তো?—কপট লজ্জায় লতিকা আঁচলে মুখ ঢাকে।

দিন দুয়েক দোলগোবিন্দ এসেছিল, পেশেণ্টের মোটরে। অল্পক্ষণই ছিল, তার মধ্যেই বার চাবেক অসিতের পিঠ চাপড়াল: যা, খুব বেঁচে গেলি এবার। বউঠানের সিঁদুরের তেজ আর শাঁখার জোর। আর মাস খানেকের মধ্যেই ছুটি।

আর মাস খানেক নয়, ছুটি মিলল আরও মাস দেড়েক পরে। প্রায় আচমকা। ডাক্তার লতিকার সামনেই বললেন কথাটা। কাল থেকে ছুটি। বাড়ি যেতে পারে রোগী। দিন পনেরো আর বিছানায় নয়, বারান্দায় চেয়ার পেতে বসার অনুমতি পেয়েছিল অসিত। ডাক্তারের সামনেই দু হাতে লতিকার একটা হাত জাপটে ধরল।

লতিকার রক্তহীন মুখে রক্ত উপচে পড়ল। মুখ লুকোল নতুন কনের মতন।

রোগীকে ছাড়বার দিন হাসপাতালের ডাক্তার লতিকাকে ডেকে

পাঠালেন। বন্ধ ঘরে ঘণ্টাখানেক ধ'রে উপদেশ। রোগীর সম্বন্ধে সাবধানবাণী—অন্তত আরও মাস খানেক বিশ্রামের ব্যবস্থা, ভারী কাজ একেবারে বারণ। লতিকা চুপচাপ শুনল মন দিয়ে। কেবল ওঠার সময় বললে, সাবধানে রাখার আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব।

সেদিন হেঁটে নয়, একেবারে টানা মোটরে। অসিত আর লতিকা পাশাপাশি সেই বিয়ের সময় জোড়ে ফিরেছিল, ভাড়াটে মোটরে এমন পাশাপাশি বোধ হয় আর বসে নি। বাড়ির দরজায় নামতেই আশে-পাশের অনেকে এগিয়ে এলেন। বউ-ঝিরা চৌকাঠ পর্যন্ত। কালরোগ, বেঁচে ফিরে এসেছে মানুষটা, কম কথা। এক হাতে সব কিছু করেছে লতিকা। সংসার আর স্বামী দুজনকে দেখেছে। বাইরের লোক এগিয়ে এল বটে, কিন্তু ঘরের খোকন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল পর্দার পাশে। চেনা লোক, এতদিন ছিল কোথায় মানুষটা। অসিত এগিয়ে খোকনকে কোলে তুলে নিলে।

অবসন্ন শরীর। সন্ধ্যার ঝোঁকেই অসিত ঘুমে কাত। ঘুম ভাঙল প্রায় মাঝরাতে। এমনি নয়, সেলাইয়ের কলের আওয়াজে। এই ভয়টাই অবশ্য লতিকা করেছিল। আরও একটা মাস চালাতে হবে সংসার। যেমন ক'রে হোক। বিনা মাইনের ছুটি। অসিত কাজে না-লাগা পর্যন্ত লতিকাকে কাজ ক'রে যেতে হবে।

এ কি !—অসিত ধড়মড়িয়ে বিছানার ওপর উঠে বসল।

কাঁচি কাপড় ফেলে লতিকা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল বিছানার ওপর : ঘুম ভেঙে গেল তো। এই ভয়টাই আমি পাচ্ছিলুম।

তা তো পাচ্ছিলে, কিন্তু কাপড়ের রাশ কেন এত ? মাঝরাতে জামা-সেলাই করারই বা ধুম কেন ?

আস্তে আস্তে একটু একটু ক'রে অনেকটা বেদানার দানা ছাড়ানোর মতন লতিকা সব বলল অসিতকে, এ ছাড়া আর কি উপায় আছে ? হাসপাতালের খরচ, রোগীর পথ্য, সংসারের অভাব-অনটন, সবই তো মেটাতে হবে। বাড়তি খরচ চোকাতে বাড়তি কাজ।

সব অসিত শুনল। ছোট ছেলের রূপকথার কাহিনী শোনার মতন। তারপর বললে, এবার আর ভয় নেই। আমি তো সেরে উঠেছি।

বিড় বিড় ক'রে লতিকাও উচ্চারণ করলে, সত্যি আর ভয় নেই। সংসারের জোয়াল শক্ত কাঁধেই মানায়। কর্ষণ করবে পুরুষ, মেয়েছেলে বীজ বুনবে, বড় জোর আগাছা ওপড়াবে এপাশ-ওপাশ থেকে। আঁচলে ক'রে জল ছিটিয়ে নরম করবে মাটি।

দিন চারেক পর। উঠে হেঁটে অসিত বেড়াতে শুরু করল। এ-ঘর থেকে ও-ঘর। দেয়াল ধ'রে ধ'রে নয়, শক্ত পায়ে, মেঝে মাড়িয়ে মাড়িয়ে। মাঝে মাঝে সহজ কাশি এলেই চমকে ওঠে। এদিক ওদিক দেখে ভয়ে ভয়ে থুতু ফেলে। লতিকাকে আড়াল করে। না, মিথ্যা ভয়। ভয়ের কিছু নেই। তবু ছোট ছেলের মতন লতিকাকে আঁকড়ে ধরে, বলে, আমি সেরে গেছি লতা, না? একেবারে সেরে গেছি?

ভুরু কুঁচকে লতিকা আলতো হাসে, বাঃ রে, গেছই তো। নিজে বুঝতে পারছ না?

পারছে বইকি। একটু একটু পারছে। রাতের অন্ধকারে নিজের গায়ে মাথায় অসিত হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখে। না, কোন উত্তাপ নেই। স্বাভাবিক অবস্থা। বুকের ওপর হাত চেপে চেপে দেয়। কই, কোন ব্যথা নেই তো। ব্যথা তো নেইই, আরও আশ্চর্যের কথা, পাঁজরের ওপর মাংসের পলিমাটি পড়েছে। মেদের ইশারা।

এগিয়ে আসে লতিকা। মাথাটা রাখে অসিতের বুকের ওপর। আধো আধো স্বরে বলে, একেবারে ভাল হয়ে গেছ তুমি। কুলোর বাতাস দিয়ে রোগকে বিদায় ক'রে দিয়েছি।

অসিত লতিকাকে আরও কাছে টেনে আনে। বলে, কুলোর বাতাস দিয়ে কিনা জানি না, ডাক্তার বদ্যি কি করেছে তাও জানি না, রোগ যদি পালিয়ে গিয়ে থাকে তো তোমার ভয়েই পালিয়েছে।

মাঝে মাঝে অসিত এলোমেলো কথাও বলে। লতিকাকে আদর করতে করতে আচমকা বলে, আচ্ছা, এই যে এত কাছে তুমি আস আমার! তোমার ভয় করে না?

ভয়? কেন?

রোগটা তো থাকতেও পারে ভেতরে। আবার যদি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে কোনদিন?

লতিকা একটা হাত দিয়ে অসিতের মুখ চেপে ধরে। কান্নায় ভেঙে পড়েঃ থাম, থাম তুমি। ফের যদি এসব অলুক্ষণে কথা মুখ দিয়ে বার কর তো আমার যেদিকে দু চোখ যায়, আমি বেরিয়ে পড়ব, নয়তো পরনের কাপড় গলায় বেঁধে ঠিক ঝুলে পড়ব একদিন।

কথা আর বাড়ায় না অসিত। লতিকা তো উদ্দেশ্য, নিজের মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি দেওয়া ভয়কেই অসিত টেনে হিঁচড়ে বার করতে চায়। অন্য লোকের চোখ দিয়ে তার স্বরূপ দর্শন।

আর দিন চারেক। তারপরেই অসিত অফিসে বেরোবে। হাতের কাজ লতিকা শেষ ক'রে এনেছে। যা কটা জামা বাকি আছে, একটু বেশি খেটেই সেগুলো প্রায় তৈরি ক'রে আনছে। মাঝরাত অবধি জেগে জেগে মাথা গরম। ঘুমই হয় না, কেবল বিছানায় এপাশ ওপাশ। কপালে ঘাড়ে ঠাণ্ডা জল দিয়ে ঘুমের সাধনা।

সেদিন অসিতকে খেতে দিয়ে একটু সকাল সকালই লতিকা স্নানের ঘরে ঢুকল। খোকন ঘুমিয়েছে। অনেকটা বাঁচোয়া। মাথা তেতে আগুন। কলের তলায় মাথা না পাতলে স্বস্তি নেই।

তুমি ব'সে ব'সে খাও। আমি পাঁচ মিনিটে স্নান সেরে আসছি।

পাঁচ মিনিট অবশ্য কথার কথা। মিনিট পনেরো কেটে গেল তেল মাখতে। তারপর সাবান দিয়ে তেল ওঠাতে আরও মিনিট দশেক। কল খোলার মুখেই লতিকা থেমে গেল। অসিতের গলা। প্রথমে বোঝা গেল না। ভাতের গ্রাস মুখে দিয়ে কথা বলার চেষ্টা। তারপর একটু কান পাততেই আওয়াজ স্পষ্ট।

ঘুম থেকে খোকন উঠে এসেছে, অসিত তাকেই কাছে ডাকবার চেষ্টা করছে। লোভনীয় বিশেষণ, নানা রকমের শব্দ। খোকনের পায়ের আওয়াজও পাওয়া গেল। শরীর সামলে হেলতে-দুলতে আসছে।

এস খোকনবাবু, দেখো, সাবধান। বাস্, এই তো চৌকাঠ পার হয়েছ।

কল বন্ধ ক'রে লতিকা চুপচাপ শুনল। আধ আধ সুরে ছেলেও উত্তর দিতে শুরু করেছে বাপের। ছাড়া-কাপড় মুখে চাপা দিয়ে লতিকা হেসেই ফেললে। কি পাকা ছেলেই হয়েছে খোকন! সকলকে হার মানাবে। শুনতে শুনতেই কিন্তু লতিকার ভুরু কুঁচকে গেল। জ্ব'লে উঠল দুটো চোখ। দ্রুত নিশ্বাসের ছন্দ। কোন রকমে শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে এল দরজা খুলে।

এস খোকন, খাবে এস। চট্ ক'রে খেয়ে নাও।

একটুও দেরি করল না লতিকা। বাপ আর ছেলের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। অসিতের প্রসারিত হাতে ঝোল-মাখা ভাত। খোকন অল্প হাঁ ক'রে এগিয়ে আসছে।

ঝাপটা দিয়ে লতিকা অসিতের হাত থেকে ফেলে দিল ভাতের রাশ। কিছু থালায়, কিছু অসিতের কাপড়ে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর ছোঁ মেরে খোকনকে কোলে তুলে নিল।

কি গো, তুমি কি সর্বনাশ করছিলে বল তো?—জ্ঞান নেই লতিকার। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে কথাগুলো।

একটু একটু ক'রে অসিত মুখ তুলে চাইল। প্রথমে ছড়ানো ভাতের দিকে, তারপর উত্তেজনায় আরক্ত লতিকার মুখের দিকে। আর কিছু অস্পষ্ট নেই। কোথাও সামান্য সন্দেহও নয়। আগে হয়তো পারে নি, কিন্তু এইবার ঠিক সময়ে লতিকা সর্বনাশ ঠেকাতে পেরেছে। ভরাডুবি থেকে খুব বাঁচিয়েছে নিজের সংসার।

শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

বেতালের বৈঠকী

গণতন্ত্র শাসনের দোষ নাহি হেরি,
পরিতেও রাজী আছি রাজতন্ত্রী বেড়ি,
বৈরতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র তাও সহ্য হয়,
মূর্খতন্ত্র শাসনেই করি বড় ভয়।

বেতালভট্ট

হ্যাম্‌লেট, ডেনমার্কের কুমার

(পূর্বানুবৃত্তি)

[পাঠরত হ্যামলেটের প্রবেশ]

পলো। অনুমতি পাই যদি শুধাইতে চাই
কেমন আছেন আমাদের
সুযোগ্য কুমার হ্যামলেট ?

হ্যাম। ঈশ্বরের কৃপায় ভালই আছি।

পলো। কুমার, আমায় কি চিনতে পারেন ?

হ্যাম। খুব ভাল রকম চিনতে পারি , আপনি তো জেলেডুবুরি।

পলো। না কুমার।

হ্যাম। তা হ'লে অমন একজন সংলোক হতে পারলেন না।

পলো। সৎলোক, কুমার !

হ্যাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ। জগতের যা গতিক সৎলোক লাখে মেলে এক।

পলো। তা সত্য, কুমার।

হ্যাম। কারণ, সূর্য যখন মরা কুকুরের দেহে কীটাণুর জন্ম দান করেন, দেবতা হয়েও গলিত মাংস চুম্বন ক'রে থাকেন—। আপনার একটি মেয়ে আছে না ?

পলো। আছে কুমার।

হ্যাম। সূর্যালোকে সে যেন না বেড়ায়। জন্মদান তো ভালই, কিন্তু আপনার মেয়ের পক্ষে সেটা কেমন হবে কে জানে ! সাধু সাবধান !

পলো। (স্বগত) ঠিক ধরেছি কি না ? সেই আমার মেয়ের কথা। অথচ প্রথমে আমায় চিনতেই পারে নি , আমায় বলে কিনা— জেলেডুবুরী ! একেবারে ব'য়ে গিয়েছে, একেবারে। সত্যি বলতে যৌবনে প্রেম নিয়ে আমিও বহুৎ কষ্ট পেয়েছি , অনেকটা এই রকমই। আবার কথা কই। কুমার কি পড়ছেন ?

হ্যাম। কথা, কথা, কথা।

পলো। ব্যাপারটা কি কুমার ?

হ্যাম। কাদের ব্যাপার ?

পলো। মানে, যা পড়ছেন তারই ভিতরের ব্যাপার।

হ্যাম। শুধু কুৎসা। দুর্বৃত্ত লেখকটি ব্যঙ্গভরে এখানে বলছেন যে, বৃদ্ধ ব্যক্তিরা সুপক্ক শ্মশ্রুবিশিষ্ট, তাদের মুখমণ্ডল বলিজর্জর, তাদের চক্ষু হতে নিঃসৃত হয় গাঢ় সর্জরস অথবা বদরীবৃক্ষের আটা, তারা প্রচুর পরিমাণে জ্ঞানবিবর্জিত, তদুপরি তাদের জানুদ্বয় একান্ত দুর্বল। এ সব কথাই আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, কিন্তু এভাবে লিপিবদ্ধ করাটা ন্যায়সঙ্গত হয় নি। কারণ, যদি কাঁকড়ার মত পিছু হাঁটতে পারেন, তবে আপনিও তো আমার মতই বৃদ্ধ হবেন।

পলো। (স্বগত) যদিও প্রলাপোক্তি, তার মধ্যে যুক্তিও আছে। কুমার, একটু খোলা জায়গায় যাবেন ?

হ্যাম। যাবই তো, ভবপারে।

পলো। সে স্থানটা খোলা বটে। (স্বগত) মাঝে মাঝে এর উত্তরগুলি কি অর্থপূর্ণ! সুস্থ মস্তিষ্কে যা সম্ভব নয়, উন্মাদে তা সময়ে সময়ে ঠিক ধ'রে ফেলে। এখন চ'লে যাই, হঠাৎ এর সঙ্গে আমার কন্যার সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দেব। মাননীয় কুমার, এখন আমায় বিদায় দিন।

হ্যাম। স্বচ্ছন্দে সানন্দে দিচ্ছি, এ আর এমন কি অদেয় ? নিজের জীবন ছাড়া, জীবন ছাড়া, জীবন ছাড়া।

পলো। তা হ'লে বিদায় হই কুমার।

হ্যাম। যত সব বুড়ো জানোয়ার !

[রোজেন্‌ক্রান্‌জ ও গিলডেন্‌স্টার্নের প্রবেশ]

পলো। কুমার হ্যামলেটকে খুঁজছেন ? ওই যে ওখানে।

রোজেন। ধন্যবাদ।

[পলোনিয়সের প্রস্থান]

গিলডেন। মাননীয় কুমার !

রোজেন। প্রিয় বন্ধু, কুমার হ্যামলেট !

হ্যাম। আরে গিলডেন্‌স্টার্ন, কেমন আছ ? রোজেন্‌ক্রান্‌জ, আছ কেমন ? বল, বল ভাই, দুজনেই কেমন আছ ?

রোজেন। জগৎ যেমন রেখেছে ; মাঝামাঝি আর কি।

গিলডেন। অতি সুখ নেই, সেই সুখে আছি। ভাগ্যদেবতার মুকুটমণি নই।

হ্যাম। তার জুতোর সুকতলাও তো নও ?

রোজেন। না, তাও নয় কুমার।

হ্যাম। খবর কি ?

রোজেন। খবর কিছুই নয়। তবে মনে হয় জগৎটা পূর্বের চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে।

হ্যাম। তা হ'লে তো প্রণয় ঘনিয়ে এল। কিন্তু তোমার ও-খবরটা ঠিক নয়। আর একটু খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করি। ভাগ্যদেবতার কাছে কি এমন অপরাধ করলে বন্ধু, যে, তিনি তোমাদের এই কারাগারে পাঠালেন ?

গিলডেন। বলেন কি কুমার ? কারাগার ?

হ্যাম। ডেন্‌মার্ক তো একটা কারাগার।

রোজেন। তা হ'লে জগৎটাই তাই।

হ্যাম। সুন্দর কারাগার! বিবিধ হাজত, পাতালঘর, গারদখানায় ভরা জগৎ ; ডেন্‌মার্ক তার মধ্যে নিকৃষ্টতম।

রোজেন। আমরা তা মনে করি না কুমার।

হ্যাম। তা হ'লে তোমাদের কাছে নয়। ভালমন্দ কোনটাই তো সত্য নয়, যে যেমন ভাবে তার কাছে তেমন। আমার কাছে এ একটা কারাগার।

রোজেন। তা হ'লে বলুন আপনার উচ্চাভিমানটাই একে কারাগার বানিয়েছে। আপনার প্রশস্ত মনের পক্ষে স্থানটা অত্যন্ত সংকীর্ণ।

হ্যাম। না হে না। আমি গুটিবদ্ধ থেকেও নিজেকে অনন্ত আকাশের অধীশ্বর মনে করতে পারি। কিন্তু মুশকিল এই, বড় খারাপ স্বপ্ন দেখি।

গিলডেন। ওই স্বপ্নই তো উচ্চাভিলাষ; উচ্চাভিলাষীর চিত্তের যে বস্তুসত্তা তা স্বপ্নেরই ছায়া।

হ্যাম। স্বপ্ন নিজেই তো একটা ছায়া।

রোজেন। তা ঠিক; আমার মনে হয় উচ্চাভিলাষ জিনিসটা এমনই সূক্ষ্ম, এমনই বায়ব যে, সে ছায়ারও ছায়া।

হ্যাম। তা হ'লে ভিক্ষুকরাই হ'ল আসল সত্তা, আর উচ্চাভিলাষী যত রাজরাজড়া, শূরবীর, তারা ওই ছায়ার ছায়া, ভিক্ষুকদের ছায়া। রাজসভায় যাচ্ছ নাকি? বলব কি ভাই, আমার বিতর্ক করবার আর শক্তি নেই।

রোজেন।
গিলডেন। } আমরা আপনারই সেবক।

হ্যাম। না হে, ও-কথা ব'লো না। আমার সেবকদের দলে তোমাদের ভর্তি করতে চাই নে। সত্য কথা বলতে কি, সেবকদের সেবা আমায় উত্তিষ্ঠ করেছে। যাক তোমরা হ'লে বন্ধু, জিজ্ঞাসা করতে পারি—এলসিনোরে আসার হেতু?

রোজেন। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা; আর কিছুই নয়।

হ্যাম। আমি ভিক্ষুক, ধন্যবাদ দান করবার শক্তিও নেই, তবু তোমাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। বন্ধু হে, জেনে রাখ, আমার ধন্যবাদ মুফতে পাওয়া যায় না। আচ্ছা, তোমাদের ডেকে পাঠানো হয় নি কি? এমনি নিজে থেকেই এলে? স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাক্ষাৎ? চ'লে এস, খোলাখুলি বল, ব'লে ফেল, ব'লে ফেল।

রোজেন। কি বলব কুমার?

হ্যাম। কেন, যাচ্ছেতাই একটা কিছু। তোমাদের ডাকাই হয়েছিল, তোমাদের মুখ চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, ঢেকে রাখবার মত কৌশল তোমাদের আয়ত্তে নেই। জানি, রাজা মহোদয় ও রাণী মহোদয়া তোমাদের আহ্বান করেছেন।

রোজেন। কি উদ্দেশ্যে কুমার?

হ্যাম। সেটা তোমরাই আমায় বলবে। তোমরা ভাই আমার

চিরসহচর, বাল্যবন্ধু, অন্তরের অন্তরঙ্গ; আর বেশি গুছিয়ে বলবার তো আমার শক্তি নেই; বল ভাই, সরলভাবে আমায় স্পষ্ট ক'রে বল— তোমাদের কেউ ডেকেছে, না, ডাকে নি?

রোজেন। (জনান্তিকে, গিলডেনকে) কি বল হে?

হ্যাম। (স্বগত) তা হ'লে ব্যাপারটা বোঝাই গেল। আমায় যদি ভালবাস, লুকিও না ভাই।

গিলডেন। কুমার, আমাদের ডাকা হয়েছিল।

হ্যাম। কেন, তা আমিই ব'লে দিচ্ছি। তা হ'লে সে কথা তোমাদের নিজমুখে ব্যক্ত করতে হবে না, আবার রাজা-রাণীর কাছে গোপন করবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তাও ভঙ্গ হবে না। কিসে কি হ'ল জানি নে ভাই, কিন্তু সম্প্রতি আমি সব আনন্দ হারিয়েছি, সব ক্রীড়া-কৌতুক ত্যাগ করেছি। মনটা এমনই ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে যে, এমন সুন্দর এই পৃথিবী, মনে হয় যেন একটা শুকনো ডাঙা, ওই চমৎকার চন্দ্রাতপ, দিগন্তচুম্বী আকাশ, হিরণ্যদ্যুতিময় জ্যোতিঃপুঞ্জখচিত ধরণীর আচ্ছাদন ওই নভোমণ্ডল, বলব কি, আমার চোখে লাগে যেন একটা অতিনোংরা ব্যাধিদুষ্ট বিষবাষ্পের স্তূপ। কী অপূর্ব সৃষ্টি এই মানুষ! মহান্ তার জ্ঞান, অনন্ত তার শক্তি, আকারে ও ভঙ্গিমায় কী যথাযথ, কী মনোহর; কার্যে দেবদূত, বুদ্ধিতে দেবতা, আদর্শ জীব, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি! তবু আমার মনে হয়, কোন্ ধূলোর ধূলো এই মানুষ? মানুষ আমায় আনন্দ দেয় না। হাসলে যে বড? মেয়েমানুষও আনন্দ দেয় না।

রোজেন। ও-কথা আমার মনেও হয় নি কুমার।

হ্যাম। তবে হাসলে কেন? আমি যখন বললাম 'মানুষ আমায় আনন্দ দেয় না'।

রোজেন। ভাবলাম, মানুষ যদি আপনাকে আনন্দ না দেয় তবে যে সব নটেরা আপনাকে আনন্দ দান করতে আসছে তারা তো আপনার কাছ থেকে উৎসাহ অভিনন্দন কিছুই পাবে না। আসবার পথে আমরা তাদের দেখে এলাম, তারা আপনার কাছেই আসছে।

হ্যাম। বেশ তো। যে রাজার ভূমিকায় নামবে তাকে অভিনন্দিত

করব, মহারাজকে রাজকরই দেব। দুঃসাহসী বীরপুরুষ অসিনৈপুণ্য ও সাহস প্রদর্শনের যথেষ্ট সুযোগ পাবে। প্রেমিককেও বৃথা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে দেব না; যাদের ভূমিকা আবেগপ্রধান তাদের উচ্ছ্বাসে কোন প্রতিবন্ধক হবে না, বিদূষক মঞ্চে নামলেই লোকের বগলে সুড়সুড়ি লাগবে; আর যিনি নায়িকা, এক ছন্দের বাধা ছাড়া তাঁর মনোভাব প্রকাশের কোন বাধাই হবে না। দলটি কোথাকার?

রোজেন। আপনি যাদের অভিনয় দেখে খুব আনন্দ পেতেন—শহরের সেই শিল্পীসংঘ।

হ্যাম। তারা মফস্বলে ঘুরছে, ব্যাপার কি? শহরে থেকেই তো তাদের যশ ও অর্থ দুই-ই বেশ হয়েছিল?

রোজেন। সাম্প্রতিক রুচি পরিবর্তনই তাদের অধোগতির কারণ।

হ্যাম। আমি যখন শহরে ছিলাম, তখনকার প্রতিপত্তি কি তাদের অক্ষুণ্ণ আছে? এখনও কি সেই রকম ভিড় হয়?

রোজেন। না, তা আর নেই।

[ভিতরে তূর্যধ্বনি]

গিলডেন। ওই যে শিল্পীরা এসে পড়েছে।

হ্যাম। তোমরা দুজন এলসিনোরে এসেছ ভাই, বড়ই আনন্দের কথা। হাতে হাত দাও, সঙ্কোচ কিসের? এই সব বাহ্যিক রীতি অভ্যর্থনার অঙ্গ। আবার তোমাদের অভ্যর্থিত করছি। কিন্তু আমার খুড়তুতো পিতা ও মাসতুতো মাতা ফাঁকে পড়লেন।

গিলডেন। কেন কুমার?

হ্যাম। আমার মাথার ঈশান কোণটাই খারাপ হয়েছে। দক্ষিণে বাতাস বইলে কাক কি কোকিল আমি ঠিক চিনতে পারি।

[ক্রমশ]

অনুবাদ° শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ইনফ্লুয়েন্জা

(ধনপতি পাগলার ডায়েরি হইতে)

"চা-ভারতী" রেস্তোরাঁর আদি ও অকৃত্রিম মালিক গোবিন্দ গরাই এসে হাজির, যে আমার কাছে কোনদিন আসবে ব'লে কোনদিন ভাবি নি। শুধালেম, ব্যাপার কি গোবিন্দ?

একটুও ইতস্তত না ক'রে গোবিন্দ বললে, রাহুলবাবুর অঙ্গ জ্ব'লে যাচ্ছে, কেট্‌লি চাপিয়ে দিলে চায়ের জল গরম হয়ে যায়।

বল কি গোবিন্দ? হঠাৎ এ রকম?

গোবিন্দ গরাই বললে, হঠাৎ হয়তো নয় বাবু। তবে আমি টের পেলুম হঠাৎ বটে। কাঁটায় কাঁটায় দশটায় ওঁকে আপিসে হাজির হতে হয়, চান্‌-টান্‌ সেরে নটার ভেতরে আমার ওখানে খেতে এসে পড়েন। নটা, সওয়া নটা, সাড়ে নটা, দশটা, সাড়ে দশটা বেজে গেল, উনি এলেন না। আমার সহধর্মিণী বললে—যাও, একবার দেখে এস। দেখতে গিয়ে দেখি, দরজা খোলা—পায়ে জুতো, বিছানায় দেহ এলিয়ে শুয়ে আছেন। আমায় দেখে বললেন—আজ আর বোধ হয় আপিস যাওয়া হ'ল না গোবিন্দ। গায়ে হাত চাপিয়ে দেখি, গনগনে উনুনের পিঠের মত গরম। ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, ইন্‌ফ্লুয়েন্‌জার হিড়িক নেই শহরে, অথচ এমন গা গরম! ভাবনার কথা। উনি বললেন—কিছু ভেবো না গোবিন্দ, শুধু একবার ধনপতিবাবুকে খবর দাও। আপনি আসবেন কি একবার?

গেলুম। যাবই যে তা যেন নিশ্চিত জানত রাহুল। বিস্মিত হ'ল না আমায় দেখে। বললে, আপিসে একটা খবর পাঠাতে হবে। আজ বোধ করি যাওয়া সম্ভব হবে না আমার। যেন তার সারা অফিস তারই পথ চেয়ে ব'সে আছে, সে বিনে সব কাজকর্ম অচল হয়ে ব'সে থাকবে। স্রোতের শ্যাওলা ভাবছে, স্রোতকে সে-ই চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

তা ভাবতে পারে রাহুল রায়। সে তো শুধু কেরানী নয়, সে কবি। মাথা গোঁজবার আশ্রয় তার ছোট, গ্যারাজের ওপর এই কম ভাড়ার ছোট্ট খুপরি—কিন্তু স্বপ্ন তার বড়, হ'লই বা সে ভুজঙ্গ চৌধুরীর মস্ত অফিসের ছোট কেরানী।

বললেম, অফিসে খবর দেব তো নিশ্চয়ই রাহুলবাবু। তার জন্তে তো তাড়া নেই। প্রথমে দরকার একখানা থার্‌মোমিটার।

থার্‌মোমিটার জ্বর শুধু দেখতেই পারে, থামাতে পারে না ধনপতিবাবু। ওটার বরং দেরি সইবে।—বললে রাহুল রায়, কিন্তু একটা জরুরী কাজ দিয়েছিলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিজে, সেটা সব তৈরি ক'রে রেখে এসেছি আমার টেবিলের ফাইলে। সমস্ত রেডি, শুধু টাইপ করাটুকুই বাকি। কিন্তু ওই বাকিটুকু বাকি থাকলে চলবে না। পুরো হওয়া চাই আজকেই।

মনে পড়ল, অল্পদিন আগে রাহুলের মাইনে দশ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভুজঙ্গ চৌধুরী। সেই দশ টাকার উন্মাদ ছায়া থরথর ক'রে কাঁপছে অহরহ রাহুল রায়ের মন-সায়রে। তাই থার্‌মোমিটার-ফাটানো তাপ গায়ে নিয়েও কবি রাহুল ভাবছে অফিসের কথা।

গায়ে হাত দিলুম রাহুলের। গা পুড়ে যাচ্ছে দুপুরের সাহারার মত। ঠাণ্ডা-রাঁহুলকে দেখে অভ্যস্ত আমি অত্যুষ্ণ-রাহুলকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লুম। বেহুঁশ হতে হয়তো বেশি দেরি হবে না রাহুলের। কি করব তখন? গোবিন্দের জিম্মায় রাহুলকে রেখে চ'লে গেলুম সৌদামিনী-ভবনের প্রবেশদ্বারে। বিজলী বোতাম টিপে জানানি পাঠালুম ভেতরে—আমি এসেছি। এল পুরাতন ভৃত্য কানাই। মুখমণ্ডলে প্রশ্নচিহ্ন আঁকা। সে চিহ্ন ভাষামুখর হয়ে ওঠবার আগেই প্রশ্ন করলুম, কর্তাবাবু আছেন?

কানাই বললে, কর্তাবাবু বাইরে, ফিরতে বারোটা হবার কথা।

তা হ'লে একবার মা ঠাকরুণ কিংবা দিদিমণিকে একটু খবর দিতে পার ভাই? বল, তাঁদের গ্যারেজের ওপরকার ঘরের ভাড়াটের বন্ধু আমি। একবার দেখা হওয়া বড্ড জরুরী। আমি বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলেম।

বাইরে থাকতে হ'লে অবশ্য দাঁড়ানোই সুবিধে। কিন্তু এইটে হচ্ছে বৈঠকখানা। এইখানেই বরং বৈঠক দিন না। আমি খবর দিচ্ছি।

বৈঠকখানায় ঢুকে বসলুম। বসতে হ'ল না বেশিক্ষণ। একটু পরেই সামনে দেখি, দাঁড়িয়ে আছেন কুমারী দময়ন্তী দালাল—সহধর্মিণীর বেনামে সৌদামিনী-ভবনের মালিক এবং কবি-কেরানী রাহুল রায়ের বাড়িওয়ালা দিবাকর দালালের একমাত্র সন্তান। তাকালেন আমার দিকে, দৃষ্টির ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসার ছন্দ। বাজে কথায় সময় এক ফোঁটাও নষ্ট করব না স্থির ক'রে বললুম, সর্বপ্রথমে দরকার একটি থার্‌মোমিটার।

হেসে বললেন, তার আগে দরকার ব্যাপারটা কি সেটা জানা।

বললুম, আপনাদের ভাড়াটে কবি রাহুল রায় সহসা ভারি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। একটু আগে হুঁশ ছিল, কিন্তু এতক্ষণে বেহুঁশ হয়ে থাকলে অবাক হবার কিছু নেই। একটা থার্‌মোমিটার নিয়ে যদি—

আমিও আসি—এই তো? আচ্ছা, চলুন দেখি।

কিন্তু থার্‌মোমিটার?

সে হবে 'খন। চলুন। একবারটি আয় তো কানাই।

বেহুঁশ হয় নি রাহুল। কিন্তু অবাক হ'ল দময়ন্তী দালালকে দেখে। চেষ্টা করলে উঠে বসবার। না উঠে বসলে অভদ্রতা হবে ভেবে। কিন্তু বৃথা—বৃথা—বৃথা চেষ্টা হে রাহুল! জীবনে এক-একটা সময় আসে যখন মানুষ চেষ্টা করলেই উঠে বসতে পারে না—এ বিষয়ে বাল্মীকি থেকে শুরু ক'রে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সবাই একমত।

দময়ন্তী দালাল বললে, উঠবেন না রাহুলবাবু। শুয়ে থাকুন আপনি। পা থেকে জুতো খুলে নে কানাই। আপনি বুঝি অফিস যাবেন ভেবে জুতো ছাড়েন নি?

মোলায়েম ছন্দে জুতো খুলে ফেললে কানাই রাহুলের পা থেকে। ফিতেহীন ঢলঢলে জুতো, গায়ে কালি পড়ে নি অনেক দিন।

রাহুল বললে, কিন্তু অফিসে একবার—

দময়ন্তী বললে, সে হবে 'খন। দাঁড়ান, জ্বরটা আগে আন্দাজ করি।

ভাবলুম, থার্‌মোমিটার বার করবে এইবার। কিন্তু না। থার্‌মোমিটার আনে নি দময়ন্তী দালাল। শুধু তার দক্ষিণ হাতে রাহুলের ললাট স্পর্শ করলে দময়ন্তী, আর বললে, উঃ, গা যে পুড়ে যাচ্ছে!

মনে হ'ল, এ সেই চিরন্তনী নারী, অস্পষ্ট অবৈজ্ঞানিক যার দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তাধারা। গা পুড়ে যাচ্ছে—এইটুকু বলাই যেন যথেষ্ট, কত ডিগ্রী উত্তাপে পুড়ছে সে হিসেব যেন অবান্তর। আবার মনে হ'ল, এ সেই চিরন্তনী নারী, দুঃখের শিয়রে যার হৃদয় ভ'রে উঠেছে সেবামধুর করুণা-উচ্ছল বেদনায়, দেহতাপের ডিগ্রী-তারতম্যের হিসেব যার কাছে গৌণ।

একটু পরে কেউ রাহুল রায়ের ঘরে গেলে দেখতে পেত, সে ঘরে তালা বন্ধ, ঘরের ভেতরে নেই রাহুল। রাহুল তখন দিবাকর দালালের বাড়িতে একটি আলো-বাতাস-ধন্য ঘরে কাঁচা-লিখিয়ের-লেখা রোমান্টিক কাহিনীর নায়কের মত দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে। গোবিন্দ গরাই ফিরে গেছে তার চা-ভারতী রেস্তোরাঁয়। তার ঐতিহাসিক প্রয়োজন মিটে গেছে। এইবারে থার্মোমিটার লাগিয়ে দেখে দময়ন্তী দালাল বললে, এক শো দুয়ের কাছাকাছি। শুনে আমি শিউরে উঠলুম। থার্মোমিটারে এক শো উঠলেই আমি শিহরিত হতে শুরু করি, অথচ এক শো দুয়ের সিংহদ্বার দেখেও দময়ন্তীর কণ্ঠস্বরে এক ফোঁটা কম্পন নেই! আশ্চর্য! কিন্তু আশ্চর্যই বা বলি কেন? এই হয়তো স্বাভাবিক। এত শাখা-প্রশাখায় ছড়ানো বিরাট বটবৃক্ষ গ্রেট এশিয়াটিক ব্যাঙ্কে যিনি অনায়াসে লাল বাতি জ্বালিয়েছিলেন, সেই দিবাকর দালালের একমাত্র কন্যার চিত্ত এত সহজে কম্পিত হবে কেন?

ফোন-নম্বর দেখে নিয়ে ভুজঙ্গ চৌধুরীর অফিসে ফোন করলে দময়ন্তী দালাল। সটান ম্যানেজিং ডিরেক্টার ভুজঙ্গ চৌধুরীর ঘরে। কি অবলীলা-ক্রমে ফোন করে দময়ন্তী! একটা দেখবার জিনিস! চেষ্টার আভাসমাত্র টের পাওয়া যায় না, এমনই সাবলীল ভঙ্গী। জীবনে নিশ্চয় অসংখ্যবার ফোন করেছে, ফোন ধরেছে, তাই বিশ্বের কোন ফোনই হয়তো আর বুক কাঁপাতে পারবে না দময়ন্তীর দালালের। এক ফোঁটা দ্বিধা, এক ফোঁটা জড়তা বা আড়ষ্টতা নেই দময়ন্তীর 'হ্যালো'তে, যেন ভয়-ভ্রূক্ষেপ করছে না দুনিয়ার কাউকেই, অথচ দম্ভ বা ঔদ্ধত্যের বিরস সুরের একটি আঁচড়ও পড়ছে না তাতে। অদ্ভুত, অদ্ভুত, অদ্ভুত দময়ন্তী দালালের এই ফোন করা! দুগ্ধফেননিভ শয্যায় সারা দেহে এক শো দুয়ের কাছাকাছি উষ্ণতা নিয়ে ভাবছিল রাহুল রায়।

ফোনের ওধারে পাওয়া গেল না ভুজঙ্গ চৌধুরীকে। অফিসে তখনও আসে নি ভুজঙ্গ, কোথায় নাকি একটা জরুরী মীটিঙে গেছে, আসতে দেরি হবে। বহুলক্ষপতি ভুজঙ্গ চৌধুরী মীটিং খুব জরুরী না হ'লে যায় না, ছোটখাট এমন কি মাঝারি-গোছের মীটিঙে গিয়েও নষ্ট করবার মত যথেষ্ট সময় তার নেই। বণিকসভায় মাঝে মাঝে জটিল বাণিজ্যিক বিষয়ের ওপর বক্তৃতা দেয় ভুজঙ্গ, মানে টাইপ-করা বক্তৃতা প'ড়ে যায়; সে সব বক্তৃতার মূল খস্‌ড়া নেপথ্যে রচনা ক'রে দেন চৌধুরী কোম্পানির অডিটার্স সার্‌কার অ্যাণ্ড সার্‌কারের বড় অংশীদার, বিলেত-ফেরত হিসাব-বিশেযজ্ঞ। সে জন্যে নেপথ্যে দরাজ হাতে পারিশ্রমিক দিতে দ্বিধা করেন না ভুজঙ্গ চৌধুরী। সেই সব বক্তৃতা ভুজঙ্গের ফোটো বুকে নিয়ে ছাপা হয় কাগজে কাগজে; অবশ্য জায়গার হিসেব ক'রে মোটা বিল আসে চৌধুরী কোম্পানির নামে কাগজগুলোর বিজ্ঞাপন-বিভাগ থেকে।

ফোন ধরেছে ভুজঙ্গের সেক্রেটারি কুমারী সানন্দা সান্যাল। ফোন না ধ'রেই টের পেয়েছে রাহুল; সে এ ধারে দময়ন্তীর কথা শুনতে পাচ্ছে কানে, আর মনে মনে শুনছে ওধারে সানন্দার কথা।

হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।...আজ তো নয়ই, আরও দু-চারদিন হয়তো যেতে পারবেন না।...কাজটা উনি কম্‌প্লিট ক'রেই রেখে এসেছেন ওঁর টেবিলের ওপর একটা ফাইলের ভেতর, আপনি শুধু কাউকে দিয়ে টাইপ করিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টর এলেই তাঁকে দেবেন। আজই। অত্যন্ত জরুরী।...উনি আমাদেরই ভাড়াটে।...না না, সিরিয়াস কিছু নয় ব'লেই তো মনে হচ্ছে।...হ্যাঁ, মিঃ দিবাকর দালালের বাড়ি এটা। আমি তাঁরই মেয়ে দময়ন্তী।...একটা দরখাস্ত পাঠাতে হবে ছুটির জন্যে? অফিসের নিয়ম? হ্যাঁ, তা তো বটেই।...ইত্যাদি।

দময়ন্তী দালালের টুকরো টুকরো টেলিফোনী কথার ফাঁক জুড়ে জুড়ে আস্ত আস্ত মানে বার করছিল রাহুল রায়। জ্বর তার প্রায় এক শো দুই। তাই নিয়েই সে ভাবছিল, দময়ন্তী দালাল যদি দময়ন্তী হ'ল তো দালাল হতে গেল কেন, আর দালালই যদি হ'ল তা হ'লে দময়ন্তী হবার কি দরকার ছিল? দময়ন্তী আর দালাল একসঙ্গে মানায় না, অথচ হে

ভাগ্যবিধাতা, তবু এক করেছ তাদের। এ তোমার বে-আইনী খামখেয়ালী হে বিধাতা।

মনে হ'ল এক-একবার রাহুল চাইছে নিজেই উঠে ফোন ধরতে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ওপারে কুমারী সানন্দা সান্যালকে কল্পনা ক'রেই পশ্চাদ্‌পদ হচ্ছে। ' ভুজঙ্গের সেক্রেটারি সানন্দাকে সে ভয় করে, সমীহ করে মনিবের দক্ষিণহস্ত ব'লে। অফিসের সবাই করে; সবারই ধারণা সানন্দা ইচ্ছেমত ভুজঙ্গকে দিয়ে না-কে হাঁ এবং হাঁ-কে না করিয়ে নিতে পারে, অফিসের বড়বাবুর চাকরিও ইচ্ছে করলে সে খেয়ে দিতে পারে। এই রকমেরই একটা ধারণা রাহুলও যে মনে মনে ধারণা করে না, তা নয়। ইচ্ছে ক'রে কারও চাকরি যাওয়াবে সানন্দা সান্যাল, এ আশঙ্কাও করে না সে। তবে কেন ভয় রাহুলের সানন্দাকে? ভয় এই জন্যে যে, তার বিশ্বাস কাজের শৃঙ্খলায় বা নির্ভুলতায় এতটুকু ত্রুটী ক্ষমা করবে না সানন্দা, তাই সদাই ভয়ে ভয়ে থাকে পাছে কোথাও কোন কাজে হয়ে যায় ভুল আর জবাবদিহি করতে হয় কুমারী সান্যালের কাছে। কোন মেয়ের কাছে জবাবদিহি করার কল্পনায় কবি রাহুলের আপন-ভোলা পৌরুষেও দোলা লাগে। আর অফিসে সে করে প্রধানত ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নিজস্ব কাজ, যার অনেক কিছুই আসলে করার কথা সেক্রেটারি সানন্দা সান্যালের। সানন্দা বয়সে ছোট। অফিসের কাজে অভিজ্ঞতা আর দড়তাও কম রাহুলের চাইতে সানন্দার। তবু যে-মাইনে পকেটে পোরে রাহুল, তার চাইতে বেশি মাইনে যায় সানন্দার ভ্যানিটি ব্যাগে। তা যাক। সানন্দা সেক্রেটারি, আর রাহুল তো মোটে কেরানী। কিন্তু যে কাজটা সম্পূর্ণ ক'রে রেখে এসেছে রাহুল, কি ভাগ্য সেটা শেষ ক'রে আসবার আগেই এই আকস্মিক অসুস্থতাটা আসে নি, সেটা তিনবার আগাগোড়া পুনঃপরীক্ষা ক'রে নিশ্চিত হয়েছে সে, কোন ভুলচুক পাবে না ভুজঙ্গ চৌধুরী বা সানন্দা। শুধু টাইপ করিয়ে রেখে আসতে পারে নি। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা তখন ছিল অজ্ঞাত ভবিষ্যতে, আর ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা নয় রাহুল।

সেক্রেটারিটি একটু অসন্তুষ্ট হয়েছেন।—বললেন দময়ন্তী দালাল,

বলছিলেন, আগে জানানি না দিয়ে এই জরুরী মরশুমে কামাই করলে অফিসের কাজের ধারা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। বললুম, তা হয়তো একটু হয়, কিন্তু অসুখ তো সব সময় আগে জানানি দিয়ে আসে না।

শুধু অসুখ নয়, সুখও অনেক সময় হঠাৎ এসে পড়ে, আগে কোন রকম জানানি না দিয়ে।—ভাবলে আরামশয্যায় শুয়ে সহসা-ব্যারামগ্রস্ত রাহুল রায়। ঘরের দখিন বাতায়ন খোলা, সেই বাতায়ন-পথে ব'য়ে আসছে দখিনের হাওয়া। সেই হাওয়ায় মাঝে মাঝে দুলছে দেয়াল-ক্যালেণ্ডারের পাতলা শেষ পাতা আর রাহুল রায়ের কবিচিত্ত। সহসা তার মনে হ'ল, এ বাড়ি দিবাকর দালালের, যে আরামের বিছানায় সে শুয়ে আছে তার পালঙ্ক থেকে শুরু ক'রে বালিশের খোল আর বিছানার চাদর পর্যন্ত সব কিছুই দিবাকর দালালের সম্পত্তি, হয়তো তার গ্রেট এশিয়াটিক ব্যাঙ্কে লালবাতি-জ্বালানো টাকায় কেনা। একদিন এই বাড়িতে উচ্চ দক্ষিণার বিনিময়েও সেতার বাজাতে আসতে রাজী হয় নি সেতারী-বন্ধু গজেন, আর আজ একটু গা গরম হয়েছে, মাথা ঘুরছে ব'লে এই বাড়ির শুভ্র নরম আরামে বিনা দ্বিধায় নিজেকে এলিয়ে দিয়েছে সে! এর পর গজেনের কাছে সে মুখ দেখাবে কি ক'রে? বললে, ফিরে যাব আমার ঘরে।

দময়ন্তী হেসে বললে—তুলনা নেই সে হাসির—যাবেন তো বটেই। এখন নয়, আজকেও নয় রাহুলবাবু। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে বিশ্রাম করুন। যা ভাববার আমরাই ভাবতে পারব। ভয় নেই আপনার।

কি যাদু তোমার হাসিতে, তোমার মুখের কথায় দময়ন্তী! তুমি যে দালাল—সে কথা বেমালুম ভুলে গেল রাহুল, শুয়ে রইল চুপ ক'রে। হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বাক্স থেকে একটি শিশি বেছে, তাই থেকে একমাত্রা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ তুমি খাইয়ে দিলে রাহুলকে। হোমিও-প্যাথিও জান দেখছি! অতি সহজে সযত্নে তার ললাটে পরালে ও-ডি-কলোনের পটি, স্নিগ্ধ শীতল সুরভিত পটির মৃদু পরশ বুলিয়ে দিলে তার দুটি উষ্ণ চোখে। আজকের ছুটির জন্যে এবং আগামী অনির্দিষ্ট কয়েক দিনের ছুটির প্রয়োজনীয়তার আভাস জানিয়ে চৌধুরী কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে লক্ষ্য ক'রে দরখাস্ত লিখলে, রাহুল রায়ের নামে

আপন হাতে, হাতের লেখার অমন অপরূপ লাবণ্য তো আর কখনও দেখি নি দময়ন্তী! শুধু রাহুলকে দিয়ে সই করিয়ে নিলে দরখাস্তের শেষে। তারপর সাদা খামের বুকে কালো ঠিকানা লিখে স্ট্যাম্প লাগিয়ে কানাইকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলে ডাকে (তোমার হাতে-লেখা, রাহুলের সই করা ওই দরখাস্ত পড়বে গিয়ে সানন্দা সান্যালেরই হাতে, ফোনে যাকে শুনিয়েছিলে তোমার কণ্ঠ।) অথচ কত সহজে! চেষ্টার কোন চিহ্ন নেই তোমার মুখে, তাড়াহুড়ো নেই এক ফোঁটা, অথচ কত তাড়াতাড়ি! দেখলেম রাহুল পরম স্বস্তি বোধ করেছে, সে কি মহামতি হানিম্যানের কৃপায়, না, তোমার মায়ামন্ত্রে দময়ন্তী? থার্মোমিটার না লাগিয়েও বুঝতে পারছি, নেমে গেছে ওর গায়ের টেম্পারেচার। জানি নে ওর মনের টেম্পারেচারের কথা।

অ্যামেচার হোমিওপ্যাথ দময়ন্তী দালাল তার সদ্য-দেওয়া দাওয়াইয়ের ফলাফল এবং নতুন দাওয়াই দেবার জন্যে লক্ষণাবলী নিরীক্ষণে ব্যস্ত বোধ হ'ল। কবি রাহুলকে সে চেনে কি না জানি নে এখনও, কেরানী রাহুলকে একটু আগে অন্তত চিনেছে, এবারে ব্যস্ত 'পেশেণ্ট' রাহুলকে নিয়ে। দেখি, হোমিওপ্যাথিক ওষুধের কাঠের স্যুটকেস-আয়তনী বাক্সের ওপর থেকে একখানা অক্সফোর্ড-পকেট-ডিক্‌শনারি-সদৃশী কিতাব অবলীলাক্রমে তুলে নিয়ে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে তার দু-চার পাতার ওপর, মেটিরিয়া-মেডিকাখানা একবার ঝাঁ ক'রে ঝালিয়ে নিচ্ছে বোধ হয়।

এই সময় দখিন বাতায়নের পাশে একবার গিয়ে একটু দাঁড়িয়েছি, অমনি অযাচিতভাবে এসে বারান্দায় ডেকে নিয়ে গেলেন দময়ন্তীর মা শ্রীযুক্তা সৌদামিনী দালাল।

একবারটি শুনে যাও তো বাবা ধনপতি।

কি ক'রে জানলেন আমার নাম, আর কেন অতখানি মধু ঝরালেন ডাকে তা জানি নে (অথবা হয়তো এখন জানি)। গেলেম বারান্দায়। দেখলেম অচেনাকেও পরম চেনা ব'লে ভেবে নেবার ভঙ্গী আছে সৌদামিনী দেবীর। বললেন, কাজটা কি ভাল হয়েছে বাবা ধনপতি?

শুধালেম, কোন্ কাজটার কথা আপনি বলছেন মাসীমা?

মার একাধিক বোন আছেন। বাড়িয়ে নিলেম আর একটি।

এই যে এমন হুট ক'রে নিয়ে আসা হ'ল ছেলেটিকে।—বললেন সৌদামিনী দালাল, যার কাজ তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে—এ কথাটা তো মান বাবা? ডোবার ধারের গাছকে তুলে এনে রূপোর টবে বসিয়ে দিলে তার ফল কি ভাল হয়? ভগবান না করুন, একটা ভালমন্দ যদি হয়ে যায় তো জবাবদিহি করবে কে?

উপন্যাসের গিন্নীর মত ভাষায় কথা কইছেন সৌদামিনী মাসী আমার, দিবাকর-গিন্নীর মত তো নয়। এই নকড়ি নস্কর রোডের মোড়েরই নিস্তারিণী-স্মৃতি-পাঠাগার থেকে আনিয়ে আনিয়ে পাসের-পড়া-মুখস্থ-করা ছাত্রীর মত গোগ্রাসে তিনি উপন্যাস গেলেন জানি নিয়মিতভাবে; অতি-আধুনিক প্রেমিক-প্রেমিকাদের প্রেমের বহু বিচিত্র পথ-ঘাটের অনেক পরিচয় পেয়েছেন অনেক উপন্যাসে। নায়ক-নায়িকা আর তাদের বাপ-মার অনেক কথা আর কথা কইবার ভঙ্গী জমা হয়ে গেছে তাঁর মনের ক্যাটালগে।

আমি বললেম, জবাবদিহি যাতে করবার দরকারই না হয় তাই তো করছেন মিস দালাল। ভয়ের তো কোন কারণ দেখছি নে মাসী।

সৌদামিনী-মাসী বললেন, তুমি কদ্দিন ধ'রে জান এই ভাড়াটেকে?

রাহুল রায়কে? অল্প কয়েক দিন মাত্র।—বললেম আমি, কিন্তু তাই যথেষ্ট। নিঃসন্দেহে জেনেছি, ও সত্যিকারের কবি, কবিতার মধ্য দিয়েই অনাগত যুগকে আগত ক'রে তবে ছাড়বে। কর্ম-জীবনে সে সামান্য মাইনের তুচ্ছ কেরানী, কিন্তু মনোজগতে—

আর বলা গেল না বা দরকার হ'ল না। রাহুল রায় কবি শুনেই একটা অস্ফুট আর্তনাদ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল সৌদামিনী দেবীর মুখে। হয়তো তিনি নিস্তারিণী-পাঠাগার থেকে ধার-ক'রে-আনা কোন উপন্যাসে প'ড়ে থাকবেন গরিব তরুণ কবি আর ধনীর দুলালী নায়িকার সহ-পলায়ন ও তৎপর বিবাহ-বন্ধনের করুণ কাহিনী, তাই ভয় পাচ্ছেন, কেরানী কবি রাহুলের সঙ্গে সেই জাতেরই কিছু একটা কাণ্ড ক'রে বসবে হয়তো কুমারী দময়ন্তী দালাল।

আমি সোজাসুজি না ব'লেও সহজভাবেই প্রকারান্তরে বুঝিয়ে

দিলেম, সে রকম কোন আশঙ্কাকে তাঁর মনে ঠাঁই দেওয়া হবে মৃত্যু চৌবাচ্চার জলে ডুবুরী নামানোর মত। ওঁর মাতৃহৃদয়ে আশঙ্কার যে দমকা হাওয়া ধমক লাগাচ্ছে সে আশঙ্কা মিথ্যে, সে আশঙ্কা ফাঁকি। রাহুল রোমান্টিক দময়ন্তীর হিরো নয়, হোমিওপ্যাথ (অ্যাঃ) দময়ন্তীর পেশেণ্ট মাত্র, রাহুলের জ্বর ছেড়ে গেলে দময়ন্তীর মাথা-ঘামানোও সেই সঙ্গে ছেড়ে যাবে।

রাহুর আত্মীয়স্বজনকে বরং একটা খবর দিলে হ'ত না?—বললেন সৌদামিনী-মাসী, ব্যামোর কথা তো কিছু বলা যায় না বাবা। সে যে কোন্ রাস্তা নেবে!

আত্মীয়স্বজন এ শহরে কেউ থাকলে কি আর বেচারী গ্যারেজের ওপর এসে এভাবে মাথা গুঁজে থাকত মাসীমা?—বললেম আমি, তা ছাড়া ওর নাম রাহু নয় মাসীমা—রাহুল।

তাই বুঝি? —বললেন সৌদামিনী দালাল। হয়তো তাঁর মন বলছিল, রাহু এসেছে তাঁর দময়ন্তী-চাঁদকে গ্রাস করতে।

তোমার মধ্যে রাহুও আছে, হুলও আছে—এটা হয়তো তুমি খেয়াল কর না রাহুল। সে রাহু ধীরে ধীরে গ্রাস করে তোমার অলক্ষ্যে, সে হুলও তোমার অজানিতেই ফোটে। তুমি অফিসে আপন-ভোলা কেরানী, নিখুঁতভাবে কেরানীগিরি ক'রে যাও; ওই রুটিন-বাঁধা কাজের মধ্যেই তুমি খুঁজে পেয়েছ সুর আর ছন্দের আনন্দ। সানন্দা সান্যাল মাঝে মাঝে তোমায় যখন কাজের অজুহাতে ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভুজঙ্গের কামরায় ডাকিয়ে পাঠায়, তখন তুমি তাই কাজটুকুই বোঝ— অজুহাতটুকু বুঝতে পার না। আর কেরানীদের টেবিল ঘুরে ঘুরে কাজ দেখার ছলে সানন্দা যখন তোমার টেবিলে এসে দাঁড়িয়ে তোমার ফাইল দেখার ছল করে মাঝে মাঝে, তুমি সমীহ ক'রে দাঁড়াও তার পাশে, পরম নিষ্ঠায় দিতে থাক তার নরম প্রশ্নের জবাব, বুঝতেও পার না—সানন্দার দুটি চোখ ছলছল ক'রে উঠছে তার ছলের ছলত্বটুকু তুমি বুঝতে পারছ না ব'লে। আর অফিসের বাইরে এসে তুমি কবি রাহুল রায়, ভুলে যাও অফিসের কথা, তাই ভুলে থাক সানন্দা সান্যালকেও—

ম্যানেজিং ডিরেক্টরের প্রাইভেট সেক্রেটারি ছাড়া যার অন্য কোন রূপ চিন্তায় আসে না তোমার।

গায়ের গরমটা একটু কমলে ওকে ওর ঘরেই নিয়ে যাও বাবা ধনপতি।—বললেন সৌদামিনী দালাল, অসুস্থ শরীরে ঘর বদলানো কোন কাজের কথা নয় বাবা। এই আমার কথাই ধর না, কিংবা কর্তার কথা, ঘর বদলে নতুন ঘরে এক রাত্তির ঘুমুতে দাও দিকি, দেখবে সারা রাত ছট্‌ফট করব বিছানায়, দু চোখের পাতা এক করতে পারব না। তার ওপর রুগী হ'লে তো কথাই নেই। আপন ঘর না হ'লে বাছা ঘুমুতে পারবে না, ব্যামো বেড়ে যাবে। ওর ঘরেই নিয়ে যাও বাবা, আমি কানাইকে বরং ব'লে দেব মাঝে মাঝে গিয়ে দেখেশুনে আসবে 'খন।

বললেম, সব ঠিক হয়ে যাবে। কিচ্ছু ভাববেন না আপনি।

হ্যাঁ বাবা, কিচ্ছু যেন ভাবতে না হয়। বোঝ তো সব।—ব'লে সৌদামিনী দেবী চ'লে গেলেন। মনে হ'ল সত্যি সত্যিই টেম্পারেচার উঠেছে কিনা রাহুলের, সে বিষয়ে পুরোপুরি নিঃসংশয় হতে পারছেন না তিনি, কিন্তু সন্দেহভঞ্জনের প্রয়াসিনী হতে ভরসা পাচ্ছেন না মনে।

ওদিকে ভুজঙ্গ চৌধুরী হয়তো এতক্ষণে অফিসে ফিরে এসেছেন। মস্ত মীটিং মাৎ ক'রে এসেছেন, ললাটের অনাগত ঘাম ডান হাতের তর্জনী বাঁকিয়ে টেনে সাফ করার ভঙ্গী ক'রে আপন চেয়ারে ব'সে বিশ্রাম ক'রে নিলেন দু-চার মিনিট। টেবিলের ওপর সামনে এন্‌গেজমেণ্ট প্যাডের সাদা বুকে সবুজ কালির লেখার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, রাহুলকে একবার ডেকে পাঠান তো মিস সান্যাল। এক্ষুনি। আর্জেণ্ট ফাইলটা নিয়ে আসতে বলবেন।

রাহুলবাবু আজ আসবেন না অফিসে।—নির্লিপ্ত স্বরে বললে সানন্দা, বোধ করি দু-চার দিন আসবেন না। তার কানের পাশে গুঞ্জরিত হচ্ছিল ফোনে-শোনা দময়ন্তী-কণ্ঠের স্মৃতির রেশগুলো।

হোয়াট্? হোয়াট্? হোয়াট্?—বললেন ভুজঙ্গ চৌধুরী। চটলে মাঝে মাঝে তিনি ইংরেজী কথা ব্যবহার ক'রে ফেলেন কথার মাঝে

মাঝে, শুরুতে বা শেষে।—কিন্তু রাহুল না এলে তো চলবে না সানন্দা, মানে মিস সান্যাল।

না ·এলেও চলবে মিস্টার চৌধুরী।—বললেন মিস সান্যাল। কণ্ঠস্বরে তার তরঙ্গহীন প্রশান্ত সাগরের গভীর গাম্ভীর্য। স্তম্ভিত ভুজঙ্গ চৌধুরী রাগে ফেটে পড়বেন কি না, এবং রাগে ফেটে না পড়লে তাঁর ম্যানেজিং ডিরেক্টরী 'প্রেস্‌টিজ' বজায় থাকবে কি না—গবেষণা করছেন, এমন সময় সানন্দা তাঁর সামনে টেবিলের ওপর পেশ করলে তিন পাতা টাইপ-করা কাগজ, কার্বন কপি সহ। বললে, এই নিন। সমস্ত আবার মিলিয়ে দেখে নিয়েছি, আপনি একবার দেখে সই দিলেই আজকের ডাকে পাঠিয়ে দিতে পারি।

দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন ভুজঙ্গ চৌধুরী। রাহুল আসে নি (ইত্যাদি) শুনে যতখানি ভয়ানক রকম চিন্তিত হয়েছিলেন, ততোধিক স্বস্তিবোধক নিশ্বাস ত্যাগ করলেন এবারে। রাহুলের অনুপস্থিতিতেও আশ্চর্য 'ম্যানেজ' ক'রে নিয়েছে সানন্দা। নাঃ, মেয়েটাকে যত বেয়াড়া ব'লে মনে করা গিয়েছিল ততটা নয়। আসলে ভেতরটা ওর নিশ্চয় নরম, বাইরে যত কড়া ভেতরে তত মিঠে। কিন্তু রাহুলের ব্যাপারটা কি? সানন্দা জানেই বা কি ক'রে যে, সে আজ তো আসবেই না, দু-চার দিন নাও আসতে পারে? তবে কি—? তবে কি—?

চ্যালেঞ্জ ক'রে কোণঠাসা করবার ভঙ্গীতে ভুজঙ্গ চৌধুরী বললেন, কিন্তু আজ যে আসবে না রাহুল আর দু-চার দিনও হয়তো আসবে না—এটা কি ক'রে জানা গেল মিস সান্যাল?

ফোন এসেছিল ওঁর বাড়ি থেকে।

রাহুল বাড়িতে ফোনও নিয়েছে নাকি আজকাল?

ওঁর বাড়িওয়ালা দিবাকর দালালের ফোন।

বাই জোভ!—বললেন ভুজঙ্গ চৌধুরী। এই ধরনের ইংরেজী চিৎকার মক্‌সো করছেন তিনি আজকাল। ৫৫৫-ক্লাবের সান্ধ্য ও নৈশ মিলন-বাসরগুলোতে বিশেষ কাজে লাগে, ককটেল্‌ পার্টি তো এ না হ'লে একেবারে নিরামিষ হয়ে যায়। ভুজঙ্গ বললেন, বাই জোভ! রাহুলের

বাড়িওয়ালা দিবাকর দালাল ? স্বর্গীয় গ্রেট এশিয়াটিক ব্যাঙ্কের বহাল-ভবিষ্যৎ গ্রেট দিবাকর দালাল ? চমৎকার !

কিন্তু তুমি তো জান না ভুজঙ্গ, রাহুলের টেলিফোন-সেক্রেটারির কাজ করেছে গ্রেট দিবাকরের কন্যা দময়ন্তী দালাল। আর তারই জ্বালার আগুন জ্বলছে সানন্দার চিত্ত-গহনে। সে আগুনের উত্তাল তরঙ্গের দল দময়ন্তী-পাষাণে ব্যর্থ আছাড় খেয়ে দ্বিগুণিত আক্রোশে ঠিকরে পড়ছে রাহুল রায়ের ওপর। অথচ রাহুল জানে না। জানে না রাহুল ! কিছুদিন ধ'রেই সন্দেহ করছে সানন্দা যে, ভুজঙ্গ সন্দেহ করছে সানন্দার অত্যধিক রাহুল-মত্ততা।

আজ উনি আসবেন না যখন, তখন কালই অফিসে ব'লে যাওয়া উচিত ছিল।—বললে সানন্দা, বছরের সবচেয়ে বেশি জম্‌জমাট কাজের মরশুম, এখন আচমকা এ ভাবে কামাই করা, একে আমি চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ব'লেই মনে করি করি মিস্টার চৌধুরী। এফিশিয়েন্‌সি যতই থাক্ অথবা যতই না-থাক্, অফিসের ডিসিপ্লিন মানতেই হবে প্রত্যেককে।

তা হ'লে একটা কড়া ব্যবস্থার ব্যবস্থা করতে হয় রাহুল সম্পর্কে, যাকে বলে ডিসিপ্লিনারি অ্যাক্‌শন্। কি বলেন মিস সান্যাল ?—তির্যক দৃষ্টিতে সানন্দার দিকে তাকিয়ে বললেন ভুজঙ্গ চৌধুরী। কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্যের যে ভান, তাকে ভান ব'লে বুঝতে বেগ পেতে হয় না, বেগ পেল না সানন্দা সান্যাল। মুখ লাল হয়ে উঠল সানন্দার। রাহুল সম্পর্কে তার মুখের কথাকে মনের কথা ব'লে বিশ্বাস করেনি ভুজঙ্গ চৌধুরী।

আমার চোখে অমন অবলীলায় ধুলো দেবে তুমি সানন্দা ? তোমার মত অনেক অনে--ক মেয়ে চরিয়েছে ভুজঙ্গ।—ভুজঙ্গ চৌধুরী বলছে ব'লে মনে হ'ল সানন্দার।

বললেন ভুজঙ্গ চৌধুরী, যা হোক, এই আর্জেন্ট কাজটা যে কম্‌প্লিট ক'রে ফেলেছেন মিস সান্যাল, আমাকে বাঁচিয়েছেন আপনি। সই ক'রে দিলুম। আজকের ডাকেই এখ্‌খুনি পাঠিয়ে দিন। এর পর দু-চার দিন রাহুল না এলেও খুব বেশি কিছু যাবে-আসবে না। কিছুদিন

ভারি চাপও গেছে ছোকরার ওপর। তা হ'লে দিবাকর দালালের বাড়িতেই রাহুল এখন আছে?

বোধ হয় তাই মিস্টার চৌধুরী।—বললে সানন্দা সান্যাল, ফোন ওইখান থেকেই এসেছিল। বললে না, ফোনটা করেছিল কে।

দূর থেকেই আঁচ পাচ্ছিলাম সানন্দা সান্যালের দুর্দম রাগের। যেন সানন্দাকে আগে নোটিশ না দিয়ে এ ভাবে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়াটা রাহুলের বিরাট অপরাধ, তার চেয়ে বিরাট অপরাধ দময়ন্তীর আওতায় গিয়ে পড়া। ফোনটা তো রাহুল নিজে করলেও পারত সানন্দাকে, তা না ক'রে করালে দময়ন্তীকে দিয়ে। নিজের হাতে চাঁটি না মেরে এ যেন দময়ন্তীর হাত দিয়ে চাঁটি মারানো সানন্দার গালে। অর্থাৎ রাহুল-চাঁদের পানে আর মিছে হাত বাড়িয়ে মর কেন গো বামন-সানন্দা? তোমার সে গুড়ে বালি। ঘাঁটি যেখানে আগলে ব'সে আছে দময়ন্তী দালাল—বড়লোকের মেয়ে, সেখানে তুমি নাক গলিয়ে কি করবে গরিবের মেয়ে সানন্দা? দলিতা ফণিনীর মত মনে মনে ফুঁসে উঠল সানন্দা, এ অবহেলার অসম্মান সহ্য করবে না সে। বেশ, তবে তাই হোক রাহুল। তোমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে সানন্দা। (অথচ এ সবের কিছুই জানে না, কিছুই জানে না রাহুল! হায় রাহুল!) আগে একবার দেখে নিতে হবে এই দময়ন্তীকে, জেনে নিতে হবে—দময়ন্তী-আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে রাহুল, না, রাহুল-অগ্নিতে ঝাঁপ দিচ্ছে দময়ন্তী-পতঙ্গ? সোজা কথায়, কে বাগাচ্ছে আর কে বাগছে!

এ দিকে সৌদামিনী-ভবনের গেটের বাইরে এসে দাঁড়াল অস্টিন গাড়ি। ফিরেছেন দিবাকর দালাল, সঙ্গে দালাল অতুল চম্পটী। বললেন দিবাকর দালাল, তুমি বৈঠকখানায় একটু ব'স হে চম্পটী। স্নানাহারটা চট ক'রে সেরে আসছি আমি। তারপর কথা হবে। গাড়িটা গ্যারাজে তুলে তুমি যেতে পার গণেশ। আজ বোধ হয় আর বেরুব না। অবশ্য বেরুতেও পারি। তুমি বরং বিকেলে একবার এসো। দেখো, তোমায় ডেকে আনবার জন্যে যেন আবার লোক পাঠাতে না হয়। তোমরা তো যা সব হয়েছ আজকাল!

গাড়ি উঠল গ্যারেজে, অতুল চম্পটী বসল বৈঠকখানায়, দিবাকর দালাল এলেন ভেতরে।

দ্রুতবেগে এগিয়ে গেলেন সৌদামিনী দালাল—অবশ্য তাঁর পক্ষে যতখানি দ্রুত এগিয়ে যাওয়া সম্ভব—গিয়ে প্রথম কথা বললেন, মেয়ে তো এক কাণ্ড বাধিয়ে ব'সে আছে।

ভয়ানক কিছু একটা আশঙ্কা ক'রে দিবাকর দালাল বললেন, কোথাও মোটা চাঁদার খাতায় সই দিয়ে বসেছে বুঝি ?

বললেন সৌদামিনী, গ্যারেজের ওপরকার ঘরের ভাড়াটে যে ছোকরা—ওকে নিয়ে এসেছে বাড়িতে।

নিয়ে এসেছে ? মানে, নিজে আসে নি সে ?—প্রশ্ন করলেন দিবাকর দালাল।

বললেন সৌদামিনী দালাল, কানাই তো একরকম কাঁধে তুলে নিয়ে এল দেখলুম। দক্ষিণের ঘরের বিছানায় এনে শুইয়ে রেখেছে।

বল কি সদু ? কি হয়েছে ছোকরার ?

তা তোমার হোমিওপ্যাথ মেয়েকে জিজ্ঞাসা করগে আর ধনপতিকে।

সে আবার কে ?

ওই ভাড়াটে ছোকরার দুদিনের বন্ধু। তাকেও ওই ঘরেই পাবে। আমার কিন্তু ভাল লাগছে না এ সব। তুমি ওকে ওর ঘরেই পাঠিয়ে দাও। ভাড়াটের গা গরম হ'লে তাকে নিয়ে বাড়িঅলার বাড়িসুদ্ধ হৈ-হৈ রৈ-রৈ হবে, এ তো বাপু আমি ভাল বুঝি নে।

দেখেই আসি একবার।—বললেন দিবাকর দালাল। তারপর আমাদের ঘরে দিকে আগুয়ান তাঁর পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। অস্ফুটস্বরে দময়ন্তী বললে, বাবা আসছেন বোধ হয়। আমাকে বা আমাদের সাবধান করবার জন্যে কিনা বুঝলাম না, কিন্তু দেখলাম খোলা চোখ বন্ধ ক'রে ঘোর তন্দ্রার ভান শুরু ক'রে দিল রাহুল। ভাড়া দিতে সে আসে দিবাকর দালালের কাছে বৈঠকখানায় মাসে একবার, তখন যত তাড়াতাড়ি পারে কাজ সেরে চ'লে যায়, তাকায় না দিবাকরের মুখের দিকে। এখন তারই অন্দরে শয়ান অতিথি অবস্থায় চোখাচোখি

হয়ে যাওয়া সইতে পারবে না রাহুল। দেহে ক্ষমতা থাকলে হয়তো এখনই উঠে পালাত সে তার আপন ঘরে।

ওকে বুঝি নিয়ে এসেছিস দময়ন্তী ?—এসে বললেন দিবাকর দালাল, কি হয়েছিল মা ? উত্তেজনার চিহ্ন পড়ে নি তাঁর কণ্ঠের স্বরে ; কৌতূহল শুধু প্রশ্নই করাতে পারে, উত্তেজিত করতে পারে না।

একা ওঁর ঘরে বেহুঁশ হয়ে প'ড়ে ছিলেন বাবা। এই ধনপতিবাবুর কাছে খবর পেয়ে নিয়ে এসেছি। কেউ খবর না পেলে একা একা ওই ঘরে ওঁর কি অবস্থাটা হ'ত বল তো ?—অবস্থাটা কি হতে পারত সেই ভাবনায় ভারাক্রান্ত দময়ন্তীর কণ্ঠ।

এ রকম একদিন যে হবেই, এ আমি আগেই জানতুম মা। যে দিন থেকে জানি ও ভুজঙ্গ চৌধুরীর কাছে কেরানীগিরি করে, সে দিন থেকেই জানি। লাখো লাখো টাকার গদি-বিছানা পেতে তার ওপর ভূতের নৃত্য নাচছে ভুজঙ্গ, তার খামখেয়ালের আগুনে জ্বালাচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে চেক আর কারেন্সী নোট ; কিন্তু যে মাইনে দিচ্ছে তার অফিসের কেরানীদের তাতে এই দুর্ভাগাদের দেহে কোত্থেকে থাকবে এক ফোঁটা ক্যালসিয়াম ভিটামিন ? এরা বেহুঁশ হবে না তো হবে কে ? এদের হুঁশ যে আদৌ কি ক'রে থাকে, সেইটেই তো আশ্চর্য ! ভিটামিন আর ক্যালসিয়ামের অভাবে এদের প্রাণশক্তি যায় ক্ষীণ হয়ে, খেয়ে ভাল ক'রে হজমও করতে পারে না। কিন্তু দে দিকি আমায় এক প্লেট পাথর—দেখবি এই ষাট-পার বয়সেও চিবিয়ে হজম ক'রে দেব।

দময়ন্তীর ঠোঁটে-তর্জনী-ঠেকানো-ইশারায় থমকে দিবাকর দালাল বললেন, তা হ'লে বরং আমাদের হেমন্ত-ডাক্তারকে একবার—

এ কেসে হেমন্তর দরকার নেই, দময়ন্তী-ডাক্তারই যথেষ্ট বাবা।—হেসে বললে দময়ন্তী দালাল, সোজা ইনফ্লুয়েন্‌জা ওষুধ দিয়েছি। দু-তিন দিনের বিশ্রামেই সেরে উঠবেন। উনি অবশ্য এখুনি চ'লে যেতে চেয়েছিলেন ওঁর ঘরে। কিন্তু চাইলেই তো আর যেতে দিতে পারি নে !

পাগল, না, ক্ষ্যাপা ?—বললেন দিবাকর দালাল, সেরে না ওঠা পর্যন্ত এইখানেই থাকবে। তার আগে ওর যাওয়া হতেই পারে না।

দেখলুম, আড়াল থেকে সে কথা শুনে খুশি হলেন না, হতাশ হলেন দময়ন্তীর মা সৌদামিনী দালাল। দময়ন্তী শুধু তাঁর একমাত্র মেয়েই নয়, একমাত্র সন্তানও বটে। অনেক সোনালী ভবিষ্যৎ তিনি মনের পাতায় এঁকেছিলেন দময়ন্তীকে কেন্দ্র ক'রে। তার শাখায় প্রশাখায় ঝাপসা ভাবে ছড়িয়ে ছিল অনেক বিলেত-ফেরত, বড়লোকের ছেলে, মোটা মাইনের চাকুরে, আই-এ-এস, আই-পি-এস, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়র, জজ, ম্যাজিস্ট্রেটের শোভাযাত্রা। আজ তাঁর মনে হ'ল, সে সব স্বপ্ন শুধু তাসের ঘর; একটা দমকা ঝড় এসে এই ঘরকে তচনচ ক'রে দিয়ে যাবে, তারই পূর্বাভাস রাহুল রায়ের এই ইন্‌ফ্লুয়েন্‌জা।

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

ভারতবর্ষের সার্বজনীন ভাষা

এক

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করার পর ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্য হইতে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষারূপে নির্বাচিত করা হইয়াছে। দেশ স্বাধীন না হইতে রাষ্ট্রভাষা বা State language-এর প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু কোন দেশে নানা ভাষা প্রচলিত থাকিলে পরাধীন অবস্থায়ও সেই দেশে নিজস্ব ভাষাগুলির মধ্যে একটিকে সার্বজনীন ভাষা বা Lingua franca-রূপে বাছিয়া লওয়ার প্রশ্ন উঠিয়া থাকে। কেন না, ওইরূপ ক্ষেত্রে সার্বজনীন ভাষা বাছিয়া লইয়া উহার ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা না করিলে জাতীয় ঐক্য সাধিত হইতে পারে না; এবং জাতি একতাবদ্ধ না হইলে জাতীয় প্রগতি বিলম্বিত হইয়া যায়। বিশেষত পরাধীন জাতির মধ্যে স্বাজাতিকতা-বোধ জাগাইতে হইলে দেশীয় ভাষার মাধ্যমেই তাহা সহজসাধ্য হয়।

আধুনিক কালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পূর্বে গান্ধীজী বিদেশী ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে স্বদেশীয় কোন একটি ভাষাকে সার্বজনীন অর্থাৎ Lingua franca-রূপে গ্রহণ করার আবশ্যকতা অনুভব করেন। হিন্দী ও উর্দুর সংমিশ্রণে হিন্দুস্থানী নামে তিনি একটি নূতন ভাষা

সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন। ভারত-ব্যবচ্ছেদের পর তাঁহার প্রস্তাবিত হিন্দুস্থানীকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়; এবং তৎপরিবর্তে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান করা হয়। হিন্দীকে ভারতের সার্বজনীন ভাষারূপে গ্রহণ ও প্রচলনের চিন্তা গান্ধীজীর প্রচেষ্টারও অনেক পূর্বে বাঙালীর মস্তিষ্কেই সর্বপ্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতকের অষ্টম ও নবম দশকে বাংলা দেশের তিন জন বরেণ্য দেশভক্ত মনীষী বিদেশী ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে কোন একটি ভারতীয় ভাষাকে সার্বজনীন ভাষারূপে নির্বাচন ও প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন; এবং তাঁহারা নানা দিক বিবেচনা করিয়া হিন্দীকে সেই মর্যাদা দানের পক্ষপাতী ছিলেন। এই মনীষীত্রয় হইলেন—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়। ইঁহাদের মধ্যে কেহই রাজনীতিক নেতা নহেন, প্রথম জন ধর্ম-প্রচারক ও সামজ-সংস্কারক এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় জন শিক্ষাব্রতী। কেশবচন্দ্র তাঁহার সম্পাদিত 'সুলভ সমাচার' নামক সংবাদপত্রের ১২৮০ সালের (১৮৭৪ খ্রীঃ) ৫ই চৈত্রের সংখ্যায় "ভারতবাসীদিগের মধ্যে একতা লাভের উপায় কি?" শীর্ষক একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেন। তাহা হইতে নিম্নে উদ্ধৃতি দিতেছি:—

"যত দিন সমস্ত ভারতবর্ষে এক ভাষা না হইবে তত দিন কিছুতেই একতা সম্পন্ন হইবে না। যত দিন আর্যদিগের একমাত্র সংস্কৃত ভাষা মাতৃভাষা ছিল তত দিন অনৈক্য উপস্থিত হয় নাই। কালের গতিতে আর্যগণ কৃষ্ণত্বক শূদ্রদিগের সহিত অর্থাৎ আদিম ভারতবাসীদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া বর্ণসঙ্কর হইলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সুতরাং সমস্ত ভারতবর্ষেই আর্যগণ বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িলেন। আর্যদিগের ভাষা এবং আদিমবাসীদিগের ভাষা মিলিত হইয়া বিকৃত ভাষা প্রস্তুত হইতে লাগিল। এজন্য সমস্ত ভাষার মধ্যে সংস্কৃতের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই এক ভাষা হইতেই প্রথমে দলভেদের উৎপত্তি হইয়াছে। তাঁহারা আপনাদিগের ভাষাকে উৎকৃষ্ট মনে করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহাদের ভাষা নিকৃষ্ট সেই সকল লোকদিগকে তাঁহারা

নিকৃষ্ট মনে করিয়া থাকেন। এক ভারতবর্ষের মধ্যে অনেকগুলি ভাষা প্রচলিত। তন্মধ্যে বাঙ্গালা, হিন্দী, উর্দু, উৎকল, পাঞ্জাবী, দ্রাবিড়ী, কর্ণাটী, মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গী প্রধানতঃ এই কয়েকটি ভাষা প্রচলিত। সংস্কৃত প্রচলিত ভাষা নহে, সংস্কৃত ভাষা এক্ষণে মৃতভাষা, যে কয়েকটি প্রচলিত ভাষা আছে তাহার এক একটি ভাষা এক একটি প্রদেশে প্রচলিত। কোন কোন স্থানে এক প্রদেশে দুই ভাষা, কোন কোন স্থানে দুই প্রদেশে এক ভাষা প্রচলিত, যে প্রদেশের সহিত যে প্রদেশের ভাষা ভিন্ন সেই প্রদেশের সহিত সেই প্রদেশের মিল নাই। কেহ আপনার ভাষাকে উত্তম মনে করিয়া অন্যের ভাষাকে নিন্দা করিতেছেন। ইহা হইতেই বিষ উৎপত্তি হইয়াছে। কেবল ভিন্ন ভাষাকে নিন্দা করা হয় তাহা নহে, এক ভাষার মধ্যে উচ্চারণের তারতম্য অনুসারে প্রশংসা নিন্দা হইয়া থাকে। এক বাঙ্গালা ভাষাই তাহার প্রমাণ।···

"যদি ভাষা এক না হইলে ভারতবর্ষে একতা না হয় তবে তাহার উপায় কি? সমস্ত ভারতবর্ষে এক ভাষা ব্যবহার করাই উপায়। এখন যতগুলি ভাষা ভারতে প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে হিন্দী ভাষা প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত। এই হিন্দী ভাষাকে যদি ভারতবর্ষের একমাত্র ভাষা করা যায়, তবে অনায়াসে শীঘ্র সম্পন্ন হইতে পারে।··" (যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত-সম্পাদিত 'কেশবচন্দ্র ও রাষ্ট্রবাণী' হইতে উদ্ধৃত)

দুই

ভূদেব মুখোপাধ্যায় বাংলা গদ্য-সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক। তাঁহার রচিত বহু গ্রন্থ বঙ্গ-সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। তিনি স্বধর্মনিষ্ঠ, স্বদেশভক্ত, সমাজ-হিতৈষী এবং শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক বলিয়া বাঙালী জাতির নিকট স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। হিন্দীকে ভারতের সার্বজনীন ভাষারূপে নির্বাচন করার অনুকূলে তিনি স্বাধীনতা-লাভের প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে যে সুযুক্তিপূর্ণ ও সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"ভারতবাসীর চলিত ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দি-হিন্দুস্থানীই প্রধান

এবং মুসলমানদিগের কল্যাণে উহা সমস্ত মহাদেশব্যাপক। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, উহাকে অবলম্বন করিয়াই কোন দূরবর্তী ভবিষ্যকালে সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষা সম্মিলিত থাকিবে।...

"স্বদেশীয় লোকের প্রতি সর্বদা সমাদর প্রদর্শন করিতে হয়। বাঙ্গালীর পক্ষে বাঙ্গালী অথবা ভারতবর্ষের অপর কোন প্রদেশবাসী বিশিষ্টরূপেই প্রেমের পাত্র। আমরা এক পুণ্যভূমিতে জাত এবং পালিত, এবং আমাদের অন্তঃকরণের গঠন পরস্পর অভিন্ন, এই ভাবটি মনে জাগরূক রাখিতে হয়। ভারতবর্ষের অধিক লোকেই হিন্দি ভাষায় কথোপকথন করিতে সমর্থ। অতএব শুদ্ধ ভারতবাসীর বৈঠকে ইংরাজীর ব্যবহার না করিয়া হিন্দিতে কথোপকথন করাই ভাল।...

"ভারতবর্ষের সকল প্রদেশবাসী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বণিক প্রভৃতির মধ্যে প্রদেশনির্বিশেষে আপনাপন বর্ণমধ্যে বিবাহ চলিলে ভারতসমাজ দৃঢ়সম্বদ্ধ এবং হিন্দি ভাষা অধিকতর প্রচলিত হইয়া উঠে—এরূপ সংস্কার প্রার্থনীয়।"

এই উদ্ধৃতি প্রদত্ত হইল ভূদেবের 'সামাজিক প্রবন্ধ' নামক গ্রন্থ হইতে। গ্রন্থের প্রবন্ধাবলী রচিত হইয়াছে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এবং ওইগুলি গ্রথিত হইয়া প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে।

এই সম্পর্কে ভূদেববাবুর উল্লেখযোগ্য কার্য বিহারের আদালতগুলিতে উর্দুর পরিবর্তে হিন্দীর প্রচলন। তিনি বাংলা সরকারের শিক্ষা-বিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎকালে বাংলা, বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা লইয়া একটি প্রদেশ গঠিত ছিল এবং উহার শাসনভার ন্যস্ত ছিল একজন ছোটলাটের উপরে। ভূদেববাবু বিদ্যালয়-পরিদর্শকরূপে বিহার সার্কেলের ভারপ্রাপ্ত হইলেন ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। বিহারের অধিবাসীরা হিন্দীভাষাভাষী; অথচ সেখানকার আদালত-সমূহে উর্দু ভাষা প্রচলিত। ইহাতে হিন্দী ভাষা ও হিন্দী সাহিত্যের অগ্রগতি ব্যাহত হইতেছে বুঝিতে পারিয়া তিনি ইহার প্রতিকারে চেষ্টিত হইলেন। তদানীন্তন প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছোটলাট স্যর্

অ্যাসলি ইডেনকে তিনি বলেন যে, বাংলার আদালত হইতে ফারসী উঠাইয়া দিয়া বাংলা ভাষার প্রচলন করায় বাংলা ভাষার শুধু মর্যাদা বাড়ে নাই, বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের উন্নতি দ্রুতগতিতে সাধিত হইয়াছে। সেইরূপ বিহারের আদালতগুলি হইতে উর্দু উঠাইয়া দিয়া হিন্দী প্রচলন করিলে হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ত্বরান্বিত হইবে।

ছোটলাট সাহেব ভূদেববাবুর প্রস্তাবের গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা বুঝিতে পারিয়া "হিন্দী বনাম উর্দু" সম্বন্ধে লোকমত অবগত হইবার জন্য জেলায় জেলায় পরিপত্র বা সারকুলার প্রেরণের আদেশ দিলেন। এই দেশহিতকর প্রচেষ্টাকে সফল করিতে তাঁহাকে বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন বিহারের মুসলমানগণ ও কায়স্থগণ। ভূমিহার ব্রাহ্মণ, সাধারণ ব্রাহ্মণ, ছত্রি, কুরমি, গোয়ালা প্রভৃতি সাধারণত উর্দু ভাষা শিখিতেন না; সেজন্য আদালতের লেখাপড়ার কার্য উর্দুনবিস উচ্চশ্রেণীর মুসলমান ও কায়স্থদিগের একচেটিয়া ছিল এই কার্যের দ্বারা তাঁহাদের অর্থোপার্জনও হইত যথেষ্ট। আদালতে দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী প্রচলিত হইলে তাঁহাদের একচেটিয়া কারবার বন্ধ হইয়া যাইবে এবং উপার্জনের ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইতে হইবে। মুসলমান-সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে এই বলিয়া এক আপত্তি উত্থাপন করা হইল যে, উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত লিপি তাঁহাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরানের লিপি, আর হিন্দী ভাষায় ব্যবহৃত লিপি দেবনাগরী হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ বেদের লিপি; সুতরাং এইরূপ অবস্থায় উর্দুর পরিবর্তে হিন্দীর প্রচলন অন্যায় ও অসঙ্গত হইবে। ভূদেববাবু কাগজপত্রাদির দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিলেন যে, বিহারের মুসলমানদিগের ঘরে ঘরে জমিদারী সেরেস্তায় লেখাপড়ার যাবতীয় কার্য কায়থী (নাগরী) অক্ষরে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে মুসলমান-সম্প্রদায়ের পূর্বোক্ত আপত্তি খণ্ডন হইয়া গেল।

হিন্দী প্রচলনের প্রচেষ্টা চলিতে থাকা কালে এই সম্পর্কে ছোটলাট ইডেন সাহেবের সঙ্গে ভূদেববাবুর যে আলোচনা হইয়াছিল, উহার বিবরণ

তদীয় পুত্র স্বর্গত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের রচিত 'ভূদেব-চরিত' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই স্থলে ভূদেববাবুর মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি :—

"দেখুন বাঙ্গালী হিন্দু বাঙ্গালা ইংরাজী ও সংস্কৃত পড়িতেছে, বাঙ্গালী মুসলমান বাঙ্গালা ইংরাজী ও আরবী পড়িতেছে। এইরূপে প্রত্যেক ব্যক্তিরই মাতৃভাষা রাজভাষা ও ধর্মের ভাষা পড়াই সঙ্গত, কিন্তু বেহারী সকল বালককেই উর্দু বা পারসী শিখিতে বাধ্য করা হয়। তাহাদের এ বিড়ম্বনা কেন? পূর্বের রাজা মুসলমানগণ হিন্দীকে ঐরূপ বিকৃত করিয়াছিলেন এবং বিদেশী পারশ্য হইতে একটি ভাষা আমদানী করিয়াছিলেন বলিয়া সে হিসাবে যে ইংলণ্ডে সক্‌শন বিজেতাদিগের জর্মন ভাষা এবং নর্মান বিজেতাদিগের ফরাসী ভাষা আজও অক্ষুণ্ণভাবে প্রচলিত রাখা উচিত হইত; এবং এদেশে কোন সুদূরবর্তী কালে (সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নয়) ইংরাজ রাজত্ব লোপ হইয়া গেলেও বেহারী বালককে হিন্দী, উর্দু, সংস্কৃত, পারসী এবং পৃথক অপর কোন রাজভাষা ভিন্ন ইংরাজীও পড়িতে হইবে। বেহারের এবং পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুর জন্যই এই প্রকার বিড়ম্বনা। কখন কোন দেশে এরূপ হইতে শুনিয়াছেন কি?

"ঈডেন সাহেব সত্য কথা ও স্পষ্টবাদিতার বড়ই আদর করিতেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন, হাঁ, ইহা নিশ্চয়ই অসঙ্গত। কোন বালকের প্রতি তিনটি ভাষার চাপই যথেষ্ট।"

তিন

ভূদেববাবুর প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয় নাই। বিহারের আদালতসমূহে উর্দুর পরিবর্তে হিন্দী ভাষা প্রচলিত হইল। ইহাতে বিহারের অশেষ উপকার সাধিত হইল এবং হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতির পথ সুগম ও প্রশস্ত হইয়া গেল। বিহারের অধিবাসীগণ তাঁহার ওই অতুলনীয় লোকহিতকর কর্মাবদানের কথা বিস্মৃত হন নাই। বিহারের আদালতে হিন্দী প্রচলনের ৩২ বৎসর পরে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকিপুরের স্বধর্মনিষ্ঠ দেশানুরাগী মোক্তার মুন্সী রঘুবর দয়াল প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি বিহারীদিগের কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ "ভূদেব হিন্দী মেডেল ফণ্ড" স্থাপনের কার্যে উদ্যোগী হন। তাঁহাদের উদ্যোগ সফল হইয়াছে।

উদ্যোক্তারা নিজে অর্থ দান করিয়া এবং জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া "ভূদেব হিন্দী মেডেল ফণ্ড" স্থাপন করেন এবং উদ্যোক্তাদের প্রস্তাবমতে বিহার সরকার উহার পরিচালনভার লইলেন। পাটনার জেলা-শাসক ও বিদ্যালয়-পরিদর্শক পদাধিকার বলে সেই ফণ্ডের পরিচালক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। ফণ্ডের আয় হইতে প্রতি বৎসর দেবনাগরী লিপিতে খোদিত একটি রৌপ্যপদক এবং কতকগুলি হিন্দী পুস্তক পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা আছে। বিহার রাজ্যে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে যিনি হিন্দী রচনায় সর্বাপেক্ষা অধিক নম্বর পাইয়া থাকেন, তাঁহাকে উহা প্রদান করা হয়। হিন্দী প্রচলনের প্রচেষ্টা সফল হইবার পরে ভূদেববাবুর প্রশংসা করিয়া কয়েকটি হিন্দী সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল এবং বিহারের জনসাধারণের মধ্যে ওইগুলি প্রচারিত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ্ গ্রীয়ারসন সাহেবের ভোজপুরী ব্যাকরণে দুইটি গান সংকলিত হইয়াছে। "ভূদেব-চরিত" হইতে একটি গান ও উহার বাংলা ভাবার্থ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"নাগরী অক্ষর কছরিয়োঁ মে চলিত হোনে কে
বিষয় মে সরকারকী প্রশংসা"

"ধন্য ধন্য গবর্ণমেণ্ট। প্রজা সুখদায়ী।
জামনীকে দূর করী। নাগরী চলাই ॥১
'ভুবন দেব' করি পুকার। লাট নিকট যাই।
পরজা দুঃখ দূর করহ। জামনী দূরাই ॥২
নানাবিধ জাল হোত। জামনী মেঁ রাই।
পরজা মন হরষ হোত। বিদ্যা নিজ পাই ॥৩
ধন্য বুদ্ধি ধন্য বিচার। ধন্য অন্তর ভাই।
করি নেয়ায় হিন্দ বীচ। হিন্দই চলাই ॥৪
পরজা নিত সুযশ গায়। অম্বিকা মনাই।
জব লেঁ চন্দ্র সূর্য রহে। রাজ রহে নাই ॥৫

"ভাবার্থ—

"(যবন ভাষ) পারসীর পরিবর্তে কাছারীতে নাগরী চালাইবার ব্যবস্থা করার জন্য গবর্ণমেণ্টের প্রশংসাস্মূচক সঙ্গীত

"গবর্ণমেণ্ট যাবনিক ভাষা (পারসী) উঠাইয়া নাগরী চালাইবার ব্যবস্থা করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইলেন। প্রজারা ইহাতে বড়ই সুখবোধ করিল।১। ভূদেববাবু লাট বাহাদুরের কাছে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, 'পারসীর ব্যবহার উঠাইয়া প্রজাদের দুঃখ দূর করিয়া দিন'।২। হে রাজপুরুষ! পারসীর চলন থাকায় অনেক কাগজপত্র জাল হইতে পায়। উহার পরিবর্তে প্রজারা যদি তাহাদের জাতীয় ভাষার চলন দেখিতে পায়, তাহা হইলে বড়ই আনন্দানুভব করিবে।৩। ধন্য তাঁহার বুদ্ধি, ধন্য বিচার, ধন্য অন্তর, যে পরামর্শ দ্বারা গবর্ণমেণ্ট ন্যায় বিচার করিয়া হিন্দুস্থানে হিন্দী চালাইলেন, সেই পরামর্শ ধন্য।৪। প্রজারা নিত্য সুযশ গান করিতেছে—অম্বিকা (পণ্ডিত অম্বিকা দত্ত ব্যাস) মানত করিতেছেন—যতদিন চন্দ্রসূর্য থাকে ততদিন পর্যন্ত মাতার (ভিক্টোরিয়ার) রাজ্য থাকুক।৫।"

চার

রাজনারায়ণ বসু ভারতীয় স্বাজাতিকতার আদ্যাচার্য বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দুগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া শক্তিশালী মহাজাতিরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা রচনা করেন। প্রথমে ইহা ইংরেজীতে *Old Hindu's Hope* নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়; এবং কয়েক বৎসর পরে ইহা 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' নামে বাংলা ভাষায় পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। ভারতের স্বধর্মনিষ্ঠ স্বজাতিবৎসল ও সমাজহিতৈষী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং প্রধান প্রধান সংবাদপত্র উহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। সেই পুস্তিকায় "মহাহিন্দু সমিতি" নামক একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের পরিকল্পনা রহিয়াছে; এবং উহার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বিধি-ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। ভারতীয় মুসলমানগণও তাঁহাদের উন্নতির জন্য অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলুক—এইরূপ ইচ্ছা

লেখক ব্যক্ত করিয়াছেন। কেন না, এইভাবে ভারতের দুইটি প্রধান জাতি তাঁহাদের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিলে পরবর্তীকালে দেশ ও জাতির হিতকর কার্যে সম্মিলিতভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন। "মহাহিন্দু সমিতি"র বিধি-বিধানে এই প্রকার নির্দেশ রহিয়াছে যে, নিখিল ভারতের হিন্দু জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য হিন্দীকে সার্বজনীন ভাষারূপে নির্বাচন করিয়া লইয়া উহার ব্যাপক প্রচলনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সম্পর্কে 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' হইতে উদ্ধৃতি দিতেছি :—

"মহাহিন্দু সমিতির সভ্যেরা যাহাতে ভারতবর্ষের সকল স্থানের সভ্যগণ হিন্দি ভাষা ও দেবনাগর অক্ষর অবলম্বন করিয়া পরস্পর পত্র লিখেন ও আলাপ করেন, সর্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করিবেন। ঐরূপ আলাপের জন্য বিদেশীয় ভাষা অর্থাৎ ইংরাজি ভাষার সাহায্য লওয়া স্বদেশপ্রেমী হিন্দুদিগের পক্ষে লজ্জার বিষয়। বঙ্গদেশ ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে যেখানকার প্রচলিত ভাষা হিন্দি নহে, তথাকার সভ্যদিগের উক্ত কার্যসাধন জন্য হিন্দি শিখা কর্তব্য। যে পর্যন্ত না তাঁহারা হিন্দি শিখেন ইংরাজি ভাষা অগত্যা উক্ত আলাপের উপায় হইবে। ভারতবর্ষের কোন বিশেষ দেশে সংস্থিত ভিন্ন ভিন্ন শাখা সমিতির সভ্যেরা পরস্পরকে অবশ্যই সেই দেশের প্রচলিত ভাষাতে পত্রাদি লিখিবেন। স্বদেশপ্রেমী ও মাতৃভাষানুরাগী ব্যক্তিদিগের ইহাই কর্তব্য। ভারতবর্ষের প্রত্যেক দেশের লোকসংখ্যার সঙ্গে তুলনা করিলে সেই দেশের অতি অল্প লোকেই ইংরাজি জানে, অতএব সেই দেশের প্রচলিত ভাষাতে সভার কার্য সম্পাদন করা কর্তব্য। কেবল ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকের মধ্যে আলাপ অথবা তাহাদিগকে পত্র লিখিবার সময় হিন্দি (অগত্যা ইংরাজি) ব্যবহৃত হইবে।..."

পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি প্রদত্ত হইল ১১ সংখ্যক বিধি হইতে। অন্য একটি বিধিতে এইরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, "মহাহিন্দু সমিতির যে বাৎসরিক মহাসভা" হইবে তাহাতে হিন্দী ভাষা ব্যবহৃত হইবে। ৩০ সংখ্যক বিধিতে এইরূপ নির্দেশ আছে :—"মহাসভার কার্য হিন্দি ভাষায়

সম্পাদিত হইবে; ইহা ভরসা করা যায় যে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর যে সকল লোক হিন্দি ভাষা জানেন না তাঁহারা মহাসভায় যোগ প্রদান জন্য হিন্দি ভাষা শিক্ষা করিবেন।"

জাতীয় ঐক্যসাধনকল্পে হিন্দীকে ভারতের সার্বজনীন ভাষারূপে নির্বাচন ও প্রচলনের ধারণা যে তিনজন বরেণ্য বাঙালী মনীষীর মস্তিষ্কে সর্বপ্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল, তাঁহারা সমসাময়িক। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইঁহাদের কালেও বাংলা ভাষা ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ থাকাসত্ত্বেও দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভাবিয়া ইঁহারা নিজের মাতৃভাষার পক্ষে কোন দাবি উত্থাপন করেন নাই। কেন না, তাঁহারা জানিতেন যে, ভারতবর্ষে হিন্দীভাষীর সংখ্যা অন্যান্য ভাষা-ভাষীর সংখ্যা অপেক্ষা অধিক, বিশেষত হিন্দীভাষী-অধ্যুষিত অঞ্চল-সমূহ ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলেও হিন্দী ভাষার অল্পাধিক প্রচলন রহিয়াছে।*

পাঁচ

হিন্দী ভাষার অনুকূলে পূর্বোক্ত মত ব্যক্ত ও প্রচারিত হইবার প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পরে বর্তমান বিংশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যভাগে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে—বাংলার বিপ্লবপন্থী কর্মীগণ হিন্দীকে ভারতের সার্বজনীন ভাষারূপে প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ, চারুচন্দ্র দত্ত, সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিক প্রমুখ অধিনায়কগণের পরিচালিত যুগান্তর-বিপ্লবী দল সেই প্রচেষ্টায় অগ্রণী ছিলেন। বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত তরুণ কর্মীগণের গোপনে শিক্ষাদানের ব্যবস্থায় হিন্দীভাষা অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পূর্বোক্ত বিপ্লবী দলের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'যুগান্তর' পত্রিকার পরিচালকবর্গ জনসাধারণের মধ্যে হিন্দী প্রচলনের উদ্দেশ্যে পত্রিকার কার্যালয়ে ক্লাস খুলিয়াছিলেন। সেখানে

* ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে নয়া-দিল্লীতে রাষ্ট্রভাষা-ব্যবস্থা-পরিষদের যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীসজনীকান্ত দাস তাঁহার ভাষণে পূর্বোক্ত তিনজন মনীষীর উল্লিখিত অবদানের কথা বলিয়াছেন।

বিনা বেতনে শিক্ষাদানের উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল। তৎকালে 'যুগান্তর' পত্রিকায় এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছিল যে, 'যুগান্তর' পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলী বিনা বেতনে হিন্দী শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছেন; হিন্দী ভারতবর্ষের **Lingua franca** বা সার্বজনীন ভাষা; সুতরাং হিন্দী ভাষা শিখিলে মায়ের নামের প্রচারকগণ ভারতের সর্বত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতে পারিবেন। বোমার মামলার সংস্রবে অরবিন্দ ঘোষ ও ভ্রাতৃগণের কলিকাতার মানিকতলা বাগানবাড়ি এবং অন্যান্য স্থান খানাতল্লাশি কালে যে সমস্ত কাগজপত্র পুলিসের হস্তগত হইয়াছিল এবং আদালতে প্রমাণে ব্যবহৃত হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটি দলিলে বিপ্লবী কর্মীর শিক্ষণীয় বিষয়গুলির তালিকা লিপিবদ্ধ ছিল। হিন্দী ভাষাও সেই বিষয়গুলির অন্যতম। পূর্বোল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি 'যুগান্তর' পত্রিকার যে সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, সেই সংখ্যার 'যুগান্তর'ও প্রমাণে ব্যবহারের জন্য সরকারপক্ষ আদালতে দাখিল করেন। খানাতল্লাশিতে প্রাপ্ত হিন্দী শিক্ষার কয়েকখানি প্রাথমিক পাঠ্য পুস্তকও দাখিল করা হইয়াছিল। বোমার মামলায় আলিপুরের সেশন জজ মিঃ বীচ্‌ক্রফ্‌টের রায়ে 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত পূর্বোক্ত বিজ্ঞপ্তি ও তৎসংক্রান্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য সম্বন্ধে যে আলোচনা আছে, তাহা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"There is also a paragraph in the same number mentioning arrangements for teaching Hindi without fees. The reason is given that Hindi is the Lingua franca of India, and a knowledge of it will enable preachers of the Mother's name to travel all over India preaching. In this paragraph is the passage :—"People whose country has been sold to others, whose king has so ordered that if brother did not cut brother's throat, it would be hard to earn a living, such a people would not be united even if they possessed one language." In this connection it may be noted that two Hindi Primers, a Hindi Reader, and a Hindi Grammer were found at 15, Gopi Mohan Dutt's Lane. I do not desire to lay too much stress on this, but it is an instance of the teaching of the Yugantar being followed. In exhibit LXXVI found in the garden, Hindi is also mentioned as a subject to be studied."

ভারত-বিশ্রুত দেশনায়ক অরবিন্দ ঘোষ হিন্দীকে ভারতের "সাধারণ ভাষারূপে" গ্রহণ করিয়া জাতীয় ঐক্যের অন্তরায় অপসারিত করার কথা বলিয়া গিয়াছেন—ভারত স্বাধীন হইবার প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে। তাঁহার সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক 'ধর্ম্ম' পত্রিকায় "দেশ ও জাতীয়তা" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তিনি এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। জাতীয়তা বিকাশের বিঘ্ন কি এবং তাহা কি ভাবে দূরীভূত করিয়া জাতীয় ঐক্য-সাধন সহজসাধ্য হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

"…আমরাও বঙ্গভঙ্গের সময়ে বঙ্গমাতার দর্শন লাভ করিয়াছিলাম—সেই দর্শন অখণ্ডদর্শন, অতএব বঙ্গদেশের ভাবী একতা ও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু ভারতমাতার অখণ্ড মূর্তি এখনও প্রকাশ হয় নাই। কংগ্রেসে যে ভারতমাতার পূজা নানারূপ স্তবস্তোত্রে করিতাম, সে কল্পিত, ইংরাজের সহচরী ও প্রিয় দাসী ম্লেচ্ছবেশভূষাসজ্জিত দানবী মায়া, সে আমাদের মা নহে, তাহার পশ্চাতে প্রকৃত মা নিবিড় অস্পষ্ট আলোকে লুক্কায়িত থাকিয়া আমাদের মনপ্রাণ আকর্ষণ করিতেন। যেদিন অখণ্ডস্বরূপ মাতৃমূর্তি দর্শন করিব, তাঁহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইব, তাঁহার কার্যে জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য উন্মত্ত হইব, সেদিন অন্তরায় তিরোহিত হইবে, ভারতের একতা, স্বাধীনতা ও উন্নতি সহজসাধ্য হইবে। ভাষার ভেদে আর বাধা হইবে না, সকলে স্ব স্ব মাতৃভাষা রক্ষা করিয়াও সাধারণ ভাষারূপে হিন্দী ভাষাকে গ্রহণ করিয়া সেই অন্তরায় বিনষ্ট করিব। হিন্দুমুসলমান-ভেদের প্রকৃত মীমাংসা উদ্ভাবন করিতে পারিব। মাতৃ-দর্শনের অভাবে সেই অন্তরায় নাশের বলবতী ইচ্ছা নাই বলিয়া উপায় উদ্ভাবিত হয় না, বিরোধ তীব্র হইতে চলিয়াছে। কিন্তু অখণ্ডস্বরূপ চাই, যদি হিন্দুর মাতা, হিন্দু জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা বলিয়া মাতৃদর্শনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি, সেই পুরাতন ভ্রমে পতিত হইব, জাতীয়তার পূর্ণ বিকাশে বঞ্চিত হইব।"

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়

সংবাদ-সাহিত্য

কিছুদিন হইতে দেখিতে পাইতেছি, তথাকথিত ধর্মের উন্মাদনা ভারতবর্ষের, বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের, মানুষকে অভিভূত ও অকর্মণ্য করিয়া তুলিতেছে। দিকে দিকে নিত্য নব নব গুরুর অভ্যুদয় ঘটিতেছে, সাধারণ মানুষ তাঁহাদের হাতে নিশ্চিন্তভাবে সর্বস্ব সঁপিয়া দিয়া শুধু পাদোদকসেবনেই কৃতার্থ হইতেছে। ঠাকুর বা গুরুর মহিমা সংবাদপত্রসমূহেও এমন ভাষায় কীর্তিত হইতেছে যাহা সর্বৈব ভ্রান্ত অথবা মিথ্যা। অতি মধুর মনোরম ভঙ্গিতে অলীক-কাহিনী-বিশারদেরা অতি সাধারণকে এমন অলৌকিকের মর্যাদা দিতেছেন যে, মহাপুরুষের সত্য মহিমা ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে, অন্য এক বা একাধিকের গৌরব খর্ব করিয়া এমন ভাবেই একের ঐশ্বর্য বা বিভূতি কীর্তন করা হইতেছে, যাহা পিনাল কোডের ধারা অনুযায়ী আইনত অপরাধ বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত ছিল। অথচ তাহাই অন্ধভক্তির আতিশয্যে অনেকেই অবাধে সমর্থন করিতেছেন। সারা দেশ এমনই মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় গুরুর স্থান-পরিবর্তনও দৈনিক পত্রের সংবাদ-স্তম্ভে বিজ্ঞাপিত হইতেছে; ধূপধুনাফুলমালাচন্দনে মায় রাজভবন পর্যন্ত সমগ্র "সেকুলার" দেশ ঠাকুরবাড়িতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। এই ভক্তিভাবাতিশয্যের প্রতিক্রিয়ার ছিদ্রপথে নিরীশ্বর-তন্ত্রীরা ইতিহাস ও বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া সর্বনাশা জড়বাদকে এই দেশে কায়েম করিয়া তুলিতেছেন। ধর্মসভা বাতিকে পরিণত হইয়াছে বলিয়া ধর্মহীন মতলববাজেরা দেশের ঐতিহ্যবিরোধী ভাবধারা প্রচারের সুযোগ পাইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ যখন মানবকল্যাণসাধনে বেলুড়মঠের পত্তন করেন, তখন তাঁহার মনেও এই ধর্মোন্মাদনার আতিশয্যের আশঙ্কা জাগিয়াছিল। তাঁহার স্বরচিত বিধিবিধানের মধ্যে "মঠ (১)" অধ্যায়ের ২৩ ও ২৪ সংখ্যক বিধিতে তাই তিনি লিখিয়াছিলেন (ইংরেজী হইতে অনূদিত)—

২৩। সুতরাং এই মঠের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্তৃপক্ষকে সর্বদাই সতর্ক থাকিতে হইবে যেন কখনও কোন কারণে এই মঠ বাবাজীদের ঠাকুরবাড়িতে পরিণত না হয়।

২৪। ঠাকুরবাড়ি অল্প কয়েক জনের সামান্য কল্যাণ সাধন করিতে পারে, মুষ্টিমেয় লোকের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারে—কিন্তু এই মঠের উদ্দেশ্য সমগ্র জগতের কল্যাণ সাধন।

"ভক্তি" অধ্যায়ের ২ সংখ্যক বিধিতে তিনি বলিতেছেন—

২। সঙ্কীর্তনের উন্মাদনায় নাচিয়া কুঁদিয়া শুধু দেহযন্ত্রকে বিকল করা অথবা মূর্চ্ছা যাওয়া ভক্তি নয়—এ কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে।

ভারতবর্ষের একান্ত প্রয়োজন কি, তাহা স্বামীজী স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন "মঠ (১)" অধ্যায়ের ৯, ১০, ১১ ও ১২ সংখ্যক বিধিতে :

৯। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও আধ্যাত্মিকতা বিস্তারই ভারতবর্ষে প্রথম এবং প্রধান কাজ। [অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে] খাইতে না দিলে ক্ষুধার্ত লোকের পক্ষে আধ্যাত্মিক হওয়া অসম্ভব। সুতরাং ক্ষুধিতকে অন্নসংস্থানের উপায়-নির্দেশই আমাদের প্রধান কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইতেছে।

১০। সমাজ-সংস্কারে খুব বেশি নজর দেওয়ার আবশ্যক নাই, কারণ সামাজিক বিকৃতিগুলি সমাজ-অঙ্গের ব্যাধির প্রকাশ মাত্র, শিক্ষা ও আহার্য দিয়া সে অঙ্গকে পুষ্ট করিয়া তুলিলে বিকৃতিগুলি আপনা হইতেই দূর হইবে। সুতরাং সামাজিক বিকারের নিন্দাবাদে শক্তিক্ষয় না করিয়া মঠের লক্ষ্য হইবে সমাজ-দেহকে পরিপুষ্ট করা।

১১। চারিত্রিক শক্তি ব্যতিরেকে মানুষ কোন কিছুতেই সাফল্য অর্জন করিতে পারে না। চরিত্রের অভাবই আমাদের ব্যাবহারিক বুদ্ধি অপহরণ করিয়াছে।

১২। আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস চরিত্র গঠনের একমাত্র উপায়। সুতরাং এই মঠ যাহাই করুক, আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস জাগাইবার জন্য সবিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

আশা করি, মঠের বর্তমান কর্তৃপক্ষ ও অধিবাসীরা নিশ্চয়ই এই বিধিগুলি স্মরণ রাখিয়া চলিতেছেন—আমরা দেশের অন্যত্র ধর্মের নামে ভাবাতিশয্য ও চরিত্রহীনতাই লক্ষ্য করিতেছি এবং লক্ষ্য করিয়া শঙ্কিত হইয়াছি। তাই এই দুর্দিনে স্বামী বিবেকানন্দের কথাগুলি স্মরণ করিলাম। তাঁহার আদর্শ ও উপদেশ যে সুফলপ্রসূ হইয়াছিল, স্বদেশী যুগে আমরা তাহা দেখিয়াছি। বাঙালী যুবকদের চরিত্রে তাঁহার আদর্শ এমনই দৃঢ়তা ও স্থিরতা আনিয়া দিয়াছিল যে, তদানীন্তন ইংরেজ সরকার সভয়ে তাঁহার বইগুলির প্রচার বন্ধ করিয়াছিলেন।

—

মঠের বিধিগুলি পড়িতে পড়িতে আর একটি বিধির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, যাহার ব্যতিক্রম আজকাল একটু বেশি পরিমাণেই দেখিতেছি—পরমহংসদেবের কাল্পনিক বাণী প্রচার ও বিবিধ বাণীর "কন্‌টেক্‌স্ট"-বর্জিত ভাবে অপ-প্রয়োগ। "ক্রীড্" অধ্যায়ের ১০, ১১ ও ১২ সংখ্যক বিধিতে লিখিত হইয়াছে—

১০। এই ভাবে তাঁহার সমগ্র উক্তিগুলি হইতে নিতান্ত ব্যক্তিগত যেগুলি [অর্থাৎ কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রয়োজনে একান্তে তাঁহাকেই যাহা বলা হইয়াছিল] এবং যেগুলি সকল মানুষের কল্যাণার্থ উক্ত হইয়াছিল সেইগুলি তফাত করিয়া লইতে হইবে। সর্ব-মানবীয় কল্যাণ-বাণীগুলি পুস্তকাকারে সংগৃহীত হইয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইবে।

১১। ব্যক্তিগত উক্তিগুলিও সংগৃহীত হইয়া মঠে একান্তে রক্ষিত হইবে, মঠের প্রচারকেরা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে উপদেশ দিবার জন্য সেগুলি জানিয়া লইবেন।

১২। ঠাকুরের একটি উক্তিতে আছে—যাহারা বহুরূপীকে [গিরগিটি জাতীয় জীব—chameleon] একবার মাত্র দেখিয়াছে তাহারা তাহার একটি রঙেরই খবর রাখে, কিন্তু যাহারা বহুরূপীর আবাস-বৃক্ষের নীচে বাস করে, তাহারা তাহার সকল রঙের খবরই জানে।

এই কারণে তাঁহার কোনও উক্তিই আসল বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না, যাহা তাঁহার নিত্যসান্নিধ্যবাসী এমন কাহারও দ্বারা সমর্থিত নয় যিনি তাঁহার জীবনদর্শনকে সফল করিবার শিক্ষা তাঁহারই হাতে না পাইয়াছেন।

ব্যক্তিগত বা সাধারণ—পরমহংসদেবের বাণীগুলির যথেচ্ছ প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক বা কবি প্রতিপন্ন করার চেষ্টা আজকাল যেভাবে চলিতেছে তাহাতেই বুঝিতে পারিতেছি, স্বামীজী দূরদর্শী ছিলেন বলিয়াই সকলকে এই বিষয়ে সতর্ক হইতে বলিয়াছিলেন। স্বামীজীর এই নির্দেশানুযায়ীই স্বামী ব্রহ্মানন্দ পরমহংসদেবের বাণীগুলি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। আমরা সভয়ে লক্ষ্য করিতেছি, কল্পনাবিলাসীরা তাঁহার সেই চটি বইখানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিতে প্রস্তুত নহেন।

একটু বঙ্কিমচন্দ্র শুনুন—

"শাঁকের শব্দ শুনিবামাত্র তাহারা পালের কাছিসকল টানিয়া ধরিল। মাঝি হাল আঁটিয়া ধরিল। অমনি সেই প্রচণ্ড বেগশালী ঝটিকা আসিয়া চারিখানা পালে লাগিল। বজরা ঘুরিল—যে দুইজন সিপাহী সঙ্গীন তুলিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গীন উঁচু হইয়া রহিল—বজরার মুখ পঞ্চাশ হাত তফাতে গেল। বজরা ঘুরিল—তারপর ঝড়ের বেগে পালভরা বজরা কাত হইল, প্রায় ডুবে। লিখিতে এতক্ষণ লাগিল—কিন্তু এতখানা ঘটিল এক নিমেষমধ্যে। সাহেব ব্রজেশ্বরের চড়ের প্রত্যুত্তরে ঘুষি উঠাইয়াছেন মাত্র, ইহারই মধ্যে এতখানা সব হইয়া গেল। তাঁহারও হাতের ঘুষি হাতে রহিল, যেমন বজরা কাত হইল, অমনি সাহেব টলিয়া মুষ্টি-বদ্ধ-হস্তে দিবাসুন্দরীর পাদমূলে পতিত হইলেন। ব্রজেশ্বর খোদ সাহেবের ঘাড়ের উপর পড়িয়া গেল—এবং রঙ্গরাজ তাহার উপর পড়িয়া গেল। হরবল্লভ প্রথমে নিশি ঠাকুরাণীর ঘাড়ের উপর পড়িয়াছিলেন, পরে সেখান হইতে পদচ্যুত হইয়া গড়াইতে গড়াইতে রঙ্গরাজের নাগরা জুতায় আটকাইয়া গেলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, 'নৌকাখানা ডুবিয়া

গিয়াছে, আমরা সকলে মরিয়া গিয়াছি, এখন আর দুর্গানাম জপিয়া কি হইবে!'"

ব্রজেশ্বরের চড়, সাহেবের ঘুষি, কাছি, হাল, দিবা, নিশা, রঙ্গরাজ—বর্তমান জগৎকে জড়াইয়া সব কিছুরই অতি মনোরম এবং সমীচীন ব্যাখ্যা দিতে পারিতাম; কিন্তু সে সকল কচকচিতে প্রয়োজন নাই। আমরা হরবল্লভ-জাতীয় জীব, এইটুকু মাত্র বুঝিতে পারিতেছি, বজরা অর্থাৎ আমাদের এই পৃথিবী ডুবিয়া গিয়াছে, আমরা মরিয়া গিয়াছি, এখন দুর্গানাম জপিয়া কি হইবে?

আজ্ঞে হাঁ, বোমার কথাই ভাবিতেছি—অ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা এবং শেষ পর্যন্ত নাইট্রোজেন বোমা। এক নম্বরের মাত্র দুইটির প্রকোপ হতভাগ্য হিরোসিমা-নাগাসাকিতে দেখিয়াছি, দুই নম্বরের একটির মাত্র মহড়ার ফলে বৈজ্ঞানিক ও রাষ্ট্রপতিরা সচকিত হইয়া মৃগের পশ্চাতে শরহস্তে ধাবমান দুষ্মন্তের উদ্দেশ্যে কণ্বাশ্রমের ব্রহ্মচারীদের মত যে আর্তনাদ তুলিয়াছেন তাহা শুনিতেছি এবং রাশিয়ার হবু-নাইট্রোজেন বোমার বিশ্বধ্বংসী শক্তির হুমকিও আমাদের কানে আসিয়াছে। সুতরাং আমরা মরিয়া গিয়াছি। এখন কি হইবে ডি. ভি. সি.-ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার কথা ভাবিয়া, বাজেটে শিক্ষাখাতে উপযুক্ত ব্যয়-বরাদ্দ ধার্য হইল না বলিয়া আপসোস করিয়া। মানভূম বাংলাদেশভুক্ত হইল বা না-হইল, কাশ্মীর পাকিস্তানীদের হাতে পড়িল কি না-পড়িল, আমেরিকা পাকিস্তানকে ভারতঘাতী অস্ত্র দিল কি না-দিল, পূর্ববঙ্গে লীগ শাসনের পতন হইল কি না-হইল, কলিকাতায় রেশন-ব্যবস্থা উঠিল কি না-উঠিল, কোন সাহিত্যিক রবীন্দ্র-পুরস্কার পাইল বা না-পাইল—এই সকল অতি তুচ্ছ নগণ্য কথা ভাবিবার এবং ভাবিয়া উত্তেজিত হইবার মত মেজাজ মরিয়া গেলে থাকিবার কথা নয়। দুর্গানাম জপই যখন ভুলিয়া গিয়াছি, তখন লিখিলেনই বা আমাদের সুনীতিকুমার *West Bengal 1954* নামক গ্রন্থে **"The Culture of Bengal"** প্রবন্ধে—

"It was in Bengal that there was a swing of the

pendulum back to the deeper things behind life as experienced by Indian Spiritualism: Ramkrishna Paramhansa, Swami Vivekananda and Rabindranath Tagore were the great saint, prophet and poet of the Indian spiritual outlook, and the mantle of these great sons of Bengal has now worthily fallen on the philosopher and thought-leader from the South, Sarvapalli Radhakrishnan.

সুনীতিকুমার যদি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের পরিবর্তে গুলজারিলাল নন্দের নাম করিতেন, বর্তমান মনের অবস্থায় আমরা তাহাতেও আপত্তি করিতাম না। বঙ্গের টিনিটি যদি কোনও বিশেষ কারণে দক্ষিণের একমেবাদ্বিতীয়ম্-রূপে কাহারও নিকট প্রতিভাত হন, তাহাতেই বা কি? সুনীতিবাবুর হিসাবের 'তিনেকত্তি তিনের হাতে রইল এক'ও আমাদের হিসাবে ফরসা হইয়াছেন।

* * *

লিখিলেনই বা শ্রীবিমল কর 'দেশ' পত্রিকায় "আত্মজা" গল্প; আজ আর ঘুমন্ত শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার বা সদাজাগ্রত শ্রীকানাই সরকারকে ডাকিয়া বলিবার প্রবৃত্তি নাই—

নির্মল কর বিমল করে মলিন মর্ম মুছায়ে।

বলিব না, এই মলিন-মর্মতা দেশকে পাইয়া বসিয়াছে—নহিলে এত ভাল ভাল বিদেশী বই থাকিতে নোংরা জাঁ পল সার্তর-এর "নোংরা হাতে"র নোংরা অনুবাদ এখানে বাহির হয় কেন, আর এক বিমল—মিত্র বিমলই বা এত ছবি থাকিতে "পুতুল দিদি"র ছবি আঁকেন কেন? অপঘাত-মৃত্যুর মধ্যে মাথা ঠিক থাকিবার কথা নয়, ভুল করিতেছি কি-না তাহা বুঝিবার জন্য "আত্মজা" হইতে কিছু উদ্ধৃতিও এই সঙ্গে দাখিল করিতেছি। যাঁহারা আমাদের মত এখনও মরেন নাই তাঁহারাই বিচার করিয়া দেখিবেন, আমরা সত্যই ভুল করিতেছি কি-না!

"হিমাংশু স্বামী; যূথিকা স্ত্রী।...এত চেষ্টা সত্ত্বেও পুতুলের মা যূথিকাকে মোটেই পঞ্চদশী কন্যার জননী বলে মনে হত না।...

…"মেয়ের গায়ের কাছটিতে এসে দাঁড়ায় ও। মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে। ফ্রকের কাপড়ের ঝুলের অংশটা একবার উঁচু করে একটু। মেয়ে বলে, হ্যাঁ—ওই পর্যন্ত হলে ভাল হ'ত। হিমাংশু মাথা নাড়ে, ঠিক। তারপর বুক। হিমাংশু বুকের দু' পাশের কাপড় দু' হাতের আঙুলে আলতো করে ধরে কাপড়ের বিস্তৃতিটা পরখ করে, সঙ্কুচিত করে বুকের বস্ত্রাংশটা। কুঁচি দিয়ে নিলে কি ভালো দেখাবে রে—বরং একটু ছোট করতে দিয়ে আসলে হয়। না, না, দরকার কি, পুতুলের আপত্তি, আমি হাতেই এমন সুন্দর করে একটা হনিকম্বের কাজ করে নেবো, দেখো—। এরপর কোমর। সত্যি বেঢপ বড় করেছে, কাপড় রেখেছে এক রাশ। হিমাংশুর দুই বিঘতের মধ্যে পুতুলের কোমরটা আঁট হয়ে থাকে। কি সরু, সুন্দর কোমর পুতুলের—হিমাংশু পরখ করে ভাবছে, হাসছে, তুই এবার একটু-আধটু নাচ শিখলেই তো পারিস, পুতুল—যা সরু কোমর তোর!…পুতুল আনন্দে আত্মহারা: সত্যি নাচ শিখতে ভীষণ ইচ্ছে আমার। আমাদের ক্লাশের রেখা, ছন্দা ওরা তো শেখে, কোথায় যেন। কিন্তু আমি যেন একটু ভারী, বাবা; ওরা বেশ হাল্কা।…ভারী? হিমাংশু হো হো করে হেসে ওঠে, টপ করে কোমরে বিঘত জড়িয়ে শূন্যে তুলে নেয় মেয়েকে। আচমকা মাটি থেকে পা উঠে যেতেই পুতুল ভয়ে হিমাংশুকে আঁকড়ে ধরে—তার হাত হিমাংশুর মাথার চুলে ঘাড়ে টলে পড়ে। ক্রিমসন রঙের লুজ ফ্রকের আড়ালে হিমাংশুর নাক, চোখ, মুখ সব ঢাকা পড়ে গেছে। শুধু একটা অট্টহাসির অনেকখানি শব্দ ঘরের বাতাসে।

পুতুলকে নামিয়ে দিতেই গা মুখ ঘুরিয়ে নিজেকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে গিয়ে সে হঠাৎ কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল। অর্ধস্ফুট শব্দ বেরুল, মা।

তাকাল হিমাংশু। দরজার গোড়ায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যূথিকা আর শিপ্রা [যূথিকার বোন]। মনে হ'ল, ওরা অনেকক্ষণই এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে।

—কখন এলেন আপনারা? হিমাংশু শিপ্রার মুখে চোখ ফেলে হাসল, আসুন—

—এসেছি অনেকক্ষণ, মেয়ে নিয়ে যা মত্ত ছিলেন, বুঝবেন কি করে? শিপ্রার ঠোঁটের পাশে একটু বাঁকা হাসি খেলে গেল।

আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই যূথিকা শিপ্রাকে টেনে পাশের ঘরে চলে যায়।

আগের দিন কিছু না বললেও আজ শিপ্রা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কথা তুললে, তোর মেয়ের বয়স কত হ'লো রে যূথি?

—পনেরো। বিরস, গম্ভীর মুখ যূথিকার।

—দেখলে যেন আরও একটু বেশি মনে হয়। তা বড়-সড় হয়েছে—ওকে ফ্রক পরিয়ে রাখিস কেন? চোখে কট্‌কট্‌ করে লাগে।

—সাধ করে কি পরিয়ে রাখি? যূথিকা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে তিক্তস্বরে বলছে, ওর বাবার সখ, মেয়েকে শাড়ি পরতে দেবে না।

—বাবার সখ? ঠোঁট উল্টে শিপ্রা একটা বিশ্রী শব্দ করলে, হিমাংশুর এই সখ নিজের চোখেই দুদিন দেখলাম। আবার একটু থামল শিপ্রা, তারপর গলার স্বর নীচু করে, যেন উপদেশ দিচ্ছে এমনভাবে বললে, জিনিসটা মোটেই ভাল নয় যূথি। এসব আস্কারা দিবি নে। এ এক ধরনের কমপ্লেক্স!

যূথিকা শেষ কথাটা বুঝল না। শিপ্রাদির চোখের দিকে তাকালে।

—মানে?

—মানে—? ও, সে তুই বুঝবি না। শিপ্রা যূথিকার অজ্ঞতাকে উপেক্ষা জানিয়ে অনুকম্পার হাসি টেনে আনল ঠোঁটে, আসলে যূথি, এই—এই—ধরনের রুচি—কি বলবো যেন একে—হ্যাঁ, এই ধরনের রুচি খুব খারাপ, নোংরা।

যূথিকা কয়েক মুহূর্ত ফ্যাকাশে অর্থহীন চোখে তাকিয়ে থাকে শিপ্রাদির মুখের দিকে। তারপর উঠে দাঁড়ায় আস্তে আস্তে।

…ঘড়ির কাঁটায় শব্দ ঠেলে রাত গভীর হয়ে আসে। সব নিস্তব্ধ।

শীতের রাত। সমস্ত পাড়াটাই এতক্ষণে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। এ বাড়িটাও।

···যূথিকার বিছানার পাশে হিমাংশু।

দেখছে বই-কি হিমাংশু—পাশাপাশি মা আর মেয়েকে। যূথিকা ডান দিকে কাত হয়ে শুয়ে, বালিশের ভাঁজের তলায় মুখ চাপা, ডান হাতটাও গালের ওপর দিয়ে কপাল বয়ে বালিশের প্রান্তে এলিয়ে রয়েছে। কিচ্ছু ভাল করে দেখা যায় না। চোখের পাতা বোজা।

মার দিকেই মুখ করে কাত হয়ে ঘুমোচ্ছে পুতুলও। ক্রিমসন রঙের সেই লুজ ফ্রক এখনও তার অঙ্গে। গায়ের লেপটা সরে গেছে —অর্ধেক দেহটাই তার খোলা। হিমাংশু আরও একবার মুগ্ধ চোখে মেয়েকে দেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সাদা চাদর আর বালিশের ফেনার মধ্যে সূর্যাস্তের রঙ ছোপানো একটি ঢেউ যেন। হয়তো দুঃস্বপ্ন দেখে ঠোঁট খুলে কেমন একটু ককিয়ে উঠে থেমে গেল পুতুল, আবার কাশলো খুক খুক করে। নড়ে চড়ে উঠে ফের শান্ত। রাত্রে কাশিটা আবার বেড়েছে মেয়েটার। যে ভাবে শোয়, রোজই হয়তো ঠাণ্ডা লাগে। গলার কাছটায় অত খোলা না রাখলেই কি নয়! হিমাংশু হাত বাড়িয়ে গলার কাছটায় জামার টিপকলটা এঁটে দেয় পুতুলের, লেপটা টেনে দেয় গলা পর্যন্ত। কতকগুলো চুল কপালের পাশ দিয়ে চোখে এসে পড়েছিল। আস্তে আস্তে সরিয়ে দেয়। গভীর সোহাগে গালে মুখে কপালে হাত বুলিয়ে সরে আসে। বারান্দার দিকের দরজাটা ফাঁক হয়েছিল। বন্ধ করে দেয় হিমাংশু। ছিটকিনি তুলে দেয়। বাতি নিভোয়। তারপর পর্দা সরিয়ে নিজের ঘরে।

বিছানার দিকেই এগুতে যাচ্ছে হিমাংশু, হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে টান দিলে চাদরে।

মুখ ফেরাতেই দেখে যূথিকা।

—তুমি ঘুমোও নি? হিমাংশু অবাক।

—না। ঘুম থেকে তো নয়ই, যেন খুব জ্বর থেকে ও উঠে এসেছে,

তেমনি শুকনো টকটকে ওর চোখ মুখ, তেমনি বিশ্রী ঝাঁজ আর তিক্ততা তার গলায়।

—কি করছিলে তবে এতক্ষণ? হিমাংশু আবার এগুতে চায়।

—তোমার কীর্তি দেখছিলাম। যূথিকা আবার বাধা দেয়।

—কীর্তি। অবাক চোখে চায় হিমাংশু।

—তাই। ঠোঁটটা দাঁতে কামড়ে ধরেছে যূথিকা।

—স্পষ্ট করে বলো যা বলতে চাও, হেঁয়ালি করো না। আমার ঘুম পাচ্ছে। হিমাংশু এই প্রথম বিরক্ত হ'ল।

—বলবোই তো। যূথিকা স্বামীর চাদর ছেড়ে দিলে, অপ্রকৃতিস্থ দৃষ্টিতে তাকালো ঘরের এদিক ওদিক। তারপর হঠাৎ, যে কপাট এতকাল খোলাই থাকত রাত্রে, সেই পাশের কপাটটা পর্দা সরিয়ে বন্ধ করে দিলে। এক মুহূর্ত থামল। কি ভাবল সে, কে জানে! দু পা এগিয়ে সুইচটা অফ করে দিলে। মুহূর্তে সারা ঘর অন্ধকারে ভরে গেল। খালি একপাশের এক খোলা জানালা দিয়ে বাইরের একটু আলোর আভাস জেগে থাকল।

—বাতি নিভোলে কেন? অন্ধকারেই বিছানার পাশে এগিয়ে গিয়ে বসলে হিমাংশু।

—অন্ধকারই ভালো। আলোয় তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতেও আমার ঘেন্না হয়।

হিমাংশু কতদূর বিস্মিত হয়েছে অন্ধকারে ঠাওর করা যায় না।

—রাত দুপুরে কি পাগলামি শুরু করলে যূথি? কি যা-তা বলছো?

—পাগলামি নয়, যা বলছি তা তোমার শুনতেই হবে। আমি আর পারছি না—আমার সহ্য-শক্তি আর নেই—নেই। যূথিকা সত্যিই বুঝি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, তোমরা দুজনে—মেয়ে আর বাপে মিলে আমায় শেষ করে ফেলছ। কি চাও তুমি, আমি চলে যাই, আমি মরে যাই?

—এসব কি বলছো!

—ঠিক কথাই বলছি। তুমি কি বল তো, মানুষ না পশু? পুতুল না তোমার মেয়ে?

অন্ধকারেও হিমাংশু একবার চমকে উঠে স্ত্রীকে দেখবার চেষ্টা করলে।

—রাত দুপুরে তুমি এই কথা বলতে এসেছ?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। রাত দুপুরে তুমি যেমন লুকিয়ে পনেরো বছরের মেয়ের ঘুমন্ত চেহারা দেখতে যাও।

—যূথি—হিমাংশু কি যেন বলতে চায়। কিন্তু তার গলার স্বর চাপা দিয়ে যূথিকার তীক্ষ্ণ, অসম্ভব তিক্ত, একরাশ অভিযোগ স্রোতের মতন বেরিয়ে আসে।

—তুমি বাপ হতে পারো, কিন্তু সে মেয়ে; তার রূপ আছে, বয়স আছে। তার, তার কি নেই, কি হয় নি! জান না তুমি? তবু, এই মেয়ে নিয়ে তোমার বেহায়াপনা রোজ রোজ আমি দেখে যাচ্ছি। বাইরের লোক এসেও আজ দেখে গেল। ছি, ছি, ছি! কোন্ আক্কেলে তুমি ওর বুকে মুখ গুঁজে থাকো, কোমর জড়িয়ে ধরো। যূথিকার হাঁপ ধরে যায়। তবু অনেক কষ্টে দম নিয়ে আবার সে বলে, এতদিন বুঝি নি, আজ বুঝতে পেরেছি, মেয়েকে ফ্রক পরাবার বায়না তোমার কেন?"

মরিয়া না গেলে—ভুল না ঠিক এই মামলা নিষ্পত্তির জন্য এই 'দেশে'ই "জাতিচরিত্রে"র লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীরাজশেখর বসু অথবা শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকারের দরবারে যাইতে পারিতাম। কিন্তু হাইড্রোজেন বোমার প্রাথমিক শক্তি পরীক্ষার পর এখন আর তাহা করিবার প্রবৃত্তি নাই। দেশ উচ্ছন্নে যাউক, আমরা তো মরিয়াই গিয়াছি।

* * *

আসল কথা হইতেছে এই, অনাবিল সুখে থাকিতে আর কেহ প্রস্তুত নয়। ভিতরে ও বাহিরে ভূতে কিলাইতেছে, তাই ফ্রাঙ্কেনস্টাইন-মানুষ নিজেই নিজের সর্বনাশের বা অপঘাতের অস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে, আমেরিকা, রাশিয়া, সুরেশচন্দ্র মজুমদার—সকলেই। অ্যাটম বম, হাইড্রোজেন বম, নাইট্রোজেন বম, বিমল কর, বিমল মিত্র, সন্তোষ ঘোষ,

শিবনারায়ণ রায়, সকলেই সেই এক ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের কীর্তি। জেনিভার সেই পদার্থ-বিজ্ঞানের ছাত্রটি—সেই ফ্রাঙ্কেনস্টাইন—জড়পদার্থে প্রাণসঞ্চারের রহস্য অবগত হইয়াছে। শ্মশান হইতে বিচ্ছিন্ন অস্থিখণ্ড সংগ্রহ করিয়া জোড়া দিয়া দিয়া এক-একটি জানোয়ার নির্মাণ করিয়া সে তাহাকে জীবন দান করিতেছে। সেই অতিপ্রাকৃত আকার ও শক্তিসম্পন্ন বীভৎস জানোয়ারকে দেখিয়া আর পাঁচজনের মত ফ্রাঙ্কেনস্টাইন নিজেও ভীত ও সন্ত্রস্ত। সৃষ্ট জানোয়ারটি প্রাণ পাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গী নাই, তাহার মনে বিষাদের অন্ত নাই, তাই স্রষ্টার প্রতি বিদ্বেষে তাহার চিত্ত পরিপূর্ণ; তাহাকে হত্যা করিতে চায়। প্রথমটা পারে নাই, ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের ভ্রাতাকে ও ভ্রাতৃবধূকে সে হত্যা করে। ফ্রাঙ্কেনস্টাইনও স্বয়ং-সম্বর্ধিত বিষবৃক্ষকে ছেদন করিবার জন্য তাহাকে অনুসরণ করিয়া সুদূর মেরুপ্রদেশ পর্যন্ত ধাওয়া করিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত সেই জানোয়ারের হাতেই যে সে বিনষ্ট হইবে—এ কথাও আমরা জানি। স্রষ্টাকে না মারিলে সে জানোয়ার মরিবে না। সারা পৃথিবী জুড়িয়া স্রষ্টা ও সৃষ্টির এই বিচিত্র পরস্পরানুসরণ চলিতেছে। জানোয়ারগুলিকে নির্মাণ করিয়া যাহারা পৃথিবীতে ছাড়িতেছে, শেষ পর্যন্ত তাহাদের কাহারও নিস্তার নাই। মৃত আমাদের তাহাই সান্ত্বনা।

—

আলাপচারী রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি যে এতদিনে জোড়াসাঁকোর ধারে পূর্ণকুম্ভের উপর পতিত হইল; ইহাতে আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। এই সর্বপ্রথম জেনানা-ফাটকও খুলিয়া গেল। আমরা জানি, ইহা ঘরোয়া বন্দোবস্ত মোটেই নয়।

—

এই মাসে যাঁহাদের চাঁদা শেষ হইল, চাঁদা পাঠাইতে তাঁহাদের অনুরোধ জানাইতেছি। যথাসময়ে টাকা না পাইলে বা পত্রে নিষেধ না করিলে পরবর্তী সংখ্যা ভি. পিতে পাঠানো হইবে। তাহা ফেরত দিয়া আমাদের অকারণ ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা ৩৭ হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: বড়বাজার ৬৫২০

শনিবারের চিঠি

ষান্মাসিক সূচী

কার্তিক—চৈত্র ১৩৬০

সম্পাদক

শ্রীসজনীকান্ত দাস

অতি-প্রাকৃত—শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ ৪৩২
আমার সাহিত্য-জীবন—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩, ১১৩, ২২৭
৩৩৭, ৪৫০, ৫৬২
আরোগ্য—শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ৬০১
অ্যান্‌ড্রোক্লিস ও সিংহ—শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু ১৭৭
উতোর—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ৫৮৯
উলুখড়—শ্রীসঙ্কর্ষণ রায় ৩৮৫
একটি পুরনো আলিঙ্গন—দীপক চৌধুরী ১২৫
কালান্তর ৫২৯
ক্ষতি কোথায় ?—শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায় ৩৫৪
চলমান বিজ্ঞাপন—শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ ৩২২
চামড়া—শ্রীকুমারেশ ঘোষ ২৯৬
চিরায়ু বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর—কানাই সামন্ত ৩৪৫
ছিদ্রান্বেষী—শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ ২৪৯
জগত্তারিণী পদক—শ্রীকালিদাস রায় ২৪৯
জবালা ও সত্যকাম—শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ৮১
টাইগার হিলে সূর্যোদয়—শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ ২৮৮
ডানা—"বনফুল" ২৭, ২৪১, ৩৬০, ৫০৮, ৫৭৭
তখন ও এখন ৪৪৯
তিনকড়ি-দর্শন—"বনফুল" ৩৫৩
দাদের দাবি—"বনফুল" ৫৮৯
ধনপতি পাগ্‌লার ডায়েরি—শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু
ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ৬২৯
একটি গাধার কাহিনী ২৭৩
চিড়িয়াখানা ৪৫৭
রাহুল ও দময়ন্তী ৪০১
ধরিত্রী—শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ ২৪৯

ধূমাবতী—"বনফুল" ৪৩, ১৭৫, ৪১৭
নববর্ষের গান ৫৬১
নাটক—শ্রীতারকদাস চট্টোপাধ্যায় ৪১৩
নামের নমুনা—"সম্বুদ্ধ" ১২৯
পথিক—শ্রীপ্রণব মিত্র ২৭১
পরিচয়—শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ৪৭
পলাশপুরের চিঠি—শ্রীপ্রভাকর মাঝি ৩০২
পাগ্‌লা-গারদের কবিতা—শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু ৫৪৪
প্রশ্ন—শ্রী গোপাল ভৌমিক ৫৬৬
প্রার্থনা ১৭৪
ফেরারী—শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ ৯৫
বনলতা সেনের প্রতি—শ্রীঅসিতকুমার চক্রবর্তী ৪১২
বসুদেব—শ্রীতারাপ্রসন্ন দেবশর্মা ২৮৯
বাতিঘর—শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ ৫৭৫
বিনোবা—শ্রীপ্রভাত বসু ৫৭৬
বিবাহ-বার্ষিকী—শ্রীসুমথনাথ ঘোষ ৫৭
বুড়ো মায়ের প্রতি—শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭
বেতালের বৈঠকী—"বেতালভট্ট" ২৪৮, ৩১৪, ৪৩৬, ৬২২
ভক্তি ৬৫
ভর—শ্রীসুভাষ সমাজদার ৩০৩
ভারতবর্ষের সার্বজনীন ভাষা—শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায় ৬৪৫
ভুল গণনা ৫২৯
মন্তর—শ্রীকুমারেশ ঘোষ ৫৬৭
মহাস্থবির জাতক—"মহাস্থবির" ৬৬, ১৫৫, ২৫৭, ৩৬৯, ৪৮২, ৫৯১
মিতার জন্য রোমান্টিক কবিতা—শ্রীশান্তকুমার ঘোষ ৬৪
রাক্ষস-খোক্কসের গল্প—শ্রীভূপেন্দ্রমোহন সরকার ৩২০
লাউড স্পীকার—শ্রীকালিদাস রায় ৬৩

শর্ট স্ট্রীটে কান্না—দীপক চৌধুরী ৪৬৫
শারদীয়া মহাপূজা ও সার্বজনীন দুর্গাপূজা
—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩১৫
শেয়ানে শেয়ানে—"বেতালভট্ট" ৪৮১
সংবাদ-সাহিত্য— ১, ২১৬, ৩২৩, ৪৩৭, ৫১৮, ৬৫৭
সন্ধ্যাবেলার গল্প—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত ৫৬
সুব্রহ্মণ্যম্ ভারতী—শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব ৫০২
স্বর্ণ-ক্যাডিলাক-কামী অভিমানিনীর প্রতি ১৭৬
স্বপ্ন-দেওঘরে—শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৫
হারানো সুর ২৩৯
হ্যামলেট, ডেনমার্কের কুমার—অনু° শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ৮৭, ২০৪, ২৫০, ৪১৮, ৫৩০, ৬২৩

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

স্বর্গের চাবি ৩৲

আর্যকুমার সেন

অভিনেতা ২।০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রসকলি ২॥০

ধাত্রী দেবতা ৪॥০

১৩৫০ ২॥০ জলসাঘর ৪৲

রাইকমল ২৲

মহাস্থবির

মহাস্থবির জাতক

১ম পর্ব ৫৲ ২য় পর্ব ৫৲

বনফুল

অগ্নি ২৲ মৃগয়া ৩৲

সে ও আমি ২॥০ রাত্রি ৩৲

বিন্দুবিসর্গ ২৲ কিছুক্ষণ ১॥০

সম্বুদ্ধ

ডায়লেকটিক ২॥০

শিকার-কাহিনী ২॥০

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

হর্ষচরিত ১০৲

ভূপেন্দ্রমোহন সরকার

বাণী ও ভস্ম ২

জীবনময় রায়

মানুষের মন

সজনীকান্ত দাস

কেড্‌স্‌ ও স্যাণ্ডাল

অজয় ২৲ কলিকাল

মধু ও হুল ২॥০ রাজহংস

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

রাণুর গ্রন্থমালা

১ম ২॥০, ২য় ২॥০, ৩য়

রাণুর কথামালা ৩৲

অমলা দেবী

শেষ অধ্যায় ২৲ মনোরমা

স্বাধীনতা-দিবস ৪

সরোজিনী ৪৲ সুধার প্রেম

কল্যাণ-সঙ্ঘ ৫

ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডিটেকটিভ ৩

মণীন্দ্রনারায়ণ রায়

প্রধূমিত বহ্নি ৪

ভস্মাবশেষ ৪

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

আবর্ত ২৮

খিন নাট্যসম্প্রদায়ে অভিনয়োপযোগী কয়েকটি নাটক

মন্মথ রায়ের

উর্বশী নিরুদ্দেশ ॥০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দুই পুরুষ ২৲

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ডিটেকটিভ ১৲

প্রমথনাথ বিশীর

তং পিবেৎ ১॥০ গভর্মেণ্ট ইন্সপেক্টর ২৲

ভূপেন্দ্রমোহন সরকারের

নেক স্বর্গ ১॥০ ইতিহাসের নাটক ৸০

বাধকুমার মজুমদারের

ভযাত্রা ॥০

[illegible]কুমার রায়ের

পরীক্ষিৎ ১॥০

প্রতাপচন্দ্র [illegible]

শহরতলা ১॥০

প্রবোধকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

ধর্মঘট ১৲

কৃষ্ণদাসের

খুনে ১৲ হোটেল ১৲

কংগ্রেস-সাহিত্য-সঙ্ঘের

অভ্যুদয় ১৲

—ছোটদের জন্য—

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

ভারত-মঙ্গল ১।০

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের

আজব দেশ ।০

আমাদের স্বর্ণ-অলঙ্কার আর হীরা-জহরতের অলঙ্কারের দীপ্তি
এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত অভিজাত ও এ
অন্তঃপুরকে আলোকিত করে রেখেছে।

সকল রকম গ্রহরত্ন প্রচুর মজুত থাকে

স্থাপিত ১৮৮২

বিনোদবিহারী দত্ত

জুয়েলার, ডায়মণ্ড মার্চেন্ট

হেড অফিস [illegible] স্ট্রীট (মার্কেন্টাইল [illegible]